শিবরাম চক্রবর্তী

ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা

banglaboipdf.com

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
Click here

ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭
প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু রায়

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

॥ এক ॥

প্রায় লেখককেই নিজের কবর খুঁড়তে হয়—নিজের কলম দিয়ে। গায়কের মতন লেখকেরও ঠিক সময়ে থামতে জানা চাই। সমে এসে যথাসময়ে না থামলেই বিষম, সবটাই বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি কালজয়ী লেখকও যদি যথাকালে না থামেন তো জীবদ্দশাতেই জীবন্মৃতের অন্তর্দশা তাঁর বিধিলিপি।

অবশ্য মহাকাল কারো কারো প্রতি একটু সদয়। সময় থাকতে থাকতেই তাঁদের নিরস্ত করেন, নিজের পুনরাবৃত্তির পথে আত্মহননের ভোগান্তি তাঁদের আর পোহাতে হয় না। যেমন, মানিক বন্দ্যো, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র। বিস্ময় থাকতে থাকতেই, রাখতে রাখতেই তাঁরা অস্ত গেছেন।

আর, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। কালের স্থূল হস্তাবলেপ তাঁর গায়ে লাগেনি। প্রতিভার ঘনবোম্মেষে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্রতিভাত, উদ্ভাসিত। নিত্য নব ভাষাভঙ্গি, নব নব ভাবের উদ্ভাবনায় বিভিন্ন শৈলীর শৈলশিখরে স্বচ্ছন্দ বিচরণে বাঁকে বাঁকে অবাক করা, নিতুই নব তিনি। হিমালয়ের মতই চিরন্তনরূপে সর্বকালীন বলে যেন মনে হয় তাঁকে। চিরদিনের অপরূপের।

কিন্তু ওই মনে হওয়াটাই। যথার্থ বললে হিমালয়ও কিছু চিরকালের নয়। কালস্রোতে সেও ক্ষয় পায়। ভেসে যায়।

তাহলেও এই মনে হওয়াটাই অনেক। ক্ষণস্থায়ীদের ঝরতি পড়তির ভিড়ে এই দীর্ঘক্ষণ স্থায়িত্বটুকু বিস্তর। অমরত্বের ভ্রম জন্মায়। তাই কি কম?

তবে সত্যিকার সর্বকালীন লেখা কি নেই? আছে। সেটা বিধাতার নিজের রচনায়। যদিও তা মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে বদলে যায়, তবু তাঁর হাতের স্বাক্ষরে এক চিরকালের আদল বজায় থাকে।

আর আছে তাঁর উচ্চারণায়—যা চারিধারে তিনি চারিয়ে দেন তাঁর প্রতিভূদের প্রতিধ্বনিতে। বেদ উপনিষদ গীতা চণ্ডী বাইবেল কোরআন্ কথামৃত—সেই জাতীয়। তা-ই কেবলমাত্র কালজয়ী। সর্বদাই আনকোরা, সর্বকালের মানুষ তার মধ্যে চিরদিনের জিনিষ খুঁজে পায়—চিরকালের প্রেরণা।

তা বাদে আর সব লেখাই কালক্ষয়ী, কালক্ষয় করার জন্য লেখা এবং পড়া। কালের সাথে সাথে ক্ষয় পাবার।

সত্যিকারের হচ্ছে এই কালস্রোত। নদীর জলধারার মতই চিরন্তন, নিত্য নূতন।

বহতা নদীর ধারে আমার কালজয়ী তাজমহল গড়ে তুললাম, অভ্রংলিহ সেই কীর্তিস্তম্ভ দাঁড়ালো বটে সগৌরবে, কিন্তু নদীর পথ পালটালো, নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও অন্য ধারা ধরলো সে, সঙ্গে সঙ্গে সেই জলপথে যাতায়াতকারী যাত্রীদলেরও মতিগতি পালটে গেল, ভাব-ভাবনা হয়ে গেল আরেক ধারায়। বহতা নদীর তীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুদূরপরাহত বহুকীর্তিত সেই কীর্তিমন্দির কারো কারো কাছে তখনো হয়ত পরিক্রমণীয় তীর্থ হলেও, নিজের দুর্বহতার বোঝা নিয়ে আর সবার কাছেই তখন তা যত্নসাপেক্ষ প্রত্ন-গবেষণার ; একদার মিউজমহল কৌতূহলী সকলের কাছে তখন মিউজিয়ম হল্ ছাড়া কিছু নয়।

আমার ধারণায়, আমাদের কারো কোনো লেখাই কখনই কালজয়ী হয় না। হতে পারে

না সব লেখকই ক্ষণকালজয়ী—যদি বা হয়। রূপের মতন সেই মুহূর্তের চোখ আর মন ভোলাতে পারলেই ঢের। তাহলেই সে সার্থক। পরমুহূর্তেই আবার নতুন রূপোদ্গমে নব বসন্তের নতুন মধুপদের আসর জমজমাট। পুরানো রূপসীর দিকে তাকাবার কারো ফুরসৎ কোথায় ?

আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি কখনই কালজয়ী হতে চাইনি, এমনকি বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাতেও নয়। সেই বৃথা চেষ্টার অক্লান্ত সাধনায় কালক্ষয় না করে সকলের জীবনের সকালটা, না, জয় করতে নয়, তার সঙ্গী হতেই চেয়েছিলাম আমি। ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় আমার লেখা পড়বে, একটু বেলা হলে, বড় হলেই অক্লেশে ভুলে যাবে আমায়। সেই একটুক্ষণ তাদের একটুখানি হাসি-হাসি করতে পারলেই আমার খুশি।

কিন্তু গোড়াতেই যেকথা বলেছি, ক্ষণজীবীই হোন আর দীর্ঘজীবীই হোন, খোদা কাউকে কখনো পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেন না,. স্বেচ্ছায় না সরলে সরিয়ে নেন—শেষ খোদকারি সেই তাঁরই।

পথচারীদের জন্যে সর্বদাই পথ সাফ রাখতে হয়, ট্রাফিক যেন জামতলায় না জমে।

এক জায়গায় এসে দাঁড়ি টানতেই হয়। আর সবার পক্ষে দেহরক্ষার পর হলেও লেখকের বেলায় তার ঢের আগেই। বলবার কথা ফুরিয়ে গেলেই তাঁর কথা বাড়ানোর কোনো মানে হয় না আর। আমার নিজের কথা যদি বলি, আমার কী বলার কথা ছিল আমি নিজেই জানি না। এতদিন ধরে কত কথাই বলেছি, বেশির ভাগই তার আজেবাজে আর হাসির কথাই, নিতান্তই টাকার জন্য, বাঁচার তাগাদায় লেখা—কিন্তু আর না। কিছু বলতে পেরে থাকি বা না থাকি, কিছু বলতে পারি আর নাই পারি—এই লেখাটার পরেই আমার দাঁড়ি! এইটাই আমার শেষ লেখা আমি আশা করি।

এর পরেও যদি প্রাণে প্রাণে থাকি, প্রাণের দায়ে যদি ফের আমায় কলম ধরতে বাধ্য করে, এই দাঁড়ির পরেও কথা বাড়িয়ে আবার আমায় Comma-য় আসতে হয়, তবে সেই সব বাক্য অবশ্যই আমার মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করবে, আমি জানি, সে হবে আমার আপন স্বাক্ষরে নিজের ডেথ সেনটেন্স।

রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে জন্মাইনি ঠিকই ; আর, যদি জন্মাতুমও, তাহলেও ঝিনুকের থেকে মুক্ত হতে আমার দেরি হত না। অল্প বয়সেই আমি বুঝেছিলুম মুখ মোটেই ঝিনুকের জন্যে নয় ; আর রূপো না, মুখের সম্মুখে যদি কিছু রাখতেই হয় তো সে হচ্ছে রূপ। ঝিনুকের থেকে মুক্তি পাবার পরেই সে মুক্ত!

সেই নব নব রূপে অপরূপ মুক্তি।

আর এই রূপই হল আমার অভিশাপ। এই রূপের জন্যেই জীবনে আমার কিছু হল না এবং যা কিছু হল তা হয়ত ওর জন্যেই হল। এই অনির্বচনীয়ের স্বাদ বাল্যকালেই আমি পেয়েছিলাম আর তার টানে সেই অতি কৈশোরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ির থেকে স্বাধীনতার সাধে শুধু কেবল বহুবিচিত্র রূপের আস্বাদে।

মুক্তির রূপ আর রূপের মুক্তি এক হয়ে মিশে গেছে আমার জীবনে।

এই কারণেই আয়াসসাধ্য কোনো সাধনা আমার দ্বারা হল না, সাধনালব্ধ কোনো সিদ্ধি নয়। এমন কি, লিখে লিখে জীবনটা কাটলেও লেখকের মত লেখক আমি হতে পারলাম না

ানোদিনই। লেখক হতে হলে যে উদয়াস্ত পরিশ্রম বা নিদারুণ পড়াশোনা বা যে দুর্নিবার
খ ভোগ করতে হয় তা আমার কুষ্ঠিতে কই ?

লেখক হতে চাইওনি বোধ হয় আমি। লিখতে ভালও লাগে না আমার। প্রেরণার বশে নয়, াণের দায়েই, আর কিছু না হতে পেরেই অগত্যা আমার এই লেখক হওয়া—সাংবাদিক তে গিয়েই লেখক। ঘরকুনো হয়ে ঘাড় গুঁজে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে লেখক ব্ার কোনোদিনই আমার সাধ ছিল না, পাঠক হতেই চেয়েছিলাম বরং। বিধাতা সে র্ণপরিচয়ের কেতাব আমাদের চোখের সামনে চারিধারে মেলে রেখেছেন সর্বদাই, যার াত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে মুক্তোর ছাঁদে সোনার আখরে আপন স্বাক্ষরে তাঁর অপরূপ কাহিনী লখা, নতুন নতুন হরফে নব নব মুদ্রণে মুহূর্তে মুহূর্তেই যে—বইয়ের নিত্য নবীন সংস্করণ, সই-বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের পড়াই আমার শেষ হয়ে উঠল না জীবনে। লিখিয়ে হব কি, াড়ুয়া হয়েই থাকতে হল আমায় চিরটা কাল। কিন্তু সেই ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করতে ারলুম কি ?

যে তিনটি কথা মাথায় করে আমার এই আত্মকাহিনীর শুরু, সে-তিনটির সঙ্গেই, যাকে লে কনফ্রন্টেশন, সেই বাল্যকালেই আমার হয়েছিল।

সত্যি বলতে, সে সময়টা ছিল কেমন ঈশ্বরপীড়িত। আমাদের বাড়িতে বাবা ছিলেন ারম বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত ; মা ছিলেন শাক্ত, শক্তির উপাসিকা ; আর আমার মামা ছিলেন াম-সাধক, হরিগুণ গানে বিভোর।

বাবাকে আমার মনে হত মহাদেবের মতন। শিবের মতই ছিল তাঁর চেহারা আর ধরনধারণ। ক্তোভ গৌরবর্ণ চেহারা, সদাপ্রসন্ন, প্রশান্ত, আত্মনিমগ্ন। সংসার-উদাসীন আত্মভোলা। াহ্মমুহূর্তে ঘুম ভাঙত তাঁর। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি গোটা গীতাটা আওড়াতেন। তাঁর ুখে শুনে শুনেই গীতা আর উপনিষদের আদ্ধেক শ্লোক আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছল— ানে তার বুঝি আর নাই বুঝি। সেই পুঁজিই আমার সারা জীবন ভাঙিয়ে খাওয়া।

মা'র কাছে প্রায়ই আসত লাল চেলীপরা ত্রিশূলধরা ভৈরবীরা—তিব্বতের কোন মঠ না কামিখ্যে থেকে কে জানে ! মা'র সঙ্গে নিভৃতে আলাপ হত তাঁদের। দিনকতক থেকে ফের কাথায় তাঁরা চলে যেতেন যেন।

এক ভৈরবী আমায় ভালোবাসতেন ভারী। পেড়া-টেড়া খেতে দিতেন তাঁর ঝোলার থেকে। দবী কামাখ্যার মহাপ্রসাদ। তিনি একবার আমায় বলেছিলেন—তোমার মাকে সামান্য মনে কারো না বাবা। জগন্মাতার অংশ আছে তাঁর মধ্যে। মাকে কখনো অমান্য কোরো না।

মাকে আমি ভালোবাসি তো।

মা সাক্ষাৎ ভগবতী। মা-ও যা—মা দুর্গাও তাই। তিনি বলতেন।

জানি আমি। জবাবে আমি বলতাম—সবার মা-ই তো তাই। মা দুর্গাই। তাই না ?

শুনে শুনেই এসব কথা জানা। আমিও শুনিয়ে দিতে ছাড়তাম না।

তাই বটে। তবে তোমার মা আরও বিশেষ।

কিন্তু কী যে সেই বিশেষ তা তিনিও কোনো দিন খুলে বলেননি, আমিও তা জানতে নি কখনো। মা'র সেই বিশেষত্ব সারা জীবন ধরে আমায় জানতে হয়েছে। জীবন ভরে জেনেছি। আর, পৃথিবীর সঙ্গে আমার মুখোমুখি হয়েছিল সেই বয়সেই। মাথার মধ্যে কী

পোকা ছিল কে জানে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোতো, আর মাঝে মাঝেই আমি বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়তাম বিবাগী হয়ে। পকেটে একটিও পয়সা না নিয়ে (পাব কোথায় পয়সা ?) বিনাটিকিটে রেল গাড়ির লম্বা লম্বা পাড়ি জমাতাম-চলে যেতাম বৈদ্যনাথধাম। দেওঘরের দেবতা কি প্যাড়া কিসের টানে তা আমি বলতে পারি না।

চলে এসেছি কলকাতায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, খবরকাগজ ফিরি করেছি, জেল খেটেছি মাঝে মধ্যে, ফুটপাথে পার্কে শুয়ে রাত কেটেছে। কষ্টের মধ্যেও কতো সুখ। স্বাধীনতার স্বাদ।

আর, ভালবাসা ? তার পরিচয় কাউকে গোধ হয় চেষ্টা করে পেতে হয় না, সে নিজেই আগ বাড়িয়ে জানান দিয়ে থাকে। ওই একটি বস্তু, যা কারোর দ্বারা কিছুতেই লভ্য নয়, (পাওয়াও যায় না বোধ হয়) নিজগুণে আপনার থেকে অযাচিত এসে ধরা দেয়।

চলার পথের মোড়ে মোড়েই তার দেখা মেলে। দেখতে না দেখতেই বেঁচে উঠি, বেঁচে বেঁচে যাই। নতুন করে বাঁচি, নতুনতরো আঁচ পাই জীবনের। কি করে যে একজনকে আরেকজনের এমন ভালো লেগে যায়, আর কী আশ্চর্য, তাকেও ভালো লাগানো যায় তেমনি আবার—কতো সহজেই না! আমার কাছে সে এক পরম বিস্ময়—পরামাশ্চর্য রহস্য।

ঈশ্বর, পৃথিবী আর ভালোবাসা—প্রত্যেকের জীবনেই ওতপ্রোত। কেউ বঞ্চিত নয় প্রত্যেককেই টের পেতে হয় কখনো না কখনো, না টের পেয়ে উপায় নেই, যিনি এই নাটের গুরু তিনিই টের পাওয়ান।

আর, বাল্যকালেই এসবের টের পেয়ে যাওয়া এক রকমের ভালোই বোধ করি। কেননা, ব্যাধি হিসেবে এই তিনটিই মারাত্মক-এই ঈশ্বর, পৃথিবী আর ভালোবাসা। তেমন করে ধরতে পারলে এ বস্তু কাউকে ছাড়ে না, রেহাই দেয় না সহজে, আজীবন ভোগায়, আপাদমস্তক গ্রাস করে বসে। সংসার, সারাৎসার আর...আর ভালোবাসার কী আখ্যা দেব ? অন্তঃসার ? নেহাৎ অন্তঃস্রাব ছাড়া কী আর ও ? এর একটিই যদি কাউকে ধরে তো তার হয়ে গেল জীবনের মতন ছাড়ান নেই। ঘোর সংসারী, ঘোরালো প্রেমিক কিংবা ঘোরতর ঈশ্বরসাধক হয়ে গেল সে। হতেই হবে। পরিত্রাণ নেই আর।

তাই কৈশোরেই কারো যদি এসবের টিকা নেয়া হয়ে যায়-খানিক খানিক স্বাদ পায় সে—তো জন্মের মতই বেঁচে গেল বেচারা!

সটীক হয়ে থাকলে সঠিকভাবে বাঁচা যায় জীবনভোর। বাল্যে বসন্তের টিকা নিয়ে রাখলে তা যেমন কখনো প্রাণান্তকর হয়ে দেখা দিতে পারে না, দিলেও হামের মতই হামেশার সামান্য ব্যাপার হয় মাত্র, তেমনি প্রাথমিক এই ত্রিবিধ টিকায়—এই ট্রিপ্‌ল অ্যান্টিজেন নেয়া থাকলে সারা জীবন ধরে পৃথিবী, ঈশ্বর আর ভালোবাসার পার্থিব আর অপার্থিব সেই বসন্তকালকে অল্পে অল্পে একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে চেখে চেখে যাওয়া যায়—খাওয়া যায়।

তাকেই খাই, তাঁর খাদ্য হতে হয় না।

পরাৎপর হলেও সেই মহাকাল যেন পরাস্ত হয়ে থাকে।

বিবেকানন্দের ভাষায় অমৃত ভাণ্ডের কিনারে বসে তার কিনারা করা। তার ভেতরে ডুব দিয়ে মজে ভূত হয়ে যাওয়া নয়, তাকে কিনারায় রেখে বহালতবিয়তে থেকে দেখেশুনে চেখে যাওয়া।

ভবানীর ভাঁড়ে হারিয়ে না গিয়ে, মিলেমিশে তাঁর সাথে একাকারে নিজেও ভাঁড়ে ভবানী

না হয়ে, নিজের ভাঁড়কেও ভবানী না বানিয়ে ভবানীর ভাঁড়ার লুঠ করা আর কি!

একদিন বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি মা আমার বিরাট দরদালানে কেমন যেন অভিভূতের মতন দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখে বললেন, জানিস কে এসেছিল আজ?

কে?

মা এসেছিলেন!

দিদিমা? তাই নাকি? কই কই? কোথায় দিদিমা? আমি লাফিয়ে উঠেছি।

না, তোর দিদিমা নয়। তোরও মা। তোর মা, আমার মা, সবার মা। তিনিই একটু আগে এসেছিলেন।

শুনে আমি হতবাক্ হই। বুঝতে পারি না ঠিক।

মা কালী আমায় দর্শন দিয়ে গেলেন একটু আগে। এই সামনে, ওইখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন—যেখানে তুই দাঁড়িয়েছিস। ওই জবাফুলটা দিয়ে গেলেন আমায়। আমার হাতে তুলে দিতে এসেছিলেন। ভয়ে আমি হাতবাড়িয়ে নিতে পারিনি। হতচ্ছাড়ী আমি!

সামনেই একটা জবাফুল পড়েছিল আমি দেখলাম। দেখেশুনে আমি শিউরে উঠেছি কেমন।

কাছেই একটা গোরু বসে জাবর কাটছিল, কিন্তু জাবর কাটা সে ভুলে গেছে কখন। রোমাঞ্চিত হচ্ছে তখনো। মনে হয় সেও বুঝি মা কালীকে দেখেছে।

আর, সত্যি বলতে, দিব্যদর্শনের গোরুত্ব তখনই আমার মালুম হয়েছিল। সেই দণ্ডেই।

॥ দুই ॥

আত্মস্মৃতির পরিক্রমায় এগুবার আগে নিজের কুল পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন আছে বোধ করি! কিন্তু ছোটবেলাতেই যে নিরুদ্দেশের অকূলে ভেসেছিল আজ এত ঘাট পেরিয়ে, অবশেষের বালুবেলায় এসে জীবনের শেষ তীর্থ আত্মবিস্মৃতির উপকূলে পৌঁছে নিজের কুলকুণ্ডলিনীকে জাগানো সম্ভব নয় বোধ হয়।

মহাকালের মোহনায় দাঁড়িয়ে গত কালের মোহ্ না রাখাই তো ভালো। যখন সামনে চোখ রেখে কিছুই দেখা যায় না তখন পিছনে তাকিয়ে থেকে লাভ? মহাসাগরের অতলে ডুবে যাবার আগে নিজের মনে ডুব দেওয়াই তো বেশ। কিন্তু...

দিন কতক আগে এক ভদ্রলোক এসে এমন বেকায়দায় ফেললেন আমায়! 'অমুক পত্রের পক্ষ থেকে আমি আসছি।' তিনি জানালেন, 'আমাদের পত্রিকায় আমরা আপনার জীবনকথা ছাপতে চাই...।'

শুনেই না আমি চমকে গেছি। আমার প্রতি কোনো পত্রিকার এহেন পক্ষপাতের হেতু খুঁজে পাই না—'আমার জীবনের কথা আসছে কোথা থেকে? আমি জন্মালাম কবে যে আমার...' বাধা দিয়ে বলতে যাই।

'আমরা অমুক অমুক অমুক সাহিত্যিকের' আত্মপরিচয় ছেপেচি, সেই পর্যায়ে আপনারটাও প্রকাশ করতে চাই আমরা।'

'তাদের পর্যায়ে আমি পড়ি না।' সবিনয়ে জানাই 'তাঁরা যথারীতি জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন, বাড়ছেন, আরো বাড়বেন—তাঁরা জীবন্ত। তাঁদের পূর্বসূরী উত্তরসুরী দুই-ই আছে।

তাঁদের জীবনী অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু আমার কথা আলাদা।'

'আলাদা কেন ?'

'কারণ এই যে, আমি নিজেকে সাহিত্যিক বলেই মনে করি না। সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা আমি সৃষ্টি করতে পারিনি। গাইতে না পারলেও অনেকের গান বোঝার ক্ষমতা থাকে,আমারও অনেকটা সেইরকম। স্বয়ং সাহিত্যিক না হয়েও আমি সাহিত্য বোঝার সামান্য একটু ক্ষমতা রাখি।'

'সাহিত্য বলতে আপনি কি বোঝেন ? জানতে পারি কি ?'

'যা সর্বকালের সর্বজনের সহিত যায়, যেতে পারে। সহযাত্রার শক্তি রাখে। সর্বজনের সর্বক্ষণের সম্পূর্ণ মনের সঙ্গমক্ষেত্র, আমার মতে, তাই সাহিত্য। সে রকম লিখতে পারে ক'জনা ? আমি তো পারি না। আমি তা পারি না। তাই আমি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর থেকে আলাদা।'

'সাহিত্যিক নন কী আপনি ?'

'সাহিত্যিকরা সবাই মহৎ স্রষ্টা, স্বভাবতই প্রেরণার বশেই তাঁরা লেখেন। সামান্য লেখকমাত্র, কলমচালক কেবল, আমি লিখি নিতান্তই টাকার জন্যে। লিখে খাই আর নিজের খাই মেটাবার জন্যেই লিখি। প্রেরণার আদায়ে নয়, প্রাণের দায়ে আমার লেখা।'

'প্রাণের দায়ে লেখা ?'

'হ্যাঁ। লিখতে আমার একটুও ভালে লাগে না। যা কষ্ট হয় কী বলব ! না লিখতে হলে বেঁচে যাই। লিখতে মেহনৎ,বহুৎ পরিশ্রমের ফল সেই লেখার গা থেকে ঘাম মুছতে মেহনৎ আবার। আদৌ সাহিত্যিক নই। আমি মেহনতি জনতার একজন। মজদুরের সগোত্র।'

'সব লেখকই লিখে টাকা পান, তা বলে টাকার জন্য লেখেন এমন কথা বলা যায় কি?' তিনি বলেন।

'গায়ে জোর নেই বলে রিকশা টানতে পারি না তার বদলে এই কলম টানি। কলমের ওপর টান আমার এইটুকুই।' আমি জানাই। -'সাহিত্যের সঙ্গে আমার সংযোগ ততখানিই।'

'তাহলেও আপনি লেখক তো নিশ্চয়ই। অনেক লিখেছেন, শখের খাতিরে না লিখলেও নেহাৎ মজুরির জন্যেই আপনার এত লেখা এ কথা ঠিক মানা যায় না।'

'লেখা আমার পেশা হলেও পিষ্ট হয়েই আমার লেখা। বেশ, মজদুর বলতে না চান মুটে বলতে পারেন আমায়। মোট ফেলেই আমার খাওয়া: মোটামুটি লিখে মোটের উপর কিছু পেয়ে যাওয়া।'

'যাই বলুন, এদেশের মাপকাঠিতে আপনাকে সাহিত্যিকের মধ্যেই গণ্য করা যায়...'

'আমি গণ্য করি না। সাংবাদিক বলতে পারেন ইচ্ছে করলে। আসলে আমি হচ্ছি ছোটদের লেখক—ছোট লেখক।'

'বড়দের লেখা দিয়েই আপনি শুরু করেছেন বলে শোনা যায় ...'

'সেসব লেখা দেখা যায় না আর। কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে ! আমারও সেই দশা হতো, কোথায় চলে যেতাম অ্যাদ্দিন, ভাগ্যিস সেই ছেলেবেলাকার ছড়াটা মনে পড়ে গেল 'বড়ো যদি হতে চাও ছোট হও তবে'—তাই আমি ছোট-র হয়ে গেলুম ছোট লেখক, ছোটদের লেখক হয়ে গেলুম—রয়ে গেলুম শেষ পর্যন্ত।'

'বড় হলেন তো শেষ পর্যন্ত।'

'আমি হইনি ঠিক। আমার পাঠকরা হয়েছে। বেড়ে উঠে তারা দিক্‌পাল হয়েছে একেকটা।

তারা আমায় টেনে তুলতে চেয়েছে বলে আজ আমার এই বাড়বাড়ন্ত।'

'এরকম তো হয় না বড় একটা। বড় হয়ে ছোটবেলার লেখকদের ভুলেই যায় ছেলেরা।'

'কারণ আছে তার। আমার লেখায় ছোটদের কখনই আমি ছোট বলে ধরিনি, অবোধ শিশু বলে গণ্য করিনি কখনো। আমার সমকক্ষ বলেই ধরেছি তাদের। বয়স্ক বন্ধুর মতন বিবেচনা করেছি। বড় হবার উপদেশ নয়, বড়ত্বের স্বাদ পেয়েছে তারা আমার লেখায়। সেই আস্বাদ তাদের মনে লেগে রয়েছে এখনো। সেই কারণেই হয়ত এটা হবে।'

'আপনি ছোটদের একজন প্রিয় লেখক আমি জানি। আপনার শিশুসাহিত্য ছোটরা খুব ভালবাসে।'

'সে আমি শিশু সাহিত্য করি না বলেই। 'করি না'না বলে পারি না বলাটাই ঠিক। সত্যিকার শিশুসাহিত্য করেছেন দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদাচরণ, সুখলতা রাও, সুকুমার রায় প্রভৃতিরাই—শিশুদের জন্যই লিখেছেন—শিশুদের মত করেই লেখা। সে কলম আমি পাব কোথায়! এ যুগে সে লেখনী আর সেই লেখা হারিয়ে গেছে বলেই আমার মনে হয়। কারো কারো হাতে সে ধরনের লেখা এখনও খেলা করে বটে, কিন্তু সে অতি বিরল।'

'একালের সেই বিরল দৃষ্টান্ত কারা?' তিনি জানতে চান।

'মোহনলাল, সুকুমার দে সরকার, সতীকান্ত গুহর নাম করা যায়। এর পরের ধাপে মানে কিশোর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়েন, হেমেনদা, প্রেমেন, নারাণ গাঙ্গুলী। লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, ধীরেন ধরকেও ধরা যায়...'

'আর আপনি?'

'আমি এঁদের ধারেকাছেও নিজেকে ধরাতে পারি না। আমার ছোটদের লেখায় কিছু পোলা থাকে আর কিছু পান্ থাকে—এছাড়া কী আছে আর? পোলাপানদের জন্যে লেখা আমার শিশুসাহিত্য পড়ে তাই কি আপনার ধারণা হয়নি? আমার লেখায় বেশ ভেজাল আছে, সেই অ্যাডালটারেটেড লেখা ছেলেমেয়েদের অ্যাডাল্ট বানিয়ে ছাড়ে। আর সেই জন্যেই হয়ত তারা তা ভালোবাসে। কোনো হিতোপদেশ নেই আমার লেখায়, আদর্শ স্থাপনের বালাই নেই কোনো, কোনো বাণী দিইনে আমি—সেই জন্যেই হয়ত শোনার যোগ্য মনে করে তারা। বলুন, বাণী দেবার আমার কী আছে, সোনাই আসলে নেই যেখানে। খাঁটি সোনার নয়, পরিপাটি গিল্টির—সেই কারণেই আমার রচনায় এত ঝুটো অলঙ্কার, এমন পানঝাল, বুঝেছেন? পান্‌মরা বাদ দিলে আমার লেখায় কী থাকে, আর এই কারণেই একটা গিল্টি বোধ সর্বদাই আমার মনে।'

ভদ্রলোক চুপ। আমার নিজের প্রতি নিজেরই দাক্ষিণ্যের অভাব দেখে বুঝি তিনি নিরুত্তর হয়ে গেছেন।

'আমার নিজের কী মনে হয় জানেন? শিশুসাহিত্যের সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। শিশুই নেই তো শিশুসাহিত্য। শিশু কোথায় এখন? শিশুরা আর জন্মায় না, জন্মালেও বেঁচে থাকে না বেশিদিন, মানে, ঐ শৈশব অবস্থাটা অতি ক্ষণস্থায়ী এখন। সময় গতিকে শিশুরা সব বয়স্ক হয়েই জন্ম নিচ্ছে, দেখতে না দেখতে বুড়িয়ে যাচ্ছে—দেহের দিকে নয়, মনের দিক থেকে। এখনকার ছেলেমেয়েদের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প দিয়ে ভোলানো যায় না, পক্ষিরাজ ঘোড়া আর তালপত্রের খাড়ায় তারা ভোলে না, চন্দ্রাভিযানের এই যুগে চাঁদের চরকা কাটার বুড়ির সুতোর মায়ায় জড়ানো যায় না তাদের। কল্পলোকের গল্পকথা এখন অচল। শিশুসাহিত্যের

সেই সত্যযুগ গেছে, এখন তার এই ঘোর কলিতে তাই আমার এই গাঁজার কল্কি।'

'না না, কী বলছেন।' আমার তরফে তাঁর ওকালতি—গাঁজা নয়।

'গাঁজা কি না আমি জানি না। গাঁজানোই। তবে কী জানেন? লেখা মাত্রই নেশা ধরায়—গাঁজা হোক বা না হোক। নেশা না ধরলে—না ধরাতে পারলে পেশা চলে না। এটা সব শিল্পেরই কুলকথা, মূলকাহিনী। তবে আসল কথাটা এই, ছেলেমেয়েদের আমি ভোলাতে চাইনি, ঠকাতে চাইনি, সজাগ করে দিতে চেয়েছি তাদের চোখ কান মন ফুটিয়ে দিয়ে...আজকের পৃথিবীর, এখনকার জীবনের একেবারে মুখোমুখি করে দিতে চেয়েছি।'

'সেই কথা বলুন।'

'এখনকার ছেলেমেয়েরা যেন তেল সলতে নিয়ে তৈরি হয়েই জন্মেছে, প্রদীপের মতই উন্মুখ। দেশলাই কাঠি ঘষে দিলেই প্রদীপ্ত। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ। শৈশবের থেকে এক লাফেই এক ধাপেই যৌবনে। সত্যি বলতে, সব শিশুর মধ্যেই সম্পূর্ণ মানুষটি রয়েছে পরিণত হবার প্রত্যাশায়—পুরোপুরি জেগে উঠতে চায় সে। সোনার কাঠি ছোঁয়ালেই হলো। তাহলেই চোখে কানে মনে সে সজাগ। বালক-বালিকার ছদ্মবেশে বিশ্বজয়ীর দল। সাহিত্যের কাজ হলো তাদের এই জাগিয়ে দেওয়া। এবং শিশুসাহিত্যই বলুন আর কিশোর সাহিত্যই বলুন, সর্বাগ্রে তাকে সাহিত্যই হতে হবে।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' তিনি মেনে নেন আমার কথাটা।

'দুধের বদলে পিটুলি গোলায় ভোলালে তাদের চলবে না। সেকালে যেমন সদ্যকিশোরকে ব্রহ্মবোধের দীক্ষা দিয়ে ঈশ্বর সাক্ষাতে নিয়ে যাওয়া হত, একালে তেমনি জীবনবোধের শিক্ষা দিয়ে তাকে বিশ্বের সাক্ষাতে নিয়ে যাওয়া—সে যুগের উপনয়নের মতই এই উপনয়ন—দুনিয়ার দরবারে তাকে পৌঁছে দেওয়া। এই জন্মের মধ্যেই আরেক জন্ম লাভ, শুধু দ্বিজত্ব মাত্র নয়, আরো আরো অনেক জন্ম লাভের বোধ সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা লাভ করি। সাহিত্যই আমাদের তৃতীয় নয়ন তার সাহায্যেই আমরা নিজেকে অপরকে জগতকে যথার্থরূপে দেখতে পাই। সাহিত্যই সেই দৃষ্টি-প্রদীপ। সাহিত্যিকের দায়িত্বও তাই এই মনের চোখ খুলে দেওয়া। হৃদয়কে জাগানো।'

'সে কথা মানি।'

'আমিও সেই দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছি—আমার সাধ্যমত। কতটা পেরেছি জানিনে, কিন্তু ছোটবেলাতেই যাতে তারা নিজেদের পরিবেশ—সমাজ সংসার মানুষের ধরণধারণ সম্বন্ধে সচেতন হয়, জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে, প্রয়াস পেয়েছি তার। জীবন আর জগতের সব কিছুই তাদের জানাতে চেয়েছি—যদিও একটু তির্যকভাবে আড় চোখে দেখলে দেখা যায় আরো। সোজাসুজি না বলেও বোঝাবুঝির কোনো অসুবিধা হয় না—বুঝলেন? এমনিতেই ছোটরা আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, বেশি বুঝদার।'

'এটা কী বললেন?'

'ঠিকই বলেছি। ছোটবেলায় বোধশক্তি স্বভাবতই তীব্র থাকে। অনুভবের দ্বারা তারা বোধ করে—কেমন করে যেন বুঝতে পারে সব। ছেলেবেলায় সকলেই খুব চালাক চতুর চৌকস থাকে, তারপরে যতই বড় হয়, হতে থাকে, চারধারের ধাক্কা খেয়েই হয়ত বা, ততই আরো ভোঁতা হয়ে বোদা মেরে যায় কেমন! নিতান্ত বোকা কিংবা অতিবুদ্ধি হয়ে, বুদ্ধিজীবী বনে বুদ্ধু হয়ে যায় বোধ হয়।'

'হ্যাঁ, ছোটরা যে বড়দের চেয়ে চালাক চৌকস সেটা লক্ষ্য করেছি—'

'আর আমার গল্প পড়ে হয়ত তারা আরো একটু চোখা হয়। আমার লেখার পয়েন্টও সেইখানেই.. .যাক্ এ কথা, আপনি কী বলছিলেন ?'

'আমি এসব কথা আলোচনার জন্য আসিনি। আপনার জীবনকথা জানার জন্যই এসেছিলাম, কিন্তু আপনি ধান ভানতে...'

কথাটা যেন তিনি উলটো বললেন মনে হলো। ধান ভানতে শিবের গীত নয়, শিবের গাজন শুনতে এসে ঢেঁকির বাদ্যি শুনতে বাধ্য হয়েছেন ! ঢেঁকির ঢক্কা নয়, শিবের গীত শুনতেই তিনি উদ্‌গ্রীব।

'আমার জীবনকথা আবার কী ! সবার জীবনও যা আমারও তাই,' আমি জানাই। —'এমন কিছু ভিন্নতর নয়, সবার মতই। কোথাও হয়ত বা একটু ইতরবিশেষ, কোথাও একটু বিশেষভাবে ইতর। এই যা।'

'তা কি কখনও হয় নাকি ?'

'যেখানে আর সবার থেকে আমি আলাদা তা আমার আর্টে। এই আর্টই লেখক শিল্পীর শিল্পসত্তা। তার বেঁচে থাকা, পেশায় এবং নেশায়। এ ছাড়া তার কোনো অস্তিত্ব নেই। শিল্পীর এবং তার শিল্পের কোনো অতীত কথা নেই, ভবিষ্যৎ বার্তাও নেই কোনো। সমস্তটাই তার বর্তমান।'

'বর্তমান ?'

'সব সময়ই বর্তমান। সবার চোখের ওপর—সর্বদাই। মহাত্মা গান্ধীর জীবনই যেমন তাঁর বাণী, শিল্পাত্মা লেখকেরও তেমনি সে যা বানিয়েছে তাই তার জীবন। তার বাইরে কিছু নেই। সেই জীবনকাহিনীই তো জানালাম এতক্ষণ আপনাকে।'

॥ তিন ॥

'বিলক্ষণ !' নিশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক : 'আপনার আর্ট তো খালি কথার খেলায়।'

'বহির্লক্ষণ তাই বটে। কিন্তু এহ বাহ্য। বাহ্যদশার মতন অন্তর্দশাও থাকে, এমনকি ঐ শব্দদেরও।' আমি বললাম : 'কথার খেলাকে নিতান্ত খেলার কথা ভাববেন না। শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্মের রহস্য কী, আমি জানিনে, কিন্তু শব্দদের চিরদিনই আমার রহস্যময় মনে হয়। একেকটি word যেন একেকটি world। তার মন নিয়ে, মনন নিয়ে স্বতন্ত্র এক একটি শব্দ, প্রায় মন্ত্রের মতই, কেবল যে তার অর্থের সহিতই জড়িত তাই নয়, তার মধ্যে একাধিক অর্থ, বিচিত্র রস, আশ্চর্য দ্যোতনা, সব উহ্য থাকে।' আমি গুহ্য কথাটা প্রকাশ করতে যাই।

'এ আবার কোন শব্দতত্ত্ব আনছেন ?'

'নিজেই জানি না। এক স্বরে একাধিক ব্যঞ্জনা এক ব্যঞ্জনায়, একাধিক স্বর , ভাবলে অবাক হতে হয়। এক কথার পান্‌জনায় অর্থবহ একাধিক বাক্যের ব্যঞ্জনা। অবাক হয়ে ভাববার। শব্দরূপ, শব্দরস, আর শব্দতত্ত্ব—সব মিলিয়ে পরম রহস্য—আমি হয়ত চেয়েছিলাম তাই দিয়ে জগন্নাথের ভোগ বানাতে, জগন্নাথ মানেই জগজন। কিন্তু আমার অক্ষমতায় তা হয়ত হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহাৎ জগাখিচুড়ি।'

'আপনার ক্ষোভের কারণ নেই। জগজন না হোক, জগতের বালকজন আপনার সেই খিচুড়ি খেয়ে বেশ খুশি। জগত বলতে অবশ্যি আমাদের এই বাংলা দেশ।'

'সুবোধ বালক তারা—যা পায় তাই খায়, তাতেই খুশি। তাদের কথা ছেড়ে দিন।...

'আপনিও ও কথা ছাড়ুন। কথার কথা থাক্, কাজের কথায় আসা যাক। যে জন্যে এসেছিলাম—ভুলে গেলেন নাকি? আপনার জীবনকাহিনী ...'

'আমার জীবন আমার যত কাহিনীর মধ্যেই বিধৃত, বিবৃত। তার মধ্যেই তারা ধরা পড়েছে, ধরা রয়েছে। খুঁজে পেতে সমঝে নিতে হবে। আমার কাহিনীই আমার জীবন, আর জীবনই আমার যত কাহিনী।'

'তার মানে?'

'নিজের জীবন নিয়েই আমার যত গল্প লেখা, বুঝলেন কিনা, আমার জীবনটা অনেকটা গল্পের মতই। জীবন দেখে, জীবন থেকেই তো সাহিত্য ছেঁকে নিতে হয়। আমার জীবনে আমার নিজের জীবনটাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি কেবল, সীমিত ক্ষমতা নিয়ে তার বাইরে আর যেতে পারিনি, তাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই জীবনটাকেই দেখিয়েছি আমার রচনায়।'

'আপনি লিখেছেনও তো নেহাৎ কম না মশাই।'

'জীবনও তো বিপুল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, দিগ্বিদিকে বিস্তৃত। ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট। বেশির ভাগই ট্রাজেডি। তবে কিনা, একজনের দুঃখের কারণ অপরের উপভোগের বস্তু হতে পারে। আমার জীবনের বিয়োগ-যোগগুলি আমি তাই অপরের উপভোগ্য করে তুলেছি। নিজের দুঃখেই কাঁদছি, কতক্ষণেরই বা সে কান্না! তাই দিয়ে আবার অন্যকে কাঁদিয়ে কী লাভ?'

'তা বটে।'

'তবে কিনা, সর্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করতে সবার জীবন দেখে, সকলের জীবন থেকেই নিতে হবে। কিন্তু বলেছি তো, আমার ক্ষমতা অতি সীমিত, উৎসাহও পরিমিত। কুলী-কামিনের কাহিনী লিখতে হলে কয়লা-কুঠিতে কাটাও, বস্তির চরিত্র বানাতে পাঁকের মধ্যে মজো, গঙ্গার গল্প লিখতে গিয়ে জেলে হও, জেলেদের সঙ্গে মেশো গিয়ে, আর কয়েদখানার কাণ্ড জানতে হলে কষ্ট করে জেলে যাও। এবং জেলে গিয়ে কষ্ট করো। পাহাড়ে পরিবেশের পরিচয় দিতে বিস্তর চড়াই উতরাই পেরোও। কিন্তু পায়ের হাড় শক্ত নয় যে পাহাড় পার হই, তাই কোনো মহাপ্রস্থানের পথে না গিয়ে ঘরে বসে নিজেকে দেখে নিজের থেকেই আমার এই প্রবোধলাভ।'

'নিজেকে জানলে সবাইকে জানা যায় বলে যে।' তিনি বলেন—'তাই বা মন্দ কি?'

'হ্যাঁ, মন্দ কি! পহেলা, আত্মানং বিদ্ধি। প্রথমে নিজেকে বিদ্ধ করে তারপর আর সবাইকে বিদ্ধ করা। লক্ষ্যভেদ করা নিয়ে কথা। আমিও সেই কথাই বলি। সেই সঙ্গে এই কথাও বলি, আমার সাহিত্য সর্বজনীন, সর্বকালীন এমনকি সর্বাঙ্গীনও হয়নি। সত্যি বলতে, তা সাহিত্যই নয় হয়ত।'

'সাহিত্যই নয়। তাহলে কী তবে?'

'বলেছি তো জগাখিচুড়ি। তবে কিনা খিচুড়িও একেক সময়ে ভালো লাগে। বাদলার দিনে তাতেই মজে যায় সবাই। তাই যদি বা কখনো মানুষের পাতে পড়ে, ভোগে লাগে। তার জীবন যন্ত্রণার একটুখানি ভোলানোর জন্যেই আমার এই হাসির পরোয়ানা। দুঃখের পরোয়া না করার। তবে তাতেও কতটা সিদ্ধকাম হয়েছি তা জানিনে।'

'আপনার গল্পকথা থাক, সে তো আপনার বই পড়লেই জানা যায়। আমি এসেছি

আপনার কথা জানতে, আপনার নিজের মুখ থেকে। আপনার ঠিকুজি কুলজি নিতে।'

'আমার কোনো কুলের খবর আমি রাখিনে। ছোটবেলায় বাড়ির মায়া কাটিয়ে পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন, পিতৃকুলে বাবার নামটুকু জানি খালি, ঠাকুর্দার নাম জানিনে। মাতৃকুলে দাদামশায়ের নাম জানতাম, ভুলে গেছি এখন। বেণীমাধব চৌধুরী না কে। কোন্ না কোথাকার জমিদার ছিলেন, নেহাত জমিদার না হলেও কোনা বলে কোনো জায়গার ভারী জোতদার জাতীয় ছিলেন বোধ হয়, তাঁদের বংশের কে বেঁচে বর্তে আছেন জানা নেই। তিনকুলের পিতৃকুল মাতৃকুল মামাতৃকুল গেল, তারপর জামাতৃকুল। তাও আমার নাস্তি।'

'জামাতৃকুল ?'

'হ্যাঁ। তাও নেই। মেয়ে থাকলে তো জামাই। মেয়েই নেই, বিয়ে হয়নি বলে।'

'বিয়ে হয়নি কেন ?'

'পৈতে হয়নি বলে বোধহয়। সেকালে অসবর্ণ বিবাহ ছিল না। পৈতে নেই, অচেনা বামুনকে কে মেয়ে দেবে ? আর, বিয়ে যখন হয়নি আমার শ্রাদ্ধও হবে না আশা করি। ছেলে নেই, পিণ্ডি চটকাবে আর ছেরাদ্দ করবে কে ?'

'আপনি খালি কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন ! কোথায় গেলে আপনার কুলের খবর পেতে পারি তাই বাতলান।'

'কোথায় পাবেন! নিজের কুলকিনারা পাই এমন আমার ক্ষমতা নেই। কোথায় যাবেন?'

'আপনার বন্ধুকুলের কারো কাছে ?'

'বন্ধুকুল ! পৃথিবীতে বন্ধু বলে কেউ আছে আমি জানিনে। শুধু আমার নয়, কারো আছে কি না সন্দেহ ! বন্ধু পাওয়া যায় সেই ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজেই। প্রাণের বন্ধু। তারপর আর না।' 'আর না ? সারা জীবনে আর না ?'

'জীবন জুড়ে যারা থাকে তারা কেউ কারো বন্ধু নয়। তারা দু'রকমের। এনিমি আর নন্-এনিমি। নন্-এনিমিদেরই বন্ধু বলে ধরতে হয়।'

'আপনার বেলায় ?'

'আমার কেউ এনিমি নয়। এ পর্যন্ত পায়নি একটাও। কিন্তু তারা কেউ আমার কোনো খবর জানে না।'

'কেন, ভবানীবাবু তো অনেক খবর রাখেন আপনার। তাঁর লেখা অমৃতের 'কাছে বসে শোনা' সিরিজে আপনার কথা বেরিয়েছিল...'

'তাঁর মহিমা। আগাগোড়া মনগড়া। আমি তাঁকে কাছে বসে কখনো কিছু শোনাইনি। তাঁকে শোনাবার আমার কিছু নেই এই কথা তাঁকে জানাতে যেদিন তাঁর বাড়ি গেলাম, শুনলাম তিনি আগের দিনই তাঁর লেখাটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন কাগজে। যথাসময়ে আমি যেতে পারিনি তাই।'

'পড়েননি লেখাটা ?'

'পড়েছি। পড়ে আমি তাজ্জব ! বাল্মীকির যেমন রাম না হতেই রামায়ণ রচনা, তাঁরও তেমনি এই শিব্রামায়ণ কাণ্ড ! আপন মনের মাধুরি মিশায়ে সেই আশ্চর্য সৃষ্টি ! তিনি যে অসাধারণ কথাশিল্পী তার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছাড়া কিছু নয়।'

'বলেন কি !'

'আমার ভাঁড়ে ভবানী তা জানি, কিন্তু—ভবানীর ভাঁড়ে যে এতও আছে তা আমার জানা ছিল না। গল্প লেখায়, মহৎ জীবনী রচনায়, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমীক্ষা, সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর জুড়ি নেই, আর ভাঁড়ারও অফুরন্ত তা জানতাম, কিন্তু একটা নগণ্য ভাঁড়কে এমন প্রকাণ্ড করা—সত্যিই অদ্ভুত ! অবাক করা কাণ্ডই ! সামান্য ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দেখানোর মত বাহাদুরি আর হয় না।'

'প্রেমেনবাবুও তো 'আমার বন্ধু শিব্রাম' বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন কোন কাগজে, পড়েননি ? সেটাও কি বানানো ?'

'পড়েছি। কে একজন এনে পড়িয়েছিলেন লেখাটা। না, সেটা বানানো নয়। সত্যি ঘটনাই। প্রেমেনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনাই। এক সিনেমা হাউসেই সেটা হয়েছিল। অবশ্যি, তার আগে কল্লোল কার্যালয়ে তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু সেখানে কোনো কথা হয়নি—আলাপ হয়নি—আলাপ জমেছিল সেই সিনেমাতেই।'

'কোন্ সিনেমাতে ?'

'আমার ঠিক মনে নেই। এখনকার এলিট-এই হবে বোধকরি। স্মরণীয় হলেও কোনো কিছু আমার মনে থাকে না, ধরে রাখতে পারে না আমার মন। এমনিই আমার স্মরণশক্তি। কিন্তু আশ্চর্য স্মরণশক্তি ওর, সিনেমা হলের সামান্য খুঁটিনাটিটা পর্যন্ত সে মনে করে রেখেছে। তার সেই লেখাটাতেই দেখা গেল। না মশাই, তাতে আমার বিষয়ে কোনো অত্যুক্তি নেই। প্রায় সব ঠিক কথাই।'

'প্রায় ?'

'একেবারে ঠিক ঠিক এ দুনিয়ায় কিছুই হয় না, হতে পারে না। সবই যেন প্রায় প্রায় হয়ে যায়।'

'আবার অচিন্ত্যবাবুও আপনার কথা লিখেছেন তাঁর কল্লোলযুগে।'

'শুনেছি, কিন্তু পড়া হয়নি। সেটাও নিশ্চয় অচিন্তনীয় কিছু হবে। ওর মন তো কারো কোনো খুঁত দ্যাখে না, সবার ভালো দিকটাই দ্যাখে কেবল, ওর কলমও ঠিক ওর মতই, নিতান্ত সাধারণকে অসাধারণ করে দেখায়।'

'পড়ে দেখেননি ? আপনার কথা আপনি পড়ে দেখেননি।' তিনি একটু অবাক হন। —আশ্চর্য তো!'

'কী করে পড়ব ! পাইনি তো। কেনাও হয়নিকো, বেজায় দাম বইটার, কিনতে পারিনি তাই। পয়সা কই আমার।'

'অচিন্ত্যবাবু দেননি আপনাকে ?'

'দিয়েছিল, মানে, দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, ডি এম লাইব্রেরী থেকে নিয়ো। চাইতে গেলে গোপালবাবু বললেন, কী করবেন বই নিয়ে ? ফুটপাতে বেচে দেবেন তো ! নাম খারাপ হবে আমাদের। তার চেয়ে তার দামটাই না হয় দিয়ে দিই। এই নিন পাঁচ টাকা। ধরুন।'

'কী করলেন ?'

'ধরলাম। তক্ষণাৎ। সমঝদার লোক তো। এ বিষয়ে আমিও বুঝদার বেশ। ওই পাঁচ টাকায় ওঁরই দোকানের সামনে ফুটপাথ পেরিয়ে চাচার হোটেলে গিয়ে নিজেকে বাঁচালাম। কল্লোলযুগে শুনেছি আমার সম্বন্ধে বিস্তর ভালোমন্দ কথা ছিল, পড়া হল না। কিন্তু ভালোমন্দ

খাওয়া গেল খুব। ডি এম অচিন্ত্যর দৌলতে কাটলেট খাওয়া গেল মজা করে।...নিজের প্রশস্তি পাঠের চেয়ে সেটা আরও প্রশস্ত ব্যাপার নিশ্চয়।'

'কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়তে পারতেন তো বইটা ?'

'কৌতূহল হয়নি আদৌ। সত্যি বললে, কৌতূহল বস্তুটা আমার কম। কোনো বিষয়েই তেমনটা নেই, নিজের বিষয়ে তো আরো কম। কেননা, আমার কাছে আমার কিছুই বোধহয় অজানা নেই। নিজের বিষয়ে নিশ্চয় আমি অপরের চেয়ে একটু বেশি জানি।'

'তাহলেও এটা আমার কাছে কেমন যেন ঠেকছে।' তিনি বললেন : 'বইটা হাতে পেলে কি আর আপনি পড়ে দেখতেন না ?'

'ভদ্রলোক ধরেছিলেন ঠিকই। দামী বইটা নিয়ে বেচেই দিতাম আমি, ফুটপাথে ঠিক না হলেও। তবে বইটা আগাগোড়া পড়ার পরেই বেচতাম যদিও। কী করব বই নিয়ে ? আমার বাসায় বই রাখবার জায়গা কই ? একটাও আলমারি কি বুক-শেলফ আছে ? কোনো বই-ই আমার কাছে নেইকো, এমনকি নিজেরও একখানা নয়। চেয়ে দেখুন চারধারে।'

'তাই তো দেখছি। লেখকের ঘরে একখানা কারো বই নেই ? আশ্চর্য !'

'যেমন লেখক, তেমনি আমি পাঠক। যেমন লেখায় তেমনি পড়ায় আমার অনীহা। লেখাপড়ায় আমি সমান চৌখস।'

'কিন্তু আপনি যে বইটা নিয়ে বেচে দেবেন, গোপালবাবুর এটা ধারণা করা অন্যায়। উনি সেটা টের পেলেন কি করে ?'

'বারে ! উনি টের পাবেন না ? ওঁর কাছেই তো বেচেছি কত বই ! আমার কোনো বই বেরুলে তার কমপ্লিমেন্টারির পঁচিশ কপি তো ওঁর দোকানে গিয়েই বেচে আসতুম, একটু বেশি কমিশন দিয়ে নগদ মূল্যে। উনি কিনতেন আর উনি জানবেন না !'

'তাই নাকি ! নিজের নতুন বইও বাড়ি এনে দেখবার সাধ হতো না আপনার ?'

'সাধ্য হত না। পাড়ার ছেলেমেয়েরা কেড়েকুড়ে নিত রাস্তাতেই। ভাব ছিল তাদের সঙ্গে। তাছাড়া, বাসার লোকরাও পাবার আশা করত। দিলে আর তা ফিরে পাবার প্রত্যাশা ছিল না। বৃথা বাজে বরবাদ না করে তার চেয়ে নিজের আশ মেটানোটা কি ভাল না মশাই ?'

'নিজের আশ মেটানো ?'

'ভালো একটা প্রাতরাশ। টোস্ট মাখন ডিমের পোচ দিয়ে কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে। তারপর ধরুন, তেমনি পরিপাটি একখানা মধ্যাহ্ন আশ—কোনো পাইস হোটেলে নানারকমের মাছ মাংসে, সন্ধ্যায় আবার তেমন ধারার একটা সান্ধ্য আশ—দেলখোস কেবিনে চর্বিওলা মাটন চপ সহ। তারপর ? না, তারপর আর কোনো আশ নেই। তারপর একটানা সারা রাত্তির লাশের মতন লম্বা ঘুম একখানা।'

'এরকম করতেন কেন ? না, আপনার ঐ খাওয়া কি ঘুমের কথা বলছি না। এই বই বেচাটা...'

'ঠিক লেখকসুলভ নয়, এই তো ? কিন্তু আমিও তো সুলভ লেখক নই। খবর কাগজ বেচেই জীবিকার্জনের শুরু হয়েছিল বলেই হয়ত অভ্যেসটা এসে থাকবে। তারপর সেই সব কাগজে লেখা শুরু করেই আমার লেখক-জীবনের সূত্রপাত হল। আর সব লেখকের কেমন আয় হত জানি না, আমার প্রায় যায় দশাই ছিল। ভারী টানাটানির সময় গেছে সেটা। যেমন ছিল লেখার দর, তেমনি তার আদর। তিনশ লাইন লিখে তিন টাকা পেতাম তখন।'

'বলেন কি!'

এমন ছিল সেকালটা। এখন অবশ্য তিন লাইন লিখে তিনশ টাকা পাই। তবে তার কতটা আমার আর কতখানি খোদার কুদরৎ তা জানি না। একটা কথা বলব আপনাকে? কাউকে বলবেন না। প্রেমেন জানলে মনে ব্যথা পাবে, অবশ্যি এখনও যদি তার ব্যথা পাবার মতন মন থেকে থাকে।'

'বলুন।'

'প্রেমেনের প্রথম বই 'পুতুল ও প্রতিমা', বেরিয়েছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় থেকে। গল্পের বই। অতুলনীয় গল্প সব। অনেকদিনের পর তার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল সিগনেটের থেকে। তার একখানা কপি হাতে পেতে পাতা উল্টে দেখি, বইটা আমার নামেই উৎসর্গ করা। এ কী! আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে। তোমার প্রথম বইটা আমাকেই দিয়েছ দেখচি। গদ্‌গদ কণ্ঠে তাকে বললাম।'

'সে কি! তুমি জানতে না?' সে সুধালো।

'না এই দ্বিতীয় সংস্করণ বের হবার পর টের পেলাম।' আমি বলি—'দ্বিতীয় সংস্করণটাই দিয়েছ বুঝি আমায়? প্রথম সংস্করণটা কাকে দিয়েছিলে?'

'কেন তোমাকেই তো! তুমি জানতে না?' সে তো হতবাক্। 'বইয়ের প্রথম সংস্করণ একজনকে, দ্বিতীয় সংস্করণ আরেকজনকে—এরকম দেওয়া যায় নাকি!'... আশ্চর্য! বইটা বেরুবার দিনই তো দিয়েছিলাম তোমায়, তোমার বাসায় গিয়ে, মনে নেই?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে এখন। আমি বাসার থেকে বেরুচ্ছি আর তুমি এলে—পথেই তো দেখা হল, মনে আছে বেশ।'

'বইয়ের মলাটও উলটে দ্যাখনি নাকি!'

'উলটে দেখার কী ছিল? তোমার সব লেখাই তো মাসিকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই পড়া। একবার নয়, বারবার। সেই সব জানা গল্প আবার নতুন করে জানতে যাবার কী আছে—তাই কোন কৌতূহল হয়নি আমার।'

মনে পড়ল তখন। হাতে পেয়ে বইটার মলাট দেখেই খুশি হয়েছিলাম। মলাটের পাতা উলটে আরো বেশি খুশি হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি যে, সেটা আমার ললাট। প্রেমেনের বই তখন লোকের হাতে হাতে চলত, তাই মনে হয়েছিল এই দুর্যোগের দিনে এটাকেও হাতে হাতেই চালিয়ে দিই এই সুযোগে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এম সি সরকারে গিয়ে বেচে দিয়ে এসেছিলাম বইটা।

॥ চার ॥

জীবনজিজ্ঞাসু সেই চমকপ্রদ ভদ্রলোকটি কিছুদিন বাদে আবার এসে হাজির একদিন আচমকাই।

যতই সচকিত হই না, যথোচিত স্বাগত জানাতেই হয়—'আইয়ে জনাব। আসুন।'

'আপনার কূলকিনারা করে ফিরেছি এবার। ঠিকুজি কুলজী সব নিয়ে।' তিনি জানালেন—'এর জন্যে মশাই, খোঁজখবর করে আপনার দেশে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম শেষটায়।'

'আমার দেশ! কোথায় আমার দেশ?' চমকাতে হ'ল আমাকে।

'কেন, আপনার দেশ কোথায় আপনি জানেন না?'

'একটা মহাদেশ তো জানি, এই ভূভারত। তাছাড়া একটা খণ্ড দেশেরও বাসিন্দা আমি

বটে—এই চোরবাগানের।' আমি জানাই, 'তবে এটাকে কলাবাগানও বলা যায় আবার। সত্যি বলতে, উভয় দেশের মধ্যপ্রদেশে—চোর আর কলা—এই চাতুর্যকলার মাঝামাঝিই আমি রয়েছি। কলাচাতুর্যের নোম্যানস্-ল্যাণ্ডের সীমান্তে আমার আস্তানা।'

'আপনি উত্তরবঙ্গের নন ? জন্মেছিলেন কোথায় শুনি ?'

'উত্তরবঙ্গে নয়, কলকাতারই কোনো অলিগলিতে হবে বোধ হয়।' আমি বলি—'মা'র মুখে শুনেছিলাম দর্জিপাড়ায় জন্ম আমার—দাদামশায়ের বাড়িতেই। নয়ানচাঁদ দত্তের লেন না কোথায় যেন ছিল সেটা।'

'কত নম্বর বাড়িতে ?'

'ভুলে গেছি অ্যাদ্দিনে। কানে শোনা মাত্র, কোনোদিন নয়নে দেখিনি সেই গলিটাকে। দেখতে যাইনি, কৌতূহল হয়নি।' আমি নিশ্বাস ফেলি—'তা ছাড়া সে গলি কি আর রাস্তায় পড়ে আছে অ্যাদ্দিন ! কলকাতা এর ভেতর কতবার ভোল পালটালো। পথঘাটের নামঠিকানাও পালটে যাচ্ছে।'

'হতে পারে জন্ম আপনার দর্জিপাড়ায়, কিন্তু আসলে আপনি উত্তরবঙ্গের কোনো রাজবংশের সঙ্গে জড়িত—সম্ভ্রান্ত পরিবারের থেকে এসেছেন জেনে এসেছি আমি।'

'কী সর্বনাশ !' শুনে এবার চমকে গেছি সত্যিই ! —'রক্ষে করুন, প্রলিতারিয়েত, পাতিবুর্জোয়া যা খুশি বলুন, কিন্তু এভাবে আমাকে বংশ দেবেন, এমন কি, কোনো রাজবংশও নয়। ভ্রান্তভাবেও না দোহাই আপনার ! আমি রাজবংশীদের কেউ নই।'

'বললে কী হয় ! আপনার মাতামহকুলও প্রায় রাজবংশই ; ঠিক রাজগোত্রের না হলেও জমিদারগোষ্ঠীর তো বটে। তখনকার কালে ওই জমিদারদেরই রাজা বলত সবাই। কোনার না কোথাকার জমিদার ছিলেন নাকি তাঁরা।'

'পৃথিবীর কোন কোনায় কে জানে।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। 'বিশ্বাস করুন, আমার পিতৃকুলে মাতৃকুলে কোনো কুলেই রাজাগজা কেউ নেই কো। তবে হ্যাঁ, মাসতুতো কুলে, তাও আমার আপন মাসির নয়, দূর সম্পর্কের মাসতুতোই, আমার বাবার মাসির, মানে বাবার এক মাসতুতো ভাই একটা রাজাই ছিলেন বটে। খেতাবী রাজা। তবে তাঁর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। এক রোদে ধান শুকোবার সম্বন্ধেও না।'

'তাহলেও আপনাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন বলতে হবে।'

কি করে ভদ্রলোকের এই সম্ভ্রান্তি দূর করি, ভারি মুশকিলে পড়ি আমি। বংশের খোঁজে জীবনে জীবনে ঘুরে ঘুরে বাঁশবনে ডোমকানা হওয়ার মতই তাঁর এই দশা বুঝতে পারি। কার স্বকপোলকল্পিত কে জানে, একটা কানা বাঁশ নিয়ে এসে ধরে বেঁধে কষে লাগাতে শুরু করেছেন আমায়।

'দেখুন, আমার নিজের ধারণা ছিল আমি কলকাতার কোনো বস্তির থেকে আমদানি কিংবা ফুটপাথের কোনে কুড়িয়ে পাওয়া। কেন যে আমায় এভাবে অযাচিত অবাঞ্ছিত এই বংশ ধারণ করতে বলছেন তা জানিনে। আমি তো জানি, কলকাতার ফুটপাথে ঘুরে ঘুরেই আমি মানুষ। কেয়ার অব ফুটপাথই আমার ঠিকানা ছিল অনেক কাল। সেখান থেকেই উঠে এসেছি এই মেসের বাসায়। কিন্তু ফুটপাথ আমায় ছাড়েনি, চেয়ে দেখুন, আমার ঘরে যত রাজ্যের জঞ্জাল ! কলকাতার রাস্তার মতনই পুঞ্জীভূত। ফুটপাতের প্রতি আমার এই স্বাভাবিক আসক্তি, এটা কি আমার রক্তের টান নয় ?'

হতে পারে। সে খবরও একেবারে মিথ্যে নয় হয়ত। সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু তাহলেও সামাজিক সম্পর্কটাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না মশাই। আপনার বংশধারার বিবরণ শুনুন আমার কাছে—উত্তরবঙ্গে চাঁচোর নামে একটি সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, এখন উদ্বাস্তুদের সমাগমে সে গ্রাম প্রায় উপনগরের মতই, যাই হোক, সেই গ্রামে একদা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নামে এক নৃপতি বাস করতেন। তিনি সিদ্ধেশ্বরী এবং ভূতেশ্বরী এই দুই পত্নী রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় দেহরক্ষা করেন...'

'বটে বটে ? আপনি দেখছি বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প এনে ফাঁদলেন—বত্রিশ সিংহাসনের একখানা নিয়ে এসেছেন আমার কাছে।' বেতালের মত বললাম।

'উক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর দুই পত্নীকেই পরের পর দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার দিয়ে যান। রাণী সিদ্ধেশ্বরী প্রথমে সেই অধিকার খাটাবেন, তিনি ব্যর্থকাম হলে তারপর দ্বিতীয় রাণী। তাঁর সেই ইচ্ছে মতন রাণী সিদ্ধেশ্বরী দেশের থেকে নিজের বোনের ছেলেকে নিয়ে এসে দত্তকরূপে গ্রহন করেন বা করতে চান...বোনের নামটা কী ছিল কেউ বলতে পারল না।'

'ধরুন না, প্রেতেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরী ভূতেশ্বরী প্রেতেশ্বরী—এক সুরে না হলেও এক স্বরে মিলে যায় বেশ।'

'বিন্ধ্যেশ্বরী হবে যেন শুনেছিলাম। যাই হোক, এই বিন্ধ্যেশ্বরীর সন্তান স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী হলেন...'

'আমার বাবা। এ তো আমি জানতাম। বাবার নাম আমি জানতাম না ? এই জানতে আপনি অদ্দূর কষ্ট করে এত নাস্তানাবুদ হতে গেছলেন।'

'উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রেরও মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে...তাঁর স্বর্গত হবার পর...'

'স্বর্গে তো গেছেন। এখন ঈশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র বলুন তাহলে। কিংবা চন্দ্রবিন্দু ঈশ্বরচন্দ্রও বলতে পারেন।' আমি বাধা দিলাম।

'হ্যাঁ। ঈশ্বরচন্দ্রের মনের ইচ্ছা ছিল প্রথমা পত্নীর বোনের ছেলেকেই উত্তরাধিকারী করার...রাণী সিদ্ধেশ্বরী হয়ত তাঁকে দত্তক নিয়েও থাকতে পারেন...'

'না মশাই, না। নেননি।' আমি জোর গলায় বলি—'আমার বাবা কারো পোষ্যপুত্র হবার পাত্র ছিলেন না, তাঁর স্বভাব-চরিত্রের যদ্দূর আমার জানা আছে। শালীর প্রতি টান থাকা স্বাভাবিক, আমি মানি। এমন কি অপত্যস্নেহবশে তাঁর ছেলেকে রাজতক্তে বসিয়ে যাওয়ার বাসনা থাকাও শক্ত নয়, কিন্তু সেই ছেলেটির ধনশালী হওয়ার বাসনা ছিল না কোনদিনই। যতটা জানি তিনি রাজাগজা কিছু হননি, হতেও চাননি কখনো। কখনো না।'

'কেন হননি বা কেন হতে চাননি তার মূলে একটা রহস্য আছে। সে কথা পরে। এখন বলুন তো আপনার বাবা যে সন্ন্যাসী হয়ে গেছলেন এ খবর কি আপনার জানা ?'

'জানি বই কি। এমন কি তাঁর সন্ন্যাসী বেশে ধ্যানমগ্ন চেহারার একখানা ফটোও ছিল আমার কাছে। অনেকদিন অযত্ন করে রেখেওছিলাম—কি করে হারিয়ে গেছে কে জানে। নইলে দেখাতে পারতাম আপনাকে। জটাজুট সমন্বিত সেই চেহারা।'

'হারিয়ে গেছে, কি করে হারালো ?'

'কবে কেন কোথায়—কিছুই আমার মনে নেই। কেমন করে জানি না, সব কিছুই আমার হারিয়ে যায়। কিছুই কখনো ধরে রাখতে পারি না আমি।'

'তাঁর সন্ন্যাসী হয়ে হঠাৎ এভাবে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে বেরিয়ে যাবার কারণটা আপনি বলতে পারেন ?'

'জায়গাটার দোষ বোধ হয়।'

'জায়গার দোষ ?'

'হ্যাঁ, ঐ যে চাঁচোর বললেন না ? ওটার ইংরেজি নাম হল গে চঞ্চল—সেখানকার ডাকঘরের ছাপেও তাই পাবেন। 'CHANCHALI'। তাই মনে হয়, সেই চাঞ্চল্যের ডাকে আমাকে যেমন এক সময় বাড়ি ছাড়া করেছিল সেইরকম বাবাকেও বোধ হয়...'

'না মশাই, না। কোনো চঞ্চলতার জন্য নয়। চাঁচোরের খুব প্রাচীন এক ব্যক্তির কাছে জেনে এলাম, অন্য কারণ। তাঁরও কথাটা আবার আরও প্রাচীন আরেক ব্যক্তির মুখ থেকেই শোনা। আপনি শোনেননি হয়ত। যাই হোক, আপনার বাবার হঠাৎ এই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ার কারণটা কী হতে পারে আপনার ধারণা ?'

'চাঞ্চল্য তো হঠাৎই হয়ে থাকে—তার আবার কারণ কী। আমার কী মনে হয় জানেন ? জায়গার যদি না হয় তবে এটা সেই সময়টারই দোষ। সন্ন্যাসব্যাধি তখন কেবল ব্যক্তিগত বা বংশগতই ছিল না। সামাজিক মহামারির মতনই ছিল অনেকটা। তখন তো খাওয়া-পরার ধান্দা ছিল না কোনো, জীবনসংগ্রামই ছিল না বলতে গেলে। এখনকার মতন নয়, কারো কোনো ভাবনা চিন্তাই ছিল না সেকালে। আর নেই কাজ তো খই ভাজ। কোনো ভাবনা না থাকলেই যত ভাব এসে মাথায় এসে চাপে। বৈরাগ্যভাবটাও সেইরকম। ঈশ্বরচিন্তায় মানুষ পাগল হয়। ভগবানের খোঁজ খবর নিতে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে অকস্মাৎ। আমার বাবাও সেইরকম...'

'না মশাই, না। এর মধ্যে অন্য রহস্য আছে...'

'হ্যাঁ, রহস্য তো আছেই। জীবনটাই এক রহস্য। আমি তো আজীবনই সেই রহস্য দেখছি—বিন্দুমাত্রও তার ভেদ করতে পারিনি যদিও। চাঁচোর থেকে এই চোরবাগান অব্দি সেই রহস্যে ওতপ্রোত হয়ে আছি। দেখছেন না আপনি ?'

'কী রহস্যের কথা বলছেন ?'

'সেই রহস্য। দেখছেন না আপনি, চাঁচোর আর চোরবাগান দুয়ের মধ্যেই একটা রহস্য রয়ে গেছে ? লক্ষ্য করেননি ?'

'না তো। কী রহস্য ?'

'দুটি জায়গাতেই একই বিশেষণে একই বিশেষ্য—অভিন্ন রূপে এক বিশেষ ব্যক্তি বর্তমান ? দেখছেন না ?'

'উঁহু।'

'এত বড়ো চোর আপনার নজরে পড়ছে না ? আশ্চর্য !'

'চোর ?' সারা মুখটাই একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ওঠে ওঁর—'কোথায় চোর ?'

'চোরই বলুন আর গোলামই বলুন—আপনার সামনেই। এই নরাধম।' হাতের তাস ফেলি।

'কী বলছেন মশাই ?' তাঁর মুখের রেখায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ওপরে বিস্ময় চিহ্ন দেখা যায়।

'হ্যাঁ। চাঁচোরেও যে চোর, এই চোরবাগানেও সেই চোরই—সেই আমিই এই আমি। আমার চোরামি ঠাওর হচ্ছে না আপনার ?'

'আপনার অকারণ এহেন কবুলতির কারণ ?'

'কারণ আবার কি ! সত্যি কথা স্বীকার করাই কি ভালো নয় ? আর সত্যি বলতে, আমাদের এই দেশ, এই আর্যাবর্ত ব্রহ্মচর্যের পীঠস্থান। এটা তো মানেন ? ব্রহ্মসূত্র আর

কর্মসূত্র এক চৌর্যবৃত্তির দ্বারা এখানে বিধৃত। এর তুঙ্গ স্থানে সেই ব্রহ্ম, আর কর্মস্থলে কেবল চৌর্য—দুহাতে এই উভয়কে আঁকড়ে ধরে আমাদের জীবন। ব্রহ্মচৌর্য ছাড়া বাঁচা যায় না। বাঁচতে পারি না আমরা।'

'ব্রহ্মচৌর্য কী বলছেন ? ব্রহ্মচর্য বলুন।'

'একই কথা। বাগর্থ এক হলেও তার বাচ্যার্থ ভাবার্থ গূঢ়ার্থ অনেক থাকে—নানা অর্থে তার, নানান অনর্থ। ব্রহ্মকে চর্যাপদে আনলে পদে পদে ঐ চৌর্যকর্মই। তাছাড়া পথ কই? বাঁচতে হলে, বাঁচার মত বাঁচতে হলে ব্রহ্মবৃত্তি আর চৌর্যবৃত্তি দুই-ই আমাদের চাই যে। পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের জীবনে সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। বাঁচার তাগিদে ননী চুরি থেকে গোপিনীর বস্ত্রহরণ কিছুই বাদ দেননি তিনি।'

'টাকা পয়সা চুরি করাটাকেই আমরা চুরি বলে ধরি, শ্রীকৃষ্ণ তা করেননি।'

খাবার অভাবেই লোকে টাকা পয়সা চুরি করে—অভাব মেটাবার স্বাভাবিক তাগাদায়। ছেলেবেলায় চুরি করে থাকে সবাই—অভাববশত নয়, স্বভাবতই। তারা ওটা চুরি বলে মনে করে না। শ্রীকৃষ্ণরও বাল্যকালে সেই need ছিল, ননী খাওয়ার লোভ ; তার অভাব মেটাতেই ননী চুরি করে তাঁর ওই no-need হতে যাওয়া। কিন্তু খাবার কি তার বিকল্প টাকা পয়সা চুরি করাটাকে চুরি বলেই আমি মনে করি না। শুধু অর্থই নয়, পরমার্থও আমাদের চুরি করে পেতে হয়। সহজে মেলে না।'

'কিছুই সহজে মেলবার নয় তা জানি। সে কথা ঠিক।' তিনি মেনে নেন।

'পরকে একসপ্লয়েট না করে বাঁচা যায় না। পরকে আত্মসাৎ করে, পরের আত্মসাৎ করেই আমরা বাঁচি, আমরা বাড়ি, আমরা হই। এই চুরি বিদ্যাই হচ্ছে বড় বিদ্যা—সুন্দর বিদ্যা। তার সমন্বয়েই এই জীবন বিদ্যাসুন্দর। সেই চৌর পঞ্চাশৎ যেমন কালীপক্ষে তেমনি বিদ্যাপক্ষেও।...আমার কথা যদি বলেন, আমি এতাবৎ বেঁচে রয়েছি পরের খেয়ে-পরেই। পরের এবং পরীর।'

'পরীর ?'

'হ্যাঁ, পরীর তো অবশ্যই। পরের থেকে অর্থ, আর পরীর থেকে পরমার্থ—পেলেই না সর্বার্থ-সিদ্ধি ? একসপ্লয়েট এবং সেক্সপ্লয়েট ? দুয়ে দুয়ে যেমন চার, তেমনি দু হাতে দুধারের দুয়েই না আমাদের বাঁচার ?'

'কী বলছেন মশাই ?'

'সেই কথাই বলছি...কামিনী আর কাঞ্চন এই দুটিই আমাদের জীবনের সার বস্তু। জীবনের আর পৃথিবীর। এই দুই নিয়েই তো বাঁচা। বাঁচার মত বাঁচার জন্য দুইটাই চাই আমাদের—যে করেই হোক। আর ভগবান ? হ্যাঁ, ভগবানও বটে। তিনি এই উভয়ের মধ্যে উহ্য। দুই মেরুর মধ্যে দণ্ডের মতই গুহ্য তিনি, তাঁর ওপর ভর করে তাঁর ভরসাতেই পৃথিবীর মতন আমাদের সূর্য প্রদক্ষিণ। শিরদাঁড়া না থাকলে কি বাঁচা যায় মশাই? খাড়াই হওয়া যায় না ঠিক মতন। তাই ভগবানও আমাদের চাই বই কি। দুই মেরুর মধ্যে একই প্রাণদণ্ডে আমাদের সঙ্গে তিনি সমান সজীব। সেই অক্ষর বস্তু আপন স্বরে আর আমার ব্যঞ্জনায়—সম্মিলিত হয়ে যুক্তাক্ষর—কামিনী আর কাঞ্চন নিয়ে সশরীরে আমাদের মধ্যেই। আপন মহিমার নব নব ভূমিকায়। অবতার রূপ না ধরেও আমরা প্রত্যেকেই তাঁর অবতারণা।'

'কিসের থেকে কিসের অবতারণা !'

'আজ্ঞে, সেই কথাই !...এই কামিনী আর কাঞ্চন...পরের থেকেই পেতে হয় আমাদের, পরস্বাপহরণ না করে মেলে না কখনোই। একআধটু চুরি-চামারি না করলে কেউ বাঁচতেই পারে না। এই দুনিয়ায় বোধ হয় বাঁচাই যায় না একদম। অন্তত আমি তো পারিনি মশাই। আমার কথা যদি কই, মার্কটোয়েনের থেকে চুরি করেই আমার হাসির লেখার হাতেখড়ি—আমি লেখক হই। শুধু তিনিই নন, আরো অনেকের কাছে আমি ধারি। মুক্তহস্তের সেই ধার মুক্তকণ্ঠে আমার স্বীকার। চার ধারের মতো আখের রস পেষণ করে আমার এই আখের। এই লেখক পেশা। চোরামির কৌশল মজ্জাগত ছিল বলেই ছ্যাঁচরাতে ছ্যাঁচরাতে আসতে পেরেছি অ্যাদ্দিন—জীবদ্দশায় টিকে থেকে কোনো গতিকে। সত্যি বললে, আমি যেমন চোর তেমনি এক ছ্যাঁচোর। সে কথা প্রকাশ করতে আমার কুণ্ঠা নেই।'

'অসম্ভব না। খুনের ছেলের পক্ষে চোর হওয়া বিচিত্র নয় কিছু।'

'কী বললেন ?'

'আপনার বাবা যে রাজ্যলোভ সংবরণ করে বিবাগী হয়ে সন্ন্যাসী হতে গেছলেন, সে কোনো ঈশ্বরের খোঁজে নয় মশাই। আপনার মাকে খুন করে তিনি ফেরার হয়েছিলেন।...

॥ পাঁচ ॥

'ওমা, সে কী কথা গো।' শুনেই না আমি আঁৎকে উঠেছি : 'তা কি কখনো হয় নাকি !'

'না হবার কী আছে !' তিনি বললেন : 'সেকালের পতিদেবতারা সাধারণ মানুষ ছিলেন না. তাঁদের পক্ষে এ তো অতি সহজ কাজ। সেযুগে বৌ ঠেঙানো লোকে বিলাসিতা বলেই মনে করত, আর, বৌকে খুন করে ফেলা তো চরম বাহাদুরি। আপনার বাবা কিছু আর তখনকার সমাজবহির্ভূত লোক নন ? তবে হ্যাঁ, এই ফেরার হওয়াটা একটু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বটে। স্বভাবতই সে সময়ে এসব আপনার থেকেই চাপা পড়ে যেত, থানার দারোগাকে কিছু ধরে দিলেই মিটে যেত হাঙ্গামা। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সদরের পুলিস সাহেবের কানে গিয়ে গড়িয়েছিল কিনা। তিনি স্বয়ং সরজমিনে তদন্তের জন্যে মহানন্দাপথে তাঁর বজরায় এসে পড়লেন একদিন...গেরেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে...'

'আর, বাবাও অমনি রাজ্যপাটের পরোয়া না করে আমাদের নদীতটে সায়েবের বজরাঘাতের আগেই কেটে পড়লেন সেখান থেকে !' আমি অনুযোগ করি : 'এই তো বলতে চাইছেন আপনি ?'

'অবিকল।'

'কিন্তু তা কি করে হয় মশাই ? আমার মাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি যে...জলজ্যান্ত দেখেছি...বাবা মারা যাবার পরেও অনেকদিন তিনি বেঁচে বর্তে বহাল তবিয়তে ছিলেন।'

'তাই নাকি ? কিন্তু আপনার মা হেমাঙ্গিনী দেবীর নিহত হবার খবর সেখানকার সুপ্রাচীন অনেকের কাছেই জেনে এলাম যে !'

'হেমাঙ্গিনী—কী বলছেন ? আমার মার নাম যে শিবরাণী !'...আমি প্রকাশ করি : 'বাবার নাম শিবপ্রসাদ। আমার ভাইয়ের নাম শিবসত্য, ঘাটশিলার স্কুল কাম কলেজের হেডমাষ্টার বনাম প্রিন্সিপাল। শিব দিয়ে মিলিয়ে নাম সব আমাদের।'

শুনে তিনি অবাক হন—'এরকম নামের যোগাযোগের মানে ?'

'কে জানে, কেন ! আমাদের দুভায়ের নাম বাবার রাখা—তিনিই মিলিয়ে রেখেছেন আর, মা'র নামটা নাকি হয়েই ছিল আগের থেকে । আর, ঐ নামের মিলের কারণেই বিয়েটা হল নাকি শুনেছি ।'

'মনের মিল হয়ে বিয়ে হয় তা জানি, কিন্তু এই নামের মিল দেখে-আশ্চর্য তো !'

'আশ্চর্য তো বটেই । বাবা যখন সাধুবেশে মুক্তিলাভের আশায় হিমালয়ের পথে বিপথে ঘুরছিলেন তখন এক ঋষিকল্প সন্ন্যাসী নাকি তাঁকে সংসারে ফিরে গিয়ে বংশরক্ষণ করে নিজের প্রাক্তনখণ্ডনের উপদেশ দেন, আর তিনিই বলেছিলেন যে, তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী অপেক্ষা করছে—যার নাম শুনলেই তিনি টের পাবেন । আর একটা রাজপ্রাসাদও নাকি তৈরি হয়ে রয়েছে তাঁর জন্যে । ভদ্রলোকের এই দুটো ভবিষ্যবাণীই কিছু কিছু ফলেছিল বলতে হয় ।'

'সেই রাজপ্রাসাদটা আমি দেখে এসেছি এবার ওই চাঁচোরে গিয়ে, যেখানে আপনারা এককালে বাস করতেন । ওল্ড রাজ প্যালেস বলে থাকে লোকে এখনো । তবে তার রাজোচিত চেহারার কিছু আর অবশিষ্ট নেই...তিন ধার পড়ে গেছে তার । অনেক- কাল হল তো ।'

'আমার বাবা যখন সন্ন্যাস ছেড়ে সংসারে ফিরে এলেন তখন স্বভাবতই তাঁর বিয়ের কথা উঠল—নানা জায়গার থেকে সম্বন্ধ নিয়ে আসতে লাগল ঘটক । তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শিবরাণী দেখেই না, বাবা ঠিক করে ফেললেন, বললেন যে, ওই মেয়েই আমার সহধর্মিণী ।'

'অবাক কাণ্ড তো ?'

'সেই পরমহংসদেবের মতই না ? তিনি ছোটবেলাতেই এক দঙ্গল বালিকার মধ্যে একটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন—ওই আমার বৌ । পরে তার সঙ্গেই তাঁর বিয়ের ঠিক হয় । তিনিই মা সারদামণি । তাই না ?'

'তা না হয় হোলো কিন্তু বিলকুল গড়বড় হয়ে যাচছে যে ! বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া খবর সব... জেনে এলাম আপনার মাকে খুন করে বাবা ফেরার হয়েছিলেন, এদিকে আপনি বলছেন বাবা মারা যাবার পরেও আপনি মাকে দেখেছেন । মনে হচ্ছে, যাকে দেখেছেন তিনি আপনার মা নন, সৎ মা । উক্ত হেমাঙ্গিনী দেবীই মা ছিলেন আপনার...আপনার বাবা দুই বিবাহ করেছিলেন, আপনি তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে ।'

'আবার আমার প্রতি আপনার এই অযথা পক্ষপাত...'

অসম্ভব কিছু নয়ত । সেকালে একাধিক বিয়ের রেওয়াজ ছিল যে । প্রায় লোকেই তা করতেন ।'

'জানি । তবে সেটা কুলীনদের বেলাতেই হতো মশাই ! এক কুড়ি দু'কুড়ি বিয়ে করা তাঁদের পক্ষে কিছুই ছিল না—এমনকি কুড়িয়ে বাড়িয়ে একশও ছাড়িয়ে যেত কারো কারো শুনেছি । কিন্তু চকরবরতিরা কুলীন নয়, যদ্দুর আমি জানি ।'

'চকরবরতিরা কঞ্জুস হয় একথাটা যেমন আপনার জানা তেমনি তো ?' তিনি হাসতে থাকেন ।

'চকরবরতিরা যে কঞ্জুস হয় সেটা কেবল জানা কেন, আমার দেখাও যে।' আমি জানাই : 'এই চর্মচক্ষেই দেখা—আয়নার মধ্যে জাজ্বল্যমান !'

'তাহলেও, কুলীন না হলেও দু'তিনটে বিয়ে এমন কিছু কঠিন ছিল না কারো পক্ষেই তখন । এমন অন্নসংকট তো দেখা দেয়নি সে সময় । আমার ধারণা আপনার বাবা ফেরার

দশার পর ফিরে এসে দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছিলেন এই শিবরাণী দেবীকে।'

'তাহলে তো সেই দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ হতো আমার, যা খুব কম ছেলের বরাতেই ঘটে থাকে...' আমি বলি : 'বাবার বিয়ে দেখতে পেতাম আমি। মানে এই দ্বিতীয় বিয়েটাই। আমার চোখের ওপরই ঘটত তো! আর কিছু না হোক, বৌভাতের দিন অন্তত পানের খিলি বিলি করার পার্টটাও আমি পেতাম।'

'তার জন্যে 'আপসোস করবেন না। আপনার লেখায় তো তাই বিলিয়েছেন সারা-জীবন।' বলে তিনি খিলখিলিয়ে হাসেন।

সে কথা সত্যি, মানতে হয় আমায়। পাঠক-পাঠিকার পাতে আর সব লেখকের নানান উপাদেয় ভুরিভোজ্য পরিবেশনের পর জীবনভোর আমার ঐ পানের খিলি বিলোনোই তো। পুষ্টিকর কিছু নয়, মুখ বদলাবার জন্য তুষ্টিকর হয়ত যৎকিঞ্চিৎ। আমার ফসলে ধান গমের কিছু নেই, তার আবাদেও পারঙ্গম নই আমি, ধার করা ধারালো আমার বরোজে খালি ওই পানই ফলে। চুটকি লেখার চটক! কারো মনের আকাশে খানিকক্ষণ উড়লেও খানিকবাদে ফুরুৎ করে মিলিয়ে যায় হাওয়ায়।

'যাক। ওসব কথা থাক, আপনার কুলপঞ্জীতে আসি। আপনার কাছে খবরগুলো যাচিয়ে নেওয়া যাক। আপনার ঠাকুর্দার নামটা কী বলুন তো?'

'কি করে বলব। আমার বাবাই জানেন।'

'আপনি জানেন না? শোনেননি কখনো বাবার কাছে?'

'শুনব না কেন, কত বারই তো শুনেছি। কিন্তু বছরে একবার করে শুনলে কি মনে থাকে নাকি কারো, না মুখস্থ হয়?'

'বছরে একবার করে?'

'হ্যাঁ, সেই মহালয়ার দিন পার্বণশ্রাদ্ধর সময়। তখনই বাবা ঊর্ধ্বতন চোদ্দ পুরুষের নাম আউড়ে তর্পণ করতেন...সেই দেবশর্মণঃদের নাম তখন তখন হলে না-হয় বলতে পারতাম; কিন্তু এখন অ্যাদ্দিন বাদে-'

'কিন্তু অন্তত তিন-চার পুরুষের নাম তো মনে থাকে, মনে রাখে সবাই।'

'রেখে লাভ মশাই? যখন সেই অতীত কুলকোটিনাম্ সপ্ত দ্বীপনিবাসিনাম কারো নামই আমাদের স্মরণে নেই, তখন হারানো মহাসমুদ্রের এক গণ্ডূষ মাত্র—গণ্ডাকয়েকের নাম মনে রেখে কী হবে? তবে...' আমার আরো অনুযোগ—'এটুকু আপনাকে বলতে পারি ঠাকুর্দার সম্পর্কে যে, শিব দিয়ে তাঁর নাম নয়। কেননা, আমার বাবা তো তাঁর নামকরণের সুযোগ পাননি আদৌ।'

'তবে শুনুন সেটা আমার কাছে। আপনার ঠাকুর্দার নাম হচ্ছে নবকুমার। ঈশ্বর নবকুমার চক্রবর্তী। সেই নবকুমারের পৌত্র আপনি, বুঝেছেন?'

'য়্যাঁ? তাই নাকি?' আমি যেন চোট সামলাই, 'তাহলে ইনিই কি সেই নবকুমার যিনি নৌকা থেকে কাঠ কুড়োতে নেমে বালিয়াড়িতে গিয়ে পথ হারিয়েছিলেন?'

'পথ হারিয়েছিলেন? তার মানে?'

'মানে, পথিক! তুমি কি পথ হারাইয়াছ-র নবকুমার? আপনি কি বলতে চান যে কপালকুণ্ডলা আমার ঠাকুমা?' আমার বঙ্কিমকটাক্ষ। —'বঙ্কিমবাবুর সেই মানস-কন্যা যাকে দামোদরের বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে, কপালকুণ্ডলা ডুবিয়া গেল আর উঠিল না,

বলে এক কথায় তিনি খতম করে দিয়েছিলেন, যে নাকি আবার সাঁতরে দামোদর পেরিয়ে মৃন্ময়ীরূপে লোকসমাজে ফিরে দেখা দিয়েছিল আবার ?'

'আপনার ঠাকুমার নাম আমি পাইনি। চেষ্টাও করিনি জানবার। তবে আপনার জন্মবৃত্তান্ত জেনে এসেছি, তাও কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়।'

'হাতী ঘোড়া কিছু নয় নিশ্চয় ? আর সবাই, সাধারণ মানুষেরা যেমন করে জন্মায়...'

'হাতী ঘোড়ার কথা আসছে কেন এখানে ?'

'মানে, আমার জন্ম ব্যাপারে হাতীমার্কা কিছু ঘটেনি, সেই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। গোপা দেবী গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে হাতীর স্বপ্ন দেখেছিলেন না ?'

'না, তেমন অলৌকিক কিছু না হলেও একেবারে লৌকিকও বলা যায় না ঠিক। মা'র মুখে আপনি শোনেননি কিছু ?'

'শুনেছিলাম একটুখানি এক সময়। কিছুতেই নাকি আমি হচ্ছিলাম না, তাই বাবা-মা বিন্ধ্যাচলে গিয়ে মানত করেছিলেন ছেলের জন্যে—আর তারপরেই নাকি আমি হলাম। মা বিন্ধ্যবাসিনীর দয়াতেই হওয়া, জগন্মাতার দোয়াতেই আমার পাওয়া। তাই মা আমার নাম রেখেছিলেন পার্বতীচরণ। পরে বাবা আমার সেই প্রথম নামটা পালটে শিবরাম বানিয়ে দেন।'

'কেমন করে পাওয়া আপনি, জানেন তো ? তাঁরা দেবীর পূজো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পান এক নবজাতক শুয়ে রয়েছে মন্দিরচত্বরে, অনেক খোঁজখবর করেও তার বাপ-মার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন সেই বেওয়ারিশ শিশুটিকেই মার দেওয়া মনে করে তুলে নিয়ে এসে তাঁরা মানুষ করেন। সেই শিশুই হলেন আপনি।'

'আশ্চর্য নয়। আমারও সেইরকম মনে হয়। বলেছিলাম না আপনাকে যে আমি কোনো বস্তির আমদানি, নয়ত রাস্তার কোণ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া—মিলে গেল তো ?'

'মেলালেই মেলে।' তিনি নিশ্বাস ফেলেন।

'তিনিই মেলান। মেলাবার মালিক তিনিই। মেলাবেন তিনি মেলাবেন—অমিয় চক্কোত্তির সেই কবিতাটা স্মরণ করুন। বস্তির সঙ্গে শ্রাবস্তির, কুঁড়ে ঘরের সঙ্গে কুঁড়ের বাদশাকে তিনিই মিলিয়ে দেন—মিলিয়ে থাকেন। সবই তাঁর অবদান।'

'এবার আপনার বাবার চরিত্রকথা শুনুন তবে—যা জেনে এসেছি। আপনার মনঃপূত হবে কিনা জানি না। আপনি তো বললেন—আমার বাবা পূত চরিত্রের দেবতুল্য আত্মভোলা মানুষ ছিলেন—কিন্তু সুন্দরী ললনাদের প্রতি দারুণ তাঁর ঝোঁক ছিল জানেন সেটা ?'

'নিজের থেকেই জানা যায়—আমার মধ্যেও সেই ঝোঁক যে। আমার দেহে বাবার রক্ত প্রবাহিত কি না জানি না, যদি আমি বিন্ধ্যাচলের সেই বেওয়ারিশ ছেলেই হই, তবে আমার স্নেহে সেটা প্রকট। বাবার দৃষ্টান্তেই মানুষ তো ! নামান্তরে সেই বাবাই। সুন্দর মেয়েদের সামনে আমিও আপনাকে সামলাতে পারি না। কেউ পারে কি না কে জানে !'

'সুন্দরী বধূদের তিনি হীরে চুণী পান্নার আংটি উপহার দিতেন জানেন তা ? সে তল্লাটের অনেক গিন্নীই হাতের সেই আংটি দেখালেন আমায়—প্রৌঢ় হলেও প্রথম যৌবনে যে তাঁরা রূপসী ছিলেন দেখলেই সেটা টের পাওয়া যায়। এটা আপনি জানতেন ?'

'জানব না কেন। স্বচক্ষে দেখছি। যখনই তিনি কলকাতায় যেতেন একগাদা সোনার আংটি গড়িয়ে আনতেন পাথর বসানো, আর যাঁকে তাঁর ভালো লাগত স্বহস্তে তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিতেন দেখেছি। ...আর এটা...এটা অনেকটা তার পাণিগ্রহণের মতই যেন, আমার

মনে হত সেই সময়।'

'আর আপনি এদিকে বলছেন আপনার বাবা ছিলেন নিরাসক্ত দেবতুল্য মানুষ—'

'তাতে কী হয়েছে! মহাদেবের কি মোহিনীর প্রতি ঝোঁক ছিল না?' বাবার হয়ে সাফাই গাই: 'আর সত্যি বলতে, বাবার ওই আদর্শ থেকেই আমি প্রেরণা পাই। এটাকে মনের দুর্বলতা বলতে পারেন, কিন্তু আমার মনের জোর ওই থেকেই। নিজের মনের দুর্বলতা অনায়াসে কাটিয়ে ওঠার অতি সহজ এই উপায় বাবার দৃষ্টান্ত থেকেই আমি শিখেছি। বাবার ওই আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়—তাঁর ওই আচরণের ছেলেবেলাকার সেই-শিক্ষায় এই অধম জীব বহুৎ বাধা অবলীলায় উৎরে এসেছে।'

'পরস্ত্রীর প্রতি ওই আসক্তি কি ভালো?'

'তা আমি জানিনে। তবে বলতে পারি আমার মধ্যে একটুও পরস্ত্রীকাতরতা নেই। পরস্ত্রী ছাড়া কি আর মেয়ে নেই দুনিয়ায়? পরকুমারীরা সব গেল কোথায়? পরীর মত মেয়েরা? তারা থাকতে—পরধনে হস্তক্ষেপ করবার দরকার! তবে হ্যাঁ, ওই আংটি দেওয়াটা একটু ব্যয়সাপেক্ষ বটে। কিন্তু ও ছাড়াও বিয়ে না করেও পরকন্যার করলাভের অন্য পথ আছে আরো, একেবারে নিখর্চায়। কাজী আমায় শিখিয়েছিল পামিস্ট্রি। মিষ্টি হাতকে হস্তগত করার সহজ উপায় হচ্ছে ঐ হাত দেখা। ঐ করে প্রথম হাতিয়ে না, তারপর শনৈঃ শনৈঃ! আর কী! শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা—শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম ইত্যাদি! কাজী নাকি ঐভাবেই বাগাতো মেয়েদের। আর সেই কারণেই আমি বলতাম, আমাদের মধ্যে কাজী...কাজীই একমাত্র...'

'কাজী কি?'

'Kazi knows rule!'

'কাজীর কথা থাক, আপনার বাবার কথা কই...তিনিও কিছু কম কাজের কাজী ছিলেন না।'

'বাবার কুলকুষ্ঠী আর আপনার কাছে কী শুনব? তাঁর কুলকাহিনীর আমিও কিছু কিছু জানি। তাঁর মুখেই শোনা। বলব আপনাকে?'

'বলুন বলুন।'

'আমাদের আদি নিবাস ছিল নাকি চৌঁয়ায়...মুর্শিদাবাদের কোনখানে যেন সেই জায়গাটা। সেখান থেকে চুঁইয়েই আমরা ওই চাঁচোরে গিয়ে পড়েছিলাম—তারপর সেখান থেকে বিদূরিত হয়ে কোথায় না! যাক, ওই চৌঁয়া যে কেমন জায়গা চোখে দেখিনি যাইনি কখনো সেখানে, তবে বাবা একটা ছড়া কাটতেন—ছড়াটা তাঁরই কিনা কে জানে-শীত নেই গ্রিষ্মি নেই সব সময়েই ধোঁয়া। সকাল নেই সন্ধ্যে নেই শেয়াল ডাকে হোয়া। গ্রামের নামটি চৌঁয়া॥ এই চৌঁয়ায় একবার এক যাত্রা পালার আসর বসেছিল। চাঁচোরেও আমি যাত্রাদল আসতে দেখেছি। মুকুন্দ দাসও এসেছিলেন একবার মনে আছে আমার। এখন চৌঁয়ার কথাটাই বলি। যেদিন রাত্রে যাত্রা হবার কথা, সেদিন সকালে বাবা সামনের বাগানে প্রাতঃকৃত্য করতে গেছেন, দেশগাঁয় গায়ে হাওয়া লাগিয়ে প্রকৃত রসিকের ন্যায় নিঃসর্গ দৃশ্য দেখতে দেখতে মুক্ত বাতাসে নিজেকে বিমুক্ত করাই যে রেওয়াজ তা আপনি অবহিত আছেন আশা করি। এখন, সেই যাত্রাদলের একটি ছোকরাও বসেছিল প্রাতঃকৃত্য করতে কাছাকাছি—তিনি লক্ষ্য করেননি। এহেন কালে একটা কুল এসে পড়ল তাঁর সম্মুখে। টোপাকুল। দেখে তিনি লোভ সামলাতে না পেরে মুখে পুরে দিয়েছেন, আমারই বাবা তো! কিন্তু সেই ছেলেটা

ঘটা দেখেছিল ।...'

'তারপর ?'

'তারপর, সন্ধ্যেয় যাত্রার আসর বসতে রাধাকৃষ্ণের পালা শুরু হোলো । সেই প্রাতঃকৃত্যের ছোঁড়াটা জটিলা-কুটিলার একজনা সেজেছিল । নাচতে নাচতে আসরে এসে গাইতে লাগল, 'তোমার কুলের কথা কয়ে দেব,' রাধার কাছেই হাত মুখ নেড়ে গাইছিল সে, তারপর গোটা আসরেই ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল তাই। বাবার কাছে এসে যখন সে হাত নাড়তে লেগেছে—তোমার কুলের কথা কয়ে দেব—বাবা তাকে একটা টাকা প্যালা দিয়েছেন । চলে গেছে। এক চক্কর ঘুরে ফের সে ফিরে এসে শুরু করেছে, তোমার কুলের কথা কয়ে দেব। অমনি বাবা হাটে হাঁড়ি ভাঙবার ভয়ে পাঁচ টাকা প্যালা দিয়েছেন । ফের আবার । বকশিশ পেয়ে পেয়ে ছোঁড়াটার উৎসাহ বেড়েছে , ঘুরে ঘুরেই আসছিল সে আর গাইছিল ওই কুলের কথার কলিটা—বাবার মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে। আর বাবাও অমনি তেড়ে তেড়ে প্যালা দিচ্ছিলেন ছেলেটাকে—তার মুখ চাপা দেবার জন্য । তিনি যত চাপতে চাচ্ছিলেন ততই তার চাপল্য বাড়ছিল যেন । সে ভেবেছিল তার গানটা বুঝি বেজায় মনে ধরেছে বাবুর—তাই সে গানও ছাড়ছিল না, বাবাকেও না । মাছির মতই ভোঁ ভোঁ করছিল বাবার কাছে এসে । আর বাবাও পাগলের মত প্যালা দিয়ে যাচ্ছিলেন—ঐ করে বাবার আংটি গেল, সোনার ঘড়ি চেন গেল, গায়ের শাল দোশালা আংরাখা, লক্ষ্মৌ টুপির কিছুই রইল না, সব চলে গেল বাবার ওই গানের ঠ্যালা সামলাতে, কিন্তু প্যালারামকে থামানো গেল না কিছুতেই । শেষটায় কুলের কাঁটার যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে বাবা উঠে পড়লেন আসর থেকে—সর্বশেষে বাবা নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি খুলে দিয়ে বললেন, যা ব্যাটা, ক'গে যা আমার কুলের কথা । হাগতে বসে একটা কুল খেয়েছি এই তো ? কয়ে দিয়ে, বয়েই গেল আমার । বলে বিলকুল দিগম্বর হয়ে বেরিয়ে এলেন আসর থেকে ।'

'তাই নাকি ?'

'বাবার এই কুলকাহিনী তো আপনি শুনতে পাননি ? সত্যি বলতে, সবার কুলকথা কুলকেচ্ছাই প্রায় এইরকম । আমিও নিজের কুলের কথা কাউকে কইতে চাইনে তো এইজন্যেই। পাছে দিগম্বর সাজে লোকসমাজে বেরিয়ে পড়তে হয় সেই ভয় ।

॥ ছয় ॥

একেবারে পোড়ো বাড়ি ঠিক না হলেও প্রায় পড়ো পড়োই ছিল বটে বাড়িটা । আড়াই ধার তার পড়েই গেছল, দেড়টা দিক খাড়া ছিল কোনো গতিকে ।

তাহলেও নামডাকে রাজবাড়ি । পুরাতন রাজবাটী । চাঁচোরের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র একদা মহাসমারোহে বাস করতেন সেই প্রাসাদে ।

বিরাট চার মহলা লম্বা চওড়া ছিল যে বাড়িটা তা তার চারধারের ধ্বংসাবশেষ দেখলেই বোঝা যায় । অন্দর মহল, রাণীরা থাকতেন যে ধারটায়, পশ্চিমদিকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন ভগ্নদশায় দাঁড়িয়ে । দক্ষিণ ধারটাও ভাঙাচোরা চেহারা, তাব একটা দিকের খানকয় পরিত্যক্ত ঘর তো আমার চোখের ওপরই ভেঙে পড়ল একদিন ।

একশ বছরের ওপর নাকি বাড়িটার বয়স, তখন সেই পড়ন্ত অবস্থায় মনে হতো পড়তে পড়তে পুরোপুরি যেতে আরও একশ বছর লেগে যাবে বাড়িটার । সেকেলে শক্ত গাঁথনির

পোক্ত বাড়ি তো! রীতিমতন বনেদী।

দোতলা বাড়ি। আমরা থাকতাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সাবেক তোষাখানায়। পূবদিকের এলাকায়। তার বাঁ দিক ঘেঁষে স্নান করার গোসলঘর। এখন সংক্ষিপ্ত হয়ে গোলঘর, সেটা পেরিয়ে গেলে শীসমহল ইত্যাদি—হলগুলো থাকলেও সে-সবের রঙ-চঙের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না আর।

দস্তুর মতন প্রশস্ত তোষাখানার ঘরটায় পর পর আটখানা খাট আঁটত। সেটাই ছিল আমাদের শোবার ঘর। বাবার নিজের ছিল তিনখানা খাট, যখন যেটাতে খুশি তাঁর দেহভার রাখতেন, তার ভেতরে একটা ছিল আবার পেল্লায়। আমার নিজের দখলে ছিল একখানা, বায়না করে বাগানো, আর আমার ভাই আর মা'র খাট দুখানা জুড়ে এক-করা, একটা বড় মশারির বিছানা ছিল সেই খাটে। আমি নিজের খাটে তো শুতামই, আবার ইচ্ছে হলে, ইচ্ছেটা প্রায়ই হত আমার, পাশের সেই জোড়া খাটে গিয়ে মধ্যিখানে সেঁধিয়ে পড়তাম এক এক সময়। বাবার পাশেও গিয়ে শুতাম কখনো-সখনো।

আর অষ্টম, বাড়তি খাটখানা ছিল মামা-টামা বা সম্পর্কিত দিদি-টিদি কেউ কখনো-সখনো এলে-টেলে তার জন্যে।

রঙমহল শীসমহল ইত্যাদির মানে কী, আমার জানা নেই। মুঘল যুগের ইতিহাসে যাঁদের দখল আছে তাঁরা বলতে পারেন। আমার মোগলাই অভিজ্ঞতার দৌড় ঐ পরোটা পর্যন্ত। আমার মনে হয় ওখানে বসে রাণী আর বেগমরা হয়ত মুখে হাতে নখে মেহেদির রঙ লাগাতেন আর রাজা কি রাজকুমাররা শীস দিয়ে ইশারা করতেন তাঁদের কিংবা সাড়া দিতেন তাঁদের ইশারায়। আর, তোষাখানাটা আমার ধারণায় ছিল খোসামোদের আখড়া। মোসাহেবদের তোষামোদে রাজাবাহাদুর এখানে আমোদিত হতেন, আমোদ পেত সভাসজ্জন সবাই।

গোলঘরটার উত্তর দিকে আরো অনেক ঘর ছিল, সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ খাড়া ছিল তখন। তারই ভেতর যে দু-একখানা তখনো পড়ে যায়নি তারই একটাতে ছিল আমাদের ভাঁড়ার ঘর আর তার পাশেই রান্নাঘর।

ঐ পর্যন্তই আমাদের এলাকা। তার ওধারটায় সাবেক মহাফেজখানা ছিল যেটা সেখানে থাকতেন এক ডাক্তার, সপরিবারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। রাজ এস্টেটের দাতব্য চিকিৎসার ভার ছিল তাঁর ওপর।

কলকাতা থেকে এসেছিলেন তাঁরা। আমার মাও শহুরে মেয়ে। তাই দুই বাড়ির গিন্নীর ভেতর ভাব জমাতে বেশি দেরি হয়নি। আমার বাবা প্রথম পরিচয়েই ডাক্তারবাবুর বৌকে একটা হীরের আংটি উপহার দিয়েছিলেন আমার মনে আছে। কিন্তু সেহেতু মা'র কোনো রাগ হতে আমি দেখিনি।

ডাক্তারবাবুর ছিল চার মেয়ে আর এক ছেলে। কী যেন তাদের নাম। শুধু একজনের নাম এখনো আমার মনে আছে, সব্বার ছোট, সেই রিনি। প্রায় আমার বয়সী, দশ-বারোর মধ্যে সবাই, তবে ছেলেটা আমার চেয়ে একটু বড়ই হবে বোধ করি।

আমার বেশ মনে আছে, আমরা দুই ভাই রাম লক্ষ্মণ সাজতাম আর সেই ছেলেটা—কী যেন ছিল তার নাম, সে হতো রাবণ। মোড়ার কাঠি ভেঙে তীর ধনুক বানিয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হত আমাদের—যেটাকে ন্যায়যুদ্ধ বলা যায় না কিছুতেই! কেন না রাবণ হারতে চাইত

না কোনোমতেই, সব শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে গায়ের জোরে হারিয়ে দিতো আমাদের। তীর ধনুক সব ফেলে দিয়ে পিটাতে এমন শুরু করত আমাকে-স্বভাবত রাবণের রামের প্রতি আক্রোশ বেশি হবার কথা—অন্যায় কিছু নয়, কিন্তু আমারই পাশ-বালিশ বাগিয়ে দুমদাম লাগানোটা কি ঠিক ? যতই বলি যে গদাযুদ্ধ রাবণোচিত নয়, দুর্যোধনের শোভা পায়, সেকথায় কান না দিয়ে সে বালিশ আর আমাকে একসঙ্গে ফাঁসিয়ে দিত। চোখে নাকে মুখে তুলো ঢুকে হাঁচতে হাঁচতে পালাবার পথ পেতাম না আমি। সে তখন লক্ষ্মণের সঙ্গে সন্ধি করে মার্বেল খেলতে বসে যেত বারান্দায়।

নীচের ডাক্তারখানা থেকে আমি একবার একটা কাচের পিচকিরি চুরি করে এনেছিলাম, বিশেষ কোনো কারণে না, এমনিই। ভালো লেগেছিল তাই। তাই না দেখে ভারী রাগ করেছিলেন বাবা, কাঁদতে কাঁদতে সেই পিচকিরিটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছিল আমায়। কম্পাউন্ডারবাবু পিচকিরিটা নিয়ে সিরাপ খাইয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন আমাকে, মনে পড়ে এখনও।

তোষাখানা আর মহাফেজখানা মাথা উঁচু করে থাকলেও পশ্চিম আর দক্ষিণের মালখানা আর বালাখানার সবটাই প্রায় পড়ে গেছল। এই চারখানার মাঝখানে অনেকখানি শান বাঁধানো ফাঁকা জায়গা ছিল—সেই বিরাট চত্বরে ম্যাজিক বা যাত্রার আসর জমত, পাঁচখানা পাড়ার লোক জড়ো হতো দেখতে। আর সেই চৌহদ্দিতেই ওরা পাঁচ ভাইবোন আর আমরা দুই ভাই মিলে বাতাবি নেবুর বল পিটিয়ে খুব ফুটবল খেলতুম।

আমাকে সঙ্গী করে বড়ো মেয়েটা, নানু বুঝি ছিল তার নাম, মাঝে মাঝে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরুতো। মেয়েটা ছিল দারুণ ডানপিটে। গায়ে জোরও ছিল বেশ। তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পারতুম না আমি কখনোই।

রত্নহারের সন্ধানে বেরুতাম আমরা একেকদিন। মহারাণীর রত্নহার। চারধারেই তো প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। সে বলত এরই আনাচে কানাচে কোথাও না কোথাও মোহরের ঘড়ার সন্ধান পাওয়া যাবে। সেকালে তো ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক ছিল না। ধনরত্ন সব মাটির তলাতেই লুকিয়ে রাখত সবাই।

আমাদের বাড়িটার পশ্চিম দিকে রাণী ভূতেশ্বরীর অন্দর মহলের ভগ্নাবশেষে হানা দিতাম, যদি মহারাণীর হীরে মাণিক্যের খোঁজ মিলে যায় দৈবাৎ।

একদিন এঘরে সেঘরে ঘুরতে হঠাৎ একটা সুড়ঙ্গের মতন দেখা গেল। নানু বলল,'আয় নেমে যাই, এর ভেতরটায় কী আছে দেখে আসি।'

'না বাবা।' আমি ঘাড় নাড়লাম। সাপখোপ থাকতে পারে। কামড়ে দেবে।'

'বাবার কাছে সাপের ওষুধ আছে।' সে বলল। ডাক্তারের মেয়ে, সাপের ভয় রাখে না সে।

'তেমন তেমন সাপে কামড়ালে টের পাবি তখন। তোর বাবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবি না। ঢুলে পড়বি এখানেই।'

'বয়ে নিয়ে যাবি তুই।'

'আমি ? আমি তোকে তুলতে পারি ?' এখুনি পরীক্ষা করে দেখা যায়—'না বাবা। তুই যা ভারী। সুড়ঙ্গে সেঁধিয়ে কাজ নেই।' 'এমন সময় সাজগোজ করা একটা মেয়ে থামের আড়াল থেকে ইশারা করল আমাদের।

থমকে দাঁড়ালাম আমরা। —'এখানে মেয়ে এলো কোথা থেকে রে ?' আমি নানুর কানে ফিসফিস করি।

'রাণী ভূতেশ্বরী হবে বোধহয়। তোকে ডাকছে। হ্যাঁ তোকেই। যা না।'

. 'না বাবা।'

'গুপ্তধনের সন্ধান পেতে পারিস। বা মোহরের ঘড়ার খবর। যা না রে। ভয় কীসের ! আমি তো রয়েছি এখানে ?'

'না বাবা।'

'গলার হারখানা দেখেছিস ? হীরে মুক্তো ঝকমক করছে। রত্নহারটা তোকে দিতে পারে—চাস যদি। চা না গিয়ে।'

'রত্নহার আমার মাথায় থাক। ও নিয়ে আমি কী করব ?'

'আমায় দিবি। পরব আমি আমার গলায়। আমায় দিবি রে !'

'না বাবা।'

সেখান থেকে ফিরে সেদিনকার রাণী ভূতেশ্বরীর সঙ্গে মোলাকাতের কথা মাকে বললাম। মা শুনে ভারী রাগ করলেন। কড়ে আঙুলটা কামড়ে দিলেন আমার। মনে মনে কী যেন আউড়ে সারা গায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

'জানো মা, রাণী আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিলেন। জানো মা, নানু বলছিল, ওর গলার হারটা দেবার জন্যই ডাকছিল আমাকে। আমরা নাকি ওর নিকটাত্মীয় হই ?'

'খবরদার, ওই সব পোড়ো বাড়ির দিকে পা বাড়াবিনে কোনোদিন।' পুনঃ পুনঃ মা সাবধান করে দিলেন আমায়।

সেদিন রাত্তিরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটেছিল নাকি। মার মুখে শুনেছি।

রাত ন'টার মধ্যেই খাওদাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়তাম আমরা। মা'র রান্নার কোনো ঘনঘটা ছিল না। লুচি, আলুর তরকারি, আর ক্ষীর—এই ছিল রাত্রের খাবার। বাবা খেতেন অনেক রাত্তিরে—তাঁর জপধ্যান সব সেরে। তাঁর খাবার ঢাকা দেওয়া থাকত গোলঘরটায়।

শুতে না শুতেই সেদিন হাড় কাঁপিয়ে আমার জ্বর এসেছিল নাকি।

দেখতে না দেখতে সে জ্বর চড়ে গিয়েছিল বেজায়। রাত দুপুরে ঘোর বিকারে দাঁড়িয়ে গেল। সান্নিপাতিক সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল তখন।

আর, সেই সময়েই শুরু হয়েছিল দারুণ ভুতুড়ে উপদ্রব। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে রকম বর্ণনা রয়েছে—হুম্ হাম্ দুম্ দাম্ অট্ট অট্ট হাসিছে। —অবিকল সেই ধরনের সব।

আর, মা আমার পাশটিতে শুয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে মা কালীকে ডাকছেন।

'ওকে ছেড়ে দে, ওকে ছেড়ে দে। ওকে আমি নিয়ে যাব।' খোনা গলায় বলেছিল কে যেন।

'না মা, তোমায় গড় করি। ওকে তুমি নিয়ো না। ওকে ছেড়ে দিয়ে যাও, তোমার দোহাই !' মিনতি করছিলেন মা।

'না। তা হয় না। ও আমাকে ভেংচি কেটেছে কেন ? ছাড়ব না, ওকে নিয়ে যাবই। নিয়ে যেতেই আমি এসেছি। তুই ছেড়ে দে।'

'মা, তোমার পায়ে পড়ি। তোমাদের বাড়ির বউ আমি। ওর হয়ে আমি মাপ চাইছি—অবোধ বালক, ওকে মাপ করো। এবারটির মত ছেড়ে দাও। ওর ঘাট হয়েছে মা।'

'ওকে না নিয়ে আমি যাব না। আজ রাত না পোয়াতেই নেব।'

তখন মা কী করেন, আর কোনো উপায় না দেখে কালীঘাটের মা কালীর কাছে তাঁর ডান হাত বাঁধা রাখলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভূতুড়ে উৎপাত শান্ত হল, আমার জ্বর ছেড়ে গেল, সকাল বেলা যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম। সম্পূর্ণ বহালতবিয়তে।

রাতে যে আমাকে নিয়ে অত টানাপোড়েন চলেছিল তার বিন্দুমাত্রও আমি টের পাইনি। টের পেলাম সেদিন দুপুরে খেতে বসে।

আমি, মা আর আমার ভাই সত্য একসঙ্গে খেতে বসতাম সকাল সকাল। স্নান আহ্নিক সেরে বাবার খেতে বসতে দুপুর গড়িয়ে যেত।

মা বসেছেন আমার সামনেই। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে শুধিয়েছি—'মা, তুমি ডান হাতে না খেয়ে বাঁ হাতে ভাত খাচ্ছ কেন আজ ?'

যেই না বলা, অমনি মা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

সেদিন আর মা'র খাওয়াই হল না। সারাদিনটা উপোস গেল। খেলেন সেই রাত্তিরে। ভাত আর মা'র পেটে পড়ল না সেদিন।

তখন জানলাম রাত্তিরের ব্যাপারটা। মার ডান হাত বাঁধা রাখার কথা। মা এখন থেকে বরাবর বাঁ হাতেই খাবেন—যদ্দিন না সেই কালীঘাটে গিয়ে মা'র মানতের পুজো দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। মা'র খাওয়া পণ্ড প্রথম আমার থেকেই হয়েছিল। অনেকদিন তিনি অমনি উপোস করে কাটিয়েছেন।

প্রথম পাণ্ডা আমি হলেও তার পরে আরো অনেকের হাতেই তাঁর খাওয়া পণ্ড হয়েছিল। শেষটায় পাড়াপড়শীরা কেউ এলে খেতেই বসতেন না মা। বাঁ হাতে খাওয়া দেখলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগত তাদের মনে, আর তার জবাবে সেদিনকার সে বেলার মতন খাওয়া বন্ধ হয়ে যেত মা'র।

তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছেন মা। বাড়ির অতিথি-অভ্যাগতরা নিজ গুণে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন তিনি। খেতেই বসতেন না। অনেকদিন পরে কলকাতায় এলে কালীঘাটে পুজো দিয়ে তারপর হাত খালাস করতে পেরেছিলেন মা।

মা ডান হাতে খাচ্ছেন, তখন সে আবার আমাদের কাছে আরেক অবাক করা দৃশ্য।...

একটা রহস্যের আজও আমি ঠিক থই পাইনি। মা'র সেই দিব্যদর্শন আর আমার ওই অদ্ভুত দেখাটার।

মনের ইচ্ছাপূরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে হয়ত বা তার কিছু হদিশ মেলে। যেরকমটা স্বপ্নে দেখে থাকি, সেইরূপ চোখ মেলেও স্বপ্ন দেখা যায়—অবচেতনের প্রার্থিত বস্তু হাতে হাতে পেয়ে যাই তখন।

মনই তো বাঞ্ছা কল্পতরু-বাঞ্ছিত বস্তু মিলিয়ে দেয় আমাদের। সব কিছুর তত্ত্ব মনের গুহাতেই নিহিত। মনের গুণেই ধন মেলে, কখনো বা কল্পনার কল্পলোকে। কখনো অকল্পনীয় ভাবে জীবনের এই বাস্তবে।

মা রাতদিন মা কালীর কথাই ভাবতেন তো! তারপর দরদালানে জবা ফুলটা দেখে তার অনুষঙ্গে তাঁর ভাবনা ঐ ভাবমূর্তি ধারণ করেছিল। এক রকমের আত্ম-সম্মোহন আর কি!

আর আমার ব্যাপারটাও প্রায় তাই। ভূতুড়ে পোড়ো বাড়িতে ভূতপেত্নীর দর্শন মিলেই থাকে, লোকমুখে শুনে শুনে গল্পগাথায় পড়ে জানা। তাই সালঙ্কারা ভূতেশ্বরীকে দেখেছিলাম।

রাত্তিরে সেই হঠাৎ জ্বর বিকার হওয়া আর মা'র মানত করার সাথে সাথেই তার বেপাত্তা হয়ে যাওয়া—এর মানে ? এই জিজ্ঞাসার জবাব পাইনে।

অবশ্যি, শেষ পর্যন্ত মহামতি শেক্সপীরের মত তাবৎ প্রশ্ন ভূয়োদর্শী উক্ত হোরেশিয়োর ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বইকি !

যদিও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় জীবনের যত ভূয়োদর্শনের সবটাই হয়ত ভুয়ো নয়।

॥ সাত ॥

রিনিকে নিয়ে আমি প্রায় দিনই বেরিয়ে পড়তাম বিকেলে বেড়াতে। ইস্কুলের থেকে ফিরে দু'পকেটে চিঁড়ে আর খেঁজুর গুড়ের পাটালি ভরে নিয়ে কুকুরডিঘির পাশ দিয়ে পাহাড়পুরের পথ ধরে চলে যেতাম একেকদিন। দুজনে মিলে চিঁড়ে গুড় খেতে খেতে মজা করে। কোনোদিন বা আবার চষা ক্ষেতের আল পথ দিয়ে আলগোছে হাঁটতাম আবার আমরা। কোনোদিন নয়া দিঘির পাড়ে বসে থাকতাম, বসে বসে গল্প করতাম দুজনায়।

মাঠের মাঝখানে সেই যুঁই গাছটার তলায় গিয়ে বসতাম একেকদিন। যুঁই ফুল ছড়ানো কেমন গন্ধ জড়ানো জায়গাটা। সেখানে গেলে রিনির সব গল্প ফুরিয়ে যেত হঠাৎ। আমার কোলের ওপর মাথা রেখে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভাবত সে, কে জানে ! তার মুখের ওপর চোখ নামিয়ে কী দেখতাম আমি কী জানি !

সারা আকাশ রঙে ভাসিয়ে দূর দিগ্বলয়ে সূর্য অস্ত যেত, আর যে সূর্যমুখী ফুল আমি চিনিনে, দেখিনি কখনো, কি রকম দেখতে কে জানে, আমার মনে হত তাই যেন ফুটে রয়েছে আমার কোলের উপরে।

কোনোদিন বিকেলে আমি ডাকতে যেতাম রিনিকে ওদের দিকটায়। কোনোদিন বা সে আসত আমাদের এধারে। দুজনে খেতে খেতে হাঁটতাম, আর হাঁটতে হাঁটতে খেতাম। আসবার সময় হাত ধরাধরি করে ফিরতাম আমরা।

সেদিন রিনি ফেরার কালে আমার হাত না ধরে আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে এল—ঠিক ছেলেদের মতই। ছেলেবন্ধুরা যেমন পাশাপাশি গলা জড়িয়ে যায় সেইরকমই প্রায়। সত্যি বলতে এই জর্জর অবস্থাটা একটু কেমন কেমন ঠেকলেও তেমন আমার খুব মন্দ লাগছিল না।

রিনির মধ্যে ছেলেমানুষি তো ছিলই, ছেলেদের মতও খানিকটা যেন ছিল কীরকম। একাধারে ছেলে আর মেয়ে—এই কারণেই তাকে আমার ভালো লাগত আরো।

ওর চেহারাটাও ছিল যেমন ছেলে-ছেলে, ওর অনেক আচরণেও তেমনি ছেলেমি প্রকাশ পেত। ছেলেদের মেয়েলিপনা অসহনীয় বোধ হলেও মেয়েদের মধ্যে এই ছেলে ছেলে ভাবটা আনকোরা এক আকর্ষণ মনে হয়।

ছেলেদের সঙ্গে ছেলেরা যেমন সহজে মেশে, রিনির সঙ্গে তেমনি অবলীলায় আমি মিশতে পারতাম। কোন কুণ্ঠা সঙ্কোচ ছিল না কোথাও।

সেদিন সারাটা পথ তার অকুণ্ঠ এই গলা জড়িয়ে আসাটা আকণ্ঠ আমার যেন অমৃতে ভরে দিল... মধু ঝরতে ঝরতে এল সারাক্ষণ। এমন কি, বাড়ি ফিরেও অনেকক্ষণ খালি কাঁধটাই আমার কাছে কালাকাঁদের মতন মিঠে ঠেকতে লাগলো।

বেড়িয়ে ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যে হয়ে যেত, তাই সোজা সে তার বাড়িতে চলে যেত আর

আমি উপরে উঠে আসতাম।

সেদিন সে নিজের এলাকায় না গিয়ে আমার সঙ্গে উপরে এল।

'তোমার পড়ার ঘরটা দেখব।'

'পড়ার ঘর বলে আলাদা কিছু নেই আমার। কয়েকটা বড় বড় হল্ তো। ঘর কোথায় আমাদের ? ঘর আছে তোমাদের দিকটায়। ছোটখাট বেশ কয়েকখানা ঘর।'

'তাহলে তুমি পড়ো কোথায় ?'

'শোবার ঘরেই পড়ি, আবার কোথায় ? বাবার টেবিলে প্রকাণ্ড আয়নাটার সামনে গোল একটা কেদারা আছে, বেশ বড়ো কিন্তু বেজায় সেকেলে, সেইটেয় বসে টেবিলে বইপত্তর রেখে পড়াশুনা করি। দেখবে চল।'

টেবিলের সামনে একটিমাত্র বড় কেদারায় আমরা ঘেঁষাঘেঁষি বসলাম। সে আমার বইখাতা হাঁটকাতে লাগল।

'ওমা! একী! কী লিখে রেখেছ সব ?'

'কী লিখেছি!' ওর সবিস্ময় শব্দে আমি সচকিত হই।

'খাতা ভর্তি যা-তা কী লিখেছ সব ? এ কী!'

'কী জানি!' উদাসীনের মত বলি : 'হাতে কোনো কাজ থাকে না তখন কী করি, যা মনে আসে তাই লিখি।'

'তাই বলে পাতার পর পাতা জুড়ে খালি রিনি রিনি রিনি রিনি! এ কী! আমার নাম কেন ?' সে অবাক হয়। 'এত এত আমার নাম! কেন গো ?'

'কে জানে কেন!'

'বারে! আর কী কোনো নাম ছিল না পৃথিবীতে ? ঠাকুর দেবতার নাম লিখতে হয়। বাবা রোজ সকালে একপাতা করে দুর্গা নাম লেখেন। মা দুর্গার নাম। শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়, শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়। তার মানে বোঝা যায়। তোমার এ কী ?'

আমি তার কী জবাব দেবো ? চুপ করে থাকি।

'এ রকম লিখো না আর। কারো চোখে পড়লে কী ভাববে বল তো ?'

'কী ভাববে আবার ? ভাববার কী আছে!'

'ক্ষ্যাপা ভাববে তোমাকে।'

এক মাঘে যেমন শীত যায় না, তেমনি এক ক্ষেপেও মানুষ পাগল হয় না—কিন্তু তার কথার ঠিক জবাবটি আমি জানতুম কি তখন! খানিক চুপ থেকে বলি—ভাবুক গে। আমার বয়ে গেল।'

সে আর কিছু বলে না।

'কেন, তুই কি রাগ করলি আমার ওপর ?' আমি শুধাই : 'কালী দুর্গা না লিখে তোর নাম লিখে রেখেছি বলে ?'

সে কোনো জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

একটা অদ্ভুত নীরবতা যেন দেখা দেয় অকস্মাৎ।

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে আমি স্তব্ধতাটা ভাঙি—'দেখি তো তোমার ইংরেজী হাতের লেখা কেমন ? লেখো তো।'

আমার খাতায় আমারই কপিং পেনসিলটা দিয়ে সে লেখে—ইউ আর এ ভেরী গুড্ বয়।

'বাংলা লেখা দেখি এবার।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দেয়।

লিখে সে তার বড় বড় চোখ মেলে তাকায় আমার দিকে। আমিও তাকিয়ে থাকি।

চুপ করে তাকিয়ে থাকি পরস্পর অনেকক্ষণ।

আমার কপিং পেন্‌সিলটা তার মুঠোর মধ্যে তখনো।

'আমার পেনসিলটা তোকে প্রেজেন্ট দিলাম। ফর এভার।'

সে কিছু না বলে পেনসিলটা মুঠোয় করে চলে গেল তারপরে।

একদিন বিকেলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার দেখা না পেয়ে তার বাড়িতে তাকে ডাকতে গেছি। দেখি তার মা তখন প্রকাণ্ড একখানা তোয়ালেয় দেহ জড়িয়ে কুয়ো তলায় বিকেলের গা ধোয়ায় লেগেছেন।

'রিনি নেই মাসিমা ?'

'কোথায় যেন বেড়াতে গেল তার দাদার সঙ্গে। নানু-টানু সবাই গেছে। তোমাদের ইস্কুলে কী ফাংশন হচ্ছে না আজ? ম্যাজিক না কী হচ্ছে যে বলল। তুমি যাওনি যে ? যাওনি কেন?'

রিনিকে নিয়ে একসঙ্গে মাঠঘাট চষে বেড়ানোর যে ম্যাজিক আমি রোজ দেখি তার কাছে কোনো ভেল্‌কিই কিছু নয়। কিন্তু সে কথা কি বলা যায়!

'এমনি যাইনি। ওকে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। নানুদের সঙ্গে চলে গেল ?' আমার গলায় দুঃখের সুর বেজে উঠল বুঝি।

'ও বোধ হয় ভেবেছে ওখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।...'

'আমি তাহলে যাই মাসিমা।'

'যাবে কেন ? বোসো না। উনিও বাড়ি নেই, কোথায় রুগী দেখতে বেরিয়েছেন গাঁয়ে। বোসো ঐখেনে। নাইতে নাইতে গল্প করা যাবে তোমার সঙ্গে।'

শিশি থেকে নিজের মাথায় তেলের মতন কী একটা জিনিস তিনি ঢাললেন ভিজে চুলের ওপর—'এখানে বসে বসেই একটা ম্যাজিক দ্যাখো। কেমন ? এই দ্যাখো না—এই তেলটা মাথায় দিলাম তো। দেখছো তো তেল ? দেখতে না দেখতে এক্ষুনি সাবান বানিয়ে দিচ্ছি এটাকে—মন্ত্রের চোটে—চেয়ে দ্যাখো তুমি।'

ওমা! সত্যিই তো! মাথায় একটুখানি ঘষতে না ঘষতেই সেটা সাবানের ফেনায় ফেনায় বদলে গেল—অবাক কাণ্ড! বিস্ময়ে থই পাই না।

'একে বলে শাম্‌পু। শুনেছ এর নাম ?' 'না তো!'

'মাথায় সাবান দিলে—তার ভেতরে ক্ষার আছে তো ? তার জন্যে চুল উঠে যায়। শাম্‌পু দিতে হয়। তুমি মাখবে ?'

'না।' ঘাড় নাড়ি আমি। —'কি হবে মেখে ?'

'মাথা হালকা হবে। চুল পরিষ্কার থাকবে। খুস্‌কি-টুস্‌কি হবে না মাথায়।'

'আমার নেই ওসব।'

'হতে কতক্ষণ। যা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা চুল তোমার। ছাঁটো না কেন ? ছাঁটবে।

'আচ্ছা।' ঘাড় নাড়লাম আবার।

মাথার শাম্‌পুর পর তিনি মুখে সাবান মাখলেন, তারপরে বললেন আমায়—'পিঠের দিকটায় মাখিয়ে দাও তো আমার।'

সাবানটা নিয়ে আমি তাঁর পিঠে মাখাতে লাগলাম।

'ভালো করে মাখাও।'

আমি জোরে জোরে ঘষতে লাগলাম।

'এবার এদিকটায়।'

'আমি ইতস্তত করছি দেখে তিনি বুকের দিকে তোয়ালেটা সরিয়ে দিলেন 'এবার।'

তবু আমি হাত বাড়াই না দেখে তিনি একটু হেসে বললেন—'তোমার মনে পাপ ঢুকেছে দেখছি।'

পাপের কথায় রাগ হয়ে গেল আমার। আমি চোখ কান বুজে জোরে জোরে সাবান ঘষতে লাগলাম।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন তারপর। 'পায়ে মাখাও এবার।'

মাখাতে লাগলাম। কী সুন্দর সুগঠিত পা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার মতই। বাবা বলতেন, দেবীর স্তবে পা থেকে বন্দনা শুরু করতে হয়। সরস্বতীর বেলায় কে যেন তা করেনি, তাই তাঁর কোপে সে নাকি গাধা বনে গেছল। আমি তার মর্মটা তখন বুঝতে পারি।

'এ কী! থামছ কেন? ওপর পর্যন্ত মাখাও। থেমে যাচ্ছ যে?'

আমি তখন ওঁর কোমর অব্দি সাবান মাখাতে লাগি। হাঁটুর ওপরে আরো কী সুষমার রহস্য রয়েছে দেখার কৌতূহল যে না জেগেছিল তা নয়। তবুও কেমন একটা বাধ বাধ ঠেকছিল বইকি।

'আরো ওপরে। আরো।'

'আরো উপরে মাখাতে গিয়ে তাঁর পরনের তোয়ালে খসে পড়ে। তিনি মোটেই সামলাতে যান না।

আমি ঘাড় হেঁট করে থাকি।

'থামলে কেন? মাখাবে তো।'

ঘাড় গুঁজে ঘষতে থাকি সাবান।

'সব জায়গায় লাগছে না যে। বাদ দিয়ে যাচ্ছ তুমি।'

তারপর আমি আর কোন বাদবিসংবাদ রাখি না। ঘাড় হেঁট করে চালিয়ে যাই।

'মাথা নীচু করে কেন? কোথায় মাখাচ্ছ দেখছ না? তাকাও ওপরে।'

নিজেই তিনি দু' হাত দিয়ে মাথাটা আমার তুলে ধরেন। প্রাণপণে আমি সাবান মাখাই। সামনে পিছনে সব জায়গাতেই।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন তারপর—'পা থেকে গলা অবধি বেশ করে রগড়ে দাও তো দেখি। ময়লা কেটে যাক।'

রগড়াই বেশ করে। তলার থেকে গলা পর্যন্ত। দেবীর বন্দনায় কোনো অংশই বাদ যায় না।

ক্রমশই ভালো লাগতে থাকে।

'এবার কুয়োর থেকে বালতি বালতি জল তুলে ঢালতে পারবে? কুয়োর ভেতরে পড়ে যাবে না তো তুলতে গিয়ে।'

'পড়ব কেন? এসব কাজ আমি খুব পারি।' হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দি।

কয়েক বালতি ঢালার পর তিনি শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বলেন—'এসো এবার সাবান মাখিয়ে তোমার গা ধুইয়ে দি বেশ ভাল করে। কেমন? জামা কাপড় খুলে

রাখো ঐখানটায়।'

'না।'

'না কেন ? গা ধোও না বিকেলে ?'

'না।'

'বিকেলেই তো নাইবার আরাম গো ! নাও, জামা-টামা খোলো। খুলে রাখো ঐখেনে। একী, লজ্জা করছে নাকি খালি গা হতে ?'

'না।'

'আমি এত বড় মেয়ে খালি গা হয়ে নাইতে পারলাম আর তুমি এইটুকু ছেলে—তোমার লজ্জা ! এসো, লজ্জা কিসের ? বেশ ভালো লাগবে তোমার।'

'না।'

তখন তিনি গাটা মুছে শুকনো কাপড় পরতে লেগেছেন।

'আমি এবার যাই মাসিমা !...দেখি গে, কী হচ্ছে ইস্কুলে।'

'আচ্ছা এসো।' তারপর কী ভেবে বললেন ফের—'কাল বিকেলে এসো আবার। কেমন ?'

তারপর রিনিদের বাড়ি যাইনি আমি। কোনো বিকেলেই যাইনি আর। ওর মা'র নাইবার সময় কখনই না।

বাধ-বাধ ঠেকত বলে যে, তা না। তাঁর দেহসুষমায় অভিভূত হলেও আমি তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ করতাম না। কেমন যেন লাগত আমার।

সেই বয়সেই নগ্ন নারীদেহের মাধুরী দেখেছিলাম অনেক। আমাদের বাড়িতে বিলিতি আর্টিস্টের আঁকা রঙীন ছবির অ্যালবাম ছিল বাবার—আমি দেখতাম। লুকিয়ে নয়, খোলাখুলিই। কোনো বাধা ছিল না। মা বাবা কিছু বলতেন না সেজন্যে। ভালোই লাগত দেখতে।

আমাদের বাড়ি ভারতী, সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতবর্ষ আর মাসিক বসুমতি আসত। তার কোন কোনটায় বাঙালী মেয়ের নগ্ন দেহ দেখা যেত মাঝে মাঝে। শিল্পী টমাস, হেমেন মজুমদার আর ভবানী লাহার আঁকা সিক্তবসনা রূপসীদের দিকে আমি অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেছি।

তবে পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর রূপলাবণ্য হাতে হাতে পরখ করে দেখা আমার সেই প্রথম। সেই অল্প বয়সেই সৌন্দর্যবোধের শিক্ষাও আমার হয়ে গেছল।

তারপর রিনিদের বাড়ি আর না গেলেও সে-ই আসত আমার কাছে। বিকেলে বেড়ানোর বেলায় তো বটেই, অন্য সময়েও কোনো দরকার পড়লে চলে আসত সে।

তবে যেতে হলো আমায় তাদের বাড়ি সাত-সকালেই একদিন হঠাৎ।

বাবা ক'দিনের জন্যে কলকাতায় গেছলেন কী কাজে, ফিরেছিলেন আগের দিন রাত্তিরে। অনেক রাত তখন, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমরা।

কলকাতা থেকে নতুন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে এসেছিলেন বাবা আমাদের জন্যে। মা খুব ভালোবাসতেন নলেন গুড়ের সন্দেশ খেতে। কলকাতার মেয়েতো।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুতেই না, মা দুটো বড়ো বড়ো তালশাঁস সন্দেশ খেতে দিলেন আমায়। অমনি আমি সেই সন্দেশ হাতে করে ছুটেছি ওদের বাড়ি। রিনিকে ভাগ না দিয়ে খাওয়া যায় ?

ওরা ভাইবোন মিলে তখন গুলতানি করছিল ওদের পড়ার ঘরে, আমি গিয়ে হাতের মুঠো খুলে রিনিকে দেখালাম—দ্যাখ, কি এনেছি তোর জন্যে।

তখুনি সে আমার হাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিয়েছে। দুটো সন্দেশই এক সঙ্গে।

'ও মা! আমি যে একদম খাইনি রে এখনো।'

বলতেই না, সে মুখ থেকে বার করে আমার হাতে নয়, পাখি-মা তার ছানাকে যেমন করে খাওয়ায়, তেমনি করে তার মুখের গ্রাসের খানিকটা আমার মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে। মুখের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে।

সেই প্রথম চুমো পাওয়া আমার জীবনে। সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে চুমু খাওয়া সেই! প্রথম অমৃত আস্বাদের জন্যে রিনির কাছে আমি চিরঋণী।

প্রথম চুমু অমন করে সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে পেয়েছিলাম বলেই কি ওই চুমু জিনিসটা এমন মিষ্টি থেকে গেল আমার কাছে চিরদিনই?

নাকি, চুমোর সঙ্গে মাখানো ছিল বলেই কি যতো মেঠাই এমন মিঠে লাগে আমার কাছে?

তাই কি আমি এমন সৃষ্টিছাড়া মিষ্টিখোর হয়ে গেলাম জন্মের মতই? কে জানে!

॥ আট ॥

সেদিন আমি ছাদেই ছিলাম বিকেলে। একটু বাদে রিনি এল।

'কী। বেড়াতে বেরুবে না আজ?'

'না। ছাদে বসে বসে আজ কাঞ্চনজংঘা দেখব।'

'এখানে বসে কাঞ্চনজংঘা দেখা যায়?' হাসল সে।

'হ্যাঁ, উত্তরের আকাশ পরিষ্কার থাকলে। আজ তাই আছে। সূর্যের আলো একটু কমে এলেই কাঞ্চনজংঘার ছটা দেখা দেবে। পাহাড়ের শৃঙ্গগুলো সারি সারি এমন সুন্দর দেখায়—সারা উত্তর দিকটা জুড়ে কি বিরাট সমারোহ! বোস না আমার পাশে; দেখতে পাবি। দেখাব তোকে।'

সে বসল বেশ কৌতূহল নিয়ে।

'চিড়ে গুড় নিয়ে আসি গে? খাওয়া যাবে।'

'ও জিনিস কি ঘরে বসে বসে খাবার? বেড়াতে বেড়াতে খায়।'

'বেশ তো, বেড়িয়ে বেড়িয়েই খাওয়া যাক।'

'বেড়াবে কোথায়?'

'কেন, এই ছাদেই। কত বড় ছাদটা দেখেছিস। আমি রোজ সকালে উঠে এইখানেই বেড়াই তো। আমাদের এধার থেকে তোদের ওধার অব্দি বার আষ্টেক পাক খেলেই আধ মাইলটাক মর্নিং ওয়াক হয়ে যায়। এই ছাদেই। তুইও আসিস না তখন! বেড়িয়ে বেড়িয়ে পড়াও যাবে—পড়াও তৈরি হয় বেশ।'

'কি করে আসব বলো? আমাদের দিক থেকে ছাদে ওঠার কোন সিঁড়ি নেই যে!'

'একটা বাঁশের মই বানিয়ে দিতে পারি তোদের দিকে—মই বেয়ে তুই উঠতে পারবি?'

সে কথার জবাব না দিয়ে সে বললে—'কোথায় তোমার কাঞ্চনজংঘা? দেখাবে বললে যে!'

'দাঁড়া না, দেখবি। বোস না।'

'বসেই তো আছি। না, কাঞ্চনজঙ্ঘা আর দেখা দেবে না আজ। কেমন ধোঁয়াটে কুয়াশার মতন দেখছি যেন উত্তর দিকটা।'

'না দেখা দিক। তুই তো দেখা দিয়েছিস! তোকেই না হয় দেখব আজ। ভালো করে দেখব আরো।'

'দেখছই তো। আবার কী দেখবে আমায়!'

'এ দেখা নয়, ভালো করে দেখব তোকে। আমার সামনে খালি গা হবি?'

'দূর! তা আবার কেউ হয় নাকি?'

'সুন্দর মেয়েরা হয়। আর্টিস্টের সামনে হয়ে থাকে। দেখে দেখে তাদের ছবি আঁকে যে তারা। এমন সব খালি গায়ে মেয়েদের ছবি তোকে আমি দেখাতে পারি। বিলিতি অ্যালবামে আছে।'

'ও! সেই বিলেতেই হয়, এদেশে নয়।' সে বলে।

'এদেশেও হয়েছে। এদেশের আর্টিস্টরা ছবি এঁকে চিরদিনের মত ধরে রেখেছে তাদের। দেখতে চাস্?'

'না। দেখে কী হবে? দেখবার কী আছে ওতে?'

'দেখতে সুন্দর! দেখতে চমৎকার! দেখলে আনন্দ হয়। এই। আবার কী!' আমি বলি—'তোকেও সেই রকমটি আমি দেখতে চাই।'

'দেখে কী করবে! তুমি তো আর আঁকতে পারবে না।'

'মনের মধ্যে এঁকে নেব—চিরকালের মতই।'

'দেখছ তো! অনেকখানিই দেখছ! মুখ দেখতে পাচ্ছ—কতটা পা দেখতে পাচ্ছ দ্যাখো। এই তো! এতখানি ফ্রকটা তুললাম...দ্যাখো না!'

'না আমি সবটা দেখতে চাই।'

'সবটাই তো দেখছ। আবার কী আছে দেখবার?'

'আরো সব।' আমি বললাম—তুই দেখতে সুন্দর না? দেখতে ইচ্ছে করে না আমার?'

'আর কোনো মেয়েকে তুমি দেখেছ এমন খালি গায়ে?'

'আবার কে আছে দেখবার?' আমি বলি, 'আবার কে সুন্দর আছে এখানে?'

'কেন, আমার দিদি! সে তো আমার চেয়ে অনেক সুন্দর।'

'মোটেই না। আমার কাছে নয়, আমার কাছে তুই-ই কেবল সুন্দর, তোকেই দেখতে চাই।'

'আমি যদি খালি গা হই তুমি দিদিকে বলে দেবে না তো?'

'পাগল! তা কি কেউ কাউকে বলে নাকি!'

সে চুপ করে থাকে, কী যেন ভাবে।

'ছাদে কেউ এসে পড়বে না তো হঠাৎ?'

'কে আসবে?'

'মাসিমা, কি তোমার ভাই?'

'মা তো জলখাবারের লুচি ভাজছেন এখন। আর সত্য? সে এখন নানুর সঙ্গে মার্বেল খেলছে উঠোনে।'

'তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না তো? ছোঁবে না তো আমায়?'

'কক্ষনো না। তুই সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকিস। খালি এক মিনিটের জন্যে কেবল। খুলবি আর পরবি।'

সে ফ্রকটা খোলে। খুলে একটুখানি হাসে—'হলো তো এবার?'

'বারে! কোথায় হলো?'

'তখন সে ইজেরটাও খুলল আস্তে আস্তে।

'কয়েক মুহূর্ত না হতেই লাজুক চোখে তাকিয়ে বলল—'পরি এবার?'

'পর। সত্যি, তুই ভারী সুন্দর। তোর মতন সুন্দর মেয়ে আর হয় না। আমি তো কখনো দেখিনি।'

'কটা মেয়ে তুমি দেখেছ!' সে হেসে বলে—'জীবনে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে দেখতে পাবে। আমার চেয়েও ঢের ঢের।...তখন তো ভুলে যাবে আমাকে।'

'কক্ষনো না। আর কোনো সুন্দর মেয়েকে আমি দেখব না। দেখতেই চাইনে আমি। তুই-ই আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর। তুই একমাত্র।'

ফ্রক-টক পরে সে এক দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল আবার।

'কোথায় গেছেলিস?'

'দোতলায়। বাথরুমে।'

তারপর সে আপনার থেকেই ফ্রক খুলল, ইজেরটা খুলে ফেলল আবার, না সাধতেই। আপনমনেই নাচতে শুরু করে দিল তারপর।

ছাদময় ঘুরে ঘুরে নাচল।

'তুই এমন নাচতে শিখলি কোত্থেকে রে?'

'শান্তিনিকেতন থেকে। মা'র সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেখানে। থেকেছিলাম দিন কয়েক। দেখে দেখে শিখেছি। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা নাচে সবাই।'

'তাই নাকি?' আমি বললাম, 'বাঃ বেশ তো!'

'আর মেমরা কেমনতর নাচে জানো? ঠ্যাং তুলে তুলে এমনিধারা। কলকাতার সিনেমায় দেখেছি।' কেন যে তার অমন ফুর্তি জাগল হঠাৎ কে জানে, ছাদময় খানিক ছুটোছুটি করে কার্নিশের ধার ঘেঁষে এমন করে সে দৌড়ে এল এক পাক যে, আমার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল হঠাৎ—আটপকা নীচে পড়ে যেত যদি?

দৌড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে কোলের ওপর বসে পড়ল সে। আমার মুখের মধ্যে তার মুখ গুঁজে রাখল।

'তোর এত ফুর্তি যে হঠাৎ!' আমি শুধাই—'কেন রে?'

'এমনিই।' তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে—'ভালো লাগল নাচতে তাই।'

'গান গাইতে পারিস নাকি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়ল সে—'গাইব?' বলে গুন গুন সুরে শুরু করল সে—'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে—' একটুখানি গেয়েই চুপ। বসে রইল চুপটি করে।

'একদিন তোর পা থেকে মাথা অব্দি আমি চুমু খাব—বুঝলি?'

'খেয়ো।'

'হাজার হাজার।'

'আচ্ছা। কিন্তু পা থেকে কেন? পা কি চুমু খাবার জায়গা নাকি?'

'দেবতাদের পাদবন্দনা করে আরম্ভ করতে হয় কিনা ?'

'আমি দেবতা নাকি ?'

'আমার কাছে তো !'

'আমিও তোমার পায়ে খাব তাহলে।'

'না। তা আমি খেতে দেবো না।' একটুখানি থেমে বলি, 'ছেলেরা কেউ দেবতার মতন হলেও তাদের পাদবন্দনা করে শুরু করার নিয়ম নেই। তাদের মুখে খেলেই হয়।'

'খাবে পায়ে ?' সে তার ডান পা-খানা তুলল একটুখানি। পাখির ডানার মত !'

আমি আলতো হাতে ধরে তার পায়ের পাতার ওপরে আমার চুমু রাখলাম।

তারপর কী হল যে, সে কান্নায় ভেঙে পড়ল কেন কে জানে ! কোলের উপর বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

'কী হল রে তোর ? কাঁদছিস কেন ?'

কিছুতেই সে ঠাণ্ডা হয় না। কত আদর করলাম, ঠোঁট দিয়ে চোখ মুখ মুছিয়ে দিলাম ওর—তবুও না।

একটু বাদে কান্না থামলে সে চোখ তুলে তাকালো উত্তর আকাশে—'দেখা গেছল কাঞ্চনজংঘা ? দেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'আমি দেখতে পেলাম না।' দুঃখের সুর বাজল তার স্বরে—'দেখলে তো বললে না যে আমায় ?'

'আকাশে দেখিনি। এই ছাদেই দেখেছি কাঞ্চনজংঘা !...' আমি বলি—'এখনো দেখছি।'

অবাক চোখে তাকায় সে আমার দিকে—'এখনো দেখছ ?'

'আমি বলি : 'কাঞ্চনজংঘার ছটা এখানে বসেই দেখছি এখন। এই তো !'

'দুষ্টু !' লাজুক মুখে একটুখানি আদর করে উঠে পড়ল সে কোলের থেকে। ফ্রক-টক পরে মধুর হেসে চলে গেল তারপরে।

তারপরেও আমি বসে রইলাম অনেকক্ষণ সেই ছাদেই। অন্ধকার নামল, তারা উঠল। সারা আকাশ যেন তারায় তারায় রিনি রিনি করতে লগল।

বিকেলে কিছু খাইনি তো, খিদে পেয়েছিল বেশ। লুচি আর বেগুন ভাজার গন্ধ আসছিল রান্নাঘর থেকে। ভাবলাম মা'র রান্নার একটুখানি বউনি করা যাক গিয়ে !

বউ নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল মা আর মাসিমার মধ্যে। দোর গোড়াতেই থমকে দাঁড়াতে হল।

'আসছে মাসেই দিদি আমরা চলে যাচ্ছি এখেন থেকে।' বলছিলেন রিনির মা।

'কেন দিদি, এখানকার জলহাওয়া কি সইছে না তোমাদের ?' মা বললেন।

'তা নয়।' মেয়েদের পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না। কোনো মেয়ে-ইস্কুল নেই এখেনে। এখনকার কালে মুখ্যু মেয়ে কি বিয়ের বাজারে চলে দিদি ?'

ইস্কুলের কোনো মাস্টারকে প্রাইভেট টিউটর রেখে দাও না কেন ! বাড়িতে এসে পড়িয়ে যাবে মেয়েদের, ফাইনালের জন্যে তৈরি হোক বাড়ি বসে। তারপর কলকাতায় গিয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেবে'খন।' তারপর মা অনুযোগ করলেন আবার : 'আর তাছাড়া, তোমার মেয়েরা তো দেখতে ভালোই। তেমন কিছু লেখাপড়া না জানলেও বেশ ভালো ঘরে বিয়ে হবে দেখো।'

'সেই বিয়ের কথাটাই ভাবছি দিদি। মেয়েরা সব ডাগর হয়েছে। নানু তো বলতে গেলে বিয়ের যুগ্যিই, ষোলো পেরুলো। তার ছোটটাও পনেরয় পড়েছে, রিনিও চোদ্দয় পা দিল। কলকাতায় আমাদের বাড়িঘর ইস্টিকুটুম সবাই—এখানে বসে কি বিয়ের সম্বন্ধ করা যাবে।'

এটা ভাবনার বিষয় ছিল বোধহয়, কেননা মাকেও একটু ভাবিত দেখা গেল। —'তা বটে। নানুর বিয়েটা দিতেই হবে এবার। কিন্তু তোমার এই মেজো মেয়েটিকে আমার পছন্দ, ভারী ঠাণ্ডা মেয়েটি। বেশ লক্ষ্মীশ্রী।...'

মেজো মেয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই, মায়ের পাশটিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। কথাটায় মাথা নীচু করল দেখলাম।

মা তার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন—'বেশ মেয়েটি। রামের সঙ্গে বেশ মানাবে। এটিকে তুমি দেবে আমায় ?'

'তা নিয়ো না হয়। কিন্তু রামের প্রায় সমবয়সী হবে না ? অবশ্যি আজকাল কেউ বয়স নিয়ে মাথা ঘামায় না আর। জাত কুল নিয়েই বাছ-বিচার করে না শুনছি।'

'তা তোমরা কি আসছে মাসেই যাচ্ছ তাহলে ? সব ঠিক ?'

'প্রায় ঠিক। কর্তা এক মাসের নোটিশ দিয়েছেন—এখান থেকে এখন ছাড়ান পেলেই হয়। কর্তা এর পরে বাড়ি বসে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক করেছেন। তোমরা কলকাতায় কখনো এলে আমাদের বাড়ি এসো কিন্তু দিদি ?'

'হ্যাঁ, একবার তো যেতেই হবে কলকাতায়—এই হাতের মানতটা ছাড়াতে হবে আমাকে।'

'আচ্ছা আসি দিদি, হ্যাঁ, যেজন্যে এসেছিলাম—কাল সকালে দশটার মধ্যে রাম ও সত্যকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো মনে করে, কেমন ?'

'কেন দিদি ?'

'কাল ভাইফোঁটার দিন না ? আহা, ওদের কোনো বোন নেই, কী দুঃখু! নিজের দাদার সঙ্গে ওদেরকেও ফোঁটা দেবে মেয়েরা। ভাই-ই তো ওরা।'

'আচ্ছা, দেবো পাঠিয়ে।' হাসিমুখে মা বললেন।

আমাদের রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরটাই ছিল দু' তরফের সীমান্ত প্রদেশ।

মাঝখানের একটা দরজার খিল খুলে যাতায়াত করা যেত। দু' বাড়ির গিন্নিরাই ঐ পথে যেতেন আসতেন—আমরা ও-পথ কোনোদিন ব্যবহার করতাম না।

রান্নাঘর দিয়ে রিনির মা সেই পথেই চলে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম আকাশ-পাতাল।

মেজোটার সঙ্গে বিয়ে কেন ? রিনির সঙ্গে হলে কী হয় ? কেন, রিনির সঙ্গে কি হতে পারে না আমার বিয়ে ? সে তো বয়সে ছোটই আমার চেয়ে...ওর মেজদির চেয়ে কি খুব খারাপ মানাবে তাহলে ?

না, মেজোকে কোনোদিন আমার চোখে লাগেনি। মনেও লাগেনি কোনোদিন। ওর সঙ্গে বিয়ে কী! ধ্যুৎ!

করলে আমি রিনিকেই বিয়ে করব। সুবিধে মত মাকে বলতে হবে একদিন. ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম থেকে তুলে খাওয়াতে হয়েছে আমায়। -'কিরে, তোর পড়াশুনা কিছু নেই আজ ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটালি সন্ধ্যে বেলাটা। দেখি গা-টা...গা তো গরম হয়নি, ভালোই আছিস

তো, ঘুমুচ্ছিলি কেন তবে ?'

'এমনি। ভালো লাগছিল না।'

'নে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় তাহলে। নটা বাজে প্রায়...'

খেয়েদেয়ে নটায় শুয়ে উঠলাম পরদিন সকাল নটায়। শুনলাম সত্য কখন গিয়ে ফোঁটা নিয়ে ফিরে এসেছে। ঘুমুচ্ছিলুম বলে আমাকে তোলা হয়নি। মুখ ধুয়েই চলে গেলাম সটান।

দেখলাম, আসন পাতা। আসনের সামনে পায়েস পিঠে সন্দেশ সব সাজানো। ধান দূর্বা, চন্দন সব তৈরি।

তার আগে জীবনে কোনো বোনের ফোঁটা পাইনি। বেশ লাগছিল কিন্তু, সত্য-টত্য সবার ফোঁটা হয়ে গেছে আগেভাগেই। আমার বাকী কেবল।

প্রথমে নানু আমায় ফোঁটা দিল কোনোরকমে মন্তর আউড়ে। ওর মা বললেন, 'রামকে একটু আদর কর। রাম তোর ছোট না ? ছোট ভাইয়ের মতই।'

'আদর আবার কী !' বলে সে আলতো হাতের এক চাপড় বসিয়ে দিল আমার ঘাড়ে 'এই তো আদর।'

তারপর মেজোর পালা। না, সে ফোঁটা দেবে না কিছুতেই, কাল আমার মা কী বলেছেন না ? সেইজন্যেই।'

'রিনি, তোর রামদাকে ফোঁটা দে এবার।' বললেন মাসিমা।

রিনি, ফোঁটা দিল তার পর। বেশ স্পষ্ট করে মন্তরটা পড়ল—যমের দুয়োরে কাঁটা দেওয়া পর্যন্ত বাদ দিল না কিছুই। ফোঁটা দিয়ে আমার পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল তার পর।

জীবনে সেই প্রথম আমি প্রণাম পেলাম একজনের। বেশ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সত্যিই— যেমন রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম পরে আরেকবার—যেবার আমার উত্তর কৈশোরে একজন প্রায়-যুবকের কাছ থেকে 'আপনি' বলে সম্বোধিত হতে শুনেছিলাম। কিন্তু ওটা যেন তার চেয়েও আরো বেশি মিষ্টি—আপনির চেয়েও আরও যেন আপনার।

ভাবছিলাম, মাসিমা ওকেও হয়ত একটু আদর করতে বলবেন আমাকে। কেন জানি না, তা বললেন না কিন্তু। পাছে সে আমার অন্য ঘাড়ে আরেক থাপ্পড় ঝাড়ে সেই ভয়েই হয়ত বা।

কিন্তু আমি জানি, বললে পরে সেদিনকার সেই সন্দেশ খাওয়ানোর মতই সে করে বসত আবার—সবার সামনেই।

যাক্, আদর না পাই, দাদার প্রাপ্য প্রণাম পেয়েছি তো !

॥ নয় ॥

আমার জীবনে তুই একমাত্র মেয়ে। তুই প্রথম আর তুই-ই শেষ। তোকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে আমি জানি না, জানতে চাই না।'

সেদিন ছাদের বুকে বসে কিশোরী রিনিকে বুকের কাছাকাছি পেয়ে কিশোর আমার একথা বলতে এতটুকু বাধেনি। উপন্যাসের নায়কের মতই উপস্থিত কথায় তুখোড় হয়ে উঠেছিলাম আমি সেই এঁচোড় বয়সেই—অল্প বয়েস থেকে উপন্যাস পড়ে পড়েই হয়ত আমার এই উপযুক্ত হওয়া। কিংবা হয়ত ভালোবাসায় পড়লে সহজেই এমন সব উপলব্ধি ঘটে, যাতে মজবুত কথার যুতসই জবাব যতো মুখের ওপর আপনার থেকেই এসে যায়।

খুব ছোটর থেকে নভেল পড়ে পড়ে পেকে উঠেছিলাম। প্রায় কায়মনোবাক্যে পরিপক্ক। কায়ের দিক থেকে ততটা হয়ত না হলেও মনোবাক্যে তো বটেই। পাকা পাকা কথা কইতে পারতাম বেশ।

আর মেয়েদের তো এমনিতেই কথার বাঁধুনি। স্বভাবতই তারা নভেলটি—সর্বদাই। কোনো রোমান্স কাহিনী না পড়েও তারা রোমান্টিক। আজন্ম নায়িকা। মুহুর্মুহু রোমাঞ্চকর।

তাই সহজেই সে বলতে পেরেছিল, এই তো তোমার জীবনের শুরু গো! আমার পরেও আরও কত মেয়ে পাবে, কতজনাই তোমার জীবনে আসবে—তখন তুমি অনায়াসেই ভুলে যাবে আমায়। দেখে নিয়ো। এই সামান্য বয়সেই নারীসুলভ অসামান্যতার দুঃস্বাভাবিক নৈপুণ্যে জীবনের এত বড় তত্ত্ব দুকথায় ব্যক্ত করতে একটুও তার বাধেনি।

সটান আমার উপন্যাসপাঠের ভূমিকায় আসতে হয় এবার...

সেকালের সব ছেলের মতন আমারও গ্রাম্য পাঠশালায় বাল্যপাঠ শুরু। এখনকার মতন অলিগলিতে কে জি ইস্কুলের পত্তন হয়নি তখন, গণ্ডগ্রামে তো নয়ই ; গেয়ো পণ্ডিতের আটচালায় গিয়ে লেখাপড়া শিখতে হত সবাইকে।

অবশ্যি, তখনো হাইস্কুল হয়েছিল দেশ পাড়াগাঁয়। চাঁচোরের রানী সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন ছিল কাছেপিঠেই। এবং ইনফ্যান্ট ক্লাসও নিশ্চয়ই ছিল সেখানে, কিন্তু রামনাথ পণ্ডিতের কাছে নামতার পাঠ না নিয়ে এক পা-ও সেখানে এগুনো যেত না। যুগপৎ গলায় আর চোখে ধারাপাত ঘটিয়ে, সমবেত কণ্ঠে শোরগোল করে গড়াগড় আউড়ে গড়াতে গড়াতে তবেই ছিল সেই ধারাবাহিক শিক্ষায়তনের পথে পা বাড়ানো।

প্রথম ভাগের হাতেখড়ি মা'র কাছে হলেও শিক্ষালাভের প্রথম ভাগ্য আমার রামনাথ পণ্ডিতের কাছেই। গ্রামের সেই পাঠশালার পড়ুয়া হয়েই সেকালের প্রায় সবার মতই আমারও পাঠ্যাবস্থার শুরু।

আর, পাঠশালায় যেতে এমন খারাপ লাগত আমার যে...

একটা যাওয়াই ছিল বটে সেটা। রাজোচিত সমারোহে যাওয়া। পালকি চেপে নয়, পালকি সেজে। পালকির মত দুলকি চালে হেলে দুলে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে হট্টগোলের মধ্যে পণ্ডিতমশায়ের আটচালায় আমার প্রবেশলাভ। বলতে গেলে প্রায় প্রত্যহই।

পাঠশালার সময়টা প্রায় প্রতিদিনই খুঁজে পাওয়া দায় ছিল আমাকে। এ ঘরে ও ঘরে, ছাদের ওপরে চিলেকোঠায় কি পায়খানায়, কোথাও আমায় খুঁজে পাওয়া যেত না। শেষটায় পাঠশালার সর্দার পোড়োরা এসে আশ্চর্য অনুসন্ধিৎসায় খাটের তলার থেকে ঠিক খুঁজে বার করতো আমাকে—তারপর সগৌরবে, আমি পায় পায় এগুতে চাইলেও নাছোড়বান্দা তারা আমায় পদস্থ হতে দিত না, অপদস্থ করে সবাই মিলে আমার চার হাত পা পাকড়ে চ্যাং দোলায় দুলিয়ে নিয়ে যেত। অসহায়ভাবে আমতা আমতা করতে করতে ঝুলে ঝুলে যেতে হতো আমায় নামতার ইস্কুলে।

সেই পঠদ্দশার কথা স্মরণে এলে পাঁঠার দশার কথাই মনে পড়ে আমার। মাঠের থেকে বাড়ি ফিরতে অনিচ্ছুক পাঁঠাকে গাঁয়ের চ্যাংড়ারা যেমন করে চার পা ধরে দখিন হাওয়ার মতই দোদুল দোলায় দুলিয়ে নিয়ে যেত, ব্যা-ব্যা- করা সেই পাঁঠার মতই তেমনি হাত পা ছুঁড়ে প্রাত্যহিক দোলযাত্রার মহোৎসবের মধ্য দিয়ে পাঠশালার পৈঠা পেরিয়ে একদা ইস্কুলের আলাদা ব্যাকরণে গিয়ে পড়লাম।

তবে ঐ সিদ্ধেশ্বরী ইস্কুলে সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়ে যেতে কেবল পা ছোঁড়াই নয়, আমার হাত সাফাইও একটু ছিল। তারই সাফল্য আমার হাতে হাতে ফললো।

নামতা ওগড়াতে একদিন একটু গড়বড় করায় পণ্ডিতমশাই কষে কান মলে দিয়েছিলেন। আমিও দ্বিরুক্তি না করে, হাত বাড়িয়ে তক্ষুনি তাঁর কান মলে দিয়েছি। কানের ব্যথার চেয়েও অপমানে আমার বেশি লেগেছিল।

ছিপ্‌খানা নিয়ে আয় তো! হুকুম দিলেন তিনি একটি ছেলেকে।

ছিপ্‌টিহস্তে পণ্ডিতমশায়ের সেই রুদ্রমূর্তি কদাচ আমি ভুলব না। এখনো আমার দুঃস্বপ্নের মধ্যে কখনো কখনো সেই চেহারা ভেসে ওঠে। ছিপ্‌টি দিয়ে অকাতরে ছেলেদের পিঠের ছাল ছাড়াতে কোনোদিন আমি তাঁর কোনো কসুর দেখিনি, কিন্তু কেন জানি না, আমার পিঠকে তাঁর সামনে অনাবৃত পেয়েও পিটতে গিয়ে তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন হঠাৎ।

'না, মারব না আমি তোমায়। তোমার বাবাকে বলে মার খাওয়াবো। রাজবাড়ির ছেলে বলেই তুমি বেঁচে গেলে আজকে। নইলে তোমার পিঠের ছাল আমি ছাড়িয়ে নিতুম। তোমার বাবাও সেইরকম করতে বলে দিয়েছিলেন আমায়।'

হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে বাবা। পাঠশালায় ভর্তি করার সময় বলে দিয়েছিলেন, 'পণ্ডিতমশায়, আমার ছেলের মাংস আপনার, হাড় আমার। আর সব ছেলের মতই বিধিমত আপনি একে পড়াবেন। কোনো কার্পণ্য করবেন না।'

না, কার্পণ্য তিনি করতেন না। ছেলেদের পিঠে ছিপটি প্রয়োগে তাঁর কিপটেপনা কখনো আমি দেখিনি, আগাপাশতলা পিটিয়ে রক্ত বার করে ছাড়তেন। পণ্ডিত হলে রামনাথ মাত্রই বুনো হয় কি না কে জানে, কিন্তু পণ্ডিতের মধ্যে বন্যতায় তিনি ছিলেন অনন্য।

তবুও আমার বেলায় তাঁর এই অন্যথার মূলে বোধ হয় আমাদের সেই পুরনো পোড়ো বাড়িটা। সেই ভাঙ্গা রাজবাড়িটাই বদাচরণের বদলে তাঁর এই বদান্যতার কারণ হয়েছিল, নইলে বাবার কথাই ছিল তাই, পণ্ডিতমশাই যা বলেছেন, আমার মাংস তাঁর আর হাড় আমার বাবার। মানে, বিদ্যালাভের খাতিরে মারের চোটে আমার দেহের চামড়া খানিকটা ছিঁড়ে গেলেও ক্ষতি নেই, মাংস যায় যাক্, নামমাত্র হাড় ক'খানা বজায় রেখে প্রাণে প্রাণে নিজের ছেলেকে ফিরে পেলেই তিনি খুশী।

শেলেট্ বই সেখানেই ফেলে দিয়ে হাড়ে হাড়ে শিক্ষা নিয়ে, কিংবা না নিয়েই, আমি ফিরলাম।

আর কখনো আমায় যেতে হয়নি সেই পাঠশালায়।

আমার ভাইকেও আর পা বাড়াতে হয়নি সে পথে।

সেদিনকার কুরুক্ষেত্রে আমার কর্ণবধের পর্ব পণ্ডিতমশায়ের কাছে শুনেও বাবা কিছু বলেননি আমায়। বাড়িতেও তুলকালাম কিছু হয়নি। মা বলেছিলেন, পাঠশালায় গিয়ে আর কাজ নেই ওদের। আমার কাছেই পড়বে ওরা। ভারী তো পড়ানো।

বাবাও সায় দিয়েছিলেন তাঁর কথায়—'বেশ, তোর মা'র কাছেই পড়বি তোরা দু' ভাই এবার থেকে—বাড়িতেই তোদের ইস্কুল।'

ভালোই হলো আমার। এতদিনের যেন অকূল জ্ঞানসমুদ্রের কিনারা পেলাম। পড়াশোনার ইস্কুল পেলাম বাড়িতেই।

জীবদ্দশার প্রথম ভাগটাই পঠদ্দশা। অবশ্য, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, কখনো হাতী

কথনো মশা হয়ে মানুষের দশ দশার মধ্যে শিক্ষণীয় দিকটা তো থাকেই। যেমন প্রথম ভাগেরই হাতে খড়ি হয়েছিল মা'র কাছেই—দ্বিতীয় ভাগ্যও খুলল আমার মা'র হাতেই। অ আ ক খ-র অক্ষর পরিচয়ের মতন ফার্স্ট বুকের বর্ণজ্ঞানও পেলাম মা'র কাছে। বি এ ডি ব্যাড, সি এ ডি ক্যাড, ডি এ ডি ড্যাড পেরিয়ে শনৈঃ শনৈঃ ওয়ান মর্‌ন্‌ আই মেট এ লেম ম্যান ইন এ লেন্‌ পর্যন্ত অবলীলায় উতরে গেলাম।

আরো নানান দিকে লেনদেন হতে লাগল। বাড়তে লাগল এলেম। পিতৃদেবের বিপুল পাঠাগারের দিকেও আমার হাত বাড়ালাম ক্রমশ।

সেখানে থরে থরে যত গ্রন্থাবলী সাজানো ছিল—বসুমতী আর হিতবাদী সংস্করণের। আর মরক্কো বাঁধাই হয়ে কত না মাসিকপত্র। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সাধনা ইত্যাদি থেকে শারীরতত্ত্বের স্বাস্থ্য সমাচার, এমনকি শিশুদের পত্রিকা সন্দেশ পর্যন্ত। তাছাড়াও কতো রকমের বই যে! ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডির জীবন-চরিত থেকে রেনল্‌ডসের লন্ডন রহস্যের বঙ্গানুবাদ অব্দি কিছুই বাদ ছিল না।

ছিলো মাসিক সাহিত্য, ভারতী, নব্যভারত। মানসী ও মর্মবাণী, আরো কতো যে পুঁথিপত্তর কী জানি! তন্ত্রমন্ত্রের বই-ই কত না!

সব কিছুই আমার হাতের নাগালে এসে গেল। আর, নাগালে আসতেই না গালে। সন্দেশের মতই গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম—নির্বিচারে, কোনো বাদবিচার না করে। এদিকে বাবা-মা'র কাছ থেকে কোনো বাধা ছিল না।

আরব্য উপন্যাস পারস্য উপন্যাস ছাড়াও আরো কত কী উপ-অনুপ-অপ-কথা ছিল আমাদের বাড়িতে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতও ছিল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যও। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিরাটকায় মহাভারত, তদ্রূপ পেল্লায় আকারের সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুম—কালক্রমে সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর দন্তস্ফুট করেছিলাম—দাঁত বসা[illegible] পারি আর নাই পারি।

সেই সঙ্গে বটতলা বাজারের যত রাজ্যের অপকথার বই। খুনীকে খুন থেকে শুরু করে হরিদাস আর হরিদাসীর গুপ্তকথা। আর কী চমৎকার সব পাঁচকড়ি দে-র গোয়েন্দা কাহিনী আর প্রিয়নাথ দারোগার দপ্তর!

বাবা কালী সিংহীর মহাভারত পড়তে বলতেন বার বার কিন্তু বারংবার প্রয়াসেও সেই বাড়াবাড়ির মধ্যে নাক গলাতে পারিনি। পড়লে বোধ হয় মানুষ হতাম। অথচ মা'র মুখে আরব্য রজনীর কুব্জ দর্জির গল্পটা শুনেই না, না বলতেই আরব্য উপন্যাসের আগাগোড়া পড়ে শেষ করেছি। আরব্য রজনীর থেকে বঙ্কিমের রাজসিংহ, রজনীতে—ধীরে ধীরে হলেও-এগিয়ে গিয়েছি একাদিক্রমে।

প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়েই পড়েছিলাম—বর্ণপরিচয় হতেই না—দেবী চৌধুরানী শুরু করে দিলাম। বঙ্কিমের ওই বইটির প্রথম, আমার মনে আছে বেশ।

তার কারণ আর কিছুই নয়। ঐ সন্দেশ।

বইটার প্রথম লাইনেই, পি-পি-প্রফুল্ল মুখপুড়ি বলে ডেকে নয়ান বউ না কে, তার সতীনের পোড়ারমুখে যখন মিষ্টি গুঁজে দিল, এমন মিঠে লাগল যে গল্পটা। বউয়ের পা টেপার ব্রজ-র সেই পদব্রজের অংশটাও মন্দ লাগেনি। বারবার ঐ পরিচ্ছেদ দুটো পড়া আমার সারা

শৈশবেই। তারপর রাজসিংহ, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ পার হয়ে গেল, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল পাঠ করলাম, কমলাকান্তের দপ্তরও বাদ গেল না। বাবার নির্দেশে কৃষ্ণচরিত্রও পড়ে ফেললাম, মন্দ লাগেনি। আনন্দমঠ পড়ে দস্তুর মতন আনন্দ পেয়েছি। তবে আমার সবচেয়ে মধুর লেগেছে কমলাকান্তের দপ্তর বাদে লোকরহস্য আর মুচিরাম গুড়। এমন মিঠে আর হয় না। প্রায় পাটালি গুড়ের মতই—হ্যাঁ।

আমি তো প্রথম ভাগ খতম করে দ্বিতীয় ভাগের শেষে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী নিয়ে পড়েছিলাম, আমার ভাই সত্য আবার আমার চাইতেও সরেস। সে অক্ষর পরিচয় সেরেই রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী নিয়ে পড়ল, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত থেকে রাজপুত জীবনসন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে গেল তার দেখতে না দেখতেই। তারপরে আমরা দু ভাই পাল্লা দিয়ে বাবার পাঠাগার ফাঁক করতে লাগলাম।

লোকরহস্য থেকে লন্ডনরহস্য হয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যলহরী অব্দি কোনো কিছুরই রহস্যভেদের বাকী রইল না আমার।

যখন আমাদের অক্ষরপরিচয় হয়নি, মা আমাদের সন্দেশের গল্প আর ছড়া পড়ে শোনাতেন। পুরানো সন্দেশের একটি ছড়ায় তিনি হেসে গড়াতেন কতো বার যে। —'ওগো রাঁধুনি, শোনো গো শোনো, তোমায় রান্না বলে দি শোনো।' সুখলতা রাওয়ের লেখাই হবে বোধ করি ছড়াটা—'আস্ত মুড়োটা ভাতে-তে ছেড়েছি, মন্দ হয় নি জেনো'—রাঁধুনীর এই মজাদার জবাবটি পর্যন্ত তিনি হাসতে হাসতে গড়িয়ে যেতেন। ওটা আউড়ে তিনি যেমন মজা পেতেন, শুনে তেমনি আমোদ লাগত আমাদেরও।

আর মজা পেতাম অঙ্গদরায়বারে। মা যখন সুর করে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাতকাণ্ডের সবচেয়ে চমৎকার ঐ ল্যাজের কাণ্ডটি পড়তেন কী ফূর্তিই যে হতো না।

রাবণের রাজ্যে গিয়ে বালীনন্দন অঙ্গদ, রাজসভায় রাজপুত্রের উপযুক্ত অভ্যর্থনা আসন না পেয়ে নিজের লেজের কুণ্ডলী করে পাকিয়ে তার ওপরে বসেছে, তার পরে সেই উচ্চাসনে বসে রাজ্যির রাবণের মুখোমুখি হয়ে কোনটি যে সত্যিকার রাবণ তার ঠাওর পাচ্ছে না, আর রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিতকে তার আসল বাপটিকে চিনিয়ে দেবার জন্য সাধছে—

শোন্ রে ইন্দ্রজিতা,
এত বাপের মধ্যে রে তোর কোন্‌টি আসল পিতা ?...
বলতে পারিস কে যে ?
মোর বাপ তোর কোন বাপেরে বেঁধেছিল লেজে ?

তখন অঙ্গদের তেজস্বিতা আর বালির লেজস্বিতায় আমরা দু ভাই চমৎকৃত হয়ে যেতাম যুগপৎ।

রামায়ণ সন্দেশের ওই ছড়াছড়িতে আকৃষ্ট হয়েই আমরা অক্ষর পরিচয়ের প্রথম পাঠে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম, আর প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ কষ্টেসৃষ্টে পার হয়েই একেবারে বাংলা সাহিত্যের উপাখ্যান ভাগে এগিয়ে গেলাম—বটতলার থেকে শুরু করে বসুমতীর তাবৎ বইয়ের হরিহরছত্রে ভিড়ে বিদ্যাসাগরের বর্ণবোধ ক্রমে নানান বোধের আস্বাদ নিয়ে একদিন বিদ্যাসুন্দরের গভীরে গিয়ে পড়ল। সাগরযাত্রা শেষ হলো মহবোধির-সুন্দর বিদ্যার সাগরসঙ্গমে।

কিন্তু এ-যাত্রা কি কোনোদিন শেষ হবার ?...পালাবদলে পা চালানো বইতো নয়।

॥ দশ ॥

বাবাকে একদিন আমি শুধিয়েছিলাম—এত এত বই যে বাবা ! কেন তুমি এনেছিলে ? এনে এমন করে সাজিয়ে রেখেছিলে কেন ?

তুই আসবি বলে—এসে পড়বি বলেই ! তোদের জন্যেই তো ! বলেছিলেন তিনি ।

কেমন করে তুমি টের পেলে বাবা যে, আমরা আসব ? তখনও তো কেউ আসিনি আমরা ? জানলে তুমি কি করে ?

জানা যায় ।

নির্লিপ্তের ন্যায় এক কথায় সেরে দিয়েছিলেন তিনি ।

কিন্তু এখন আমি জানি তাঁর কথাটা সত্যি কতখানি । সত্যিই জানা যায়—আর কারো না তাঁরই খেলা এসব । অমিয়-চরিত কথায়, যেমন, যিনি মেলাবার তিনিই মেলান, যথাসময়ে যথাযথ মিলিয়ে থাকেন । যা মিলবার আপনার থেকেই অঙ্ক আর কবিতার মতই কেমন করে, কি করে যেন মিলে যায়—অসম্ভব মিলন কাণ্ডের পাণ্ডা সেই তিনিই তো !'

একদা আমার মতন অর্বাচীন এক বালকের সঙ্গে মেলার জন্যেই এই বইয়ের মেলা ! এত মেলাই বই !

তিনি জানতেন, সারা জীবন নিজের লেখার মোট ফেলতে আর মজুরি কুড়োতেই আমার দিনরাত কাটবে, পড়ার ফুরসৎ আর হবে না কোনদিন, লেখাপড়া অদৃষ্টে নেই আমার—তাই কৈশোরকালের এই ফাঁকতালে তাক মাফিক এক-আধটু আমার পড়াশোনার এহেন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ।

মোটামুটি যা কিছু জানবার শেখবার তখনই আমি শিখেছি ও জেনেছি । বাবার ঐসব বই পড়েই ।

পণ্ডিত হবার পক্ষে এমন কিছু না হলেও একজন মেহনতি মজদুরের পক্ষে, আমার ধারণায়, এই যথেষ্ট । এর বেশি পড়াশোনার দরকার করে না ।

মা অবশ্যি বলতেন, বই পড়ে কিছুই জানা যায় না, মন দিয়ে জানতে হয় । চোখে দেখে, পরখ করে তবেই আমরা টের পাই । এর ভেতর ওই মনটাই আসল । মন না দিলে কিছুই ঠিক দেখা যায় না বোঝা যায় না । এমন কি ওই বইও যদি মন দিয়ে না পড়ি তো ওর মর্ম মেলে না আদপেই ।

তবে ছেলেরা যে এত পড়ে-পড়ে পড়ে মুখস্থ করে মনে রাখে, তার মানে কী মা ? আমি শুধিয়েছি । কত বড় বড় লোককেও তো বই মুখে পড়ে থাকতে দেখেছি আমি দিনরাত । পড়ে যায়, খালি পড়ে যায় ।

না বুঝে পড়ার সবটাই বোঝা হয়ে থাকে তাদের মাথায়, বলেছেন মা : কখনই মনের সঙ্গে মিলিয়ে যায় না । জীবনের সঙ্গে মেশে না । জীবনের সঙ্গে মেলে না । সে পড়া শুধু ভার হয়ে থাকে ঘাড়ের ওপর, কাজে লাগানো যায় না কখনো, খাটানো যায় না নিজের জীবনে । যে বিদ্যা জীবন হয়ে ওঠে না, জীবন্ত হয় না, সে আবার কী বিদ্যা রে ?

মার কথার মানে সেদিন আমি বুঝিনি, এখনো যে তার অর্থ ঠিক ঠাওর হয় তা আমি বলতে পারি না । এখন আমার মাঝে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, কেন আমি বিধিমত লেখাপড়া শিখিনি । আমার বন্ধুদের কত কত পড়াশোনা, বিশ্বসাহিত্যের কত অলিগলিতে যাতায়াত, কী না তাঁরা জানেন ? কী না পড়েছেন—কোনো কিছুই তাঁদের অজানা নেই । আর এক কণাও

তার পড়া হয়নি আমার। পৃথিবীর কত মহৎ সৃষ্টি আমার অগোচর অপঠিত থেকে গেল, আমার স্বদেশেরই কি সব জানতে পারলাম! মহাকাব্যের ক'খানা পড়েছি, পুরাতত্ত্বেরই বা কী! বাবার অত অত বলাতেও বাল্মীকি বেদব্যাসের রামায়ণ মহাভারত দুটো আমার পড়া হল না। বিদেশী মহৎ স্রষ্টাদের প্রায় সবাই তো অমনি অচেনা রয়ে গেলেন! বিশ্বের নিত্য নবীন সাহিত্য সৃষ্টির সাথেই বা যোগ রাখলাম কোথায়! সর্বাধুনিক রচনাই বা কী পরিচয় পেলাম। অভয়ঙ্করের বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনা পড়েই আমার যা এই ভয়ঙ্কর বিদ্যে।

অবশ্যি উপেনদা (অগ্নিযুগের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিজলীর সম্পাদন-প্রকাশনায় বিজড়িত) একদিন সান্ত্বনাছলেই বুঝি আমায় বলেছিলেন, বাঁধাধরা লেখাপড়া তেমনটা তুই শিখিসনি যে তা এক পক্ষে ভালোই হয়েছে, শাপে বর হয়ে গেছে তোর। তোর ওপর অপর কারো প্রভাব পড়েনি, পড়তেই পায়নি একদম। তুই যা হবি আপনার থেকেই হবি, যা লিখবি নিজের মনের থেকেই লিখবি। কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের মতন হওয়াই তো ভালো রে! তোর লেখায় আর কারো প্রভাব পড়বে না। অবশ্যি তোর রচনায় কোনো ঐতিহ্যসূত্র থাকবে না তা বটে, তাতে কি! তা না থাকলেও তুই-ই নিজেই একটা ইতিহাস হতে পারিস হয়ত বা!

বাবার পাঠাগারে নানা ধরনের গাদা গাদা বই থাকলেও রবীন্দ্রনাথের রচনা ছিল না একখানাও। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেয়েছিলাম ইস্কুলে ভর্তি হবার পর। বছর কয়েক মা'র কাছে ঘরে বসে পড়ে বাংলা ইংরাজির কিছুটা রপ্ত করে সাহিত্য ব্যাকরণ গ্রামার ট্রানশ্লেশন একটুখানি দুরস্ত হয়ে পরীক্ষা দিয়ে ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম সটান ক্লাস সেভেন-এ। আর আমার ভাই এক ক্লাস নীচেয়। সেইকালে ইস্কুলের লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথের খবর মিলল। আর পেলাম বাংলার সার-এর কাছে। তখন আমার এমন বিস্ময় জাগল, বঙ্গদর্শন থেকে নব্য ভারত, তত্ত্ববোধনী পত্রিকা থেকে সমাজপতির সাহিত্য, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, তা ছাড়া আরো কতো পত্রপত্রিকা, এমন কি গৃহস্থ গম্ভীরা মানসী মর্মবাণী, স্বাস্থ্য সমাচার এত ছিল, কিন্তু বাবার ভাঁড়ারে কবিগুরুর বই ছিল না একখানাও!

রবি ঠাকুরের ওপর কেন জানি না, হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন বাবা।

কবি বলতে তার কাছে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র আর নবীন সেন! তাঁদের কবিতা তাঁর মুখস্থ—আওড়াতেন মুখে মুখে। সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণির থেকে শুরু করে হুর্‌রে হুর্‌রে হুর্‌রে করি গর্জিল ইংরাজ! নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ, পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ। আর, বাজ রে শিঙা বাজ ঘোর রবে/সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে/সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে/ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়! আর সেই সাথে, হেমচন্দ্রের হায় হায়! ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে!

কবিতা তো এই সব! এঁরাই তো কবি। তা নয় তো কী, তোর ঐ রবিঠাকুর! 'আর বকিস না পায়রা কবি, খোপের ভিতর থাক ঢাকা/তোর বক্ বকম্ আর রকম সকম সব কবিত্বের ভাব মাখা। তাও ছাপালি পদ্য হোলো, নগদ মূল্য এক টাকা'!!

কবিকে ঠাট্টা করা কাব্যবিশারদের গালভরা গাঁট্টামারা এই ছড়াটা বেশ ফুর্তি করে তিনি আওড়াতেন।

বাবার উপরোধে মাইকেল, নবীন সেন, হেমচন্দ্রে এক-আধটু হাবুডুবু খেয়েছিলাম।

মাইকেলে হাঁপিয়ে উঠেচি, হেমচন্দ্রে উঠে হাঁপছাড়া গেছে, নবীন সেন মন্দ লাগেনি নেহাত তবে স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস ফেলতে পেরেছি ভারতচন্দ্র পেয়ে। তাঁর কাব্যলোকে পৌঁছে—তাঁর অন্নদামঙ্গল আর বিদ্যাসুন্দরে এসে রস পেয়েছি সেই বয়েসেই। আহা, কী ছন্দ ! কী বাক্যের ছটা ! কী রূপরাগের ঘটা ! একেবারে যেন মাতিয়ে দিয়েছিল।

পুরানো সাধনা, আর স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের রচনার কিছু কিছু স্বাদ পেয়েছিলাম, আর তদানীং কালের প্রবাসীতেও কিছু কিছু—কিন্তু ভূরিভোজ শুরু হোলো সেই ইস্কুলের লাইব্রেরীর নাগাল পেয়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধের বইয়ে ঠাসা ছিল গোটা একটা আলমারিই।

পাঠশালার সেই ঝুলনযাত্রার পর যেন শারদীয়া মহাপূজার মহা-মহোৎসবের মধ্যে এসে পড়লাম।

প্রথম দিনই আমি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' নিয়ে এসেছিলাম। তার প্রথম কবিতাটা ছিল, মনে আছে এখনো,'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে...'। ধূপের মতই যেন আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যছন্দে আর ভাবসৌরভে একেবারে মিলিয়ে গেলাম—বিলিয়ে দিলাম আপনাকে।

বইখানা হাতে নিয়ে বাবার সেই নাক সিঁটকানো...এখনো যেন আমার চোখে ভাসে। আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন বাবা—আমাদের ছেলে—চারু দেখছি বার করেছে বইটা। পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রহ্ম হয়ে গেছে চারু।

ঐ পর্যন্ত, আর কিছু নয়।

লেখক হিসেবে চারুদা আমাদের অচেনা ছিলেন না। প্রবাসীতে তাঁর গল্প আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়তাম। তাঁর 'ভাতের জন্মকথা' বইটা তিনি আমার ক্লাস ফ্রেন্ড বিষ্টু সুকুলকে উৎসর্গ করেছিলেন—বিষ্টুর কাছ থেকে নিয়ে পড়েছিলাম বইটা। এমন ভালো লেগেছিল যে ! সে বইটা বোধহয় পাওয়া যায় না এখন আর।

চাঁচোরের রাজার সম্পর্কে কে যেন হতেন চারুদা আমাদের। রাজাকাকার জামাই চারু বলে আরেকজনা ছিলেন, তাই বাবা-মা চারুদের কথা উঠলেই ছেলে-চারু বলে বোঝাতেন। চাঁচোরের পারিবারিক কাহিনী নিয়ে কয়েকখানা উপন্যাসও লিখেছিলেন চারুদা—পরগাছা, আরও যেন কী কী ! প্রবাসীতেই বেরিয়েছিল, পড়েছিলাম।

তাছাড়াও 'ভাতের জন্মকথা' বলে চারুদার ছোটদের জন্যে লেখা বইখানা বন্ধু বিষ্টু সুকুলের কাছ থেকে নিয়ে পড়েছিলাম।

বিষ্টু সুকুলকে আমি রীতিমত ঈর্ষা করতাম এক কারণে, ঐ বইয়ের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় তার নাম ছাপানো ছিল বলে। বিষ্টুর ভাতের সময় বইটা তিনি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। বিষ্টুর বাবা গৌরীপ্রসাদ সুকুল চারুদার বাল্যবন্ধু ছিলেন। মা'র মুখে শুনেছিলাম, গৌরীকে একবেলা না দেখতে পেলে তিনি নাকি ছটফট করতেন।

বিষ্টুর জন্যও আমার সেইরকমটাই হতো বোধ করি মাঝে মাঝে। একদিন ক্লাসে গিয়ে নিজের পাশেই তাকে না পেলে সেই ছটফটানিই হতো বুঝি। যেদিন সে অপর কোনো ছেলের পাশটিতে বসত এমন খারাপ লাগত আমার যে কী বলব ! পাঠ্য পুস্তকের আড়ালে গল্পের বই পড়তেও মন লাগত না তখন আমার।

বিষ্টুকে আমি বলতাম, তুই একজন বড় রাইটারের একখানা বই পেয়েছিস তো !

আরেকখানাও পাবি তুই এক সময়। আমিই দেব তোকে। আমার একখানা বই উৎসর্গ করব তোর নামে। বড় হয়ে আমিও বই লিখব তো ?

আরেকজন বড় রাইটার ? চোখ বড় বড় করে সে তাকাত।

তা ঠিক বলতে পারি না, তবে রাইটার হব আমি ঠিকই। বড় হয়ে বই লিখব আমি। তুই দেখে নিস।

আমাকে নিয়েও একটা গল্প লিখিস তাহলে। কেমন, লিখবি তো ?

নিশ্চয়। লিখব বইকি।

বই তো তারপর লিখেছি বিস্তর, কিন্তু একখানাও ওর নজরে পড়েছে কিনা কে জানে।

অনেকদিন আগে শুনেছিলাম, বিহার মুলুকের কোথায় যেন সে মাস্টারি করছে, তারপর আর কোনো খবর পাইনি তার, কোথায় যে সে থাকে ! আমারও কোনো খবর রাখেনি সে তারপর। আমারও ঠিকঠিকানা তার জানা নেই বোধহয়।

আমার 'নিখরচায় জলযোগ' বইটা আমার বাল্যকালের প্রাণের বন্ধু সেই বিষ্টু প্রসাদ সুকুলের নামে উৎসর্গীত। আর 'অদ্বিতীয় পুরস্কার' বইয়ের নাম-গল্পটাই তার কীর্তিকাহিনী নিয়ে। কিন্তু দুখানার একখানিও তার কাছে আমি পৌঁছাতে পারিনি। কোনো সূত্রে সে পেয়েছে বা পড়েছে কিনা জানি না।

ছেলেবেলার বন্ধুরা মেয়েদের ভালোবাসার মতই কোথায় যে হারিয়ে যায়! ভাবতে অবাক লাগে একেক সময়। মনে হয় যে, বুঝি একরকম ভালোই। তাদের নির্মেদ দেহ আর নির্মেঘ মন নিয়ে কৈশোরের নিবিড় মাধুর্যে মিশিয়ে নিটোল মুক্তোর মতই চিরদিনের স্মৃতির মধ্যে অক্ষয় থেকে যায় তারা—পরে যে কখনো আর ফিরে দেখা দেয় না তাতে জীবনের মতই সুমধুর থাকে, পলে পলে দন্ডে দন্ডে অবক্ষয়ে টাল খায় না, ক্ষয় পায় না।

নইলে পরে যদি তারা ভূরি ভূরি কামিয়ে আর বিপুল ভুঁড়িভার নিয়ে ফিরে এসে দেখা দিত আবার, তাহলে সংসারের ত্রিতাপদগ্ধ পোড়াকাঠের মত তাঁদের দেহমন আর পেনসনপ্রাপ্ত অখন্ড অবকাশ আমাদের জীবনে কী দুর্বিষহই না হতো যে!

বন্ধুত্বের সেই পরাকাষ্ঠায় বৃষোৎসর্গের মতই আত্মাহুতি দিতে হতো আমাদের।

জীবন মন্থনের প্রথম ভাগেই তাই যত না অমৃত, তার পরে যা ভাগ্যে ওঠে তা নিতান্তই হলাহল। তখন কার ভেলকিতে কেমন করে কে জানে, আগের সব অমিয়ই গরল আর ভেল হয়ে গেছে!

জীবনভোর জীবন-যন্ত্রণাই বাকী আছে কেবল।

চাঁচোরের কাছাকাছি নামডাকওয়ালা এক গ্রাম ছিল—বেশ বর্ধিষ্ণু—কলিগ্রাম। চাঁচোর থেকে পাকা সড়কে পুল পেরিয়ে যাওয়া যেত কলিগাঁয়, আবার আমাদের ইস্কুলের পাশের চাষের খেতের মধ্যে দিয়েও সোজাসুজি যেতে পারতাম সেখানে। কলিগাঁর ছেলেরা চাঁচোরের ইস্কুলে পড়তে আসত। তাদের অনেকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল আমার।

কলিগ্রাম যেমন মালদা জেলার এক নামকরা গ্রাম, তেমনি কলিগ্রামের বিখ্যাত নাম কৃষ্ণচরণ সরকার। একজন জমিদার বা মহাজন সেখানকার ; একদা স্বদেশী যুগের পান্ডা ছিলেন, পরে অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। স্বনামধন্য বিনয় সরকারের সহযোগে মালদহের বিখ্যাত সংস্কৃতিপত্র গম্ভীরা-র তিনি ছিলেন প্রকাশক সম্পাদক। তাঁর

এক বিরাট গ্রন্থাগার রয়েছে খবর পেলাম কলিগাঁর ছেলেদের কাছে। পত্রপাঠ গেলাম তাঁর বাড়ি।

তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর বই কাউকে বড় একটা তিনি নিতে দিতেন না, এইরকম শুনেছিলাম। এই কারণেই বোধহয় বইগুলো টিকে ছিল।

বাবার নাম করতেই সমাদরে তাঁর বইয়ের ঘরে তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে। আলমারিতে আলমারিতে সাজানো থরে থরে সব বই। তদানীন্তন লেখকদের বই যত। কত বই যে! ইতিহাস প্রবন্ধ গবেষণামূলক বইও কতো! রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যদুনাথ সরকারের বই। শরৎচন্দ্রের বইয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল আমার সেইখানেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক আর কবিতার বইও পেয়েছিলাম। আরো কতোরকমের বই—মনে নেই এখন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশিত তাবৎ বই ছিল তাঁর। তার থেকে ইচ্ছেমত কয়েকখানা তিনি বেছে নিতে বললেন। আর বললেন যে, পড়ে-টড়ে ফিরিয়ে এনে দিলে আবার পাব। এমনি করে সেকালের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল।

সকালে উঠে একখানা বই পড়ে শেষ করি। একখানা দুপুরে পড়ার জন্যে ইস্কুলে নিয়ে যাই। আবার রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরেকটা পার করতে লাগি। দু'দিন বাদ বাদ নিয়ে আসি গিয়ে।

বাবা বলতেন, গ্রন্থীঃ ভবতি পন্ডিতঃ। যারা গ্রন্থ নিয়ে পড়ে থাকে তারাই পন্ডিত হয়।

মানে, তুমি বলছ যে লাইব্রেরীয়ানরাই ? যারা কিনা বই নিয়েই ব্যস্ত থাকে সব সময় ?

না না, সেভাবে পড়ে থাকা নয়, গ্রন্থ নিয়ে পড়া—সেই কথাই বলছি রে ! বই পড়েই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়।

মা, বাবা কী বলছে জানো ? মাকে গিয়ে বললাম, গ্রন্থীঃ ভবতি পন্ডিতঃ। কথাটা সত্যি নাকি ? মানে কী ওর ?

ঠিকই বলেছে তোর বাবা। যারা বই মুখে করে পড়ে থাকে সব সময়, তারা পন্ডিত না হয়ে আর যায় না। বই ছাড়া চোখের সুমুখে কিছুই তাদের পড়ে না তো আর—তাই সবটাই পন্ড হয় তাদের। তার মানেই হোলো গিয়ে পন্ডিত।

তুমি কী বলছ মা ? পন্ডিত মানে কি তাই ? একেবারে পন্ড হয়ে যাওয়া ?

গ্রন্থি কথাটার আরেকটা মানেও আছে আবার। তার মানে গেরো। কপালে গেরো না থাকলে কি কারো পন্ড হয় ? কেউ পন্ডিত হয় নাকি ? এ হোলো গে ওই বইয়ের গেরো।

গেরোও বলা যায় আবার গেরোনও বলা যায়, তাই না মা ?

বলতে পারিস। বই থেকে কী জানা যায় কিছু ? মন থেকেই তো জানা যায় সব। সেই জানাটাই আসল। মনের জানাটা বই দেখে মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে কেবল, সত্যিকার জানা তোর ঐ মনেই। মনের মধ্যেই তোর সব রে।

বাবা যে ব্রহ্মগ্রন্থি দেয় পৈতেয় ? সেটা তাহলে ? সেটাও কি—?

ঐ গেরোই। ধরতে গেলে, সেই গেরোই একরকমের। ব্রহ্মও একটা গেরো ছাড়া কী ? গেরোনও বলতে পারিস। যার কপালে ঐ গেরো আছে, যার বরাতে ঐ গ্রহণ লাগে, মানে যাকে তিনি গ্রহণ করেন, তার কি আর নিস্তার আছে নাকি ? ইহকাল পরকাল সব ঝরঝরে।

ভগবানের খর্পরে পড়া তাহলে ভালোই নয় বলছ তুমি ?

না, আমি কিছু বলছি না। কারো খর্পরে পড়াটাই বুঝি ভালো নয়। তুই পৈতের ব্রহ্মগ্রন্থির কথা বলছিলিস না ? সেটা হচ্ছে গিয়ে উপনয়ন সংস্কার। ভগবানের সঙ্গে জোট পাকিয়ে

নতুন করে জন্মানো—ভগবান আর তুই দুজনে মিলে একজোটে দ্বিজত্ব লাভ, বুঝলি ?

একদম না।

উপনয়ন মানে উপনীত হওয়া, ব্রহ্মের মুখোমুখি গিয়ে পৌঁছনো। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ। উপনয়ন মানে তৃতীয় নেত্রও বোঝায় আবার। তার মানে, যা আমি বলছিলাম, তোর ঐ মনের চোখ। মনের চোখ খুলে যাওয়া। যার মনের চোখ খুলে যায় সে পৃথিবীর সব কিছুই যথার্থরূপে দেখতে পায়। আর তাই হল গিয়ে সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎ।

মনের সেই চোখ কি করে খোলে মা ?

মা'র ইচ্ছে হলেই খোলে। এই জন্মেই খোলে, কারো-কারো আবার সাত জন্ম লেগে যায় খুলতে। আবার এই দন্ডেই খুলে যায় কারো কারো। সবই মা'র ইচ্ছে।

মানে, তোমার ইচ্ছে !

আমার ইচ্ছে ? আমি কে ? বলছি না মা'র ইচ্ছে ? আমার মা, তোর মা, সবার মা—সেই বিশ্বজননী।

তুমিই তো সেই মা। সেই বিশ্বজননী। তুমিই তো ! ভৈরবী বলেছিল আমায়।

দূর পাগলা। মা হাসতে লাগলেন আমার কথায়। —মাথা খারাপ করে দিসনে। আমি শুধু ভাবছি তুই খাবি কি করে রে ? পড়ার বই ছুঁসনে একদম—রাতদিন নভেল নিয়ে পড়ে থাকিস! পাসটাস করতে পারবিনে—চাকরি-টাকরিও জুটবে না তোর কপালে। লেখাপড়া শিখলিনে, মুখ্যু হয়ে থাকলি। কী হবে রে তোর ? খাবি কি করে ?

তুমি তো আছো। মা থাকতে ছেলের ভয় কি !

আমি কি চিরদিন আছি নাকি ? বেঁচে থাকব চিরকাল ?

না থাকলেও তখনো তুমি থাকবে, আমি জানি। আমার ভাবনা নেই।

তা কি হয় নাকি রে ? তুই কি আমায় বেঁধে রাখতে চাস ? আমি বাঁধা পড়তে চাই না। কিছুতে না, কারোতে না।

তারপর খানিক কী ভাবলেন তিনি—দাঁড়া, তোর সঙ্গে আসল মা-র পরিচয় করিয়ে দিই। তাহলে আর তোর কিছু ভাবনা থাকবে না। খাওয়া পরার তো নয়ই—কোনো দুঃখকষ্টও পাবিনে জীবনে। দাঁড়া।

দাঁড়িয়েই তো রয়েছি। তোমার সামনেই তো দাঁড়িয়ে।

আমার দুই ভুরুর মধ্যবিন্দুতে আলতো করে তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি ছুঁইয়ে তিনি বললেন—এইখেনে মন আনতে পারিস ? আন দেখি ? এই দুই ভুরুর মাঝখানে ?

মন ?

হ্যাঁ। মন আনতে হবে, এনে স্থির করতে হবে এখানটিতে। সারা দেহময়ই তো তোর মন ছড়িয়ে—তাই না ? সেই সবগুলো মনকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এইখেনে নিয়ে এসে জড়ো করতে হবে—মনের মধ্যে মন। সেই মনের মধ্যেই মা দুর্গা থাকেন। সবার মা যিনি, বিশ্বজননী।... এনেছিস মন ?

চেষ্টা করছি।

কী মনে হচ্ছে এখন ?

কতো কী ! কতো কী যে মনে পড়ছে।

মা দুর্গার কথা ?

না তো। যত সব আজেবাজে মেয়েদের কথা মনে আসছে কেবল।

তোর মনে আবার মেয়ে কী রে! মা তো শুনে হতবাক্।

রিনিটিনিদের কথাই মনে পড়ছে আমার।

তাই বল। শুনে হাসলেন মা—দাঁড়া, আমি তোর মন এনে দিচ্ছি এখেনে। এ বলে তিনি ভ্রূর মধ্যে তাঁর মুখ ছোঁয়ালেন—যতক্ষণ আমি তোকে চুমু খাব ততক্ষণ তোর মন এখেনে থাকবে। তুই মনে মনে মা দুর্গা মা দুর্গা কর—আমিও মাকে ডাকছি মনে মনে। মা আবার আমাদের দু'জনকে ডাকছেন। এইখেনে বসে। মিনিট খানেক বাদে মা শুধালেন—এলো মন?

হ্যাঁ।

কি রকমটা বোধ হলো তোর?

শিরশির করছিল গা।

মা দুর্গার আবির্ভাব হলো কিনা, সেই জন্যেই। তারপরে তিনি আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে হাত ছুঁইয়ে বললেন—এখানে থাকেন বাবা মহাদেব। পরম শিব। আর, তাঁর পায়ের তলায়, এইখেনে দুই ভুরুর মাঝখানটিতে পার্বতী রয়েছেন। দশভুজা দুর্গা। আর এইখানে, এই কণ্ঠদেশে আছেন বাগেদবী—মা সরস্বতী। বুকে নারায়ণ, নাভিপদ্মে মা লক্ষ্মী—এমনি সব নানা দেবতা নানান অঙ্গে ছড়িয়ে, বড় হয়ে যখন বই পড়বি, তন্ত্রের বইটই পড়বি, তখন টের পাবি। দেহের নানা স্থানে নানান চক্র রয়েছে ভুরুর—মাঝখানটিতে আছে আজ্ঞাচক্র। মা দুর্গা এখানে বসে আজ্ঞা করছেন, বলছেন তথাস্তু। তথাস্তু। তাই হোক। তাই হোক। এখানে মন নিয়ে এসে তোর মন দিয়ে যা চাইবি তাই পাবি। পেয়ে যাবি—দেখিস।

তাই পাব? বলছ কি মা?

নিশ্চয়। চেয়ে দ্যাখ না তুই।

চাইব বইকি। আজই চাইব। আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না মা।

বিশ্বাস না হলেও হবে। অবিশ্বাস করে চাইলেও পাবি—শুধু মা'র কাছে এসে চাইতে হবে...এইখেনে মন নিয়ে এসে...

বিশ্বাস না হলেও?

অবিশ্বাসে কী আসে যায়? মা কি আর মা থাকে না তাহলে? অবিশ্বাস করে আগুনে হাত দিলে কি হাত পুড়বে না তোর? মা তো আগুন রে।

তবে যে মামা বলেন, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর...!

সে কথা কৃষ্ণের বেলা খাটতে পারে, মা'র বেলা নয়। মা তো তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সব সময় মিলে রয়েছেন।...যাই গে, আমার কাজ পড়ে রয়েছে।

চলে গেলেন মা। আমিও চলে এলাম আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের খোলা ছাদের নিমগাছের ছায়ায়। আমার শোয়ার, শুয়ে শুয়ে বই পড়ার প্রিয় জায়গা ছিল সেইটা। খোলা হাওয়ায় খোলা ছাদে গা গড়িয়ে ভুরুর মাঝখানে মা দুর্গাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগলাম শুয়ে শুয়ে।

বিকেল গড়িয়ে এসেছিল, খিদে পেয়েছিল বেশ। সেই কখন সন্ধ্যে হবে, লুচি ভাজবে, খেতে বসব আমরা। এর মধ্যে যদি কিছু খেতে পাওয়া যায়, কী ভালই না হয় তাহলে! মনে মনে মা দুর্গার কাছে খাওয়ার দাবি জানাতে লাগলাম।

মা দুর্গাকে ছেড়ে কখন ফের রিনিদের কথা ভাবতে লেগেছি টের পাইনি। এদিকে বড় বারকোস নিয়ে দোতালার সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল ক'জনা। সামনের ছাদে আমায় শুয়ে থাকতে দেখে ইশারায় তারা ডাকলো আমাকে।

কী ব্যাপার ? না, মা সিংহবাহিনী আর রামসীতার শীতল ভোগের মহাপ্রসাদ—বৈশাখ মাসের বৈকালী। সারা বোশেখ মাসটা ধরেই প্রতিদিন বিকেলে এমনি ধারা বৈকালিক ভোগ দেয়া হবে তাঁদের, আর সেই প্রসাদ পালা করে বিলোনো হবে একেক জনকে একেক দিন।

আজ প্রথম দিনটিতেই রাজাবাহাদুরের হুকুমে আমাদের পালা পড়েছিল।

প্রকান্ড রূপোর আর শ্বেত পাথরের দু থালায় সাজানো মাখন ছানা ক্ষীর সর বাদাম কিসমিস আখরোট আঙুর খেজুর ভিজে ছোলা শসা কলা ইত্যাদি যাবতীয় ফলটল আর সেই সঙ্গে সন্দেশ-টন্দেশ আরো কত কী !

সীতারাম সিংহবাহিনীর শীতল ভোগের মহাপ্রসাদ !

নয়া রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে রামসীতার প্রকান্ড মন্দির। দেখেছিলাম আমি। তার পাশেই সিপাহিদের বকেয়া ব্যারাকে আমাদের হাইস্কুল বসতো।

রোজ সন্ধ্যায় রামসীতার পূজারতি হয় খুব ঘটা করে তাও শুনেছি। কোনো দিন তা দেখা হয়নি। কী করে দেখব ? ইচ্ছে থাকলেও অত দূরে সন্ধ্যেবেলায় একলাটি কি আমায় যেতে দেয় ? আমাদের এই পুরনো রাজবাড়ি থেকে নয়া রাজবাড়ি তো কমখানি পথ না।

রামসীতার দিনের বেলার পূজার্চনাও দেখিনি কখনো। দুপুরে যে রাজভোগ হয় শত শতলোক তার প্রসাদ পায় নাকি। আর রাত্রির গোড়ায় সন্ধ্যারতি—তা নাকি একটা দেখবার মতই। দেখতে হবে একদিন। রিনিকে নিয়ে দেখে আসব না হয়।

রামসীতা রাজবাড়ির ঠাকুর। আর সিংহবাহিনী তাঁদের কুলদেবতা। সোনার প্রতিমা—ছোট্ট একটুখানি। দূর থেকে দেখা যায় না। খুব কাছে গেলে তবেই দেখা যায়, দেখিনি কখনো। পুজোর সময় পাহাড়পুরে রাজবাড়ির মহাপুজায় বিরাট দুর্গা প্রতিমার পাশেই নাকি সোনার সিংহাসনে সিংহবাহিনীকে রাখা হয়—মা দুর্গার সঙ্গে তাঁরও পূজা হয়ে থাকে তখন। মা দেখেছেন সে ঠাকুর, আমার চোখে কিন্তু পড়েনি।

দু'থালা প্রসাদ, একটা শ্বেত পাথরের থালায়, আরেকটা থালা রূপোর।

দু'থালা কেন গো ? দু'রকমের দুটো থালা যে।

রূপোর থালায় মা সিংহবাহিনীর প্রসাদ, আর শ্বেতপাথরে সীতারামের।

প্রসাদ রেখে দিয়ে থালা নিয়ে যাবে তো তোমরা ? লোকগুলোকে শুধোলাম।

না। না। থালা এখানেই থাকবে। থালাসমেত রেখে যেতে বলেছেন রাজাবাহাদুর।

রাজবাড়ির ব্যাপার। রাজরাজড়ার চালচলন। তাঁদের কান্ডকারখানাই আলাদা।

এর আগে আর কখনো আমাদের বাড়ি বৈকালীর পালা পড়েনি। আসেনি কখনো আর। সেই প্রথম এল।

আর, সেই প্রথম আমার ঈশ্বরের প্রসাদলাভ...মা'র আশীর্বাদে।

॥ এগার ॥

সেদিন সারা বিকেলটা নিমগাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে প্রাণপণে মা দুর্গাকে ডাকাডাকি করলাম' কিন্তু কোথায় কী ! সেই বৈকালী আর এলো না। কপালগুণটা বাজিয়ে দেখতে

গিয়ে মাঝখান থেকে খিদে বেড়ে গেল আরো।

বৈকালীর বদলে রিনি এল—'বেরুবে না আজকে ? বেড়াতে যাবে না ?'

'যাব বইকি। মাঠের পারে কি পুকুর ধারে নয়, নতুন জায়গায় বেড়াতে যাব আজ, দাঁড়া, আগে কিছু খাবার ব্যবস্থা করি।' রিনিকে নিয়ে মা'র কাছে গেলাম। 'মা, কিছু খেতে দাও না আমাদের। ভারী খিদে পেয়েছে।'

'সেই কখন খেয়েচিস। খিদে পাবে তার আশ্চর্য কী। কি করছিলি এতক্ষণ ?'

'নিমগাছের ছায়ায় ছাদে শুয়ে তোমার মা দুর্গাকে ফাঁদে ফেলবার তালে ছিলাম। কিন্তু এত করে চাইলাম, বৈকালী তো কই এল না আজ ?'

'রোজ রোজ আসবে না কি ? একেকদিন একেকজনের পালা যে ? পালা করে সবার বাড়িতেই যাবে তো। তোর বাবা বয়সে আর মানে সবার চাইতে বড়ো বলে প্রথমদিনের পালাটা তাঁরই পড়েছিল। বামুন পাড়ার ঘর ঘর সবার বাড়িই যাবে, তারপর বড় বড় আমলাদারদের বাড়িতেও। সারা বোশেখ মাস ভোরই তো চলবে এইরকম।'

'তা যাই বলো না মা, চাইলেই পাওয়া যায় না সব সময়। তোমার মা কালী একটু খামখেয়ালী আছে।'

'তা আছে। তবে চাইলেই পাবি—পাবি যে, সেটা নিশ্চয়। কখনো তক্ষুনি, কখনো বা কিছু পরে। পেতেই হবে, না পেয়ে যাবিনে কক্ষনো। কখনো চেয়ে পাবি, কখনো বা পেয়ে চাইবি—কখনো বা না চাইতেই পেয়ে যাবি-এমন ধরা চলতে থাকবে সারা জীবন, পরখ করে দেখিস।'

'পরখ করে দেখলাম তো এতক্ষণ।' আমার ক্ষুব্ধ স্বর শোনা গেল।

'আবার চাইবার আগেই পেয়ে যাবি একেক সময়—বললুম না ? দেখবি যে না চাইতেই কখন দিয়ে বসে আছেন মা।' মা বলেন।

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, জীবনের কোন জিনিসই তো এখনো তোর টেস্ট করা হয়নি। তাই আগে মা একটুখানি করে তাদের স্বাদ দেবেন। স্বাদ দিয়ে তোর সাধ জাগাবেন। আর, তোর সাধ মেটাবেন চাইলে পরেই তারপর। মেটাতে মেটাতে যাবেন তিনি জীবনভোর বরাবর।'

'একেই বুঝি সাধনা বলে থাকে ? তাই না মা ?'

'তাও বলতে পারিস। তবে সাধনা দু'তরফেই—মা'র পুত্রসাধনা আর ছেলের মাতৃসাধনা। দুজনের দুজনকে নিয়ে সাধ আহ্লাদ।'

'বাঃ বেশ তো।' শুনে আমার বেজায় ফুর্তি হয়। হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে যাই তক্ষুনি।

'যেমন চাইবার আগেই পেয়ে গেছিস আজকে। পরে তুই চাইতে পারিস বলে তার আঁচ পেয়ে আগের থেকেই যুগিয়ে রেখেছেন মা।'

'কোথায় পেলাম!' মা'র কথায় আমার অবাক লাগে।

'আজ সকালেই পৌঁছে গেছে তোদের বিকেলের জলখাবার।'

'বলোনি তো তুমি ? কখন এল ? কী এসেছে ?'

'তোরা তো তখন ইস্কুলে ছিলি—বলব কখন ? আজ সকালে তোর বাবা পাহাড়পুরে তোর জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গেছলেন না ? বড়মা তোদের জন্যে ক্ষীরের ছাঁচ সরের নাড়ু চন্দ্রপুলি তিলকোটা চিড়েমুড়ির মোয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন সব।'

'দাও দাও। বলোনি কেন এতক্ষণ।' আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি।

'বস। বসে খা।' রিনি আর আমাকে আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে বলেন মা।

'বসে বসে খায় নাকি মানুষ? রাস্তায় খাব আমরা। বেড়াতে যাচ্ছি না এখন? রিনিকে আমি রাম-সীতার মন্দির দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি আজ। আরতি দেখে ফিরব। ...যেতে যেতে খাব আর খেতে খেতে যাব।' বড়মার অবদানে আমার দু'পকেট বোঝাই করে বেরুলাম।

'বেশি রাত করিসনে যেন।' পই পই করে বলে দিলেন মা। —'সামনে ক্লাস পরীক্ষা রয়েছে তোর। এসেই পড়তে বসবি, বুঝেছিস? বেশি রাত জেগে, কি মাঝ রাত্তিরে উঠে আমি পড়তে দেব না।'

ঘাড় নেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

'তোমার মা আবার কোন্ মায়ের কথা বলছিলেন গো! যিনি সব জুগিয়ে থাকেন? তোমার পাহাড়পুরের বড়মা?'

'না না, অন্য মা। আরেক মা। তোর মা, আমার মা, মা'র মা, বড়মারও মা—সবার মা, যিনি বিশ্বজননী, মা দুর্গা। তাঁর কথাই বলছিলেন মা।'

'মা দুর্গা?'

'হ্যাঁ, তিনিই খাবার পাঠিয়েছেন আমাদের—খেতে চাইবার আগেই।' রিনির বড় বড় চোখ আরো বড় হয়ে উঠল যেন। —'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, চ' না। যেতে যেতে বলছি তোকে সব। আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক। খিদে পেটে তত্ত্বকথায় মন যায় না।'

চন্দ্রপুলির তত্ত্ব নেবার পর রিনির চাঁদ মুখের তত্ত্ব নিলাম। - 'তোর মুখে নারকেল নাড়ুর ভগ্নাংশ লেগে রয়েছে। দাঁড়া, মুখ মুছিয়ে দি তোর।'

'এ আবার কী ধরনের মুখ মোছানো? পকেটে রুমাল ছিল না? হাত ছিল না তোমার? মাঝ রাস্তার মধ্যিখানে ....এই সব।' আপত্তি করল সে।

'হাত ছিল তো কী!' আমি বলি—'ঝগড়াঝাঁটির বেলায় অবশ্যি হাত থাকতে মুখ কেন? তখন কষে তোমার দু হাত চালাও। কিন্তু তেমন কারো মুখ মোছাতে হলে অন্য কথা। তখন মুখ থাকতে হাত কেন? তাই মুখ দিয়েই মুছে দিলাম।'

'বেশ করেছো। এবার শুনি তোমার সেই কথাটা। মা দুর্গার কথা।'

'তোমার মা দুর্গা আবার কিরে! তোরও মা দুর্গা তো, মা দুর্গা তো সবাইকার। বল্, আমাদের মা দুর্গা।'

'ওই হোলো। এখন শুনি তো কথাটা।'

'মা দুর্গা আছেন না? শিব আছেন, দুর্গা আছেন লক্ষ্মী সরস্বতী দেবতারা সবাই রয়েছেন।'

'আছেন তা তো জানি।' একবাক্যে তার সায়। —'তা কে না জানে?'

'কিন্তু আছেন কোথায়? সেই আকাশের মগডালে নয়, আমাদের এই শরীরে—আমাদের মনের মধ্যেই। যেমন তোর শিব আছেন মাথার এইখানটায়, আর মা দুর্গা রয়েছেন তাঁর পায়ের তলায় বসে—এইখানে কপালের মধ্যিখানে। এখানে মন নিয়ে এসে এম্নি করে....মা দুর্গাকে ডাকতে হয়। আনতে পারিস এখানে তোর মন?'

'কি করে আনব?'

'দাঁড়া, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে। আগে আমার এখেনে ডেকে আনি মা দুর্গাকে...বলাটা হয়তো ভুল হলো...আগে আমাকে ডেকে নিয়ে যাই এখানে মা দুর্গার কাছে, তারপর...'

তারপর মা'র আখ্যানের পুরোটাই তার দেহে মনে মঞ্জরিত করতে লাগি—যথাবিহিত পুরঃসর আমার অখ্যানমঞ্জরী নিবেদনের পর শুধাই : 'কি রকম লাগছিল বল্ তো, আমি যখন...'

'তুমি যখন ঠোঁট ঠেকিয়ে রেখেছিলে না, সারা গা কেমন শিরশির করছিল আমার।'

'করবেই তো! কপালটা শিরোভাগ না? তাই করবেই তো শিরশির!'

'কপাল নয় গো, গাটা শিউরে উঠছিলো যেন।'

'আহা, ওই শীর্ষদেশ থেকেই তো যতো শিরা উপশিরা আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার ডাকে সাড়া দিচ্ছিল তারা।' নিজের বুদ্ধিমতন আমার ব্যাখ্যা করা।

'এবার বুঝলাম। বেশ তো, ডাকা গেল না হয় মা দুর্গাকে। কিন্তু কারণে অকারণে নাহক তাঁকে ডাকতে যাব কেন? তাঁকে বিরক্ত করা হবে না?'

'মা আবার বিরক্ত হয় নাকি ছেলেমেয়ের ওপর? আর অকারণে কেন? কোনো কিছুর দরকার পড়লেই ডাকবি তো। চাইবার জন্যেই ডাকবি, পাবার জন্যেই ডাকবি রে। দেখবি তোর প্রার্থনা পূর্ণ হয় কিনা।'

'আচ্ছা, আমি কিছু না চাইবার জন্যে ডাকি যদি?' সে জানতে চায়।

'না চাইবার জন্যে ডাকা? না পাবার জন্যেই সে আবার কী রে?' তার কথাটায় আমার ধাঁধা লাগে, বুঝতে পারি না ঠিক।

'ধরো, মা তো আমাদের আসছে মাসে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে। আমি এখান থেকে যেতে চাইনে। আমি যদি এখন মা দুর্গার কাছে না যাবার জন্যে চাই তাহলে আমাদের না যাওয়া হবে তো?'

'না চাওয়ার জন্য চাওয়া যায় কিনা তা আমি জানি না।' ওর কথায় আমি ভাবনায় পড়ি—জিগ্যেস করতে হবে মাকে। তারপরে তোকে বলব।'

না পাওয়ার জন্য চাওয়াটা কী আবার? ওর কথাটা আমার অদ্ভুত লাগে—'সত্যি, তোরা মেয়েরা যেন কেমনধারা। আমরা ছেলেরা চাইবার জন্যেই চাই, পাবার জন্যেই চেয়ে থাকি-পাই আর না পাই। কিন্তু এই তোরা-মেয়েরা। তোরা না চাইবার জন্যেও চাস আবার! না পাবার জন্যও চেষ্টা করিস। আশ্চর্য!'

'চাইলে যদি পাওয়া যায়, না চাইলে তবে না পাওয়া যাবে কেন?' তার জিজ্ঞাসা।

'কে জানে! তোরা মেয়েরাই তা জানিস। আমরা ছেলেরা যা চাই তাই শুধু চাই, তোরা মেয়েরা তার ওপর আবার না চাইতেও চাইতে পারিস দেখছি। মামা যে বলেন কথাটা মিথ্যে নয় তাহলে, মামা বলতেন বটে, কিন্তু আমি তার মানে বুঝতাম না তখন।'

'কী বলতেন তোমার মামা?'

'মেয়েরা ভারী নাচাইতে পারে।'

'তুমি ভারী বোকা! সেটা ঐ না চাওয়া নয় মশাই, তা হচ্ছে গিয়ে তোমায় বাঁদর নাচানো।'

'তোরাই জানিস। তোরাই নাচাস তো।'

বেড়াতে বেড়াতে আমরা মহানন্দার তীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

'আমরা যাচ্ছি কোথায় বল তো?' সে শুধায়।

'রামসীতার আরতি দেখতে যাচ্ছি না। নদীটা পেরিয়ে যেতে হবে।'

'জল আছে যে নদীতে!'

'ও হাঁটুখানেক জল। অক্লেশে হেঁটে পেরোনো যায়। বর্ষাকালে বান ডাকে। তখন ফেঁপে ওঠে এখানকার মহানন্দা। অন্য সময় বেচারী মহাবিষণ্ণ হয়ে পড়ে থাকে ওর একটুখানি জল নিয়ে।'

'ঐ তো দূরে পুল দেখা যাচ্ছে, সাঁকোর ওপর দিয়ে গেলে হয় না?'

'তাহলে এই ফুটবলের মাঠ ক্রস করে এলাম কেন? সাঁকো দিয়ে পেরিয়ে পাকা সড়ক ধরে গেলে অনেক দূর পড়বে, দেরি হবে বাড়ি ফিরতে। সোজাসুজি নদী পার হয়ে সিঙিয়ার আমবাগানের ভিতর দিয়ে শর্টকাট করব আমরা।'

'হাঁটুর বেশি জল হয় যদি? আমার ফ্রক ভিজে যাবে কিন্তু।'

'কোলে তুলে নিয়ে যাব তোকে? কি, পিঠে করে?'

'পারবে? জলে ফেলে দেবে না তো?'

'তোর কী মনে হয়?...জলেই তোকে বিসর্জন দেব?'

'রামসীতা ছাড়া আরো কী যেন ঠাকুর আছে বলছিলে—যা দেখতে যাচ্ছি আমরা। আর কী ঠাকুর?'

'সিংহবাহিনী। এইটুকুন ঠাকুর কিন্তু আগাগোড়া সোনা দিয়ে গড়া।'

'তাই নাকি?'

'কিংবা সোনা দিয়ে মোড়াও হতে পারে। জানি না ঠিক।'

'দেখেছ তুমি?'

'দেখিনিও বলা যায় আবার দেখেছিও বলা যায় আবার। চোখের সামনেই দেখছি তো এখন। তোর সোনার প্রতিমা দেখছি না?'

'হয়েছে। খুব হয়েছে।'

'তুই আমার কাছে সিংহবাহিনী। আর আমি যদি তোকে বয়ে নিয়ে যাই তবে আমি তোর বাহন হব তো? আমি হব গিয়ে তাহলে তোর সিংহ। বুঝেছিস?'

'তুমি সিংহ? সিংহ তো তোমার কেশর কই গো?' সে হাসে: 'তবে তোমার চুলগুলো প্রায় কেশরের মতই বানিয়েছ বটে! এমন ঝাঁকড়া চুল—ছাঁটো না কেন? ছাঁটবার সময় পাও না নাকি?'

'নাপিতের কাঁচির সামনে উবু হয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে থাকতে আমার এমন বিচ্ছিরি লাগে। কারো খচখচানি আমার সয় না। এমনকি, ওই কাঁচিরও নয়।'

ততক্ষণে আমি তাকে কোলে তুলে ফেলেছি। —'তুই তেমন ভারী নোস তো! হালকা পলকা আছিস। তবে বিয়ের পর শুনছি মেয়েরা নাকি খুব মুটিয়ে যায়। তুইও বেশ মোটা হবি তখন।'

'বয়স হলে ছেলেরাও মোটা হয়। ভুঁড়ি হয় তাদের। তুমিও মোটাবে।'

'সে নেহাৎ মন্দ হবে না—যদি দুজনেই একসঙ্গে মোটাই। ভালোই হবে মোটের ওপর।'

'মোটামুটি মানিয়ে যাবে বলছ?'

'হ্যাঁ, দুজনেই যদি মোটামুটি হই—এইতো এসে গেলাম পারে। কই, পড়লি তুই জলে?' পর পারে নিয়ে ওকে নামালাম।

কিন্তু নামাবার আগে শরৎচন্দ্রের কথা আমার স্মরণে এল। তাঁর স্বামী বইটা আমার পড়া হয়ে গেছল তার মধ্যেই—কৃষ্ণচরণ সরকারের পাঠাগারের থেকে নিয়ে। দামিনীকে কোলে করে নরেনের সেই নালা পেরুনোর ঘটনাটা আমার অবচেতনের মধ্যে যেন বিদ্যুতের মতই চমকে উঠল অকস্মাৎ। আমাকে নালায়িত করল।

বিশিষ্টরূপে বহন করার মানেই যে বিবাহ, তদ্ধিত প্রত্যয়ের সেই তথ্য বাংলার সারের সৌজন্যে আমার অজানা ছিল না তদ্দিনে। নরেনের মতই তাকে মাটিতে নামাবার আগে আমার স্বামীত্বের স্বাক্ষর তার মুখপত্রে রেখে দিয়েছি।

'এটা কী হোলো আবার ?' ওর দু চোখে দুই সৌদামিনী খেলে যায়।

'আমাব লায়ন্স শেয়ার।' আমি বললাম, 'মজুরি নিলাম...আমার এতক্ষণ তোকে বয়ে আনতে কষ্ট হল না বুঝি ? একটুখানি মিষ্টিমুখ করে সেই কষ্ট লাঘব করা গেল।'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সিঙিয়ার আমবাগানের সামনে এসে পড়েছি।

'ও বাবা ! এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব নাকি এখন আমরা ? ভেতরটা কী দারুণ অন্ধকার।'

'জঙ্গল বলছিস ? সিঙিয়ার বিখ্যাত আমবাগান—এর নাম। হাজার খানেক আম গাছ আছে বাগানটায়। ভালো ভালো আম যতো। ল্যাংড়া বোম্বাই ফজলি গোপালভোগ হিমসাগর ক্ষীরসাপাতি—কতো কী ! আমের সময় আমরা ছুরি নিয়ে চলে আসি। গাছতলায় কত পাকা আম পড়ে থাকে যে। কাটি আর খাই।' আমি জানাই : 'অনেক ছেলে আবার গাছে উঠেও খায় বসে বসে।'

'আমিও খাব, এবার যদি আমের সময় আমাদের থাকা হয় এখানে।' রিনি বলে 'আমি কিন্তু গাছে উঠতে পারব না।'

'আমিও পারিনা। গাঁয়ের অনেক মেয়ে পারে কিন্তু। গেছো মেয়ে কিনা তারা।'

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এই অন্ধকারে বাগান দিয়ে যেতে ভয় করছে আমার। সাপখোপে কামড়ায় যদি ?...কতখানি পথ গো ?'

'তা, আধ মাইলটাক হবে। ইস্কুল যাবার সময় এই বাগান দিয়েই তো আমরা শর্টকাট করি। রাজবাড়ির ডান দিকে রামসীতার মন্দির, আর তার পাশেই আমাদের ইস্কুলটা। সাপের ছোবলের ভয় করছিস ? তাহলে, কোলে করে নিয়ে যাই তোকে ?'

'আর ওই বলে...' আর কিছু সে বলে না। তার চোখের চকচকানিতেই কথাটা বলা হয়ে যায়। —'বুঝেছি।'

'খেতে খেতে যাব আর যেতে যেতে খাব এই কথাই বলছিস তো ? বাবা বলেন, মুখের অন্ন সম্মুখের অন্ন ছাড়তে নেই। তা যখন অন্নপূর্ণাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছি...'

'অত অন্ন খাওয়া ভালো নয় মশাই। গরহজম হয়।'

'তা যা বলিস।' আমার জবাব : 'কিন্তু যতই খাই না কেন, তোর মাথা খেতে পারব না। তোর মাথা অলরেডি খাওনা। মামা বলে, কলকাতায় মাথা না খাওয়া মেয়ে নাকি একটাও নেই—তারাও নাকি আবার জোর মাথাখোর।' আমার মামার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করি—'আর, তুইও তো কলকাতার মেয়ে ! তার ওপর এমন সুন্দর। তোর মাথা কি না-খাওয়া আছে এখনও ?'

'কে খেল শুনি ?'

'কে খেয়েছে কে জানে।' কেউ না কেউ খেয়েছেই।'

'না বাপু, তুমি সড়ক ধরেই চলো। পথ দেখে দেখে যাব আমরা। পথের দুপাশে দেখবার কিছু নেই কি।'

'অগত্যা তিলকুট আর চিড়ের নাড়ু চিবুতে চিবুতে সড়ক ধরেই চললাম আমরা।

এতখানি পথ! ইস্কুলে যাবার সময় কতটাই না মনে হয়! কিন্তু এখন যেন দেখতে না দেখতে ফুরিয়ে গেল। পকেটের রসদ ফুরোতে না ফুরোতেই পথ খতম।

'ও বাবা! কত বড়ো একখানা বাড়ি গো। এই বুঝি তোমাদের সেই রাজবাড়ি? চাঁচোরের রাজার?'

'হ্যাঁ, নতুন রাজবাড়ি। ওর ডান দিকে রামসীতার মন্দির ওই। আর তাঁর পাশেই আমাদের হাই স্কুল।'

'কলকাতায় এত বড় বাড়ি দেখিনি।' রিনি অবাক হয়ে দ্যাখে। —'তবে কলকাতার কতটুকুই বা দেখেছি।'

'ভেতরে আবার আরও কত বড়ো। যতখানি চওড়া দেখছিস সামনেটা, ততটাই ডান দিকে, বাঁ দিকেও ততখানি, পেছনেও আবার তাই। কতো কতো ঘর যে। কতো বড়ো একখানা ছাদ। ফুটবল খেলা যায়। ছাদে আবার কল আছে—খুললেই জল পড়ে।'

'কলকাতার মতই নাকি? বলো কি গো?'

'তা হবে। কলকাতার কল দেখিনি তো আমি।' ...কাঁসর ঘণ্টা বাজছে শোন! আরতি শুরু হয়ে গেছে এখন।'

আমরা মন্দিরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াই। আরতি দেখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'বাঃ, বেশ ঠাকুর তো। রাম সীতা লক্ষন হনুমান...' রিনি গড় হয়ে প্রণাম করে। আমিও!

'তোমার সিংহবাহিনী কই গো? দেখছি না তো।'

'এরই মধ্যে আছে কোনোখানে। এতদূর থেকে ভালো দেখা যায় না। এইটুকুন ঠাকুর তো।' আমি বলি: 'সিংহবাহিনী তো দুর্গাই। মা দুর্গারই একটা নাম সিংহবাহিনী। আমি এখানে মন নিয়ে এসে মা'র কাছে কি প্রার্থনা করলাম এখন জানিস।'

'কী?'

'আমি যেন রামের মতন রাজা হই।'

'রাজা হবে? রাজা হবে তুমি? রাজা হয়ে কী করবে?'

'সিংহাসনে বসব ঐরকম। তুই সীতা হয়ে আমার পাশে বসবি, আর আমার ভাই সত্য লক্ষণ হয়ে ছাতা ধরে থাকবে আমার মাথায়। আর হরিটা হনুমান হবে।'

'হরি আবার কে?'

'আমাদের ছোট্ট ভাই। মামার বাড়ি থাকে কলকাতায়। দিদিমার ন্যাওটা কিনা। দিদিমা ভারী ভালোবাসেন তাকে। তাঁর কাছেই থাকে।' আমি জানাই—'সে হনুমানের মত হাত জোড় করে থাকবে আমাদের সামনে।'

'হনুমানের মতন ল্যাজ আছে ওর?'

'নেই, তবে ল্যাজ হবে—হয়ে যাবে ল্যাজ। —তুই দেখে নিস।'

'হ্যাঁ, তারও ল্যাজ হয়েছে আর আমিও সীতা হয়েছি!' রিনি হাসতে থাকে।

॥ বারো ॥

আরতি দেখে ফিরতে একটু রাত হল। মা বললেন,'কি রে, এত দেরি করলি যে। খাবার সময় হয়ে গেল, পড়তে বসবি কখন ? সামনে তোর পরীক্ষা না ?'

'পরীক্ষা কিসের মা। প্রমোশন তো সামনে।'

'পাশ করেছিস ?'

'করে! পরীক্ষার ফল জানা হয়েছে, এক অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়েই ভালো মতন পাশ।' জানালাম : 'বাংলায় তো ফার্স্ট হলাম।'

'বলিস কি রে। পড়লি না টড়লি না, বাজে বই পড়ে সময় কাটালি, পড়ার বই ছুঁলি না পর্যন্ত। পাশ করে গেলি!' মা হতবাক্।

'তোমার আশীর্বাদে।' আমি জানাই : 'তুমি যে প্যাঁচ শিখিয়ে দিয়েছ না, তাই কষেই তো তরে গেলুম এ যাত্রা। বরাবর এই করেই তরব আশা করছি...কোশ্চেন সব আউট করলাম যে।'

'সে কি রে। কোশ্চেন আউট করলি কি ? অ্যাঁ ?' মা হতবুদ্ধি—'আমি আবার কী প্যাঁচ শেখালুম তোকে।'

'ঐ যে ! ভুরুর মধ্যেখানে মন এনে মা দুর্গাকে ডাকতে—পরীক্ষাতেও সেই ভুরকুটি দেখিয়েছি। ঐ করে কোশ্চেন সব বার করেছি। তাই আমাকে আর কষ্ট করে পড়তে হয়নি, পরীক্ষা পাশ করতে হয়নি, এমনি করেই পরীক্ষার পাশ কাটালাম। পরীক্ষাই আমায় পাশ করে গেল এবার।'

'শুনি তো ব্যাপারটা।' মা'র আগ্রহ দেখা যায়।

'এইরকম আর কি', আমি বিশদ ব্যাখ্যা করে দিই, 'চোখ বুজে ঐ সন্ধিস্থলে, নাকি সন্ধিক্ষণে- মন নিয়ে আসি আর মা দুর্গার নাম করে একটা বইয়ের একটা করে জায়গা বার করি—এমনি করে পাঁচবার করার পর সেই সব জায়গার দুদিকের পাতার, মোট দশ পৃষ্টার সবখানি দুরস্ত করে রাখি, তার পরে দেখা গেল ঐ দশ পৃষ্টার ভেতর থেকেই বেশির ভাগ প্রশ্ন এসে গেছে। পাশ করার মতন নম্বর পেয়ে গেছি তাইতেই।'

'এই করে পাশ করেছিস তুই ?' মা'র মুখে রা সরে না।

'হ্যাঁ। এই করে ইংরেজি বাংলা ভূগোল ইতিহাস সব, শুধু অঙ্কটাতেই সুবিধে হল না মা। পঁইত্রিশ পেয়ে টায়েটুয়ে কোনোরকমে পাশ।'

'মোটে পঁইত্রিশ ?'

'হ্যাঁ, সব অঙ্ক জানা ছিল না তো। একটা বড় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক, একটা ডেসিমেলের, ফ্র্যাকশনের আঁক একটা,আর ঐ সিঁড়ি ভাঙা একখানা কষতে পেরেছি কেবল। জিয়োমেট্রির একটা থিয়োরেমও করেছিলাম কিন্তু তার জন্যে মাত্র আদ্ধেক দিয়েছে।'

'আদ্ধেক কেন ?'

'আমি এখানে মন নিয়ে এসে মনগড়াভাবে সেটাকে মিলিয়ে দিয়েছিলাম কি না। অঙ্কের স্যার বললেন যে আমি যেভাবে প্রুভ করেছি তাও হতে পারে বটে, তবে বইয়ের মতনটাই ফলো করতে হবে আমাদের। সেই কারণে তার জন্যে পুরো নম্বর দেননি।'

'বাকী অঙ্কগুলো তোর জানা ছিল না কেন ? ঐখেনে মন নিয়ে এসে চেষ্টা করিসনি কেন জানবার ?'

করেছিলাম। বের করেছিলাম দশটা পাতা, তার ভেতরের আঁকও এসেছে হয়ত বা, এসেছে কি না তাও জানি না, আসতে পারে হয়ত—কিন্তু ঐ অঙ্কগুলো তো আমার জানা ছিল না, কষিনি তো আগে।'

'কেন, কষিসনি কেন ? আর জেনে তখন-তখনি বা কষে নিলি না কেন—ঐ অঙ্কগুলো ?'

'কী করে করব ? আগের অঙ্ক না জানা থাকলে, কষে না রাখলে পরের অঙ্ক কি করা যায় নাকি ? এ তো আর তোমার মুখস্থ করা নয় যে মুখস্থ করে রাখলেই হবে—স্টেপ্ বাই স্টেপ্ এগিয়ে যাবার ব্যাপার। আগের অঙ্কগুলোই করিনি যে।'

'অঙ্কের মাস্টার ক্লাসে হোম টাস্ক দেন না তোদের ? দেখাতে হয় না প্রত্যেক দিন ?'

'হয় বইকি। সে আমি ম্যানেজ করি।' আমি বলি, 'কাবিল হোসেন আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, আমার খুব বন্ধু। হোমটাস্কের আঁকগুলো আমার খাতায় কষে দেয় সে রোজ রোজ—তাই আমি সেকেন্ড মাস্টারকে দেখিয়ে দিই। প্রতিদানে কাবিলকে আমি মাঝে মাঝে রসগোল্লা খাওয়াই বাণিজ্যার দোকানে।'

'তাই নাকি রে ?'

'হ্যাঁ। তবে সেও খাওয়ায় মা আমায়। তাদের হোস্টেলে মুর্গি-টুর্গি হলে ডেকে নিয়ে খাওয়ায়।... মুর্গি খাওয়া কি খারাপ মা ? মুসলমানের খেলে কি জাত যায় আমাদের ?'

'পাগল ! হিন্দু মুসলমান আবার কী ? জাত বলে কিছু নেই রে ! তবে গোরু টোরুগুলো খাসনে যেন কখনো।'

'না, তারাও খায় না। আমরা মনে কষ্ট পাব বলে কাটেও না তারা।' মাকে আমি ভরসা দিই—'আমি তাকে তোমার ওই মা দুর্গার প্যাঁচটা শেখাতে গেছলাম, সে বললে যে, তাদের ওটা করতে নেই। আল্লা ছাড়া আর কোনো দেবতাকে ডাকলে তাদের গুণা হয়। সে বললে বিসমিল্লার কাছে প্রার্থনা করলেও সেই ফলই পাওয়া যাবে—বিসমিল্লা হের্ রহমানে রহিম—এই মন্তর বলে চাইতে হয় নাকি। তা কি হতে পারে মা ?'

'কেন হবে না ? একই তো সব। সব তো একই। সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে সেই ভগবান—সেই কেন্দ্রস্থলে মন নিয়ে যেতে হয় কেবল, তাহলেই হলো। এখন, যে মন্তরে, যা বলে ডেকে সেখানে তুমি যাও না কেন ! আসলে সেই একই জিনিস—এক ভগবান। বিসমিল্লা আর দুর্গা এক—সেই এক বিন্দুবাসিনী।'

'বিসমিল্লা হের্ রহমানে রহিম আর মা দুর্গা এক ? কথার হেরফের কেবল ? আচ্ছা, যেমন করে এখানে মন এনে কোশ্চেন জেনে পাশ করলাম তেমনি করেই তো ফার্স্টও হতে পারি আমি ?'

'তা কি করে হবে ? পড়াশুনা না করে—পাঠ্যবইদের বিলকুল ফাঁকি দিয়ে ? তা কি হয় নাকি রে ?' মা বলেন, 'যে ছেলেরা রীতিমতন খেটেখুটে পড়ছে তাদের ভেতর থেকেই ফার্স্ট হবে, তুই শুধু কোনোরকমে পাশ করে যাবি কেবল।'

'তা কেন মা ?'

'সাধনা না করলে কি সিদ্ধি হয় রে ? যে ছেলেটা খেটে পড়ছে সে যদি মা দুর্গাকে নাও ডাকে তবুও সেই ফার্স্ট হবে—তার ঐ খাটুনিটাই তো আসলে ভগবানকে ডাকা। আর যদি খাটেও আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাকেও—তাহলে সে কোথায় গিয়ে উঠবে বলাই যায় না। উন্নতির চূড়ান্ত হবে তার আর এইভাবে ফাঁকি দিয়ে তরতে গিয়ে তোর তলিয়ে

যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু ঐ মাকে ডেকেছিস, তাই তুই ডুবে যাবিনে একেবারে, শুধু ভেসে থাকবি কোনোগতিকে। সারাজীবন এইভাবে ভেসে ভেসেই কাটবে তোর।'

'ভাসা ভাসা জীবন হবে ? তুমি বলছ ?'

'আমি কিছু বলছি না। সেটা মা'র ইচ্ছে। তবে জেনে রাখিস্ সাধনা না করলে কোনই সিদ্ধি হয় না। যেমন তোর ওই অঙ্কের মতন। কী অঙ্কগুলো আসবে জানতে পারলেও কষতে পারলিনি —স্টেপ্ বরাবর এগুসনি বলে। ওই স্টেপ্ বাই স্টেপ্ এগিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে সাধনা। ফাঁকতালে কিছুই মেলে না রে, অমনি করে এগিয়ে গিয়েই পেতে হয় সব।'

'অঙ্ক যে আমার একদম্ ভালো লাগে না মা!'

'তাহলে কি করে হবে রে। তবে কি করে এখান থেকে উৎরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকোঠ ডিঙোবি ? আর তা না হলে...তোর বাবা যে তোকে বিলেত পাঠাতে চায় রে। সেখান থেকে আই-সি-এস পাশ করে আসবি তুই। জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবি। তোকে সিভিলিয়ান দেখার স্বপ্ন যে তাঁর অনেক কালের। খেয়ে না খেয়ে টাকা জমাচ্ছেন সেই জন্যে।'

'আমি চাই না জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে। ওসব হতে ভাল লাগে না আমার। কী হয় ওসব হয়ে ? ওই তোমাদের এক বিচ্ছিরি শখ মা ! ছেলেদের সব সিভিলিয়ান করার মতলব। বামুনপাড়ার আদ্ধেক ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে—বসে বসে পড়তে লেগেছে সবাই। তাদের বাবাদের শখ সিভিলিয়ান করার। হাকিম মুনসেফ উকীল ব্যারিস্টার ডাক্তার সাবরেজিস্টার হবে। বাবার শখ মেটাতে উঠে পড়ে লেগেছে তারা।'

'সেটা কি খারাপ ?' মা বলেন : 'ভালোই তো। তাদের নিজেদের পক্ষেই তো ভালো।'

'ভালো না ছাই। ওসব হতে চাই না আমি। আমি চাই আমি হতে। তা কী করে হওয়া যায় যে... !'

'ভেবে কোন কূল পাচ্ছিসনে তার ?'

'পেয়েছিলাম তো একটা কূল—তোমার কথায়। এখেনে মন এনে মা-দুর্গার কাছে চেয়ে চেয়ে আমার কাজ বাগাতে। তুমি তো বলছ যে কেবল তাতে হবে না। শর্টকাট করলে চলবে না, সারা পথটা হাঁটতে হবে—হেঁটে হেঁটে সারা হতে হবে আমায়। কিন্তু তা কি করে হয় ? অমনতর হাঁটবার আমার ক্ষমতা নেই। ইচ্ছেও করে না আমার।'

'তাহলে আর কি করে হবে।' মা সান্ত্বনা দেন—'তবে খুব বড় হলেও কিছু একটা হবিই। কিছু কিছু হবে তোর। ভিক্কে-শিক্কে করে যা হয়। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—বলেছে না ? ভগবানের কাছে ভিক্কে চাইলেও প্রায় সেই কথাই। তবে ওরই মধ্যে একটুখানি ইতর বিশেষ—এই যা।'

'কেবল প্রার্থনা করে মেলে না কি মা ?'

'চাইতেও হবে, চেষ্টাও করতে হবে—তবেই হবে ষোল আনা। চাই কি, তার চেয়েও বেশি হতে পারে। চেয়ে চেয়ে এগুতে হবে—এগিয়ে গিয়ে আগাবার পর চাইতে হবে—তবেই না হবে পথ চলা। পথ চলাটাই তো আসল রে। গন্তব্যস্থল কোথাও নেই।'

'কী মুশকিল! কী মুশকিল!'

'মুশকিলটা আবার কোনখানে ?'

'আমি ভেবেছিলাম তোমার সিদ্ধিটা আমার কাজে লাগাব। তোমার ঐ প্যাঁচটা কষে যা হবার হতে পারব—যা যা চাইবার, যা পাবার পেয়ে যাব সব—এখন দেখছি... '

'আমার আবার সিদ্ধি কি রে ?' মা একটু বিস্মিতই।

'তুমি তো সিদ্ধিলাভ করে বসে আছ, ভৈরবী বলছিল আমায়।'

' ভৈরবী তো সব জানে!' হাসতে থাকেন মা : 'ওই সব আজেবাজে কথায় কান দিস তুই! বিশ্বাস করিস ?'

'বা রে! ফল পেয়েছি যে! না পড়ে পাশ করে গেলুম কি করে তাহলে ?'

'ও কিছু নয়। এক-আধবার ওরকম হয়ে যায়। কখনো আবার হয়ও না। কেন যে হয়, কেন যে আবার হয় না তা আমি জানি না। মনে হয়, তুই যে একবার বলেছিলি না ? মা কালী একটুখানি খামখেয়ালী, তাই হয়ত এর কারণ হবে। পরমহংসদেবের কথামৃত পড়তে দিয়েছিলাম যে তোকে ? পড়েছিলিস ?'

'পাঁচ খণ্ডই। কবে শেষ করেছি।'

'কী বলেছেন তাতে ঠাকুর ? এরকমটা হলেও এটা হওয়াতে নেই। এটা একটা ছোটখাট সিদ্ধাই—বুঝেছিস ? ঠাকুর সিদ্ধাইয়ের বিরুদ্ধে, সেটা টের পাসনি ?'

'পেয়েছি। কিন্তু তিনিই তো আবার বলেছেন যে গুরুকেও বাজিয়ে নিতে হবে? বলেননি? বাজিয়ে না দেখলে সিদ্ধাই কিনা বুঝব কি করে ?'

'তাই কি তুই ওই সিদ্ধাইটা বাজিয়ে দেখছিস নাকি ?'

'যদি বলি তোমাকেই। তোমাকেই বাজিয়ে দেখছি আমি। মা'র চেয়ে বড়ো গুরু তো নেই আর, ভৈরবীর কথা। তুমি তো আমার পরম গুরু। -তাই তোমাকেই, তার মানে, তোমার কথাটাকেই বাজাতে লাগলাম। তোমার ওই সিদ্ধাইটাকেই...'

'আমার আবার সিদ্ধাই কিসের!'

'সিদ্ধাই না বলে যোগবল যদি বলি ? তোমার যোগবল ?'

'আমি আবার যোগ করলুম কবে রে ?'

'যোগ না করলে তুমি এই কৌশলটা জানলে কি করে তবে ? বাবা যে বলেন, যোগঃ কর্মসু কৌশলম, মানে যে. যোগ হচ্ছে গিয়ে কাজ করার কৌশল, সেটা কি মিথ্যে ?'

'না না, মিথ্যে কেন হবে ? শাস্ত্রবাক্যই।'

'আমি কেবল সেই কৌশলটাই কাজে লাগাচ্ছি তো। ছলে বলে কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে হয় না ? তাই এই কৌশলেই কাজ হাসিল করছি আমার।'

শুনে মা গুম হয়ে যান-কিসের ভাবনায় যেন তাঁকে কাতর করে : 'মনে হচ্ছে আমিই তোর সর্বনাশ করলুম বুঝি। তোকে এই প্যাঁচটা শিখিয়ে দিয়ে...যাক্, মা-ই তোকে বাঁচাবেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর পায়েই তো ফেলে দিয়েছি তোকে।'

'তুমি কি ব্রহ্মকে জেনেছ মা ?' আমার আচমকা জিজ্ঞাসা। শুনে মা যেন চমকে যান—ব্রহ্ম ? ব্রহ্মকে কি জ্ঞা যায় নাকি ? জানতে পারে কেউ ?'

'তুমি জেনেছ।'

'পাগল! জানলেও কি কেউ কাউকে তা জানাতে পারে ? ব্রহ্মকে কেউ মুখের থেকে বের করতে পেরেছে কখনো ? ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট বলেননি ঠাকুর ? কী পড়লি তবে সেই কথামৃতে ? ব্রহ্মকে মুখের থেকে বার করা যায় না, নিজে তার স্বাদ পেলেও অমৃততুল্য সে সোয়াদ আর কাউকে দিতে পারে না কেউ কখনো...'

'হ্যাঁ পারে। ব্রহ্ম কী তা জানিনে, তবে তার সোয়াদ অপরকে দেওয়া যায় জানি একদিন দিয়েছিল আমাকে।'

'রিনি ? তাই নাকি ? কী রকমের ব্রহ্ম শুনি তো একবার ? কেমন তার সোয়াদ ?'

'সন্দেশ।' আমি জানাই। রিনির স্বমুখের থেকে বের করা অমৃত অংশটুকু উহ্য রেখে, ব্রহ্মস্বাদের পনের আনাই বাদ দিয়ে মুখ্য খববের, না, খাবাবের এক আনাটাক ব্যক্ত করি।

'সন্দেশ! সন্দেশই বুঝি তোর কাছে ব্রহ্ম রে ? ব্রহ্মস্বাদ সহোদর ঐ সন্দেশ? বটে বটে?' হাসতে থাকেন মা—'তবে সেই সন্দেশ নিজে না খেয়ে পিঁপড়েদের খাওয়াতে যাস কেন? তাদের গর্তে-গর্তে রেখে আসিস যে ?'

'সব ভালো জিনিসই সবাইকে দিয়ে খেতে হয়, তুমিই তো বলেছ মা! বিলিয়ে না দিলে ভগবান মিলিয়ে দেন না। এমন কি, তোমার এই প্যাঁচটাকেও আমি অনেক ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছি। সবাই মিলে মা দুর্গাকে জব্দ করুক না। আমি একাই কেন মজা লুটি! তারাও ভগবানের সাহায্যে উৎরে যাক—কার্যোদ্ধার করুক। তোমার ঠাকুর বলেছেন না ?...'

'কী বলেছেন ঠাকুর ?'

'বলেছেন গুরুর মতন হাঁড়ি কলসিকেও বাজাতে হবে, নাকি, হাঁড়ি কলসির মত গুরুকেও বাজিয়ে নিতে হবে ? ভগবানের চেয়ে তো গুরুতর আর কিছু নেই। তাই হাঁড়ি কলসির মতই ভগবানকেও আমি বাজাতে লেগেছি। চাই কি, ভগবানের এই হাঁড়ি হাটেও একদিন আমি ভাঙতে পারি হয়ত।'

'সে কি রে!'

'তাই। ভগবানকে আমি কাজে লাগাতে চাই মা। যে ভগবান আমাদের নিত্যকার কাজে লাগবে না, সে-ভগবানে আমাদের কী কাজ মা ?'

॥ তের ॥

'ভগবানকে কাজে লাগাবি কি রে! ভগবানের কাজে লাগবি তো!' আমার কথায় মা হতভম্ব হন। —'ভগবানের কাজের জন্যেই আমরা এসেছি তো...তাঁর সেবার জন্যেই।'

'ভগবানের সেবার জন্যেই সবাই ?' আমি শুধাই: 'তাঁর সেবা করা ছাড়া আর আমাদের নিজেদের কোনো কাজ নেই ?'

'আবার কী কাজ ? তাঁর সেবা তাঁর উপাসনা করাটাই তো মস্ত কাজ।'

'তা ছাড়া আর সমস্ত কাজ ? সেবা করাটা আবার কি রকম ? উপাসনা কাকে বলে ?'

'উপাসনা মানে তাঁর কাছে বসে থাকা. তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শোনা, তাঁর নামগান করে তাঁকে শোনানো।'

'আর সেবা মানে তো গিয়ে ভোগ দেওয়া ? তাই না মা ? আমাদের নিজেদেরকেই কি ভোগ দেব তাকে ? নাকি, নিজেদের যত ভোগ...? যত না কর্মভোগ...?'

'সেবা বল পূজা বল ভালোবাসা বল—তাঁকে ভালোবাসার জন্যই আমাদের জন্মানো। তিনি যে ভালোবাসার ধন।'

'ভগবানকে ভালোবাসব কী মা ?' তাঁর কথায় আমিও কম অবাক হইনে: 'ভগবানকে কি ভালোবাসা যায় ? যার ধারণাই করতে পারিনে তাকে আমরা ভালোবাসব কি করে ?

'ভালবাসা যায় না ভগবানকে ?'

'একটা পিঁপড়ে কি একটা হাতিকে ভালোবাসতে পারে ? হাতী যে কী, তা তো সে টের পায় না কোনোদিন। তার গায়ে হেঁটে চলে বেড়ালেও না, তার পায়ের তলায় চাপা পড়লেও নয়। হাতি ও পিঁপড়ের ঠাওর পায় কি না কে জানে।'

'পায় না ? তুই বলছিস ?'

'হাতীর পক্ষেও একটা পিঁপড়েকে ভালোবাসা অসম্ভব। আর পিঁপড়ের ভালোবাসা পেতে হলে, কি পিঁপড়েকে ভালোবাসতে হলে তোমার হাতীকে ওই পিঁপড়ে হয়েই জন্মাতে হবে আমার মনে হয়।'

'তাই তো জন্মায় রে। ভগবান মানুষ হয়ে জন্মান তো সেই জন্যেই। তাঁর অবতার হওয়া তো সেই হেতুই।'

'তাই বল মা। তিনি মানুষ হয়ে জন্মেছেন...জন্মাচ্ছেন...আমাদের ভালোবাসা পাবার লালসায়। আমি তো সেই কথাই কইছি মা। ...ভগবানকে ভালোবাসাই যায় না। মানুষকেই কেবল ভালোবাসা যায়, কারণ মানুষকে আমরা বুঝতে পারি, তার ভালোবাসাও টের পাই আমরা।'

'একই কথা। মানুষকে ভালোবাসাও সেই ভগবানকেই ভালোবাসা।'

'আর, মানুষের ভালোবাসাও সেই ভগবানেরই ভালোবাসা—তাই বলছ তো ?' আমি হাঁফ ছাড়ি : 'আর রিনির ভালোবাসা আমার কাছে তাই ভগবানের ভালোবাসাই।'

'কী বললি ?' মা চকিত হন। —'কার ভালোবাসা বললি ?'

'বলছিলাম যে এই জন্যেই আমরা ভগবানের ভালোবাসার কাছে ঋণী। মানুষের এই ভালোবাসার জন্যেই। এবং তাঁরও এত কষ্ট করে মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের মারফতে অন্য মানুষকে ভলোবাসার জন্যে এমন দুঃখ পোহানো—এই ত্যাগস্বীকার—তার জন্য আমরা ঋণী নই কি ?'

'ঋণী বই কি। আর তিনিও তো আমাদের ভলোবাসার স্বাদ পাবার জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মান। এই কারণেই তো তাঁর অবতার হওয়া।'

'অবতার না হয়েও তো তিনি এন্‌তার মানুষ হয়ে জন্মেছেন—জন্মাচ্ছেন এখনো, যত খুশি তোমরা ভালোবাসো না। যাকে খুশি তাকে। তাই না মা ?' আমি বলি—'কিন্তু আমরা মানুষকে না ভালোবেসে তাঁকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁর সেই স্বাদে বাদ সাধছি কেবল। তাই নয় কি মা ?'

'মানুষকে ভালোবাসলেও সেই তাঁকেই ভালোবাসা হয় রে।' মা বলেন, 'আর ভগবানকে ভালোবাসাও .. ..ঠাকুর বলেছেন ...'

'অত ঘুরে আমার নাক দেখতে যাব কেন মা ? নাকের সামনেই তো মানুষ।' সোজাসুজি মানুষকেই ভালোবাসব ....মানে রিনিকেই....মানে কিনা, যার ভালোবাসায় আমি ঋণী....যার কাছে ভালোবাসার স্বাদ পেলাম প্রথম, সেই মানুষকেই।'

'ঠাকুরের কথাটা হোলো....'

তোমার ঠাকুর যাই বলুন না মা', তাঁর কথায় আমি বাধা দিই—'ঠাকুরের বিবেকানন্দ কিন্তু কোনোখানেও ভগবানকে ভালোবাসার কথা বলেননি, মানুষকেই ভালোবাসতে বলেছেন। পড়লাম তো কতো বই-ই তাঁর, কিন্তু কোথ্থাও না। ভগবানকে ভালোবাসবার কথাই নেই।'

'বলেননি তিনি কোথাও ?'

'কোথায় ! তিনি তো বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেই জন....'বলে আমি তক্ষুনি বিবেকানন্দ আওড়াতে যাই।

'কোথায় পেলি বিবেকানন্দের বই ? পড়লি কবে ?'

'আমার জীব বার করার আগেই মা'র বাধা পাই। নির্জীবের ন্যায় বলি—'কলিগাঁয়। কোবন্দা-দার ভারতীভবন লাইব্রেরীর থেকে নিয়ে। তাঁর পাঠাগারে কতো রকমের বই আছে যে ! বিবেকানন্দের বই, অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ, এমনি সব ভালো ভালো বই। যতো কর্মবীরদের জীবনী। মানে সেই সব বই যা পড়লে নাকি মানুষ হওয়া যায়....গল্পের বই নয়, প্রবন্ধের বই যতো। সেখান থেকেই নিয়ে পড়েছি আমি।'

'বিবেকানন্দের কথাটা তুই বুঝিসনি ঠিক। ভগবানকে না ভালোবাসলে মানুষকে ঠিক ভালোবাসা যায় না।'

'ভগবানকে তো ভালোই বাসা যায় না মা !....ভগবানকে ভালোবেসে কোনো সুখ নেই।'

'সুখ নেই ? বলিস কি রে তুই ? ভগবানকে ভালোবাসলে তোর মানুষের ভালোবাসার চাইতে সহস্রগুণে সুখ, তা জানিস ? ঠাকুর বলেছেন ....'

'তোমার ঠাকুর যাই বলুন না মা, তাঁর কথায় আর কাজে কোনো মিল নেই—আমি বলব। ভগবানকে ভালোবেসেই যদি এত সুখ তবে তিনি শুধু তাই নিয়ে না থেকে মানুষকে ভালোবাসতে গেলেন কেন আবার ? তিনি তো মা কালীকে দেখেছিলেন, পেয়েছিলেনও হদ্দমুদ্দ, তবে তিনি তাঁর ভালোবাসাতেই তৃপ্ত না হয়ে বিবেকানন্দকে নিয়ে মত্ত হতে গেলেন কেন ? মা কালীতেই না মশগুল থেকে তাঁর কাছে নরেনকে এনে দাও, নরেনকে এনে দাও বলে কান্নাকাটি লাগিয়েছিলেন কেন ? নরেনতো একটা বাচ্চা ছেলেই তখন। প্রায় আমার মতই হবে।' আমি জানাই : 'মা কালীতেও তাঁর আশ মিটলো না। তাই, তাকে পাবার পরেও একটা ছেলের জন্যে তিনি পাগল হলেন শেষটায়।'

'মা কালীর জন্যেও কি তিনি বালিতে মুখ ঘষেননি একদিন ?'

'তা ঘষেছিলেন। কিন্তু বালিবধের পর হনুমানকে নিয়েই মজে গেলেন তো সেই।' সুরেশ সমাজপতির মতন তাঁর সমালোচনা আমার। —'তাঁর আগের জন্মে যেমনটা ঘটেছিল প্রায় তেমনটাই।'

'আগের জন্মের....হনুমানকে নিয়ে মজলেন।' মা ঠাওর পান না ঠিক।

'মজলেন না ? যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ তিনিই তো সেই রামকৃষ্ণ ? তাহলে যিনিই বিবেকানন্দ তিনিই সেই হনুমান।' আমার অনুমান ব্যক্ত করি, 'অবশ্যি আমার মতন হনুমান না, আমাকে তুমি যে হনুমান বলো সে হনুমান নয়, আমার ন্যায় দুর্বল নয়, হনুমানের মহাবীর সংস্করণ। মানে, বলছিলাম কি', আমার ব্যাখ্যা প্রকাশ করি—'হনুমান যেমন সমুদ্রলঙ্ঘন করেছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনি কি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে একালের স্বর্ণলঙ্কা আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার রাক্ষসদের তাক লাগিয়ে দেননি ? হনুমান যেমন শ্রীরামের বাহন, বিবেকানন্দও তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাহন তো ? তাঁর ভাবধারা বহন করে নিয়ে গেছলেন সেখানে। আসলে এটাকে—এই ক্রিশ্চান মুলুকে গিয়ে তোলপাড় করাটাকে আমি তাঁর লঙ্কাকান্ড বাধানোই বলব মা। তোমার ঠাকুর যেমন কুরুক্ষেত্র কান্ড বাধিয়েছিলেন তাঁর আগের জন্মে কৃষ্ণঠাকুর হয়ে....যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ তিনিই শ্রী....'

'তোর কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। গোঁজামিলের কথা রাখ তো। এলোমেলো কথা যত তোর। এসব কথা থাক্, তোর বইখাতা নিয়ে আয় দেখি। পড়াশোনাটা কেমন হচ্ছে দেখা যাক একবার।'

খাতাপত্তর নিয়ে আসি সব। উলটে—পালটে দেখে মা বলেন—'অঙ্কের খাতাটা কই? দেখছি না তো এর ভেতরে।'

'বলেছি না তোমায়? মাতৃ অঙ্ক ছাড়া আর অন্য কিছু আমি জানি না। অঙ্কটঙ্ক একদম আসে না আমার।'

'তাহলেও খাতা একটা থাকবে তো? গেল কোথায়?'

'কাবিলের কাছে আছে। বলেছি না, আমার বন্ধু মহম্মদ কাবিল হোসেন আমার খাতায় প্রতিদিনের আঁকগুলো সব উতরে দেয়, তাই সে খাতাটা ইস্কুল থেকে নিয়ে যায়, পরদিন আবার নিয়ে আসে ইস্কুলে ঠিকঠাক করে। আমার আঁকের খাতার মোকাবিলা সে-ই করে।'

'দেখি তোর কম্পোজিশনের খাতা তবে। ট্রান্সলেশনের খাতাটা দেখি।'

'ওই তো আছে। তোমার সামনেই তো।'

'এসব কী লিখে রেখেছিস খাতায়?'

'দ্যাখো না।'

'গদ্যপদ্যের ছড়াছড়ি দেখছি। এসব কী আবার? কিসের মহাভারত?'

'মহাভারত নয়, রামায়ণ।'

'রামায়ণ!' মা যেন আকাশ থেকে আছাড় খান।

'পড়ে দ্যাখো না, কেমন আমি রামায়ণ লিখলাম।'

'রামপেসাদী কান্ড বাধিয়েছিস যে? তিনি যেমন হিসেবের খাতায় মায়ের গান ফেঁদে ছিলেন, দে মা আমায় তবিলদারি-র গান বেঁধে রেখেছিলেন, তুইও তাই করেছিস দেখছি।'

'শিবপ্রসাদের ছেলে হয়ে সেটা কি খুব বেহিসেবী হয়েছে মা? বাবা তো পদ্যটদ্য লেখেন, বইও ছাপিয়েছেন সেই সব নিয়ে, আমিও তদ্রূপ কৃত্তিবাসের তহবিল তছরূপ করেছি মা। কৃত্তিবাসের মতন আমিও রামায়ণ লিখছি একখানা।'

'দেখি তোর কান্ডটা।' পাতাগুলোর ভেতর দিয়ে ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে যান মা।

'একটা কান্ড হয়নি এখনো।' আমি জানাই: 'সাতকান্ডর সবটাই বাকী। মাঝে মাঝে লিখে গেছি খানিক খানিক। যখন যেখানটা আমার মনে ধরেছে লিখে রেখেছি।' আরো আমি বিশদ করি—'তবে সপ্ত কান্ডের শেষ কথাটি আমি লিখে রেখেছি আগেভাগেই।...এই যে! এই পাতাটায় দ্যাখো না!'

মা দেখলেন, তার পরে শুরু করলেন সুর করে:

'সুপন্ডিত শিবরাম বিচক্ষণ কবি।
সপ্তকান্ডে গাহিলেন রামায়ণ সবি॥

আওড়াবার পর মা'র সে কী হাসি! মা'র এরকম হাসি, এমন উচ্চহাস্য এর আগে আমি কখনো শুনিনি।

হাসির চোটে আমি রীতিমতন চোট খাই। ঘাবড়েও যাই বেশ। অপ্রতিভের মতন ই-'ভালো লাগল না বুঝি তোমার?'

'কিস্সু হয়নি তোর। কৃত্তিবাসের কথাগুলোই উলটে পালটে বসিয়ে দিয়েছিস—তাঁর লেখাটাই আরেক রকম করে সাজিয়েছিস। তাঁর পয়ারের ভেতর থেকেই মিল টেনে

এনে মিলিয়ে দেওয়া কেবল। এই যেমন তোর শেষ ছত্রটাই ধর্ না —! কৃত্তিবাসের রয়েছে—কৃত্তিবাস পন্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ—সপ্তকান্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ ॥ তুমি বাপু, সেই কথাগুলোই ফের ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছ। ফের ফের তাই দেখছি আগাগোড়া।'

আমার ফেরেব্বাজির কথায় আমার প্রাণে লাগে -'কিচ্ছু হয়নি তুমি বলছ ?'

মা'র কথায় কান্না পায় আমার, বলতে কি! 'দেখাবো তোমায় ?'

'কি করে হবে ? সাধক না হলে কি এসব লেখা যায় রে ? কৃত্তিবাস কাশীরাম—এঁরা মহাপুরুষ, মহাসাধক ছিলেন। মহাভক্ত তাঁরা, ভগবানের কৃপাতেই লিখেছেন, লিখতে পেরেছেন। নইলে কি লেখা যায় নাকি ? তুই তা লিখবি কি করে ?'

'তাহলে আমি বৈষ্ণব পদাবলীই লিখব না হয়!' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলি-'তাও আমার বেশ আসে। আরেকটা খাতায় লিখেছি...দেখাবো তোমায় ?'

'এইরকম তো হবে, তার দরকার নেই, দেখলে আমার হাসি পাবে আরো।' না দেখেই হাসতে থাকেন মা : 'বৈষ্ণব পদাবলী তুই লিখলি কি করে ? তোর বাবার পদাবলী সংগ্রহ পড়ে পড়ে ?'

'না পড়লে কি লেখা যায় নাকি ?' নিজের সাফাই গাই : 'লেখাপড়া শিখতে হলে যেমন আগে লেখা তার পরে পড়া, আগে হাতেখড়ি অ-আ-ক-খ যতো লিখে লিখে মরি, তার পরে তো বইটই পড়ি ? তেমনি লেখক হতে গেলে আগে পড়া তার পরে লেখা। তাই নয় কি ? আমার তো তাই মনে হয় মা। আগে পরের লেখা না পড়লে কেমন করে লিখব ? কী লিখব, কিরকম করে লিখব টের পাব কি করে ?'

'কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী কি তাই ? পড়লেই কি লেখা যায় নাকি ?...তুই কি বৈষ্ণব ? কৃষ্ণের ভক্ত কি তুই ? সাধন ভজন করেছিস কিচ্ছু কখনো ? তা না হলে ওসব লেখার অধিকারী তুই নোস। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, এঁরা গুণী লোক, যেমন সাধক তেমনি ভক্ত, তাই ওই পদাবলী তাঁরা লিখতে পেরেছিলেন। তাঁদের ভক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন ভগবান... যেমন সাধক তাঁরা' তেমনি আবার মরমিয়া কবিও।'

মরমিয়ার মর্ম তখন আমার মগজে না ঢুকলেও কথাটা আমার মর্মে লাগল বেশ।-'তবে আর লিখে কী হবে! আমি যখন পারবোই না তুমি বলছ। আমি কিন্তু মা, জয়দেবের মতন সমস্কৃত কবিতাও লিখব এঁচে রেখেছিলাম।' মর্মান্তিক কথাটা না বলে পারলাম না।

'জয়দেব! অ্যাঁ ? বলিস কি রে ? জয়দেব পড়েছিস নাকি তুই ?'

'পড়ব না, কী মিষ্টি যে! বাবার আলমারিতেই তো রয়েছে-কুমারসম্ভব, শকুন্তলার সঙ্গে। পড়েছিও, বুঝেছিও। সমস্কৃত হলেও বোঝা যায় বেশ, বাংলার মতন সোজাই তো।'

'তাহলেই বোঝ। বুঝে দ্যাখ তাহলে। কত বড় ভক্ত হলে তবেই না অত বড় কবি হওয়া যায়। তাঁর ভক্তির টানে ভগবান নিজে এসে তাঁর কবিতায় অসমাপ্ত পদ স্বয়ং লিখে সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেছলেন, জানিস তো ?'

'জানি বই কি। স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্ দেহি পদপল্লব মুদারম্!'

'আহা! আহা!!' মা'র আহাকার-ধ্বনি শোনা যায়।

'রাধার মতন অমন আহামরি মেয়ে হলে তেমন পদপল্লবমুদারম করতে সকলেই পারে মা। এমন কি আমিও পারি। সত্যি কথা বলতে কি...'

বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই। রিনির পদপল্লব নিয়ে নিজের মাথায় না ধরলেও প্রায় তার কাছাকাছি এনে সেই উদারতা আমিও যে দেখেয়েছি সে কথা আর কই না। সে কথা ফাঁস করে নিজের ফাঁসির দড়ি কি কেউ গলায় পরে সাধ করে ?

'বড্ড পেকে গেছিস তুই ! এই বয়সেই। তোর বাবাই তোর মাথাটা খেল-একটুও শাসন করে না তোকে। এমন অনাসক্ত সন্ন্যাসী মানুষকে নিয়ে কি সংসার করা পোষায় !'

'তাহলে আর কী হবে ! আমি তো কবি কি লেখক কিছুই হতে পারব না আর।' আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

'পারবি না কেন ? তবে কিনা, পরের নকল করে তা হতে পারবিনে। পরের মত করে লিখলে কি হবে ? তাহলে চলবে না, নিজের মত করে লিখতে হবে যে। পরের থেকে নিয়ে নয়, নিজের থেকেই হতে হবে তোকে। এই যেমন...' মা আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে এক দৃষ্টান্ত নিয়ে আসেন-'এই কবি রাজকৃষ্ণ রায়। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী পড়েছিস তুই ? আছে তো আমাদের। তোর বাবার ঐ আলমারিতেই রয়েছে।'

'না, পড়িনি তো। এখনো পড়িনি।'

'পড়ে দ্যাখ তো ; বাল্মিকীর অনুসরণে তিনিও রামায়ণ লিখেছেন, নানা ছন্দের কবিতায়-কিন্তু একেবারে নিজের মতন করে। সাত কাণ্ডের কোনোখানেও কবি কৃত্তিবাসের কোনো অনুকরণ করেননি। যদিও কৃত্তিবাস তাঁর ঢের আগেকার।'

'করেননি

না। করলে তাঁর লেখা কিছুই হত না একেবারে। কিন্তু লিখেও যে কিছু হয়েছে তা নয়। হয়নি কেন জানিস ? রামায়ণ বলে কথা ! রামের ভজনা না করে শুধু বিদ্যাবুদ্ধির জোরে কি তা লেখা যায় ? ভগবানের সাধক না হলে ভগবানের চরিত গাথা গাইবার ক্ষমতা হয় না, রচনাও করা যায় না। তুলসীদাস, কৃত্তিবাস শ্রীরামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন—তাঁর কৃপাতেই ওই মহাকাব্য লিখতে পেরেছেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায় ভক্ত সাধক ছিলেন না তো: লিখলেন বটে রামায়ণ, ভালোই লিখলেন বটে, কিন্তু লিখেও কিছু হল না। তাঁর বই লোকসমাজে চালুই হল না মোটে। অথচ ভারতের ঘরে ঘরে রামচরিতমানস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এতেই বুঝবি।'

মা'র কথায় রাজকৃষ্ণ রায় নিয়ে বুঝতে বসলাম।

পড়ে দেখলাম চমৎকার লেখা। বিচিত্র ছন্দে রচিত, আশ্চর্য কবিতা সব। নতুন ধরনের মিল দিয়ে, আনকোরা লেখাই। কৃত্তিবাসের ধার-কাছ দিয়েও যায় না, আলাদা রকমের লেখা. তাঁর চেয়ে আরো ভালো বলেই মনে হোলো, কিন্তু এমন করে লিখেও কিনা...এই দশা? এ-বই কেউ পড়ে না আজকাল ? চলে না বাজারে ?

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরে এসে লিখতে বসে রাজকৃষ্ণের অমন কীর্তি যদি বাসী হয়ে গিয়ে থাকে তো আমার এই অনাসৃষ্টির দশা কেমনটা দাঁড়াবে তাহলে ?

ঘাবড়ে গেলাম বেশ। রাম জন্মাবার ষাট বছর আগে যেমন বাল্মীকির রামচরিত রচিত হয়েছিল, আমার বেলায় সব দিক খতিয়ে দেখে জন্মাবার আগেই আমার রামায়ণ খতম !

॥ চোদ্দ ॥

সেই সাংবাদিক ভদ্রলোককে অনেকদিন পরে ফের দেখা গেল আমার ঘরের দোরগোড়ায়।

'আইয়ে জনাব! আইয়ে! আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক। বহুদিনের বাদ এলেন। তারপর তো আর দেখা পাইনি আপনার...'

তাঁকে দেখে একটু সচকিতই হয়েছিলাম বলতে কি!

তাঁকেও যেন একটু চমকিতই দেখলাম—'ওমা? একি! খেতে বসেছেন এই সাত—সকালে?'

'সাত—সকাল কোথায়? এখন তো সাড়ে আট সকাল! একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেচি। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে সবে এসে বসেছি এই বিছানায়—ভাত দিয়ে গেল এক্ষুনি।'

'এক্ষুনি ভাত? এখন তো আপিসের বাবুরা ভাত খায়, খেয়ে আপিস যায় সব। আপনার তো আর আপিস-টাপিস নেই মশাই!'

'তা নেই, কিন্তু খিদে আছে। রাতভোর মোটেই কিছু খাইনি তো! সেই রাত নটায় যা খেয়েটেয়ে শুয়েছি...তার পরে এতক্ষণ ধরে তো একটানা উপোস। খিদে পাবে তার দোষ কি!...তাছাড়া...'

'তাছাড়া?'

'তাছাড়া, এই মেসবাড়ির রান্না গরম গরম থাকতেই খেয়ে নেওয়া ভালো। নইলে সে আর মুখে উঠতে চায় না। সেই শুকনো ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত খেতে হলেই হয়েছে।'

'তা বটে! কিন্তু এই শোবার বিছানার ওপরেই খেতে বসেছেন?'

'ক্ষতি কী? কাজ তো আমার দুই, খাই আর শুই। এক জায়গাতেই হওয়াটা ভালো নয় কি? এইখানেই খেলাম, খেয়েটেয়ে শুয়ে পড়লাম এইখানেই...! নিশ্চিন্তি।'

'খেয়েই শুয়ে পড়বেন নাকি? এইখেনেই? এখনই?'

'তাই তো করি মশাই! সারা রাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে কহতব্য নয়। ঘুম থেকে উঠে শরীরে বলাধানের হেতু একটুখানি খেতে হয়—কী আর খাব? তাই এই ভাত খাই। —কিন্তু এই খাবার ব্যাপারটা! এও এমন পরিশ্রমসাধ্য কাজ যে আবার ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয় তাইতেই। সেই ক্লান্তি দূর করতেই আবার ঘুম। ঘুমোতে হয় আমায়। শুয়ে পড়ি ফের তার পরেই।'

'খেয়েই শোয়া? তার চেয়ে শুয়ে শুয়ে খাওয়াটা সারলেই পারেন!'

'না ঘুমোলে ক্লান্তি যায় না। আর, খেয়েই এমন ঘুম পায় যে...' আমি জানাই—'এই খেয়ে নিয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে সেই দুপুরবেলায় উঠব...'

'সেই ক্লান্ত হয়ে উঠবেন তো আবার? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হয়ে?'

'সেই সময় আমার ভাগ্নে রুটি, মাছ, তরকারি ইত্যাদি নিয়ে আসবে তাদের বাড়ি থেকে। খেয়েই শুয়ে পড়ব আবার।'

'আবার ঘুমোবেন?'

'না, আর ঘুমোব না। তখন একটু কাজটাজ—এই কাগজটাগজ পড়ব। অল্পবিস্তর কাজও করতে হয় সময় সময়। এই সময়টাই তাই করি।'

'তারপরে কী করেন?'

'বিকেলে আবার খাবার ব্যবস্থা। কী খাওয়া যায় তার ধান্দা দেখি। কাজু-টাজু বিস্কুট-ফিস্‌কুট, ভালোমন্দ যা নাগালে পাই, এই গালে দিই-'

'দিন-রাত্ত যদি এমনি খালি খান আর ঘুমোন তাহলে লেখেন কখন ? লেখেন-টেখেন কখন ?'

'কেন, পরের দিন ?' আমার সপ্রশ্ন জবাব : 'পরের দিন তো পড়েই আছে। নেই কি, বলুন ?'

'সে তো চিরদিনই পড়ে থাকে। কোনোদিনই তো আর সে আসে না।'

'আমার সবই পরের ভরসা মশাই। পরদিনের, পর জনের মানে, ঐ পরি জনের... পরাৎপরের।'

'পরকাল আপনার ঝরঝরে।' হাসতে থাকেন ভদ্রলোক।

'ধরেছেন ঠিক। একি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে ! বসুন। এই বিছানাতেই বসুন-ওপাশটায়। দেখছেন তো অতিথি অভ্যাগতর জন্যে আমার ঘরে কোনো টেবিল চেয়ার কিছু নেই।'

'সেবারেই দেখে গেছি। এর মধ্যে কোনো শ্রীবৃদ্ধি হয়নি দেখছি ঘরখানার।'

'বরং কিছু বিশ্রী বৃদ্ধি হয়েছে। জঞ্জাল-টঞ্জাল বেড়েছে আরো একটুখানি। যাক্ গে-এখন বলুন তো কী খবর আপনার। নতুন খবরটবর কিছু আছে ?'

'খবর তো আজকের কাগজে। সে তো আপনি বিছানায় পেতে ভাতের থালা রেখেছেন তার ওপর। দেখেননি কাগজ ?'

'কই দেখলাম। দেখব দুপুরে। তবে এক কাজ করলে হোতো, খাবারটা থালায় না নিয়ে কাগজের ওপর খেলে হোতো—খাওয়াও চলত কাগজও পড়া চলত এক সঙ্গে। খবর আর খাবার একাধারে।'

'মন্দ হতো না। খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়তেন তার ওপরেই।'

'শুয়ে শুয়ে পড়াও চলত তার ওপর। ...বলুন, এখন কী বার্তা নিয়ে এসেছেন এবার ?'

'বলছি দাঁড়ান। কিন্তু তার আগে জানতে চাই আপনি সেবার আমায় ধোঁকা দিয়েছিলেন কেন মশাই ?'

'ধোঁকা ?'

'ধোঁকাই তো। আপনি বলেছিলেন যে ইস্কুল-কলেজের চৌকাঠ আপনি মাড়াননি। অথচ, আপনার এক প্রকাশকের কাছে আপনার খবর নিতে গিয়ে জানলাম আপনি নাকি দস্তুর মতন এম-এ পাশ !'

'এম-এ পাশ ! কী সর্বনাশ !' আকাশ থেকে পড়তে হয় আমায়-'এমন তথ্য কে প্রকাশ করলেন ? কিনি সেই প্রকাশক ?'

'অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দিরের অমিয় চক্কোত্তি। এম-এ পাশ, তাও আবার ইংরেজিতে। লীলা মজুমদার আর আপনি এক বছরেই পাশ করেছেন, গেজেটে একসঙ্গে ছাপা রয়েছে আপনার নাম। অমিয়বাবু স্বচক্ষে দেখেছেন।'

'বটে?...কার লীলা কে জানে! আমি তো জানি ও-খেলা আমি কোনোদিন খেলিনি। ওই পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা। ওদের মায়াপাশে না জড়িয়ে পাশ কাটিয়ে এসেছি চিরটা কাল।' বলে একটু থেমে যোগ করি : 'সত্যি বলতে, আপনাকে বেশ ভয় করছে আমার। আপনি যখন আমার এম-এ আবিষ্কার করেছেন, কোনদিন হয়ত আবার আমার মেয়েও বার করে বসবেন !'

'করেইছি তো, কিন্তু সে কথা পরে। তবে একথা না বলে পারছি না যে, আপনি ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী।'

'যা বলেছেন। একটা সত্যি কথা বললেন এতক্ষণে। গল্প লেখার সময় মিথ্যে লিখতে পারি আর কইতে গেলেই যত দোষ ?...তবে হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই শিবসত্য ইংরেজিতে ডিস্টিংকশন নিয়ে বি-এ পাশ করেছিল বটে। সে-ই পরে হয়ত এম-এ-টাও দিয়ে থাকতে পারে, আমার জানা নেই। তার নামের সঙ্গে আমার নামটা গুলিয়ে ফেলেননি তো অমিয় বাবু ? গোড়ায় শিব আর শেষে চকর্‌বর্‌তি দেখেই আত্মহারা হয়েছেন, ভেতরের সত্যটা তলিয়ে দেখতে যাননি কো আর ?'

'তা কি হতে পারে নাকি ? এতদূর দৃষ্টিভ্রম ?'

'অসম্ভব কী ? তা না হলে ধরুন না...এই সহজ কথাটাই ধরুন। আমার ভাই যেকালে বি-এ পাশ করে ঘাটশিলা হাই স্কুলের হেডমাস্টার হতে পেরেছে সেকালে আমি এম-এ পাশ করলে, তা সে যে বিভাগেই করে থাকি না কেন, যে কোনো একটা মাস্টারি কি জুটিয়ে নিতে পারতুম না ? নিদেন একটা সেকেন্ড মাস্টার হয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারতুম না কি ? এই থার্ড ক্লাস লেখক হতে যেতাম কোন্ দুঃখে ? লেখক হতে কি ভালো লাগে কারো ? অন্তত আমার তো লাগে না মশাই!'

'লেখত হতে চান না আপনি ?'

'একদম না। এই দণ্ডে যদি আমি হাজার দশেক টাকা পাই, তো আমার ছোটদের বইগুলোর একটা ট্রাস্‌ট্ বানিয়ে দিয়ে...ওগুলো তো আর আমার নয়, বাংলার ছেলেমেয়েদের সম্পত্তি...তার প্রকাশ ব্যবস্থাটা করে গঙ্গাস্নান করি গিয়ে আমি। তার পরে একেবারে তোবা তালাক দিয়ে এই লেখাটেখা সব ছেড়ে দিই বেবাক্।'

'বলেন কি ?'

'তাই বলি। কী যন্ত্রনার জীবন যে এই লেখক হওয়া-কী বলব। সাধ করে কি কেউ হতে চায় ? নেহাৎ প্রাণের দায়-ও ছাড়া কিছু পারি না তাই।' যাক্ গে, সে কথা থাক। এখন বলুন আপনার বার্তাটি কী ? সেবার তো আমার কুলের কেচ্ছা নিয়ে এসেছিলেন।'

'এবার এসেছি আপনার উপকূলকাহিনী নিয়ে।'

'উপকূল!' আবার আমায় হতচকিত হতে হয়। —'সে আবার কী মশাই ? উপকূল আবার কী ?'

'উপকূল কাকে কয় জানেন না নাকি ?'

'জানব না কেন ? নদীর দুই উপকূল থাকে, সেই দু'কূলের গণ্ডী বজায় রেখেই তাকে বইতে হয়..' আমি বলি। 'আর সাধারণ লোকেরও দুটি কুল থাকে জানি। পিতৃকুল আর মাতৃকুল।'

'কিন্তু লেখক শিল্পীরা কি সাধারণ লোক ? তাঁদের কি কেবল দু'কুল হলেই পোষায় মশাই ?'

'তা বটে। দুকুলে শুধু সীতা শকুন্তলাকেই শোভা পেয়েছিল, লেখক-টেখকদের একাধিক কুল থাকতে পারে বটে। এতদ্বারা আপনি কি কোনো পরস্মৈপদী পরকীয়া ইঙ্গিত-টিঙ্গিত করছেন ?'

'যা বলেছেন, তাই বটে।' কলকাতার চারদিকে আপনার চারটে উপকুলের খবর পেয়েছি আমি... জানি না, তাঁরা আপনার বিবাহিত স্ত্রীও হতে পারেন...'

'কী সর্বনাশ! এতগুলি নারীর উপনায়ক হয়ত আমি হতে পারি কিন্তু তাদের ভর্তা হওয়া

তো আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের ভরণপোষন করতেই আমার প্রাণ যায় তার ওপর এই কান্ড! এমনটা আমি করেছি আমার বিশ্বাস হয় না।'

'বিশ্বাস হয় না?'

'না মশাই! এতগুলি মেয়েকে বিয়ে করব কি, কোনো মেয়েরই উপযুক্ত আমি নিজেকে জ্ঞান করিনি কখনো। ভেবে দেখলে এদেশের বেশির ভাগ মেয়েরই বেশ দুঃখের জীবন। এদের একটিকে অন্তত আমি সুখী করতে চেয়েছিলাম আমার জীবনে...'

'কাকে?'

'যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করিনি। আমার হাতে পড়ে বেচারী অহরহ যে কষ্ট পেত তার থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

'বিয়েও করেননি, উপটুপও নেই বলছেন। মেয়ের অভাব কখনো বোধ করেননি আপনি?'

'বরং উলটো। মেয়ের প্রভাবেই একেক সময় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়েছে আমায়। আমার বাবা ততটা বউ পছন্দ করে নয়, যতটা নাকি সাত শালী দেখে বিয়ে করেছিলেন শোনা যায়—রসিক ব্যক্তি ছিলেন নিশ্চয়। আমি স্বয়ং শালীবাহন না হলেও তাইতেই পুষিয়ে গেছল আমার, বাবার উত্তরাধিকার-সূত্রে আমার সাত মাসির সৌজন্যে সাতাত্তরটি কাজিন রত্ন লাভ করেছিলাম...'

'সাতাত্তর জন? বলেন কি মশাই?'

'গুণে গেঁথে দেখিনি অবশ্যি, তবে আমার আন্দাজ। তাছাড়া, আমার নিজের স্বোপার্জিত কাজিনও কিছু ছিল বইকি তার ভেতর...'

'স্বোপার্জিত কাজিন কী রকমটা?'

'মনে করুন বন্ধুর মা-সে তো ঠিক মা'র মতই। নাকি তাকে আপনি অন্য কোনো উপমা দিতে চান? তাঁর মেয়েরা, মানে আমার বন্ধুর বোনদের তো বোনই ধরতে হবে?' নাকি আপনি তাদের উপবোন বলবেন, শুনি?'

'আমি আর কী বলব।'

'উপবনই বলুন। কারণ সেখানে সেকালে ফলের কোনো আশা নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই কোনো-উপবনই বলা উচিত। তথায় ফুল ছেঁড়ারও অধিকার নেই আপনার, শুধু ওপর ওপর ঘ্রাণ নেওয়াই কেবল। একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকুগান শুনি গোছের আর কি।'

'কিন্তু তাতে কি আশ মেটে? কাউকে ষোলো আনা পাবার সাধ জাগেনি কখনো আপনার? কেবল ফুল শুঁকে শুঁকে কি দুঃখ যায়? ফল কী তাতে?'

'মা ফলেষু কদাচন। ষোলো আনার সাধ মেটাতে গেলে ষোলো আনাই যে বরবাদ হয়। যদি কোনো মেয়ের ষোল আনা আপনি পেতে চান তো বিনিময়ে তাকে ষোলো আনাই দিতে হবে আপনার-তার চেয়ে এক আনা পেয়েই খুশি থাকা কি ভালো নয়? শত শত একানি পেলে মোটমাট কতখানি দাঁড়ায় ভেবে দেখুন একবার।'

'ভাবতে গিয়ে তিনি গুম হয়ে থাকেন। উপকূলের খবর নিয়ে এসে এখন বুঝি হিসেবের কূল পান না। এ কানার পাল্লায় পড়ে বোবা মেরে যান বোধ হয়। কিন্তু একটু পরেই তিনি গুমরে ওঠেন আবার-

'কিন্তু যাই বলুন না মশাই, কলকাতার চারদিকে আপনার যে চারজন রয়েছেন তাঁরা কখনই উপবন নন, তাঁরা আপনার...'

'উপস্ত্রী ? তাই বলছেন তো ! তাহলে বলি।' বলে আমার পঞ্চ ম-কারের পঞ্চমটিকে ধরে টানি- 'তাহলেও আপনার হাওড়ার সেই মেয়েটির খবর জানা নেই যাকে নিয়ে আমি হাওয়া হয়েছিলাম একদিন...'

'তাই নাকি ? জানি না তো !'

'জানবেন কি করে ? আমি নিজেই জানতাম নাকি ! খবরটা ধরা পড়ল হঠাৎ। আমার এক কিশোর বন্ধু একদিন বিবাহ রেজেস্ট্রি আপিসে গিয়ে খবরটা জেনে এসেছিল। তার এক দূর সম্পর্কের মাসির সঙ্গে আমার এক সুদূর সম্পর্কিত খুড়োর অসবর্ণ বিয়ের নোটিশ দিতে গিয়ে রেজেস্ট্রি আপিসে গিয়ে দেখে এসেছিল যে, সেখানকার নোটিশ বোর্ডে হাওড়ার কোন মেয়ের সঙ্গে এক শিবরাম চক্রবর্তীর বিয়ের নোটিশ রয়েছে। জানলাম তার কাছে—তারপর আমি তার সঙ্গে গিয়ে নিজের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এলাম।'

'দেখলেন আপনাদের বিয়ের নোটিশ ?'

'দেখলাম বইকি ! তারপর কিছুদিন বাদ একটু সময় সুযোগ পেতেই হাওড়ার ঠিকানাটায় গিয়ে সেই মেয়েটিকেইও দেখে এসেছি।'

'কী দেখলেন ?'

'দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়। তবে ভারী বিষণ্ণ চেহারা। তাহলেও তেমন মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হওয়া যায় মনে হোলো। কিন্তু বিয়ের সুখ তার কপালে সইলো না...তার বিষণ্ণতার কারণ জানা গেল...'

'বিধবা হয়ে গেল না কি? বিয়ের পর মারা গেল সেই লোকটা? মানে সেই শিবরাম—'

'তার চেয়েও খারাপ। পড়শীদের কাছে জানতে পেলাম বিয়ের পর লোকটা মেয়েটির গয়নাগাঁটি সব নিয়ে উধাও হয়েছে। তার কোনো পাত্তাই নেইকো আর।'

'তাই নাকি ?'

'তাই তো বললেন, প্রতিবেশী সেই ভদ্রলোক। কে লোকটা, শুধাতে জানালেন কোথাকার কে এক লেখক মশাই এই শিবরাম চক্কোত্তি ! গল্পটল্প লেখে-টেখে। বইটই আছে নাকি তার। তার লেখা পড়েই নাকি পটে গেছল মেয়েটা, পস্তাচ্ছে এখন। ফুসলে বিয়ে করে এখন তার যথাসর্বস্ব নিয়ে সে হাওয়া !'

'আপনারই কান্ড নাকি মশাই ?'

'কে জানে ! কোনো লেখকের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। তবে এতদিন আমি মেয়েদেরই অঘটন- ঘটনপটিয়সী বলে জানতাম। তাদের ওপরেও যে পটীয়ান লোক থাকতে পারে সে ধারণা আমার ছিল না।'

॥ পনেরো ॥

'আমি চারুদার মতন গল্প লিখিয়েই হব না হয়।' মাকে আমি বলেছিলাম - 'কৃত্তিবাসের মত কবি নাই বা হলাম। সেও কিছু কম কীর্তি হবে না মা।'

'ছেলে-চারুর মত গল্প লিখবি তুই ? বলিস কী রে ?'

'পারব না লিখতে ? চারুদার 'ভাতের জন্মকথা' বইটা বিস্টুর কাছ থেকে নিয়ে পড়েছি- চমৎকার ! অমনতর লিখতে পারলেও তো মন্দ হয় না।'

'তুই কী লিখবি ? ডালের জন্মকথা ?' হাসলো মা . 'চারুকে তো প্রবাসীর পাতায় পাতায় দেখি। তোকে তা হলে এরপর ডালে ডালে ঘুরতে দেখা যাবে !'

'ঠাট্টা করছো মা ? কেন, ডাল নিয়েও লেখা যায় না কি ? ডালও তো কত রকমের হয়। ছোলার ডাল, কলাইয়ের ডাল, খেসারির ডাল, অড়হর ডাল, মুসুরির ডাল, মুগের ডাল...'। ছোলা কলার থেকে শুরু করে মুগের ইস্তক ভাঁজতে লাগি।

'জানি। ডালের আবার কত পালা, শাখা-প্রশাখা, কত কী ! কিন্তু তার খোঁজখবর নিতেও ঢের পড়াশোনা করতে লাগে। চারুর মত বিদ্যা হয়েছে তোর ? সে বি-এ পাশ। ডালপালার অতো শতো ফ্যাকরায় না গিয়ে বরং তোর বাপের মতন পদ্য লেখ না কেন !'

'হ্যাঁ, পদ্য লেখেন বটে বাবা। পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী-নানা আকারে, নানান ছন্দে বানানো ছোটখাট অনেক রকম পদ্য লিখেছেন বটে, নিজ ব্যয়ে বই করে ছাপিয়েছেনও সেসব আবার, কলকাতার থেকে ছাপিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছেন-তা, হাজারখানেক কপি তো হবেই। যে চায়, যে না চায় তাকেও, না চাইতেই বিনামূল্যে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন। চাঁচোর আর আশপাশের গাঁয়ে তাঁর বই পেতে বাকি নেই কারও। কবি খ্যাতিও রটেছে নিশ্চয়ই।

নিজের নামেই নামকরণ করেছেন বইটার-শিবপ্রসাদ : নিজে তেমনটা না হলেও তাঁর বইটিকে তিনি স্বনামধন্য করে ছেড়েচেন।

বাবা বলতেন, সে কবিতাই বা কী আর সেই বনিতাই বা কীসের, পা ফেলার সাথে সাথেই যে হাতে হাতে তোমার মন না কেড়ে নেয়। বেড়ে কথা বলেছিলেন বাবা। 'পদ্যবিন্যাস মাত্রেণ মন না রমতে যয়া।' কথাটার মর্ম বুঝতে আমার একটুকুও বিলম্ব হয়নি। কবিতার পদবিন্যাস কী তখনো আমি তা ভালো করে জানি না, কিন্তু বনিতারটা জেনেছিলাম। রিনির পদবিন্যাসের সঙ্গে কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখেছিলাম সত্যি বটে ! বনিতা কাকে বলে কে জানে, কিন্তু অমন মেয়ে না হলে, যে তার পা দিয়েই সহজে যে কারো মন হাতিয়ে নিতে পারে-তার সঙ্গে ছাড়া আর বুঝি বনিয়ে চলা যায় না। আর কেউ তেমন বনবার নয়।

আমার সেই বাল্যকালে বাবার বইটা আমি কয়েক বারই তো পড়েছিলাম, কিন্তু এমনিই আমার বিস্মৃতি শক্তি, এতদিন পরে তার অতগুলো পদ্যর একটাও যদি আমার মনে থাকে।

কেবল তার একটা পদবিন্যাস আমার মনে আছে-যে পদ্যটা সত্যিই আমার মন ভুলিয়েছিল সেদিন। ভারী উপাদেয় পদ !

বাংলার নানান জায়গার কোথাকার কী খাদ্য, কোনখানের কোন খানা খাসা, তার সবিস্তার ফিরিস্তি তাঁর একটি পদ্যের কয়েকটি ছত্রে তিনি ধরে দিয়েছিলেন, তার মধ্যেকার সারাৎসার সেই লাইনটি-

'চাঁচোরের মানকি কলা সংসারের সার।' এখনো আমার মর্মে মর্মে গাঁথা হয়ে রয়েছে। মনের লালায়িত রসে সজিভ হয়ে এখনো।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের (সেই কালেই আমার পড়া) 'আহা, কী করিয়া বলিব কেমন সেই মুখখানি'-র বর্ণনার সঙ্গেই বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে বুঝি সেই কলার তুলনা কর চলে। তেমন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কলা, (মর্তমান জাতীয়ই হবে বোধ হয়, কিন্তু বর্তমানে বিরল) চাঁচোরের বাইরে আর কোথাও আমি পাইনি, খাইনিকো অন্য কোথাও। ফজলি যেমন মালদা জেলার বিশিষ্ট আম (গোপালভোগ, বৃন্দাবনা, ক্ষীরসাপাতি ইত্যাদি আরো সব থাকলেও) তেমনি ঐ মানিক কলা চাঁচোরেরই বিশেষ আমদানি। খানদানি পরিবাররাই খানদান- খান এবং দান করে থাকেন।

বাবার বইটির আরো ছত্র, আমার জন্ম কাহিনীর সঙ্গে জড়ানো বলেই বোধ করি, আমার স্মরণে রয়ে গেছে এখনো-

'বঙ্গাব্দ তেরশ দশ প্রাতে রবিবার
সাতাশে অগ্রহায়ণ শিবের কুমার
শিবরাম জনমিল লীলাশঙ্খ বাজাইল
শিবহৃদে উপজিল আনন্দ-অপার ॥'

'লীলাশঙ্খটা কী মা ?' শুধিয়েছিলাম আমি মাকে : 'রবিবাবুর কবিতায় লীলা কমলের মতই কোনো জিনিস-টিনিস নাকি ? লীলাখেলা করবার ?'

'না রে, তুই যখন জন্মালি না, জন্মানোর সময় শাঁখ বাজাতে হয় তো, তখন যে মেয়েটা তোর জন্মাবার সময় শাঁখ বাজিয়েছিল তার নাম ছিল লীলা।' মা জানালেন 'আর জানিস, তুই যখন হলি না, সূয্যিঠাকুর উঠল ঠিক সেই সময়টায়-একসঙ্গেই এলি তোরা দুজনায়।'

'সূয্যিঠাকুরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছিলাম বলছ না নিশ্চয় ?'

'কে জানে! আর তুই জন্মেছিলি তোর দু'হাত খুলে-সেটা একটা ভারি আশ্চয্যি ব্যাপার। আশ্চয্যি কিসের ?'

'সব ছেলেই জন্মায় দু হাত মুঠো করে-তাই নিয়ম। তুই এসেছিলি একেবারে খোলা হাতে। নানা জনে নানান ব্যাখ্যা করেছিল তার।'

'কি রকম ?'

'কেউ বলল, এ ছেলে এক নম্বরের উড়নচণ্ডী হবে, কিচ্ছু এর হাতে থাকবে না, কোনো জিনিস ধরে রাখতে পারবে না। কতজন কত কী বলল। তোর বাবা বলল যে, এ ছেলে কাউকে বাঁধবে না, কারো কাছে কোথাও বাঁধা পড়বে না। আমার ছেলে তো ! আমার মতই হবে ! জন্মসন্ন্যাসী। মুক্ত হাতে এসেছে, মুক্ত হাতে যাবে-সর্বদা মুক্ত হস্ত। মুক্ত পুরুষ।' —এই কথা বলতো তোর বাবা।'

'মুক্ত পুরষ ! মুক্ত পুরুষ কী মা ?' আমি জানতে চাই ; 'অগাধ সমুদ্দরের ডুবুরি যারা; মুক্তো খোঁজে, শুক্তি খুঁজে বেড়ায়, তারাই কি ? নাকি, যারা মুক্তি খোঁজে তারা ?'

'যারা মুক্তো খোঁজে তারাও-যারা মুক্তি খোঁজে তারাও।'

'মুক্তো তো খুঁজতে হয় সমুদ্রের তলায় গিয়ে। আর মুক্তি তো খোঁজে মানুষ ভগবানের কাছেই—তাই না মা ? ভগবানই তো মুক্তি দিতে পারে-তাই না ? বইয়ে তো সেই কথাই বলে থাকে।' আমি শুধাই : 'আমি যদি মুক্তি চাই তো ভগবানের কাছেই চাইতে হবে আমায়। তাই তো ?'

'চাইতে পারিস। কিন্তু মুক্তিটা দিতে হবে তোকেই। ভগবানের তোকে মুক্তি দেওয়ার মানে হোলো, মানে তার অপর মানেটা, তোরই ভগবানকে মুক্তি দেওয়া অন্য কথায়।'

'তার মানে ?

'মানে, ভগবান তোকে কী মুক্তি দেবে রে ? তোর কাছ থেকেই তাঁকে নিজেব মুক্তি নিতে হবে। তুই-ই মুক্তি দিবি ভগবানকে। তুই মুক্তি দিলে তবেই তিনি নিজের মুক্তি পাবেন। সেটা তোর মুক্তি বল বা উন্মুক্তি বল—যা খুশি।'

'খুলে বলো না মা ! খোলসা করে কও ?'

মা তখন কথাটার খোলস ছাড়াতে লাগেন—'যেমন ধর এই সূর্য। সূর্যর ভেতর দিয়ে ভগবান আলো হয়ে মুক্তি পাচ্ছেন, আলো বানিয়ে সূর্যই ভগবানকে মুক্তি দিচ্ছে একথাও তো বলা যায়। সূর্য তাঁর বাহন। বলা যায় যে, ভগবানই আলো হয়েছেন, কিন্তু সূর্যটি না হলে হতে পারতেন কী? সূর্যের যেমন ভগবানের দরকার নিজের আলোর জন্যে, তেমনি ভগবানেরও ঐ সূর্যটিকে চাই আবার। দুজনের না হলে দু-জনার চলে না।'

'এই জন্যেই কি দেবতাদের সব বাহন থাকে মা? মা দুর্গার যেমন সিংহ, সরস্বতীর যেমন কিনা হাঁস...।' আমি ফাঁস করতে যাই।

'বলতে পারিস। তা হলে দ্যাখ ভগবান যেমন তোকে মুক্তি দেবেন, তুইও তেমনি তাঁকে মুক্তি দিবি। কেবল নিজেকে নিয়ে কারো চলে কি রে? একক চেষ্টায় মুক্তি মেলে না, আরেক জনকে চাই। নইলে, ভগবান তো গোড়ায় একলাই ছিলেন আপনি, হাজারটা হতে গেলেন কেন তবে? ওই জন্যেই তো। হাজার জনের ভেতর দিয়ে হাজার রকমের মুক্তির স্বাদ পাবেন—সেই জন্যেই না! হাজারটার মজাই আলাদা।'

'হাজা মজা যে বলে থাকে মা, তা বুঝি এই?' আমি কই-'ভগবান আমাদের হেজে মজে গেছেন?'

'তোর যতো সব উল্টোপাল্টা কথা! কোনোই তার মাথামুন্ডু নেই!' কথার মাঝখানে বাধা পেয়ে মা'র ব্যাজার ভাব। —'বড় হলে বুঝবি এসব।'

'না না, এখনই বুঝছি। এখনই বুঝব। তুমি বলে যাও। শুনছি তো আমি এই যে! কান খাড়া করে দেখাই।

'তা হলে দাঁড়ালো কী? ভগবান যেমন তোর মুক্তিদাতা, তুইও তেমনি তাঁর মুক্তিদাতা—কিংবা উন্মুক্তিদাতাও বলতে পারিস। তোরা দুজনেই, যাকে বলে পরস্পরের পরিপূরক। গতিমুক্তি—আশা-ভরসা।'

'তাহলে আমি....আমিই তো....না, আমি ঠিক নই....মানুষই তো তাহলে বিধাতার চেয়ে বড়ো হয়ে গেল মা? অত বড় বিধাতাকে, ধারণাই করা যায় না যার, এই একটুকুন মানুষ মুক্তি দিচ্ছে—?'

'হলই তো এক পক্ষে। তার সসীম দেহের ভেতর দিয়ে, তার আয়ুর খন্ডকালের মধ্যে সেই অসীমকে, অখন্ডকে সবার কাছে নিয়ে....গন্ডীর মাঝখানে ধরে বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছে এনে....একপক্ষে হলই তো বেঁ। মুহুর্মুহু মৃত্যুর শিকার হয়েও সর্বদা ভগবানের অঙ্গীকার লাভে সে মহৎ।'

'আর সব মানুষের কথা থাক, বড় বড় মানুষের কথায় আমার কাজ নেই, আমায় বলো তুমি কী করে আমি মুক্তি পেতে পারি? কিংবা, তোমার কথামতন আমার ভগবানকে মুক্ত করতে পারি আমি? সেই কথাটাই বলো তুমি আমায়।'

'ভগবান প্রকাশ পান রূপে আর অপরূপে—মানুষের দেহ—সুষমা আর তার শিল্পকলার সৃষ্টি—মহিমায় তিনি ধরা দিয়েছেন। তুই যদি কবি হোস, তা হলে তোর কবিতাই হবে তাঁর মুক্তি, যদি দেখতে সুন্দর হোস, তবে তোর সেই, সৌন্দর্যেই তিনি উন্মুক্তি পাবেন। রকমটা এই আর কি। ভগবানের বাহন হতে হবে তোকে। কাউকে তিনি আপনার থেকেই নিজের বাহন বেছে নিয়েছেন, কারু আবার তাঁকে যেচে তাঁর বাহন হতে হয়েছে। ঠাকুরকে তিনি

বেছে নিয়েছিলেন, বাণীরূপে তিনি মুক্তি পেয়েছেন সেখানে। আর রবিঠাকুরকে যেচে নিতে হয়েছে....নিজের কাব্যসাধনায় তাঁর সে অন্তরদেবতাকেই তিনি উন্মুক্ত করেছেন।'

বলে একটু থামেন মা—'আর, তুই যদি নিজের চেষ্টায় কখনো খুব বড়লোক হোস, তাহলে তোর নিজের অর্থ অপরকে দিয়েই সেই ভগবানকেই তুই বিলিয়ে দিবি। তোর সেই দানই ভগবান তখন। সেই ভগবানের দান, ভগবানকেই দেওয়া—বুঝেছিস। মানে, যা পাবি....রূপই হোক, শিল্পই হোক, অর্থই হোক, তা পেয়েই তোকে দিতে হবে—দিলেই তুই পাবি আবার। পেলেই দিবি, দিলেই পাবি—এমনি ধারা একটি মজার খেলা চলছে দুনিয়ায়। না দিলেও তেমনি কিছু পাওয়া যায় না রে! দিলেও তেমনি কিছুই পাওয়া যায় না—এটা একটা রহস্যই।'

'বুঝেছি মা। আমি যদি বড়লোক হই, তবে আমাকে পেয়ে পেয়ে দিতে হবে, যদি গাইয়ে হই তো গেয়ে গেয়ে দিতে হবে। নইলে সত্যিকারের পেয়েছি কি না, তা আমি টের পাব কি করে? তাই তুমি বলছ তো?'

'হ্যাঁ, তাই। নইলে, তোর লাখ টাকা মাটির তলায় পোতা থাকলে কার কী! তোরই বা কীসের! অন্য কেউ ভাগ পেল না বলে টাকাটা তোর ভাগ্যেও এল না।'

'আর যদি আমি কাউকে ভালোবাসি মা, তাহলে কিন্তু খালি দিয়ে গেলেই চলবে না, সেখানে আমায় দিয়ে দিয়ে পেতে হবে—যেমনটা কিনা পেয়ে পেয়ে দিতে হবে। তা নইলে ভলোবাসা হল কোথায়? তা তো কখনো একতরফা হয় না মা। সেখানে আমায় চেয়ে চেয়ে দিতে হবে, দিয়ে দিয়ে চাইতে হবে—তাই তো?'

'এই বয়েসে তোর এত ভালোবাসার ধান্দা কিসের রে? আমি যে তোকে এত ভালোবাসি আমি কি তোর ভালোবাসা চেয়েছি কখনো? চাই কখনো?'

'তোমার ভালোবাসাই আলাদা।' আমি জানাইঃ 'মা'র ভালোবাসার কি তুলনা হয় কারো সঙ্গে?'

'দুটো হাতই মুক্ত রাখতে হয়—পাবার আর দেবার। দেওয়ার আর নেওয়ার। মুক্ত হস্তে দিবি, মুক্ত হস্তে নিবি। আদান-প্রদান একই খেলার এদিক ওদিক। যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতে হয়—নইলে, ভগবানের দান মেলে না। মনে কর না, বাইরে ভগবানের ঝড় বয়ে যাচছে, কিন্তু তোর ঘরের একদিকের একটি মাত্র জানালা খোলা রাখলে তার একটু হাওয়াও কি তুই পাবি?'

'একেবারে পাব না? বাইরে ঝড় বইলেও তার ঝাপটা লাগবে না আমার ঘরে? একটুখানিও না?' আমি জানতে চাই।

'একদিকের একটা জানালা খোলা থাকলে'—মা বলেন, 'সেই হাওয়ার ছিটেফোঁটা হয়ত আসতে পারে তোর ঘরে—কিন্তু ঘরের দু'ধারের জানালা যদি খুলে রাখিস তো সেই ঝড় তোর ঘরের ভেতর দিয়ে হু হু করে বয়ে যাবে। তাঁর কৃপার জন্য দুটো দরজাই খোলা রাখতে হয়—আসার এবং যাবার।'

'তা হলেই তাঁর কৃপার পার পাওয়া যায় না'—মা'র কথার ওপর আমার টিপ্পনি কাটি—মা'র ঢাকের ওপর আমার এক কাঠি।

'বেশ বলেছিস। কেবল ভগবানের দিকে ওপনিং থাকলেই হবে না, মানুষের দিকটাও ওপন রাখতে হবে, নইলে ভগবান তোর বাতায়নে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবেন। ঈশ্বরের কাছ

থেকে যা আমরা পাই তা আবার কড়ায় গণ্ডায় আমাদের ফিরিয়ে দিতে হয় তাঁকে—কিন্তু সরাসরি তাঁকে দেবো কি করে? তাই পৃথিবীকে দিয়েই তাঁকে দিতে হয়। মানুষকে দিলেই তিনি পান। নইলে পান না—পেতে পারেন না।'

'মানে, তাঁর দেওয়াটা একেবারে দান না? ধার দেওয়া কেবল? তার মধ্যে ফিরিয়ে দেবার কড়ার রয়েছে আবার? সুদ দেবার—শুধে দেবার কড়াকড়ি?'

'আছেই তো। কেবল যোগ করলেই হয় না তো, বিয়োগ করতেও হয়—তবেই কিনা অঙ্ক মেলে। যোগবলে কী পেলি বিয়োগ ফলেই তো তা টের পাবি রে। যোগবলের চেয়ে ঐ বিয়োগবল বড়ো—বুঝেছিস?'

'আর ওই বিয়োগ ফলটাই শেষ ফল মা—তাই না? এত যোগবল আর যোগফলের পরেও শেষের তোমার ওই প্রাণ বিয়োগ।' আমার দীর্ঘ নিশ্বাস।

'মা থাকতে মৃত্যু কোথায়? আবার তিনি এমনি জন্ম দেবেন—ভয় কিসের?....তোকেও দেবেন আমাকেও দেবেন।'

'তুমি তো বললে মা যে, ভগবানের কাছ থেকে যা আমরা পাই, তা আমাদের মানুষকে ফিরিয়ে দিতে হয় আবার। বললে না তুমি? কিন্তু একটা জিনিস আছে মা, যা নাকি কাউকে চেষ্টা করে পেতে হয় না, কষ্ট করে দিতে হয় না। টাকাকড়ি পরকে দিতে গেলে সব দিক দেখতে হয়, এমন কি, তোমার ঐ ভালোবাসাও—কাউকে দিতে যাওয়া তেমন সোজা নয়কো মা। অনেক চেয়ে চেয়ে পেতে হয়—দিতে হয়।'

'জিনিসটা কী তোর—শুনি?'

'রূপ। ও তো যে পায়, এমনিতেই পায়, অমনিই পেয়ে থাকে। অপরকে দিতেও তাকে কোনো বেগ পেতে হয় না। যেমনি পাওয়া অমনি তার দেওয়া। না দিয়ে উপায় নেই তার—ঝরনা যেমন আপনার থেকেই সর্বক্ষণ ঝরছে।'

'রূপ তো ভগবানেরই বিভূতি রে। তাঁরই ঐশ্বর্য—যে পায় তার মতন ভাগ্যবান কে আর? সবাই কি তা পায়?'

'যেমন কিনা রিনি—মানে যে ঐ জিনিস পেয়েছে, সে তাঁর কাছে ঋণী হয়েও সেই ঋণী নয়—তাকে আর কষ্ট করে পরকে দান করে তা শুধতে হয় না। সে দেখা দিলেই তার দেওয়া হয়ে যায়, তাকে দেখতে পেলেই পাওয়া হয়ে গেল আমার—দর্শন দান আর দর্শন লাভ যুগপৎ! আশ্চর্য নয় মা?'

'আশ্চর্য বই কি। পরমাশ্চর্যই। পরম ঐশ্বর্যও আবার।' মা বলেন—'রূপ তো ভগবানেরই প্রকাশ—সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ হয়েছেন।'

'অমনি আরেকটা জিনিসও আছে মা, যা নাকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া হয়ে যায়—খাওয়ার সাথে সাথেই খাওয়ানো। সেও কিছু কম আশ্চর্য নয় মা।' আমি বলি—'তার চেয়ে বড় অবদান বিধাতার কিছু নেই আর।'

'কিসের কথা বলছিস তুই?'

'কিসের কথাই বলছি তো মা।' বলতে গিয়ে আমি ঢোক গিলি—ওর বেশি আর বলি না। সব কথা কি সবাইকে বলবার? গুহ্য কথা গুরুজনদের কাছে ব্যক্ত না করাই শ্রেয়ঃ। পূজ্যদের কাছে উহ্য রাখাই বিধেয়।

॥ ষোল ॥

তাহলে এই পটানো কাজটি আপনার নয় আপনি বলতে চান?' জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক।

'কী করে বলি? আপনার সম্বন্ধে কি সঠিক কখনো জানা যায়? নিজের রহস্য কি টের পায় কেউ? আপনার অন্ত মিলেছে কারো? সেই গুরু গোবিন্দর পর বলুন, পেয়েছি আমার শেষ—এমন গুরুতর কথা ক'টা লোক আর আওড়াতে পেরেছে? হাজার আত্মবিদ্ধ করেও আত্মবিদ্ধ হয় না মশাই। এই কথাই আমি কইতে চাই।'

'সোজাসুজি বলুন না গো। অত ঘোর প্যাঁচে যাচ্ছেন কেন।'

'কিন্তু সহজ কথা যায় কি বলা সহজে। আমাদের কর্মকান্ডর বিবরণ বিশদ করা কি সোজা? ক'টা কাজ আমরা প্রকাশ্যে করি—কতটাই বা আমাদের জ্ঞাতসারে হয়? প্রদীপ জ্বালার আগে যেমনটা সলতে পাকানো, অনেকটা তো আমাদের অন্তর্লোকের অবচেতনায় ঘটে থাকে। ক্রিয়াকলাপের বেশির ভাগই আমাদের অন্তরগত, লোকলোচনের অন্তর্গত হবার নয়।'

'এমন কাজ আপনি করতে পারেন বিশ্বাস হয় না।'

বিশ্বাস হয় না যথার্থ। আমারও। আবার অবিশ্বাস করতেও প্রাণ চায় না। এমনতর নিজের নৈপুণ্য মনে মনে আমি কল্পনা করেছি অনেক। পটনকর্ম তো একটা শিল্পকর্মই, কর্মশিল্পও বলা যায়। পটনশিল্পী—পটশিল্পীর চেয়ে কিছু কম নন। আর, আমি কি এককালে (এই লিখিয়ে না হয়ে) পটুয়া হতেই চাইনি? চায় না কি লেখকরা? বিস্তর লেখালেখির পর রেখার হরিহরছত্রেও কি পটুতা দেখা যায়নি কারো কারো?

সুন্দরদের শুধু চিত্তপটে ধরে না রেখে (ক' দিনই বা রাখা যায় অমন করে?) চিরদিনের তরে চিত্রপটে বেঁধে রাখতে চাইনি কি?

'দেখুন, এ বিষয়ে আমি সন্দেহবাদী', জনাববাহাদুরের প্রতি আমার জবাব: 'সব ব্যাপারের মতন এখানেও আমার একটুখানি সংশয় আছে। আমার কী মনে হয় জানেন—হয়ত আমিই করেছিলাম এই কর্ম, কিংবা হয়ত...হয়ত বা আমার মতন অন্য কোনো ব্যক্তি এই দুষ্কার্য করে থাকতে পারেন। পটিয়সীদের ওপর পটিয়স হবার দক্ষতা আমার আছে জানলে স্বভাবতই আমার গর্ব হয়, কিন্তু কে জানে, আমার ওপরেও টেক্কা মারার মতন আরও কোনো টেকচাঁদ ঠাকুর থাকতে পারেন। আমার চাইতেও বাহাদুর কেউ নেই কি আর?

'তাহলে আপনার কোনো ডবল? আপনি বলতে চান'

'অবিকল। ঠিক ধরেছেন আপনি। আমার প্রবল সন্দেহ তাই। ফুরার হিটলারের যেমনটি ছিল বলে শোনা যায়—তাঁরা বোধ হয় কখনো ফুরাবার নন। সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশের পর আমি একবার ওয়েলিংটন—ধর্মতলার মোড়ে কল্পতরু আয়ুর্বেদ ভবনে সুভাষচন্দ্রের মতন বজ্‌নিস্ একজনকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেছলাম, পরে জানা গেল, উনি সেই গণনায়ক নন, কবিরাজ গণনাথ সেনেরই কে যেন হন।'

'দেখেছিলেন নেতাজীর অন্তর্ধানের পরে? সত্যি?'

'তা বই কি। সেই রকম কেউ হয়ত আমার অনুরূপ ধারণ করে আমার ওপরে এই হীট করে যাচ্ছেন বারংবার—যদিও তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ডেড হীট হয়নি এখনো অব্দি। তিনিই হয়ত আমার বিয়ের সাধটা মিটিয়ে গেছেন। আমার বংশরক্ষার শখও মিটিয়েছেন

কি না কে জানে।......তাহলে তো আমার......আমাদের উভয়েরই মৃত্যুর পর জলপিণ্ডির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

'পুত্রপিণ্ডের প্রয়োজনেই ভার্যাবরণ করা হয়, শাস্ত্রে বলে। জানি।'

'হ্যাঁ। আর পুত্রপিণ্ডের ভরণপোষণ, মানুষ করার দায় থেকে বেঁচে গিয়ে নিখরচায় যদি ঐ পুত্রপিন্ড, পুত্র আর পিণ্ড, আলাদা আলাদা, রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কারো সৌজন্যে পাওয়া যায় মন্দ কি!'

'আপনি ভাগ্যবান! খেটে মরলো হাঁস, ডিম খেলো দারোগাসাহেব!'

'তাই তো হয় মশাই, এক-একজনের বরাত অমনিধারা। বর না হয়েও কনে পায় তারা—ঘরের কোণেই মিলে যায় অবলীলায়। আমার কী মনে হয় জানেন? ঐ মহাপ্রভু! উনিই! আমায় কোনো মেয়ে দিয়েছেন কি না এখনো জানিনে, তবে আমায় ঐ এম-এ ডিগ্রীটা—আমার ধারণা, ওঁরই অবদান।'

'সেই লোকটার কাণ্ডই বলছেন?'

'সে ছাড়া কে আর? তিনিই অঙ্ক মিলিয়ে অতগুলো পরীক্ষা পাস করেছেন, আবার অঙ্কশায়িনী মিলিয়ে দিয়েছেন তিনি—তাঁর দয়ায় কোনো দুঃখ অভাব নেই আর আমার।'

'দুঃখ ছিল নাকি কখনো?'

'ছিল না? কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ দেখিনি, সেজন্য কেমন যেন একটা নিঃস্ব বোধ করতাম নিজেকে—বৌ নেই বলেই কি কম ক্ষোভ ছিল এককালে? তাঁর কৃপায় নাক গেল না, কিন্তু নরুন মিলল-কষ্ট করে পড়াশুনা করতে হল না, অবহেলায় ডিগ্রী জুটে গেল। সেকালে, জানেন, নামের পেছনে বি-এ, এম-এর লেজুড় লাগানোর রেওয়াজ ছিল বেজায়। একালে কেউ তেমন পোঁছে না, কিন্তু তখন এর যেমন বাজারদর তেমনি নাকি কদর। যাই হোক, এহেন দৌলত তাঁর দৌলতেই তো!'

'গাছে না উঠেই এক কাঁদি—কোনো কাঁদাকাঁদি না করেই।' আমার কথায় তাঁর সায় দেওয়া—'আপনার ভাষায় প্রকাশ করলাম মশাই; মাপ করবেন। ব্যারামটা ছোঁয়াচে কি না।'

'হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীটা তাঁর সৌজন্যে হলেও, চুয়াল্লিশ ডিগ্রীটা পাওয়া স্রেফ আমার নিজের জন্যেই। সম্পূর্ণ আমার কুদ্রতে। বিলকুল স্বোপার্জিত।' আমি জানাই।

'চুয়াল্লিশ ডিগ্রীটা কী আবার? কোথাকার কলেজের?'

'আলিপুর জেলের। পাঁচ হাত লম্বা, হাত চারেক চওড়া ছোট ছোট খুপরি-বাইশটা করে সারি সারি দু লাইনে সাজানো—খুনের আসামীদের ফাঁসি দেয়ার আগে আটক রাখা হয় সেখানে।'

শুনেই তিনি চমকে উঠেছেন—'ও বাবা! আপনি খুনও করেছিলেন আবার?'

'না। আমার তরুণ বয়সে কলকাতায় এসে এক যুগান্তকারী পত্রিকা প্রকাশের জন্য খুন হয়েছিলাম। দেশবন্ধু দাশের অর্থ সাহায্যে আগেকার যুগের যুগান্তর পত্রিকাটার নবপর্যায়ে পুনঃসঞ্জীবন করেছিলাম। ফলে যা হবার। জেল হয়ে গেল। তখনকার কালে যাতে না পালাতে পারে, সে কারণে ওই রাজবন্দীদেরও রাখা হোতো সেই সব খাঁচায়। উপেন বাঁড়ুজ্যে বারীন ঘোষ উল্লাসকরের আত্মজীবনীতে নিশ্চয় ওর সবিশেষ বর্ণনা পেয়েছেন।'

'তাই বলুন।' তিনি হাঁফ ছাড়লেন—'আমি ভেবেছিলুম......'

ভেবেছিলেন আমি সর্বগুণান্বিত, এমন কি ঐ খুনান্বিতও? না, মশাই না, হয়ত বা ইচ্ছে থাকলেও অদ্দুর আমি এগুতে পারিনি। সাধ ছিল বটে, সাধ্য ছিল না—কবির ভাষায় বলা যায়। আমার দৌড় ওই মসজিদ অব্‌দি—ছিচঁকে ব্যাপার—প্রাণ বাঁচানোর দায়ে-করা ছিচকেমি যত। ছিঁচকাঁদুনি আর গাইতে চাইনে। বাঁচতে হলে মানুষকে এক আধটু ক্রাইম্ করতেই হয়—অবশ্যি সবদিক বাঁচিয়ে আইনের দিকটাও—না হলে চলে না। আর বাঁচার মতন বাঁচতে হলে সময় সময় কিছু কিছু সিন না করলেই নয়। এই আমার ধারণা। তবে বাঁচোয়া এই যে, তার অনেকখানিই আমরা মনে মনে সারি—বাহ্যত এবং কার্যত পারি না। বেশির ভাগই আন্তরিক উপভোগ।' আমি যোগ করি : 'আর আসলে সুখ দুঃখ তো আমাদের মনেই মশাই। জন্মভূমির মতন আমাদের মনোভূমিও তো স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। স্বপ্নসাধ আর স্মৃতিসুখ—এই নিয়েই তো আমাদের আধখানা বাঁচা। আদ্ধেক জীবন।'

'সমাজে বাস করে অপরাধপ্রবণ হওয়া উচিত নয়।' তাঁর সুচিন্তিত অভিমত। —'অপরের চেয়েও নিজের মনেই তার প্রতিক্রিয়া বেশি হয়।'

'তা তো বটেই। জানি, অপরাধ করলে একটা অপরাধবোধ সর্বদাই মনের মধ্যে খোঁচায়, তেমনি আবার কোনো কোনো অপরাধ না করলে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হয়। পস্তাতে হয় জীবনভোর।'

'জানি না ঠিক। এবার শুনি আপনার কারাবাসের কাহিনী। সময়টা খুব কষ্টের ছিল নিশ্চয়?

'কষ্ট কিসের। অমন সুখের সময় আর আসেনি আমার জীবনে। আমার বিশ্বাস সহজে লোকে জেলে যেতে পারে না বলেই সাধ করে বিয়ে করে—ওই জেলে না যাওয়ার দুঃখ ঘোচাতেই। ওই জাতীয় একটা সুখের লোভে নিজের বাড়িতে জেলখানা এনে বানায়। হাতে পায়ে শেকল বাঁধে।'

'তবে জেলখানাকে নরক ভোগ বলে কেন মশাই?' আমার কথায় তিনি বেশ একটু অবাক হন।

'ভিন্ন রুচির লোক হয়ে—থাকে না? তাই হবে বোধহয়! জেলখানার বিচার তো জেলের খানা দিয়েই। প্রেসিডেন্সি কি আলিপুরের জেলে থাকতে—কোনটায় ছিলাম জানিনে, তবে এটা বলতে পারি, যেখানেই এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রী বিরাজিত সেইখানেই—খাওয়াটা ছিল একেবারে যাচ্ছেতাই। একটা জগাখিচুরির মতন খেতে হতো আমাদের—নাম ছিল তার লপসি। সহজে গলা দিয়ে গলতে চাইত না। কিন্তু সেখানকার সেল থেকে বেরিয়ে বহরমপুরের জেলে গিয়ে যেন হাতে হাতে স্বর্গ পেলাম। সেখানকার খানাই ছিল আলাদা। মাথাপিছু তিন টাকা করে বাঁধা ছিল সবার—সেই টাকায় কী ইলাহী খাওয়া হোতো যে। তা কহতব্য নয়।'

'বটে বটে?'

'সেখানে গিয়ে জে এল বাঁড়ুয্যে, নজরুল ইসলামের দেখা পেলাম। আলাপ হোলো কবি বিজয় চাটুজ্যে, বিপ্লবী বীর পূর্ণ দাসের সাথে। আরো কে কে যেন ছিলেন, মনে পড়ে না এখন—তাঁদের প্রত্যেকেই দিক্‌পাল। কাজী বলত, ছোটবেলায়, সে নাকি কোথায় বাবুর্চির কাজ করেছে—সব রকমের রান্না জানে। প্রমাণ দেবার জন্যে সবার রান্নাটা সে-ই করত। আর কী খানাই যে বানাত মশাই কী বলব! বিরিয়ানি পোলাও থেকে শুরু করে চপ কাটলেট

কোপ্তা কোর্মা কাবাব কারি—কাবাব আবার দু'কিসিমের—শিক্ এবং নন—শিক্—কারিকুরি কত না।'

'রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছু করত না কাজী?'

'তার গানে কবিতায় আবৃত্তিতে গল্পগুজবে আড্ডায় মাতিয়ে রাখত। এমন মজার মজার কথা কইত সে! অমন প্রাণোচ্ছল প্রদীপ্ত যুবক জীবনে আমি আর দেখিনি।' খানাকুলের থেকে আমি কৃষ্ণনগরের দিকে এগোই—'তার প্রেমের গান সেইখানেই শুনেছিলাম! তার বিদ্রোহের কবিতার পাশাপাশি দোলনচাঁপার কাহিনী। প্রেমের স্মৃতিচারণ তার অবিস্মরণীয় যতো গজল। সোজা গজালের মতন গিয়ে গেঁথে যায় মগজে।'

'বিদ্রোহের গানটান গাইতো না?'

'গাইত না আবার! তার বিদ্রোহী কবিতাটার আবৃত্তি তার মুখে মুখে বার বার শুনলাম। আর বিপ্লবের যতো গান! কারার ঐ লৌহকপাট/ভেঙে ফ্যাল কর রে লোপাট/রক্তজমাট/শিকল পূজার পাষাণবেদী/ওরে ও পাগলা ঈশান/বাজা তোর প্রলয় বিষাণ/রক্তনিশান/উড়ুক প্রাচী—র প্রাচীর ভেদি।' মনে হয় এ—গানটা তার ঐ জেলেই বাঁধা। কী উল্লাসে গাইত যে!'

'আর কী করত কাজী?'

'তাছাড়া কবিগুরুর গানও গাইত একেক সময়। তার মুখে কবির ঋতু পর্যায়ের গানগুলো এমন ব্যঞ্জনা পেত যে বলা যায় না। তোমারি গেহে/ পালিছ স্নেহে/ তুমি ধন্য ধন্য হে! কবির এ গানটার এমন চমৎকার এক প্যারডি বেঁধেছিল সে। গেয়ে গেয়ে সেটা শুনিয়েছেও আমাদের।'

'গানটা কী শুনি।'

'আমি তো গাইতে পারব না, শোনাতে পারি—তোমারি জেলে/পালিছ ঠেলে/ তুমি ধন্য ধন্য হে! / তোমারি অশন/তোমারি বসন/তুমি ধন্য ধন্য হে! '

'আপনারা বেশ আরামেই ছিলেন দেখা যাচ্ছে সেখানে। তবে জেলখানাকে এত মন্দ জায়গা বলত কেন লোকে?'

'মন্দের ভালোটা তারা দেখতে পেত না তাই। ভালোর ভালো বলে এই দুনিয়ায় কিছু তো নাই। মন্দের ভালোই সত্যিকার ভালো। তাই নিয়েই খুশি থাকতে হয়। আমাদের কবিও কি সেই কথাই বলে যাননি? অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। সেই তো তোমার আলো/ সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো/ সেই তো তোমার ভালো! বলেননি কি তিনি?'

'জেলখানাটা আপনার বরাতে দেখছি এক রাজযোটক হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়। আমার স্বনামধন্য সেই ভদ্রলোক আমার হয়ে কষ্ট করে পাশ-টাশ করেছেন, বে-থাও করেছন, সেজন্যে আমার কোনোই ব্যথা নেই, কিন্তু কী ভাগ্যি, তিনি আমার হয়ে এই জেলটাও খাটেননি—তাহলে, সত্যিই! কী সর্বনাশ যে হতো আমার! এইসব অন্তরঙ্গদের সঙ্গসুখ পেতাম না। যথার্থই সর্বহারা হতাম। রাজযোটক তো বটেই। যত রাজাগজার সঙ্গে যোগাযোগ সেই সুযোগেই আমার ঘটল তো! আর সেই খানা! জেলখানার সেই খানা। আহামরি! কার সঙ্গে তার তুলনা করি। মনে পড়লে এখনো জিভে জল সরে। আমি নিজেকে যেন সজিভ বোধ করি আবার। আহা, তেমনটি আর জীবনে কখনো খাইনি।'

'কী বলেন যে!'

আরে মশাই। এই চেহারা আমি ফিরিয়ে আনলাম সেই জেলের থেকেই। বলব না? আগে তো আমি এই কড়ে আঙুলটির মতই টিঙটিঙে ছিলাম। কোনো ব্যায়াম ট্যায়াম সেরে নয়, টনিক-ফনিক মেরে না, জলবায়ুর হেরফেরেও নয়কো, সেই কড়ে আঙুলের ন্যায় চেহারা নিয়ে গিয়ে তেহারা হয়ে ফিরলাম। এই বুড়ো আঙুলের মত হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এলাম বহরমপুরের সেই গারদ থেকেই। দেখছেন তো বেঁটেখাটো আমার এই প্রতীকচিহ্ন? দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকারকে আমার এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে এলাম। আর, তারপর থেকে...।'

'তারপর থেকে?'

'তারপর থেকে জেলখানায় আর জেলের খানায় গড়া এই মোগলাই চেহারা একটুখানিও টসকায়নি আমার। সেইরকমটিই রয়ে গেছে প্রায়। অ্যাদ্দিন বাদেও এখনো আমার সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই দেখিয়ে বেড়াচ্ছি সবাইকে।'

জবাবে কাজীর প্যারডির একটি পংক্তিই তিনি পুনরুচ্চারণ করলেন-'তুমিই ধন্য ধন্য হে!'

সত্যি বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুদ্রাযন্ত্র তার দুঃশাসনী কারাগারের নিষ্পেষণী খর্পর থেকে আমার এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার অদ্বিতীয় কৃতিত্বের জন্য নিজেকেই কি আমার ধন্যবাদ দেবার ইচ্ছে করে না একেক সময়?

॥ সতর ॥

'না বিইয়ে কানাইয়ের মা বলে না?' বললেন ভদ্রলোক, 'আপনি দেখছি সেই রকম বিয়ে না করেই বলাইয়ের বাবা। বলাই বা বালাই যাই বলুন।'

'এ কথা বলছেন কেন?' আমি শুধাই।

'মানে, আপনার সেই হাওড়ার পরকীয়া গৃহিণীকে স্মরণ করেই কথাটা মনে পড়ল আমার। এতদিন তাঁর দৌলতে হয়ত আপনি অনেক ছানাপোনার বাবা হয়ে বসেছেন ......।'

'কিন্তু বালাই বলছেন কেন তাদের?'

'মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী হলেও ছেলেরা তো আপদ বালাই-ই। মায়ের কাছে তা না হলেও বাপের কাছে তো তাই বটে। ছেলেদের মানুষ করা যায় না যে। বেশির ভাগই তারা বাঁদর হয়ে যায়। সেই কারণেই।'

'বংশধররা বংশের ধারা রাখে কি না!'

আদমপূর্বিক সেই ডারুইনের সূত্র ধরে তাদের হয়ে আমার সাফাই গাইতে হয়, 'মেয়েদের মনের মত করে গড়া গেলেও (এমনিতেই মেয়েরা মনের মত স্বভাবতই) ছেলেদের বেলায় সেটা একেবারেই খাটে না। তারা নিজের মতই হয়ে ওঠে। বাপের ধার ধারে না, ধারাও বজায় রাখে না। এই জন্যই কি বালাই? কিন্তু কোনো পুরুষেই তো বাপের ধার ধারেনি—পিতৃঋণ শোধ করতে চায়নি। পারেনি কেউ। আর মাতৃঋণ? মা'র ঋণ তো শোধ করাই যায় না। এবং.....এবং মা তার বড় একটা প্রত্যাশাও রাখেন না। মা মা-ই। তার সঙ্গে কারো কি তুলনা হয়?' আমি নিশ্বাস ফেলি—'মার' ঋণ কখনই আমরা শুধতে পারিনে। তাঁর কাছে আমরা চিরঋণী, আর তাই আমরা থাকতে চাই!'

'সে কথা তুলছি না। বলছিলাম হাওড়ার সেই আপনার পরকীয়া পত্নীটির খবর নিয়েছিলেন আর? ভদ্রলোক, মানে সেই ওরফে-টি নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন এর ভেতর, সুখে ঘরকন্না

করছেন এতদিন।'

'অসম্ভব না। নানান অশ্বমেধের পর অনেক হুড্ডাবড্ডা খেয়ে নিজের নিশ্চিত নীড়ে ফিরে এসে, রাজসূয়ের যোগ্য হয়ে রাজার মতই শুয়ে পড়েছেন এতদিনে আশা করি।'

'এবং আপনার আশাও পূর্ণ করেছেন আরো। আপনাকে পুত্র কন্যা ধনে ধনী বা ঋনী— যাহোক একটা করে আপনার সন্তান দুঃখও মোচন করে বসে আছেন আপনার সেই ওরফে বা বিকল্প—যাই বলুন।'

'অসম্ভব নয়। একালে আর সেই কল্পতরু তো নেই—এখন সবই বিকল্প—সব কিছুরই বিকল্প নিয়েই সুখী হতে হয় আমাদের। আমিও আমার সেই বিকল্প—তরুর থেকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ করলাম। এমনকি, পুত্রকন্যাও পেয়েছি নিশ্চয়। যাকে বলে মোক্ষম লাভ।'

'তাহলে আপনার সব দুঃখ দুর হয়েছে বলুন।'

'সুখ আরো যে, নিজে না হতে পারলেও আরেকজনকে আমি স্বনামধন্য করতে পেরেছি। সাহিত্য জগতে দ্বিত্ব লাভ না করলে দ্বিজত্বলাভ করা যায় না ; তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র, সুনীল গাঙ্গুলির দু নম্বর বেরিয়েছেন। যে কারণে তারাশঙ্করকে শ্রী-হীন হতে হল মশাই! বাকী দুজন কী করেছেন জানিনে। আমারও যে অমনি একজন আছেন জানলেও আনন্দ!'

'কিন্তু তিনি তো লেখেন না আর! লেখক তো নন?'

'হতে কতক্ষণ? লেখা এমন কি শক্ত কাজ? আর, আমার লেখা এমন উঁচু দরের অননুকরণীয় কিছু নয় যে কারো পক্ষে এ ধরনের লেখা কঠিন হবে। ইস্কুলের থার্ড ক্লাসের ছেলেরাও আমার স্টাইলে আমার চাইতে ঢের ভালো লেখে, আমি দেখেছি— অবলীলায় এমনটা লেখা যায়। কেবল আমার পক্ষে লিখতেই যা দারুণ পরিশ্রম হয় মশাই।'

'কই, আপনার নাম নিয়ে কাউকে লিখতে তো দেখা যায়নি এ পর্যন্ত।' তিনি শুধানঃ আপনার স্বনামধন্য সেই ভদ্রলোকের কোনো লেখা কি চোখে পড়েছে আপনার?'

'এখন অব্দি না! আমার মতন থার্ড ক্লাস লিখিয়ে হতে চান না বোধ হয়। কিংবা আমার মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছেন; আমি মরলেই তিনি কলম ধরবেন। আমি বিরল হবার পরই তাঁর অবিরল হবে।'

'ভালোই আপনার। এও তো এক রকমের অমরত্বই।'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া, দেখছেন তো একালে অমর হওয়া শক্ত কত। নামজাদা লেখকরাও মারা যাবার পরই ডুবে যাচ্ছেন। পাঠকরা তাঁদের ভুলে যাচ্ছে একেবারে। সেকালে এক একটি প্রতিভা বহুদিন বাদ বাদ প্রদীপ্ত হতেন—তিনকাল ধরে প্রতিভূরূপে আলো বিলোতেন অন্তত। এখন তো ঘন্টায় ঘন্টায় নতুন নতুন প্রদীপ জ্বলছে,—নিভেও যাচ্ছে তেমনি—এবং আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দেশ। ভালোই তো বলতে গেলে।'

'তা বটে। তাহলেও মরবার পরে অমর হতে না পারলেও আপনি অন্তত ধারাবাহিক হতে পারবেন।'

'পারতাম, কিন্তু আর বোধ হয়'এ আশা করা যায় না। আমার কী মনে হয় জানেন? ভদ্রলোক বোধ হয় আর বেঁচে নেই।'

'কেন এমন আশঙ্কা আপনার?'

'আমি যদি তাঁকে মেরে ফেলে থাকি?....'

'অ্যাঁ? তাই নাকি? খুন করেছেন তাঁকে?' তিনি, শিহরিত হন : 'আপনি বার বার পিলে চমকে দিচ্ছেন আমার। ঈর্ষাবশতই মেরেছেন বোধ হয়? কী করে মারলেন?'

'ট্রেন দিয়ে।'

'ট্রেন দিয়ে? চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন নীচেয়? অ্যাঁ?'

'না, না—তা নয় ঠিক।'

'তবে কী? ট্রেন দিয়ে কি কাউকে মারা যায় নাকি?' তিনি একটু সন্দিগ্ধই : 'তবে হ্যাঁ, একজনকে খতম করার দায়ে ট্রেন উড়িয়ে দিয়ে অনেককে ঘায়েল করা যেতে পারে বটে।'

'মারা যায় না ট্রেন দিয়ে? কী যে বলেন! পাকিস্তান যদি লরী দিয়ে সাতজন বিদেশী ডিপ্লোমাটকে কাত করতে পারে তাহলে কি আমি ট্রেন দিয়ে একজনের মোলাকাত করতে পারব না—যদিও আমি তাদের মতন তেমনটা লড়িয়ে নই।'

'খুলে বলুন তো, শুনি আপনার কাণ্ডটা। কী করে খতম করলেন তাকে?

'ক' বছর আগেকার কথা। সেবার মহাষ্টমীতে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দুর্ঘটনা ঘটল। মহাষ্টমীতে যাত্রা নাস্তি বলে থাকে পাঁজিতে জানেন তো? আজকাল আমরা তা মানিনে, নিজের সুবিধেটাই দেখি। মহাষ্টমীতে পুজোর ভিড়টা কমে যায় বেশ—ট্রেন যাত্রা ঢের সহজ। তাই ওই দিনই আমি আমার মুল্লুকে যাই। সেবার হাওড়া স্টেশন থেকেই দুর্ঘটনার শুরু—প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেই ট্রেনটা পেয়ে গেলাম। ধরতে পারলাম, চড়তে পারলাম কামরায়। আশ্চর্য ব্যাপার।'

'আশ্চয্য কিসের? দুর্ঘটনাই বা কোথায়?'

'বরাবর আমায় পরের ট্রেনে যেতে হয়—সিটি বুকিং-এ আগের থেকে টিকিট কেনা থাকলেও। যে ট্রেনের জন্যে মনে করে বেরুই, যে কারণেই হোক, সে ট্রেনটা নির্ঘাত ফেল করে বসি, তাকে আর ধরতেই পারি না। সেই কারণেই পরের গাড়িতে যেতে হয় আমায়........তবে সবই তো পরের ট্রেন। সেদিক দিয়ে ধরলে, কোন্ ট্রেনটাই বা আমার নিজের বলতে পারি বলুন?'

'তা বটে।' তিনি ঘাড় নাড়েন: 'ট্রেন আর কবে কার! তারপর?'

'তারপর আর কি! সেই ট্রেনটাতে না যাবার জন্যেই দুর্ঘটনা ঘটল। ঘটল আবার সেই ট্রেনেই।'

'কোন্ ট্রেনে?'

'পরের ট্রেনে, যেটাতে আমার যাবার কথা অথচ আমি যেতে পারিনি। আগের ট্রেনটা পেয়ে তাতেই চেপে চলে গেছি। যথাসময়ে ঘাটশিলায় পৌঁছে খেয়েদেয়ে বিছানায় গড়াচ্ছি, এমন সময়ে সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই বিদঘুটে এক আওয়াজ এল—ঘাটশিলার অদূর থেকেই। সোরগোল উঠল ঘাটশিলার কাছেই নাকি এক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে—বে-লাইন হয়ে উলটে গিয়েছে গাড়ি। পরের দিনের কাগজে বিস্তৃত খবর বেরুল—হতাহতের তালিকায় এক শিবরামের নাম।'

'অ্যাঁ? সে কী মশাই?'

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। না না, ঐ ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য না—আমি দায়ী মানে, আমার দোষেই ঐ ভদ্রলোক হতাহত হলেন কি না! আমি যদি পরের ট্রেনে আসতাম তো আমিই মারা যেতাম নির্ঘাৎ। এক বাড়িতে দুবার

বজ্রাঘাত হয় না, এক লোককে দুবার কামড়ায় না সাপে—তেমনি এক সাথে দুজন শিব্রাম মারা পড়তে পারে না কখনো।'

'আপনার পক্ষে ভালোই তো সেটা।' তিনি ঠিক ঠাহর পান না—'এর ভেতর খারাপটা হলো কোনখানে?'

'সেই ভদ্রলোকের মারা যাওয়াটা খারাপ হলো না? একজনা বিধবা হলো না সেজন্য? কয়েকজন পিতৃহারা হলো না কি? কিন্তু আমি মরলে কার কী যেত? কী ক্ষতি হতো কার?' খতিয়ে আমি বলি—'চিত্রগুপ্তের খাতায় এক শিব্রামের ট্রেন চক্রে মরবার কথা ছিল সেদিন, সেই খাতে আমায় মিলল না বলেই ওকে মেরে তাঁর খতিয়ানের হিসেব ঠিক রাখতে হলো। কাপুরুষের মতন আত্মরক্ষা করে তাঁর মৃত্যুর জন্য আমিই কি দায়ী নই? বলুন আপনি?'

শুনে তিনি গুম হয়ে যান. কিছুক্ষণ তাঁর কথা সরে না। তার পরে তিনি গুমরে ওঠেন—'অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত তা বটেই! আমাদের বেচেঁ যাওয়াটাও অদ্ভুত, মারা পড়াটাও অদ্ভুত! সবচেয়ে অদ্ভুত আমাদের এই বেচেঁ থাকাটা। মুহুর্মুহু মিরাকেল্।' তাঁর কথায় আমার অক্ষরে অক্ষরে সায়।

খেয়েদেয়ে থালাতেই হাত ধুয়ে মুখ মুছে সকড়ি থালাবাটি গেলাস সব চৌকির নীচে নামিয়ে রেখেছিলাম—'এবার আমি শুয়ে পড়ি, কী বলেন? শুয়ে শুয়ে আপনার সঙ্গে গল্প করা যাক, কেমন?.... আপনি পা তুলে ভালো করে বসুন। বাবু হয়ে বসুন বিছানার ওপর।'

'তা কি হয়! পায়ে ধুলো যে!'

'ধুলো কিসের! আপনি জুতো পরে আসেননি কি?' তাঁর পায়ের দিকে নজর দিই, 'এ কি? আপনার জুতো গেল কোথায়?'

'ঘরের বাইরে রেখে এসেছি। দরজার ও ধারে।'

'করছেন কী! খালি পায়ে এসেছেন এই নোংরা ঘরে, অ্যাঁ? কেন? ঘরে কি আরো জুতো নেই নাকি? আমারই তো ক' জোড়া রয়েছে—ঘরময় ছড়ানো। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত—দেখছেন না? এটা তো ঠাকুরঘর নয় আর। জুতো পায়ে ঢুকতে কী হয়েছিল আপনার? জুতোর কি আবার জাতিভেদ শ্রেণীভেদ আছে নাকি?'

'না, তা নয়। তবে কারো ঘরে কি জুতো পরে ঢুকতে আছে?'

'অন্য ঘরের খবর রাখিনে, আমার ঘরে কিন্তু তাই নিয়ম। দেখছেন আমার ঘরে কতো ধুলো বালি আবর্জনা জমে রয়েছে। তিন যুগ আগে সেই কবে যে এই ঘরে ঢুকেছি তার পর আর এখানে ঝাঁটপাট পড়েনি। ঝাড়পোছ হয়নি কখনো। কে করবে ওসব বলুন? ও সব তো গৃহিণীর কাজ—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, বলে না? মুচ্যতে কিংবা মুচ্ছ্যতে যাই বলুন না।'

'কেন, বাসার চাকর-টাকর? বললে, বক্সিস দিলে, তারা কী ঝাঁটপাট দিয়ে ধুলো ময়লা সব সাফ করে দেয় না।'

'কী হবে দিয়ে? তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে ঘরের ভেতরে পুঞ্জীভূত এই জঞ্জালের মধ্যে না জীবাণু জন্মেছে—কত না রোগজীবাণু! কী হবে ঝেঁটিয়ে তাদের উত্যক্ত করে? ঝাড়লেই তো তারা হাওয়ায় উড়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের নাকমুখের পথে সোজা গিয়ে শরীরে সেঁধুবে? কী দরকার তার? তার চেয়ে লেট দি স্লিপিং ডগস্ লাই। আমার এই

কথাই।'

'বেশ কথা। কিন্তু তাহলেও, দোরগোড়ায় একটা পাপোশ তো রাখতে পারেন? লোকে পা-টা মুছে ঢুকতে পারে ঘরে তাহলে।'

'আমিও সেটা ভেবেছি—রাখব একটা পাপোশ এবার। তবে দরজার বাইরে নয়, আমার ঘরের ভেতরেই রাখতে হবে পাপোশটা।'

'ঘরের ভেতরে কেন?'

'বাইরে রেখে কী হবে? বাইরেটা তো বেশ পরিষ্কার, দেখছেন না? রোজ সকালে জমাদারের ঝাড়ু পড়ে। ঘরের ভেতরেই তো যত ধুলোবালি আর জঞ্জাল। ঘরের মধ্যেই রাখতে হবে পাপোশটা—যখন কেউ এ ঘর থেকে বেরুবেন, বেশ করে নিজের পা-টা মুছে-টুছে বেরিয়ে যাবেন সেই পাপোশে।'

॥ আঠারো ॥

'পা তুলে গুটিয়ে বিছানার ওপরে ভালো করে বসুন না মশাই।' বললাম আমি জনাব সাহেবকে—'ঘরের ধুলো বালি আপনার পায়ে লেগেছে বলেছেন? এক কাজ করুন না! আমার এই বিছানাতেই পা-টা মুছে নিন না হয়।'

'বিছানাতে পা মুছব?' তিনি যেন অবাক হন।—'বলছেন কী!'

'কোথায় মুছবেন আর? পাপোশ তো নেই আমার ঘরে? কী হয়েছে? আমিও তো তাই করি সর্বদাই।'

'বিছানাতে পা মোছেন নাকি?'

বিছানাতেই কি আর? তা কি কেউ মোছে নাকি? চাদরের তলাতেই মুছি। চাদর তুলে কম্বলের গায়ে মুছে দিই। চাদর আমার ফিটফাট ধোপদুরস্ত। চাদরের তলায় কী আছে কে দেখতে যাচ্ছে বলুন? ওপরটা চাকনচিকন হলেই হল। চাদরের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। বিছানার কী! নিন, মুছুন।'

চাদর তুলে আমার কম্বল শয্যা উন্মুক্ত করি।

'আমার কোনো বিষয়াসক্তি নেই। বিছানাকে যে চাদর দিয়েছি সেই ঢের—তার বেশি আদর করা ঠিক হবে না। মাঝে মাঝে পা মুছি তাই—এই, জুতো-টুতো পরার আগে কিংবা বাইরে থেকে ফিরে এসে। মাঝে মাঝে পদাঘাত করতে হয় বিছানাকে—তবেই ব্যাটা দুরস্ত থাকে।

তিনি পা নিয়ে ইতস্তত করেন।

'নইলে নাই পেলে বিছানা মাথায় উঠবে যে! অনেকে অবশ্যি বিছানাকে মাথায় করে রাখেন। ঝালর দেওয়া সুজনি টুজনি বিছিয়ে তার ওপর। আমার মতে, বিছানা হচ্ছে ঘুমোবার জন্যে, ঘুমটি হলেই হোলো। শান্তিতে ঘুম—নির্বিবাদ শান্তি। তার জন্যেই বিছানা। বিছানায় বিছা না থাকলেই হোলো। নেইও আমার। কামড় বসাবার কেউ নেই। বিয়ে করিনি তো।'

'সারারাত বিছের কামড় সইতে পারবেন না বলেই নাকি?'

'আঁক-ফাঁকের দেমাক সয় না আমার। তার ভেতর মাথা গলাই না আমি। অঙ্ক মেলাতে পারতুম না বলে অঙ্কশায়িনীও মিলল না বোধহয়। ভালোই হোলো একরকম। বিছানাকে নাই দিতে হোলো না, বিছানাময়ীকেও নয়।'

'জীবনমন্থনের বিষভাগকে বাদ দিতে গিয়ে অমৃতের ভাগেও বঞ্চিত হলেন শেষটায়। জীবনটাই বিস্বাদ করলেন।' আমার ভাষাতেই যেন তাঁর বিসংবাদ শুনি—'ফাঁকি দিয়েছেন নিজেকেই। ফাঁকি পড়েছেন একেবারে।'

'সাধ্য কী!' আমি বলি—'নেচার অ্যাভরস্ ভ্যাকুয়াম্, বলে না? কোথায় ফাঁক রাখার যো আছে কি? প্রকৃতিই থাকতে দেয় না। ভগবান একেবারে ফাঁকি পড়তে দেন না কাউকেই। সব ফাঁক সবার ফাঁকই ভরাট করে দেন একেক সময়—ভগবানের প্রকৃতিই তাই।'

'বটে?' তিনি জানতে চান—'তাহলে শয্যাসঙ্গিনীও ঘটে যায় একেক সময় বলছেন? ওই বিয়ে না করলেও?'

'আমি কী বলব? আপনিই বলুন। এসব কথা কি কাউকে কখনো মুখে বলার? নিজের মনে নিজ গুণেই সমঝে নিতে হয়ে। তাবৎ ভাবের কথাই তো ভাববাচ্য মশাই!'

তিনি যেন ভাবে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কথা সরে না তাঁর। তারপর বলেন—'আশ্চর্য কিছু নয়।'

'আশ্চর্য কী! কার কোথায় কখন কীভাবে কোন্ অভাব মোচন হয়ে যায় কেউ বলতে পারে? কখনো দৈবাৎ মেলে, কখনো বা পুরুষকারের দ্বারা লভ্য পুরস্কার। মোটের ওপর ভগবতীর রাজ্যে কেউ কদাপি ফাঁক যায় না—একেবারে ফাঁকিতে পড়ে না কেউ। কালী কল্পতরু, কালও আবার তাই। কালক্রমে মেলে সব, মিলে যায় তাবৎ, জানেন নাকি?'

'কী জানি!'

'কী জানবেন আর! জানবার কী আছে! ভগবানের অপার রহস্য, কিছু কি তার জানা যায়? নিন, পা তুলে ভালো হয়ে বসুন তো! নইলে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।...শুতে পারছি না বলে শান্তি পাচ্ছিনে।'

'পড়ুন না শুয়ে। কে আটকাচ্ছে?'

'আপনাকে ওই প্রায়োপবেশনে রেখে কি শোয়া যায় মশাই? ভদ্রতায় বাধে যে?' সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুযোগ : 'লেখকরা যদিও ঠিক ভদ্র নন কখনো—তাহলেও চক্ষুলজ্জা বলে একটা আছে তো।'

ভদ্রলোক আমার উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন সসঙ্কোচে চাদরের এক ধারটা তোলেন—'এ তো কম্বল দেখছি কেবল। দুখানা কম্বল। এই আপনার বিছানা! তোষক—টোষক নেই?'

'পাবো কোথায়? কে দেবে? জেলখানার দৌলতে পাওয়া ওই কম্বল দুটোই দুনিয়ার সম্বল আমার।'

'অ্যাঁ? কী বললেন? জেলখানার কম্বল?'

'হ্যাঁ। চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর অবদান। সেখানে হাজত বাসের সময় ও দুখানা দিয়েছিল—একটা পাতার জন্যে আর একটা গায়ে দেবার। তারপর আদালতে কারাদণ্ড হবার পর সেখান থেকে বহরমপুরের জেলে চালান যাবার কাছে ওদুটো নিতে হোলো—শীতকাল ছিল কিনা তখন! প্রহরী আর কম্বল—পরিবেষ্টিত পৌঁছলাম বহরমপুরে গিয়ে। কম্বল নিয়েই ঢুকলাম সেখানকার গারদে।'

'তারপর?'

'সেখান থেকে খালাসের সময় আমায় বললে যে, তোমার যা জিনিসপত্র আছে, যা যা সঙ্গে এনেছিলে নিয়ে যেতে পারো। নিজের বলতে ওই কম্বল দুখানাই ছিল। নিয়ে এলাম

সমভিব্যাহারে। বাধা দিলে না কেউ। ব্যবহারে লাগিয়েছি এখন।'

'পলিটিক্যাল আসামী বলে ভ্রূক্ষেপ করেনি কেউ। সেইজন্যেই আনতে পেরেছেন।'

'আনন্দবাবুও সেই কথাই বললেন...'

'আনন্দবাবুটি কে?'

'এই বাড়ির মালিক। আনন্দমোহন সাহা। তাঁর এই বাসায় তিনিই তো ঠাঁই দিয়েছিলেন আমায়। দুঃখের বিষয়, এখন আর বেঁচে নেই। সস্ত্রীক স্বর্গত। আহা, তাঁরা বেঁচে থাকতে কতো ভালোমন্দ খেয়েছি যে! পায়েস পিষ্টক ভুনিখিচুড়ি—ভূরি ভূরি খেয়েছি। খিচুড়িটা ঠিক পোলাওয়ের মতই খেতে—প্রায়ই আসত তাঁদের বাড়ি থেকে। আর পায়েস! আহা, সে কী পায়েস! আয়েস করে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার মতন। খাসা চাল, দুধে নয়, ক্ষীরের মধ্যে সেদ্ধ করা আগাগোড়া। তেমনটি আর হয় না। আজকাল কোথাও খেতে পাই না আর।' আনন্দ বিয়োগে ততটা নয়, ওই পায়েসের শোকেই আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—'আমার জীবনের আনন্দ তিনি নিয়ে গেছেন। সেই আনন্দবাবুই এই কম্বল দেখে বললেন, আরে ভাই! করেছো কী! জেলখানার মাল নিয়ে এসেছো! কেউ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না—চুরির দায়ে ধরা পড়বে যে! হাতকড়া পড়বে। আর এবারকার জেলটা ঠিক বিরিয়ানি খাবার হবে না, হবে দস্তুর মতন ঘানি টানার।...সরিয়ে ফেল সরিয়ে ফেল এক্ষুনি।'

'বললেন তিনি। এই কথা বললেন?'

'হ্যাঁ। শুনেই না আমি সরিয়ে ফেলেছি তক্ষুনি। চাদরের তলায় চাপা দিয়েছি তাদের।'

'আর ঐ বালিশটা পেলেন কোথায়? নক্সাকাটা ওয়াড় দেয়া খাসা বালিশ তো? ওটাও কি জেলখানার নাকি?'

'না। ওটা আমার বোন পুতুল দিয়েছিল আমাকে। একদা সে এসে দেখল কি, আমার মাথাটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে...'

'মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল? আপনার মাথা?'

'আহা, ওই হোলো। এই বিছানতেই গেল না হয়। গড়াগড়ি যাচ্ছিল তো ঠিকই। আর টাকা মাটি মাটি টাকা যদি হতে পারে তো বিছানার মাটি হতে বাধা কিসের? তাই না দেখে সে তক্ষুনি বেরিয়ে কোত্থেকে একটা বালিশ কিনে এনে উপহার দিল আমাকে। ওই বালিশটাই। সঙ্গে আবার ওয়াড় দিল খান দুয়েক। দুখানা কেন? শুধিয়েছিলাম তাকে। যাতে আমায় কাচাকাচির কাজে না যেতে হয় সেইজন্যেই দুখানা—একটা ধোবা বাড়ি কাচতে যাবে, আরেকটা পরানো থাকবে। কাচাকাচির কাজ করলেও মেয়েরা কখনো কাঁচা কাজ করে না।'

'তাই বলুন! কিন্তু এই কম্বল শয্যার সঙ্গে ঐ উপাদেয় উপাধানের খাপ খাচ্ছে না ঠিক। কেমন বেখাপ্পাই ঠেকছে।

'জেলের কি তার জিনিসের কোনো নিন্দে করবেন না আপনি আমার কাছে।' আমি বলে দিই। 'তার দৌলতেই আমার এমন দেহলাভ আর এই দেহরক্ষার জন্যে এহেন শয্যা—তা জানেন?'

'জানলাম। কিন্তু এইটে আমি বুঝতে পারছিনে আপনার এমন সব বোন থাকতে তাঁরাও কি এই ঘরটার ওপর একটু নজর দেন না? সাফসুফ করতে চাননি কখনো কেউ?'

'চাননি কি আর? বিনি ইতু পুতুল—যে এসেছে, ঘরের এই চেহারা দেখেছে, সে-ই এর হাবভাব বদলাতে চেয়েছে, কিন্তু দিচ্ছে কে হাত লাগাতে? বিনিকে নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে

অনেক গল্প লিখেছি এককালে মানি, সে-সবের বিনিময়ে টাকাও পেয়েছি দাদার তা জানি, কিন্তু—তাই বলে দাদার লেখা বিকিয়েছে বলে তার মাথা কিনে নেয়নি, আমার কি আমার ঘরের ওপরে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাকে দিইনি আমি। আর ইতু কি পুতুল এ-ঘরের জঞ্জালে হাত লাগাতেই না আমার সঙ্গে হাতাহাতি বাঁধার যোগাড়। যতই ইতুদেবীর পূজারী কি পৌত্তলিক আমি হই না কেন, আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় কারো হস্তক্ষেপ আমি সইতে পারি না। ব্যক্তিত্বহানিতে আমি নারাজ। ব্যক্তিত্বই তো একজনের চরিত্র। চরিত্রহীন হতে চায় কে?'

'ঘর পরিষ্কারের সাথে ব্যক্তিত্বের, ব্যক্তি-স্বাধীনতার কী সম্পর্ক মশাই?' তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না।

'ঘর কি আমার ব্যক্তিত্বের অংশ নয় মশাই? আমার ঘরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বও কি জড়িত নয়? কী বলেন! আমার মনের রূপের বহিঃপ্রকাশ তো এই ঘর। খানিকটা অন্তত নিশ্চয়ই। আমার অন্তঃকরণের পুঞ্জীভূত জঞ্জালের অভিব্যক্তি ছাড়া কী আর? সত্যি বলতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সোফা সেট সাজানো পোশাকী ঘরে লোফার আমি যেন ঠিক স্বস্তি পাইনে।'

'বুঝতে পেরেছি। এই হেতুই কোথায় আপনি হবেন এক বিরাট জমিদারি আর সাত মহলা বাড়ির সুসজ্জিত সাতষট্টিখানা ঘরের মালিক, খাটপালঙ্ক গদি সাজানো ঘর সব, তা না হয়ে।' গদির কথায় তাঁকে গদ্‌গদ হয়ে উঠতে দেখি।

'আর কোথায় এহেন এক ঘরের এই চৌকিদারি আমার।' তাঁর বাক্যটা আমিই সম্পূর্ণ করি · 'অবশ্যি, সেই সাথে কয়েকটি চটিরও মালিক বটি।'

'চটি না বলে স্লিপার বলুন বরং।

'স্লিপার তো আমিও কিছু কম নই। ওরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, আর আমি সর্বদা এই শয্যায় নিক্ষিপ্ত। তফাৎ এই, ওরা সব জোড়ায় জোড়ায়, আর আমার আদৌ কোনো জোড়া নেই। এ ঘরে নেই অন্তত।'

'সারা বাংলা মুল্লুকেই আপনার জোড়া নেই।' কথাটা যেন তার ব্যাজস্তুতিচ্ছলেও বলা নয়। —'তা জানি।'

'জুড়ি একজনা ছিল বটে—কিন্তু সে জুড়ি তো আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি কোন্‌কালে। ঘাটশিলার রেলগাড়িতেই। বললাম না আপনাকে?'

'অন্য জুড়ি জুটলে এমনটা হতো না। বিয়ে করলে এভাবে থাকতে পারতেন না কিছুতেই। বোন না হয়ে বৌ হলে কি আর এসব আবর্জনা বরদাস্ত করত? দরকার হলে হাতাহাতি করেও সব জঞ্জাল সাফ করে ছাড়ত এক লহমায়।'

'তা হয়ত হতো, কিন্তু সেই জঞ্জাল সাফ হতো কি করে? আমার প্রশ্ন রাখি।

'কোন জঞ্জাল?

'সেই জঞ্জাল হটানো জঞ্জাল? তিনি আবার যে পুন্নাম নরক আমদানি করতেন—সেই সব?'

'স্ত্রীপুত্ররা সব জঞ্জাল নাকি আপনার কাছে? তাদের অবশ্যি মায়াজাল বলেছে বটে', কিন্তু...তাহলে আপনার বোনরাও তো আপনার কাছে জঞ্জাল একরকম?'

'মোটেই না। আমার কাছে তারা সব নন্দন কানন। নন্দন অংশ বাদ দিলেও—সেই পারিজাত সৌন্দর্য—সুরভির সীমা নেই, তুলনা হয় না। বন উপবন যাই বলুন, সেসব

ব্যক্তি-স্বাধীনতার হন্তারক নয়। স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্থান। আস্তে আস্তে তারা সব ছেড়ে যায়, বেঁধে রাখে না, বাঁধা থাকে না। বন ক্রমেই গভীরতর হয়ে নিছক রোদনের অরণ্যরূপে, কালক্রমে নিজে সংসারসমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যায়। তারা তো ছাড়ান দেয়, ছেড়ে যায় যথাসময়ে, কিন্তু বৌকে তো আর ছাড়ানো যায় না কিছুতেই। কখনই না।'

'দরকার কি তার?'

'সিন্ধুবাদের সেই গলগ্রহের ন্যায় সূতহিবুকযোগে লব্ধ গোধূলি লগ্নের উদ্বাহিত সেই ভার্যাকে ঘাড় থেকে আর নামানো যায় না যে! তারপরে 'শেষকালেতে মাথার রতন লেপটে রইলেন আঠার মতন!' কবি ডি এল রায় একথা কেন বলে গেছেন কে জানে! যে জন্যেই বলুন, মোদ্দা কথা এই, তারপর সেই নাছোড়বান্দার নেহাৎ বান্দা হয়ে বন্দীদশায় যাবজ্জীবন কাটানো!

'তাই বলছেন আপনি? বৌয়ের বিরূদ্ধে এই আপনার অভিযোগ।'

'আমি কেন বলব? বৌয়ের বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই।' আমি জানাই: 'আমার আবার অভিযোগ কিসের! বিয়েই করিনি আমি। মাথা নেই তো মাথাব্যথা কিসের!' কিন্তু যাঁরা করেছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁদের, তাঁদের সেই ফার্স্টহ্যাণ্ড নলেজের ফল গল্প-কাহিনীর ছলনায় তাঁদের আত্মচরিতেই ব্যক্ত হয়েছে। আমার বন্ধুরাই মুখে না বলে লিখে জানিয়ে গেছেন।'

'লিখে জানিয়েছেন? বলেন কি?'

'কেন, পড়েননি নাকি? কে যেন তার বৌকে কুয়াসার আড়ালে হারাতে চেয়েছিল—অবশ্যি মেয়েটি হারায়নি শেষ পর্যন্ত। হারাবার কি হারবার পাত্র নয় মেয়েরা হারিয়ে না গিয়ে উলটে তারাই হারিয়ে দেয় আমাদের।...সেই কার যেন স্ত্রীকে শৃঙ্খলের মত বোধ হয়েছে, কে যেন আবার দেদার পাম্প করে দিয়ে স্টোভ ফেটে বৌয়ের অপঘাতের অপেক্ষায় বসেছিল—বিস্ফোরণের এক যাত্রায় সহধর্মিণীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াও তার বাঞ্ছনীয় ছিল নাকি—পড়া নেই আপনার?'

'পড়ব না কেন? বিখ্যাত গল্প সব। কিন্তু আপনার লেখক বন্ধুদের একজনেরই তো গল্প এগুলো—আর কোনো বন্ধুর কেউ কি এরকম দুর্লক্ষণ দেখিয়েছেন? তার উল্লেখ করুন!'

'দরকার করে না, উনি একাই একশ। আমাদের সবার মুখপাত্র। গৌরবে বহুবচন—তাঁকে নিয়েই আমাদের গৌরব। হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই আর সবার হালচাল জানা যায়। তাঁর লেখাতেই আর সকলের টিপসই রয়ে গেছে। তবে একথা ঠিক, গল্পকথা হলেও এগুলি অল্প কথা নয়। এর মধ্যে শিক্ষণীয় আছে অনেক কিছু।...

'কিন্তু শুনেছি তো, তাঁর মতন পত্নী—বৎসল নাকি হয় না...'

'ঠিকই শুনেছেন।...'স্ত্রী না হলে একদণ্ডও চলে না ওঁর। বউকে ছেড়ে এমন কি আমেরিকায় গিয়েও উনি স্বস্তি পাননি—একদিনও তিষ্ঠোতে পারেননি সেখানে। সম্ভাবিত নোবেল প্রাইজ পাবার লোভ সংবরণ করে দুদিন বাদেই ন্যাড়া মাথায় নিজের সেই বেলতলাতেই ফিরে এসেছিলেন আবার।'

'কেন এলেন বলুন! তাহলেই বুঝবেন—স্ত্রী কী চীজ!'

'আসতেই হবে যে। আর সেই কারণেই তো আমার বলা—দাম্পত্য জীবনের পরিণতিতে দাসমনোভাব দাঁড়ায়, অন্য গতি থাকে না আর। হয়ত একটু আত্মতুষ্টির আবহ সৃষ্টি করলেও

আত্মস্ফূর্তির পক্ষে ভয়াবহ। বউ কোনো বাড়াবাড়িতে যেতে দেয় না, স্বচ্ছন্দবিহার চলে না, বাড়িতেই বন্দী হয়ে থাকতে হয় সবসময়—অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায়—কেচ্ছার ভয় আছে না? সেসব বালাই নেই ব্যাচিলারের। বউ অন্তরের আয়ের সব পথ বন্ধ করে দেয়—নিজের কাছে অন্তরীণ রাখে। এইজন্যেই সে ব্যক্তি—স্বাধীনতার অন্তরায়।'

'কিন্তু অসুখবিসুখে দেখাশোনা করবার...'

'যেমন সে, নানান আধিব্যাধি আমদানি করতেও তেমনি। বিবাহিত ব্যক্তির নানা অসুখবিসুখ তো লেগেই থাকে, কেন বলুন দেখি?'

'আপনিই বলুন না।'

'ঐ বউয়ের জন্যেই মশাই! রোগেই তো রোগ টানে। গোড়াকার রোগ ওই দারাই। দারারোগ দুরারোগ্যই। আবার ওই বউয়ের হাতের সেবাসুখ পাবার লোভেই যতো না অসুখ। বউ এসে গায় মাথায় হাত বুলোবে, যত্নআত্তি করবে, তার মুখের আহা উহু শোনা যাবে সেইজন্যেই না! যার ঘরে বউ নেই তার কোনো ব্যামোও নেই, অন্তত তেমনটা নেই—এইজন্যেই।'

'আপনার অসুখবিসুখের সময় আপনি কি চান না আপনার প্রিয়জনরা কেউ এসে গায় মাথায় হাত বুলাক?'

'মাথায় থাক। অপর কেউ আমার গায় মাথায় হাত বুলোলে আমার গা জ্বালা করে—আমার মা ছাড়া আমার কপালে আর কারো করাঘাত আমি সইতে পারিনে—পাছে কেউ আমায় অসহায় অবস্থায় পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে যায় সেই ভয়ে আমার কোনো অসুখই করে না কখনো। এই বছর পঞ্চাশ তো এই বাসায় কাটালাম, জিগ্যেস করুন না বাসার ঠাকুরকে, জানবেন একদিনের জন্যেও আমার কোনো মীল বাদ যায়নি। কোনো অসুখ করেনি কখনো। এমন কি একবার...' কথাটা বলব কিনা আমি ভাবি একবার।

'একবার?' তিনি উসকে দেন আমায়।

'একবার এ বাসায় ফুড পয়জন হয়েছিল অনেকদিন আগে। নৈশাহারের পরেই। পরদিন শুনি আগের রাত থেকেই বাথরুমে যাতায়াত শুরু হয়েছিল কারো কারো। পরের দিন সকালে উঠে বেরিয়ে গেছি, কিছু জানিনে, রাত্রিবেলায় ফিরে দেখি রান্নাঘর অন্ধকার। উনুনে আঁচটাচ পড়েনি, কী ব্যাপার? না, সারাদিন ধরে বাসাড়েরা কেউ বিশ পঁচিশ কেউ বা বাহান্নবার বিগলিত হয়েছেন—কেউ কেউ আবার হাসপাতালেও গেছেন নাকি। আমাদের বাসার ওড়িয়া ঠাকুর—পরশুরাম পাঢ়ী—সে নাকি সন্ধ্যে পর্যন্ত সঠিক ছিল, কিন্তু তারপরে তাকেও এখন মুক্তকচ্ছ হতে হয়েছে। বাসার সবাই আজ ধারাবাহিক, তাই আজ রান্নাঘরে আঁচ পড়েনি, হাঁড়ি চাপেনি তাই।'

'বটে?'

'অথচ সেদিন সকালে যেখানে গেছলাম সেই বন্ধুর বাড়িতে বেদম খেয়েছি—খাবার লোভেই আমার যাবার গরজ তো—তারপরে বাসার ঐ নিরাহার চেহারা দেখে বেরিয়ে পড়তে হোলো আবার। দেলখোস কবিনে গিয়ে গিলতে বসে গেলাম।'

'আপনার জীবনে কখনো কোনো অসুখবিসুখ করেনি তাহলে? এই কথাই বলতে চাইছেন আপনি?'

'করেছিল বইকি। একবার করেছিল। মোক্ষম অসুখ। প্রায় মোক্ষ প্রাপ্তির কাছাকাছি নিয়ে

গেছল বলতে কি! এখানে সেখানে ভালোমন্দ খেয়ে না খেয়ে—বহুকালের ব্লাডপ্রেসার তো আমার। দারুণ প্রেসার। তার দরুন একটু স্ট্রোক হয়েছিল হঠাৎ। ব্লাডপ্রেসার মানতাম না, ডাক্তারের মানাটানা না শুনে তার ওপরেও খেতাম—একটানা গিলে যেতাম—মাংস ডিম মাখন ক্রীম—তার ফলেই ওই দুর্ঘটনা। কিন্তু তারপরেই আমি সাবধান হয়ে গেছি খুব। কোথাও যাই না, গেলেও তেমনটা খাই না। কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর জন্মদিনে বেজায় ঘটা করে ষোড়শোপচারে খাওয়ানো হয়, সেখানে গেলে পাছে লোভ সামলাতে না পারি—তাই যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, তাঁরাও বেঁচে গেছেন মনে হয়, কেননা কারো জীবনের শুভদিন অপর কারো শোকাবহ মৃত্যুদিন হয়ে জন্মোৎসবটা নষ্ট হোক, তারাও তা চান না নিশ্চয়। নিজ গুণে ক্ষমা করেছেন আমাকে।...'

'মুক্তারামের তক্তারামে শুয়ে- অচিন্ত্যবাবুর ভাষায়—শুক্তারাম খেয়ে সুখে রয়েছেন?'

'সর্বদা মার্কাস স্কোয়ারের দূর্বা-মথিত দুর্বার মুক্ত বায়ু সেবন করে'—আমি জানাই—'এই, সকালে খাই চারটি ভাত, কত ক'টি, চোখেই তো দেখলেন? দুপুরে বোনের বাড়ির থেকে আমার ভাগনের নিয়ে আসা একখানি রুটি, কয়েক টুকরো মাছ, একটু তরকারি আর রাত্রে খালি হরলিকস্। তার সঙ্গে হয়ত এক-আধটা বিস্কুট। তবু আমার রক্তের চাপল্য যায় না মশাই!'

'কখনো আপনার কোনো অসুখ হয়নি একথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হয়নি কি? হয়েছে। ছেলেবেলাতেই হয়ে গেছে। কী অসুখটাই না ভুগেছি তখন—কত রকমের যে অসুখ! যত রকমের সুখ আর অসুখ আছে তার উপভোগ সেই অতি কৈশোরেই হয়ে গেছে আমার। সে সবের লিস্টি দিয়ে কী হবে? যেমন রোগা ছিলাম তখন, তেমনি রোগও ছিল কত না! কিন্তু সেও সেই মা এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। বিছানার পাশটিতে বসে থাকবে দিনরাত, সেই লোভেই তো! আর, ইস্কুলে যেতে হবে না, শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়া যাবে মজা করে—কী আনন্দ! সুখের জন্যেই আমাদের যতো অসুখ, বুঝেছেন?' আমার বক্তব্যের উপসংহার—'তারপর সেই যে বাড়ির থেকে পালিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে পড়লাম উদার পৃথিবীতে, তারপর থেকে আমার একটিও অসুখ করেনি কখনো। কার জন্যে করবে?'

'তা না হয় হলো, কিন্তু এখন আপনার এই বয়সে যদি হঠাৎ কোনো অসুখ বিসুখ করে, কোনো শক্ত অসুখই হয়, এখন তো যে কোনো সাধারণ অসুখই সহসা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বাসার সবাই নিজের কাজ নিয়ে আপন ধান্দায় ব্যস্ত এই অবস্থায় একলাটি কী ব্যবস্থা হবে আপনার? বলুন দেখি?'

'কী হবে আর? মারা যাবো? এই না? তা বলে দৈনন্দিন মার খেয়ে মরতে হবে না তো? মারা যাবার সময় কারো ওই আহা-উহু শুনতে পেলাম আর নাই পেলাম। কী ক্ষতিবৃদ্ধি? তখন কি কারো ফোঁসফোঁসানি কানে যায়, না ভালো লাগে মশাই? বিশেষ করে শুধু আমিই যখন মারা যাচ্ছি—আর কেউ মরছে না আমার সঙ্গে অন্তত, এই মুহূর্তে নয়—তখন আমার অন্তরের সেই হাহাকার তাদের ঐ আহাকারে কি থামবার? সেই কালে তাদের ওই সহানুভূতি আমার মরার ওপর খাঁড়ার ঘার মতই মনে হবে না কি?'

'কিন্তু আপনার যদি বৌ থাকত এ সময়—'

'রক্ষে করুন। সারা জীবন ধরে বৌয়ের অসুখ সামলাতো কে? তারা কিছু কি কম অসুখে ভোগে নাকি। তাদের অসুখের হ্যমলা পোহাতে হোতো না দিনরাত? নিজের অসুখের দায় বরং সওয়া যায়, কিন্তু সেই বোঝার উপর বৌয়ের বিসুখের ঐ শাকের আঁটিটি-তার ঠ্যালা কি কম নাকি?'

'আরে মশাই, দিনরাত অসুখে ভুগবে কেন সে? দেখেশুনে স্বাস্থ্যবতী এক যুবতীকে বিয়ে করতে পারবেন না? পরীর মতন একটি বৌ হলে আপনার ঘর আলো করে থাকত নাকি? আপনার দেখাশোনাও করত সে?'

'সত্যি কথা বলব? পরীর মত মেয়ের কথা বলছেন? আমার জীবনে কোনো পরীর দ্বারাও আমি দৃষ্ট হতে চাইনি, অন্ততঃ এভাবে নয়, শুধু একটি মেয়ের দ্বারাই পরিদৃষ্ট হতে চেয়েছি।'

'কে সে মেয়েটি, জানতে পারি?'

'আমার মা।'

'তিনি তো কবে মারা গেছেন!'

'মা-রা কি কখনো মারা যাবার? তাঁরা চিরকাল বেঁচে থাকেন, থাকতে হয় তাঁদের। ছেলেকে দেখাশোনার জন্যেই, বুঝলেন? ছেলের মরণের পরও তাঁকে বাঁচতে হয় ছেলেকে কষ্ট করে পুনর্জন্ম দিতেই আবার। ছেলেকে নিজের গর্ভে ধারণ করতে হবে না? জন্মজন্মান্তরের মায়ের সেই ঋণ কি শোধ হবার কখনো? এ জন্মে না—কোনো জন্মেই নয়।'

॥ উনিশ ॥

মাকে একদিন আমি শুধিয়েছিলাম, 'মা, তুমি কি কখনো ঈশ্বরকে দেখেচ?'

'দূর খ্যাপা! ঈশ্বরকে দেখবি কি! ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?

'যায় না? বাঃ! তবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখতেন কি করে?' আমি বলি—'তিনি কি তাহলে মিথ্যে কথা বলেচেন?'

'না, মিথ্যে বলবেন কেন? তিনি নিজেকেই দেখতেন—নিজের মধ্যে নিজেকে।' মা বললেন—'ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে উনি নিজেই ভগবত্তা লাভ করেছিলেন। সেই যে, কাঁচপোকার কথা ভাবতে ভাবতে আরশোলা একদিন কাঁচপোকা হয়ে যায়—বলতেন না উনি?'

ঈশ্বরপ্রাপ্তি, ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি সব। যদি তিনি ধরা দিতেন না, তাঁর ঐশ্বর্য—বিভূতি ব্যবহার করতেন না কখনো।'

'নিজেকেই নিজে দেখতেন, তুমি বলছ মা, সেটা আবার কী রকম?'

'তুই যেমন আয়নায় নিজেকে দেখতে পাস না? সেই রকম আর কি! আত্মসম্মোহিত অবস্থায় চিত্তের আয়নায় আত্মসাক্ষাৎকার হতো তাঁর।...বুঝেছিস এবার?'

'না তো। কিচ্ছু বুঝলাম না।'

'আমার যদি সম্মোহনবিদ্যা জানা থাকত তাহলে তোকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম এখুনি—মর্ত্য পাতাল তিনলোকে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে আনতাম তোকে...মা দুর্গাকে দেখতে স্বচক্ষেই।'

'হিপ্নটাইজম করে দেখাতে?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সেদিন হিন্দু হোস্টেলের ম্যাজিক খেলায় সেই যাদুকরটা যেমন আকাশ থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা নোট সব বার করে আনছিল দেখিসনি? তোদের সবাইকে হিপ্‌নটাইজ করেই তো। সেই রকম, ধ্যানের সাহায্যে নিজেকে সম্মোহিত করার এক কায়দা আছে—একদিকে মন রেখে একটানা ধ্যান করে যেতে হয়, তার ফলে যা হয় তাকেই বলে সমাধি। উনি সমাধিস্থ অবস্থায় আত্মদর্শন করতেন।'

'তা হলেই আমার ভগবানকে দেখা হয়েছে!' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম 'একটানা ধ্যানে বসব কি, একটুক্ষণের জন্যেও মনকে কোথাও আমি বসাতে পারিনে। ভগবানের কথা ভাবতে গেলেই যত রাজ্যের জিনিস আমার মগজে ভিড় করে আসে। কী করি আমি বল তো? ও ছাড়া কি ভগবানকে দেখবার কোনো শর্টকাট নেই? ইংরেজী মেডইজির মতই?'

'থাকবে না কেন? সব কিছুরই শর্টকাট আছে। বোম্ ভোলানাথ বলে গাঁজায় কষে দম দিলে মুহূর্তের মধ্যে কৈলাসে শিবদুর্গার সান্নিধ্যে গিয়ে পৌছোনো যায়; সাধু—সন্নিসিরা তাই করে থাকেন শুনেছি, অমনি করে ইন্দ্রলোকে অপ্সরাদের নৃত্যগীত দেখেন—শোনেন নাকি! তোর বাবা তো সন্ন্যাসী ছিলেন এক সময়, গাঁজাও খেতেন নাকি, তাঁকেই শুধাগে না!'

'শুধাবার দরকার কি? এখনো তো মাঝে মাঝে খান, আমায় লুকিয়ে। তাঁর খেয়ে রাখবার পর সেই ছিলিমটা নিয়ে একদিন না হয় টেনে দেখব লুকিয়ে—এক টান মাত্তর! দেখি না কী হয়!

'এই মরেছে। তাহলে তোর সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস প্রাপ্তি ঘটে যাবে। সেইখানেই থেকে যাবি—আমার কাছে ফিরে আসতে পারবি না আর। মহেশ্বরের কাছেই থাকতে হবে তারপরে—নন্দীভৃঙ্গির সাকরেদ হয়ে।'

'চাইনে আমার ভগবানকে তাহলে।' আমার সাফ জবাব—'তোমাকে ছেড়ে ভগবানকে চাচ্ছে কে? নন্দীভৃঙ্গির সাকরেদ হবার দায় পড়েছে আমার!'

'বাঁচালি বাপু!' হাসলেন মা—'তোর বাবা সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে গেছলেন, তুইও যদি আবার তাই করিস তা হলেই হয়েছে!'

'কী দুঃখে সন্ন্যাসী হব মা! ভগবানের খোঁজে? ভগবানের ওপর অতখানি টান নেই আমার। কলিগাঁয় গৌরদা রামপদদাদের একটা আড্ডা আছে জানো মা? ভারী তর্কাতর্কি হয় সেখানে সব সময়। ভগবান আছে কি নেই—এই নিয়ে তর্ক যতো। আমি সেখানে বসি গিয়ে এক এক সময়। শুনি সব।'

'তাই নাকি?'

'কলিগাঁয় ফকির সরকারের বাড়ি থেকে বই আনতে যাই না? রামপদদাদের আড্ডাতেও যাই তখন। কলিগাঁয় অতুল গোঁসাই আমাদের ক্লাসফ্রেন্ড—তাদের বাড়িতেই সেই আড্ডাটা। ...গৌরদা কে হয় যেন তাদের। তাদের বাড়িতেই থাকে। আর, রামপদদা হচ্ছেন গৌর গোঁসাইয়ের বন্ধু!'

'তোর চেয়ে বয়সে বড়ো বুঝি?'

'অনেক বড়ো। তিরিশ বত্রিশ বছর বয়েস হবে বোধ হয়। তারা বলে যে, তারা নাস্তিক, ঈশ্বর ধর্ম কিচ্ছু মানে না। ওসব কিচ্ছু নেই নাকি! না মানা তো ভারী খারাপ, না মা?'

'কেন, খারাপ কিসের!' মা একেবারে নির্বিকার—'না মানলে কী হয়? ভগবান রাগ করেন? না,না-হয়ে যান?'

'বয়সে তারা বড়ো হলেও আমি তাদের সঙ্গে তর্ক করতে যাই, কিন্তু পারি না কিছুতেই। তারা বলে, ঈশ্বর আছে যে তার প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ দাও আগে। আমি কি করে প্রমাণ দেব? কিছুই তো জানি না আমি। তুমি বলে দাও না মা আমায়—ঈশ্বরকে কি প্রমাণ করা যায়? প্রমাণ আছে কোনো তার অস্তিত্বের?'

'আছে বই কি। প্রমাণও করা যায় নিশ্চয়।'

'কী প্রমাণ? আমি জানতে চাই—'কী করে প্রমাণ করা যায়—বলে দাও না তুমি আমায়!'

'ঈশ্বরের প্রমাণ বিন্দুমাত্র।' মা জানান—'বিন্দুমাত্রই প্রমাণ!'

'বিন্দুমাত্র প্রমাণ?'

'হ্যাঁ, বিন্দুর যেমন অস্তিত্বই শুধু সার, সেই রকম আর কি! তোর ঐ জ্যামিতি দিয়েই প্রমাণ করে দেওয়া যায় ভগবানকে।' মা বিশদ হন—'পয়েন্ট থেকে ইচ্ছে মতন রেডিয়াস্ নিয়ে সার্কেল টানা যায় না? রেডিয়াস্ মাফিক কোনোটা বড়ো সার্কেল হয়, কোনটা বা ছোট সার্কেল? হয় না? সেই সার্কেলটাই হচ্ছে পয়েন্টের অস্তিত্বের প্রমাণ তখন। তাই না? পয়েন্ট একটা ছিল বলেই তো তার থেকে রেডিয়াসের সাহায্যে সার্কেল টানা গেল? তেমনি আমরাই হচ্ছি ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমরাই তাঁর সার্কেল, নিজগুণে তিনি টেনেছেন আমাদের—তাঁর সেই টান থেকে বেরুনো।'

'ভগবানের সার্কেল আমরা?'

'হ্যাঁ। কারো বা বড়ো সার্কেল কারো বা ছোট সার্কেল। কেউ বা সূর্য হয়েছে, কেউ বা শুধুই যুঁই। কেউ রবিঠাকুর, কেউ বা...কেউ বা তোর ওই রিনি! যার যেমন ব্যাস তার তেমনি বৃত্ত। সেই বিন্দুমাত্র ঈশ্বর আছে বলেই জগদ্ব্যাপী আমাদের অস্তিত্ব। ঈশ্বর আছে বলেই আমরা আছি। আমরা হয়েছি, আমরা হচ্ছি। আমরা হব।'

'তা না হয় হলাম, কিন্তু তাই বলে ঈশ্বরকে তোমার তো জানা যাচ্ছে না মা।'

'জানা যায় না, তবে বোঝা যায়। ঠাকুর যাকে বলতেন বোধে বোধ। সেই ঈশ্বর বোধের থেকে যে জ্ঞানের উদয় তাই হলো গিয়ে তোর বেদ। আর, বেদের সেই বোধোদয় থেকে ব্যাস নিয়ে আমাদের এই জীবনের বৃত্ত রচনাই হচ্ছে গিয়ে মহাভারত। যার মানে কিনা, মহাপ্রকাশ। ঈশ্বরপ্রকাশ। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বৃত্তলাভ। আর আমাদের ঈশ্বরবৃত্তিলাভ।'

'বেদব্যাসের মহাভারত—জানি মা আমি।' সায় দিই মা'র কথায়। 'সেই মহাভারত কী? ঈশ্বরের কথাই তো। তাঁর লীলাকাহিনী। ভগবান ভূতলে নরদেহ নিয়ে নেমেছেন—বিচিত্র দেহরূপে স্নেহরূপে তাঁর সেই রসায়ন। যেমন তাঁর কথা তেমনি আমাদের জীবনকথাও আবার। ঐ মহাভারতই আমাদের জীবনে কোনো না কোনো রূপে কখনো না কখনো ঘটছেই। ঘটবেই।'

'আমাদের জীবনবৃত্তান্তই লিখে গেছেন সেই মহাকবি? কবি বেদব্যাস?'

'আবার একালের তোর ওই রবিঠাকুরও সেই বেদব্যাসেরই আরেক রূপ। আরেক দেহরূপ স্নেহরূপ সেই তাঁরই। তাঁর রচনাও অন্য এক মহাভারত। গীতাঞ্জলি পড়েছিস তো? কী সেটা? ভগবানের কথাই না?'

'হ্যাঁ মা। আবার তোমার রিনিও তাই। তাই না মা? রিনি অবশ্যি ভগবানের কথা কয় না, কিন্তু তাহলেও সেও ঐ ভগবানের কথাই। ভগবানের শেষ কথাই সে, আমার বোধ হয়।'

'যা বলিস! এই জীবনবৃত্তেই মরলোকে নরদেহী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তা ছাড়া ঈশ্বরদর্শনের আর কোনো উপায় নেই। বুঝেছিস?'

'মা'র মোদ্দা কথাটা যা আমার মগজে ঢুকেছিল তা হচ্ছে এই যে, আমাদের জীবনের সব কিছুর কেন্দ্রেই তিনিই মূল। সেই কেন্দ্রমূল থেকে বোধের ব্যাস নিয়ে বৃত্তে এসে তিনি কাত হয়েছেন—'তাঁর মুলাকাত পেতে হলে সেই বৃত্ত পথে—আমাদের প্রবৃত্তি পথেই যেতে হবে—নানা বৃত্তের নানান বৃত্তান্তে পদে পদে তাঁর সাক্ষাৎ পাব। নইলে তিনি মূলে হাবাৎ। কেবল মূলে তাঁর খোঁজ পেতে গেলে তিনিও নেই। আমরাও নাস্তি!

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার...এই জন্যেই বিবেকানন্দ বলে গেছেন, তাই না মা?'

'হ্যাঁ, তাই। ফলেন পরিচীয়তে—বলে না? সবকিছুর প্রমাণ হচ্ছে তার ফলে—ফললাভে। ঈশ্বর কল্পতরু আর কল্পতরুর প্রমাণ তার ফলেই তো মিলবার? তাই না?'

'হাতে হাতেই পাবার তো মা? আম লিচু যেমনটা আমি পাই?'

'নিশ্চয়! নইলে পরিচয়টা হবে কি করে? তাঁকে ডেকে তুই তোর কল্পিত ফল, এমনকি তোর অকল্পিতও যা—যদি তুই কল্পনাতীত ভাবে পেয়ে যাস, তাহলে সেটাই, ঈশ্বর যে আছে তার প্রমাণ হবে—নয় কি? ডেকে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ তুই পাস কি না তবেই তো বিশ্বাস হবে।'

'অবিশ্বাস করে ডাকলেও তো ফল পাবো? তুমি বলেছিলে না মা আমায়?'

ঈশ্বরকে মনে রেখে তোর কর্মবৃত্তির পথে তোকে এগুতে হবে—এগিয়ে যাবি—দেখবি ঈশ্বর হাত ধরে পদে পদে এগুচ্ছেন তোর সঙ্গে—তোর সহযোগিতা করছেন , পদে পদে তাঁর সাহায্য পাবি, হাতে হাতে নগদ, দেখিস। দেখে নিস।'

'ঈশ্বরের সাহায্য পাব সব সময় ?'

'বলছি তো, তবে ঈশ্বরের সহযোগিতা পেতে হলে আমাদের তাঁর বোধের সাহায্য নিয়ে নিজের মনের মত কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে--তবে তিনিও সেই সুযোগে আমাদের সঙ্গে সহকর্মে প্রবৃত্ত হবেন তাহলে—নানান কর্মে প্রবৃত্ত তিনিই তো করছেন আমাদের। আমাদের কর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে তিনিই সারথি।'

'তিনি তো তাহলে শ্রীকৃষ্ণ ? —সারথি যখন তুমি বলছ ? আর আমরা তাহলে ?'

'আমরা পার্থ। পৃথিবীর সন্তান সব।'

'তাহলে তো আমরা কেউ কম নই মা। তাঁর সাহায্যে কুরুক্ষেত্রকান্ড করতে পারি আমরা ?'

'পারিই তো। মনের ঠিক প্রবৃত্তিটা ধরতে পারি যদি। সেই বোধও তিনিই দিয়ে দেন। তাঁর কাছে চাইতে হয়। তাঁর কাছে চেয়ে পেতে হয় সেই বোধ। সেই বোধকে কর্মে রূপায়িত করতে তিনিই আবার সহায়তা করেন। আমাদের যথার্থ প্রবৃত্তির পথেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়—পদে পদে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে।'

'প্রবৃত্তির পথে ? এটা তুমি কী বললে মা ? প্রবৃত্তি তো ভালো নয়, নিবৃত্তিই ভালো—আমাদের যতো ধর্মশাস্ত্রে এই কথাই তো বলে মা ? বলে না ?'

'ধর্মশাস্ত্র পড়েছিস তুই ?'

'তা পড়িনি বটে, আমার সব সেকেন্ডহ্যান্ড নলেজ। এখানে-সেখানে এর ওর তাব

লেখাটেখা পড়ে এই জ্ঞান হয়েছে—তাই থেকেই বলছিলাম—এমন কি তোমার ঠাকুরও তো ওই কথাই....'

'ঠাকুর কক্ষনো অমন কথা বলেননি, বলতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরে মন রেখে নিজের নিজের কাজ করে যেতে বলেছেন—যার যেটা কাজ ; সবাইকে তিনি তার নিজের মতন হতেই বলেছেন—নিবৃত্ত হতে বলেননি কাউকেই। গিরিশ ঘোষকে তিনি অভিনয় করে যেতেই বলেছিলেন—যেটা তাঁর কাজ। এবং তাঁর প্রবৃত্তি বুঝে মদ্যপানেও কোনো দিন বাধা দেননি তাঁর।'

'তাই বটে মা।' মেনে নিতে হয় আমায়।

'কবীরের কথা শুনেছিস ? মুচির কাজ করত কবীর। কিন্তু কবিত্বে আমাদের রবির কাছাকাছি। রবিঠাকুরের যেমন গীতাঞ্জলি, তেমনি কবীরের ওই দোঁহা। প্রবাসীর পাতায় ক্ষিতিমোহন সেনের লেখায় তার পরিচয় পাবি তুই, পড়ে দেখিস। তাঁকে একবার কে যেন বলেছিল, গঙ্গাসাগর তীর্থে চল না ? কবীর বলল, কী হবে গিয়ে। আমার মন যদি ঠিক থাকে তো এখানেই মা গঙ্গা আমার। 'মন যদি চাঙ্গা তো কাঠুরিয়ামে গঙ্গা'.....আমি আমার কাজে লেগে থাকব। গঙ্গা মাঈর যদি খুশি হয় তিনি আমার এই জলের কটোরাতেই এসে দেখা দেবেন। দিয়েছিলেনও তিনি। ....নিজের কর্মবৃত্তির পথেই কবীর পেয়েছিলেন মা'র দেখা।'

'তবে নিবৃত্তির কথাও কোন্ কোন্ মহাপুরুষ যেন বলেছিলেন মা, তাঁদের নাম এখন মনে পড়ছে না।'

'নিবৃত্তির পথে যাওয়া মানে ভগবানের বিরুদ্ধে যাওয়া। তা কি হয় নাকি রে ? না, কেউ পারে তা কখনো। এটাই বোঝ না, ভগবান তো গোড়ায় নিজের মূলকেন্দ্রে চিৎরূপে নিবৃত্ত হয়েই ছিলেন, তাতে কোন সুখ নেই দেখে, কোন আরাম না পেয়েই না এই আনন্দের পথে, রূপের পথে অবারিত হলেন—প্রবৃত্তির পথে গা ভাসিয়ে দিলেন নিজের। তাঁর সেই স্রোতের উলটো দিকে কি যাওয়া যায় ? কেউ পারে তা ? চেষ্টা করলেও তিনি তার ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে দেন যে। প্রবৃত্তির পথে আসতে হয় ফিরে আবার।'

'এখন মনে পড়ছে মা।' আমি উসকে উঠি—'নিবৃত্তির কথাটা বাবার মুখেই আমি শুনেছিলাম যেন।'

'যা, তবে তোর বাবার কাছ থেকেই ভালো করে জেনে আয়গে।'

শুনেই আমি তক্ষুনি এক ছুটে চলে যাই বাবার কাছে, আর পরমুহূর্তে টেনিস বলের মতন বেয়ারিং পোস্টে ফেরত চলে আসি মা'র কোর্টে। 'বাবা বলছেন—সংস্কৃত শ্লোক-টোক কী সব আউড়ে যেন বললেন, যার মানেটা হচ্ছে যে প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম, অর্থাৎ কিনা, ভূতদের এইরকমই প্রবৃত্তি বটে, কিন্তু নিবৃত্তিতেই নাকি রয়েছে মহাফল। ভূত কী মা ?'

'ভূত কী, তা তুই জানিসনে ?'

'আমিই তো, তাই না ? তুমি তো আমায় ভূত বলে ডাকো একেক সময়, হনুমান কথাটা পাও না যখন। আমরাই তো ভূত মা, তাই না ? মারা যাবার পর প্রেত হয়ে যাব।'

'তোকে বলেছে।' হাসলেন মা—'মরবার পর তোকে প্রেত হতে হবে না কখনো—মা

তা হতে দেবেন না। মায়ের পেটে জন্ম নিবি তক্ষুনি আবার।'

'অবশ্যি মা'র যদি, মানে তোমার যদি তাই অভিপ্রেত হয়। সে তো আর আমার ইচ্ছের ওপর নয়।....কিন্তু মহাফলটা কী জিনিস, যা নাকি নিবৃত্ত হলে মেলে?'

'কাঁচকলা।'

'বেলও তো হতে পারে?' আমি বলি—'বাবা যখন বেল খান রোজ রোজ?'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে? তবে সন্ন্যাসী হয়ে ন্যাড়া না হতে পারলে তো আর বেলতলায় যাওয়া যায় না রে! তুই কি তাহলে সন্নিসী হতে চাস?'

'কক্ষনো না। জটাজূট রেখে ছাইভস্ম মেখে কী লাভ? আমি তোমার ওই প্রবৃত্তির পথেই রয়েছি সব সময়।....কিন্তু মা, তোমার ওই প্রবৃত্তির কথাটা বাবাকে যখন বললাম না, শুনেটুনে বাবা কী বললেন জানো মা? বললেন যে, তোর মা'র কথাটা বিলকুল দর্শনবিরুদ্ধ। আমাদের কোনো দর্শনশাস্ত্রে এমন কথা বলে না।'

'দর্শন—টর্শন জানিনে, ষড়দর্শন পড়িনি কখনো। এটা হচ্ছে আমারনিজস্ব দর্শন—আমি নিজে যা দেখেছি, যা দেখছি—তাই।' মা জানান—'এখন বল তো তোর আসল প্রবৃত্তিটা কোন্ দিকে? কোন্‌দিকে তোর মনের ঝোঁক, বল দেখি আমায়?'

'বলব? বলব মা?....' বলতে গিয়ে আমি আমতা আমতা করি, রিনির নামতা আওড়াতে পারি না কিছুতেই—

'বলব মা? আমার ঝোঁক খালি তোমার দিকে, তোমাকেই আমি দেখি তো। তোমাকেই দেখেছি, দেখছি সব সময়।' বলে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার কথাটায় আরো একটুখানি জোর লাগাই: 'এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব দর্শন।'

॥ কুড়ি ॥

ভগবদ্দর্শনের প্রশ্নটা বাবার কাছেও পেড়েছিলাম আমি।

বাবা বলতেন, 'ধ্যানের দ্বারা ধরা যায়। ধ্যাননেত্রেই তিনি প্রত্যক্ষ হন। আর ধ্যানে বসতে হলে? এমনি করে পদ্মাসনে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসতে হবে—একটানা, যতক্ষণ পারো।' বলে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ হতেন।

এদিকে পদ্মাসনে বসাটা তেমন সোজা নয়, বসতে গেলে উল্টে পড়তে হয়। আর উল্টে যদি নাও পড়ি নেহাত, অমন আড়ষ্টভাবে বসে থাকাটাও কষ্টকর। ওর চাইতে কুশাসনে বসাটাও ঢের সুখের। তাছাড়া ঐভাবে বসে ভগবানের ধ্যান করতে গেলে নাকের ডগায় আনব কি, আমার সবটা মনগিয়ে যন্ত্রণাকাতর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সেইখানেই ওতপ্রোত হয়ে। মৈনাকের শিখরদেশ থেকে মনের এই পদস্খলনের গতিরোধ করা যায় না।

মাকে কথাটা বলায় তিনি বললেন—'তোর বাবার যেমন! নাকের ওপর নজর রেখে জড়ভরতের মত ল্যাজেগোবরে হয়ে বসে থেকে কী লাভ? ভগবান কি ঐ নাকের মাথায় রয়েছেন যে দেখা দেবেন? কুশাসন কেন, তুমি আরাম করে কুশানে কি ইজিচেয়ারে বসে ডাকো না, কি বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং—এর ওপর ঠ্যাং তুলে। মন দেওয়া নিয়ে কথা, নাক দেখানো নয়।'

'বেশিক্ষণ ডাকাই যায় না ভগবানকে, ভালও লাগে না ডাকতে।' আমি জানাই। 'তাছাড়া, ঐ নাক নিয়ে মানে, নিজের নাক নিয়ে মাথা ঘামানো আমার একদম ভালো লাগে না।

অতটা উন্নাসিক হওয়া কি ভালো ? কিন্তু তা না হলে তো আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির একেবারেই কোনো আশা নেই দেখছি।'

'ভগবান যেমন বিন্দুমাত্র, ভগবানকে ডাকার প্রয়োজনও তেমনি মুহূর্ত মাত্রই। গোশৃঙ্গে সর্ষপ, মানে গোরুর শিঙের ওপর সর্ষে রাখলে যতক্ষণ থাকে ততটুকুর জন্যই ভগবানে মন দিলে, মন দিয়ে তাঁর মন পেলেই ঢের। তার ফলে যে গতিলাভ হয়, যেদিকে যাবার প্রবৃত্তি হয়, তিনি যেদিকে নিয়ে যান সেইটেই হোলো তোর ভগবদ্‌গতি। খুব সহজ ব্যাপার। এত সহজে আর কিছু হয় না। প্রায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই।'

মা'র মতে, আমার মনে হোলো যে, ঐ নাকই দেখতে হবে বটে, তবে কিনা একটু ঘোরালো পথে। প্রায় ঘুরিয়ে নাক দেখার মতই। বৃত্তির পথে, প্রবৃত্তির পথেই যেতে হবে আমায় ভগবানকে পেতে পেতে। এক সেকেন্ড মাত্র ভগবানকে দিয়ে তার পর থেকে খালি সেকেন্ডহ্যানডে ভগবানকে পাওয়া। সবার সঙ্গে তাঁর সাথে সাথে চলা। যেতে যেতে আদানে-প্রদানে তাঁকেই দিতে দিতে পেতে পেতে যাওয়া।

'বাবা যে বলেছে মা, ভগবানকে পাওয়া নাকি সোজা না। অনেক সাধনার দরকার।' বাবার কথার পুনরাবৃত্তি আমার।

'ভগবান যদি মা হন তাহলে কি তাঁকে সাধ্যসাধনা করতে লাগে ? মাকে তো এমনিতেই পাই-ছেলে হয়ে জন্মানোর সাথে সাথেই। আমরা তো সবাই স্বয়ংসিদ্ধ তো। আজন্ম সিদ্ধি আমাদের। সাধনা যদি করতে হয় তো প্রবৃত্তির সাধনাই করতে হবে-বুঝেছিস ? আমৃত্যু সেই সাধনা, জন্মজন্মান্তরের। তোর প্রবৃত্তি কী, মনের ঝোঁকটা কোন্‌দিকে তোর, সেইটে তুই বার কর আগে।'

মাথা ঘামাতে লাগলাম আমি তারপর। কোন্‌দিকে মনের ঝুঁকি, মনের মধ্যে মাথা ঠুকি। ঠুকে ঠুকে মরি।

মনের ভেতর দিয়েই যদি ভগবানের প্রেরণা মেলে, তাহলে তাঁকে ডাকতে গেলে যেসব দিকে মন খেলে (ভগবান নিজেই খেলিয়ে দেন কিনা কে জানে ?) সেই দিকেই কি মনের ঝোঁক আমার ? বুঝতে হবে তাই ?

কী হতে চাই ? কী করতে চাই আমি ? মাথা খেলাই।

সেদিন ক্লাসে হেড স্যার শুধিয়েছিলেন সবাইকে - কে কী হতে চাই আমরা ?

হেড স্যার কান্তিভূষণ ভট্টাচার্য ইংরেজি পড়াতেন আমাদের। এমন জলের মতন বোঝাতেন, এমন চমৎকার পড়াতেন যে, দৌলতপুর কলেজের প্রিন্সিপাল কামাখ্যাচরণ নাগ মশাই আমাদের ইস্কুলে রেকটর হয়ে যোগ দেবার সময় তাঁর সেরা ছাত্র কান্তিবাবুকে হেডমাস্টার করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে।

একমনে পড়িয়ে যেতেন তিনি, আজেবাজে কথা কইতেন না একদম। সৌম্যদর্শন ছিপছিপে চেহারার গুরুগম্ভীর মানুষ। হঠাৎ সেদিন তিনি পড়ার বাইরে ঐ প্রশ্নটা করে বসলেন কেন যে। কেউ বললে সে ডাক্তার হবে, কেউ বললে যে বিজনেস করবে, কেউ হবে অ্যাডভোকেট—এমন কতোজন কতো কী।

আই ওয়ান্ট টু বি এ প্যাট্রিয়ট। আমায় শুধাতে জবাব দিয়েছিলাম।

আমাদের বাড়িতে অর্ধসাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা আসত—দেশপ্রেমের বান ডাকত সেই কাগজে। প্যাট্রিয়ট—ঐ শক্ত কথাটা সেখান থেকেই শেখা আমার। অবশ্যি,

ফিলানথ্রপিস্ট—কথাটাও ততদিনে জানা হয়ে গেছে ঐ কাগজের কল্যাণেই। হেডস্যারের জবাবে ঐ প্যাট্রিয়টই জিভের গোড়ায় এসে গেল। হেডস্যারের জবাবে ঐ গালভরা কথাটাও আমি আওড়াতে পারতাম, কিন্তু কেন জানি না, ঐ প্যাট্রিয়টই জিভের গোড়ায় এসে গেল। ফিলানথ্রপিস্ট হতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে লাগে, তার আগে বহুৎ কষ্ট করে বড়লোক হতে হয়, তারপরেই না বিশ্বের উপকার করতে বেরুনো ? কিন্তু ঐ প্যাট্রিয়ট হওয়াটা তার চেয়ে ঢের সোজাই যেন ! সারা জীবন দিলে তো কথাই নাই, সোজাসুজি প্রাণটা দিলেও হওয়া যায়।

কিংবা দেশের ভাবনায় ভাবিত ঐ অর্ধ সাপ্তাহিকের গরম গরম সম্পাদকীয় বা সংবাদের পৃষ্ঠা পাঠেই বুঝি আমি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকব। অথবা বাবার বইয়ের ভাঁড়ার থেকে বাগানো যোগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ম্যাজিনি-গ্যারিল্‌ডির জীবনকাহিনীর থেকেও হয়ত প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারি।

কান্তিবাবু আর কোনো ছেলের উচ্চাশা সম্পর্কে বিশেষ উচ্চবাচ্য না করে আমার বিষয়ে কিংবা ওই প্যাট্রিয়টের বিষয়েই বেশ কিছু বলেছিলেন মনে আছে। প্যাট্রিয়ট কাকে বলে; প্যাট্রিয়টিজম কী, কী বা তার দায় ধাক্কা তার যেন একটুখানি আঁচ পেয়েছিলাম তাঁর কথায়।

সেদিন ইস্কুলের ছুটির পর আমাদের ক্লাসের ছেলে সতীশ আমায় পাকড়ালো।

'আয়, এখানে বসি একটু। কথা আছে তোর সঙ্গে।'

ড্রিলের মাঠটায় আমরা বসলাম।

'প্যাট্রিয়ট হতে চাস বলছিলিস না তুই ? তাই ভাবলাম, তোকে তো আমাদের দলে নেওয়া যায় তাহলে।' চাপা গলায় বলল ও।

'তোদের দল ! ক্রিকেট ফুটবলের টীম যদি হয়...' আমার সাফ কথা—'না ভাই, তার মধ্যে আমি নেই। ঐ সব খেলাধূলায় হাত পা ভাঙতে পারব না আমি। ওসব আসেও না আমার, ভালোও লাগে না। তবে হ্যাঁ, যদি টেনিস কি ব্যাডমিনটন হয়...'

'আরে না না, সেসব কিছু নয়। তার ভেতরে প্যাট্রিয়টিজমের কী আছে ? একেবারে অন্য জিনিস। আনকোরা আরেক ব্যাপার।'

'ব্যাপারটা কী শুনি ?'

'তুই আমাদের বিপ্লবীদের দলে আসবি ?'

'বিপ্লবীদের দল ? সে আবার কী রে ?'

'কেন, জানিসনে ? ক্ষুদিরাম কানাইলালের কথা শুনিসনি নাকি ? ফাঁসি হয়ে গেছে যাদের ?'

'দেশোদ্ধারের দল ? জানি বইকি। আছে একটা দল ওরকম। খবরের কাগজ পড়লেই জানা যায়। খবর বেরয় বটে মাঝে মাঝে।'

'আসবি তুই সেই দলে ? খুব গোপন কিন্তু। বলবিনে যেন কাউকে।'

'কী করতে হবে আমায় ?'

'তোর কথা আমাদের লীডার বলছিল একদিন। দলে তোকে পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে. ..তোর মতন একটা ছেলেকে আমাদের দরকার খুব !'

'লীডারটা কে শুনি ?'

'তা বলব না। তা তুই জানতে চাসনে। জানতে পাবি না কোনোদিন। আমাদের দলে

কে কে আছে তাও না। তুই শুধু আমাকেই জানবি, আমি তোকে রিক্রুট করলাম তো ? লীডারের অর্ডার আমার মারফতেই পাবি তুই। সেই মতন তোকে কাজ করে যেতে হবে।'

আমি ভেবে দেখি ওর কথাটা। 'অভিরামের দ্বীপান্তর মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি। বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' মনে পড়ে মুকুন্দদাসের যাত্রার পালা গানও। 'জাগো জাগো জননি', 'আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান—সাবধান সাবধান !' মনে পড়ল কত কথাই।

'কাজটা কী করতে হবে শুনি আমায় ?'

'সেন্টার থেকে চিঠি আসবে লীডারের—আসবে তোর নামে—দলের আরো বড় লীডারের চিঠি। সেসব চিঠি খুব দরকারী, কিন্তু তার ভারী রিস্ক। আমাদের হোস্টেলের ছেলেদের চিঠিপত্র সব পুলিসে খুলে দ্যাখে কি না! ডাকঘরেই দেখে নেয় টিকটিকিরা। তোর নামে, তোর একটা দলীয় নাম দেব আমরা, সেই নামে যেসব চিঠিপত্র, পার্শেল-টার্শেল আসবে, একদম তুই না খুলে সেসব তুলে দিবি আমার হাতে। আমি গিয়ে লীডারকে দেব। আপাতত এই কাজ।'

'তারপর ?'

'তারপর, পরে তোকে যা করতে বলা হবে, করতে হবে। ইতস্ততঃ করা চলবে না। কিন্তু সে পরের কথা পরে, এখন...'

'আমার চিঠিপত্র খুলবে না পুলিস ?'

'তোর বাবার কেয়ার অফ-এ আসবে তো ? সন্দেহ করবে না পুলিস। তোর বাবা বয়স্ক লোক, গণ্যমান্য মানুষ—তিনি কি আর এইসব বিপ্লবী দলে থাকতে পারেন—ভাববে তারা। বুঝেছিস এখন ? কেমন, রাজী তো !' কথাটায় কি রকম রোমাঞ্চ বোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যাই। প্যাট্রিয়ট হবার বাসনা প্রকাশের সাথে সাথেই প্যাট্রিয়টের মত কাজ করার এই সুযোগ। সৌভাগ্য বলেই মনে হয় আমার।

দুদিন বাদে সতীশ এসে বলল, 'তোর নাম দেওয়া হয়েছে সুরেন। দলীয় নাম।'

'আরে ! সুরেন যে আমার মামার নাম রে ! সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।'

'ভালোই হলো আরো। ঐ নামই রইলো তোর তাহলে।' বলে চলে গেল সতীশ।

আমিও ভাবলাম, মন্দ কি ! নরাণাং মাতুলক্রম বলে নাকি, আমার যদি নামের দিক দিয়েই সেই উপক্রম হয় তো ধারাবাহিকতাই বজায় থাকে তার।

দিনকতক বাদে একটা চিঠি এল মামার নামে—খামের চিঠি—বাবার কেয়ার অফে, ইস্কুল থেকে ফিরে জানলাম মা'র কাছে।

মা বললেন, 'এ কী চিঠি এসেছে রে সুরেনের নামে, দ্যাখ দেখি। এক বর্ণও বোঝা গেল না তার।'

'খুললে কেন চিঠিটা ? খুলতে গেলে কেন ? মামার চিঠি, দেখছ না ?'

'সুরেন তো রাজাপুরেই এখন, তার বাড়িতেই। কোনার ঠিকানায় না লিখে এখানে আবার তাকে লিখলো কে, কলকাতার থেকে খুদিদি, তোর বড় মাসীই হয়তো লিখে থাকবে, মনে করেছে সে এখেনেই আছে এখনো—তাই ভেবেই, খবরটা কী, আমি খুলে দেখতে গেছি!... কিন্তু দেখছি, এ তো একটা আঁক। কী আঁক কে জানে ?'

ইকোয়েশনের আঁক বলে ঠাওর হচ্ছে। তার সঙ্গে ফ্রাকশন ট্রাকশন ডেসিমেল সিঁড়ি ভাঙা সব মিশিয়ে বিদঘুটে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড!'

'এ আঁক তুই জানিসনে?'

'কোনো জন্মে না। কাবিল হোসেন জানে। কিন্তু তাকে তো এই চিঠি দেখানো যাবে না। যার চিঠি তার হাতে দিতে হবে।'

'কার চিঠি শুনি?'

'সে একজনের। শুনলে তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না।' বলে চিঠিখানা হাতিয়েই আমি সরে পড়ি।

সতীশকে চিঠিখানা দিই গিয়ে। খাম খোলা দেখেই সে খাপখোলা তরোয়ালের মতই ঝলকে উঠেছে: 'খুলেছিস কেন?'

'আমি খুলেছি নাকি? মামার চিঠি মনে করে—মামাকে লেখা মাসির চিঠি তাই ভেবে না খুলে দেখেছে মা। দেখেও বুঝতে পারেনি কিচ্ছু। যা বিচ্ছিরি আঁক একখানা—তার ভেতর নাক গলায় সাধ্য কার।' এক সাথে আমি মা'র আমার সাফাই গাই—'মনে হচ্ছে মা আমার মতই অঙ্কে দিগ্‌গজ। আমারই মা তো!'

'মোটেই তোমার আঁক নয়, সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। লীডার বুঝবে।' এই না বলে সে দ্বিরুক্তি না করে চিঠিখানা নিয়ে চলে যায়। কোথায় যায় কে জানে!'

রাত্রে তাদের হোস্টেলে গেলে সে জানায়—'লীডার ভারী রাগ করেছে। এরপর থেকে ইস্কুলে যাবার পথে রোজ তুই পোস্ট আপিস হয়ে যাবি। জানবি তোর মামার নামে চিঠিপত্তর পার্শেল-টার্শেল টাকাকড়ি মনিঅর্ডার-টর্ডার এসেছে কিনা। এলে 'ফর' দিয়ে সই করে নিয়ে সোজা চলে আসবি ইস্কুলে।'

'মনিঅর্ডার টাকাকড়িও আসবে নাকি আবার?' শুনে আমার উৎসাহ হয়।

'এলেই বা! তাতে তোর আমার উৎসাহিত হবার কিছু নেই। বেল পাকলে কাকের কী। পার্টির টাকা—দলনেতাকে গিয়ে দিয়ে দিতে হবে তক্ষুনি!'

সতীশের কণ্ঠস্বর পৃথিবীর মতই উত্তর-দক্ষিণে চাপা হয়ে আসে তারপর—'এমন কি পিস্তল-টিস্তলও আসতে পারে ঐ পার্শেলে। সেই খবর দিয়েছে ওই চিঠিতে।'

'পিস্তল!' শুনেই আমি চমকে উঠেছি। —'পিস্তল-টিস্তল কেন রে!'

'আমাদের টার্গেট প্র্যাকটিশের জন্যই, আবার কী রে? স্বদেশী ডাকাতি করতে হবে না? টাকার যোগাড় হবে কোত্থেকে? কলিগাঁয় ফকির সরকারের বাড়ি করব ডাকাতি। ওরা ভারী মহাজন, অনেক টাকা ওদের।'

'না না। ওর বাড়ি না। কিছুতেই নয়, ওই ভদ্রলোক দারুণ ভালো। বইটই পড়তে দেয় আমায়—ওর বাড়ি ডাকাতি-টাকাতি নয়।'

'ঘাবড়াচ্ছিস? হয়তো তোদের বাড়িও করতে হতে পারে আমাদের। তখন তোকেও লাগতে হবে—থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে। কালি-ঝুল মেখে মুখোশ পরে থাকবি, বাড়ির কেউ চিনতে পারবে না তোকে।...তোদেরও অনেক টাকা আছে, তাই না?'

'কাঁচকলা পাবি আমাদের বাড়ি। বাবার যা কিছু আছে সব কোম্পানীর কাগজে জমা রাখা। কাগজ ক'খানা পাবি কেবল। তবে হ্যাঁ, মা'র গয়নাগুলো নিতে পারিস। চাইলে মা হয়ত নিজের থেকেই দিয়ে দিতে পারে দেশের কাজে। কেড়ে নিতে হবে না।'

টাকা নেই তো চলে কি করে তোদের ? শুনি ? তোর বাবা তো কোনো চাকরি-বাকরি করেন না।'

'রাজ এস্টেট থেকে মাসোহারা আসে না বাবার ? মাস মাস আসে টাকা। তাতেই আমাদের চলে যায়। তার থেকেও বাবা জমায় আবার। কোথায় রাখে আমার জানা আছে। মাঝে মাঝে বাবার অজান্তে সেখান থেকেও হাত সাফাই করি—ধরতে পারে না বাবা। খেয়ালই করে না বোধ হয়।'

'যাক গে, তুই যখন পার্টির, তোদের বাড়ি ডাকাতি হবে না নিশ্চয়। তার আগে তো টার্গেট প্র্যাকটিশ করে হাত-টাত পাকাতে হবে আমাদের।'

'হাত পাকাবি কোথায় ?'

'কেন, সিঙ্গিয়ার আমবাগানে। হাজার হাজার গাছের আওতায় নিশ্চিন্তে প্র্যাকটিশ করা যাবে। নির্জন জায়গা, কেউ বড় একটা সেঁধোয় না ওর ভেতর—গুলিটুলির আওয়াজ কারো কানে যাবে না।'

'যেখানে আম পাকে সেখানেই হাত পাকাবি ? তাহলে ভাই আমের সময়টাতেই পাকানো যাবে না-হয়। পাকা আমের দিকে তাক করে লাগালে দু-একটা আম গালে এসে পড়তেও পারে, চাই কি !'

'সেই সুখেই থাক !' আমার কথাটা সে এক কথায় উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু এক কথায় পাকা আমের অত বড়ো বাগান ওড়ানো যায় না—আমি আবার তাকে বাগাতে লাগি : 'ওইসব ফলন্ত আম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে লোভ সামলাতে পারবি তুই? তোর হাতের তাক তো আমি জানি। শুধু ঢিলিয়েই তুই ফজলি আম নামিয়ে আনিস। পিস্তলের নিশানা না জানি তোর আরো কতো জোর হবে ! আর সিঙ্গিয়ার বাগানে কী সব আম রে ভাই !' আমের ভার আর তার হাতের তারিফ একবাক্যে করে আমি ওর আমড়াগাছি করি।

সে কিন্তু টলে না একদম। বলে যে, হ্যাঁ, সেইজন্যেই আনা হচ্ছে কিনা পিস্তল ! আম পাড়বার জন্যে আনছি কিনা আমরা।' সে বলেঃ 'বিলেতে যে একটা জোর লড়াই বেধেছে খবর রাখিস তার ? ইংরেজ জার্মানীর যুদ্ধু হচ্ছে জানিসনে ?'

'জানব না কেন ? আসে তো খবর কাগজ আমাদের বাড়ি। হিতবাদী, অমৃতবাজার দু-ই আসে। সব খবর পাই আমরা। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কী ! কোথায় বিলেত আর কোথায় আমরা। কার সঙ্গে কার লড়াই আর আমরা কোন্‌খানে !'

'কী বোকা রে !' তার চোখে কৃপাকটাক্ষ। 'আরে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের এই তো মোকা রে। ইংরেজ জার্মানীর সঙ্গে লড়ায়ে বিব্রত—এই সুযোগে আমরাও তৈরি হবো এদিকে।

রণক্ষেত্রের সৈনিক না আমরা ? আমাদের অ্যানার্কিস্ট পার্টি ভারতজোড়া, জানিসনে ?'

'শুনেছি এক-আধটু। পড়েওছি খবর কাগজে।'

'এ সব কথা থাক এখন। ক'দিন বাদে পিস্তলের পার্শেলটা আসবে। ক'টা পিস্তল আ[illegible] কে জানে। ইস্কুলে আসার পথে রোজ খবর নিবি পোস্টাপিসে—এলেই ডেলিভারি নিবি। আর নিয়েই না, সোজা চলে আসবি ইস্কুলে। ইস্কুল পালিয়ে তারপর প্রতিদিন দুপুরে আমাদের পিস্তলের মহড়া শুরু হবে ওই বাগানে—সেদিন থেকেই। বুঝেছিস ?'

'পিস্তল নিয়ে লড়তে হবে বলছিস ? কিন্তু লড়বি কার সঙ্গে শুনি ? তাহলে তো সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হয় আমাদের, ওই বিলেতেই।'

'কেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়ব আমরা। এখানেই লড়াই করব। সারা ভারতই আমাদের রণক্ষেত্র। সর্বদাই আমাদের সংগ্রাম।'

'এখানে ইংরেজ কোথায় রে, এই গাঁয় ?' আমি শুধাই—'এই অজ পাড়াগাঁয় কই তোর ইংরেজ ?'

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নেই ? পুলিস সাহেব নেই জেলার ? সেখানে গিয়ে মেরে আসতে হবে তাদের। লীডারের হুকুম হলেই যেতে হবে আমাদের।'

'না ভাই, ওসব খুনোখুনি কাণ্ড আমার ভালো লাগে না।' আমার আপত্তি : 'পুলিস-সুপারকে প্রাণে মারলে মেম-সুপারির প্রাণে লাগবে না ? কাঁদবে না তাঁর ছেলে-সুপাররা ? মেয়ে-সুপারিরা ? না... মানুষ মারবে কেন মানুষকে ? মারবার জন্যে তো মানুষরা হয়নি। ভালোবাসাবাসির জন্যেই হয়েছে।'

'সব মানুষকে কি ভালোবাসা যায় ? ওরা আমাদের ছেলেদের ধরে ধরে গুলি করে মারছে না ! লটকে দিচ্ছে না ফাঁসিতে ? তুই বল ?'

'হ্যাঁ, সব মানুষকে ভালোবাসা যায় না, তা ঠিক।' মানতে হয় আমায়—'তবে মানুষের মধ্যে যারা রূপসী মানুষ তাদের ভালো না বেসে পারা যায় না। সেইসব মানুষের ভালোবাসার জন্যে আমরা সব সময় উপোসী। তাদের রূপের উপাসনা করি আমরা।'

'তোর ওই সব রূপসী মানুষ উপোসী মানুষের ফাতরা কথা যতো রাখ তো। দেশের স্বাধীনতা তুই চাস কি চাস না ?'

'নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ওইসব খুনখারাপি না করে...না ভাই, কাউকে খুন করতে আমি পারব না। ওতে আমার একদম প্রবৃত্তি হয় না।'

'কিসে তোমার প্রবৃত্তি শুনি ?'

প্রবৃত্তির প্রশ্নটা খট করে আমার মগজে এসে লাগে। মা'র কথাটা মনে পড়ে যায়...প্রবৃত্তির পথেই ভগবদ্‌গতি...আমাদের গতি ভগবানের দিকে, ভগবানের গতি আমাদের দিকে। উভয়ের গতিমুক্তি এক পথে—একসঙ্গে। একাধারে—এক ধারায়। ধারাবাহিক।

'কিসে আমার প্রবৃত্তি বলব ? আয়, আমরা হাতে-লেখা একখানা পত্রিকা বার করি। মাসিক কি ত্রৈমাসিক। আমার মতে সেই ভালো হবে তার চেয়ে। মাস মাস কি তিন মাস অন্তর বেরুবে কাগজটা। তাতে গল্প উপন্যাস কবিতা সব থাকবে। তুই লিখবি, আমি লিখব, হোস্টেলের আরো সব ছেলেরা লিখবে—বিষ্টু-টিষ্টু সব্বাই। ইস্কুলের লিথো মেশিনটা নিয়ে লিথো করেও বার করতে পারা যায়। কাগজটার নাম রাখা হবে অঞ্জলি। দেবী ভারতীর পায়ে অঞ্জলি আমাদের।'

'তোর মাথা। দেশের স্বাধীনতা আগে, না, ওইসব তোর ছাতামাথা ? দেশ স্বাধীন হোক না। সাহিত্যচর্চার ঢের সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু ইংরেজ এখন জীবন-সঙ্কট লড়ায়ে বিব্রত, তাকে খতম করার এমন সুযোগ আর মিলবে না। জার্মানরা ওদিকে হারাবে তাদের, আমরা এদিক থেকে তাড়াব।'

তার কথাটাও নেহাত ফেলনা নয়, ভেবে দেখি। ভেবে দেখতে হয়।

'ভাবছিস কী ? আমরা সবাই রণক্ষেত্রের সৈনিক এখন। লড়তে হবে এ সময়—লড়তে হবে, মরতে হবে, মারতে হবে। প্রাণ দিতে হবে, প্রাণ নিতে হবে—বুঝেছিস !'

'হ্যাঁ, প্রাণ দিতে হবে প্রাণ নিতে হবে-প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার কথাই বটে। ভেবে দেখি, কথাটা রিনির ক্ষেত্রেও যেমন, রণক্ষেত্রেও তাই।

॥ একুশ ॥

অবশেষে একদিন পার্শেলটা এল।

স্কুলের পথে পোস্টাপিসে খবর পেয়েই মামার নামের 'ফর' দিয়ে ফরফরিয়ে আমার সই করে সেটার ডেলিভারি নিয়েছি।

সটান চলে গেছি ইস্কুলে-সিঙ্গিয়ার আমবাগানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে।

বাংলার সার সীতানাথবাবু ততক্ষণে এসে গেছেন ক্লাসে।

পার্শেলটা দেখেই না লাফিয়ে উঠেছে সতীশ। অবশ্যি, বসে বসেই যতটা লাফানো যায়—সারের নজর বাঁচিয়ে।

'কী আছে রে ওতে ?' জানতে চেয়ে ফিসফিসিয়েছে পাশের ছেলেটি।

'ডিক্সনারি।' ফাঁস করেছি আমি। 'দেখবি নাকি ? দেখতে চাস ? খুলব ?'

শুনেই সে আর দ্বিরুক্তি করেনি, দ্বিতীয় বার তাকায়নি সেদিকে—নাড়ানাড়ি করা দূরে থাক।

খানিক বাদে বলেছে, 'বিয়ের আগে কোনো নারীঘটিত ব্যাপারে থাকতে নেই ভাই ! বি এ পাশ করার আগে কি কেউ ডিক্সনারি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে ?'

'নারী আর ডিক্সনারির মধ্যে মিলটা কোনখানে ?' আমি জানতে চেয়েছিলাম।

'নাড়ির সম্বন্ধ নেই ?' তার পাল্টা জিজ্ঞাসা।

আমাদের ভেতরে সে একটু পরিপক্ক বলতে হয়, কেননা তার পুরুষ্টু গোঁফ বেরিয়েছিল, বিয়ে হয়েছিল দিন কতক আগে। (তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ে বাল্যবিবাহ চালু ছিল বেশ) হয়ত সেই কারণেই ডিক্সনারি নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা সে পছন্দ করেনি।

আমি আর সতীশ আর কথা না বাড়িয়ে পিরিয়ড শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

তারপরে পিরিয়ড কাবার হতেই স্কুল পালিয়ে সতীশ আর আমি চলে গেছি আমবাগানে পিস্তলের তাক বাগাতে।

ছায়াচ্ছন্ন নিরালা এলাকায় খোলা হল পার্শেল।

তিনটে পিস্তল এবং আরো কতকগুলো কী যে দেখা গেল তার ভেতরে।

'তিনটে কেন রে ?' শুধালাম আমি সতীশকে।

'এর একটা তোর, একটা আমার। তৃতীয়টা কার জন্যে কে জানে ?'

'কেন, তুই জানিসনে ?'

'লীডার জানে। বলেনি সে আমায়। আমিও জানতে চাইনি। সেরকম চেষ্টা করাও অন্যায়। শুধু জানিয়েছিল যে তিনটে আসবে মোটমাট।'

'আর এগুলো সব কি রে ?'

'কার্তুজ। আমাদের টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে।'

'এত কার্তুজ ?'

'লাগবে না ? সহজে কি কারো নিশানা দুরস্ত হয় নাকি ? অবশ্যি প্র্যাকটিসের পরেও বেঁচে যাবে এর অনেক। পরে সেগুলো কাজে লাগাব আমাদের। আমাদের কিংবা আমাদের দলের।'

'সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি প্র্যাকটিস করতে আসবে না ?'

'তার হাত দুরস্ত আছে—আগের থেকেই। তাছাড়া সে যে কে তাও আমি জানিনা। লীডার আমায় জানাননি। টের পাবো সেই অ্যাকশনের দিন। কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পেলেও হয়ত তাকে দেখতে পাব না।' মনে হোলো বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন সে চাপল।

'তিন তিনটে ঝকঝকে পিস্তল ! বেশ দেখতে কিন্তু।' আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি।

তাকিয়ে দেখার পর তাক করে দেখতে লাগি তারপর।

হাত তৈরি হবার পর সতীশ একদিন এসে জানাল—'এই শোন ! আমাদের কষ্ট করে সদরেও যেতে হবে না আর। ম্যাজিস্ট্রেট কি পুলিস সাহেবকে জেলায় গিয়ে মারতে হবে না। এখানেই আসছেন তাঁরা ক'দিন বাদে আর।

'তাই নাকি ?' আমি জানতে চাই—'কেন আসছে রে ?'

'দুজন না হলেও ওদের একজন তো আসবেই নির্ঘাত। খবর পেয়েছে আমাদের লীডার।

'ইস্কুল ভিজিট করতে বুঝি ?'

'তা নয়। মীটিং করতে এখানে। বিলেতে যুদ্ধ বেধেছে না ? বাংলাদেশে বেঙ্গল রেজিমেন্ট তৈরি হচ্ছে সেইজন্যে। তার সোলজার রিক্রুট করতেই তাঁরা আসছেন। ইস্কুলের ছেলেদের কি এখানকার যুবকদের কেউ সেই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চায় যদি।'

'বেঙ্গল রেজিমেন্ট ? হ্যাঁ, দেখেছি বটে কাগজে। স্কুল-কলেজের অনেক ছেলে সৈন্যদলে নাম দিয়েছে তাও জানি।'

'এখন, আমাদের প্ল্যানটা কিরকম হবে শোন্। সভাটা হবে স্কুলের মাঝখানে ড্রিল মাঠে সামিয়ানা খাটিয়ে—যেমনটা হয়ে থাকে ফি বছর প্রাইজ বিতরণ উৎসবের সময়। তবে এবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিস সাহেব আসছেন না ? তাই এবার আরো জমকালো হবে সভাটা।'

'তা তো হবেই। সে আর বলতে হয় না।'

'যেমন হয়ে থাকে, সভার একধারে হবে ডায়াস—সেখানে চেয়ার সাজিয়ে বসবেন ঐ সাহেবরা, গাঁয়ের গণ্য ন্য যতো লোক, রেকটার, হেডস্যার আর মাস্টার মশায়রা, এমনি আমার আন্দাজ। আর তার সামনে সারি সারি পাতা বেঞ্চে বসব শুধু আমরা যত ছাত্ররা।'

'ফি বছর বসে যেমন।' তার আন্দাজে আমার ঢিল ছোঁড়া।

'তুই বসবি গিয়ে একেবারে সামনের সারিতে, বুঝেছিস ; পকেটে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে। আর আমি বসব ঠিক তোর পেছনে—কয়েক সারি পিছনে—আমার পকেটেও থাকবে পিস্তল।'

'তোর পিস্তল কিসের জন্যে রে ! তুই কাকে মারবি আবার ?' আমি ভেবে পাই না 'ও বুঝেছি। পাছে আমার হাত কাঁপে, তাক ফসকে যায় যদি--তাকে শেষ করার জন্যেই বুঝি তুই...? মানে, আমার লক্ষ্য তেমন ঠিক হয়নি এখনও তোর ধারণা ?'

'না, না, সেজন্যে নয়।' সে বলে : 'তাক কেন ফসকাবে তোর ? তোর নিশানা অব্যর্থ ! আমি দেখেছি। না, সেজন্যে নয়...'

'তবে কিসের জন্যে ? তোর পিস্তল আবার কেন তাহলে ?'

'তোর জন্যেই রে।' বলে সে একটুখানি হাসে।

তার হাসিটা আমার তেমন ভালো লাগে না। হেঁয়ালীর মতই লাগে কেমন। 'আমার জন্যে তার মানে ? আমার পিস্তল তো রয়েছেই, তার ওপরে আবার কেন ? আমারটা যদি কোন কারণে জ্যাম হয়ে যায়, যথা সময়ে গুলি না বেরয় যদি ?'

'তোর পিস্তলটা যেমন তোর জন্যে, আবার ওই সাহেবটার জন্যেও যেমন, আমার পিস্তলটাও সেই রকম আমার জন্যেও-ফের আবার তোর জন্যেও তেমনি।'

'আমার জন্যও তেমনি ? তার মানে ?'

'তা আমি বলব না। মানা আছে বলবার।' বলে সে একটুখানি ঢোঁক গেলে--'সব কথা কি সবাইকে সব সময় বলা যায় ?'

'আমি কি সবাইকার মধ্যে হলুম ? আমি তোর বন্ধু না ?' ফোঁস করে উঠি : 'এক পার্টির ছেলে না আমরা ?'

'বলতে পারি। গোপনে। কাউকে বলবি না বল ?'

'বলব কেন ? এসব কথা কি বলাবলির ?'

'যক্ষুনি তুই পুলিস সাহেবকে গুলি করবি, আর সে পড়ে যাবে-সেই মুহূর্তেই তোকে গুলি করতে হবে আমায়! বুঝেছিস ? লীডারের এই হুকুম।'

'আমাকে মেরে ফেলবি! তুই!' তার পিস্তলের তাক হবার আগেই যেন আমার তাক লেগে যায়।

'আমি না মারলেও তোকে তো মরতেই হবে—তা কি তুই জানিসনে ? গুলি করার পরই তো ধরা পড়ে যাবি। —পুলিসের হাতে ধরা পড়বি তুই। চেনা ছেলে, সবাই তোকে চেনে, পালাবি কোথায় ? আর ধরা পড়লেই তোর ফাঁসি হবে। হবে না ?'

'তা হবে। তা হবে বটে।' আমতা আমতা করে মানতেই হয় আমায়। 'কিন্তু তাই বলে ফাঁসি যাবার আগেই...এই ভাবে মারাটা...মারা যাওয়াটা...' আমার কথা আটকে যায়। গলার কাছে দলা পাকিয়ে কি একটা যেন ঠেলে উঠতে থাকে। কান্নাই নাকি ?

'সেই তোকে মরতেই হবে। সেই মরবি কিন্তু পুলিসের হাতে অনেক মারধোর খেয়ে, অনেককে মেরে তার পরে মরবি—তার চেয়ে আগেই খতম হয়ে যাওয়াটা কি ভালো নয় ? তোর পক্ষেও ভালো, দলের পক্ষেও।'

'দলের কাকে আমি মারতে যাচ্ছিলাম! কাউকেই তো চিনি না আমার দলের।'

'ধরা পড়বার পর থানায় নিয়ে পুলিস যা বেধড়ক মার লাগাত না, পুলিসের সেই পিটুনির বহর তো জানিসনে...জানলে তুই ঢের আগেই মরতে চাইতিস—নিজেকেই নিজে গুলি করে মরতিস। কিন্তু তখন আর সে উপায় নেই তোর। লেট হয়ে গেছে।'

'খুব মারে বুঝি পুলিস ? থানায় নিয়ে গিয়ে খুব কষে ঠ্যাঙায় ?'

'মারে না ? নখের মধ্যে পিন ফুটিয়ে দেয়, কম্বলে মুড়ে রামধোলাই লাগায়, ঠ্যাং বেঁধে কড়িকাঠে লটকে ঝুলিয়ে রাখে...'

'এই উলটো ফাঁসিটা কেন ? আগের থেকে আসল ফাঁসির মহড়া দিয়ে রাখতেই নাকি ?'

'কষে চাবকাবার জন্য, আবার কেন ? তারও পরে আরো আছে...ন্যাংটো করে বরফের চাপড়ার ওপরে শুইয়ে রাখে...'

'ন্যাংটো করে ? না না, ন্যাংটো হতে আমার ভালো লাগে না একদম।'

'প্রবল আপত্তি আমার—'খালি গা হতে লজ্জা করে ভারী।'

'তোর আপত্তি তারা শুনছে কি না! কারো লজ্জাফজ্জার ধার ধারে কি না তারা!'

'সতীশ বেআবরু করে। 'কেন, খালি গা হতে লজ্জাটা কিসের তোর? আমরা তো হোসটেলের ছেলেরা কেউ কেউ ফুটবল খেলার শেষে সন্ধ্যেবেলায় এসে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি গিয়ে—পাড়ের ওপর প্যান্ট-শার্ট সব খুলে রেখে—খালি গায়ে সাঁতার কাটি কেমন—আমাদের কই লজ্জা করে না তো।'

'আহা, তোর মতন শরীর হত যদি—দেখাবার মত অমন—আমারও খালি গা হতে লজ্জা করত না তাহলে, ইচ্ছেই করত বরং। কিন্তু দেখছিস তো এই প্যাঁকাটির মতন চেহারা, হাড় বার করা জিরজিরে এই শরীর নিয়ে কেউ কি কারো সামনে খালি গা হতে চায়?'

'সে আমি জানি না ভাই, তবে শোয়াবেই ওরা বরফের চ্যাঙাড়ে। এবং একেবারে দিগম্বর করে- কিছুতেই ছাড়বে না। যার যা দস্তুর। বরফের ওপর শুতে কেমন লাগে জানিস?'

'খেতে তো ভালোই জিনিসটা, শুতে কেমন কে জানে! কখনো তো শুয়ে দেখিনি।'

'দেখতে পাবি বেঁচে থাকলে। টের পাবি হাতে হাতে তখন। দেখতে চাস নাকি?'

'না, কিন্তু শোয়াতে যাবে কেন তারা? তাতে লাভ তাদের? তারা তো সোজাসুজি নিয়ে আমায় ফাঁসিতে লটকে দিলেই পারে। শেষমেস তাই যখন লটকাবে, লটকাবেই, ছাড়বে না, তখন তার আগে মড়ার ওপর এত খাঁড়ার ঘা মারাটা কিসের তবে?'

'কনফেসন আদায় করতে তোর। তোর দলে আর কে কে আছে তাই জানবার জন্যেই...'

'দলের কাউকেও তো আমি জানি না ভাই! কী জানাব? কার নাম করবো?'

'আমাকে তো জানিস। যন্ত্রণার চোটে আমার নামটা বলে দিবি নিশ্চয়। না বলে পারবি না। পার পাবি না। তখন তারা আমাকে পাকড়ে নিয়ে গিয়ে ওই সব কান্ডই করবে আবার। মারের চোটে আমিও বলতে বাধ্য হব তখন—যার নাম জানি তার। এই করে করে শেষ পর্যন্ত গোটা দলটাই ধরা পড়ে যাবে আমাদের। সেই কারণেই তোকে এই অঙ্কুরেই বিনাশ করা।'

শুনে আমি গুম হয়ে যাই। অঙ্কুরিত বিনাশের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হবার কোনো উৎসাহ পাই না।

সে কিন্তু গুমরে ওঠে তার পরেই—'পার্শেলের মধ্যে মোট তিনটে পিস্তল ছিল, মনে নেই তোর?'

'হ্যাঁ, ছিল তো। বেশ মনে আছে।'

'তার মানেটা কী জানিস?' বলে সে একটুখানি থামে—'অকালে মরার জন্যে মন খারাপ করছে তোর? মনে কোনো দুঃখ রাখিসনে। কিচ্ছু ভাবিসনে। আমিও তোর সহযাত্রী ধরে নে না! তোর পরে আমিও হয়ত এই পৃথিবীতে আর থাকব না। ওই তৃতীয় পিস্তলটি, মনে হচ্ছে আমার জন্যেই হয়ত।'

'তোর জন্যে? তার মানে?' অন্য আরেক ধাঁধার সামনে আমি বাধা পাই আবার।

'মানে, সেদিন হয়ত কে জানে, সেখানেই আর কেউ অমনি বসে থাকবে আমার পেছনে—আমাকে মারবার জন্যে তাক্ করে! সঙ্গে সঙ্গে সাফ করে দিতে আমায়। কেউ বলতে পারে?'

'তোদের লীডার না কি? না অন্য কেউ?'

'কী জানি কে! আমি কী জানি?'

'নিজের মধ্যে এই খুনোখুনি? না ভাই, ব্যাপারটা আমার একেবারেই ভালো লাগছে না। যাই বল তুই।'

'ভালো লাগালাগির কথা নয় তো, দলের কানুন। যে বিয়ের যা মন্তর বলে না? তাই।'

॥ বাইশ ॥

অমন দুর্ধর্ষ জার্মান ফৌজ য়ুরোপ জুড়ে অতো লড়াই করেও যে ইংরেজদের মেরে ফৌত করতে পারছে না, আমরা মুষ্টিমেয় বালক এখানে সেখানে তাদের এক আধটাকে কখনো-সখনো খতম করে কি করে যে শেষ পর্যন্ত তাদের নিকেশ করব তা আমার হিসেবে আসেনা। আর সেই হেতু অকারণে অকালে এভাবে আমাদের নিজেদের হতাহত হওয়াটা একেবারের ভালো লাগে না আমার।

তাছাড়া এই খুনোখুনি কাণ্ডে একটুও প্রবৃত্তি হয় না, সত্যি বলতে।

কিন্তু কী করা যায়...

কোনদিকে যাই, কী করি, কোন পথ ধরি তাই আমি ঠাওর পাই না। আমার প্রবৃত্তি যে কোনদিকে, কে আমায় তা বলে দেবে?

শেষটায় বাবাকে গিয়ে পাকড়াই—'প্রবৃত্তির পথটা আমায় বাতলে দিতে পারো বাবা!'

'প্রবৃত্তির কোনো কথাই নয়। নিবৃত্তি! নিবৃত্তি!' আবৃত্তি করেন বাবা—'বললাম না তোকে বোকা? হাত-পা-মন সব গুটিয়ে এনে পদ্মাসনে বসে একাগ্র হয়ে ধ্যান করতে হবে? এইভাবে নিবৃত্তিটা রপ্ত করতে পারলে, মানে, নিবৃত্তিই হচ্ছে আসল কথা। সত্যিকার পথ। যে পথে নাকি মোক্ষ।'

বাবার মোক্ষম কথাটা মা'র কাছে গিয়ে ফাঁস করে উঠেছন মা—'তোকে বলেছে! তুই না হয় হদ্দমুদ্দ চেষ্টায় কোনোমতে নিবৃত্তিটা আয়ত্ত করলি, কিন্তু ভগবানকে নিবৃত্ত করে কে? কার সাধ্যি? তিনি তো কারু কথা শুনবেন না—হতেই থাকবেন, যেমন কিনা হচ্ছেন। তেমনিধারা হয়ে যাবেন। নিজেকে গুটিয়ে নেবেন না কখনই। কিছুতেই। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে? স্রোতের উল্টো মুখে কি যাওয়া যায়? গিয়ে লাভ?' মারও সেই আগের কথারই পুনরাবৃত্তি আবার।

মা'র বক্তব্য আমার ভাষায় ব্যক্ত করি গিয়ে বাবার কাছে—'আমি না হয় নিবৃত্ত হলাম বাবা! কিন্তু বাবা, ভগবানকে নিবৃত্ত করা যায় কি করে, করতে পারে কেউ? মা এই কথা বলছিল।'

বিপন্নের মত মুখ করে তার জবাবে বাবা মাইকেলের গীতিকবিতা আওড়ান—'সখি রে, বন অতি রমিত হইল ফুলফুটনে/পিককুল কলকল/অলিকুল চঞ্চল/চললো নিকুঞ্জে সখি, ভজি ব্রজরমণে।' বিপদে পড়লেই, দেখেছি, তিনি মধুসূদনকে স্মরণ করেন।

তারপরে, বোধ করি, বিপদের কিনারা করার পর, তিনি নিবৃত্তির তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বসেন—'ভগবান কি কারো পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন?' 'ভগবতীর পরামর্শেই বোধ হয়'—আমার এই গায়ে পড়া কথাটা গায়ে না মেখেই তিনি বলে যান—ভগবানের কথায় আমাদের কাজ কী বাবা? মহাজনরা যা বলে গেছেন তাই না শুনতে হবে আমাদের? মেনে চলতে হবে তাই না? তাঁরা বলে গেছেন, নিবৃত্তিই হচ্ছে পথ। আর সে পথে যেতে হলে...' তিনি

নাগাড়ে বলে যান : 'প্রবৃত্তির কোনো কথাই নেই।' বলেই চলেন বাবা—'নিবৃত্তিই হচ্ছে আসল কথা। নেতি নেতি করে এগিয়ে যেতে হয় কেবল...' বলে বাবা তাঁর নেতিবাদের বিস্তৃত বিশদ বিবরণ দেন।

বাবার নেতৃত্বে আমার পথের কোনো হদিশ না পেলেও শোনার মতন বাণী শোনা যায় বিস্তর।

শোনার জন্য যেমন, তেমনি শোনানোর জন্যও বাণীর দরকার জানি, আর, অলঙ্কার গড়তে গেলে সেই সোনাটাই ঝালিয়েও নিতে হয় আবার। যদিও ঝালমরা বাদ দিয়েই খাঁটি জিনিস পাই আমরা, তেমনি বাবার কাছে শোনাটা মা'র কাছে ঝালিয়ে নিতে যেতে হয়।

শুনেটুনে মা বলেন, 'তাই করগে যা তবে—যা বলেছেন তোর বাবা। নেতি নেতি করতে করতে নিবৃত্তির পথে এগিয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নেতিয়ে পড় গিয়ে। তাহলে হাতে হাতে মোক্ষ লাভ হবে।'

'বাবা তো সেই কথাই বলছেন মা? মোক্ষের কথা, নির্বাণের কথাই!'

'সব জ্বলা আর জ্বালা চুকিয়ে দিয়ে নিবে যাবার কথা। মুলে গিয়ে হাবাৎ হওয়া? এই কথাই বলেছেন তো তোর বাবা?'

'তোমার কথাটা শুনে বাবা কি বললেন জানো মা?...কোনো কথাই বললেন না, কেবল মাইকেল, না না, মাইকেলের মেঘনাদ নয়। আরেক আর্তনাদ ছাড়লেন।' বলে মহাকবির ফুলকেলির কথাটা আমি প্রকাশ করে দিই তাঁর কাছে।

'ওর মধ্যেই তাঁর অজান্তে ঈশ্বরের কথাই দৈববাণীর মত উক্ত হয়েছে...উহ্য রয়েছে...' মা জানান : 'ফুল বরং বৃন্তচ্যুত হয় কিন্তু ভগবানের বৃন্তচ্যুত হবার কোনো কথাই নেই। বৃত্তকে ধরেই তিনি কেন্দ্রমূল। সর্বদাই তিনি তাঁর প্রবৃত্তির পথে ধাবিত। ফুল তিনি ফোটাতেই থাকবেন, অফুরন্তই, বনও রমিত হবে বারংবার সে-প্রবৃত্তি তাঁর কোনো কালে ঘুচবে না। অলিকুলের মধ্য দিয়ে তাঁর মাধুকরী বৃত্তিও কোনোদিন যাবার নয়। তাহলে?'

'তাহলে কী হবে তার জবাব আমি কী দেব? আমি বলি—'তাহলে আমার প্রবৃত্তির পথটা তুমি আমায় বাতলে দাও না মা। কী যে আমার পথ, কোনদিকে যে আমার প্রবৃত্তি তার কিছুই তো আমি ঠাওর পাচ্ছিনে। দেশোদ্ধার করব, না, সাহিত্যিক হব, না...না...নাকি...'

'নাকি, মাকে কেন্দ্র করে আমার রিনির বৃত্তপথেই ঘুরতে থাকব আমরণ, যেমন ঘুরছি এখন? কিন্তু নানান কথার সেই কথাটায় আর মুখ ফোটাতে পারি না, চুপ করে থাকি। মা'র কাছে আমার নাকি-কান্না কাঁদা যায় না।

'কোনদিকে তোর মনের ঝোঁক টের পাচ্ছিসনে তুই? তাহলে তোর মা'র কাছে গিয়ে চাইগে যা, তিনিই তোর পথ ধরিয়ে দেবেন ঠিক...'

'আমার মা'র কাছে?'

'হ্যাঁ, তোর মা আমার মা সবার মা। আমাদের সবার মনের মধ্যে তিনি আছেন। তাঁর কাছে চাইগে যা। তোর সত্যিকার প্রবৃত্তি কিসে যে, তা তিনিই জানেন কেবল।'

'তুমি যে সেই ঠাকুরের মতই কথাটা বললে মা। তিনি যেমন মা'র কাছে পাঠিয়ে ছিলেন নরেনকে—তার যা দরকার তা চেয়ে নেবার জন্য। নরেন কী চাইতে গেল আর কী চেয়ে বসল শেষটায়। মানে, তিনিই চাইয়ে দিলেন বোধহয়। সে চাইতে গেল টাকাকড়ি, আর তাকে চাইতে হল ত্যাগ বিবেক তিতিক্ষা। কী ঝঞ্ঝাট দ্যাখো দিকিন্। না, মা'র কাছে চাইতে

আমার ভারী ভয় করে মা। না, তিতিক্ষা-ফিতিক্ষা আমার চাইনে। ওসবে আমার কী হবে?.. তিতিক্ষা মানে কী?'

'নরেন তার নিজের নয়, তার বাড়ির চাহিদাটা চাইতে গেছল, তিনি তাকে তার মনের চাওয়াটা ধরিয়ে দিলেন কেবল। নরেন থেকে বিবেকানন্দ বানালেন তাকে। ত্যাগ বিবেক তিতিক্ষার দিকেই অন্তরের ঝোঁক ছিল তার, সংসারের দাবীর কাছে নিজেরটা তিনি দাবিয়ে রেখেছিলেন...মা তাঁর সেই সত্যিকার প্রবৃত্তির পথটা মুক্ত করে দিলেন কেবল। মা'র কাছে গিয়ে চা তুই। তিনিই আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যান হাত ধরে। মা ছাড়া কে আর আছে আমাদের বল?'

'তুমি আমার হয়ে চেয়ে দিতে পারো না মা? কি করে চাইতে হয় তাই যে আমি জানি না।'

'যেমন করে আমার কাছে চাস তেমনি করে—আবার কী? তফাৎ এই, আমার কাছে মুখ ফুটে বলতে হয়, তাঁর কাছে মনে মনে। মনে মনেই শুনতে পান, জেনে নেন তিনি।'

'কিন্তু নিজের মতিগতির হদিশ মা'র কাছে গিয়ে চাইব কী, মাঝপথে আমার গাইড সতীশ। যে মাঝখানে এসে হানা দেয়—তৈরি আছিস তো শিবু? আসছে হপ্তাতেই সেই সভাটা। পুলিস-সাহেব আসবেন আমি খবর পেয়েছি। খতম করতে হবে তাকে। মনে আছে!'

'সেই মুহূর্তে আমাদেরকেও তো সেই সঙ্গে—? পরের খতমের সঙ্গে নিজের ক্ষতিটা না খতিয়ে আমি পারি না—'কিন্তু যাই বল্ ভাই, কিছুতেই আমার মন টানছে না ওদিকে।'

'না টানলেও তোর রক্ষে নেই। আমাদের কারোই রক্ষে নেই। করতেই হবে তোকে। নইলে আমাদের পার্টিই তোকে খতম করে দেবে। রেহাই পাবিনে, মনে রাখিস।'

'সে কথা কি ভুলবার?' আমি বলি—'অহরহই মনে রয়েছে আমার।'

'যেমন ঢিলে শার্ট পরে ইস্কুলে যাস তেমন যাসনে যেন সেদিনটায়। ভারী কোট পরে যাবি, তাহলে তোর পকেটের পিস্তলটা কারো নজরে পড়বে না। তৈরি থাকিস, আমি এসে ঠিক সময়ে নিয়ে যাব তোকে। আমার সঙ্গে প্যান্ডেলে যাবি, ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেব, বুঝেছিস? এই শনিবার, মনে রাখিস।'

তার গলায় যেন অশনির আওয়াজ পাই। মনে মনে ভয় খাই।

এদিকে শনিবার শনৈ শনৈ এগুতে থাকে।

এর মধ্যে রিনি এসে বলে গেছে আমাকে—'জানো শিবরামদা, সামনের শনিবার আমরা চলে যাচ্ছি। এখেন থেকে—সেই কলকাতায় আমাদের বাড়িতে। সন্ধের গাড়িতে—মা বাবা সবাই আমারা—চিরদিনের জন্য। আমি গিয়ে চিঠি লিখব তোমায়। উত্তর দিয়ো কিন্তু।' বলে তাদের কলকাতার বাড়ির ঠিকানাটা আমায় জানাল।

আমি নিরুত্তর হয়ে যাই। এই প্রথম রিনি দাদা বলে ডাকল আমায়—চিরকালের মতন তার চলে যাবার আগে।

আমার হৃদয়ের দুর্বলতম স্থানে অকস্মাৎ এই দা বসিয়ে একেবারে দু' টুকরো করে দিল আমায়।

আমার তো মনে হয়, শুধু আমার কেন, কোনো মেয়ে দা বসালে, আমার ধারণা, রক্ষে নেই কারোই।

'উত্তর দিতে পারব কি না জানি না।' মুখ ফোটে আমার—'আমিও সেদিন যাচ্ছি ভাই! আমিও চলে যাচ্ছি সেদিন।'

হ্যাঁ, আমিও তো চিরকালের মতই চলে যাবার পথে। এখেন থেকে—ইহলোক থেকে? শনিবারের বারবেলাতেই!

'কোথায় যাচ্ছ শিবরামদা? কলকাতায়? আমাদের সঙ্গেই চল না কেন তাহলে। সারাটা পথ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে, কেমন? কোথায় উঠবে কলকাতায় গিয়ে? মামার বাড়ি? কোনো মাসির বাড়িতে? আমাদের বাড়িতেই ওঠো না কেন? বলব আমি মাকে? নাকি, তোমার মাকেও বলতে হবে আবার?'

'কলকাতায় কি কোথায় যাচ্ছি আমি জানিনে। —তবে যেতে হবে।' আমি জানাই-'তোর মাকে বলার দরকার নেই। আমার মাকেও নয়। যদি যেতেই পারি তাহলে তোদের বাড়িও যাব নিশ্চয়। তোর সঙ্গে দেখা না করে পারি আমি? তুই বল্?'

'যেয়ো তাহলে।' এই বলে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে সে চলে যায়।

মাকে কেন্দ্র করে রিনির বৃত্তও যেন আমার চোখের ওপর মুছে যাচ্ছে দেখতে পাই...রিনির বৃত্তান্তের সঙ্গে ইহকালের আমার ইতিবৃত্তেরও ইতি।... কোথায় যাচ্ছি আমি?

অবশেষে শনিবারের সেই মারাত্মক দিনক্ষণ এল। ভারী কোট পরে, তার ওপরে পিস্তলের ভারে জর্জর, ভারিক্কী হয়ে বসে অপেক্ষা করছি—অকুস্থলে অকুক্ষণে নিয়ে যাবার জন্যে যথা সময়ে সতীশ এসে হাজির।—'তৈরি?'

'হ্যাঁ, ভাই।'

'দেখি কেমন তৈরি!' বলে সে আমার পকেট হাতড়ে পিস্তলটা বার করে পরীক্ষা করল—'গুলি ভরে নিয়েছিস দেখছি। বেশ।' তার পিস্তলটাও বের করে দেখালো আমায়—'আমারটাও ভর্তি। দেখেছিস!'

'আমি আর দেখতে যাই না, নীরবে এগুতে থাকি ওর সঙ্গে।

'এই হপ্তাতেই কলকাতায় তোর জীবনী বেরিয়ে যাবে—জানিস? আমাদের অমর শহীদ সিরিজে।' যেতে যেতে সে জানায়।

'আমার লাভ? আমি তো আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা পাবি না বটে, সে কথা ঠিকই, তবে জেনে যা—ক্ষুদিরাম, কানাইলালের সঙ্গে একাসনে স্থান পাবি—এক সাথে নাম উচ্চারিত হবে তোর।'

'আমার জীবনী? লিখতে গেল কে? আমি যে নিজেই কিছু জানি না আমার জীবনের।' বলে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি—'আমার জীবন তো শুরুই হয়নি, এখনো।...পরলোকে পাড়ি দিতে চলেছি? আমার জীবন কাহিনী তোরা জানলি কি করে?'

'জানিনে আমরা? এতদিন একসঙ্গে আছি, দেখছি তোকে, জানিনে? তারপর তোর বাবার পদ্যের বই থেকেও কিছু নেওয়া, কিছুটা বানিয়ে দেওয়া। কে লিখেছে বলছিস? স্বয়ং আমাদের লীডার! লেখার বেশ হাত আছে তার।'

'আমার জীবনী লেখা হয়েছে এতদিন জানাসনি তো আমায়?'

'কবে লেখা হয়ে গেছে! ছাপাও শেষ, এখন শুধু বেরুনোর অপেক্ষায়। তোর ঐ কান্ডটার পরেই ছাড়া হবে বাজারে। জানাইনি আগে বটে, তবে এখন, যাবার আগে কথাটা জেনে আনন্দ হচ্ছে না?'

'আনন্দ? জেনে আমার কিসের সুখ ভাই!' অমর শহীদ হবার কোনোই সান্ত্বনা আমি পাই না। —'লাভটাই বা কী আমার, বল?'

'তোর লাভ নয়, আমাদের লাভ। আমাদের পার্টির লাভ। কী লাভ, কেমন করে লাভ,

বলছি শোন। বইটা বাজারে পড়তে না পড়তেই তো সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত হবে, তল্লাসী করে তার কিছু কিছু বই এখানে সেখানে পেয়ে নিয়ে যাবে পুলিস। কিন্তু বেশির ভাগ বইয়েরই কোনো হদিশ মিলবে না। তখন সেইসব বই লুকিয়ে ছাপা হতে থাকবে আরো। এডিশনের পর এডিশন। আরো আরো লাভ।

'তোর জীবনীও কি আমার সঙ্গে বেরুবে নাকি আবার ?' আমি জিগ্যেস করি।

'বের হতেও পারে, টের পাইনি এখনো। লীডার কিছু বলেনি আমাকে।'

যথা সময়ে যথাস্থানে গিয়ে যথাযথ বসলাম আমরা। ডায়াসের সামনের সারিতে আমি, আর আমার ঠিক দু' সারি পিছনে আমার উপর নজর রেখে সতীশ। কোটের পকেটে হাত পুরে রেখে বসেছে সে দেখে নিলাম।

আমিও তার মতই পকেটের ভেতরে পিস্তল পাকড়ে বসেছি।

সদর থেকে পুলিস সাহেব এসেছেন, সঙ্গে বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক পদস্থ সৈনিক। হাবিলদার-টাবিলদার হবে কেউ, কাবিল হোসেন বলল। আমার ঠিক পাশেই বসেছিল সে।

বিপদে পড়লে মাথা খেলে নাকি মানুষের, কথায় বলে। আমিও ডায়াসের সম্মুখে বিপদের মুখে—বসে বসে নিজের মাথা খেলাই।

আচ্ছা, সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙ্গে-তেমনটা করা যায় না কি ? আমাদের অভিশাপ ওই সাহেবটাও মোলো অথচ আমার দেহযষ্টি অক্ষত রইল-এমনটা হয় না ?

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের পরেই আমি যদি ধুপ করে বসে পড়ি—বসেই না বেঞ্চির সঙ্গে মিশিয়ে যাই, তাহলে, সতীশের তাক না ফস্কালেও, আমার গায়ে তার গুলির আঁচড়টিও লাগবে না; ধরাও পড়তে হবে না, পুলিসের ধোলাই থেকেও বেঁচে যাব হয়ত।

যেহেতু, সাহেবের পতন ও মৃত্যুর সাথে সাথেই দারুণ হইচই পড়ে যাবে। হট্টগোলের মধ্যে ভেঙ্গে যাবে সভা। সবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে পুলিস, কে কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই। আমিও ঘাড় গুঁজে সেই ভিড়ের ভেতরে ভিড়ে গিয়ে হারিয়ে যাব গভীরে। সেখান থেকে সটান চলে যাব সাম্‌সিতে। এক দৌড়ে মাইল দশেক দূরের আমাদের রেল স্টেশনে। খানিকক্ষণ কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে তারপরে কলকাতার ট্রেন ছাড়বার মুখটাতেই চট্‌ করে উঠে পড়ব সেই গাড়িতে। সরাসরি চম্পট কলকাতায় তারপরই।

জমজমাট সমাবেশ! এক একজন কিছু বলতে উঠছেন, চটাচট পড়ছে হাততালি। পাঁচশো ছেলের হাজার হাতের হাতুড়িতে গমগম করছে সভা।

প্রথমে বলতে উঠলেন আমাদের রেক্‌টর মশাই কামাখ্যাবাবু, তিনি পরিচিতি দিলেন মাননীয় অতিথিদের। বাংলার এককালের শৌর্যবীর্যের উল্লেখ করে বললেন—যে-সামরিক বৃত্তির পথ এতদিন বাঙ্গালীর কাছে অবরুদ্ধ ছিল, ভগবানের কৃপায় আজ তা আবার উন্মুক্ত হয়েছে, আবার কৃপাণ ধরবার সুযোগ পেয়েছি আমরা। বাঙ্গালী যুবকরা—যারা শক্ত সমর্থ—এহেন সুযোগের সদ্ব্যবহারে যেন দলে দলে এই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করে—সেই আশাই উচ্চারিত হলো তাঁর ভাষণে।

সব শেষে বলতে উঠলেন হাবিলদার সাহেব। বীরোচিত চেহারার সেই বাঙ্গালী সৈনিকটি। রণক্ষেত্রে নিজের রোমাঞ্চকর নানান অভিজ্ঞতার কথা এমন ভাষায় তিনি বর্ণনা করলেন যে, সত্যিই রোমাঞ্চ হল আমাদের। যুদ্ধে না গিয়েই গায়ে কাঁটা-দেওয়া সেদিনের আমার

সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।—

তারপরেই তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় আহ্বান জানালেন সবাইকে'।

সেই মুহূর্তেই আমি দাঁড়িয়েছি, পকেটের মধ্যে হাত মুঠো করে। সঙ্গে সঙ্গে সতীশও উঠেছে আমার পিছনেই, আড় চোখে দেখছি তাকিয়ে। আমি উঠতেই না, চারধার থেকে এমন জোর হাততালি পড়ল যে এক লহমায় সব প্ল্যান ভেস্তে গেল আমার।

হাবিলদার সাহেব আমায় ডাকলেন তার কাছে।

ডায়াসে যেতেই তিনি আমায় বুকে জাপটে ধরলেন ; ঘোষণা করলেন —'এই তরুণই এখানকার প্রথম বীর, আমাদের সৈন্যবাহিনীর।' তারপর দু'হাতে আমাকে উঁচুতে তুলে সবার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রদর্শনী করলেন আমার।

তিনি নামাবার পর কামাখ্যাবাবু আমার মাথায় হাত রেখে তাঁর আশীর্বাদ জানালেন। গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন—'ধন্য ! তুমি আমাদের মুখ রেখেছ। সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের মুখ উজ্জ্বল করেছ তুমি। যাও, বীরের মত যুদ্ধে যাও, বীরের মতই ফিরে এসো আবার। বীরের উপযুক্ত তোমার সংবর্ধনার জন্য সেদিনটির অপেক্ষায় থাকব আমরা।'

আবার চটপট হাততালি চারধার থেকে। ছেলেদের সে কী উল্লাস ! পুলিস সাহেব আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন সহাস্যে।

আমার পিছু পিছু সতীশও উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখাদেখি আরো জনাকতক।

সবাইকে ডাকা হলো সেই ডায়াসের ওপর। রিক্রুটের দলে নাম লেখা হলো সবাইকার। শুনলাম, সাহেবের সঙ্গে পরদিনই সদরে চলে যেতে হবে সবাইকে।

আমার অপটু দেহের জন্য, বিস্তর বাহবা দিয়েও, শেষ পর্যন্ত আমায় বাতিল করে দেওয়া হল। ওদের সবাইকে কিন্তু ভর্তি করে নেওয়া হলো সৈন্যদলে। সতীশও গেল সেই সঙ্গে।... আমাকে আর কষ্ট করে নিজের মাথা খেলাতে হল না। কার লীলা কে জানে, অবলীলায় বেঁচে গেলাম সে যাত্রায়।

কী করতে যে কী হয়ে যায় ! আমাদের মাথার ওপরে আড়ালে থেকে কে যে নিজের মাথা খেলায় !

॥ তেইশ ॥

সেদিনের সংগ্রামসভা থেকে ফিরেই সোজা যাচ্ছিলাম রিনিদের কোয়ার্টারে—তার সঙ্গে শেষ দেখা সারতে। সেদিনের সন্ধ্যাতেই তাদের স্টেশনে যাওয়ার কথা—সামসি রওনা হবার আগেই যদি ধরতে পারি তাদের। রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় পাড়ি জমাবে তারা।

বাড়ির সামনেই বাধা পড়ল। আমার ভাই সত্য এসে খবর দিল—'বাবা তোকে ডাকছে রে দাদা।'

যেতে হোলো বাবার কাছে।

বাবা সেই সভায় যাননি, কিন্তু সেদিনকার সব খবরই পেয়েছিলেন আমার ভাইয়ের কাছে।

যেতেই তিনি বললেন, 'রাম, তোমার শৌর্যে আমি সুখী, একটু গর্বিতও বইকি। কিন্তু এখনও তোমার যুদ্ধবিগ্রহে যাওয়ার বয়স হয়নি। বয়স হলে যেয়ো। যাবে বই কি।

লড়াইয়ের কায়দা-কানুন রপ্ত করে রাখাটা ভালো—এখনই তার বেশ সুযোগ ছিল। কিন্তু লড়তে হবে নিজের দেশের জন্যেই, ইংরেজের জন্যে নয়।....'

'হ্যাঁ বাবা, তা আমি জানি। দেশের স্বাধীনতার জন্যই আমি প্রাণ দিতে চাই, ইংরেজের স্বার্থে নয়—সেইজন্যেই যাচ্ছিলাম। ইংরেজের কাছ থেকেই তো শিখে নিতে হবে এই যুদ্ধবিদ্যাটা ?'

'এখন যারা তার উপযুক্ত, তারা তা শিখবে বইকি। এবং তারা কি শিখছে না ? দলে দলে যুদ্ধে ঢুকছে তারাই এখন। পরে সুযোগ মতন সব বেঁকে দাঁড়াবে। কামানের মুখ, বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দেবে ওই ইংরেজের দিকেই। কিন্তু এখন তোমার সে বয়স আসেনি, তোমার শরীর যুদ্ধে যাবার মতন তৈরি হয়নি—মজবুত হয়নি এখনো....'

'সেইজন্যই তো নিল না আমায়।' আমি সখেদে জানাই—'তারাও সেই কথাই বলল বাবা।'

'এখন তোমার যে কাজ সেইটাই ভালো করে করো। খেলাধূলায়, ব্যায়াম চর্চায় শরীর তৈরি করো। আর পড়াশুনায় মন দাও। যখনকার যা কাজ তাই করতে হয় ; তাহলে পরবর্তী কাজটার জন্য উপযুক্ত হওয়া যায়। বিদ্যার্জন কিছু কম কাজ নয় বাবা। যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দিলে অমরলোকে যাওয়া যায় জানি, জয়তে লভতে লক্ষ্মী—মৃতেনাপি সুরাঙ্গনা—শাস্ত্রে বলেছে, কিন্তু বিদ্যার দ্বারাও অমরত্ব লাভ করা যায়—মরবার পরে নয়, এই জীবনেই। সেটাও কিছু কম শ্রেয় নয়। বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে—বলে থাকে, জানো ?'

'জানি বাবা।' আমার ঘাড় নাড়ি : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ে ওই ছাপ মারা থাকে আমি দেখেছি, কিন্তু ওর মানে ঠিক জানি না।'

'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে, কিনা, বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে - অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা অমৃত অর্জন করা যায়। বুঝলি ?'

'হ্যাঁ বাবা। এখন খেলতে যাই তাহলে ? ' বলে বাবার কাছে বিদ্যার্জন সেরেই না রিনিদের বাড়ির দিকে দৌড়াই।

গিয়ে দেখি তাদের ঘরগুলোর জানালা খড়খড়ি সব বন্ধ—তবু আশায় ভর করে—এখনও হয়ত ওরা রওনা দেয়নি—সেই ভরসায় কাঠের সিঁড়িটা ধরে উপরে উঠলাম। কুয়াতলার পাশ দিয়ে এগিয়ে দেখি, দরজায় মোটা তালা ঝুলছে। আর দরজার গায়ে রিনির হাতের গোটা গোটা আঁচড়ে টাটকা চকের লেখা—রামদা, চলে গেলাম, রিনি।

র-য়ের বদলে ঋ-কার দিয়ে নিজের নাম লিখেছিল সে। বানান ভুলটা চকচক করছিল চোখের উপর। ইচ্ছে করে ঐ রকম বানানো—আমি বুঝলাম।

কিন্তু সে ঋণীটা কিসের ? ঋণী তো আমি। আমিই তো। সে তো খালি দিয়েই গেছে, দু হাতে, অন্নপূর্ণার মতন যত পরমান্ন, আর আমি কেবল নিয়েই গেছি—পেয়েছি যত না ! বিনিময়ে কিছুই তাকে দিইনি—দিতে পারিনি।

আমার আছেটা কী ? চিড়ে গুড় ছাড়া আর দেবার কী ছিল আমার ? সে-ই তো মহাজন। আমি ঋণী, চিরঋণী—শিবের মত চিরভিখারী রয়ে গেলাম তার কাছে।

ফিরে এলাম রান্নাঘরে, মা'র কাছেই। মা লুচি ভাজছিল তখন।

'আয় বোস, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ ? কিছু খাসনি তো বিকেলে। মুখটুখ শুকিয়ে

গেছে।'

খানকয় ফুলকো লুচি আর পটল ভাজা দিলেন একটা রেকাবিতে। খেতে খেতে বলি—'মা, তুমি কলকাতায় যাবে বলছিলে না ?'

'কলকাতায় ! কেন রে ? এত জায়গা থাকতে কলকাতায় যাব কেন হঠাৎ।'

'বাঃ, বলছিলে না সেদিন ? কালীঘাটে তোমার হাত খালাস করতে যাবে। বলছিলে না সেদিন রিনির মাকে ?'

'রিনির মা কী রে ? মাসিমা বল। হ্যাঁ, যাব তো কলকাতায়। যেতে হবে বটে, কিন্তু কবে হয়ে ওঠে দেখি।'

'এর আর দেখাদেখি কি মা ? হয়ে ওঠাওঠিটা কিসের ! গাড়িতে উঠে বসলেই হয়।' আমি মাকে উৎসাহ দিই-'বল তো আমি সাইকেলে করে সামসিতে গিয়ে আগে থেকে টিকিট কেটে নিয়ে আসতে পারি। যাব কাল সকালে ?'

'টিকিটের জন্যেই আটকাচ্ছে কিনা ! তোর বাবার সময় সুবিধা হলে তবেই তো যাওয়া হবে। দেখা যাক আগে....'

'বলব গিয়ে বাবাকে ? জিগ্যেস করব মা ?'

'না, তোকে জিগ্যেস করতে হবে না। আমিই বলবখন।'

'সত্যি হাতটা খালাস করে নেওয়াই ভালো। বাঁ হাতে খেতে তোমার কতো কষ্ট হয়..হয় না মা ?'

'কষ্ট কিসের ! অভ্যেস হয়ে গেছে তো। এখন হয়ত ডান হাতে খেতে গেলেই আমার আবার বাধ-বাধ ঠেকবে।'

'বাঁ হাতে খাওয়াটা কেমন দৃষ্টিকটু নয় ? যারা দেখে তাদের তো কষ্ট হয়। হয় না মা ?'

'তা কী জানি ! কী করে বলব ! আমি তো কাউকে দেখতে দিই না আমার খাওয়া।'

'কী দরকার অমন করে লুকিয়ে চুরিয়ে খাওয়ার ? নিজের পয়সায় খাচ্চি তো ? পরের পয়সায় কি চুরি করে খাচ্ছি না যখন ?....আচ্ছা মা, কলকাতায় গেলে রিনিদের বাড়িতেই তো উঠব আমরা ? মাসিমা এত করে বলে গেছেন তোমায় ?'

'আমার আপন দিদি থাকতে, তোর খুদি মাসির বাড়িতে না উঠে, ওদের বাড়ি যাব কেন রে ? সেটা কি ভালো দেখাবে ? তবে হ্যাঁ, একদিন ওদের বাড়ি যেতে পারি, যাব বেড়াতে একদিন, বলেছি যখন।'

'আমি একটা থার্ড ক্লাস ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে আনব মা-যেদিন যাব ওদের বাড়ি। আমি খড়খড়ি বন্ধ করা গাড়ির খুপরির ভেতর তোমার সঙ্গে বসব না কিন্তু, বলে রাখছি এখন থেকেই। আমি কোচম্যানের পাশে বসে যাব, নয় তো গাড়ির পেছনে সইসের জায়গায় দাঁড়িয়ে। কেমন তো ?'

'বেশ বেশ, তাই হবে। তাই যাস না হয়।' হাসতে থাকেন মা-'এখন খেয়ে নিয়ে পড়তে বসগে।'

'খোলা ফিটন গাড়ি চেপে গেলেও তো হয় মা ? হয় না ? তাহলে তো আমি তোমার পাশে বসেই দেখতে দেখতে যেতে পারি।'

'তাও হয়। কিন্তু খোলা ফিটন তো সাহেবপাড়া ছাড়া পাওয়া যায় না রে !'

'আমি ট্রামে চেপে চলে যাব সাহেবপাড়ায়, সেখেনে থেকে ফিটন ভাড়া করে নিয়ে আসব না হয়-চেপে বসে আসব তাইতে। আনব তো ? কী বল মা ?'

'তাই আনিস না হয়।'

'তারপরে রিনিদের বাড়ি পৌঁছবার পরে ঐ গাড়ি করেই যদি আমরা—আমি আর রিনি যদি একটুখানি হাওয়া খেয়ে বেরিয়ে আসি মা ?'

'বেশ তো , আসিস না-কে মানা করছে ! যা, এখন পড়তে যা তো।'

'বাবাও তো পড়তে বলছেন মা। বলছেন, বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে। কিন্তু তার মানেটা কী মা ? মুখস্থ করে পাশ করে কী যে আমার চারটে হাত বেরুবে তা তো আমি ভেবে ঠাওর পাইনে। মুখস্থ বিদ্যায় কী অমরত্ব যে পাব তা জানি না। কী তত্ত্ব তার কে জানে !'

বলতে না বলতে উসকে ওঠেন মা। তত্ত্বকথায় মাকে একবার পেলে হয়, তক্ষুনি তিনি উন্মত্ত। বাবার তত্ত্ব পেতে গিয়ে মা'র ব্যাখ্যা শুনি—শুনতে বেশ লাগে আমার। যা কিছু শিক্ষা আমার-সে তো সেই ছোটবেলাতেই—নিজের মা'র কাছেই। বই পড়ে আর কতটা শিখেছি !'

'তাই বলছেন নাকি তোর বাবা ?'

'বলছেন তো তাই। বলছেন যে, আবৃত্তি সর্ব শাস্ত্রানাম্ বোধাদপি গরিয়সী। শাস্ত্রটাস্ত্রর মানে কী যে, যদি কিছু বুঝতে নাও পারো, শুধু কেবল তুমি আউড়ে—শাস্ত্রবোধের চেয়েও তার ঐ আবৃত্তিটা বড়ো।'

'সে আবৃত্তি কি তোর মুখস্থ বিদ্যে ? তোকে বলেছে !'

'আমিও তো তাই বলছি মা। মুখস্থ করে কোন্ অমৃতটা আমি পাব যে.'

বলতে গিয়ে আমি থমকে যাই। মনের মেঘে বিজলির মতন চমকে ওঠে, হ্যাঁ, একটা অমৃত আছে বটে, যা শুধু মুখস্থ করলেই মেলে, মুখেই যার উদয় আর মুখেতেই অস্ত-মুখের ওপরেই সমস্ত—কিন্তু সর্বক্ষণ অন্তরে যায় নিরন্তর অনুরণন—উদয়াস্তব্যাপী সেই দিবাবাহার, আসলে তা কোনো বিদ্যা কিনা জানি না, তবে তার তত্ত্ব যে সেই অল্প বয়সেই আমার আয়ত্ত হয়েছে, মা'র কাছে তা আমি আর ব্যক্ত করতে যাই না ; (যেমন ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর ওই বইটাও যে আমি পড়েছি, ফাঁস করতে পারিনি কোনোদিন। বিদ্যাসুন্দরের থেকে শেখা সেই সুন্দর বিদ্যার কথাটা জানাইনি কখনো মাকে, বইটা পড়ার পুনঃ পুনঃ মানা ছিল মা'র -সেইজন্যেই। মনে হয়, মনে আমার পাপ ঢুকেছিল তখনই।

'বিদ্যার মানে আলাদা একেবারেই আলাদা-সবাই তা জানে না। গড়গড় করে তোর ওই আউড়ে যাওয়াটা বিদ্যে নয়। বিদ্যে কখনও পুঁথিগত হয় না, সেটা অভ্যাসগত। সেই অভ্যাসের মানেও আবার স্বতন্ত্র। প্রত্যেক শব্দের একটা আভিধানিক মানে আছে, কিন্তু তার আড়ালে আরেক অর্থ থাকে, প্রত্যেক বাক্যের অন্তর্নিহিত আরেক তত্ত্ব। শোন বলি। বিদ্যার মানে হচ্ছে .'

কিন্তু মা'র বিদ্যা জাহিরের আগেই সত্য ভগ্নদূতের মতন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে—'জানো মা, কী হয়েছে ? সতীশদাকে পাকড়েছে পুলিশে, তার পকেটে রিভলবার পাওয়া গেছে নাকি। সে কবুল করেছে যে, আরেকটা জিনিস আছে নাকি দাদার কাছে। থানার দারোগা অ্যারেস্ট করতে আসছে দাদাকে।' জানায় সে।

'ঐ জিনিস—কী জিনিস ?' জানতে চান মা।

'ঐ রিভলবার। আরেকটা আছে নাকি দাদার কাছে।'

'কোথায় রিভলবার ? দেখি তো ?'

'এই যে মা।' কোটের পকেট থেকে বার করে দিই।

'কোথায় পেলি তুই ?'

'মামার নামে একটা পার্শেল এসেছিল। সেই যে মামার একটা অঙ্কের চিঠি এসেছিল না? তার পরেই তো এল এই রিভলবার দুটো। একটা পার্শেলে।'

'সুরেন তলে তলে বিপ্লবীদের দলে ভিড়েছে জানতুম না তো। ঘুণাক্ষরেও না...'

দারোগাবাবু ততক্ষণে বাবার বৈঠকখানায় এসে পৌঁছেছেন—বাতচিত করছেন বাবার সঙ্গে। দারোগার মুখে আমাদের কীর্তিকাহিনী শুনেও বাবার মুখে কোনো ভাবান্তর আমি দেখলাম না।

মা গিয়ে দারোগাবাবুকে বললেন—'রিভলবারগুলো এসেছিল আমার ভাই সুরেনের নামে পার্শেলে...'

'জানি। পোস্টমাস্টারবাবু পার্শেলের কথা বলেছেন। পার্শেল যে এসেছিল তা আমি জানি। সেদিনও গিয়েছিলাম পোস্ট-আপিসে, রোজই একবার করে যেতে হয় আমাদের...এইসব ব্যাপারের খোঁজখবর নিতে। পার্শেলটার ওপরে লেখা ছিল 'মেডিসিন উইথ কেয়ার' আমি দেখেছিলাম। শিবপ্রসাদবাবুর কেয়ার অফে এসেছিল বলে আমরা আর ওটা খুলে পরীক্ষা করে দেখিনি...সন্দেহই করিনি কোনো।'

'রামও করেনি আমার। মামার জিনিষ মনে করে নিয়েছিল, খুলে দেখেছে পিস্তল। খেলার জিনিস মনে করে রেখে দিয়েছে কাছে।'

রিভলভার তো খেলার জিনিষ নয় ম্যাডাম। তক্ষুনি গিয়ে জমা দিলে হতো থানায়। তা না করে নিজের কাছে রাখাটা...' দারোগার মুখ দারুণ গম্ভীর হয়।

'খুবই অন্যায়, খুবই অন্যায়।' মা সায় দেন তাঁর কথায়। —'আমি জানলে সেই ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু টের পেলাম তো আজ। এইমাত্র। তা ছাড়া আমার ভাই সুরেন যে তলে তলে বিপ্লবীর দলে গেছে ঘুণাক্ষরেও তা আমরা জানিনে। টের পাইনি কখনও। তা ছাড়া, সুরেন তো বহুদিন এখানে থাকে না...'

'কোথায় থাকেন সুরেনবাবু এখন ?'

'ভাঙরের কাছে কোন এক আশ্রম আছে নাকি, গোঁসাই গুরুর আশ্রমেই থাকে সে। ধর্মকর্ম নিয়েই আছে এখন—সর্বদা হরিনাম কীর্তন করে এই তো জানি। কোনোদিন যদি বিপ্লবী দলে ভিড়েও থাকে, এখন সে বদলে গেছে একেবারে। হলফ করে বলতে পারি আমি।'

'তা হলে খোঁজখবর নিতে হবে আমাদের একবার।'

'নিয়ে দেখুন, তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা কইলেই টের পাবেন—আলাপ হ'লেই জানতে পারবেন সে এখন আলাদা মানুষ...একেবারে অন্যরকম...'

'এই সব কাজের প্রতিক্রিয়ায় অনেকেই পালটে যায়, ধর্মে মতি হয় শেষটায়, দেখেছি আমরা অনেক...'

'আপনারা কি মামাকে গিয়ে অ্যারেস্ট করবেন নাকি ?'

আমার অন্তরগত বিবেক আমায় কামড় বসায়, আর্তনাদ করে উঠি।

'যদি দেখি যে বিলকুল বদলে গেছেন, এনার্কিস্ট দলে তিনি নেই এখন আর, তাহ'লে নাহক কেন তাঁকে হ্যারাস করতে যাব আমরা ?'

'দাদাকে বুঝি ধরে নিয়ে যাবেন থানায় ?' সত্য জানতে চায়।

'শিবপ্রসাদবাবু যদি ওর জামীন হন—অতঃপর ওর গুড বিহেভিয়ারের দায়িত্ব নেন-ওকে

নিজের চোখে চোখে রাখেন, বিপথে যেতে না দেন, তা হ'লে ওকেও আমরা কিছু বলব না। তবে বাবার নজরে ছেলেরা আর কতক্ষণ থাকে বলো। উনি যদি নিজের হেফাজতে রাখেন...' মা'র প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন। —'ছেলেরা মা'র নজর এড়াতে পারে না কখনই...উনি যদি নিজের হাতে ভার নেন ওর-তাহ'লে তোমার দাদাকেও আমরা কিছু বলব না।'

দারোগার আবেদনে নীরব থাকলেও সর্বদাই যে তাঁর নজরানা আমার প্রতি প্রদত্ত, মা'র মৌনতাতেই সেই কথাটি সবার সম্মুখে মুখর হয়। আমি বেঁচে যাই।

কিন্তু তার পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। শেষের সেই প্রশ্নটি আমার—'আর আমাদের সতীশের কি হবে তাহলে ?'

'যদি সে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় তো কিছুই হবে না। ভালই হবে তার। যুদ্ধ থেকে বেঁচেবর্তে যদি ফিরে আসে, আসতে পারে, সরাসরি আমার জায়গাতেই এসে বসতে পারে হয়ত—চাই কি, কোনো থানার দারোগা হয়েই বসবে হয়তো কোনোদিন।'

দারোগা ? কী হতে গিয়ে কী যে হতে হলো সতীশকে, আমি নিজের মনে খতিয়ে দেখি একবার। লাভ কি ক্ষতি জানিনে, দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে সেই রাজভক্ত হ'তে হলো তাকে—পেট্রিয়ট না হয়ে পুলিস সেজে পেটের ধান্দায় ঐ পথের আর সব বিপথিকদের ধরে পেটাবার কাজে লাগতে হলো শেষটায়...হায় রে !

কী চাইতে গিয়ে কী যে পায় মানুষ, কী পাবার পরে কী আবার চেয়ে বসে যে—হিসাবের খাতায় তার অঙ্ক কোনোদিনই মেলে না বুঝি !

॥ চব্বিশ ॥

'সবটা কাল শোনা হোলো না মা আমার,' মা'র কাছে গিয়ে বসলাম আবার : 'দারোগাবাবু মাঝখানে এসে আমার বিদ্যালাভের পথে বাগড়া দিলেন না কালকে ?'

'কিসের বিদ্যালাভ ?'

'সেই যে...যে বিদ্যায় অমৃতলাভ হয়...বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ?'

'অমৃত মানে কী, বল্ দেখি আগে।'

'কে না জানে ? সেই জিনিস, যা নাকি একদিন দেবাসুরের সমুদ্র—মন্থনে উঠেছিল...সুধা আর বিষ।'

'সুধা আর বিষ ?'

'হ্যাঁ, সুধাটা স্বর্গেই শুধু পাওয়া যায়, কিন্তু বিষ কি কোথায় মেলে আর এখন ? সবটুকু তো তোমার নীলকন্ঠই গিলে বসে রয়েছেন।'

'গিলেছিলেন ভাগ্যিস !'

আমার অনুযোগ : 'কিন্তু ঐ সুধাও কি তোমার এই বসুধায় মেলে নাকি আবার ? বাবা বলছেন যে, বিদ্যার্জনেই কেবল তা পাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ, সুধাই বটে। অমৃতর তাই একটা মানে বটে ঠিকই, কিন্তু বলেছি না, প্রত্যেক শব্দের ভেতরে আরেকটা অর্থ থাকে ফের ? অমৃত কি না, অম্—এর সঙ্গে যা ঋত, কিনা জড়িত। অ হ'ল গে আদিস্বর, ব্রহ্ম আর ম্ হল তোর অনুস্বর—তার সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জন,-যার মানে অন্তত ব্যঞ্জনা, অফুরন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম আর তাঁর মায়া—স্বয়ং ব্রহ্মময়ী—মা বিন্দুবাসিনী।

বিন্দু আর ব্যাস মিলিয়ে ঐ অম্।'

'অনুস্বরের চেহারাটাও প্রায় সেই রকম-তাই না মা? যেন পয়েন্ট আর তার রেডিয়াস।' আমার পয়েন্টেড প্রশ্ন : 'বিন্দু আর ব্যাস নিয়ে তোমার ঐ বিন্দুবাসিনী। তাই না মা? ভারী আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য কি! শব্দ তো ব্রহ্মই। প্রত্যেক শব্দের আড়ালেই তিনি রয়েছেন, বাক্যমাত্রেই তাঁর আভাস মেলে। যেমন সব জলেই ছায়া পড়ে আকাশের।' মা জানানঃ 'শুধু দেখতে জানলে হয়।'

'যাদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায় তারাই দেখতে পায়, তাই না? যেমন বিবেকানন্দের খুলে গেছল একবার, তোমার ওই ঠাকুর খুলে দিয়েছিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সব জিনিসেই ব্রহ্ম দেখছিলেন। গোলদীঘির ধারে দাঁড়িয়ে, হারিয়ে ফেলেছিলেন গোলদীঘিকে। অতবড় গোলদীঘিটা, এমনকি তার রেলিং-টেলিং সব নিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে, গুলিয়ে একাকার হয়ে গেছল তাঁর চোখের সামনে।'

'হয়েছিলই তো।

'কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ গোলদীঘির কিংবা গোলদীঘির সঙ্গে মিলিয়ে তোমার ঐ ব্রহ্মের এই তালগোল পাকানোটা কি ভালো মা? তাতে তো কোনোটাকেই ঠিক ঠিক দেখা যায় না—সঠিকরূপে পাওয়া যায় না একদম!'

'সেও একরকমের দেখা রে! ব্রহ্মকে অখণ্ডরূপে দেখা, আবার খণ্ডরূপে দেখা—দুটো দেখাই সমান দেখাই সমান সত্যি।'

'খণ্ডরূপে দেখাটাই ভালো আমার কাছে। অখণ্ডরূপে দেখতে গেলে তো অদেখা হয়ে যায়, মনে হয় কিছুই দেখা হ'ল না। সন্দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে ভেঙে খেলে তবেই না তার স্বাদ মেলে?'

'এখন যে কথা হচ্ছিল আমাদের,' মা তাঁর আদিস্বরে ফিরে যান—'অম্-এর সঙ্গে ঋত, মানে, জড়িত কী? তার ব্যাস এবং বৃত্ত। সেই বিন্দু—ব্যাস—বৃত্ত-অখণ্ড মণ্ডলাকার—চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।'

'তোমার বিন্দুবাসিনী গিয়ে বিন্দুব্যাসিনী হয়েছেন শেষটায়!' মা'র কথার ওপর আমার ফোড়ন কাটা—'এটা তাঁর বিলাসব্যসন কিংবা ব্যাসনবিলাসো বলা যায় মা।'

'বিন্দু, ব্যাস, বৃত্ত-অ উ ম্ তিন মিলিয়ে হল গে ওম্। ওঁ—প্রণবমন্ত্র। অনাহত ধ্বনি। বিশ্বসৃষ্টির—বীজ নব নব সৃজনের। বুঝেছিস?'

'জানি। বাবা হরদম হরি ওম্ হরি ওম্ করেন, জানিনে? কিন্তু মন্ত্রবিদ্যা জানতে চাইনি তো তোমার কাছে-আমার বিদ্যালাভের মন্তরটাই জানতে চেয়েছিলাম!'

'বিদ্যা হচ্ছে বিদ্যমানতা, আমাদের অস্তিত্ববোধ। বোধের মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকা। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগেই আমাদের অস্তিত্ব। অম্—এর সঙ্গে ঋত হয়েই আমরা অমৃত—আমাদের মৃত্যু নেই তখন। আবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, জড়িত হয়েই অস্তিত্ব ঈশ্বরেরও—তিনিও অমৃত তখনই। পরস্পরের এক সঙ্গে একাধারে যুগপৎ এই বিদ্যমানতার বোধই হচ্ছে মহাবিদ্যা। আর এই বিদ্যাতেই অমৃতমশ্নুতে।'

'ওব্বাব্বা!' আমার বাকস্ফূর্তি রহিত। —'এত কাণ্ড!'

'বিদ্যা আবার দু'রকমের—পরাবিদ্যা আর অপরাবিদ্যা।' মা'র ব্যাখ্যান 'পরাবিদ্যা হোলো ঈশ্বরের সঙ্গে বিদ্যমানতা। পর কে ? না, ঈশ্বর। পর বলতে তাঁকেই বোঝায় কেবল।'

'কথাটা ঠিক বলেছো মা।' তৎক্ষণাৎ আমার সায় : 'ভগবানের মতন পর আর হয় না। কখনই তিনি কারো আপনার নন। দ্যাখো না মা, তিনি আপনার হলে পৃথিবীর মানুষের এত দুঃখকষ্ট কেন ?'

'দুঃখকষ্টের কারণ ভগবান নন। আমরা নিজেরাই। সে কথা তোকে বোঝাব আরেকদিন।' মা বলেন-'এ পর সে পর নয় রে ! এখানে পরের মানে আলাদা। পর কিনা, পরাৎপর, পরম। যাঁর ওপরে আর কেউ নেই, কিছু নেই। সেই পরমের সঙ্গে অহরহ আমাদের যে যুক্ততাবোধ-সেই হলো তোর পরাবিদ্যা। আর অপরের সঙ্গে বিদ্যমানতা হোলো অপরাবিদ্যা।'

'সেটা আবার কীরকম মা ?'

'দু'রকমের অস্তিত্ব না আমাদের ! এক, ভগবানের সঙ্গে মনোযোগে আর অপর সকলের সঙ্গে কর্মযোগে ? ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ মনোবৃত্তে এবং সবার সঙ্গে যোগ জীবনবৃত্তে। মনে মনে তাঁকে আমরা টের পাই, তাঁর অস্তিত্ববোধ জাগে, ঠাকুর যাকে বলেছেন বোধে বোধ। আর বুদ্ধদেব বলেছেন, বোধি।'

'বুদ্ধদেবের বেলায় বোধি ? আর পরমহংসদেবের বেলায় বোধোদয় ?' আমার প্রশ্ন হয়।

'বুদ্ধদেব তো ঈশ্বর মানতেন না, নিজেকে স্বীকার করতেন কেবল। তাঁর বোধি হোলো আত্মবোধ— নিজের অস্তিত্ববোধ। আর শেষ পর্যন্ত তাতেই নির্বাণ লাভ করা।'

'কিন্তু সেই বোধি তো বুদ্ধ হওয়া—বুদ্ধু মেরে যাওয়া ! ফুরিয়ে যাওয়া একেবারে—যা নাকি নির্বাণ। সে তো সর্বনাশ। সে তো ভালো নয় মা !' আমার বোধশক্তি জাহির করি—'অনির্বাণ না জ্বলে একেবারে নিবে যেতে কে চায় মা ?'

আমার সে কথার জবাব না দিয়ে মা নিজের কথার আবেগে এগিয়ে যান : 'মনে মনেই সেই পরমকে পাই : আর অপরকে পেতে হলে যেতে হয় জীবনে জীবনে : আমাদের পেশায়। কার্যসূত্রে আমাদের নিত্যকার বৃত্তিতে যোগাযোগ হয় সবার সঙ্গে। সেই হোলো আমাদের অপর এক অস্তিত্ব।'

'ভগবানের যোগে আমরা মনস্বী, আর অপরের যোগে ধনস্বী—পরমার্থের সঙ্গে টাকাকড়ি—দুই মিলে জীবন্ত।' মা'র খোদাইয়ের ওপর আমার কিঞ্চিত খোদকারি।

'হ্যাঁ, তাই। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে আমাদের জীবনে বৃত্তটাই হল গিয়ে আসল। বৃত্ত নইলে অস্তিত্বই নেই। আবার সেই বৃত্তকে যদি মূল—এর সঙ্গে বিন্দুর সহিত যুক্ত করতে পারি, তাহ'লেই আমাদের অস্তিত্বের পূর্ণতা। বিন্দুবাসিনী আমাদের বৃত্তে এসেই নিত্য, নিত্যকালীন নৃত্যকালী, তাঁর সঙ্গে সংযোগেই আমাদের অস্তিত্ব। আমরা অ-মৃত।'

'হ্যাঁ, মা।' কিছু বুঝি কিছু বুঝি না, মা'র কথায় সায় দিয়ে যাই।

'একেই বলে আবৃত্তি। এই আবৃত্তিই হোলো গে...'

'কী করে হোলো, বুঝিয়ে দাও।'

'অ হোলো গে ঈশ্বর, অ-র সঙ্গে আরেক অ-কার যোগ হলে হয় আ। স্বরসন্ধিতে [illegible]। এই দ্বিতীয় অ-কার হোলো তাঁর অনুরূপ। তুই, আমি, আমরা সবাই—পরস্পরের

যোগাযোগে আমাদের আকারলাভ !...তারপর বৃত্তপথে এসে, নিজ নিজ বৃত্তির পথে আবৃত্তি হচ্ছে আমাদের। তাঁরও, আমাদেরও। তাঁকে নিয়ে আমরা পুনরাবৃত্ত, এবং আমাদের নিয়ে তাঁর পুনরাবৃত্তি। পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি—অনন্তকাল ধরে চলেছে এই খেলা।'

মা অনায়াসে কত সহজে সেদিন বুঝিয়েছিলেন যে! 'এতদিন বাদে আজ আমার ভাষায় তার আভাসেও পৌঁছতে পারব কি। মোটামুটি যা বুঝেছিলাম, এইভাবে বিন্দুমাত্র-তিনি বৃত্তপথে এসে ব্যক্ত হচ্ছেন—আমাদের মনোবৃত্তে প্রাণবৃত্তে, আমাদের ব্যক্তিত্বে। দেহবৃত্তে স্নেহবৃত্তে আদান-প্রদানের রূপ ধরে জীবনের নানান বৃত্তিতে। এই আমাদের জীবনবৃত্তান্ত। মূলে তিনিই ফুলে ফুলে ফুটছেন, ফল হয়ে ফলছেন—তাঁকে পাট্টায় বসিয়েই পাটোয়ার আমাদের ফলাও কারবার। মৌলিক তিনিই নিজের অনুকরণ করছেন আমাদের মধ্যে—নব নব রূপে—নিত্য নব হয়ে। নিতুই নব চিরকালের রূপকথাই এই।

'তাকে কেন্দ্র করেই বৃত্তাকারে ঘুরছি আমরা, ঘুরব আমরা-এই আবৃত্তিই হচ্ছে শাস্ত্রটাস্ত্র পড়ার চেয়ে বেশি—'মা পাড়েন : 'এই আবৃত্তিই তোর সর্বশাস্ত্রানাম্ বোধদপি গরিয়সী—বুঝেছিস এইবার?'

'হ্যাঁ মা।' মা'র বোঝানো কেমন অবলীলায় মনের মধ্যে মিলিয়ে যায়! পান্ডিত্যের বোঝার মতন মাথার ওপর বোঝাই হয়ে চেপে বসে না। ভারালো হয়ে ভারিক্কী করে তোলে না।

'আর আমাদের ঠাকুর হচ্ছেন তার প্রমাণ। মা কালীর নিরক্ষর পুরুৎ ছিলেন তো তিনি। পূজা আরতি করতেন মা'র। আর আরতি মানেও আবৃত্তি। তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকা, শুধু তাঁকেই প্রদক্ষিণ করা ঘুরে ঘুরে। সমস্ত শাস্ত্রের পার পেয়েছিলেন তিনি ঐ করেই। মা'র কাছেই—নিজের মনের মধ্যে। পরে অবশ্যি তিনি পন্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় জেনেছিলেন, মা তাকে যা যা জানিয়েছেন শাস্ত্রবাণীর সঙ্গে তা সব মিলে যায় ঠিক ঠিক। তাই না?'

'হ্যাঁ মা।'

'মা-ই নিজে জানিয়ে দেন, তা নইলে কি আমরা জানতে পারি? তিনিই প্রথমে চিনিয়ে দেন নিজেকে-তারপরে সারা জীবন ধরে চিনতে হয়, জানতে হয় আবার আমাদের—বাজিয়ে নিতে হয় বাস্তু বাদ যা নাকি তিনি জানিয়েছেন। পদে পদে হাতে হাতে পাই যখন—তখন তখনই টের পাই, ফের বুঝতে পারি আমরা। এমন কি দেবতাদেরও তাঁকে জানাতে হয়েছিল এই করে—চেনাতে হয়েছিল নিজের থেকে। কথাটা বেদে আছে।'

'বেদে আছে? দেবতাদেরও চেনাতে হয়েছিল?'

'দেবতারাও কি তাঁর দেখা পায়? চিনতে পারে তাঁকে? তিনি নিজে না দেখালে না চিনিয়ে দিলে? এইজন্যেই দেবতাদের কাছে তাঁকে দেখা দিতে হয়েছিল। দেবতাদের সামনে দিব্য জ্যোতিরূপে একদিন আকাশে তিনি আবির্ভূত হলেন। দেবতারা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, ঐ জ্যোতিস্বরূপা কে উনি? 'উমা হৈমবতী' আকাশবাণীতে তিনি বলে দিলেন তখন তাদের। আর তাদের পথের সামনে যে তৃণখন্ড পড়েছিল, বললেন, ওটাকে দু'খানা করো দেখি। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সবাই মিলে হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করেও সেই একটা কুটোকে দুটো করতে পারলেন না। এমন কি, নাড়াতে পারলেন না একটুও। অমন প্রবলপ্রতাপ যে বায়ু—যার দাপটে কিনা বিশ্বব্রহ্মান্ড কাঁপে—সেও সেটাকে একটুখানিও

সরাতে পারল না। মা তখন জানালেন, আমিই সেই শক্তি, যার জোরে তোমরা নড়াচড়া করছ, নাড়াচাড়া করছ, নড়ছ চড়ছ।... চণ্ডীতেও ঐ কথা আছে, প্রথমে উনি ওদের দেখা দিলেন, দিয়ে বললেন, ডাকো আমায়। আমার কাছে চাও। আমিই দেবো তোমাদের, আমিই দিতে পারি। বাঁচাতে পারি তোমাদের। যখন যখনই আমায় ডাকবে আমি দেখা দেবো, আপদে বিপদে সব সময় রক্ষা করব তোমাদের। করেছিলেনও রক্ষা-চণ্ডীতে আছে পড়ে দেখিস। আমার শিয়রের কাছেই তো থাকে বইটা, মাথার বালিসের পাশেই। দেখিসনি ? সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু মানে করে দেওয়া রয়েছে বাংলায়। পড়লেই বুঝবি। পড়বি, বুঝলি।'

'বাবার গীতার মতন দেখতে, ওই চটি বইটা তো ? দেখেছি। পড়বো মা।'

'দেবতা কি ছাড়, স্বয়ং শিবের কাছেও নিজের স্বরূপ প্রকাশ করতে হয়েছিল তাঁর। তবেই না শিব চিনতে পারলেন তাঁকে ঠিক ঠিক। দশ মহাবিদ্যারূপে দেখা দিয়েছিলেন না তিনি একবার ?'

'হ্যাঁ, পড়েছি অন্নদামঙ্গলে।'

'কী পড়েছিস ? শিব নিঃস্ব হ'য়ে ভিখারীর ন্যায় অন্নভিক্ষায় বিশ্বময় ঘুরেছিলেন, কোথাও খুদকুঁড়োটাও জোটেনি, এমন কি মা লক্ষীর কাছেও না—শেষটায় অন্নপূর্ণার কাছে গিয়েই তিনি তাঁকেও চিনলেন, আর অন্নও পেলেন নিজের। পরমান্ন, যা নাকি অমৃতই।'

'হ্যাঁ মা।'

'মা তাঁকে নিজেকেও চেনালেন,পরমান্ন কী, কোথায় মেলে তাও বুঝিয়ে দিলেন তিনিই।' মা বলেন—'প্রথমে মা-ই মিলিয়ে দেন, তারপর সেই সত্য টের পাবার পরে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়-চেয়ে চেয়ে নিতে হয় বারবার—বরাবর—জীবনভোর।'

মিলিয়ে দেখি মনের মধ্যে, হ্যাঁ, মা'র কথাটা ঠিকই। অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। পরমান্ন যে কী, আমার অন্নপূর্ণাও নিজের থেকে চিনিয়ে দিয়েছিল আমায়। তার সম্মুখেই পেলাম প্রথম। তারপর আমাকে চেয়ে চেয়ে নিতে হয়েছে। খেয়ে খেয়ে পেতে হয়েছে। পেয়ে পেয়ে খেতে হয়েছে। বারবার। সত্যি। সত্যিই সত্যি!

সত্য কথাটার তত্ত্বালোচনায় মজে মনে মনে মশগুল হচ্ছি, মাঝখান থেকে সত্য এসে অন্য কথা পাড়ে। কালকের মতই জানান দিয়ে তার হানাদারি।

'কী রে দাদা! যাবিনে তুই ?'

'কোথায় যাব রে ?'

'বাঃ, সতীশদারা আজ চলে যাচ্ছে না ? ইস্কুল থেকে সভা করে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হচ্ছে সবাইকে। সব ছেলে যাচ্ছে, তুই যাবিনে ?'

'যাব না কী রে! বুঝি বা জন্মের মতন চলে যাচ্ছে তারা। আবার ফিরে আসবে কিনা কে জানে! দাঁড়া।'... শার্টটা আমার গায়ে চড়াই।

যাবার মুখে সাড়া পাওয়া যায় বাবার। —'সেদিনকার সভায় তো পড়িসনি। বলে দিলাম তোকে অতো করে আমি। আজকের সভাটায় মনে করে পড়িস যেন। হেমচন্দ্রের সেই অমর কাব্য এরকম ক্ষেত্রেই পড়বার বস্তু—বুঝলি ? আবৃত্তি করিস আজ, কেমন ?

করবি তো ?' বলে বাবা নিজেই আওড়াতে শুরু করেন—

'বাজ্ ওরে শিঙ্গা বাজ্ ঘোর রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ;
চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান...
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, ভারত শুধুই...'

'জানি বাবা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ফাঁক পেলেই শিঙ্গাটা আমি বাজিয়ে দেবো আজকে।' আমি ভরসা দিই।

'সেদিন বাজাতে কী হয়েছিল তোর ? ফাঁক খুঁজে নিতে হয়। সুযোগ কি আর আপনার থেকে আসে রে ? সেটা সৃষ্টি করবার।'

'সেদিন আর শিঙ্গা ফুঁকবার সময় পেলাম কোথায় বাবা। তার আগেই না সমস্ত কিছু গড়বড় হয়ে প্ল্যান ভেস্তে গেল আমাদের ?'

॥ পঁচিশ ॥

স্কাউটের পোশাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল যে সতীশকে। সুগঠিত সুঠাম শরীরে মিলিটারি ড্রেসে সে যেন এক লহমায় যৌবনে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাদের সবাইকেই চমৎকার মানিয়েছিল, কী বলব !

'তোকে সেই মেজর জেনারেলের মতই মনে হচ্ছে মাইরি !' বললাম আমি সতীশকে। গদ্‌গদ গলায়।

সতীশ গর্বিত হাসি হাসল একটুখানি।

'কী করব ভাই ! নিলই না যে আমায়। আমার মতন কাউকেই নিল না তো। জেনার‍্যালি মাইনরদের নেয় না যে। মেজর জেনারেল হতে পারলাম না তাই।'

সতীশ আর আমায়—দুজনকেই বুঝি আমি সান্ত্বনা দিতে চাই।

'শরীরটা তৈরি করে নে এর ভেতরে, তাহলেই হবি। যুদ্ধ কিছু এর মধ্যেই ফুরোচ্ছে না। যুদ্ধ আছে আরো। চিরকাল ধরে যুদ্ধ। ঢের চানস্ আসবে।'

'তোদের লীডার ভারী রাগ করছে, নয় রে ? কী করতে কী হয়ে গেল যে। সত্যি ! কিন্তু ভাই, আমার কোনো দোষ নেই, আমি তো মারবার জন্যে তৈরি হয়েছিলাম, এমন কি মারা যাবার জন্যেও, কিন্তু কপাল মন্দ, করব কী ! রাগ করছে খুব আমাদের ওপর, তাই না ?'

'না না, রাগ করবে কেন ? খুশিই হয়েছে বরং। আমি যুদ্ধে যাবার এই সুযোগটা পেলাম বলেই। এতে আমাদের কাজের সুবিধেই হবে আরো। সেখানে গিয়ে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে আমি রিক্রুট করতে পারব—এনতার আসবে আমাদের এই বিপ্লবী দলে। আমাদের কাজের আরো সুসার হবে তাতে। সেই ভারই দিয়েছেন তিনি আমাদের ওপর।'

'ভালোই হয়ে গেছে তাহলে, কী বলিস ? এই জন্যেই বুঝি বলে থাকে—ভগবান যা করেন সব ভালোর জন্যেই—না রে ?'

'হ্যাঁ রে। এখন যদি সত্যিই আমি মেজর জেনারেল হয়ে ফিরতে পারি তবেই না। ফিরে এসে ফোর্ট উইলিয়মের ভেতরে থাকব তখন, আমার দলবল নিয়ে। ভেতর থেকে, ভেতরে থেকে একদিন দখল করে নেব ফোর্ট। তারপর কেল্লার যত ফৌজ স্বদলে পেলে, আর কামান বন্দুক তামাম হাতে এলে ইংরেজ তাড়াতে কতক্ষণ লাগে রে!'

'পারবি পারবি। নিশ্চয় পারবি। সেইজন্যেই তোর জন্ম হয়েছে, বুঝতে পারছি আমি। নইলে এমন যোগাযোগ হয় কখনো? বল তুই?'

গলার মালা দুলিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে মার্চ করে চলে গেল সব্বাই। আমি ফিরে এসে মা'র কাছটিতে বসলাম আবার।

'আচ্ছা মা, যুদ্ধবৃত্তিটা কি খুব খারাপ?'

'না, খারাপ কিসের! যার ওদিকে ঝোঁক আছে তার পক্ষে ভালোই তো। ন্যায়যুদ্ধ তো ভালোই রে! কেন, তোর বুঝি ভারী খারাপ লাগছে যুদ্ধে যেতে পারলিনে বলে?'

'না, না। তা নয়। যুদ্ধ-টুদ্ধ আমার মোটেই ভালো লাগে না। মানুষরা কি মারবার? মানুষ তো ভালোবাসার জিনিস মা!'

'তাই নাকি রে! তুই বুঝি মানুষকে খুব ভালোবাসিস?'

'ঠিক তা নয়। সব মানুষকে না, তবে তার ভেতরে বেছে বেছে দু'চারজনকে তো ভালোই লাগে বেশ। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না তাদের?'

'মহাপুরুষদের বুঝি? যেমন অশ্বিনী দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বোস, এঁদের মত? নাকি ওই রবিঠাকুর, পরমহংসদেব...'

'না না, ওদের কাউকেই না। অত বড়োকে কি ভালোবাসা যায় কখনো? এই ছোট ছোট মানুষদের-মাথায় যারা আমার বড় নয়, আমার মতই...আমার মনের মতন যারা।... আচ্ছা মা, ভালোবাসাবাসিটা কি কারো বৃত্তি হতে পারে না?'

'বৃত্তিই তো। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই রে। তবে বৃত্তি বলতে যা বোঝায় তা নয় ঠিক। ওটা তো হৃদয়গত ব্যাপার। বৃত্তি হচ্ছে কর্মগত। তুই যা কাজ করবি—যে কাজটা বেছে নিবি তোর জীবনে, সেইটাই হবে গিয়ে তোর বৃত্তি। বুঝেছিস এবার?'

'তা তো বুঝেছি। কিন্তু কোন্ কাজটা যে আমি বেছে নেব তাই তো আমি ভেবে পাচ্ছি না। কী যে আমার বাঞ্ছনীয়!'

'যেদিকে তোর মন যায়, যে কাজটা তোর মনের মতন কাজ। সেই কাজই হচ্ছে তোর আসল কাজ। তাই করবি তুই। তাই হবে গিয়ে তোর আসল বৃত্তি।'

'সেটা আমি টের পাব কি করে মা? সেই কাজটা?'

'মা-ই বুঝিয়ে দেবে, জানিয়ে দেবে—সে কাজে তোর মন সাড়া দেবে, মা'র সাড়াও পাবি। নিয়তিই পাইয়ে দেবে তোকে। যথাসময়ে পেয়ে যাবি-ভাবিসনে। মা'র কাছে চাইলেই পাবি, বলেছি তো তোকে। মাকে ধরতে পারছিসনে? মাকে পেলেই সব পাওয়া যায়। মিলে যায় সব কিছুই।'

'মাকে আমায় পেতে হবে না মা। কষ্ট করে পাকড়াতে হবে না তাকে, তুমিই বলেছ তো। মা-ই তো ধরে রয়েছে আমাদের সবাইকে? তাই না? মূলধন তো আমার হাতের

মুঠোয়, কিংবা সেই কেন্দ্রমূলের মুঠোর মধ্যেই আমরা। সেজন্যে আমি ভাবিনে। আমি মাথা ঘামাচ্ছি আমার বৃত্তিটা কী হতে পারে তাই নিয়ে। আমার বৃত্তিটা কী হবে, বলো না তুমি আমায়।'

'প্রবৃত্ত হলেই দেখতে পাবি। বুঝতে পারবি তখন।'

'কিসে প্রবৃত্ত হবো তাই যে আমি জানিনে ছাই।

'কাজেই প্রবৃত্ত হবি, আবার কীসে?' মা বলেন, 'যে কোনো কাজে। মনের মত কাজ হলে তো কথাই নেই, যদি কাজের মত মন হয় তাহলেও হবে। মা তো সব কিছুর কেন্দ্রেই রয়েছেন, মনের মূলেও সেই তিনিই—তুই মন দিয়ে তোর কাজ করলেই তাঁর সঙ্গে তোর যোগাযোগ হয়ে যাবে, সহজেই হবে স্বভাবতই-সেটা তোর জান্তেই হোক, অজান্তেই হোক। তখন দেখতে পাবি তোর ভেতর থেকে আরেকজন কে যেন তোর কাজে এসে হাত লাগিয়েছে, সব কাজ করে দিচ্ছে তোর, কাজটা হয়ে যাচ্ছে অবলীলায়, তখনই তুই বুঝবি। এ আর কারো কর্ম নয়, মা'রই কাজ।'

'যে কোনো কাজ?'

'হ্যাঁ, যে কোনো কাজ। কাজটা বড় কথা নয়, কাজের ভেতর ভগবানের দেখা পাওয়াটাই আসল। তিনিও যে তোর কাজে তোর সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন, হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে, হাতে হাতে তার প্রমাণ পাবি, তুই চলেছিস আর তোর সঙ্গে তিনিও চলেছেন সাথে সাথে, পদে পদে টের পাচ্ছিস সেটা—মুহূর্তে মুহূর্তে তার পরিচয় পাবার জন্যই তো আমাদের জন্মানো, এই বেঁচে থাকা, আমার আমি হয়ে ওঠা—সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। এই পুনঃ পুনরাবৃত্তি। জন্মে জন্মে এই অমৃতমশুতে। এই অমরত্ব।'

'আমি কাজে লাগলেই আরেকজন অলক্ষ্যে আমার কাজে এসে হাত লাগাবে, বলছো তুমি?' আমি কই, 'সমক্ষে সেই প্রমাণ পাবো?'

'পাবি বইকি। ভেতর থেকে তিনি তো আসবেনই, বাহির থেকেও আসবে কতজনা তোর সাহায্যে এগিয়ে—তাদের মধ্যেও সেই তিনিই। বিরাট কর্মীদের বড় বড় কাজ সব এই করেই তো হয়েছে রে।'

'আমি বাইরের লোকদের কথা ভাবছি না মা, আসুক না আসুক, বয়েই গেল আমার। আমি ভাবছি ভেতরের...'

'নিশ্চয়। ঠাকুর কি তবে মিছে কথা কয়েছেন নাকি? বলেননি যে, একজন ধান মাপতে বসলে আরেকজন তার পাশে বসে ধানের রাশ ঠেলে দিতে থাকে—বলেননি তিনি?

'হ্যাঁ, বলেছেন তো। তুমি বলছ এই রাশলীলা সেই ভগবানের?'

'বলছি কি তবে? রামপ্রসাদ যখন নিজের ঘরের বেড়া বাঁধতে লাগলেন তখন ভেতর থেকে তাঁর হাতের কাছে দড়ি যুগিয়ে দিচ্ছিল কে? তিনি কাজটায় লাগলেন বলেই না ভেতরের যোগান পেলেন? এই যোগানদারিটা কার? আবার তিনি যখন নিজের গান বাঁধতে বসলেন তখন সেই গানের বাঁধুনিও কে তাঁকে যোগালো বল্ দেখি?... ঠাকুর কি কখনো মিছে কথা ক'ন?

'আবার রবিঠাকুরের বেলাতেও এরকমটা ঘটেছিল মা। রিনি সেদিন একটা গান গাইছিল, শান্তিনিকেতনে শেখা...শুনবে? তার মতন অমন মিষ্টি সুর বার করতে পারব না আমি. তবে কথাগুলো কোনোরকমে ছন্দ করে বলতে পারি—

আমার এ গানের তরী ভাসিয়েছিলাম/চোখের জলে
সহসা কে/এলে গো/কে এলে গো/সে তরী বাহিবে বলে...

রিনি গাইছিল তাই আমার মিষ্টি লাগছিল, কিন্তু গানটার মানে আমি একদম বুঝতে পারিনি, তোমার কথায় বুঝতে পারছি এখন।'

'সেই একই মানে। কবি যখনই না সুরধুনীর স্রোতে নিজের নৌকো ভাসিয়েছেন, দেখেছেন যে, আরেকজন এসে তাঁর পাশে বসে দাঁড় বেয়ে চলেছে তাঁর সঙ্গে। গীত রচনাই ছিল তাঁর বৃত্তিতে, নিজের বৃত্তিতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন বলেই না ... গানের পথে পা বাড়াতেই সঙ্গীতের সঙ্গী এসে হাত মেলালেন তাঁর সঙ্গে ...এত সুর, এই অফুরন্ত গান কি একজনের কাজ!' বলে মা গুনগুন করে সুর ধরলেন তারপর...'পথিক, তুমি পান্থজনের সখা হে,/পথে চলা, সেই তো তোমার পাওয়া/যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে/তারই কণ্ঠে তোমারই গান গাওয়া...!'

'তাঁর গানে সেই একই কথা মা এখানেও।' আমি সায় দিলাম মা'র কথায়। সত্যি মা, এত গান, এত রকমের গান কখনই একজনের সৃষ্টি নয় সত্যি। এত কাজ একজনের পক্ষে সম্ভব হয় না।'

'একজনের জন্যে কি হয় কিছু কখনো? 'গাহিতে হবে দুইজনে।' পরাবিদ্যায় গায়ক গাইছেন পরমাত্মার সঙ্গে। আর অপর বিদ্যমানতায় এক শ্রোতার জন্য—তার সঙ্গেই। তাকেই বলে গানের সঙ্গত।'

'নইলে গান গাওয়াটাই অসঙ্গত। তাই না মা?' বলে আমি মা'র উল্লেখিত কবিতাংশটা আউড়ে নিজের স্মৃতিশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাই-'কেবল গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে/একজন গাবে ছাড়িয়া গলা আরেকজন গাবে মনে॥'

'হ্যাঁ। তেমনি তুই যদি কখনো কবি হোস...কবি হতে চাস নাকি তুই? তাহলে তোর বেলাও এমনটা ঘটবে দেখবি। রবিবাবুর মতন অত বড় অঘটন হয়ত ঘটবে না, শতদল পদ্ম যেমন তার একশ দলে বিকশিত হয়ে ওঠে তা হয়তো হবে না তোর বেলায় আমার মনে হয় এটা। যার যেমন আধার। না হোক, দু'চার দলের ফুলের মতন ফুটতে পারবি তো তুই—তাতেই তুই সম্পূর্ণ হবি, সার্থক হবি।'

'হলে তো মা!' মা'র কথার পিঠে আমি দীর্ঘনিশ্বাস পাড়ি —'হওয়াই যাচ্ছে না যে!'

'হবেই। না হয়ে যায়?' ঠিক প্রবৃত্তিটির বৃত্তে তুই এক-পা এগুলেই দেখবি, মা দু'পা এগিয়ে এসেছেন, সাথী হয়েছেন তোর পথযাত্রায়, তুই দু'হাত বাড়ালেই মা দশ হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন তোকে। দেখবি তুই।'

'কবিতা লেখা, গল্প লেখা কি কারো বৃত্তি হতে পারে মা?' আমি শুধাই।

'কেন হবে না? যেখানে পরাবিদ্যায় আর অপরাবিদ্যায় মিলেছে, মাকে ডাক দিয়ে পাচ্ছিস, মা'র কাছ থেকে আসছে, আর অপরের যোগে প্রকাশিত হচ্ছিস—ডাকিনী আর যোগিনী, মা'র দুই সখি এসে মিলেছেন যেখানে, সেখানেই আমাদের বৃত্তি, সেই আ...দের বৃত্তপথ—সেইখানেই আমরা প্রবৃত্ত। যেখানে যেখানে এমনটা হয় মা'র সেখানে এই ছিন্নমস্তারূপ—নিজের কণ্ঠের রুধির ধারা নিজে পান করছেন, পান করাচ্ছেন তাঁর ডাকিনী যোগিনীদের।...সেই ত্রিবৃত্ত এসে মিলেছে যে পথে—সেইখানেই। কোথায় কোথায় এমনটা হয় রে?'

'কোথায় হয় কে জানে। তুমিই জানো আর মা-ই জানেন।'

'সঙ্গীতে হয়, সেখানে মা নিজের সুর নিজে শোনেন, যে সেই সুরঙ্গমাকে ডাকে, ডেকে আপন গলায় আনে—সেও শুনতে পায়, আর পায় বিশ্বজন সবাই—তার শ্রোতারা-সেই সুরধুনীতে স্নান করে ধন্য হয় যারা। ডাকিনী আর যোগিনী হল না?' মা একটুখানি থামেন : 'লেখাটেখার বেলাতেও তো তাই হয়ে থাকে, তাই না?'

'আবার ভালোবাসার বেলাতেও বোধ হয় তাই মা।' ভাবলে, প্রায় সঙ্গীতের মতই সপ্তরাগ সমন্বিত সেটাও। কিন্তু সঙ্গদোষে দুষ্ট সেই পঞ্চম ম—কার মা'র সম্মুখে উচ্চারণ করতে বাধে আমার। একটু ঘুরিয়েই বলি—'তাতেও মা একজন ডাক দেয়, আরেকজনা যোগ দেয়, আর মা তাদের মাঝখানে থেকে মিলিয়ে দেন দু'জনাকে। প্রায় তাই হল না মা?' আমার পুনশ্চ যোগ হয়—'মা-ও তো সেই ভালোবাসার ভাগ পান, পান নাকি?'

'মাকে ভাগ দিয়ে পেলেই, মাতৃভাগ্যে এলেই তো সার্থক হয়, সম্পূর্ণ হয় সেই ভালোবাসা।' মা ক'ন, 'মা'র প্রসাদ পেলেই তো স্বাদ মেলে, সাধ মেটে।'

তবে তুমি যে বলছ মা, ভালোবাসা কোনো বৃত্তি হতে পারে না—বৃত্ত হতে পারলেও। ওটা আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিই নাকি—নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতই। তাই তুমি বলছ তো? তোমার মতে কর্ম না হলে কোনো বৃত্তি হবে না, কিন্তু ভালোবাসা তো কর্ম হতে পারে না—কর্মই নয়...। বলে আমার স্বগতোক্তি শুনি এবং কর্ম হলেও তো ঈষৎ কর্ম। সৎ কর্ম কিনা কে জানে! আর তা যদি কোনো বিদ্যাই হয়, সুন্দর বিদ্যাই। (ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আমার মনে পড়ে যায়।) আর বৃত্তি হলে তো আনন্দবৃত্তি। কিন্তু কর্ম? কর্ম বলতে যা বোঝায়, এক সঙ্গে হাত পা মাথা খাটিয়ে ডাকিনী-যোগিনীর সহায়তায় রুধির উপায়—রুধির বলতে টাকাকড়িও বোঝায় নাকি আবার—মা-ই একবার বলেছিলেন আমায়—একাধারে নেশা আর পেশা সেই ভালোবাসা তা নয় তো! কাউকে ভালোবেসে কি টাকা উপায় করা যায় কখনো? গেলেও সেটা সদুপায় বলে গণ্য হয় না নিশ্চয়, নিতান্তই তা গণিকাবৃত্তি বটে। মনে মনে মাথা ঘামিয়ে এই সব আলোচনার পর নিজের মুখপটে প্রকট হই—'কিন্তু তোমার ওই লেখা-টেখাটা বৃত্তি হবে কি করে বলো? সে কর্মে তো টাকা উপায় করা যায় না মোটেই?'

কে বললে যায় না? তবে তেমনটা হয় না হয়ত। কিন্তু জীবনের সব দুঃখ দূর হয় না বোধ হয়—কিন্তু জীবনে তো দুঃখ রয়েছেই, বড়লোকেরও আছে, গরীবদেরও আছে তবে যারা শিল্পকলা নিয়ে থাকে, আপন ছন্দে চলে, একরকমের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য তারা পায় বইকি—সেটা কি কিছু কম?'

'না, সেটা ছন্দ নয়।' আমি ঘাড় নাড়ি - 'আর চারুদা তো লিখেটিখেই সংসার চালায়। চালায় না মা?'

'চালায় বই কি! লেখাটাই যদি তোর পেশা করিস তো মাকে স্মরণ করে লিখতে বসলেই...।'

'মনটা গোড়ায় মাকে দিয়ে তারপর তো লেখায় দিতে হবে মা? গোড়ার থেকেই তো আগাতে হয় আমাদের।

'হ্যাঁ, তাহলেই দেখবি তোর লেখাটেখা কেমন আপনার থেকেই হয়ে যাচ্ছে যেন। নিজের বেগে বয়ে চলেছে। কোত্থেকে সব কথা আসছে যে! লাইনকে লাইন কে যেন লিখে

দিচ্ছে তোর হয়ে....কত আইডিয়াই যে আসছে তোর মাথার থেকে, ভেবেই পাবিনে। তর তর করে লিখে যাবি তুই।'

'তাই নাকি মা ?'

'তবে ওই যে বললি, গোড়ার থেকে আগাতে হয় - উল্টোপাল্টা কথা কইলেও কথাগুলো তোর আলতুফালতু না—একেক সময় তার একটা মানে হয় বেশ। কিন্তু আমার ভয়ও হয় সেই সঙ্গে আবার।'

'কিসের ভয় মা ?'

'তুই যেরকম শব্দের মোহে পড়েছিস না ? তার থেকে, ভয় করে এর পরে হয়তো তুই অর্থের মোহে পড়বি নির্ঘাত—। টাকাকড়ির লালসায় ছুটবি। শব্দ থেকে আর এক পা এগুলেই তো অর্থ। অর্থের জন্য আরেক ধাপ এগুলেই অনর্থ। অনর্থে না পড়ে যাস তুই শেষটায়—সেই ভয়। তবে ভরসা এই, মা-ই তোকে সব অনর্থ থেকে সব সময় সামলে রাখবেন—বাঁচাবেন তোকে সব সময়।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' আমিও মাকে ভরসা দিই : 'এখন তুমি গোড়াতেই যে কথাটা বলছিলে না....' বলে অন্য কথায় গড়িয়ে যাই। শুধুই যে শব্দের মোহে পড়িনি, শব্দের মতন রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব কিছুর মহিমাতেই আমি কাতর, তার দৃষ্টান্ত মা'র কাছে তুলে ধরিনে আর।

'গোড়ার কথা হচ্ছে মা—ই। সব্বের গোড়ায়—সব কিছুর গোড়াতেই। মা'র গুঁড়ি ধরেই উঠতে হবে আমাদের।'

'গোড়াগুড়িই মা ? আগাতেও সেই মা-ই আবার ?' আমার বাগাড়ম্বর—'মা আমার ফলেও আছেন ফুলেও রয়েছেন!'

'হ্যাঁ, মা'র বোধন করেই আমাদের সব কাজের উদ্বোধন। মাকে ডাকার সাথে সাথেই মা'র সাড়া পাওয়া যায়—মাতৃসম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই তোর বোধোদয়—বুঝেছিস ? সম্বোধনে কী হয় ? প্রথমা। প্রথমা-ই তো ? পড়িসনি তোর উপক্রমণিকায় ? সব কাজের উপক্রমেই তাই। মা-ই। তিনিই তো এই বিশ্বের আদ্যাশক্তি—প্রথমতমা—তাই প্রথমা। তাই উপক্রমণিকার সম্বোধনেও স্বয়ং তিনিই। আর, সম্বোধনের সাথে সাথেই তাঁর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ স্থাপিত। সম্বন্ধে ষষ্ঠী। আর তার পরেই কিনা পরস্পরের প্রতি অধিকারবোধ জাগ্রত—মা'র তোকে আর তোর মাকে অধিকরণ। অধিকরণে সপ্তমী। আর তার পরেকার ব্যাপার হল গিয়ে তোদের দু'জনের সন্ধি—তুই তাঁর বাহন সিংহ হলেও—কি, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অসুর হলেও—সেই অষ্টমীতে।'

'তারপর ?' আমার প্রশ্ন।—'সন্ধিপূজার পর ?'

'তারপরই নবমী। তোর নবীকরণ—নবরূপান্তর। আর সবশেষে তোদের নিরঞ্জন—মা'র মধ্যে তোর আর তোর মধ্যে মা'র। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তের মাতৃপূজার এই-ই নির্ঘণ্ট।'

'ওব্‌বাবা কটমট ওই ব্যাকরণের মধ্যেও আবার সেই ভগবান ?' আমি হাঁ হয়ে যাই।—'সেটাও তোমার গিয়ে দর্শন শাস্ত্র ?'

'আমাদের সব কিছুই দর্শনভিত্তিক। আমাদের সঙ্গীত, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ—সব। আর দর্শন মাত্রেই ভগবদ্দর্শন। ভগবানকে দেখা—তাঁর মূলে এবং তাঁর মায়ায়—তস্মিন দৃষ্টে প রূপরে—সেই পরে তাঁতেই—আর এই অপরে—আর সবকিছুতে। কথাটা পরাবরেও

হয় মতান্তরে—এখানে পর হলো তিনি আর আবর হচ্ছে তাঁর মায়া—এই বিশ্বসৃষ্টির আবরণ। এই উভয়ের মধ্যেই, সর্বত্র, সব ক্ষেত্রে তাঁকে দেখাটাই হচ্ছে সত্যিকারের দেখা। এবং সেই কথাটাই আমাদের সব শাস্ত্রে, সব মহাকাব্যে। এবার যা বলছিলাম...!' মা আবার তাঁর গোড়ার কথায় আগান ; তত্ত্বব্যাখ্যার পর মা'র দৃষ্টান্তের আখ্যান : 'মহাকবি কালিদাসও তাঁর কাব্য রচনার আদিতে পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করেছিলেন...'

'জানি। বাবাকে আওড়াতে শুনেছি তো।' মা'র উদাহরণে আমার উদ্ধৃতিযোগ : 'বাগর্থ যত্র সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে/জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।' বাবার মুখে বার বার শোনা কালিদাসের পদটা আওড়াই—'বুঝেছি মা। কালিদাসের—পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলতে হবে আমাকে। কোনোকালে কালিদাস হতে পারি আর নাই পারি।'

'হ্যাঁ, আর তাহলেই দেখবি কৃত্তিবাসের উঞ্ছবৃত্তি করতে হবে না তোকে আর। কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ/সপ্ত কাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ ॥ ভাঙিয়ে তোর ওই—শিবরাম পণ্ডিত এক বিচক্ষণ কবি/সাত কাণ্ডে গাহিলেন রামায়ণ সবি ॥ এইসব ভ্যাজাল আমদানি করতে হবে না আর। তুই নিজেই এক কাণ্ড করে বসবি তখন, যদি সেই কল্পতরুর তলায় গিয়ে হাত পাতিস কেবল। ফল পড়বে টুপটাপ, দেখবি। বলেছেন না ঠাকুর—কালী কল্পতরু—মূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি। বলেননি তিনি ?'

'বলেছেন তো! আচ্ছা ওই চারি ফলটা কী মা ? কোনো খাবার জিনিস ?'

'চারি ফল হচ্ছে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ। জানিসনে ?'

'এর মধ্যে তোমার প্রথম আর শেষটা আমার চাইনে। ধর্মের আমি ধার ধারিনে, আর মোক্ষ ? মোক্ষে আমার দারুণ অনীহা।'

'অনীহা—মানে ?' মা সচকিতই।

'জানি না আমি ঠিক। ভারী ভারী প্রবন্ধে থাকে, দেখা যায়। কী মানে কে জানে, কথাটা বেশ কিছু। আমার রচনার খাতায় ফাঁক পেলেই লাগিয়ে দিই যেখানে সেখানে—তোমার সেই পিতাঠাকুরের মতই। বাংলার মাস্টারও বুঝতে পারেন না, হকচকিয়ে যান, তাজ্জব হয়ে থাকেন।' আমি জানাই : 'তবে আমার ধারণা, ওর মানে হয়ত হবে, অনীহা, কিনা, না ইহা—এটা নয়। বাবার ঐ নেতিবাদের মতই কিছু একটা হবে বোধ হয়।'

'ধর্মই তো আসল জিনিস রে। ধর্ম কি ফ্যালনা নাকি ? ধর্ম ছাড়া কি একদণ্ডও কেউ বাঁচতে পারে ?'

'ধর্ম-টর্ম আমার ভাল লাগে না।' আমি বলি, 'ধর্মটা কী মা ?'

'কর্মই হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম কর্ম বলে না রে ? যে-কর্ম তুই ধরে থাকিস আর যে-কর্ম তোকে ধরে রাখে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম সবার—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভগবানের সঙ্গে আর জীবৎকর্মে যে একান্ত ব্যক্তিগত যোগাযোগ তাই হচ্ছে তোর ধর্ম। তোর যেটা কর্ম তা যদি তুই সবটা মন দিয়ে সুচারুরূপে করতে পারিস তবে সেই করাটাই ধর্ম। ধর, তুই যদি লেখক হোস তো লেখাটাই হবে গিয়ে ধর্ম তোর। কর্মও আবার।'

'তাই বলো মা!' আমি হাঁফ ছাড়ি : 'বাঁচালে তুমি আমায়।'

'আর, মোক্ষ হলো গিয়ে,মন দিয়ে লিখতে বসলে যা তোর মনের ভেতর থেকে মুক্তি পাবে... লিখতেই বস বা কি কাউকে ভালোই বাস...তখন তোর অন্তর থেকে যা ক্ষরিত হবে—বিমুক্ত হয়ে আসবে, তাই হচ্ছে গিয়ে তোর মোক্ষ। মোক্ষ কিছু লাভ করার বস্তু

নয়—মুহুর্মুহু সেটা ঘটবার। সেই আত্মমোক্ষণে তোর সঙ্গে ভগবানেরও মুক্তিলাভ। ধর্ম হচ্ছে তোর—মাকে ধরে থাকা। আর মোক্ষ হচ্ছে ভগবানের—। মা-র। অহরহই সেটা হচ্ছে।'

'আচ্ছা, আমি যদি চাই তো তোমার ওই কল্পতরু কি গল্পতরু হয়ে ধরা দেবে আমার কাছে? আমি শুধাই,'এনতার গল্প পাবো তার কাছ থেকে—চারুদার মতই। কৃত্তিবাসের গাছতলায় গিয়ে কবিতার মিল কুড়োতে হবে না আমায়। মিলটিল সব সেখান থেকেই মিলবে। আমার কীর্তি ফলছে তোমার ওই গাছেই, বলছো তো তুমি?'

'চেয়েই দ্যাখ না। গাছ মাত্রই তো ফলেন পরিচীয়তে—এমনকি ঐ কল্পতরুও। বেয়ে চেয়ে দ্যাখগে... বাগর্থের মতই পরাবিদ্যা আর অপরাবিদ্যা যেখানে হরিহরাত্মা হয়ে মিলেছে, সেই কালী কল্পতরুর মূলেই পাবি তুই সব।'

'শিবও তো কল্পতরু মা? বাবা যে আওড়ান—প্রণমামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্...শিবও তো হতে পারে মা...?'

'শিব দুর্গা কি আলাদা রে? এক দেহেই তো অর্ধনারীশ্বর হরগৌরী হয়েছেন।...দুর্গা স্বয়ং শিবের কাছেও কল্পতরু আবার, তা জানিস? একবার অন্নপূর্ণা হয়ে-'

'জানি জানি। কিন্তু পরমান্ন আমার চাইনে এখন মা! আমি এখন গল্প পেতে চাই, কবিতা পেতে চাই ঝুড়ি ঝুড়ি।'

'সব পাবি। কবি তোর নিজেই বলে যাননি কি?—নূতন ছন্দে অন্ধের প্রায়/ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়/নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়/নূতন রাগিণী ভরে/যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা/যে ব্যথা বুঝিনে জাগে সেই ব্যথা/জানি না এনেছি কাহার বারতা/কারে শোনাবার তরে॥ ওগো রহস্যময়ি! আমি যে-কথাটি/কইতে চাইছি/কহিতে দিতেছ কই?/—পড়িসনি ছেলে-চারুর চয়নিকায়?

'পড়েছি তো। মানে বুঝেছিলাম, কিন্তু মর্ম বুঝিনি তখন।'

'এই রহস্যময়ীটি কে বল দেখি?'

'জানিনে বুঝি? মা-ই তো, আবার কে? তোমার মা আমার মা সবার মা।'

আমার কথায় হাসতে থাকেন মা-সেই হাসির আড়ালে সর্বময়ীকেই...সবার মা'র হাসিটি দেখা যায় না কি!

॥ ছাব্বিশ ॥

'আমাদের গতিবিধির বৃত্তান্ত শুনবেন তাহলে নিতান্তই?' জনাব সাহেবের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করে শুরু হয় আমার: 'কিন্তু শুনলে আপনি হতাশ হবেন, আমি বলছি। কেননা, মানুষের আশা কখনই পুরোপুরি মেটে না—যে গতিবিধি করে তারও যেমন নয়, যে তার ইতিবৃত্ত চায় তারও তেমনটা। তাছাড়া মানুষ স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত, জানেন তো? আর এই লেখক-শিল্পী গোত্রের কেবল দ্বিধা নয়, শতধাই বলা যায়। দেহ মন নিয়ে শতদিকে সতত তাঁরা ধাবমান—কে তার সন্ধান রাখে, কেই বা কাকে তা দিতে পারে! তাহলেও শুনুন, গোড়াতেই বলে রাখছি কিন্তু...গতিবিধি বলতে যা বোঝায় তা ঠিক হয়ত হবে না। বিধিমত গতি তাকে বোধহয় বলা যায় না কিছুতেই।'

উৎকর্ণ ভদ্রলোক বৃথা বাক্যব্যয়ে অযথা বাধা না দিয়ে নিজের মৌন সম্মতিতে উন্মুখর

হয়ে আমায় উৎসাহিত করেন।

"হেমেনদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ একেবারেই আকস্মিক", আমি আরম্ভ করি: "অঘটনের মতই প্রায়। সেকালের নব সংস্কৃতির নানামুখী ভাগীরথী ধারার যাঁরা ভগীরথ—ধারক বাহক ছিলেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমাদের এই হেমেন্দ্রকুমার রায়। অবশ্য ভাগীরথীর ন্যায় সংস্কৃতির ধারা সব সময়ই বহতা, সেকাল একাল বলে তার কিছু নেই—কখনো তার মোড় ফেরা, কখনো বা তার মুখ ফেরানো।

সে যুগের এক চমকদার লেখক ছিলেন হেমেন রায়। যেমন তাঁর গল্প, তেমনি তাঁর কবিতা, তেমনি আবার ব্যঙ্গ কবিতাও—সেই সঙ্গে কিশোর সাহিত্যও আবার। কিশোর সাহিত্যে তো তাঁর জোড়া মেলে না—তাঁর বন্ধু মণিলাল গাঙ্গুলীকে বাদ দিলে। যথার্থ বলতে দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথার রাজ্যে কিশোর কাহিনীর আমদানি তাঁরই একান্ত কীর্তি। সে-পথে আমরা অনুগামী তাঁরই।

আর মানুষ হিসেবে তুলনাই হয় না তাঁর। লেখকদের মধ্যে এমন সহৃদয় আমি খুব কমই দেখেছি, অবশ্যি ক'টা লেখকই বা দেখেছি আমি আর ?

ফুটবল ম্যাচ দেখে মাঠের ফেরতা 'কল্লোল'-এর কয়েকজন আমরা প্রায়ই চাংওয়ায় খেতে যেতাম। চাঁদা করে খাওয়া হোতো। প্রত্যেকের ভাগে এক টাকা। অবশ্যি, বিলের টাকা মেটাবার সময় সবার ভাগেরটা প্রেমেনই দিয়ে দিত বেশিরভাগ।

খাবারদাবার দারুণ সস্তা ছিল তখন চাংওয়ায়। এক টাকায় ঢাউস এক প্লেট কুঁচো চিংড়ি, মাংসের কুঁচি দেওয়া ফ্রায়েড রাইস দিত, যা তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। আর এক টাকায় গোটা ছয়েক প্রন কাটলেট মিলত, তার স্বাদের তুলনা হয় না। আর এক টাকায় যে কী নেওয়া হ'ত তা এখন মনে পড়ে না। চপটপ কি কারিটারি কিছু হবে বোধহয়।

এছাড়া এক পেগ করে ছিল আবার আরো প্রত্যেকের। ওটা নাকি অবশ্য গ্রাহ্য।

প্রেমেন বলেছিল এক টাকায় এত এত খাবার দিয়ে ওদের কী লাভ থাকে ভাই। যা কিছু মুনাফা এই মদ বেচেই। এ না নিলে এখানে পাত্তাই মিলবে না একদম।

নিতেই হ'ত বাধ্য হয়ে। তবে একথাও আমি বলতে বাধ্য,বস্তুটির মতন অখাদ্য আর হয় না। প্রথম চুমুকেই আমার গাল গলা এমন জ্বলে গেছল যে জীবনে আমি আর তার দ্বিতীয় চুমুকে যাইনি।

আমার বিবেচনায় নেশা যদি করতেই হয় তো রাবড়ির। চুমুকে চুমুকে খাওয়া যায় আর প্রতি চুমুকেই চমৎকার।

আর বিশ্বসংসার ভুলবার জন্যেই যদি নেশা, তাহলে বলা যায়। ঐ চুমুকেই।

এক চুমুকেই তামাম দুনিয়া দুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয়, রঙীন করে দেয় ঐ চুমুই। যা কোনো লালপানিতে কখনো পারে না।

ব্যক্তিই কি আর বস্তুই কি, প্রথম পরিচয়টা যুতসই না হলে সম্পর্কটা তেমন মজবুতসই হয় না। প্রাথমিক মদালাপটা ঐ রকমটা না হওয়ার দরুণই হয়ত পরে আমার অনেকবার পান করার সুযোগ এলেও, এমন কি শখ গেলেও, শখটা আর জমল না তেমন।

সিগ্রেটের বেলাও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল আমার।

সেকালে রামরাম, হাওয়াগাড়ি এইসব অদ্ভুত নামের সস্তার সিগ্রেট মিলত—দু-চার পয়সা

দামের প্যাকেটে। স্কুলের এক বন্ধুর পাল্লায় একবার তার এক টান না টেনেই, চোখমুখ কপালে উঠে, দম আটকে কাশতে কাশতে মারা যাই আর কি। তারপর এ পর্যন্ত নামী দামী উপাদেয় কতো রকমের সিগ্রেটই না বেরিয়েছে বাজারে, শুনতে পাই, বিজ্ঞাপনেও নজরে পড়ে বইকি, কিন্তু কোনো সিগ্রেটকেই আর কখনো এমুখো হতে দিইনি।

সেদিনই ধরা পড়ে গেছলাম মা'র কাছে।

ইস্কুলে যাবার সময় মা যেমন আদর করে ছাড়তেন আমাদের, ইস্কুল থেকে ফিরলেও তেমনিই আদর করতেন আবার।

ধরা পড়ে গেলাম সেই মুহূর্তেই—'সিগ্রেট খেয়েছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ মা।'

'আর খাসনে কখনো।'

আর, ধরা পড়েছিলাম রিনির কাছেও—'সিগ্রেট টানা হয়েছে বাবুর আজ?'

'কী করে ধরলি? হাত গুণে নাকি?'

'ধরতে পারি আমরা। ফের যদি তুমি সিগ্রেট খাও তাহলে আর কক্ষনো আমার খেয়ো না। আমিও আর...'

'আর বলতে হবে না তোকে। ও জিনিস খায় মানুষ! ছ্যা!'

তবুও সে তারপরও আরো বলেছিল—'সিগ্রেট খেলে আর কোনো মেয়ে তোমায় চুমু খাবে না, এক তোমার বউ ছাড়া। তাহলে তাকেও সিগ্রেট ধরাতে হবে—মনে রেখো।'

আমি মনে রেখেছিলাম।

সেই চাংওয়াতেই হেমেনদার দর্শন পেয়েছিলাম প্রথম।

চাংওয়ার দু'ধারে দু'সারি কেবিনের মাঝখানটায় টেবিল পাতা থাকত তখন। কেবিনের বাইরে তারই একটা টেবিল বেছে নিয়ে আমরা বসতাম।

সেখানে বসেই একদিন একটা কেবিনের ভেতর হেমেনদাকে দেখেছিলাম। কেবিনের পর্দা সরিয়ে বেয়ারা খাবার দিতে যাবার সময়ে নজরে পড়ল।

কে একজন চিনিয়ে দিল আমাদের মধ্যে—'ঐ যে! হেমেনদা খাচ্ছেন ঐ কেবিনে।'

'সঙ্গে দারুণ সুন্দর দু'টি মেয়ে ভাই! দেখেচ?' আমি উচ্ছ্বসিত হয়েছি।

'ওঁরই মেয়ে তো!'

'সে কি! উনি মেয়েদের নিয়ে এখানে এসে এমনি করে পানভোজন করছেন?'

'দোষ কি তাতে? বাড়িতে বসে মেয়েদের সামনে খেতে যদি কোনো বাধা না থাকে তাহলে...তাছাড়া, উনি একলা এসে এখানে ভালোমন্দ কতো কী খাবেন, আর ওঁর মেয়েরা তা খেতে পাবে না, ওঁর মতন স্নেহকাতর পিতার মনে সেটা লাগে। সেকথা উনি ভাবতেই পারেন না।'

ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিক। ভালোবাসা সহজেই সব সংস্কারমুক্ত করে, কোনোখানেই গণ্ডী রাখতে দেয় না। আমাদের খণ্ডিত দর্শনে তাকে যতই না জটিল-কুটিলরূপে দেখতে যাই, তার মতন সহজ কিছু আর হয় না।

শুধু নিজের মেয়েকেই নয়, পরকেও উনি খাওয়াতে ভালোবাসেন খুব। এমনি করে আমাদেরও ধরে নিয়ে এসে খাইয়েছেন কতদিন এখানে। প্রেমেনই বলেছিল বুঝি।

তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর আমিও সেই অভিজ্ঞতার ভুক্তভোগী।

ঘনিষ্ঠতা ঘটেওছিল ভারি অদ্ভুত ভাবেই।

শিশিরকুমারের নাট্যমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নিয়েই এই অঘটন। শরৎবাবুর দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ ঐ ষোড়শী।

অবশ্য ষোড়শী নিয়ে মারামারি এই প্রথম নয় এবং আজকেরও না—ট্রয় নগরী ডেস্ট্রয়ের মূলেও ছিল এই ষোড়শীই, এমনকি তারও আগে সুন্দ-উপসুন্দর আমল থেকেই চলে আসছে এই কাণ্ড।

তবে এবারকার লড়াইটা ছিল কাগজে কাগজেই।

আমার সেই তরুণ বয়সে ইবসেনের নাটক পড়ে বিষয়বস্তুতে তো বটেই, আরো বেশি করে তার রচনার টেকনিকে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

আমাদের দেশে সেকালে থিয়েটারের পালা পাঁচ অঙ্কে অসংখ্য গর্ভাঙ্কে বহু পাত্রপাত্রী এবং সুদীর্ঘ দেশকালে বিস্তৃত বেশ এক গন্ধমাদনী কাণ্ডই ছিল। সেখানে অল্প সময়কালে ঘনবিন্যস্ত ইবসেনের নাটকগুলি স্বভাবতই চমকিত করেছিল আমায়।

বাংলায় কি এমনটা করা যায় না ?

আমার মাথায় তখনও মৌলিক নাট্য রচনার কোনো প্লট দানা বাঁধেনি। শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা সে সময় সবে 'ভারতবর্ষে' বেরিয়েছে। আমার মনে হল ওই উপন্যাসটিকে নিয়ে এ ধরনের নাট্যরূপের পরীক্ষা—নিরীক্ষা করা যায় বোধ করি।

শরৎচন্দ্রের প্রায় সব লেখাতেই বেশ নাটকীয়তা রয়েছে দেখা যায়। এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলা রঙ্গমঞ্চে চলেছিল খুব। কিন্তু তারপরে একালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে, সে-সবের অন্তর্গত অত নাটকত্ব সত্ত্বেও, কেন যে তেমনটা হয়নি আমি ভেবে পাইনি।

যাই হোক, ইবসনি কায়দায় সেই বিস্তৃত বইকে চার অঙ্কের—প্রত্যেক অঙ্ক একটিমাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ—নাট্যাকারে ঘনসম্বদ্ধরূপে দাঁড় করানো গেল। সেই নাট্যরূপ নিয়ে আমি শিশিরবাবুর কাছে গেলাম, তিনি তখন ঘোষ লেনের বাড়িতে থাকতেন।

কিন্তু কেন জানি না ওটা তাঁর মনে ধরল না।

তখন আমি নাটকটি নিয়ে 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলাদেবীকে দিলাম। জগৎ ভট্টাচার্য তখন পত্রিকাটার কার্যনির্বাহক ছিলেন। সম্পাদনা কার্যও করতেন তিনি।

ভারতীর পূজাসংখ্যায়, সেইটাই তার নবপর্য্যায়ের শেষ সংখ্যা আবার, বেরিয়ে গেল রচনাটা।

বেরুল কিন্তু শরৎবাবুর নামেই। নাট্যরূপান্তর সাধনের জন্য তার কোথাও আমার নামগন্ধ কিছুই ছিল না। সেটা যে ব্যবসায়িক কারণেই তা বোঝা তেমন কষ্টকর হয়নি। তাছাড়া, সেই জগতের নিয়ম—ব্যবসায়ী জগতের ধারাই তাই। এইরকমটাই ধারণা হয়েছিল আমার—আমার বন্ধু জগৎ ভট্টাচার্যের ওপর কোনো কটাক্ষ করছিনে।

যাই হোক, ওই প্রকাশের ফলে সাড়া পড়ে গেল থিয়েটার পাড়ায়। স্টার থিয়েটারের প্রবোধ গুহ মশাই ওটা তাঁর পাদপিঠে মঞ্চস্থ করতে চাইলেন। এবং তারপরও টনক নড়ল শিশিরবাবুর।

প্রবোধবাবুর আগেভাগেই তিনি পানিত্রাসে গিয়ে শরৎবাবুর কাছ থেকে নাটকের অভিনয় স্বত্ব নিয়ে এলেন।

মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল বইটা। দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত সাফল্যে চলেছিল সে-পালাটা।

অবশ্যি ভারতীর ষোড়শী আর অভিনীত ষোড়শীতে কিছুটা পার্থক্য ছিলই। ভারতীতে প্রকাশিত নাট্যরূপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক অবিকল রেখে তার প্রথম এবং চতুর্থ অঙ্ক দুটি একাধিক দৃশ্যে ভাগ করে একটু পরিবর্তন সাধিত করা হয়েছিল। আমি যেকালে উপন্যাসের মতই নাটকটিকে বিয়োগান্ত রেখে খোদার ওপর কোনো খোদকারি করতে যাইনি, শিশিরবাবু সেখানে তাঁর রঙ্গলৌকিক প্রয়োগ নৈপুণ্যে কিংবা তৎকালের দর্শকদের মুখ চেয়েই হবে হয়তো বা, কিংবা ব্যবসায়িক সাফল্যের কথাটা ভেবেই বোধহয় মিলনান্তক মাধুর্য দিয়ে নাটকটা সমাপ্ত করেছিলেন।

যাই হোক, তার জন্য আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না, নাট্যরূপের জন্য আমার নাম না থাকলেও নয় তেমনটা কিন্তু উক্ত প্রয়াসে আমার অংশ হেতু, কৃতিত্ব গৌরবের কিছুটা না হোক, আংশিক অর্থ প্রাপ্তির কিঞ্চিৎ প্রত্যাশা স্বভাবতই ছিল আমার।

একজন সংগ্রামী নবীন লেখকের পক্ষে—যদিও এখনকার ব্যাপকতর ভূমিকায় মহত্তর অর্থের সংগ্রামী নয়—নিছক নিজের তুচ্ছ জীবনধারণের জন্যই যার জীবনসংগ্রাম—তার কাছে নাম বা টাকা কোনটাই নেহাত ফ্যালনা নয়।

কিন্তু এই ব্যাপারে নাম তো হলই না, আর টাকাও যা পেলাম তা নামমাত্রই—শত খানেকের বেশি নয় কোনমতেই।

সত্যিই এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভারী মর্মান্তিক ঠেকেছিল তখন।

এবং স্বভাবতই শরৎচন্দ্র আর শিশিরকুমারের প্রতি আমার রাগ হয়েছিল দারুণ।

আর আমার সেই রাগের ঝাল সেকালের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ঝাড়তেও আমি কিছু কসুর করিনি। যথাসাধ্য সাহিত্যিক ভাষায় কষে গাল দিয়েছি তাঁদের।

আমার সেই ঝাল ঝাল লেখাগুলি—অচল টাকা ইত্যাদি—নবশক্তি, নাচঘর এবং আরো কী কী কাগজে যেন বেরিয়েছিল।

আর রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক ঐ নাচঘরের সম্পাদক ছিলেন আমাদের হেমেন্দ্রকুমার রায়। শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমারের, বিশেষ করে শিশিরবাবুর অন্তরঙ্গ হলেও হেমেন্দ্রকুমার তাঁর বন্ধুদের আঘাত-করা আমার লেখাগুলি তাঁর পত্রিকায় স্থান দিতে কোনো দ্বিধা করেননি. এমন কি, কোথাও কোথাও হয়ত আমার পক্ষ সমর্থন করে থাকবেন। তাঁর নাচঘরে আমার একটি নাটকও (চাকার নীচে) ধারাবাহিক বেরিয়েছিল তারপর (আমার প্রথম মৌলিক নাটক 'যখন তারা কথা বলবে' বেরয় নবশক্তিতে।) তাঁর সপ্রশংস ভূমিকা নিয়েই।

এমনি অসাধারণ সহৃদয় সাহিত্যিক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার।

অবশ্যি আমার তখনকার সেই মর্মদাহ বেশিদিন থাকেনি। সে বয়সে সবাই স্বভাবতই সব কিছু ক্ষমা করতে পারে, সহজেই ভুলে যায় সব।

তার পরে যখন আমার প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে, 'মস্কো বনাম পন্ডিচেরি' আর 'ফানুস ফাটাই', তার কোনটাতেই ঐ অচল টাকা বা ঐ জাতীয় লেখাগুলি আমি বার করিনি, ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। এবং আমার জীবনের ঐ পর্ব নিয়ে সমস্ত আলোচনা আর বাদ-বিসংবাদ সযত্নে এড়িয়ে গেছি।

(তবে এর পরে যদি কখনো আমার এতাবৎ যাবতীয় গদ্য রচনা নিয়ে কোনো প্রবন্ধসমগ্র বেরয় তাহলে ঐ লেখাগুলি এবং ঐ কালের আরো কিছু কিছু রচনা সে বইয়ের অন্তর্গত করার বাসনা আমার আছে। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার 'ইন্দ্রমিত্র' মশাই অনুগ্রহ করে তৎকালীন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে সেগুলি আমায় সংগ্রহ করে দেবেন বলেছেন।)

বলতে গেলে, আমার ভাগ্যে পর্বতের সেই মূষিক প্রসবে আমার কোনো দুঃখ নেই এখন আর। এবং দুঃখিত নই অনেকদিন থেকেই। আমার জীবনের সেই বিষাদ পর্বকে জীবনের স্বাদ-বয়ে-আনা একটা পার্বণ বলেই মেনে নিয়েছিলাম আমি। তখন তখনই। মনে হয়েছিল আমার যে, ইহাই নিয়ম। পৃথিবীর চেহারাই এই। দুনিয়ার হালচাল এই ধারার। এ নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। আর সেই দুঃখ মনের মধ্যে পুষে রাখার মতন অপুষ্টিকর কিছু আর হয় না।

ষোড়শীর সূত্রে টাকা আর স্বীকৃতি পেলে তার সাফল্যে আমি নাট্যজগতের বিপথেই চলে যেতাম হয়ত-রঙ্গমঞ্চের চোরাগলিতেই ঘুরে মরতাম এতদিন। সেই পোষ মাস আমার সর্বনাশ ডেকে আনত। তার বদলে যে ধারাবাহিক উপোস মাসগুলি আমায় কাটাতে হয়েছিল, হয়ত তার হেতুই আমার জীবনের সত্যিকার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। তার জন্যই আমি ধন্য। আমি কৃতার্থ।

সেই জন্যেই শিশিরকুমার এবং শরৎচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি আজ। তাঁদের শাপ আমার বরাতে বর হয়ে এসেছে।

নাট্য রচনা অবশ্যই কোনো সাহিত্যিক বিপথ নয়—কিন্তু আমার পক্ষে তা ঠিক স্বধর্ম হ'ত না, পরধর্মের মত বোধ হয়, ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াত শেষটায়। তা না হয়ে ঐ বিতর্কের সুযোগে হেমেন্দ্রকুমারের সান্নিধ্যে এসে সুধীরকুমার সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটে মৌচাকের সৌজন্যে কিশোর সাহিত্য রচনার যে রাজপথ দেখা দিল সেই পথেই যেন আমি আমার আমাকে সম্পূর্ণ করে পেলাম, সম্পূর্ণভাবে দিতে পারলাম সবাইকে।

প্রবীণ মানুষদের প্রাজ্ঞ মুখোশের রাজ্য থেকে নির্বাসন লাভ করে তরতাজা কিশোর-কিশোরীদের একান্ত আপনার হয়ে তাদের অনন্ত মাধুরী অফুরন্ত মধুর সাম্রাজ্যে আসবার সুযোগ পেলাম আমি।

নাকের বদলে নরুণ নিয়ে নাকাল না হয়ে আমার সম্মুখে এল যতো কচি কচি হাসি হাসি মুখ।

বিতর্কিত ষোড়শী নিয়ে কোনো দুঃখই থাকে না আর মনে, নতুন নতুন ষোড়শীরা এসে দেখা দেয় জীবনে। 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই' কবির সেই স্বপ্নটাই সত্য হয়ে ওঠে, সব ঠাঁই নিজের ঘর খুঁজে পাই বুঝি। নিত্যকালের কিশোর-কিশোরীদের চিত্তলোকেই।'

॥ সাতাশ ॥

'নিত্যকালের চিত্তলোকে!' তিনি প্রতিধ্বনিত হন : 'কথাটা বলেছেন বেশ।'

'বেশ বলা নয়, বেশি বলা। বাড়িয়ে বলা।' আমি বলি : 'ভালো শোনায়—বলা তাই। মিথ্যে কথামাত্রই তো মিষ্টি শোনায়। শোনায় না? যেমন আপনার ভালোবাসার কথা যত।

ভদাহরণ স্বরূপ দিয়ে আমার কথাটা যথাযথ করি।'

'মিথ্যে কথা ?'

'মিথ্যে নয়তো কী ? মিথ্যে বলতে আপত্তি থাকে, বলুন অতিরঞ্জিত। আসলে সত্যি নয়। আসল সত্য হচ্ছে নিত্যকালের চিত্তলোকে কারোই কখনো ঠাঁই হয় না। চিরকালের স্বামীত্ব নেই কারোরই, সবাই ক্ষণকালের আসামী। বর্তমানের বাইরে বলতে গেলে, কারোই কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'অস্তিত্বই নেই ? কারোই না ?'

'কোথায় আর! কবিগুরুকেও দুঃখ করতে হয়েছে জানেন না ? ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী/শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি। মহাকাল কাউকে তাঁর সাথী করেন না। বর্তমানের চাকায় ঘুরপাক খাচ্ছি আমরা সবাই!'

'কী বলছেন!'

'খাঁটি কথা বলে গেছেন ঐ ওমর খৈয়াম। নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক। এর চেয়ে সত্য কথা আর হয় না।'

'নিত্যকালের চিত্তলোকে কারোই ঠাঁই হয় না ? আপনি বলেন কী মশাই ?'

'কই আর হয়! মহাকালই তো কাণ্ডারী ? তিনি যদি ঠাঁই না দেন, কী করে হবে ? ভগবান চিরকালই হাল ধরে থাকেন—মা বলতেন কথাটা। কথার মধ্যে আবার আরেকটা করে মানে থাকে, বলতেন মা। সেই মানেটা সমঝে নিতে হয়। হাল মানে আবার বর্তমান। ভগবান হাল ধরে আছেন সবার, সব কিছুর, অর্থাৎ সর্বদাই তিনি সবার বর্তমানে আবর্তন করছেন—নিরন্তর পরিবর্তন আর সমাবর্তনে। তিনিই হচ্ছেন, হওয়াচ্ছেন। এই তাঁর হালচাল। তাঁর অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই। আমাদেরও তাই।'

'হুম্।' তাঁর হুঙ্কার শোনা যায়।

পুনশ্চ অনুযোগ করতে হয় আমায় : 'এইভাবেই আমরা সবাই বর্তাচ্ছি—অফুরন্ত বর্তমানে। তিনিও বর্তে গেছেন, আমরাও বেঁচে বর্তে রয়েছি—অনন্ত কাল ধরে—পরস্পরের দৌলতে।'

'ভগবানের ওপর ভবিষ্যতেরও কোনো ভরসা রাখব না ? সে কী কথা ?'

'এইমাত্র ভরসা রাখতে পারি যে, ভবিষ্যতেও তিনি বর্তমান থাকবেন। যেমন থাকব আমরাও। নিরবধি বর্তমানে তিনি আবর্তিত। নিয়তই তিনি হচ্ছেন, আমরাও হচ্ছি—এই আমাদের নিয়তি।'

'তত্ত্বকথা থাক, তথ্যকথায় আসুন।' তিনি আসলে আসেন—'তাহলেও ষোড়শীরা সব এসেছিল তো আপনার জীবনে ? এখন সেটা অতীত কথা হলেও তখন সেটা নগদ লভ্যই হয়েছিল। সেটাও কিছু কম লাভ নয় মশাই।' বলে তিনি একটুখানি দম নেন—'লাভ কথাটারও আরেকটা মানে আছে আবার। ইংরেজি মানে যদিও।'

'কোন্ দুঃখে আসতে যাবে তারা ?' আমি প্রকাশ করি—'ষোড়শীরা সব শরৎচন্দ্রের এলাকায়। তখনকার ষোড়শীরা অন্তত। সবাই তাঁরা পরিণীতা দেবদাসের মুলুকেই তখন। আমার পাঠক পাঠিকারা সব একাদশ থেকে চতুর্দশের মধ্যে। যতই চতুর দশায় থাকি না মশাই, আমার বরাতে চিরকাল সেই একাদশী। এবং আমার ভাগ্যে তারা প্রথম এলেও জীবনের প্রথম ভাগের পাঠ নিয়েই না একটু বড় হলেই তারা বড় বড় লিখিয়েদের আওতায় চলে যায়। যেমন এখনও, তেমনি তখনও।'

'যথা ? যেমন ?' তিনি দৃষ্টান্ত দর্শনে উদগ্রীব।

'কেউ তাদের প্রে-মেনে গিয়ে পড়ত, কেউ বা প্রবোধ লাভ করত।' আমি কই·· 'কেউ আবার অচিন্তনীয় কোনো কিছুর সন্ধানেই থাকত হয়ত। কেউ বা ফের বুদ্ধবিহারে গিয়ে রজনীদের উতলা করে তুলত কখন!'

'এমন কি এখনো হতে পারে নাকি!' তিনি বিশ্বাস করতে চান না। —'পথ ভুলেও কেউ কেউ কোথাও এসে ফের মরে নাকি ? এমন কথাও কি বলে যাননি কবি ?'

'আমার ভাগ্যই সেটা বলতে হবে। সত্যি বলতে, আমার বোনের বাইরে কোনো ষোড়শী সপ্তদশীর মুলাকাত আমি পাইনি। পেলেও সেভাবে পাইনি। বোন হয়ে বন্ধু হয়েই এসেছে তারা আমার জীবনে। অন্যরূপে বন্যরূপে দেখা দেয়নি কখনো। সেজন্য ভাগ্যকে আমার ধন্যবাদ। কেননা, ষোড়শীরা চিরকালই কিছু ষোড়শী থাকেন না, অনিবার্যভাবেই সাঁড়াশী হয়ে দেখা দেন একদিন। নাক নিয়ে টানাটানিতে নাকাল হতে হয় তখন। নারীর হ্লাদিনী রূপটিই ভালো, চিত্তচমৎকারী। আহ্লাদিনীরূপে এলে, তাঁকে নিয়ে বেশি আহ্লাদ করতে গেলে, তিনি জহ্লাদিনী হয়ে ওঠেন শেষটায়।'

'নারী কি তাঁর হ্লাদিনীরূপে থাকতে পারেন না চিরকাল ?

'সে রূপ তাঁর সেই কিশোরী বয়সেই। এই কারণেই তো বৈষ্ণব কবির ঐ কথা—কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন, কিশোরী গলার মালা! গোপবালারা একটু বয়সে গড়াতেই কেষ্টঠাকুর তাঁর সাধের বৃন্দাবন ছেড়ে পালালেন কেন তাহলে ?'

'আজব কথা কইলেন আপনি!'

'এসব কথা থাক। যে কথা হচ্ছিল আমাদের...হেমেনদার কথা। এমনি আশ্চর্য লোক ছিলেন আমাদের হেমেনদা। ঘনিষ্ঠতা হবার পর আমাকেও কতদিন তাঁর পানভোজনের সাথী হতে হয়েছে। একদিন দেখি কি, তিনি কাজী, প্রেমেন, নৃপেনকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সি করে আমার আস্তানায় এসে হাজির। শুনলাম নানান জায়গা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনেছেন তাদের—আমাকেও সহযাত্রী হতে হবে। সবাইকে ধরে বেঁধে নিয়ে চললেন তিনি চাংওয়ায়।

এক নম্বরের বোহেমিয়ান ছিলেন আমাদের হেমেনদা। বইটই লিখে যা তিনি উপায় করতেন, এমনি করে খেয়ে খাইয়ে উড়িয়ে দিতেন সবটাই। পাথুরেঘাটায় পৈতৃক বাড়িতে তাঁর সঙ্গে প্রথমালাপের পর ইদানীং তিনি বাগবাজার ঘাটের কাছে গঙ্গার কিনারের ওপর ভাস্কর্য এবং শিল্পকলার বিরল সংগ্রহে সজ্জিত মিনারের মতন যে বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেখানেও গেছি আমি বহুবার।

তার চারতলার ঢাকা বারান্দার কোণে এক টুকরো জায়গায় ছোট্ট একটা টেবিলের ধারে বসে তিনি লিখতেন—অভ্যাগতরাও বসত গিয়ে সেখানে। বাড়িটিই তাঁর ছবির মত ছিল না কেবল, সেখান থেকে বিবেকানন্দ সেতু পর্যন্ত বিস্তৃত উদার গঙ্গার দৃশ্যও দেখা যেত যেন ছবির মতই।

চাংওয়ায় গিয়ে আমাদের নিয়ে মশগুল হয়ে উঠলেন তিনি। পানাহারে সবাইকে পরিতৃপ্ত করে এমন আনন্দ পেতেন হেমেনদা! তার ওপরে সেদিন কাজী সঙ্গী আবার! কাজী, যেখানে আনন্দ সেখানে—জীবন যেন তরল পানীয়ের মতই শত ধারায় উচ্ছল—উচ্ছ্বসিত!

ফূর্তির চোটে সেদিন ভারী মজার এক কান্ড করেছিলেন হেমেনদা।

স্নেহের আবেগে প্রেমেনকে জাপটে ধরে, পাশেই বসেছিল সে, খপ করে এক চুমু খেয়ে বসলেন হঠাৎ।

চাবুকের মতই সপাৎ করে পড়ল সেটা প্রেমেনের গালে।

চাংওয়ার চিকেন কাটলেটও যেন বেগুনি হয়ে উঠলো ওর মুখে।

ব্যাপারটা কিছুই না এমন, বাল্মিকীর সম্মুখীন ব্যাধের সেই ক্রৌঞ্চ নিধনের মতই প্রায়, কিন্তু এমন ঝটিকার বেগে সংঘটিত হল যে, সেই মা-নিষাদের মত দু পঙ্‌ক্তির পজ্‌ঝটিকা ছন্দে গজিয়ে উঠল আমার মনে।

গল্প না/বৎস, না/কল্পনা/চিত্র
হেমেন্দ্র/চুম্বিত/প্রেমেন্দ্র/মিত্র।

ভাব, ছন্দ আর যতিঃপতনে নিখুঁত নিটোল এমন দুটি লাইন আর কখনো আমার জীবনে আমদানি হয়নি। প্রেরনায় কী না হয়, বোঝা যায় এইতেই!

পরে যখন প্রেমেনের কাছে পয়ারটাকে পড়েছিলাম, মোটেই সে ভালো মনে নেয়নি। এমন ক্ষেপে গেছল আমার ওপরে যে...। তার প্রতি আমার এটা অযথা এবং অতিশয় মন্দ আক্রমণ বলেই সে মনে করেছিল তখন।

কিন্তু আমি কী করতে পারি ? ছড়াটা না পালটে আমি ছন্দটাকেই পালটে দিলাম তার পর। বললাম, এটা তাহলে পজ্‌ঝটিকা হবে না ভাই, মন্দাক্রান্তাই বোধ হচ্ছে। যাই হোক, এটা ওই মা-নিষাদের সমগোত্রই—যতই বিষাদের (নাকি, বিস্বাদের ?) হোক না !

(অবশ্যি, মন্দাক্রান্তা বা পজ্‌ঝটিকা যে কী ছন্দ, কেমন চীজ তা আজও আমার জানা নেই সঠিক !)

আহারাদি সাঙ্গ হবার পর হেমেনদা পাড়লেন, চলো এখন এক জায়গায় গিয়ে গানটান শোনা যাক একটু।

প্রেমেন আমাদের সঙ্গ নিল না। কাটল সেখান থেকেই।

হেমেনদা, নজরুল, নৃপেন আর আমি চারজন চললাম ট্যাক্সি নিয়ে।

হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি আসতেই প্রায় একটা অ্যাকসিডেন্ট বাধে আর কি ! কাজীও চেঁচিয়ে উঠেছে—রোকো রোকো ! ট্যাক্‌সিটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে তক্ষুনি। ড্রাইভারটা ছিল বেশ হুঁশিয়ার।

কিন্তু তারপর আর ছাড়েই না গাড়িটা !

—এই, রোকা কাহে ?

—আপ্ খাড়া করনে বোলা না ?

—তুমকো নেহি, ঘোড়াকো।

এক ঘোড়ার এক্কা—একটা ফিটন গাড়ীও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই সময় !

আমাদের চারজনকে নিয়ে চললো ট্যাক্‌সি চিত্তরঞ্জন সরণি ধরে সেই চিত্তরঞ্জনী সদনে।

বীডন স্ট্রীট পেরিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের পাশ কাটিয়ে কোথায় যেন জায়গাটা, মনে পড়ে না ঠিক এখন।

মেয়েটি খুব খাতির করেই অভ্যর্থনা করেছিল হেমেনদাকে, মনে আছে।

সেখানে গিয়ে নৃপেন একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়িয়ে পড়ল আরামে।

সৌম্য চেহারায় নৃপেন আর আলুথালু চুলের বাবরি আর কবি কবি ভাব নিয়ে সহজেই সবার চোখ টানতে পারত।

তার উদাস উদাস চাউনি দিয়ে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাকে বেশ সচেষ্ট দেখা গেল সেখানে।

প্রেমালু চোখে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

তাকাচ্ছিলাম আমিও...চোখ টানবার মতই মেয়েটা! কিন্তু আমাদের কারো তাকের ওপর দৃষ্টি ছিল না তার। তার যতো খাতির-যত্ন দেখলাম আমাদের হেমেনদাকেই!

আর, তার নজর ছিল ঐ নজরুলের ওপর।

আশ্চর্য কিছু না। তার চমৎকার চেহারা, যেমন পৌরুষব্যঞ্জক তেমনি মোহময়, ভরাট মিষ্টি গলা, প্রাণখোলা হাসি, আয়ত চোখের চাহনি আর কথায় কথায় রসিকতা ছেলেদেরই মজিয়ে দিত, মেয়েদের নজরানা যে সহজেই টানবে সে আর এমন বেশি কি।

মেয়েটি গানও গায়ে বেশ। হেমেনদার অনুরোধে সে কয়েকখানা গাইল। কাজীও গাইল তার নিজের গান, প্রাণমাতানো গজল সুরের কয়েকটা।

-কাজীদা, আপনার গান শেখাবেন আমায়? মেয়েটি অনুরোধ করেছিল কাজীকে।

কাজী সঙ্গে সঙ্গে রাজী। যেমন প্রাণচঞ্চল, তেমনি গান-পাগলা—এ বিষয়ে একবারের বেশি দু' বার বলতে হয় না তাকে।

কল্লোলের আসরে যেমন তাকে গজল গানে মেতে থাকতে দেখেছি, তেমনি নিজের গানের টানে বাড়িঘর বিশ্বসংসার সব ভুলে কোথায় না ভেসে গেছে সে!

এই কলকাতায়, এই হুগলিতে, এই ঢাকায়—বাড়ির বা বন্ধুদের কাউকে কোনো খবর না দিয়েই—এমনি আত্মভোলা জগৎভোলানো মানুষ ছিল নজরুল।

খানিকক্ষণ গানবাজনার পর আমরা উঠে পড়লাম সবাই, কাজী কিন্তু নড়ল না সেখান থেকে।

গান শিখতে চেয়েছে যে। শিখিয়ে যাবো। বলে বসে থাকল।

চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে আনতে পারতাম। হেমেনদা বললেন বাইরে এসে—কিন্তু ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। মুসলমান বাচ্চা, যখন চেয়েছে, তখন উচিত মতন শিক্ষা না দিয়ে উঠবে না।

'আপনার কি মনে হয় যে কাজী...?' তাঁর ইঙ্গিতটা অনুক্তই রাখেন ভদ্রলোক।

'না না না, আদৌ না।' জনাবের কথার জবাবে আমি কই—'সে ধরনের কিছু মনেই হয় না আমার। কি রকম সঙ্গীতমত্ত মানুষ ছিল সে জানেন তো! কাজীর ব্যক্তিত্ব শতধা বিকীর্ণ, সহস্ররূপে বিচ্ছুরিত, অজস্র ধারায় উচ্ছল। যেমন তার শিল্পীসত্তা, বিপ্লবীসত্তা, সাধকসত্তা, তেমনি তার প্রেমিক-সত্তা, আর সব ছাপিয়ে ছিল তার পুরুষসত্তা। সবগুলোই সমান সত্য। তার কোনো ব্যক্তিরূপকে বাদ দিয়েই কাজী নয়, সব মিলিয়ে মিশিয়েই নজরুল। আমার তো মনে হয়, বাংলার মাটিতে শ্রীচৈতন্যদেবের পর সুভাষচন্দ্র আর নজরুল এক আবির্ভাব। মানুষের গড্ডলিকা প্রবাহে এক ফেনোমেনা। এঁরা সারা বাংলাকে মাতিয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া ...'

'তা ছাড়া?'

'তা ছাড়া—',আমি আরো ছাড়াই : 'তেজস্বীদের দোষ হয় না কিছুতেই। তেজীয়সাং ন দোষায়—মহাভারতের কথা। আগুনকে কোনো মালিন্য স্পর্শ করতে পারে না। বহতা নদী সব কিছুই ধুয়েমুছে নিয়ে যায়। আর কাজী তো কেবল প্রবাহিনী নয়, প্রবল বন্যাই।'

আমার কথাগুলো হজম করবার পর হাঁফ ছাড়লেন তিনি—'আপনাদের দৌড় অ্যাদ্দুর ? এই আপনাদের গতিবিধি ?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে-মনে হল তিনি রীতিমতন হতাশ।

'অবশ্যি, আরেকটা গতিবিধির বৃত্তান্তও দিতে পারি আপনাকে—একান্তই জানতে চান যদি। সেটা প্রায় একরকম রগ ঘেঁষে যাওয়াই।'

'রগ ঘেঁষে যাওয়া ?' তিনি কন : 'শুনি তো রগড়টা।'

'আমার আওতায় এসে আপনিও প্রায় আমার ভাষার ভাঁওতা পেয়ে বসেছেন দেখছি!' ওঁর রগড়ের কথায় না হেসে পারি না—'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গেছলাম সেখানে। সে আমায় বললো—বেড়াতে যাবে এক জায়গায় ? মেয়েটেয়ে আছে, গানটান হবে। জমবে খুব। যাবে ?'

অজানার পথে এগিয়ে যেতে সর্বদাই আমি এক পা বাড়ানো। বললাম, 'কেন যাব না ?'

'বন্ধুটি কে ? কল্লোলের কেউ ?'

'জেনে কী হবে ? আমি নিজের মুণ্ডপাত করতে পারি, কিন্তু অপরের মাথায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কি আছে আমার? নাম নাই বললাম, তাতে কাহিনীর কোনো হানি হবে না। কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যেতে মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়ে শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে গিয়ে সেই গলিটা। গলির মোড় থেকেই মেয়েদের উঁকিঝুঁকি—কিশোরী যুবতী, নানাবয়সী নারীদের আনাগোনা।

'ও বাবা! এ যে দেখছি এক স্বনামধন্য রাস্তায় এনে ফেলেছো তুমি আমায়!' রাস্তাটার নাম-ফলক দেখে বললাম। আনাড়ি হলেও জায়গাটার মহিমা আমার অজানা ছিল না।

'রাস্তাটার নাম জানতে পারি কি ?' তিনি শুধান।

'তা জানতে বাধা কি আর!' জনাব সাহেবকে জানাই-'প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট।'

॥ আটাশ ॥

এই প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট! সেই ডাকসাইটে (নাকি ডাকিনীসাইটে) জায়গা ? মহানগরীর নাগর সংস্কৃতির পীঠস্থান ? প্রেমের কতটা ছয়লাপ হয় এখানে জানিনে, কিন্তু চাঁদের ছড়াছড়ি দেখি চারধারেই!

সুহৃদ্বরকে সম্বোধন করলান : 'এ যে একবারে প্রমীলারাজ্যেই এনে ফেললে হে!'

বাড়িতে বাড়িতে বারান্দায় বারান্দায় সারি সারি মেয়েরা। এরা কি সব বারাঙ্গনাই ? ঘরদোর আনাচকানাচ উপচে রাস্তায় এসে পড়ছে পরীর দল। দারুণ পরিস্থিতি!

রাজপথ না বলে রানীপথ বলাটাই বুঝি সঠিক। এবং যারপর নাই পরাস্ত হবার পানিপথ বুঝি সবার জন্যেই।

অলিন্দে অলিন্দে ফুটন্ত ফুল। গলিতে গলিতে উৎফুল্ল অলি। অলিগলি যদি বলি তো একেই বলা যায় বোধ করি।

ওরই ভেতরে একটি মৌচাকে সুহৃদ্বর আমায় নিয়ে সেঁধুলেন।

খুপরিতে খুপরিতে মক্ষিরাণী। তারই একটা কামরায় বসলাম গিয়ে আমরা।

আঠারো-উনিশ বয়সী বোধহয় মেয়েটি ; কচি কচি মুখ। দেখলে মায়া করে।

আমাকে বন্ধু বলে সুহৃদ তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সমভাবেই সে খাতির করছিল দুজনকে। ভারী ভদ্র মেয়েটি। বন্ধুর অনুরোধে খানকয়েক গানও গাইল সে। সুরেলা মিষ্টি গলা।

চা বিস্কুট এল—তিনজনেই খেলাম। বেশ খানিক গল্পগুজবের পর আমরা চলে এলাম সেখান থেকে। আসার আগে সুহৃদ মেয়েটির হাতে কিছু টাকা দিয়েছিল মনে আছে।

'চেনা চেনা বলে যেন মনে হোলো মেয়েটাকে।' বললাম বাইরে এসে।'

'তোমাদের দেশের নাকি ?' শুধোলো সেঃ 'দেশ পাড়াগাঁ থেকে বেশ কিছু মেয়ে আসে। তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বার করে নিয়ে আসে এখানে। আর একবার এ পথে বা বাড়ালে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায় একেবারে। চিরদিনের মতই বলতে গেলে।'

'না, দেশের নয়।' দেশের কেউ বেরিয়ে এসেছে বলে আমি জানিনে। দেশের কোনো খবর রাখিনে আমি। কোনো সম্পর্ক নেই সেখানের সঙ্গে আর আমার।' আমি কই : 'এমনিই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল কেন যে !...কোথায় যেন দেখেছি একে !'

'ও—তাই।' সমঝদারের মত সে হাসল—'তাই বলো। বুঝলাম এবার।'

'কী বুঝলে ?'

'পরীর মত মেয়ে দেখলে এরকমটা মনে হয় বটে। মনে হয় যেন কতকালের পরিচিত। স্বভাবতই এমনটা হয়। না হয়ে পারে না। সবারই হয়ে থাকে।' সে হাসে আবার।

'মিষ্টি মিষ্টি মুখ দেখলেই চিনি চিনি লাগে—চোখে দেখেই, চেখে না দেখলেও ? এই তুমি বলছো তো ? মানে কবির ভাষায়, যাকে বলে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ?'

'ঠিক তাই। এখানকার চেনাজানা না হলেও হয়ত বা পূর্বজন্মের পরিচয় বলে ঠাওর হতে থাকে। আশ্চর্য কিছু নয়।'

'মোটেই তা নয়। এ জন্মেই দেখেছি—ইহলোকেই।' আমি জোর দিয়ে জানাইঃ 'এই কলকাতাতেই দেখেছি কোথাও। এখন ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'বাদ দাও। এখন বলো, মেয়েটি কেমন ? কী রকম লাগল তোমার ? তাই কও।'

'চমৎকার। কেমন টানাটানা চোখ—কী মিস্টি হাসি !....এমন মেয়ে আর হয় না।' বলে তখনই তার প্রুফ সংশোধন করিঃ 'অবশ্যি, সব মেয়ের সম্বন্ধেই তা বলা যায়। সবার বেলাই একথা খাটে। মেয়ে মাত্রই তো সুন্দর হয়ে থাকে।'

'তোমার ভালো লাগলো ওকে ? ভালো লাগবার মতই মেয়ে ! লেখাপড়া জানে, কালচারড্ মেয়ে। কে জানে, কারো প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, তারপর কিছুদিন ফুর্তির পর ছেলেটা ওর গয়নাগাটি সব নিয়ে ওকে পথে বসিয়ে উধাও হয়েছে। এমনিই তো হয়ে থাকে আকচার।'

'আহা। মুখখানা দেখলে ভারী মমতা হয়। সত্যি।'

'আরেকদিন আসা যাবে তাহলে। আসবে ?' সে শুধায়। 'নাকি, তুমিই একাই আসতে চাও এখানে ? তাও আসতে পারো। বাড়িটা তো চিনেই গেলে। ওর নাম হচ্ছে মায়া। বললেই ওর ঘর দেখিয়ে দেবে সবাই।'

'না।'

'না, কেন ? কেউ কিচ্ছু বলবে না তোমাকে। কোনো ভয় নেইবে

'না, ভয়ের কথা নয়। আবার এলে হয়ত আরো আমার মায়া পড়বে। আবার আবার আসতে ইচ্ছে করবে। অত টাকা আমি পাব কোথায় ? টাকা কই আমার ?'

'সেজন্যে ভেব না। যা দেবে তাতেই ও খুশি হবে। ভারী ভালো মেয়ে। তবে একটা কথা মনে রেখো, এদের সব বাঁধা বাবু থাকে, এরও আছে নিশ্চয়। সে যে সময়টায় আসে, এখানে থাকে, তখন যেন তুমি এসো না। তবে তার আবার দিনক্ষণ ঠিক করা আছে। সেটা কৌশলে জেনে নিতে হবে।'

'না, ভাই! আমার সাহস হয় না। আমি দারুণ মায়াবদ্ধ জীব। ওর মায়ায় জড়িয়ে পড়ব তাহলেই আর রক্ষে নেই আমার। এ পথে এলে আর ফেরা যায় না জানি।'

'কী করে জানলে ? তুমি তো এ পথে আসোনি কখনো এর আগে ?'

'আহা, বই পড়ে জেনেছি। বই পড়ে জানা যায় না ?' এ পথে এলে কি রেসের মাঠে গেলে কত লোক সর্বস্বান্ত—কত পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়—কে না জানে।' আমি জানাই : 'বটতলার কত নভেলেই এদের কাহিনী লেখা হয়েছে! জানিনে ?'

'আবার চন্দ্রমুখীরও তো দেখা মিলে যায় কোথাও কোথাও ? বটতলার থেকে সে শরৎচন্দ্রের দিকে মুখ ফেরায় : দেবদাস পড়োনি তুমি ? সে তো একালেরই কাহিনী।'

'একালের পাঁক-এও তো পড়েছি গো আবার ! কিন্তু পাঁকে পা নামাতে আমার ভরসা হয় না! ডুবে যাই যদি ?....তাছাড়া মায়ার কথা কি কিছু বলা যায় ? আমি ভারী মায়ালু জীব—যদি জড়িয়ে পড়ি ঐ মায়ায় ? মেয়েটার নামও নাকি মায়া আবার, বলছো তুমি !'

'জীবনকে জানার জন্য লেখকদের সব জায়গাতেই যেতে হয়, জানতে হয় সবাইকে—সব কিছুই দেখতে হয়। জীবন না দেখা হলে তা লেখা হবে কি করে ? এখানেই জীবন, জীবন তো এই-ই। তাছাড়া তুমি যে উপন্যাসের নায়কদের কথা বলছো'—বটতলার উল্লেখ করে সে কয় : 'সে কথা সব ক্ষেত্রে খাটে না।....লেখক শিল্পীদের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতাবোধ থাকেই। সেই সঙ্গে একটা আত্মচেতনা, সেটাই তাঁদের বাঁচায়। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকে কখনো জড়ায় না, পিছলে বেরিয়ে যেতে পারে....তুমি কেন জড়িয়ে পড়তে যাবে ?'

'কেন কে জানে! মিষ্টি মুখ দেখলেই আমার কেমন যেন আদর করতে ইচ্ছে করে। আজও করছিল একটু একটু।'

'করলেই পারতে! করলে না কেন ?' সে বলে : 'কিচ্ছু বলত না তোমাকে।'

'কি করে করি বলো ? তুমি ওকে ছুঁলে না পর্যন্ত! একবারটিও হাত দিলে না ওর গায়ে? আমি কি করে একেবারে ওকে আদর করে বসি। তুমি যদি একটু কিচ্ছু করতে....আশ্চর্য ! এখানে যেজন্যে লোকে আসে তার তো কিছুই তুমি করলে না !'

'সেইজন্যেই আসা বুঝি ? দেহের পরিতৃপ্তি ? মনের আনন্দটা বুঝি কিছু নয় ? একটি রূপসী তরুণীর ক্ষণকালের সাহচর্য—তার দাম কি কিছুই না ? নারীসঙ্গে কাটানো গেল খানিকক্ষণ, গানটান শোনা হলো, গল্পগুজব করলাম, সময়টা কাটল বেশ—এই ফূর্তি—এই তো যথেষ্ট ভাই !'

'সঙ্গসুখই ঢের, মানলাম তোমার কথাটা। কিন্তু আসঙ্গ সুখ নাই হোলো, সেই সঙ্গে সামান্য একটুখানি অনুষঙ্গ সুখে কী ক্ষতি ছিল ভাই ?' আমি কইতে যাই।

'ছিল বই কি ক্ষতি।' সে খতিয়ে দেখায়ঃ 'তাতে কী হানি হতে পারে, সেটা কতখানি ঘটতে পারে—তা জানা নেই তোমার। জানো, কী সব শক্ত শক্ত অসুখ থাকে এদের ?

দূষিত সংসর্গে সেইসব রোগ এদের দেহে এসেছে—এদের থেকে অন্যদের দেহে—সারা সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়বে। এদেশে এসব ব্যাধির সুচিকিৎসার এখনো কোনো সুব্যবস্থা হয়নি। সে রোগ, এই যৌবনকালে রক্তের তেজে এখন চাপা থাকলেও বয়েস একটু পড়ে এলেই প্রকট হবে। তাতে কানা কালা বোবা হয়ে যেতে পারো, পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যায় কেউ কেউ, বংশানুক্রমে ছড়াতে পারে সেই ব্যারাম। ছেলেমেয়েরা কানা, বোবা, হাবা হয়ে জন্মাবে। ছেলেপিলে নাও জন্মাতে পারে তোমার—যদি তুমি এই ব্যারামে বাঁজা হয়ে যাও। সেটা এক পক্ষে মন্দের ভালো। এক পুরুষেই পরিত্রাণ! নইলে কী সর্বনাশ হয় ভেবে দ্যাখো একবার—তোমার, তোমার স্ত্রী—পুত্রদের—তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আরো আরো সব পরিজনের—পরিবারের সবাইকার। ক্রমে ক্রমে গোটা সমাজের....আর ধরো তোমাকেই যদি প্যারালিটিক হয়ে বিছানায় পড়ে বোবা মেরে সারা জীবন কাটাতে হয় তাহলেই তো চমৎকার!'

উপদংশিত সংক্রামক যেসব দুষ্টব্যাধির খবর কার্তিক বসুর স্বাস্থ্যসমাচারের দৌলতে বহুকাল আগেই আমার পাওয়া, সেইসবই সে নতুন করে আওড়াতে থাকে আমার কাছে। তথ্যবহুল তত্ত্বগুলি সবিস্তারে ,শুনিয়ে বোঝাই করে আবার আমায়—'এই রাস্তাতেই তুমি দেখতে পাবে, বেশি বয়সী মেয়েদের। উপদংশক্ষত-জর্জর দূষিত দেহ নিয়ে ভিক্ষে করচে এখানে সেখানে—লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে। এই পথেরই শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তারা—যে পথের গোড়ায় এখন পা দিয়ে রয়েছে এই মেয়েটি।'

শুনেই আমি চমকে উঠি, আর আমার মনেও চমক দেয় তৎক্ষণাৎ! আমার মনে পড়ে যায় হঠাৎ—

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! এবার আমার ঠাওর হয়েছে। চিনতে পেরেছি মেয়েটাকে। বুদ্ধদেবের মতন মুখ ওর—লক্ষ্য করোনি?'

'গৌতম বুদ্ধ?'

'গৌতম কি গধাদর তুমিই জানো! সপ্রতিভ কি প্রগতিবান—তাও তোমার অজানা নয়....আমি ঠারেঠোরে কইতে যাই।

'শুনি না কে, আহা! এত ভণিতা কিসের? কোথায় দেখেছ এমন মেয়ে আরেকটাকে...'

'এই কলকাতাতেই। এমন কি তোমার ঐ কল্লোল আপিসেও....'

'কল্লোল আপিসে! কল্লোল আপিসে মেয়ে?'

'আহা, মেয়ে কেন হবে গো! ছেলেই তো!' আমি প্রাঞ্জল হই, 'ছেলে-ছেলে মুখ না মেয়েটার? দেখেই তাই চেনা চেনা ঠেকেছিল আমার।'

'ওরকমটা হয়ে থাকে। অনেক ছেলে মেয়েলি মুখ নিয়ে জন্মায়, অনেক মেয়ে দেখতে হয় যেন ছেলের মতই....' বলে সে জৈব প্রকৃতির দৈবলীলার আরেক ফিরিস্তি বিস্তারিত করতে চায়।

'থামো। বুঝেছি। কেন যে তুমি এখানে আসো টের পেয়েছি এবার। এই গলির মধ্যে এত মেয়ে থাকতে ওকেই বা কেন বেছে নিয়েছ তাও বুঝতে আমার বাকী নেই আর।'

'কেন, মেয়েটা কি সুন্দর না? তুমি তো ওকে আদর করতে চেয়েছিলে হে!'

'সুন্দর না ছাই! আদর করতে চেয়েছিলাম বলে নিজের উপর আমার রাগ হচ্ছে এমন। ওই তোমার সুন্দর? সুন্দর না ঢেঁকি!'

'বিনা উপরোধেই তো তুমি ঢেঁকি গিলতে যাচ্ছিলে হে।'

'তাই বলি! তা, তুমি এখানে না এসে সেই বালিগঞ্জে গেলেই পারতে! সোজাসুজি বুদ্ধদেবের ফ্ল্যাটেই।' ওর রসিকতায় আমার রাগ আরও জ্বলে ওঠে : 'এখানে যা খেলে সেখানে গেলেও তা মিলত। ঐ চা আর বিস্কুট।'

'চা বিস্কুট?'

'তাছাড়া কী? তাছাড়া সেখানে তোমার একটি পয়সা লাগত না আবার। এই সঙ্গসুখ, এমন সুন্দর মুখ, সেখানেও পেতে তো। সেখানে গিয়ে ঐ আহা-মরি রূপসুধা পান করার অসুবিধাটা কী ছিল শুনি?....এখানেও তো তুমি কিছু করলে না, সেখানেও করবার কিছু ছিল না।'

'কী আজেবাজে বকচো সব! মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার?'

'এই যদি তোমার মনের ইচ্ছা....তা এত ঘুরিয়ে বলার কী দরকার ছিল আমাকে? এখানে এই মেয়েটার কাছে আমায় নিয়ে এসে এমন ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কী প্রয়োজন ছিল? সোজাসুজি বললেই পারতে যে বুদ্ধদেবের ওপরেই তোমার বেশ টান। যাও, আর আমি...এ জীবনে আমি আর তোমার সঙ্গে মিশবো না।'

বলে ওর নামলাঞ্ছিত সেই রাস্তার মোড়েই ওকে ত্যাগ করে মা'র মানা না মেনে প্রাণ তুচ্ছ করে সামনের চলতি ট্রামে লাফিয়ে উঠেছি। উলটো দিকে রওনা দিয়েছি সটান!

॥ উনত্রিশ ॥

ইস্কুলের ছুটির পর বিষ্টু সুকুলের সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরছিলাম, ডাকঘরের পিয়নের সাথে দেখা হয়ে গেল মাঝ-রাস্তায়। মহানন্দার পুলের ঠিক ওপরটাতেই।

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হোলো বাবু! আপনাদের বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হল না আমাকে। একটা চিঠি ছিল আপনার।' বললে সে।—'ভালোই হোলো যে পেয়ে গেলাম আপনাকে এখানে।' পলকমাত্র দেখেই না সেটা পকেটে পুরে ফেলেছি। লেখাতেই চিনতে পেরেছিলাম আমার রিনির চিঠি। কলকাতার থেকে লিখেছে। ডাকপিয়নের কাছে অভাবিত 'বাবু' ডাকের মর্যাদালাভে উৎসাহিত হয়েছিলাম। তারপর খামখানা হাতে পেয়ে মন আনন্দে থই থই করে উঠল।

'হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে।' প্রতিধ্বনিত হয়েছি আমি পিয়নের কথায়। বাড়িতে গিয়ে চিঠিখানা মা-বাবার হাতে পড়েনি—ভাগ্যিস্! 'কার চিঠি রে? তোর মামার?' বিষ্টু শুধোয়।

'হ্যাঁ, আমার।' অনুনাসিক সুরে বলার জন্য 'আমার' কথাটা মামার মতই শোনায় অশ্বত্থামা হত ইতি গজ-র মত সত্যভাষণ হয়ে যায়।

'চল্ বাণিজ্যা ঠাকুরের দোকানে যাই। রসগোল্লা খাই গে চল।' সে বলে।

প্রায় প্রাত্যহিক রুটিন আমাদের—ওখানে গিয়ে ঐ রসগোল্লা খাওয়া। গরম গরম রসগোল্লা, খাসা খাসা মন্ডা নামায় ওরা বিকেলেই—খেতে যে কী মজা!

দাম দেবারও দায় ছিল না আমাদের। মাস-কাবারে গিয়ে হিসেব দিয়ে বাণিজ্যা ঠাকুরই আদায় করে নেবে বাবার কাছ থেকে। তাছাড়া আমাদের বাড়ির জন্যও যায় রোজকার রসগোল্লা সন্দেশ ওখান থেকেই। গোটা গাঁ জুড়েই বাণিজ্যা ঠাকুরের অবাধ বাণিজ্য।

বসে বসে খাচ্ছি আমরা দুজন, এমন সময় বছর ত্রিশ-বত্রিশের এক ভদ্রলোক আসতেই বাণিজ্যাঠাকুর উঠে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে—আসুন, আসুন বন্দীবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। কী সৌভাগ্য আমার আজ।' চেয়ার এগিয়ে দেয় বসবার।

অবাক হয়ে তাকাই আমরা। বন্দীবাবু আবার কী রে বাবা! কে রে বাবা! এত খাতির কিসের জন্য ওনাকে ?

ভদ্রলোক বসেই হাঁকলেন—'দিন যা ভালো ভালো খাবার আছে আপনার আজ। কী কী হয়েছে শুনি ? পাঁচ দশ টাকার দিয়ে দিন। খাওয়া যাক বসে বসে।' খানার খাতির দেখেই তাঁর খাতিরখানার অর্থ জানা যায়।

'আজ্ঞে খাজাও হয়েছে আজ। বালুসাইও বানিয়েছি। গরম আছে এখনও—দেবো ? তাছাড়া, বড়ো বড়ো বুঁদিয়া। রামবোঁদে যার নাম। আর রসগোল্লা মন্ডা রসকদম্ তো রয়েছেই আমাদের।'

'দিয়ে যান এনতার! যত আপনার প্রাণ চায়।'

'প্রকান্ড এক থালায় সব সাজিয়ে এনে ধরে ঠাকুরমশাই ভদ্রলোকের সামনে।

'বুঁদিয়াগুলোর চেহারা কী মোটা মোটা রে দেখেছিস ? কেমন সব হৃষ্টপুষ্ট বোঁদে।' বিষ্টু আমাকে দেখায়।

'রসে বুঁদ হয়ে রয়েছে।' সজিভ হয়ে আমার রায়।

'খাজাগুলোও তো খাসা দেখছি রে! খেলে বেশ মজা হোতো।'

'খেলে তো ভালোই হতো রে, কিন্তু আমার বরাদ্দের বাইরে গেলে রাগ করবেন বাবা।'

'তবে থাক্।'

ওর ওই ক্ষুণ্ন কণ্ঠ শুনে ভদ্রলোক বুঝি অক্ষুণ্ন থাকতে পারেন না। তাকান আমাদের দিকে—

'আহা, তুমি সেই ছেলেটি না ?' বলে ওঠেন আমাকে দেখেই—'যুদ্ধে যাবার জন্য যে নাম লিখিয়েছিল সেদিন সব প্রথম ?' তিনি কন। —'শিবরাম না কী যেন নাম ?'

'হ্যাঁ। শিবরাম চক্রবর্তী। আপনি কী করে জানলেন ?'

'আমিও যে ছিলাম সেদিনকার সভায় গো! আমন্ত্রিত হয়ে গেছলাম। লক্ষ্য করেছি তোমাকে। এ ছেলেটি কে ?'

'আমার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়ি।'

'বেশ বেশ। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে-বুঝলে ? আর, ব্যায়াম-ট্যায়াম করে শরীরটা বাগাতে হবে। বাণিজ্যামশাই, আমাকে যা যা দিয়েছেন ওদেরও তাই তাই দিন সব। দাম যা লাগে আমি দিয়ে যাচ্ছি।'

দু'খানা দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে তিনি চলে যান।

'ভারী বড়লোক তো লোকটা। কে মশাই উনি ?' আমি বাণিজ্যাঠাকুরকে শুধাই।

'রাজবন্দী ভদ্রলোক, জানো না বুঝি? এখানে ইনটার্ন হয়ে রয়েছেন এই কিছু দিন থেকে। সরকার থেকে মোটা টাকার ভাতা পান কিনা! মাস মাস আসে ওঁর টাকা—দু'তিন শ' করে হবে বোধ হয়। ঠিক জানি না। পুরো টাকাটা সেই মাসের মধ্যেই খরচ করার নিয়ম সরকারকে। প্রতি মাসে খরচার হিসেব দিতে হয় সরকারকে-খরচ নাহলে যা বাকী থাকে

ফেরত পাঠাতে হয় সরকারকে। সেই কারণে ওঁরা মরীয়া হয়েছে খেয়ে না খেয়ে খরচা করেন সারা মাস ধরে। এই ব্যাপার।'

'বাঃ, বেশ তো।' শুনেই আমার উৎসাহ হয়। উপায় করার কড়ার নেই অথচ খরচ করার কড়াকড়ি—এর চেয়ে ভালো ধরাধামে আর কিছুই হতে পারে না।

'সরকারী কান্ডই আলাদা। ওনাদের হালচাল কি জানার উপায় আছে দাদা?' বাণিজ্য ঠাকুর বাতলান।

'আমি তো জানতাম, দারুণ অত্যাচার করে ওরা রাজবন্দীদের ওপর। এ তো দেখছি একেবারে উল্টোই এখানে।' ভেবে আমার তাক লাগে। একদিকে যেমন এই বদ ব্যবহার, অন্যদিকে তেমনি এই বদান্যতা কেমন যেন সরকারী অন্যথা বলেই মনে হতে থাকে আমার।

ও তাই। আমার মনে পড়ে যায় তখন।...

এর আগেও দেখেছি আমি ভদ্রলোককে এখানকার হাটবাজারে কয়েকবার—মা'র ফরমাস মাফিক টুকিটাকি কিনতে গিয়েই—উনি আসা মাত্তর সারা বাজারে যেন সাড়া পড়ে যেত অকস্মাৎ।

'ঐ বন্দীবাবু আইছে! বন্দীবাবু আইছেন!' উল্লাসের হুল্লোড় খেলে যেত কেমন।

আর, আসার সঙ্গে সঙ্গে দর চড়ে যেত বাজারে! দু টাকা সের মাছের দর উঠে যেত সাত টাকায় চড়াৎ করে। বাজারের সব কিনতেন উনি সবাইকে টেক্কা মেরে। নোট ছড়াতে ছড়াতে উনি যেতেন, আর থলে হাতে সঙ্গের লোকটা মোট কুড়াতে কুড়াতে যেত।

মাছ মাংস তরিতরকারি আনাজপাতি মিলিয়ে সে এক ইলাহী মোচ্ছব। তাকিয়ে দেখবার মতই ব্যাপার।

একবার এক দোকানী শুধিয়েছিল ওনাকে, শুনেছিলাম আমি—'আচ্ছা বাবু, কী করলে বন্দীবাবু হওয়া যায় কইবেন সেটা একবার আমাদের? আমরাও হতাম তাহলে।'

ভদ্রলোক কোনো জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে চলে গেছেন। ভুরু কুঁচকেছিল আমার।

সেই থেকেই একটা কৌতূহল ছিল। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে সব কিছুর হদিস মিলে গেল এখন।

রাত্তিরে বাবা মা সত্য সকলের শোবার পর আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। আলো জ্বেলে বইয়ের ভেতর থেকে রিনির চিঠিটা বের করলাম... একটু আদর করলাম চিঠিটাকে।

'এত রাত্তিরে আলো জ্বেলে কি হচ্ছে আবার? পড়াশোনার সময় পেলিনে আর?'

মা কি ঘুমের মধ্যেও সজাগ? কি করে যে তিনি বুঝতে পারেন সব। চোখ বুজেও বুঝি টের পান মা।

'না মা! বেশিক্ষণ না। একটা ভেরি আরজেন্ট হোমটাস্কের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। কালকে ক্লাসের ফার্স্ট পীরিয়ডেই সেটা আবার। সেরে রাখছি তাই এখন।'

'কেন, কাল সকালে করলে কি হ'ত না? রাত জেগে পড়াশোনা করলে শরীর খারাপ পরীক্ষা-টরীক্ষার সময় সে আলাদা কথা।'

'কাল সকালে উঠেই মুস্‌লিম হোস্‌টেলে যেতে হবে আমায়। কাবিল হোসেনের কাছে শিখতে। ফিরে এসেই নেয়ে-টেয়ে ইস্কুল যেতে হবে। এখনই করে রাখছি তাই। ...শ লাগবে না মা, তুমি ঘুমোও।'

কত কথাই লিখেছিল রিনি। তুমি কেমন আছ, আমি ভালো আছি ইত্যাদি মামুলি সাত-সতেরর পর আনকোরা একটা খবর দিয়েছিল সে...

'কলকাতায় এখন বেজায় হইচই, বুঝলে! মহাত্মা গান্ধী এসেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের খবর পেয়েছো নিশ্চয়। সেই সম্পর্কেই এসেছেন তিনি এখানে। টাকা তুলছেন তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের। লাখ টাকা আয়ের ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিয়ে সি আর দাশ রাস্তায় নেমেছেন আজ। আর তাঁর সঙ্গে বিলেত-ফেরত আই-সি-এস সুভাষ বোস হাকিমি না করে। কি চমৎকার দেখতে তাঁকে-দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আঁর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ইস্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। মদ আর বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে তারা। পাঁজা পাঁজা বিলিতি কাপড় পোড়ানো হচ্ছে পার্কে পার্কে। সবাই মেতে উঠেছে একসঙ্গে। আমার ইচ্ছে করছে ইস্কুল-টিস্কুল সব ছেড়েছুড়ে আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ে যাই। তুমিও কেন চলে এসো না এখানে এখন ? দু'জনায় একসঙ্গে দেশের কাজে লাগা যাবে কেমন !...'

জানতাম বইকি। ততটা উত্তাল না হলেও এই সুদূর গ্রামাঞ্চলেও আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছিল আমাদের। অসহযোগের সব খবর নিয়মিত পেতাম আমরা খবর কাগজের মারফতে। বাবার আসত সাপ্তাহিক হিতবাদী আর সঞ্জীবনী। আর আমার জন্য তিনি আনাতেন অমৃতবাজার পত্রিকার হিতবাদী সংস্করণ, যাতে কিনা, চালু ইংরেজিটা শিখে ঐ ভাষায় আমি একটুখানি সড়গড় হতে পারি।

তা, বিদ্যায় না সড়গড় হই, সংবাদে সরগরম ছিলাম বইকি।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়িগে বিছানায়।... রিনির আমন্ত্রণের কথাটা ভাবি শুয়ে শুয়ে। কি করে যে যেতে পারি আমি কলকাতায়।

মনে পড়ে একদা হেডমাস্টার মশায়ের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলাম যে, আই ওয়ান্ট টু বি এ পেট্রিয়ট্। তারপরে হিংসার পথে সতীশের সঙ্গে দেশোদ্ধার করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছি দারুণ। উদ্ধার পেয়েছি দৈবক্রমে। এবার কি তবে অহিংসাব্রতে দেশ সেবার কাজে লেগে পড়তে হবে ? রিনির সাথে ?

দেশোদ্ধারই কি আমার বৃত্তি হবে শেষটায় ? বৃত্ত হবে এই জীবনের ? শুয়ে শুয়ে ভাবি তাই।

ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই।

কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান পথ দেখিয়েছিলেন পার্থকে। তার জন্মগত ক্ষাত্রবৃত্তির কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যথাকালে। এইভাবে যথোচিত প্রবৃত্ত করে তার বৃত্তপথের—তার রথের সারথি হয়েছিলেন স্বয়ং।

ক্ষত্রিয়সন্তান অর্জুনের ক্ষাত্রবৃত্তি হলে, ব্রাহ্মণসন্তান আমার কী বৃত্তি হবে তা'হলে ? ব্রাহ্মবৃত্তিই নাকি ?

বাবা বলেন যে, ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মকে জানতে পারলে তবেই নাকি বামুন হয়। এদিকে ব্রহ্মকে নাকি কিছুতেই জানা যায় না আবার—তিনি সবার বাক্যমনের অতীত, অবাঙ্মনসোগোচর—বলে থাকেন বাবাই।

বাবার কথাটা মাকে বলায় মা বলেছিলেন যে, অবাক্ মনসোগোচর—কথাটার মানে কিন্তু ওই নয় রে। ওর ভেতরের মর্ম আরেক। 'আ' মানে ব্রহ্ম, তিনিই তো আদিস্বর আর

বাক্—এর অর্থ হচ্ছে বাক্ পানি পাদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি, মানে, পৃথিবীর আর জীবনের সব কিছু জড়িয়ে বেবাক, ব্রহ্মের বৃত্তপথ, সেই জীবনবৃত্ত আর ইন্দ্রিয়বৃত্তির পথে মনের যে প্রকাশ, তার মধ্যেই তিনি গোচর, তিনি প্রত্যক্ষ। আবার গোচরের অর্থও আছে আলাদা। বাক্মনের সাহায্যে অন্তলীন তিনি, যে গোচারণা করছেন, গো অর্থে পৃথিবীও হয় ফের, এইভাবে যে পৃথিবীকে চালাচ্ছেন সেই পৃথিবীতেই তিনি পরিদৃশ্যমান, সবার গোচরীভূত। এই সূত্রে প্রতীকী অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাকে শুদ্ধ টেনে এনে বাবার কথাটার প্রতীকক্রিয়া তাঁর আলোচনায় প্রকাশ পায়।

আধ আধ ঘুমে মা'র কথাটা মনের মধ্যে খেলে যায়।

তা না হয় হলো, গোলোকেই থাকলেন না হয় ভদ্রলোক, আর ব্রহ্মও নয় ব্রহ্মলোকে বিরাজ করলেন শান্তিতে, যথার্থ বৃত্তপথে প্রবৃত্ত করতে তাঁদের কেউই এখন আগ বাড়িয়ে আসছেন না আর আমার কাছে।

এদিকে বামুনের বৃত্তি বলতে ইহলোকে তো দেখতে পাই তিনটি ফুৎকার মাত্র—শাঁখে ফুঁ, কানে ফুঁ, আর উনুনে ফুঁ মানে শাখ ঘন্টা বাজিয়ে মন্দিরের ঠাকুরের পুরুৎগিরি প্রাত্যহিক দেবসেবায় ভাগ বসাবার—নিয়মিত আলোচাল কাঁচকলা আদায়ের ফিকির, আর কানে ফুঁ হলো কান পাকড়ে মন্ত্র দিয়ে শিষ্যদের ধনেপ্রাণে সর্বস্বান্ত করার চক্রান্ত ; এবং এর কোনোটাই যদি না হয়, অগত্যা সেই উনুনে ফুঁ—নিজেই রান্নাঘরের ঠাকুর বনে বিরাজ করা শেষ পর্যন্ত। বামুনের এই তিন বৃত্তির কোনোটাতেই আমার প্রবৃত্তি হয় না। এই তিনটি ফুৎকারই এক ফুৎকারে আমি উড়িয়ে দিয়েছি।

ফুৎকৃত হয়ে নিজেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কখন।

পরদিন খুব ভোরেই হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। যে আমার সাত সকালের আগে ভোর হয় না কখনো, সেই কুম্ভকর্ণের এই পাঁচ সকালে ঘুম ভাঙাটা আশ্চর্যই! একটা কোকিল একটানা ডেকে যাচ্ছিল কোথায় যেন!

আর, সেই ডাকে পেটের মধ্যে কী যেন গজ গজ করতে লাগল আমার! মনের ভেতরে গজিয়ে উঠছিল আপনার থেকেই।

অভ্যন্তরের সেই গঞ্জনাকে টেনে এনে খাতার ওপর পেড়ে ফেলতে কেন যে বাসনা জাগলো কে জানে...

মাথার কাছে একটা ছোট্ট টীপয়ের ওপর বইখাতা সব থাকত আমার। টেনে নিয়ে লিখতে বসলাম ফসফস ক'রে। আর খাতার পাতায় যেন লেখা হতে লাগল আপনার থেকেই—

কোকিল ডাকে ভোরের ফাঁকে আম্রশাখে
ভোরের বাতাস যায় যে চিরে...
ব্যথার তীরে হঠাৎ ধীরে।
সেই ব্যথা কি যায় চারিয়ে চারি দিকে ?
যায় হারিয়ে স্মৃতির পাকে ?
নাড়িয়ে দেয় কি জীবনটাকে ?
মনে পড়ে ছেলেবেলার বন্ধু খেলার
মিলনমেলার সঙ্গিনীকে-
প্রতিদিনের রঙ্গিনীকে !

কথায় গভীর ব্যাথায় নিবিড়
সেই মোহিনীর সঙ্গটাকে।
কোকিল ডাকে।

এই রকম প্রায় আট স্ট্যানজাই। তার পর আর মনে পড়ে না আমার। অভাবিত এই লেখাটা কোত্থেকে এল এমন হঠাৎ? এই ছন্দ মিল শব্দের ঝর্ণা প্রপাত—যার মধ্যে কাশীরামী কৃত্তিবাসী পয়ারকীর্তির বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই? 'এ কৃতিত্ব কার?' অবাক হয়ে আমি ভাবি। নিজের বলে দাবী করতে পারি না কিছুতেই।

সেদিনই কবিতাটা প্রবাসী আর ভারতী—দুই পত্রিকাতেই পাঠিয়ে দিই ছাপার জন্যে।

॥ ত্রিশ ॥

দিনকতক বাদে লেখাটা আমার ফেরত এল প্রবাসীর থেকে। সঙ্গে চারুদার এক চিরকুট। চিঠিটার মর্ম মোটামুটি : 'তোমার কবিতাটা মন্দ হয়নি। কিন্তু এটি প্রবাসীতে ছাপিয়ে তোমাকে উৎসাহ দিতে আমি চাই না। সমস্ত মন দিয়ে এখন তোমার লেখাপড়া করাই উচিত, অন্য কোনোদিকে ঝোঁক যাওয়াটা ঠিক হবে না। লেখা একটা মারাত্মক নেশা, এই বয়সে তোমাকে পেয়ে বসলে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লেখকও হবে না—মানুষও হতে পারবে না। বরং পরে বড় হয়ে যথাসময়ে এসবের চর্চা কোরো না হয়। সঙ্গীত,কবিত্ব আর ল্যাজ কারো ভেতরে থাকলে তা আটকানো যায় না। তোমার মধ্যে যদি তা থাকেই প্রকাশ পাবেই—যথাকালে দেখা দেবে--অযথা জোর করে অসময়ে তাকে টানাটানি করে বার করার কোনো দরকার নেইকো।...ইত্যাকার পত্রখানা সদুপদেশ নিঃসন্দেহেই; কিন্তু মর্মান্তিক। কথাগুলো আমার মর্মে মর্মে গাঁথা হয়ে ছিল অনেকদিন।

কিন্তু ভারতীর থেকে এদিকে কোনো সাড়াশব্দই নেই। বুঝলাম, চারুদা নেহাৎ সম্পর্কিত বলেই লেখাটা পড়েছেন এবং পাঠিয়েছেন পত্রপাঠ—ভারতীর তেমন কোনো গরজ নেইতো, সেখানকার কারো সাথে চেনাজানার বালাই নেই আমার। নির্ঘাৎ লেখাটা তাঁদের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে পাচার হয়েছে।

যাক্‌গে, বয়েই গেল আমার। চারুদার কথাটা মনে পড়ল, ল্যাজ যদি আমার থাকেই, বেরুবেই একদিন। কেউ চাপতে পারবে না। নিজের ল্যাজের প্রতি বেশি টান দেখানোর কোনো মানে হয় না। নাই বেরুলো কোনো পত্রিকায়, প্রকাশ পাওয়া নিয়ে কথা। একেলা গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে। তেমনি কেবল লেখকের নয় তো লেখা; পাঠকের অপেক্ষা রয়েছে সেখানে।

হাতে লিখে লিখে বিলিয়ে দেবো নাহয় জনে জনে--তার কী হয়েছে? পড়ুয়া নিয়ে হল কথা, পড়ানো নিয়ে ব্যাপার।

কিন্তু কাঁহাতক লেখা যায় বসে বসে? কাগজের পিঠে কলম ঘষে ঘষে রাতদিন? বিলির চেয়ে অন্য কোনো বন্দোবস্ত করাটাই ভালো না কি?

তাই করলাম। ডিমাই সাইজের প্রকান্ড একখানা কাগজ নিয়ে ছোটখাট সাইজের গল্প কবিতা ছাড়া প্রবন্ধ হাস্যকৌতুক, এমনকি, ক্রমশ প্রকাশ্য ধারাবাহিক উপন্যাসেরও একটুখানি দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে, আষ্টেপৃষ্টে ভরে দিলাম। তারপরে শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত লিখিত এবং প্রকাশিত সেই পত্রিকাটি হাটখোলার কালী মন্দিরের গায়ে গিয়ে

গঁদের সাহায্যে মুদ্রিত করে দিয়ে এলাম। আঠা দিয়ে উত্তমরূপে সাঁটার পর গদ্‌গদভাবে তাকালাম তার দিকে।

হট্টমন্দিরের দেয়ালে আমার খেয়ালটা সেই প্রথম দেয়ালা।

আমাদের হাটখোলা জায়গাটা একটুখানি নয়। অশ্রদ্ধা করবার মতন না। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের মতন চারখানা আঁটে গিয়ে সেই জায়গাটা। প্রতি বুধবারে সেখানে বিরাট হাট লাগে। বিশাল জনসমাবেশ। আশপাশের পঞ্চাশখানা গাঁয়ের খদ্দের পসারীরা আসে। বহুত ইতরভদ্র জমায়েত হয় সেখানে।

দুপুরের আগেই থেকেই পসারীরা আসতে শুরু করে। দেড়টা-দুটোর মধ্যে হাট জমজমাট। লাখখানেক লোক কেনাবেচায় আসে নির্ঘাৎ। তার ভেতর জনকতকের নেকনজর কি পড়বে না আমার লেখাটার ওপর ? কেউ কি দয়া করে পড়বে না একটুখানি দাঁড়িয়ে ?

হাটের দিন বুধবার। সেদিন সকালেই ঐ দেয়ালপত্র লাগিয়েছি কালীমন্দিরের গায়।

ইস্কুল ছুটির পর বিকেলে একলাই ফিরছিলাম সেদিন। বিষ্টু ইনটার-ক্লাস-টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলতে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে নেমেছে গিয়ে ফুটবল মাঠে। একা-একাই ফিরতে হচ্ছিল আমাকে।

বাণিজ্যাঠাকুরের দোকানে বাণিজ্যকর্ম একলাই সারতে হোলো। তারপর বুধবারি ভিড় ঠেলে হট্টমন্দিরের কিনারায় গিয়ে ঠেকলাম।

দুয়েকজনের নজর পড়ছিল দেখলাম আমার কাগজটায়—কিন্তু দেখে দাঁড়িয়ে পড়া, কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার তেমন গরজ কারো বিশেষ দেখা গেল না।

সবাই নিজের বেচাকেনা নিয়েই ব্যস্ত! সাহিত্যোৎসাহী কেউ নয়। একটু-আধটু তাকিয়েই না অবহেলাভরে চলে যাচ্ছিল সবাই। আমি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিলাম।

খানিক বাদে সেই বন্দীবাবুকে দেখা গেল সেইখানে।

আরো দেখা গেল তাঁকে স্থাণুর মতই সেখানে দাঁড়াতে। সকৌতুক আগ্রহে তিনি পড়ছিলেন সব দেখলাম।

সবটা পড়ার পর তিনি ফিরে দাঁড়াতেই তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আমার।

'তুমি তো দেখছি দস্তুরমতন লেখক হে!' একটু এগিয়ে এলেন তিনি আমার দিকে।

'কী যে বলেন!' সলজ্জ আমি বলি—কিচ্ছু হয়নি ওসব। লাগিয়ে দিয়েছি এমনিই। মনে এলো তাই।'

' না না, বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে। এমনি করেই তো হয়। তোমার একটা কবিতাও বেরিয়েছে এবারের ভারতীতে দেখলাম। চমৎকার হয়েছে কবিতাটা!'

'বলেন কি ?' শুনেই না আমি লাফিয়ে উঠেছি—'কই, আমাদের ভারতী তো আসেনি এখনো। আপনি পেয়ে গেলেন এর মধ্যে ?'

'সব কাগজই পাই কিনা আমরা। সরকার বাহাদুরের সৌজন্যে। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিকপত্র সব। আমাদের অ্যালাউন্স থেকেই কাটা যায় দামটা। ইচ্ছে করলে যে-কোনো বইও আমরা আনাতে পারি—পলিটিক্সের বই বাদে। যাবে তুমি আমাদের বাসায় বইপত্র সব দেখতে ? আজই চল না কেন, এখনই ?'

'না, যাব একদিন। খুব শীগগিরই যাব একদিন। তবে আজ না, এখুনি বাড়ি যেতে হবে। ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে মা ভাববে আবার। মাকে বলে আসিনি তো। মাকে বলে

যাব একদিন শীগগির।'

বলে আমি পাশ কাটাই। আমাদের ভারতীও এসে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণ। তাড়াটা আমার সেইজন্যেই—মা'র জন্যে নয়।

'এসব কী লিখেছিস রে!' বাড়িতে পা দিতে না দিতেই মা'র খবরদারি—'কী লিখেছিস কাগজে এসব?'

'কী লিখেছি মা? কোথায়?' আমি যেন কিছুই জানি না—'হাটখোলার ঐ কাগজটার কথা বলছ বুঝি?'

আমার হাটের হাঁড়ির খবরটা মা'র কাছে কেউ এসে ভেঙেছে বলে বোধ হয় আমার।

'হাটখোলা কী আবার? ভারতীতে বেরিয়েছে তো! তোর এই পদ্যটা—

'ও! ওই ভারতীর লেখাটা!' নিরুৎসুকের মত বলি—'ওটার কথা বলছো?'

'দুখানা ভারতী এসেছে এবার আজ। একখানা তোর বাবার নামে—যেমন আসে। আরেকখানা তোর নামেই আবার।'

'দেখি দেখি।' আমি হাত বাড়াই—আগ্রহ দমন করে।

'দেখবি তো। কিন্তু তোর এই পদ্যটার মানে কী, তা বলবি তো আমায়?'

'পদ্য পদ্য বোলো না মা। পদ্য না, কবিতা।' আমার রাগ হয়ে যায়—'ওকে কবিতা বলে।'

'কবিতাই হল না হয়, কিন্তু মানে তো ওর থাকবে একটা।'

'কবিতার আবার মানে কী? কবিতার কি কোনো মানে হয় কখনো মা? ধরতে গেলে, মানে তো খুব সোজাই। কেন, তুমি বুঝতে পারছো না?'

'বোঝা তো সোজাই রে! তা কি আর বুঝতে পারছিনে! কিন্তু মানের মধ্যে আরেকটা মানে থাকে যে!' মা'র জেদ—'তোর এই কিশোরকালের সঙ্গিনীটি কে, শুনি।'

'কে আবার? কেউ না। মনগড়া সব। কবিরা সব মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে লেখেন—জানো না কি? যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি আমি।'

'তাই নাকি!' হাসতে থাকেন মা।

'তা না তো কী! রবিবাবুর মানসী যেমন, তা কি আর ছিলো নাকি কখনো! সোনার তরী কি চোখে দেখা যায় নাকি? অপরকে শোনানোর জন্যেই বানানো ওসব।....ভারী খিদে পেয়েছে মা, কী খেতে দেবে দাও এখন।'

কথাটা ঘুরিয়ে আমি খাবার ঘরের দিকে মাকে ফিরিয়ে দিই।

তারপরও ভারতীতে আমার কবিতা বেরিয়েছিল আরও। তার এক-আধটার এক আধটু মনে আছে আমার এখনো ....

কবিগুরুর সেই 'ভুলভাঙ্গা' কবিতাটার....'বুঝেছি আমার নিশার স্বপন/ হয়েছে ভোর/ মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে/ রয়েছে ডোর/ নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া/ ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া/ বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর/ ....

জবাবে একখানা লিখেছিলাম আমি এইধারার—

সত্য হে কবি, এ যে ভুল ভাঙা
আর এক ভুল ধরিতে।
এ যে তটিনীর এক কূল ভাঙা
আর এক কূল গড়িতে।

প্রেম চলে যায়, বাঁধা তো রহে না ;
তাই ফেলে যায়- বোঝা তো বহে না,
কেন চাহো তারে একটি স্বপনে
ভরিতে ?
সুখবেদনার এ যে ফুল রাঙা -
কালি নিশাশেষে ঝরিতে।

এইরকম পাঁচ ছ' ছত্রই প্রায়। তারপর আর মনে নেই আমার।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সেই বিদায় অভিশাপের হাসি ? হায় সখা, এ ত স্বর্গপুরী নয়। পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়....কবিতাটারও একটা উতোর গেয়েছিলাম আবার—ভারতীতে নয়—সাপ্তাহিক সচিত্র শিশির-এর পৃষ্ঠাতেই।

পেয়েছিলে দশ শো বছর দেবযানী,
তবু তোমার মিটলো নাকো তৃষা ?
দশটি নিশি পেলেই মোরা ঢের মানি,
তোমার ছিল লক্ষ মধু নিশা।
লক্ষ দিনে সখ্যনীড়ে বন্ধুটিরে/পাওনিকি ?
লক্ষ নিশি বক্ষে মিশি লক্ষ চুমু/খাওনি কি ?
লক্ষ চুমুর তুল্য কী ?
লক্ষ চুমুর মূল্য কী ?
এক জীবন মিললো যাদের/
লাখ জীবনে ভুললো কি ?
পাইনি মোরা দশ শো বছর - চাইনেও।
সয় না মোদের একটা রাতের/ঘুমহানি !
দুনিয়া আমার স্বর্গ আমার—তাই দেবো।
দাও না আমায় এক পলকের/
চুমুখানি।
একটি চুমুর/তুল্য কী ?/একটি চুমুর
মূল্য কী ?
এই জনমে মিললো যাদের/আর
জনমে• ভুললো কি ?

এ ছাড়া, এর পরে, ভারতবর্ষে বেরিয়েছিল আমার প্রায় শ-দুই ছত্রের দীর্ঘ দু'পাতা ব্যাপী এক কবিতা—'চুম্বন' বলে। সেটাকে চুম্বনের শত নাম—চুমুর হরিহরছত্রই বলা যায়। তাতে ছিলো চুমুর নানা আখ্যানের নানান ব্যাখ্যান। দুঃখের বিষয় সেই ছত্রাকারেরও এক ছিটেও মনে এখন আর পড়ে না আমার।

কবিতাটা এক ফাগুন সংখ্যায় বেরিয়েছিল—যে কারণে সম্পাদককে গাল খেতে হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র কাছে—'ফাগুনের ভারতবর্ষে আমাদের জলধরদা বুড়ো বয়সে আগুন ছুটিয়েছেন'—ইত্যাকার ব্যঙ্গোক্তির পরিসীমা ছিল না।

তৎকালের লেখা—ভারতবর্ষ উত্তরা কল্লোল প্রভৃতিতে প্রকাশিত—আমার লম্বাচৌড়া কবিতাগুলি 'মানুষ' এবং 'চুম্বন' দুটি বই হয়ে এম সি সরকার থেকে বেরিয়েছিল পরে। সেযুগে কবিতার জন্য একালের মতন পাঠকের তেমন আগ্রহ না থাকলেও বছর খানেকের মধ্যেই বই দুটির সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছিল মনে আছে। কিছু টাকাও এসেছিল আমার পকেটে। কিন্তু তারপরে বই দুটি আর ছাপা হয়নি। এখন তো তার কোনটারই পাত্তা পাওয়া যায় না আর।

আমার কাছে ওই মানুষ-চুম্বনের কোনো কপি নেই। প্রকাশকের কাছে তো নেইই। এমনকি, খুঁজে দেখেছি ফুটপাথেও তাদের পড়ে থাকতে দেখা যায় না। পাওয়া গেলে হয়তো ছাপানো যেত এখন।

কিন্তু সেই কাঁচা বয়সের এসব লেখা এমন কিছু চমৎকার হয়েছিল আমি মনে করি না। তবে তার ভেতরকার আবেগটা ছিল হয়ত খুব। চমৎকার না হলেও গোড়াকার আমার লেখাগুলো যে চুমুৎকার হ'ত বেশ, তার কোনো ভুল নেই।

এমনকি, আন্দামান-ফেরত মহাবিপ্লবী বারীনদা উপেনদার সাপ্তাহিক পত্র বিজলীতেও আমার একটা ছোট্ট চুটকি চমক্ মেরেছিল একসময়....মনে পড়ে বেশঃ

এক চুমুকে গণ্ডূষ করার মতন লেখাই!

জানি জানি/ সবাই সবে/ ছাড়বে।
চলার পথে/ কে কার চুমু/ কাড়বে?

চুমু যেমন কাড়াকাড়ির তেমনি ছাড়াছাড়ির, তেমনি আবার চিরকালের মত হারাবার জিনিস! তার কি কোনো ভুল আছে আর?

কিন্তু ভাবি আজ, এই সব কবিতা সেই বয়সে আমার মাথায় এল কি করে? খাতার পাতায়ই বা এল কীসে?

আমার লেখা বলে মনেই হয় না যেন।

তার কিছুদিন আগেই তো আমি মহাকবি কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক ধরে, 'শিবরাম পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ/ লঙ্কাকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ / কেঁদে বসেছিলাম....সেই আমিই কি এই আমি? এই কেঁদে কূল পাচ্ছে না যে?

কার পদাঙ্ক এসব? কোন্ অঙ্কশায়িনীর অনুসরণে এই পদাবলী?

কৃত্তিবাসী কীর্তির হনুকরণে লঙ্কাকাণ্ডে নিজের মুখ না পুড়িয়ে মিষ্টিমুখের কিসকিন্ধ্যা কাণ্ডে এমন করে কে টেনে নিয়ে এলো আমায়? কার ইঙ্গিতে লেখা আমার এই সব?...

এমনকি, বহুদিন পরেও সেই সংশয় আমার যায়নি এখনো। বহুবর্ষ পরের এই ছত্র দুটিতেও তা ব্যক্ত হয়েছে :

লিখেছি কি আমি অনেক বন্ধু ?/
আমি তো সেসব লিখিনি।/
ছিলো যে লেখিকা জনেক বন্ধু।/
ছিলাম আমি তার লেখনী॥

কে ছিল সেই লেখিকা? ওহেন কৃতিত্ব কার? এই প্রেরণার জন্য কার কাছে ঋণী আমি?....রিনিই কি?

নাকি, সেই তিনিই?

॥ একত্রিশ ॥

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, বলে না ?

সুখী ব্যক্তি মাত্রেই ভূতের কিল খায়, খেতে বাধ্য হয়। আধি ভূত ব্যাধি ভূত—ডাক্তার উকীলের ছদ্মবেশে এসে নানা মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে বারো ভূতে মিলে কষে কিলোয় তাদের—শান্তি-স্বস্তি পায় না। ঝুট-ঝামেলায় জেরবার হয়ে যায়।

শুধুই বহির্ভূত নয়, মনের মধ্যেও ভূত থাকে যে আবার! কিছুতেই সুখে থাকতে দেয় না কাউকে।

ছেলেরা কিন্তু এমনিতেই সুখী—স্বভাব গুণে সর্বদাই স্বচ্ছন্দ। খুব দুঃখী দরিদ্র পরিবারের ছেলেরাও মনের আনন্দেই থাকে—বাপ-মা'রা দুঃখকষ্টে কাটালেও সন্তানদের কখনো তার আঁচ পেতে দেন না—ছেলেবেলাটা বেশ কেটে যায় তাদের। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের বেলাতেই তাই। তা যদি নাও হয়, তাহলেও তারা বাস্তবের দুঃখ মনগড়া স্বপ্নের জগতে বাস করে ভুলতে পারে।

তাই বলে কি ছোটদের মনে সুখদুঃখের ছোঁয়া লাগে না ? আশপাশের ছোঁয়াচ লাগে বইকি। তাছাড়া, কোনো কারণ না থাকলেও, অকারণেও নিজের মনে তারা সুখদুঃখ পায়।

এই সুখী, এই অসুখী তারা—ক্ষণে ক্ষণেই। কেন যে তা কে বলবে! অহেতুক দুঃখসুখের খেলা তাদের মনে লেগেই থাকে সময় সময়। সুখের মধ্যে থেকেও কেন যে তারা কষ্ট পায়, কিসের অভাব বোধ করে কোথায় যেতে চায় কে জানে! ছেলেদের দুঃখ কিসের, কে কইতে পারে!'

বাল্য কৈশোর সুখের কাল, বলে থাকেন সকলেই। বয়স্করা পিছন পানে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

আর ছোটদের বয়স্কদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বুঝি! বড় হবার, বড়দের মত আচার-আচরণ করার—স্বাধীনতার স্বাদ পাবার সাধ জাগে বোধ হয়। অন্তর্নিহিত অবচেতনের কোনো স্পৃহাই কি ?

কী সুখেই যে কেটেছিল আমার জীবনের সকালবেলাটা। ক্রীচার কমফর্ট বলতে যা বোঝায় তার কোনো কিছুরই অভাব ছিল না আমার। দক্ষিণ পশ্চিমে ভগ্নদশা হলেও এককালে প্রকাণ্ড প্রাসাদের প্রায় আধখানাই আমাদের। লম্বাচওড়া বড় বড় ঘরে সারি সারি খাট পাতা, তার ওপরে পুরু গদির নরম বিছানা বিছানো। সেই বিছানার কোলে গদিনশীন হয়ে দু' ধারে পাশবালিশ নিয়ে সিল্কের মশারির মধ্যে ঘুমানোর কী আরাম। পূবের টানা বারান্দাটার মোটা মোটা থামগুলির খিলানের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক পায়রার বাসা—তাদের বক্‌বকমের মিঠে ডাক শুনে রোজ সকালের ঘুম ভাঙা যেন এক স্বপ্নের মতই।

আর, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই না বাবার প্রসাদ লাভ!

প্রসাদ বলতে গত রাত্রের বাবার খাবারের ভাগ আমাদের ভোগের জন্য রেখে দেওয়া।

সকালে বাবার হ'ত হবিষ্যান্ন ; আতপ চালের ভাত গাওয়া - ঘি দিয়ে ডাল তরকারির সাথে খাওয়া, মাছটাছ কিছু নয়। তিনি ছিলেন পাক্কা নিরামিষাশী। আর রাত্রে হ'ত তাঁর ফলার। সের দশেক দুধ মন্দা আগুনের আঁচে সারা দিন ধরে ফুটে ফুটে মরে মরে ক্ষীর হয়ে থাকত, তার ওপরে সর পড়তে মোটা রুটির মতই। আ মরি মরি! ক্ষীর ভাগের

সবটুকু আর সর ভাগের অর্ধেক বাবা খেতেন রোজ রাত্তিরে—সঙ্গে থাকত সেই সুবিখ্যাত মানকি কলা (কলার ফলার বাবার বারো মাসই) আর সেই ঋতুর যা ফলমূল তাই। আর সেই সরের আদ্ধেকটা তিনি রেখে দিতেন আমাদের দু'ভায়ের সকালে উঠে খাবার জন্যে। রসগোল্লাও দু-এক জোড়া থাকত তার সঙ্গে আবার।

পুরুষ্টু রসগোল্লাগুলো কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে পুরু সরের সঙ্গে মিকচার বানিয়ে আমি খেতাম—আহা, রসনার সে যেন স্বর্গলাভ!

সকালে আমরা মা'র রান্না খেয়ে ইস্কুলে যেতাম—মাছের ঝোল আর ভাত। ইস্কুল থেকে ফিরে খেতাম ফুলকো লুচি। রাত্রেও আবার লুচি, মাছের তরকারি। মা'র রাঁধা চচ্চড়ি দিয়ে খানকতক লুচি, আবার মিস্টি ক্ষীর মিশিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে তার ওপর। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা সে লুচির সোয়াদই আলাদা। সেই ছোটবেলাতেই যা খেয়েছি—তারপরে আর পাইনি কোনোখানে, খাইনি কোথাও!

আর সেই বিরাট একখানা ছাদ! সকাল সন্ধ্যে যেখানে মুক্তি অবাধ। মজাসে ফূর্তি করে বেড়াও। কতো কবিতাই না ভেঁজেছি সেই ছাদে বেড়াতে বেড়াতেই—কত চতুস্পদীর সঙ্গেই না পায়চারি করা আমার সেখানে! কোথায় গেল সেসব কবিতা—আমার মনের আগুনের ফুলকি যতো! কোথায় গেল তারা? কে জানে!

যত মুকুল ধরে তার সবই কি ফুল হয়ে ফোটে? আম গাছে যত বোল আসে কতটুকুই বা তার ফলাও হয়? তবু তাইতেই তো তার বোলবোলাও! সেই সৌরভেই দশদিক আমোদিত!

স্বপ্নমায়ায় বিভোর হয়ে কেটেছে সেই স্বর্গীয় (এবং স্বর্গত) দিনগুলি আমার কৈশোরের!

সেই স্বর্গসুখেও অরুচি ধরতো আমার মাঝে মাঝে। মন যেন উধাও হয়ে যেত কোথায়। ভোগসুখকে তুচ্ছ করে দুঃখভোগের জন্য কাঁদত বুঝি মন? হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনোখানে—ভেবে আনচান করত বুঝি প্রাণ?

বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম আমি এক-এক সময়—কাউকে কিছু না জানিয়ে এক বস্ত্রে—একলাটি—সঙ্গে একটিও পয়সা না নিয়ে। পয়সা পাবই বা কোথায় তখন? আর, পয়সা সঙ্গে নেবার দরকারও বোধ করতাম না কখনো। অতিথিপরায়ণ সচ্ছল দেশে আতিথ্যলাভ তখন সহজ ছিল বেশ।

বাবা এককালে সন্ন্যাসী হয়ে দিগ্বিদিক ঘুরেছিলেন, তাঁর মাথার সেই ঘূর্ণী পোকাই কি আমার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল নাকি? কিংবা এ পোকা হয়ত সব ছেলের মগজেই গজগজ করে—বাড়ি থেকে পালিয়ে ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরিয়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় তাকে—সেই ঘূর্ণীপাকে পড়লে আর রক্ষে নেই। এবং এই পোকাই বুঝি যথাসময়ে ঘুণপোকা হয়ে ভালোবাসার ছলনায় এসে কুরে কুরে খায় তাকে আবার।

ফি বছর দুর্গাপূজার পর আমাদের সবাইকে নিয়ে বাবা তীর্থভ্রমণে বেরুতেন। বিজয়ার পর তাঁর সেই দিগ্বিজয়ে গোটা সংসারটা যেত আমাদের আনুষাঙ্গিক। বাড়ির কুটোটি পর্যন্ত না নিয়ে তিনি নড়তেন না। মোটা মোটা বড় বড় গাঁটরি বাঁধা হতো—একটা থলে ভর্তি যত বাসনকোশন—পেতলের হাঁড়ি কড়াই, হাতা-খুনতি, থালা বাটি গেলাস সব—এমনকি মায় শিল-নোড়াটি অব্দি (বিদেশ বিভুঁয়ে মশলা বাটার জন্য মিলবে নাকি শিল কোথাও?

রেঁধেবেড়ে তো খেতে হবে !) আমি সায় দিতাম বাবার কথায়—হ্যাঁ বাবা, শীল হচ্ছে কুল-লক্ষণ, কেউ কি তা কাউকে দিতে চায় কখনো ? মা'র মতে একটা কুলক্ষণ-ঐ ভূতের বোঝা বয়ে বেড়ানো। তোরঙ্গ ভর্তি জামা কাপড় গামছা তোয়ালে পিরান কুর্তা। তার ওপর তোষক বালিশ মশারি-টশারি নিয়ে বিছনাপত্রের গোটা তিনেক গাঁটরি। টুকিটাকি জিনিস-টিনিসে ভর্তি তদুপরি আরো দুটো বাক্স আবার।

রাজার পিলখানায় হাতী ছিল বিস্তর—সবার সেরা তাদের মোহনপ্রসাদ। যেমন চেহারায় তেমনি দাঁতের বাহারে। বিরাট আকার হাতীর বড় বড় দুটো দাঁত। যেমন লম্বা তেমনিই মোটা। মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হ'ত মোহনপ্রসাদের। ক্ষেপে গিয়ে সোজা সে চলে যেত সেই রাজবাড়িতে—রাজাবাহাদুরের কাছেই সটান। মাহুত সহিস কেউ তাকে সামলাতে পারত না। রাজাবাহাদুর ভারী ভালোবাসতেন তাকে। তিনি স্বহস্তে হাঁড়ি হাঁড়ি রসগোল্লা তাকে খাওয়াতেন। তাই খেয়ে তবেই সে শান্ত হ'ত। রসগোল্লা খাবার জন্যেই সে ক্ষেপে যেত আমার মনে হয়।

মোহনপ্রসাদ ক্ষেপলে বাণিজ্যাঠাকুরের দারুণ বাণিজ্য ! হাতীটা ক্ষেপলেই তিনি চার কড়াই রসগোল্লার ভিয়েন চড়াতেন। দু'জনের মধ্যে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র ছিল কিনা কে জানে !

বাবারও ভারী প্রিয় ছিল মোহনপ্রসাদ। সব হাতীর চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন তিনি ওকেই—ওই নামমাহাত্ম্যের জন্যেই কিনা কে জানে। ওর পিঠে চেপে আর মালপত্রের লটবহরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে সামসি রওনা হতাম আমরা। সামসি ছিল আমাদের কাছাকাছি স্টেশন—দশ বারো মাইল দূরই হবে বোধ হয়। কিন্তু স্টেশনে যাওয়ার আগেও বাবার আরেক যাত্রাপর্ব ছিল আবার। মা বলতেন, যাত্রা নয়, ওটা তাঁর নিতান্তই থিয়েটার করা।

সেটা ছিল তাঁর পাঁজিপুঁথি দেখে যাত্রা। দিনক্ষণ দেখে, কত প্রহর কত দণ্ড পল বাদে কোন সময়টা যাত্রার পক্ষে শুভ সেটা লক্ষ্য করে, তারপর সবার প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়ে, গাড়ি ধরবার তখন আঠারো ঘণ্টা বিলম্ব থাকলেও। হয়ত রাত তিনটেই ঠিক ক্ষণটি, একটু না ঘুমোতেই রাত দেড়টায় সবাইকে হই হই করে তুলে, সবার প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়ে, শয়নঘর ভোজনঘর বাদ দিয়ে, আমাদের সবাইকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বৈঠকখানার ঘরটায় নিয়ে এসে তিনি বসে থাকতেন। যথাকালে আসল যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতেন সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

মোটঘাট আগের থেকেই বাঁধাছাঁদা হয়ে মজুত থাকত সেইখানে। তিনটে গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে যেত আমাদের যত লটবহরে। দশ মাইল রাস্তা গোরুর গাড়িতে টিকিয়ে টিকিয়ে যাওয়া কী কষ্টকর ! ইস্টিশনে যাবার পাকা সড়ক হয়নি তখনো। (এখন তো শুনি বাস যায় নাকি পিচমোড়া রাস্তায়।) বেশির ভাগ গোরুর গাড়িতেই যেতে হ'ত, কখনো কখনো অবশ্যি রাজবাড়ির থেকে হাতী আসত আমাদের স্টেশনে নিয়ে পৌঁছে দেবার জন্যে—খবর দিয়ে রাখলে আগের থেকে ফিরতি পর্বেও তেমনি স্টেশন থেকে আমাদের নিয়ে আসার জন্যও হাতী যেত এক এক সময়।

আর হাতী চাপতাম আমরা সম্বচ্ছরে সেই পূজার সময়। রাজবাড়ির দুর্গোৎসব হ'ত পাহাড়পুরে (এখনও হয় বোধ হয়), সেখানে হাতী চেপেই যেতাম আমরা—আমরা আর বামুনপাড়ার ছেলেরা সবাই। বামুনপাড়ার অনেকে রাজার একরকম আত্মীয়ই হবেন—দূর

সম্পর্কিত হলেও। কেউ তাঁদের ডাক্তার, কেউ জোতদার, কেউ বা শুধুই পুরোহিত। পুজোর চারদিন হাতী চাপবার ফুর্তি ছিল আমাদের।

পাহাড়পুর পর্যন্ত চার মাইল রাস্তা হাতী চেপে মসমসিয়ে যাবার মজাই ছিল অদ্ভুত! পুজোর আমোদের উপরি আরেক প্রমোদ! এখন, ট্রেনযাত্রার কথাটাই বলা যাক। বাবা আগের থেকেই স্টেশনে লোক পাঠিয়ে গোটা একটা থার্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করে রাখতেন—লটবহর সমেত আমাদের সবাইকার জন্যে। বাড়ির থেকে শুভযাত্রায় শ্রীদুর্গা স্মরণ করে রওনা হওয়ার পর আমরা সেই কামরায় গিয়ে চাপতাম।

তারপর সারা ট্রেনযাত্রায় সেই লাগেজ তুলতে নামাতে কী কম হাঙ্গামা! গোদা-গাড়িঘাটে ট্রেন ছেড়ে ধরতে হ'ত স্টীমার, ওপারে লালগোলায় গিয়ে চড়তে হ'ত কলকাতার ট্রেনে। অত লাগেজ নিয়ে কুলীদের সে কী চেঁচামেচি—তাদের সঙ্গে কত দর কষাকষি-বকাবকি বাবার! শেয়ালদায় নেমেও সেই ঝঞ্ঝাট ফের! ছ্যাকরা গাড়ির কোচোয়ানের সঙ্গে কচকচিও কম নয়।

ভেবে আমার অবাক লাগত, একদা সংসারবিরাগী বাবা কেন যে এই সারা সংসারের গন্ধমাদন ঘাড়ে করে তীর্থভ্রমণে বেরুতেন! এ জিজ্ঞাসার জবাব আমি খুঁজে পেতাম না।

অথচ যখন তিনি নিজে বেরুতেন একলাটি, কার্যগতিকে কলকাতায় কি আর কোথাও, তখন কোনো লটবহর নয়, কেবল একটিমাত্র হাতব্যাগ থাকত তাঁর সঙ্গে। আর তার ভেতর থাকত আরেক প্রস্থ তাঁর জামাকাপড়, জমা-খরচের খাতা আর দরকারী কাগজপত্র। এই নিয়েই তিনি যেতেন।

কলকাতায় গেলে তিনি ফিরে আসতেন কিছু মোটঘাট নিয়েই অবশ্যি। হয়ত কিছু আনকোরা বাসনপত্র, ছাতাটাতা, নতুন ধুতি, শাড়ি, মশারি-টশারি, ঝুড়িখানেক ল্যাংড়া আম, ভীমনাগের সন্দেশ—এই মোটমাট।

আমাদের নিয়ে বেরুলে কখনো যেতেন তিনি বৈদ্যনাথ দেওঘর, কখনো পুরী ভুবনেশ্বর, কখনো বা কাশীধামে। কখনো আবার শুধুই কলকাতায়—আমাদের মাসিধামে।

মাসির বাড়ি যাওয়ার সুযোগ এলে আমরা যেমন পুলকিত হতাম, মাকেও তেমনি হাসিখুশি দেখা যেত ভারী।

রামতনুবাবুর গলিতে (নম্বর মনে পড়ে না) বড়মাসির বাড়ি উঠতাম আমরা। সাত বোনের ভেতর ঐ খুদিদিদির ওপরই মা'র টান ছিল বেশি।

পরে আমিও আবার উধাও হয়ে যেতাম ঐ সব জায়গায়। বাবার সঙ্গে গিয়ে গিয়ে যে সব স্থানের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, বাড়ির থেকে পালিয়ে সেখানেই যেতাম বেশি বেশি। কিন্তু ঠিক তীর্থের টানে সেটা নয় বোধ হয় আদৌ। কেননা শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে আমি আর দ্বিতীয়বার যাইনি—সমুদ্র বিশেষ আন্দোলিত করেনি আমায়। সাগরের চেয়ে গঙ্গা ঢের প্রিয় ছিল আমার কাছে—তার কিনারায় বসে ঢেউ গুণে সময় কাটাতে কী আরাম! পুরী কি ভুবনেশ্বর মন্দিরের আকর্ষণ আমি কখনো বোধ করিনি। জগন্নাথ দেবের অন্নপ্রসাদে তেমন উৎসাহ পাইনি বলেই হবে হয়ত। কাশীধামে গেছি—সেখানকার মালাই লচ্ছির তুলনা হয় না, ভাগলপুরেও গেছি ভুল করে—সেখানকার হালুইকরের দোকানের পুরু সর একটু গুরুপাক হলেও অতি উপাদেয়—আর বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদী প্যাঁড়া—কী উপমা দেবো তার? কাশী গয়া প্রয়াগের প্যাঁড়া খেয়েছি বাবার সঙ্গে গিয়ে, কিন্তু দেওঘরের প্যাঁড়ার

জোড়া নেইকো-প্যারালাল নাস্তি।

কাটিহার দিয়ে কেটে বেরুতাম, তারপর নানাদিক ঘুরে ফিরে, কিউল বরৌনি মতিহারী নানান জংশন হয়ে (ভাগলপুরও ঐ রকম বিপথের মধ্যেই পড়েছিল বোধ হয়) এখানে সেখানে নেমে এক-আধদিন ধরমশালায় কাটিয়ে অবশেষে পৌঁছে যেতাম সেই দেওঘর ধাম—ততটা বাবা বৈদ্যনাথের প্রতি ভক্তিবশত নয় যতটা ঐ আহামরি প্যাঁড়ার টানেই। আন্‌প্যারালাল্‌ড্ প্যাঁড়া!

আশ্চর্য লাগে এখন, টিকিট সঙ্গে না থাকলেও রেলগাড়িতে কখনো আমায় কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। প্রায়ই দেখেছি আমার পাশের সহযাত্রী একগাদা টিকিট বার করে দেখিয়েছেন চেকারকে—এবং চেকার ভদ্রলোক আমাকেও ওঁর আনুষঙ্গিক জ্ঞান করে দৃক্‌পাত করেননি আমার দিক ফিরে। এবং আহারাদিরও অসুবিধা হয়নি কখনো। যেখানেই গেছি না, সেখানকার কোনো না কোনো প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা আদর করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে খাইয়েছেন আমায়—বাড়ি পালানো ছেলে মনে করেই হবে বোধ হয়-কী সব মানুষই না ছিল যে সেকালে! (এখনও অন্য নামে আছেন তাঁরা নিশ্চিত) কেউ কেউ বাড়ি ফেরার গাড়ি ভাড়াও অযাচিত দিতে চেয়েছেন আবার। দিয়েছেনও জোর করে গছিয়ে—বহুৎ সদুপদেশের সহিত। আজও অত অচেনার ভেতরে একজনের কথা আমার মনে আছে এখনো—আমার সমবয়সী ছেলেটি—বাঙালী নয়, বিহারী। বিহারী হলেও বাংলা বলতে পারত বেশ।

মধুপুর স্টেশনে আলাপ হয়েছিল তার সাথে—কোনো পাণ্ডার সাকরেদ হবে—কিংবা বাচ্চা এক পাণ্ডাই—যাত্রী পাকড়াতে বেরিয়েছিল।

টের পেয়েছিল যে আমার টিকিট নেই—সঙ্গে পয়সাটয়সাও নেই একটা। যশিডি জংশনে গাড়ি থামতে আমাদের প্রায় সবাইকে নামতে হল সেখানে—সেখান থেকে বৈদ্যনাথধাম যাবার অন্য গাড়ি ধরতে হয়। ছেলেটি নেমেই না চার পয়সা দামের একখানা দেওঘরের টিকিট কিনে হাতে দিল আমার। বলল যে, বাবাকে দর্শন করতে যাচ্ছ তো? মন্দিরেই আমার সঙ্গে দেখা হবে—এখন আমি যাত্রী ধরতে চললাম।

স্টেশনে নেমে সোজা চলে গেলাম মহাদেবের মন্দিরে। রাস্তাঘাট সব চেনাজানা ছিল। মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম আগে। দেখলাম সেইরকম মন্দিরের পথের দুপাশে গালার তৈরি কাঁচ পাথরের চুমকি বসানো ঝকমকে যত চুড়ির দোকান—সোনার চুড়িকেও হার মানায় তারা—দোকানে বসেই বানাচ্ছে যত কারিগর, যেমনটি নাকি আগেও দেখেছিলাম।

প্যাঁড়ার দোকান তাদের ধারে ধারেই—কিন্তু ধারে খাওয়াবার পাত্র নয় কেউ তারা।

মন্দিরের মধ্যে গিয়ে দর্শন করলাম বাবাকে। কষ্টিপাথরের মত নিকষ কালো তেলতেলে মাথায় হাত বুলোতে কী আরাম! ভালো লাগল বলেই বাবার মাথায় হাত বুলালাম খানিক।

বাবার মাথাটা একটু টোল খাওয়া। তার কারণ স্থানীয় পুরাণ কথায় যা বলে, খুদে পাণ্ডাটির কাছে তা জানা গেল।

একদা শিবভক্ত রাবণ কৈলাস থেকে বাবাকে টেনে হিঁচড়ে নিজের কাঁধে তুলে স্বর্ণলঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছিল। দেবাদিদেবের কিন্তু মোটেই ইচ্ছা ছিল না সেখানে যাবার। কিন্তু ভক্তের বাহুবন্ধন আর মায়াপাশ কাটানো দায়। অ্যাদ্দুর এসে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল, নিজের শীর্ষস্থানীয় সুরধনীকে রাবণের পেটের মধ্যে তিনি সেঁধিয়ে দিলেন। ফলে রাবণকে

দারুণ প্রেরণায় পেয়ে গেল তারপর। বাবাকে ঐখানে নামিয়ে মুক্তধারায় সে স্বচ্ছন্দ হতে বসল। বাবা বললেন, একপ্রহরের মধ্যে তুমি এলে তো এলে, নইলে এই যে আমি বসলাম, নড়ছিনে আর এখান থেকে। রাবণ বলল, প্রহর কিসের ঠাকুর। এক দণ্ডেই আমি আসছি। কিন্তু সেই অফুরন্ত প্রবাহিনীর বেগ কি একটুখানি? চার প্রহর কেটে গেল রাবণের দেখা নেই। তারপরে কাজ সেরে ফিরে এসে কিছুতেই সে আর বাবাকে তুলতে পারে না। নড়নচড়ন নেই আর তার কথারও নড়চড় হবার নয়। রাবণ আর কি করে? ক্রোধভরে বাবার মাথায় বিরাট এক মুক্কা মেরে না নিজের মক্কায় ফিরে গেল সে। তাঁকে একচোট দেখে নিয়ে সেইখানে রেখে গেল অবশেষে।

আর, রাবণের চোট তো চারটিখানি না। তার বিশখানা হাতের বিরাশীমণী ধাক্কাই। একটু টোল খেয়ে তার টাল সামলাতে হলো বাবাকে।

তদবধি ভক্তাধীন ভোলানাথ ভক্তবৎসল নারায়ণের ভৃগুপদ লাঞ্ছনার ন্যায় ভক্তের সেই টিপসই নিজের শিরোধার্য করে রয়েছেন। রাবণের সেই কীর্তি, কর্মনাশা নামে কীর্তিত, এখনো দেওঘর দিয়ে প্রবাহিত নাকি—সেই নদীর জল কিন্তু কেউ পান করে না। স্নান করে না কেউ সেখানে।

সুন্দরীর গালের মত সুচারু না হলেও সেই টোলে হাত বুলোতে গিয়ে গোল বাধল যা! মন্দিরের পাণ্ডারা এমন ধমক লাগালো আমায় যে, টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম!

সঙ্গে আমার কোনো পাণ্ডা ছিল না। বিনা দর্শনীর এই দর্শনার্থীর অযথা হস্তক্ষেপ আর সব পূজারী পাণ্ডার প্রাণে সইল না বোধ হয়। কে না কে তাদের সর্বস্বত্বসংরক্ষিত দেবতার মাথায় এসে নিখরচায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। তাদের তাড়নায় বেরিয়ে আসতে হল বাইরে।

বাইরে এসে মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করলাম একবার। বার বার করছিলেন ভক্তদের অনেকে। মন্দির বেষ্টন করে তার গা-লাগাও সারি সারি ছোট ছোট খুপরির মতন—তার খোপে খোপে মনোবাঞ্ছাপূরণের প্রার্থনায় বাবার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ে রয়েছে কতজন।

তারই একটা খালি মতন পেয়ে তার পৈঠার ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম আরামে। তার আগে চন্নামৃতের কুণ্ড থেকে পেট ভরে পান করে খিদে মিটিয়ে নিয়েছি আমার।

খিদের মুখে সেই চন্নামৃতের স্বাদ প্রায় অমৃতই। রাতদিন কত না পূজার্থী ভক্তিভরে বাবার মাথায় দুধ ঘি দই মালাই গঙ্গাজল ঢালছে, প্যাঁড়ার ভোগ লাগাচ্ছে, তার সবটাই তো ধুয়েমুছে একটা নালি বেয়ে সেই কুণ্ডে এসে জমা হচ্ছে। সে বস্তু যেমন তুষ্টিকর তেমনি পুষ্টিকর, একাধারে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই-ই মেটায়, সন্দেহ কি।

বসে রয়েছি চুপচাপ। এমন সময়ে কোত্থেকে সহসা আমার সমবয়সী সেই কিশোর পাণ্ডাটি এসে হাজির।

এসেই সে গোটা চারেক প্যাঁড়া দিল আমাকে। দোনার মধ্যে নিয়ে প্যাঁড়াগুলো হাতে করেই এসেছিল সে।

এই প্যাঁড়ার জন্যেই কি এখানে বসে এতক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছিলাম আমি নিজের অগোচরে।

কিন্তু আমার মনের কথা ওই ছেলেটা টের পেলো কি করে?

আগেকার কাল হলে, স্বয়ং বাবাই ওর ছদ্মবেশ ধরে আমার কাছে এসেছেন মনে করে তক্ষুনি তার পায়ের তলায় দণ্ডবৎ হয়ে লুটিয়ে পড়তাম হয়ত।

কিন্তু সেরূপ কোনো প্রেরণাই জাগল না আমার—তেমন বিশ্বাস ছিল না তো। পাওয়ামাত্র অম্লানবদনে খেতে লাগলাম প্যাঁড়াগুলো—বিনা বাক্যব্যয়ে। খিদে পেয়েছিল বেজায়।

'তোমাদের পাণ্ডা কে এখানে?' ছেলেটা শুধালো আমাকে।

'পাণ্ডা আছে আমাদের—এর আগে যখন মা-বাবার সঙ্গে এসেছিলাম দেখেছি-তবে নাম জানি না তাঁর। ইয়া গাট্টাগোট্টা চেহারা।'

'এখানকার সকলের চেহারাই ভাই ঐরকম। বাবার প্রসাদে আর রোজ বিকালে ওই ভাঙ খেয়ে।' বলে হাসতে লাগল ছেলেটা—'ভাঙই বাবার উত্তম ভোগ। পেস্তা বাদাম পিষে মালাই লচ্ছির সঙ্গে মিলিয়ে বানানো হয়। খেতে যা—কী বলব। আহা!' তার দুই চোখ নিমীলিত হয়ে আসে।

'ভাঙও খেতে দেবে নাকি আমায়?' আমি সভয়ে বলি—'বাবার ঐ উত্তম প্রসাদ?'

'না না, তোমাকে দিতে যাব কেন ভাঙ?' সে আমার ভয় ভাঙতে চায়: 'বাঙালীরা ভাঙ সইতে পারে? খেলে তুমি উলটে পড়বে এখনই।'

যে ক'দিন ওখানে ছিলাম মন্দিরের চত্বরেই পড়ে থাকতাম। রাতভোর ভক্তের ভিড়ে গমগম করত জায়গাটা। খিদে পেলেই চন্নামেত্ত আর মাঝে মাঝে সেই ছেলেটা এসে প্রসাদী প্যাঁড়া দিয়ে যেত আমাকে। যজমানদের পুজো করিয়ে বাবার কাছে দেওয়া তাদের ভোগের থেকে পাওয়া নিজের ভাগের খানিকটাই বোধ হয়।

সকালবেলা উঠে বেরিয়ে পড়তাম এদিকে সেদিকে যেদিকে দু চোখ যায়—দেওঘরের যে কোনো রাস্তা ধরে। একদিন গেছলাম ত্রিকুট পাহাড়ে, আরেকদিন নন্দনকাননে। তবে যেদিন যমুনাজোড়ে (ঝিরঝির বয়ে যাওয়া পাহাড়ী নদীর নাম) গেছলাম সেদিনটির কথা বিশেষ করে মনে আছে আমার এখনো।

চাষীদের সবিস্তার আখের খেত ছিল যমুনাজোড়ের দু'ধার ঘেঁষে। যেতেই তারা সমাদরে অভ্যর্থনা করে এক ভাঁড় রস (আহা, কী তার মাধুরি!) খেতে দিয়েছিল আমায়। আমি না না করলেও তারা আমার মানা শোনেনি। দেহাতী লোকের এই স্নেহাতিশয্য বিস্মিত করেছিল আমাকে। কে জানে এখনো আখের চাষ হয় কিনা সেখানে—প্রাণ টানে সেখানে যাওয়ার জন্যে আমার এখনো! আখেরে আর যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও আমার। এখনো কি তারা সেদিনের মতই অচেনা অতিথিকে আমন্ত্রণ জানায়—তেমনিই সরস উপচারে সাদরে?

॥ বত্রিশ ॥

মাঝে মাঝে এমনি বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরে দীর্ঘদিনের জন্য ডুব মারলেও বাবা-মা'র মনে আমার জন্য কোনো ভাবনা হতো বলে মনে হয় না—সামান্য একটা মার্বেল ডুবলেও পুকুরের বুকে যতটুকু তরঙ্গ তোলে, আমাদের বাড়ির নিস্তরঙ্গ পরিবেশে ততটুকুও চাঞ্চল্য জাগত না বোধ করি।

বাড়ি থেকে চলে গেলেও যেমন তাঁরা ভাবিত হতেন না, তেমনি দীর্ঘকালের পর আবার বাড়ি ফিরে এলেও অভাবিত কোনো উল্লাস দেখিনি তাঁদের। সব একেবারে স্বাভাবিক। এতকালও যেন বাড়িতে ছিলাম এইরকম ভাব—অতকাল বাইরে কাটিয়ে এলেও। কোথায়

ছিলাম, কী করেছি, কিভাবে কাটালাম তার কোনো প্রশ্নই ছিল না, কৌতূহলও নয়, খাপছাড়া তরোয়ালের মতই যথারীতি খাপ খেয়ে যেতাম নিজের বাড়ির খোপে আবার।

বাবা-মা যে আমার প্রতি উদাসীন বা স্নেহহীন ছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন ঐ একরকমের। একদা সন্ন্যাসে কাটানোর জন্যেই কিনা কে জানে, বাবা ছিলেন সব বিষয়ে নির্বিকার, সব সময় নিরুদ্বিগ্ন। আর মা? মা তো আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন একপ্রকার। বলতেন, 'তোদের দু' জনকে মা'র পায়ে সঁপে দিয়েছি, আমার কোনো ভাবনা নেই তোদের জন্যে আর। কোনোদিন তোরা কিছু দুঃখকষ্ট পাবিনে, গোল্লায় যাবিনে কখনোই। আমি নিশ্চিন্ত আছি।

মা'র কথায় নিশ্চিন্ত ছিলাম আমিও। কদাচ নিজের জন্যে কিছু ভাবিনি কখনো। না বর্তমানের না ভবিষ্যতের ভাবনা—কোনোদিন আমায় বিচলিত করেনি একটুকু। ভাবনার কারণ আসার আগেই তা কাটাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দারিদ্রের মধ্য দিয়ে গেছি দুঃখ পাইনি, আগুনের আওতায় থেকেচি আঁচ লাগেনি গায়ে, কে যেন সবসময় আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছে আমায়।

রোগা পটকা দুর্বল দেহ নিয়ে পড়াশুনায় কাঁচা, টাকাকড়িতে ফাঁকা, নিতান্ত অপদার্থ এই আমি কি করে আমার যৎসামান্য জীবনে এত কাণ্ড করলাম, ভাবলে অবাক লাগে 'প্রকান্ড তার কোনোটাই হয়ত নয়, কিন্তু সব তিলগুলি জড়ো করে যে তাল, তাকে তো আর বাতিল করা যায় না। পঙ্গু-আমি গিরি লঙ্ঘন করতে পারিনি ঠিকই, (বিশ হাতের অমন বাহুবলশালী রাবণও তো স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে যেতে পারেনি।) কিন্তু প্রায়-মুখ্যু মূক আমি মুখর হলাম যে! মুখ্য নাই বা হলাম। আমার পক্ষে সেটাই কি কম নাকি! তা যার কৃতিত্বে বা কৃপাতেই হই না কেন! আলো যেখান থেকেই আসুক, এই মাটির প্রদীপেই জ্বলছে তো?

এই জীবনে সব কিছুর সোয়াদই তো এক-আধটু পেয়ে গেছি। কিছুর জন্যেই কোনো খেদ নেই আমার। কোনো লোভ না, কোনো ক্ষোভ নয়।

আত্মতৃপ্ত হলে কিছু হয় না; এই আত্মতৃপ্তির জন্যই বোধ করি কিছুই হল না আমার। লেখককর্মে বা কর্মলেখায় উল্লেখ্য তেমন কিছু। কিন্তু কিছু না হওয়ার মধ্যেও যেমন কিছু হয়ে যায়—কিছু-কিছু হওয়া যায়, ভেবে দেখলে সেই-কিছুটা তো কিছু কম নয়। যৎকিঞ্চিৎ জীবনে তাই আমার যথেষ্ট।

আধারটাই বড়ো কথা। বড়ো আধারে বেশি ধরে—বেশি ক্ষমতাই বেশি পারে। হ্রদের বুকে যত জল জমে গোষ্পদে কি আর তত! আকাশের ছায়া অবশ্যি দু'জায়গাতেই দেখা যায়—দু'খানেই ছড়ানো—দুই-ই তার মায়া জড়ানো; কিন্তু হ্রদের বিশালে যে বেশি বর্ষণ হয় নদের প্রবাহ বয়ে সেই স্নেহধারাই দু'ধারেই তৃষিত শ্যামল অধর সরস করে সমুদ্রের বুকে গিয়ে হারায় আবার। ফের আবার সূর্যের আকর্ষণে উচ্ছসিত সেই স্নেহই আকাশের মেঘপুঞ্জে সঞ্চিত, হ্রদে বর্ষিত আর নদের দ্বারা বাহিত হয়ে যথাসময়ে সাগরমোহনায় গিয়ে গদ্‌গদ। এই-ই লীলা।

পরিমিত শক্তির মধ্যে যে স্তিমিত, সীমিত গন্ডীর মধ্যেই তার লিমিট্; নিজ সীমান্তের বাইরে কিছুই তার করার নেই। এবং তার হেতু খেদ করে (কিংবা জেদ করেও) লাভ হয় না কোনো।

৮ রবীন্দ্রনাথ যেমন। একাধারে হ্রদ, নদ আর সমুদ্রের সমাহার। এপর্যন্ত মানুষের পরিণতিতে পরিপূর্ণ মানবতার ঠিক না হলেও, মানবিক পরিপূর্ণতার মাপকাঠি রূপেই ধরা যায় তাঁকে। সেই রবীন্দ্রনাথকেই ধরুন। আধারটা তাঁর কেমন, দেখুন একবার। জন্মসূত্রে পাওয়া স্বাস্থ্য, শরীর আর সম্পদ, মহর্ষিতুল্য পিতৃমাহাত্ম্যে ব্রহ্মসূত্রে টিকি বাঁধা সেই বাল্যকালেই! বৃত্ত এবং মূলের এই একাত্মীয়তা—বৃত্ত আর বৃত্তির এমন সমন্বয়—যা প্রায় দেখা যায় না। আগাগোড়া তাঁর জীবনবৃত্তান্তেই তার পরিচয়। পারিবারিক সূত্রে জন্মলব্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সহজ যোগাযোগ, সুযোগসুবিধা। অসাধারণ আভিজাত্য। তিন যুগের ঐতিহ্য। স্বভাবত-অর্জিত সেই মহাসম্পদ স্বচেষ্টায় বহুগুণ বর্ধিত। সুন্দর শরীর আর স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলেন, ব্যায়াম কুস্তি করে তা আরও সুগঠিত করেছেন—হাতের কব্জিটা কি দেখেছিলেন তাঁর? সেই অনুপাতে দীর্ঘায়ত দেহ—রূপে অপরূপ। নিজ আয়াসে যেমন তাঁর দেহগঠন, নিজ প্রয়াসেই তেমনি আত্মশিক্ষণ। সেই সঙ্গে একাত্মভাবে অনন্তযোগে কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে সংস্কৃতিসৃজনায় অফুরন্ত তাঁর স্বতোৎসার। আজীবন। অশ্বমেধযজ্ঞে দিগ্বিদিক-বিজয়ে বেরিয়েছেন যেমন, তেমনি আবার শান্তিনিকেতনে ছিল তাঁর রাজসূয়—বিশ্বভারতীর যে মহৎ যজ্ঞে সারা বিশ্বের আমন্ত্রণ। সেখানে নানান দেশ থেকে তাঁর প্রায় সমযোগ্যরা রাজকর নিয়ে এসেছে। নানান কর্মকাণ্ড আর কল্পকীর্তির নানা রূপে নিজের নব নব উন্মেষে মজে থেকেছেন—নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি দেশবিদেশে।

দৈবকৃপার মূলধনকে পুরুষকারের সাধনায় বহুগুণ বাড়িয়েছেন—তার পুরস্কার তিনি দিয়ে গেছেন শুধু তাঁর স্বদেশীয়দেরই নয়, বিশ্বজনকে। কল্পবৃক্ষের মতই তাঁর অকল্পনীয় বিস্তার—যেমন জাতির মেদমজ্জায় বিস্তৃত হয়েছে তার শিকড়, তেমনি ফের নানান কান্ডে ফলাও হয়ে তা দিগ্বিদিকে বিস্তারিত—তাঁর সাফল্যে ফলবান—ফলভোগী আজ সকলেই। তাঁর মৌলিক চেতনার আলোয় আর সাধনার সম্পদে আমূল নতুন করে গড়ে দিয়ে গেছেন তাঁর স্বদেশ-তাঁর স্বজাতিকে।

সেই হিমালয়তুল্য অভিব্যক্তির সম্মুখে ব্যক্তিত্বে আমরা তো ঢিবিই। অবিনশ্বর ঐশ্বর্যের সামনে ক্ষণভঙ্গুরতার পরমাশ্চর্য। কিন্তু হাজার হাস্যকর হলেও পাহাড়ের সঙ্গে উইঢিবির তুলনাকরা যায় বোধ হয়। সেই WE ঢিবিদের অন্যতম নগণ্যতম এই আমার তাঁর সঙ্গে তুলনায় কী দেখি?

প্রৌঢ় পিতার ঔরসলব্ধ দুর্বল দেহে জন্মসূত্রে মা'র হাঁপানির উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছি—বেড়ে উঠেছি পোড়ো বাড়ির আওতায়, হোক না নাম তার ওল্ড প্যালেস, টাকাকড়ির ঝুলি ফাঁকা, পড়াশুনায় ঘোড়ার ডিম।

উচ্চতর অভিজাত সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ নেই কোনোখানেই। অবশ্যি গায়ে যেমন এক কড়ার ক্ষমতা ছিল না, তেমনি কাঁধের ওপর বোঝা বওয়ারও কড়ার করিনি কোনো—সাংসারিক দায়ধাক্কার সাথে লড়ালড়ির কোনো কড়াকড়ি ছিল না আমার। না দেহে, না মনে, না মস্তিষ্কে, না জ্ঞানে, না বিদ্যায়, না বুদ্ধিতে, এক কড়ার পুঁজি নিয়ে আসিনি, অহংকারের কিছু চাটুতাও ছিল না তাই। কিন্তু এই কড়ার মধ্যেই বুঝি ক্রান্তি মিলে যায়, নিজের মনেই কেমন করে যেন জানি, তাঁর সংযোগের সংক্রান্তি হলেই। সর্বহারা তার সর্বস্ব হাতে পায় বুঝি অবলীলায়।

মানস সরোবরের বিরাট আধার নয় আমার (রবীন্দ্রনাথের যেমনটি ছিল), আমার ফুটো ভাঁড়ে একটি ফোঁটাও জল ধরে না। আমার ভাঁড়ে ভবানী আমি জানি। আমার ছ্যাঁদার খবর আমি ভালোই রাখি, আমার ছিদ্রান্বেষীরা আর কতটা রাখেন তার। কিন্তু এই মাটির ভাঁড়ের ছিদ্রপথেই, কার মায়ায় কে জানে, অলকনন্দার প্রবাহিনী বয়ে যায়—সেই রহস্যের মূল কোথায়! নিজে ফাঁকা হলেও, ফাঁকিতে পড়লেও, নিজের ফাঁক দিয়েই সে বহুজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে—স্বয়ং তৃষিত থেকেও। টালা ট্যাংকের বিপুল পুঁজি কলের কৌশলের ভেতর দিয়ে গলে গেলেও পাইপ নিজে সে শুন্য শুষ্কই থাকে—কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে বসে না সে। সম্পূর্ণ নিজের জলাঞ্জলির মধ্যেই কোথায় যেন তার সার্থকতা থেকে যায়। ভবানীই ভাঁড় পূর্ণ করে থাকেন, রাখেন ; তাই সে নিজের ভাঁড়ার শূন্য করে সব উজাড় করে সবাইকে দিলেও তাঁর ভাঁড়ের ভাঁড়ার কখনই আর ফুরোয় না। মধুসূদনদাদার দইয়ের ভাঁড়ের মতই, উপুড় করে ঢেলে দেবার পর চিত করলেই ফের ভর্তি আবার! সেই হেতুই স্বয়ং শঙ্করাচার্যও সোহংতত্ত্বের সবিশেষ বিচারের পরেও তাঁর সর্বশেষ সার কথাটি কয়ে গেছেন—গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী। তাবৎ শূন্য ভাঁড়ের ছিদ্রপথে নিজের গতিমুক্তি দিয়ে যেমন নিজেকে তিনি বিলিয়ে যেতে থাকেন, তেমনি থেকেও যান আবার—আশ্চর্য সেই কেকের মতই বুঝি, যা খাওয়া যায়, সবাইকে খাওয়ানোও যায়, তেমনি আবার হাতেও রেখে দেওয়া যায় সবখানাই।

টইটম্বুর মানস সরোবর আর ফাঁপা জলের কল সমান পাত্র না হলেও সমগোত্রই। দু'জনেই জল যোগায়। কার জল কে জানে!

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ইস্কুল থেকে ফিরলাম। এনট্রেন্স-এর টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছিল সেদিন। কোনোরকমে পাশ করে গেছি।

অথচ পাশ করার কোনো আশা ছিল না। ক্লাস টীচাররাই তো আমাদের খাতা দ্যাখেন। এগজামিনারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আর জনে জনে জিজ্ঞেস করে সব কিছুর ফলাফল আগের থেকেই জানা ছিল আমাদের। কে কোন্ সাবজেক্টে কেমনতর মার্ক পেয়েছে, কার রেজাল্ট হয়েছে রিমার্কেবল্।

আমারটাও রিমার্কেবল্ বলতে হয়। আবার নতুন করে মার্ক দিতে হয়েছে আমায় একটা খাতায় অন্তত। আমার অঙ্কের খাতাতেই, বুঝতে পারলাম।

মার্কামারা সেই খাতাটি আমার—কার না জানা ?

ভারতের সনাতন আর্যরাই সবপ্রথম সংখ্যার মধ্যেকার শূন্য-কে আবিষ্কার করেছিলেন শোনা যায়। সেই শূন্যকেই আমি পুনরাবিষ্কার করেছিলাম আমার অঙ্কের খাতায়, জেনেছিলাম আমি। বরাবর যেমনটি হয়ে এসেছে। আর, বরাবরই আমায়, কেন জানি না, ওপর ক্লাসে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অঙ্কে আমি চিরদিনিই কাঁচা। সাংখ্যযোগে চিরকালই আমার ঐ শূন্যলাভ। দেবী অঙ্কশায়িনী কোনোদিনই আমার মুখ তুলে তাকাননি। তাঁর সঙ্গে আমার শুধু মুখের সম্পর্ক।

বাণিজ্যার দোকানের গোল্লা নয়, গোল্লার মোকামে বাণিজ্য করে এবারকার এই পাল্লা উৎরে যেতে পারব সে ভরসা আমার ছিল না। স্বপ্ন দেখেছিলাম কত-যে। এখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে কলকাতায় পড়তে যাব, সেখানকার কলেজে ভর্তি হব গিয়ে, সেই

কলেজ , কোন কলেজে জানিনে—শুনেছি মাত্র, যেখানে নাকি ছেলেরা মেয়েরা এক সাথে পড়ে—কত মেয়ের সঙ্গে ভাব হবে আমার, কত সঙ্গিনী পাব— সুন্দর সুন্দর মেয়ে সব। বোনের মতই বা বন্ধুর মতই হল না হয়—সেই বা কী কম লাভ ? ইংরেজি বাংলা যে বানানেই ধরিনে কেন। আগুনের কাছাকাছি থাকাটাই যে অনেক, আঁচ পাওয়া যায় তো। ছোঁয়াচ লাগেই। আলো আসে—ভালোবাসার ষোলো আনা নাই পেলাম। আলোকিত হই তো। দেহমন গরম রাখতে পারি। সেই কি কম ?

মাথায় ওঠার নাই নাইবা দিল কেউ, নাও বা উঠলো মাথায়। একটুখানি মুখোমুখি হওয়ার সেই যে সুখ ?

একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু গান শুনি—তাই নিয়ে মনে মনে কি ফাল্গুনীর মৌসুমী আনা যায় না ?

কারো পুরো মন যদি নাও পাই, গুঁড়ো মন তো পাবই ; একমন যদি নাই হতে পারি কারো সঙ্গে, এক তিল তো হবই। মনেক না হলেও সেই আমার অনেক। তিল তিল কুড়িয়েই না তিলোত্তমা ?

'তিল তিল তিল মন/মন্দির তাই নিয়ে। /কণা কণা চুম্বন/কনারক তাই দিয়ে॥' এ রচনা তো আমারই—তখনকার না হলেও ঢের পরের আমারই ছত্রখান সেই। আর, তিল তিল জমে ওঠা সেই যে তাল, তার পাল্লাই কে সামলায় তখন ?

কিন্তু পরোক্ষে পাওয়া পরীক্ষার ফল জেনে সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল আমার। অশ্বমেধের দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ছত্রপতি হবার আগেই আমার ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। কুরুক্ষেত্র কান্ডর আগেই মহাপ্রস্থান !

তখনই আমি মা'র কাছে শেখানো সেই প্যাঁচ খাটিয়ে ভ্রূমধ্যবিন্দুর মা বিন্দুবাসিনীকে স্মরণ করেছি, শরণ নিয়েছি তাঁর—মা, তরিয়ে দাও আমায় এযাত্রায়। এবার থেকে আমি খুব ভালো ছেলে হব তুমি দেখো। মন দিয়ে পড়াশুনা করব এখন থেকে। কলেজের ক্লাসে গিয়ে প্রক্সি-টক্সির ফাঁকি দেবো না আমি একদিনও—তুমি দেখে নিয়ো।

তারই প্রত্যুত্তরে কি উৎরে গেলাম আমি ?

মা'র প্যাঁচের সেই মারপ্যাঁচেই, নাকি বাবার খাতিরেই (যদিও জানি আমার উদাসীন বাবা কারো জন্য কোনো কিছুর জন্যেই কখনো কাউকে অনুরোধ উপরোধ করতে যাবেন না কদাচ) নাকি, ইংরিজি বাংলা ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির খাতায় একটু ভালো করেছিলাম বলেই কি আমায় এই তরিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

বাড়ি ফিরেই টিপকরে পেন্নাম ঠুকলাম মাকে,'টেস্টে অ্যালাউ হয়ে গেছি মা। এবার আমি কলকাতায় গিয়ে পড়ব তো ? মালদা টাউনে তো কোনো কলেজ হয়নি এখনো।'

'তাই পড়িস। কলকাতার কলেজেই পড়বি তুই।'

'কো-এডুকেশনের কলেজে ভর্তি হব কিন্তু আমি ?'

'তাই হোস, তার কী হয়েছে।'

'রিনিদের বাড়িতে থেকেই পড়বো তো মা ?'

'পরের বাড়িতে থাকতে যাবি কেন রে ?'

'মাসিমারা কি পর হয়ে গেল তোমার ?' আমি ফোঁস করলাম। আমার কাছে যে তা মোটেই পরের বাড়ি নয়, পরীর বাড়িই বরং, সে কথাটা আর ফাঁস করলাম না। গুরুজনদের

সামনে কখনই রং সাইডে থাকতে নেই।

'না, পর নয়, না হলেও...তাহলেও কেন তুই থাকতে যাবি সেখানে ? হোস্‌টেলে থেকে পড়বি তুই। তোর সমবয়সী আর সব ছেলের সঙ্গে—সেই তো ভালো রে। ভালো কলেজে ভর্তি হবি, ভালো ছেলেরা সব পড়ে সেখানে, সেইসব ভালো ছেলেদের সঙ্গে এক হোস্‌টেলে থাকবি তুই। কিন্তু...

'কিন্তু কী মা ? কিন্তু কিসের !'

'কিন্তু তা হলে তো তোকে ফার্স্ট ডিভিশনে খুব বেশিবেশি নম্বর রেখে পাশ করতে হবে রে। এই ক'মাস পড়তে হবে দারুণ। নভেল-টভেল পড়া, ঐসব ছাইভস্ম লেখাটেখা ছেড়েছুড়ে, তা কি তুই পারবি করতে ?'

'কেন পারবো না মা? খুব পারবো তুমি দেখো। পড়ার টেবিল ছেড়ে এক মিনিটের জন্যও আমি উঠব না। বেরুব-টেরুব না কোথাও—দেখতে পাবে। দিনরাত পড়ব। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ তো করবই—প্রথম দশজনের মধ্যে না হই, একশ জনের একজন তো হবোই।'

'তাহলেই হলো। তুমি একাই একশ। তোকে আর পায় কে তখন !'

'ক'টা মাস মা। এই ক'মাস আর পড়তে পারব না একটু কষ্ট করে ?'

'কষ্ট কিসের ! অভ্যেস হলে পড়ায় মন বসে গেলেই দেখবি পড়ার মতন আনন্দ আর হয় না। কী ভালোই লাগে যে পড়াশুনা করতে। দেখতে পাবি তখন।'

'তাই তো চাই মা আমি, ফি বছরই তো ফেল করতে করতে কোনো গতিকে পাশ করে প্রতিজ্ঞে করি যে, এর পর থেকে একমনে পড়ব আমি—একটানা পড়ে যাব। কিন্তু কী করে যে সব গুলিয়ে যায় মা, কোত্থেকে এত ফ্যাকড়া জোটে কিছুই হয় না আমার।'

'এবার হবে তোর। ভালো কলেজে পড়বি, ভালো হোসটেলে থাকতে পাবি—হতেই হবে তোর এবার। ভালো কলেজে ভালো ভালো ছেলেরাই পড়তে যায়, পড়তে পায়—ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট মাস্টাররাই সব পড়ায় সে কলেজে, যত জজ ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের ছেলেরাই পড়ে সেখানে—বড় হয়ে তারাও তাই হবে সবাই। তাদের সঙ্গে পড়বি তুই। কেবল পড়াশুনাটাই সব নয় রে, সঙ্গটাও চাই সেইসঙ্গে আবার !'

'চাই বই কি মা !' সোৎসাহে সাড়া দিই : 'সঙ্গটাই তো আসল।' ...মধুর বৃন্দাবন মাঝ/মধুর মধুর রসরাজ/মধুর যুবতী জনসঙ্গ—মধুর মধুর রসরঙ্গ ! ...পদাবলী আওড়াই। মনে মনেই। বলেই মনের জিভ কেটে ভুল শুধরে নিই তক্ষুনি 'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা/ভবতি ভবার্ণব—তরণে নৌকা ! নিশ্চয় মা।'

'বিপদাবলীর থেকে সাত পা পশ্চাদপসরণ আমার তৎক্ষণাৎ।

'হ্যাঁ, সঙ্গতির জোরেই তরে যায় মানুষ। সঙ্গ গুণেই সৎ মহৎ হয়, আবার সঙ্গদোষেই অধঃপাতে যায়। এই জন্যেই বলে, পড়াবি তো পড়া পো, নইলে সহবতে থো। ছেলেকে যদি তোর লেখাপড়া শেখানোর সাধ্যি না থাকে, অন্তত তাকে ভদ্রজনের সহবতে রাখ—তাহলে সভ্য আদবকায়দা শিখে ভদ্র চালচলনে রপ্ত হয়ে একদিন না একদিন সে নজর টানবে সবার, প্রশংসা করবে সবাই—তার পেটে বিদ্যে কী আছে না আছে, দেখতে যাচ্ছে কে ? তার পরে যদি কখনো কোনো মহৎ জনের নেকনজরে পড়ে যায় এক চোটেই, হিল্লে হয়ে যাবে তার।'

'হ্যাঁ, মা।'

'বড় কলেজে বুঝলি, বড় বড় ঘরের ছেলেরা সব পড়ে—তাদের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা হয়ে গেলে ভাবনা কি তোর? তারা বড় হলে উঁচুতে উঠলে তোকেও ওপরে টেনে তুলবে। তাদের সমকক্ষ করে নেবে। নীচে পড়ে থাকতে দেবে কেন ? আগেকার বন্ধুদের ওপর কি টান থাকবে না তাদের ?'

'থাকবে বই কি মা ! আমারও কি টান নেই নাকি ?'

'তোর আবার কার ওপর টান রে ?'

'আমিও আমার বন্ধুদের টেনে তুলব সব ! দেখো তুমি। বিষ্টু-টিষ্টু, কাবিল হোসেন-টোসেন কাউকে বাদ দেবো না নিশ্চয়।'

'তাই তো করতে হয়। ওঠা যেমন ভাগ্যের কথা, অপরকে টেনে তোলা আরো বড়ো ভাগ্যের। ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও ওঠাতে হয়, নইলে তারাই একদিন টেনে নামিয়ে ছাড়ে—তুলে আছাড় মারে আবার। ঐ নিচুতলার মানুষগুলোই।'

'কবিও তো তাই বলে গেছেন মা ! যারে তুমি নিচে ফ্যালো/সে তোমাকে টানিবে যে নিচে। পশ্চাতে রেখেছো যারে/সে তোমারে পিছনে টানিছে।'

'সবাই মিলে উঠতে হয়—সবার সাহায্য নিয়ে—সবাইকে সাহায্য করে। এ-ই দুনিয়ার নিয়ম। পরের সাহায্য নিয়ে তবেই লোকে দাঁড়ায়। চলতে শেখে, এগুতে পারে। পরস্পরের ধাক্কায় পরস্পর এগোয়। সবার সাহায্যে সবাই ওঠে। এখানে বাঁচতে হলে, সভ্যসমাজে বাস করতে হলে, কাউকে না হলে কারু চলে না। তুই যার সাহায্য পেলি তাকে যদি ফিরে ফের সাহায্য করার সুযোগ নাও পাস, অন্য কাউকে সাহায্য করে তার প্রতিদান তোকে দিতে হবে।'

'তা তো হবেই। আমিও তো তাই চাই মা। সবাইকে নিয়ে সবার সঙ্গে উঠতে চাই আমি।'

'তা যদি চাস তো এখন থেকেই পড়াশুনায় লাগ। ফাঁকি দিসনে আর। এক পা এক পা করে এগুতে হয়—এগুতে থাক তাহলে।'

'নিশ্চয় মা। এখন থেকেই পড়াশুনায় লাগব মা উঠে-পড়ে, দেখো। । বলেই আমি উঠি—'এখুনি আমি পড়ার টেবিলে গিয়ে বসছি, দ্যাখো না ! তোমার আশীর্বাদে আমার সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি দেখো।'

'বলেই মা'র পায়ের গোড়ায় আমার আরেক ঢিপ। (কিন্তু ঐ ঢিপ্‌কারের সঙ্গে যে দৈবের ধিক্কার ছিল তা কে জানত !)

না, এবার থেকে তৎপর হতে হবে আমায়। পড়াশুনায় যার-পর-নাই মন দিতে হবে। অবহেলা করলে চলবে না আর। অনেক দায় আমার ঘাড়ে...বড় দুঃখ বড় দৈন্য, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার...ইত্যাদি ইত্যাদি...কবির বাণী মনে পড়তে থাকে ক্ষণে ক্ষণে।

মা'র কৃপায় যখন ত্রাণ পেয়ে গেছি ঐ যাত্রায়, তখন আর আমায় পায় কে। কিন্তু এক একবার কোনোরকমে উৎরে গেলেই তো চলবে না, অনেক উত্তরণ আমার সম্মুখে। শুধু আমার উত্তরণ নয়, অনেকের। অনেকের সহিত আমার।

কিন্তু হায়, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সেই উত্তরণ যে প্রায় দাক্ষিণ্য লাভের ন্যায়ই দুর্ঘট। এক সঙ্গে সকলের উত্তারায়ণ, সে তো আরো অনেক দূর। তাছাড়া...

তাছাড়া, ভ্রূসন্ধানে মা বিন্দুবাসিনীর করুণাবিন্দু তখনকার মতন পেলেও ক্ষণেকের জন্যে বারেক মা মুখ তুলে তাকালেও সেই কৃপাকটাক্ষের আড়ালে যে তাঁর ভ্রূকুটিও থেকে গেছে

'তা কি আর জেনেছি তখন। কতো কীই জানার বাকী ছিল যে।

আমার ওই ভিরকুটিতে যে তিনি ভুলবার পাত্রী নন, জানি কি তখন।

॥ তেত্রিশ ॥

ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে অহিংস লড়ায়ের স্বেচ্ছাসৈনিক হয়ে ইংরেজবাজারে পা দিতেই শহরের বড় রাস্তার ধারে ধারে সারে সারে খাজার দোকান নজরে পড়ল আমার।

খাজা কথাটার মধ্যেই যেন একটা আমন্ত্রণ রয়ে গেছে—যদিও ওই রাষ্ট্রভাষাতেই—মানে, খেয়ে যাও। খা যা তো বটেই, কিন্তু কাছে গিয়ে হাজার হাঁ করলেও যে একখানা পাওয়া যাবে,—মুখে তুলে দেবে কেউ—তা আমার মনে হয় না। এ তো আর চাঁচলের সেই বাণিজ্যার দোকানের অবাধ বাণিজ্য নয়। এখানে টাকা বাজালে তবেই নাকি খাজা মেলে। কিন্তু কোথায় আমার টাকা যে।

খোঁজখবর নিয়ে স্থানীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে পৌঁছতে দেরি হোল না। টাউনের তখনকার প্রথম সারির উকীল বিপিনবিহারী ঘোষ মশাই মালদার কংগ্রেসী পান্ডা, একটুখানি খোঁজ খবর পেলাম, আর খবর নিতেই না তাঁর নাম ঠিকানা মিলে গেল তক্ষুনি।

তাঁর কাছে গিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে আগমনের কারণ জানাতে তিনি বললেন—'তা বেশ-বেশ তো। তোমার বাবাকে আমি ভাল রকম জানি—সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি যদিও। আরো কিছু কিছু ছেলে এসেছে এই জেলার এখান-সেখান থেকে—তোমাদের ওধার থেকে এখনও কেউ আসেনি তেমন। তুমিই। প্রথম। তবে আসবে সব, এসে পড়বে সবাই। দেশের ডাকে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারবে কেউ?'

মনের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর কথায় ব্যক্ত হয়।

'সেই ছেলেরা সব কোথায়, যারা এসেছে আরো?' আমি জানতে চাই।

'স্বরাজ কুটীরে রয়েছে সব। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে একটা ছোটখাট বাড়ি নেওয়া হয়েছে তো—সেখানেই আছে। সেখানেই তাদের খাওয়াদাওয়া থাকা। সেখানেই পাবে সবাইকে।'

'কী করে তারা?'

'চরকা কাটে, মদের দোকানে, বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে, পথে পথে গান গেয়ে তিলক স্বরাজ ভান্ডারের চাঁদা তোলে—এই সব আর কি। আপাতত এই। এর পর দাশ মশাই এসে আমাদের যেমন নির্দেশ দেবেন তাই হবে।'

'কবে আসবেন দাশ মশাই?' আমি শুধাই।

'আগামী হপ্তায়। তাঁর টেলিগ্রাম এল এই মাত্র।'

'খুব—খুউব ভালো।' খবরটা এমন ভালো লাগে আমার।

'এখন যাও, আমার লোকের সঙ্গে গিয়ে স্বরাজ কুটীরটা দেখে এসো গে। ওখানে আরো সব স্বেচ্ছাসেবক আছে না? প্রায় তোমার বয়সীই সবাই। তাদের সঙ্গে তোমার ভাব হবে—তাদের সঙ্গেই থাকবে, কাজ করতে হবে তো?'

'কী করতে হবে আমায়?'

'তোমাদের ক্যাপটেন যা বলবেন। চরখা-টরখা কাটতে হবে, পিকেটিং-টিকেটিং—এই সব আর কি। তবে ওখানে রাত্তিরে থাকতে হয়ত কস্ট হবে তোমার। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে শোয় কিনা ওরা। তোমার তো অভ্যেস নেই। কোনো চৌকি তক্তপোষ নেই ওখানে। তবে রাত্তিরের খাওয়াটা সেখানে সেরে এখানে আমার বৈঠকখানায় এসে শুয়ো

তুমি বরং। কেমন ?'

'এই বিরাট তক্তপোষে ?' ঘরজোড়া বিস্তারের দিকে আমার অঙ্গুলি বিস্তারিত।

'হ্যাঁ। এখানেই দিনে আমার দপ্তরখানা বসে—আমার কোর্ট-কাচারির কর্মচারী, মুহুরি, তশিলদার সবাই বসে কাজকর্ম করে এখানে সারাদিন। রাত্রেও আমার জনকয়েক কর্মচারী শুয়ে থাকে। তুমিও শুয়ে থাকবে এদের মধ্যে এক পাশটিতেও। অনেকখানি জায়গা। শোয়ার কোনো কষ্ট হবে না তোমার। তোমার মতন ন'জন শুতে পারে এই বিছানায় অক্লেশে। বুঝলে ?'

ছ'খানা তক্তপোষ জোড়া ন'জনের শোবার মত বিছানার সেই নয়-ছয় ব্যাপার—বাস্তবিক, চেয়ে দেখবার মতই।

'বিকেলে তো কিছু খাওনি তুমি ? ট্রেন থেকে নেমেই চলে আসছ তো ? কোনো দোকান থেকে কিছু মিস্টি—টিস্টি কিনে খাও গে। তারপরে স্বরাজ কুটীরে রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে এখানে চলে এসো, কেমন ?'

তিনি একটা টাকা দিলেন আমায়।

টাকাটা হাতে আসতেই আমি রাজা! সোজা চলে গেলাম এক খাজার দোকানে।

তিনি একজন লোক দিয়েছিলেন সঙ্গে-স্বরাজ কুটীর দেখিয়ে দেবার জন্য।

রাস্তায় নেমে, খানিকটা গিয়েই না, প্রায় মাছির মতই ভাগিয়ে দিলাম সেই লোকটাকে। পাছে খাজার ভাগ দিতে হয়, মাছির মতই আমার খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে শেষটায়!

'দরকার হবে না। খুঁজে নিতে পারব তোমাদের স্বরাজ কুটীর। যেমন করে বিপিনবাবুর খোঁজ নিয়ে এলুম না আমি—তেমনি করেই খুঁজে নেব।' বাতলে বিদায় করে দিলাম লোকটিকে।

খাজায় পেট বোঝাই করে স্বরাজ কুটীরে গিয়ে হানা দিলাম তারপর।

প্রায় আমার সমবয়সী জনকয়েক ছেলে প্রকাণ্ড একটা থালার চারধার ঘিরে বসেছিল নারকেল আর মুড়ি নিয়ে।

'আমিও ভাই তোমাদের একজন ভলান্টিয়ার। এখানে এলাম আজ।' নিজের খবর জানালাম। —'থাকব তোমাদের সঙ্গে এখানে।'

'বাঃ বাঃ! বেশ বেশ!' সবাই ওরা উৎসাহিত—'এসো, বসে পড়ো আমাদের সঙ্গে।' থালার এক পাশে একটুখানি জায়গা করে নিলাম।

'পেট আমার বেশ ভর্তি আছে, তাহলেও নারকেল মুড়ি খেতে আমার আপত্তি নেই।' বলতেই না বসে পড়লাম, খাবার ওপর টান আমার বরাবর—কোনদিনই তা যাবার নয়। খাদ্য অখাদ্য যাই হোক না, পেলেই খাই।

পেলেই খাই, আর খেলেই পাই—এই কথাটাই সব কিছু মিলিয়ে সারা জীবন ধরে জানা আমার।

আত্মসাতের দ্বারা আপনার মত করে না নিলে কিছুই যেন আর আপনার হয় না, এই দুনিয়ায়!

খেতে খেতে পরস্পর জানাশোনা হোলো। মালদা জেলার নানা জায়গা থেকে তারা এসেছিল। আরো আরো ছেলে আছে এখানে, পিকেটিং করতে তারা বেরিয়ে গেছে এখন। ওদের মধ্যে ভূপেন ঝা একজন ছিল, কালিয়াচক না মানিকচক কোন্ থানার, আলাপ

হোলো তার সঙ্গে। উদ্দীপ্ত চেহারা ছেলেটার—দেশপ্রেমে জ্বলছিল যেন মনে হয়। কেবল তার কথাটাই এখনো আমার মনে আছে। কাঠখোট্টা জ্বলন্ত ঐ চেহারার জন্যই বোধহয়।

জলযোগের পরই ভূপেন ঝা সুতো কাটতে বসে গেল। চরখায় মন দিল আপনার।

'চরখা কাটতে জানো?' শুধালো সে আমায়।

'একদম না। চরখাই দেখিনি সাত জন্মে। এই প্রথম দেখছি।'

'কাটবে?'

'দেখি পারি কিনা।'

কেমন করে কাটছিল সে, লক্ষ্য করেছিলাম। সেইভাবে তুলোর পাঁজ নিয়ে টাকুর মুখে লাগিয়ে পাক দিতেই না লম্বা এক সূত্রপাত হয়ে গেল প্রথম চোটেই।

কয়েক টান টেনেই না অরুচি ধরে গেল আমার—প্রথম সিগ্রেট টানার সেই অভিজ্ঞতার মতই।

না, একটানা কোনো কিছুরই টানাপোড়েনে আমি নেই। তাতে সুতোর বা কোনো জুতোর টান যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক না, আমার নিজের পক্ষে সেটা যেন পোড়েন বলেই মনে হয়। অকারণে বিদগ্ধ হতে আমি রাজী নই।

'বাঃ, বেশ ফাইন সুতো হয়েছে তো? আগে প্র্যাকটিশ করা ছিল বোধ হয়?

'দেখিইনি কখনো চরখা এর আগে, বলছি না?'

'তাহলে হোলো কি করে এই?' তার বিশ্বাস হয় না—'প্রথমেই চরখার এমন হাত তো দেখা যায় না ভাই! কতোবার সুতো ছিঁড়ে যায়, কতো সরু মোটা সুতো বেরয়....'

'এটা একরকমের হাত সাফাই ভাই। মা'র শেখানো একটা প্যাঁচ জানা আছে আমার, তাতে শুরু করতেই না, সব কিছুই আমার সুরৎ করে হয়ে যায় অমনি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর আর হয় না, হয় হয়ত, কিন্তু হওয়াতে আর ইচ্ছে করে না আমার।'

'ইচ্ছেই করে না?'

'না। জেনে নিলাম, পেয়ে গেলাম, ফের কেন আবার সেটা? তারপর অন্যটায় হাত বাড়াতে প্রাণ চায়।'

'সে আবার কী?' সে বুঝতে পারে না ঠিক।

'ঐ রকম। সাইকেল চড়া তো গোড়ায় কত হপিং করে প্যাডল্ করে পরের সাহায্য নিয়ে, বার বার আছাড় খেয়ে শিখতে হয়,—হয় না? আমি প্রথমে সাইকেলের সীটে বসেই না অবলীলায় চার চক্কর ঘুরেছিলাম, কারো সাহায্য না নিয়েই....'

'বলো কি হে?'

'তারপর সাইকেল সমেত এমন এক আছাড় খেলাম না কাঁটা ঝাড়ের ওপর গিয়ে। ব্যস্, সেইদিনই, সেইখানেই আমার সাইকেল চড়া খতম। আর কোনোদিন ভুলেও তার ওপর চড়াও হইনি।'

'বুঝলাম। তাহলে ওই গোড়াতেই যা হয় তোমার, শেষরক্ষা হয় না আর?'

'হ্যাঁ, ভাই। সিদ্ধিলাভ হয় না আমার কোনো কিছুতেই শেষ পর্যন্ত। বরাতে আমার সিদ্ধি নেই, ধাতেও না। মা বলে, সাক্সেস কখনো ফাঁকতালে পাওয়া যায় না রে, তার জন্যে সাধনা চাই।'

'চাই-ই তো।' কথাটার ওপর জোর দেয় ভূপেন।

'ওই সাধনা করতেই আমি চাইনে, ভালোই লাগে না আমার।' —আমি জানাই—'না, কোনো কিছুর বা কারুর ওই সাধ্য-সাধনায় আমি নেই।'

'তাহলে তো জীবনে তোমার কোনো সাক্সেসই হবে না দেখছি।' কথাটা বলে সে গুম্ হয়ে যায়।

'হবেই না তো, সে আমি ভালোই জানি। ফাঁকতালে যা হবার তাই শুধু আমার হবে। বাবা বলেন, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। ওই কৌশলের যোগাযোগে যা হয়-তাই।'

'ফাঁকি দিয়ে কিছুই হয় না ভাই! চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না—বলেননি বিবেকানন্দ?' সে গুম্রায়।

'কোনো মহৎ কাজ করতে চাইনে তো আমি। কোনো কিছুর সিদ্ধি-ফিদ্ধি চাইনে আমার। কোনো কিছুই পুরোপুরি পেতে চাই না, কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে চাই। পরমহংসদেব সিদ্ধাই চাননি, চাইতে মানা করেছেন। —আমি কিন্তু ভাই ওই সিদ্ধিও চাই না, তার ওপরেও আরেক কাঠি।'

'ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। পড়োনি তুমি শ্রীম কথিত কথামৃত পাঁচ ভাগ।'

'না ভাই! পাবো কোথায়? আমাদের গাঁয়ে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কেবল পাঁজিই এক মাত্র পড়বার। তাই আমার একশো বার পড়া হয়ে গেছে-অনেক কিছু জানা যায় কিন্তু তাই থেকেই। তা জানো?'

পাজির পা-ঝাড়া ওর বিদ্যাবত্তার এই বহর জেনে আমার হাসি পায়। কিন্তু আমি হাসি চেপে রাখি।

হাসবার আমার কী আছে? ওর তবু পাঠ্যপুস্তকগুলো ভালো করে পড়া, আমি তো তাও ছুঁইনি কখনো। এক পেয়ালার বিদ্যেকে কি এক কেটলিমাত্র বিদ্যাধরের কটাক্ষ করা সাজে?

'সিদ্ধিও চাও না তুমি? কোনো কিছুতেই না? আশ্চর্য!'

'এইজন্যেই চাইনে যে, যেখানেই আমার সিদ্ধি হোলো সেখানেই তো আমি জমে গেলাম। মজে গেলাম তাইতেই। কিন্তু তাতে ভাই আমার মজা নেই। সেই আমার যমালয়। সেখান থেকে আর গতিমুক্তি নেই আমার। এই হেতুই এমন কি, তোমার ওই ভগবৎ সিদ্ধিও চাইনে আমার।'

'চাইলেই যেন পাওয়া যায় ভগবানকে?' আমার কথায় সে হাসে।

হাসবার কথাই বটে। আমিও হেসে ওড়াই কথাটাকে—'হাজার চাইলেও পাওয়া যায় না ভাই! হাজার মাথা খুঁড়লেও নয়। কেউই পায় না—হাজার সাধ্যসাধনাতেও। মাঝখান থেকে যা পাবার, যাকে পাবার তাও হারায়—বুঝলে ভাই? সত্যি বলতে, পাওয়াই যায় না ভগবানকে। আমরা কখনোই পাইনে, ভগবানই আমাদের পান। তিনি পেলেই হয়। তখন না চাইলেও....না চাইতেই পাওয়া যায় তাঁকে। তাই আমি ভগবানের পেছনে ঘুরিনে, তাঁকে চাইতে যাওয়া বিলকুল বৃথাই তো!'

'কী চাও তুমি তবে শুনি?'

'আমি অনেক অনেক অনেক সিদ্ধি চাই, অনেক রকমের সিদ্ধি সাফল্য—কিন্তু তা কেবল ক্ষণেক ক্ষণেক ক্ষণেকের জন্যেই। এক জীবনে হাজার রকম বাঁচাই আমার চাই।'

'না সিদ্ধি চাও নাই চাইলে, চরখা কিন্তু আমাদের সাধতেই হবে।' নিজের চরখার প্রতি সে চাড় দেখায় আবার : 'মহাত্মাজী বলেছেন। চরখা কাটতে আমরা বাধ্য। তুমি কাটিবে না ?'

'আমার চরখা নেই ? ও তো তোমার চরখা ?'

'হলই বা। কাটা নিয়ে কথা।'

'পরের চরখায় কি তেল দিতে আছে ? নিজের চরখায় দিতে হয়। যাই, একটুখানি বেড়িয়ে আসি বাইরে। হাওয়া খাইগে। তোমাদের শহরটা ঘুরে ফিরে দেখা যাক্ একবার।'

চক্রবর্তীদের চরখাবর্তী-করা সহজ নয়। চরখার চক্রান্তে না পড়ে আমি শহরের চক্করে বেরিয়ে পড়লাম।

মহানন্দার পাড় হয়ে তার ধার ধরে ঘুরে এলাম একবার। শহরের রাস্তাগুলো চষে ফেলা হলো বার দুয়েক। তারপরে চলে গেলাম বিখ্যাত সরকারী ইস্কুলবাড়ি দেখতে। জেলার স্কুল বোর্ডিং-এর চত্বরে গিয়ে পড়লাম।

জেলার সব ইস্কুলের ছেলেরা জমবে এসে এখানে যথাসময়ে—ক'দিন বাদেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে আসবে যখন।

বিষ্টুও আসবে আর সব ছেলের সঙ্গে পরীক্ষার্থী হয়ে। এখানেই সীট পড়বে, এই হোস্‌টেলেই এসে থাকবে তারা।

আমিও আসতাম। আলাউ হয়েছিলাম তো। কিন্তু আমি আর আসব না। আডমিট কার্ড নিইনি—

তবে বিষ্টুকে দেখতে আসব এখানে নিশ্চয়—যদি সে সময় আমার এই শহরে থাকা হয়।

যে-পরীক্ষা কোনোদিনই দিতে চাইনি, দিতে ভালোই লাগত না, দিলাম না—সেই পরীক্ষার জন্যই, কেন জানি না, কেন যেন মন কেমন করে!

যাক্, আসছে বছর আমি দেবো নিশ্চয়—দেশ যদি এর মধ্যেই স্বাধীন হয়ে যায়। হবেই তো স্বাধীন। এবং পড়বও আবার। কো-এডুকেশনের কলেজেই পড়ব তারপর কলকাতায় গিয়ে, মা তো বলেই দিয়েছে।

রিনির সঙ্গেও দেখা হবে আবার। চাই কি, রিনিকেও হয়ত সেই কলেজেই পেতে পারি সেই সময়। কিছু কি বলা যায় কখনো ?

'কী দেখছ এখানে ?' হোস্‌টেলের একটা ছেলে গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে আমায়।

'দেখছিলাম। এই ইস্কুলেই আমাদের পরীক্ষার সীট পড়বে তো ? থাকতে হবে হয়ত এখানে, দেখতে এসেছিলাম তাই।'

'তুমি বুঝি এগজামিনী ?'

'ছিলাম বটে, কিন্তু এখন আর নই।'

ছেলেটি আমার কথায় একটু অবাক হয়, কিন্তু তারপর আর কিছু জানতে চায় না, তার বন্ধুর সঙ্গে গালগল্পে মশগুল হয়ে চলে যায়।

সেখান থেকে ভারি মন নিয়ে বিপিনবাবুর বাড়ি ফিরলাম।

মনের সেই ভার আজও বুঝি যায়নি এই-আমার! মনের সেই বোঝা আজ বোধহয় আমার অবচেতনায় গিয়ে বোঝাই হয়েছে। এখনো মাঝে মাঝে বই বগলে ইস্কুলে যাবার—বিরাট হলে বসে আরো সব ছেলের সঙ্গে পরীক্ষা দেবার স্বপ্ন আমি দেখি। যে-পরীক্ষা

পাশ করতে পারলাম না, যে পড়াশুনা আমার পাশ কাটিয়ে গেল, আমার ঘুমের ঘোরে চারপাশ থেকে এসে তারা হানা দেয়... আমায় উতলা করে তোলে বুঝি।

স্বরাজ কুটীরে ফিরে যাইনে আর—রাত্রের খাবার জন্যে। খাজা খেয়েই পেট ভরে ছিল, তার ওপর আরো ভর্তি করার দরকার ছিল না কোনো, মনের ভার নিয়ে বিপিনবাবুর দরাজ বৈঠকখানায় নিজের দেহভার রাখি। ঢালাও বিছানার ওপর ঢেলে দিই আপনাকে।

সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়েই না, চলে যাই সেই স্বরাজ কুটীরে। স্বেচ্ছাসেবকদের সবার দেখা পাওয়া গেল সেদিন। একেকটা খোরা সামনে নিয়ে প্রাতরাশে বসে কী যেন খাচ্ছিল সকলে।

'কী খাচ্ছো ভাই তোমরা ?'

ভূপেনকেই শুধাই। কাউকে কিছু খেতে দেখলেই কেমন যেন খিদে পেয়ে যায় আমার।

'এই যে চক্রবর্তী! এসো এসো।' আমাকে দেখেই সম্বোধন করেছিল সে, এখন আমার কথার জবাবে শুধালো, 'পান্তা ভাত। খাবে তুমি ?'

'পান্তা ভাত! সে আবার কী ভাই ? খেতে কেমন ?'

'অবাক হচ্ছ দেখছি!' আমার জিজ্ঞাসায় ভূপেনরা সবাই হতবাক্। —'চরখা না হয় নাই দেখছো কিন্তু পান্তার নামও কি শোনোনি নাকি কখনো ?'

'শুনব না কেন ? নুন আনতে আনতেই যা ফুরিয়ে যায় সেই পান্তা তো ? নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—বলেই দিয়েছ কথায়।' আমি কই—'তা তোমরা সবাই নুন নিয়ে বসেছো তো ?'

'নুন! অঢেল অঢেল! কতো চাই তোমার ?' সে জানতে চায়—'খাবে চারটি পান্তা ?' যা খিদে পেয়েছিল তখন আমার--একবার সাধিলেই হয়।

'খাব বই কি! চোখে না দেখতে পারি কিন্তু চেখে দেখতে আপত্তি নেই। তা, এই পান্তাটা হয় কী করে শুনি ? কী করে বানাও তোমরা ?'

'কালকের রাত্তিরের বাসীভাত জলে ভিজিয়ে রেখে দিলেই হয়, সকালে পান্তা হয়ে থাকে। ভাত কি নষ্ট করবার ? বাড়তি ভাত ঐ করে রেখে দেওয়া হয় তাই। সকালে উঠে না, নেবুর রস আর তেঁতুল দিয়ে খেতে যা খাসা! কী বলব—আহ!'

ভূপেনের জিভের জল গড়িয়ে পড়ে খোরার উপরে সেই পান্তনিবাসে।

'বাসী ভাত খেলে তো অসুখ করতে পারে ? না খেয়ে তা বিলিয়ে দিতে পারো বরং। কোনো ভিখিরিকে দিয়ে দিলেই হয়।'

'ভিখিরি-টিখিরি কেউ নেই এ মুল্লুকে। কোথায় পাবো ভাই ভিখিরি ?'

'তা বটে! আমাদের চাঁচলেও কোনো ভিখিরি দেখা যায় না প্রায়। বৈরিগি আছে বটে, তবে তারা তোমার ভিখিরি নয়। ভিক্ষে করে না তারা, খঞ্জনী বাজিয়ে গান গায়, মাধুকরী করে, তারা সব বোষ্টম।'

'না, বৈষ্ণবরা ভিখিরি নয়। একটা ধর্ম সম্প্রদায়। জানি আমি।' ভূপেন প্রকাশ করে।

'আমার মামাও বৈষ্ণব।' আমি জানাই। 'বামুন হলেও বৈষ্ণব। তবে বোষ্টম নন, বৈরিগি হননি। হরিনাম করেন, কীর্তন গান, কর্তাল বাজান। কর্তাল-ভজা না কর্তাভজা কী যেন বলে থাকে, সেই সম্প্রদায়ের কেউ হবেন বোধ করি।'

'সব জাতের থেকেই বৈষ্ণব হওয়া যায় তো।' ভূপেন বলে : 'বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য, হাড়ি মুচি ডোম সবাই হতে পারে। এককালে মুসলমানরাও হতো নাকি শোনা যায়। তাদের লেখা গানের পদও আছে নাকি অনেক।'

'তাই নাকি ? তা হবে হয়ত। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে আমি পাইনি কিন্তু। তবে মামা বলতেন বটে, বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবেরো শকতি। দেবতাদেরও খ্যামতা নেই যে বৈষ্ণবকে চিনতে পারে।'

'সে কথা সত্যি।' ভূপেনের সায় আমার কথায়।

'চিনতে পেরেছেন শুধু বিষ্ণু ঠাকুর। সেই চিহ্ন তিনি নিজের বুকে নিয়ে রয়েছেন। ভৃগুপদচিহ্ন।'

'আর চিনেছো তুমি।' 'একটা ছেলে ঠাট্টা করে আমায়—'শালুক চেনেন গোপাল ঠাকুর।'

ততক্ষণে ভূপেন আমাকেও এক খোরা বেড়ে দিয়েছে। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে, ছেলেটার কথা গায়ে না মেখে, নুন দিয়ে নেবুর রস মাখিয়ে পান্তা ভাত চাখতে লেগেছি।

সত্যিই তোফা ! বাড়ি থাকতে—আমাদের প্রত্যহের প্রাতরাশ বাবার সেই মহাপ্রসাদ, রসগোল্লা কোঁচানো সেই পুরু দুধের সরের চেয়ে জলভাতের এই ঠাণ্ডা সরোবর আস্বাদে কোনো অংশে কম যায় না। সে যদি সুধাস্বাদ হয় তো এও অমৃতই।

'তুমি বলছিলে না যে বাসী ভাত খেলে অসুখ করে—ভিখিরিদের দিয়ে দিলেই হয় ! বলছিলে না তুমি ? কিন্তু এই ভারতের সবাই তো আমরা ভিখিরি ভাই ! ইংরেজ তো সব লুটেপুটে নিয়ে গেছে, কিছু কি ফেলে রেখে গেছে আর ? তাছাড়া যে জিনিস তুমি নিজে খেতে পারো না তা কি ভিখিরিদের দেওয়া উচিত ? ভিখিরিরা কি মানুষ নয় ? এই দেশেরই মানুষ তো ! এই ভারতবর্ষেরই তারা। বলতে গেলে তারাই ভারতবর্ষ। এদেশের শতকরা পঁচানব্বই জনই তো দরিদ্র অন্নহীন। তাদের জন্যই তো স্বাধীনতা চাই আমাদের। স্বরাজের জন্যই তো আমাদের লড়াই ? সে স্বরাজ তো ওদের জন্যই ভাই। গান্ধীজী কপ্‌নি পরেন কেন ? দেশের পঁচানব্বই জনই ঐ কপ্‌নি-পরা—তাই বলেই। সেটা কি তুমি বোঝো না ভাই ?' বলতে গিয়ে ওর পিঙ্গল উজ্জ্বল চোখ যেন জ্বলতে থাকে আরো। সেই চোখের আলোতেই আমার স্বদেশবাসীদের যেন আমি দেখতে পাই আজ নতুন করে আনকোরা আরেক রূপে।

'আর তাছাড়া, দেশ কি তোমার ঐ ম্যাপটা ? ভারতবর্ষের ম্যাপটা কি আমাদের দেশ নাকি ? ভারতের মানুষ নিয়েই তো ভারতবর্ষ—এমন কি, ভারতের গরু ছাগল ভেড়া সব নিয়ে, বাঘ সিংহ গণ্ডার উল্লুক সমস্ত। তার নদ নদী পাহাড় পর্বত-তাও। এর সবটাই আমার ভারতবর্ষ। সবার স্বাচ্ছন্দ সবার সার্থকতাই আমরা চাই। তাই-ই আমাদের স্বদেশ সাধনা ভাই।'

যার খোঁজে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, আজ এই পান্তার তেপান্তরে এসে সেই রাজকন্যার—একদা রাজরাজেশ্বরী এখন ভিখারিণী আমাদের সেই দেশমায়ের সন্ধান যেন পাই আমি—ভূপেনের ওই কথায়।

॥ চৌত্রিশ ॥

সেই ভূপেনের সঙ্গে আমার দেখা হল আবার—বছর কয়েক আগে, এই কলকাতাতেই।

রাস্তায় হঠাৎ মুখোমুখি।

দেখেই সে চিনতে পেরেছে—'আরে, চক্রবর্তী যে! কেমন আছ ভাই?'

আর, সঙ্গে সঙ্গে সেই সেকেলে ধরনের কোলাকুলি এই একেলে শহরের মাঝখানে—আমাকে দেখেই না!

আমিও তাকে চিনেছিলাম। বয়সে হয়ত একটু বুড়িয়ে গেলেও, রুক্ষ সূক্ষ্ম চেহারায় সেই উজ্জ্বল পিঙ্গল চোখ তো ভোলবার নয়।

'যেমন দেখছ!' বললাম আমি। 'অনেকদিন পরে দেখা হল, ভালো আছ তো বেশ?' আমি জিগ্যেস করি।

'আর ভালো!' সে নিশ্বাস ফেলল—'ঐ আছি একরকম। কী করছ ভাই এখন?'

'যা করতাম তাই। লিখিটিখি। লিখে খাই আর খেয়ে লিখি—লিখেটিখে চালাই। চলে যায় একরকম। তুমি কী করছ এখন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে সে শুধায়—'ছেলেপিলে ক'টি হোলো?'

'বিয়েই করিনি তো ছেলেপিলে!' আমি হাসলাম।

'কেন, বিয়েটিয়ে করলে না কেন?'

'লিখেটিখে চালাই কোনোরকমে। নিজেই খেতে পাই না তো ছেলে বৌকে কী খাওয়াবো?' আমি জানাই: 'বে-থা করিনি তাই ছেলেপিলের কোনো ব্যথাও নেই—সংসার-যন্ত্রণা নাস্তি।'

'সংসার-যন্ত্রণা যা বলেছো! স্ত্রীপুত্রের অসুখবিসুখ লেগেই রয়েছে। সেই জন্যেই তো আসা আমার এই কলকাতায়। বিধান রায়ের কাছে।'

'বিধান রায়?'

'হ্যাঁ, তিনি ছাড়া দেখবার আর কে আছে আমাদের? বিধানবাবুকে জানো তো?'

'জানি না?' ঘাড় নাড়লাম আমি। 'খুব জানি।'

—বিধানবাবুর গুণগরিমা আমারও অজানা ছিল না। জানতাম যে সঙ্কটকালে তিনি ছাড়া বিপত্তারণ বিপদবারণ কেউ নেই বিশেষ। যার কাছে নেবার তিনি ঠিকই নেন, আবার যাদের দেবার ঠিকঠিকই দেন। অভাবীদের তিনি কেবল ওষুধের ব্যবস্থাপত্রই দিতেন না বিনা ফি-য়ে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থাও করে দিতেন অমনি সেইসঙ্গে।

কেবল চোখের দেখা দেখেই তিনি সারেন না, সারে কি না সেটাও দ্যাখেন আবার। এমনি মানুষ বিধান রায়!

আর কী মনে রাখতে পারতেন যে!

আমার ইস্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর নামের বহর সেই দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছিল! নামডাকের ডাক্তার ছিলেন তিনি। কে না শুনেছে তাঁর নাম!

মা প্রায়ই ভুগতেন হাঁপানির ব্যারামে আর হাঁপানি এমন বিচ্ছিরি ব্যামো যে কহতব্য নয়। আর সব রোগে শুইয়ে ফ্যালে, হাঁপানি কিন্তু বসিয়ে রাখে। বসিয়ে দেয় একেবারে।

সারারাত বিছানায় বসে ঠায় হাঁপাতেন মা।

দেখেই এমন কষ্ট হতো আমার—যার হতো তার না জানি কী!

আমি তাই করলাম কি, খামের মধ্যে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা খাম দিয়ে মা'র অসুখের কথা জানিয়ে বিধানবাবুকে একটা চিঠি ছেড়ে দিলাম গাঁয়ের থেকে।

ক'দিন বাদেই তাঁর জবাব এসে গেল ব্যবস্থাপত্রসমেত। প্যালল বলে একটা পেটেন্ট ওষুধের নাম ও সেবনবিধি লিখে দিয়েছিলেন। ওই ওষুধটা খেয়ে বেশ ভালো থাকতেন

মা। অনেকদিন পরে যখন কলকাতার আত্মশক্তি কি যুগান্তর (নব পর্যায়ের) সম্পাদনায় জড়িত, কী সূত্রে যেন যেতে হয়েছিল তাঁর কাছে। আমার নাম বলতেই বললেন—'শিবরাম? শিবরাম বলে একজনকে আমি জানতাম, একবার চিঠি লিখেছিল আমায় !'

'সেই আমি—সে-ই আমি !!' প্রকাশ করতে হল আমাকে।

এরকম অদ্ভুত স্মরণশক্তি আমি কম দেখেছি।...

'তুমি কী করছ এখন শুনি ?' এবার আমি জানতে চাই।

'সেই যা করতাম। কংগ্রেসের কাজ নিয়েই আছি।' বলল ভূপেন—'তুমি তো ছেড়েই দিলে কংগ্রেস ! সেই কবে ছেড়েচ। খদ্দরের সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিয়েছ। আমরা কিন্তু লেগেই রয়েছি এ পর্যন্ত।'

'তা তো দেখছি। সেই মোটা খদ্দরেই লেগে আছ তাও দেখছি।'

'ফাইন খদ্দর নেতারা পরেন, আমাদের শোভা পায় না,-বুঝলে ভাই ?'

'কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে চুকিয়ে দিলে কেন বলো তো ? চার আনার মেম্বর হয়ে থাকতেও কি পারতে না ?'

'কোনো জিনিসই ভাই বেশিদিন ভালো লাগে না আমার। তাছাড়া কংগ্রেসের কাজটা মানে ঐ রাজনীতি ফাজনীতি আমার ধাতে আসে না। আমার স্বধর্ম নয় ঠিক।'

'কংগ্রেসে লেগে থাকলে একটা মন্ত্রী কি উপমন্ত্রী হতে পারতে য়্যদ্দিন। দাশ সাহেব থেকে বড় বড় নেতাদের সবার সঙ্গেই তোমার জানাশোনা ছিল তো। যোগাযোগটা রাখতে পারতে।'

'না ভাই, আমি বলেছিলাম না তোমায়, মনে আছে ? সিদ্ধিলাভ আমার পছন্দসই নয়। একটা পথের শেষ পর্যন্ত লেগে থাকলে একটা কিছু হওয়া যায়—কার্য সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু হয়ও না আবার, এই যেমন তোমার হয়নি। তুমি তো লেগে থেকেও আজও কোনো মন্ত্রীটন্ত্রী হতে পারোনি !'

'না ভাই ! আমরা তলার লোক তলাতেই পড়ে রইলাম। উপরে উঠতে পারলাম কই ?' সে ম্লান হাসল একটুখানি।

'তোমাদের জেলা থেকে যাঁরা এসে এখন জাঁকিয়ে বসেছেন, মন্ত্রী কি উপমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের কাউকেই তো তখন কংগ্রেসের ত্রিসীমানায় দেখা যায়নি। তোমার মতন জেলটেলও খাটেনি কেউ এরা। এরা সব জুটলো কোত্থেকে ? কবে জুটলো ?'

'ওপর থেকেই এল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল। জমিদার, জোতদার সবাই—টাকার অভাব নেই। পার্টি ফাণ্ডে মোটা টাকা দিয়ে নমিনেশন পায় ওরা। টাকার জোরে দল ভারী করে কাজ বাগায়। স্যাক্রিফাইস করার সময় কেউ এরা ছিল না বটে, জেল খাটেনি কেউ এরা, তাও ঠিক—সুযোগ বুঝে সুবিধা লুটতে যথাসময়ে এসে জুটেছে সব !'

'সুবিধাবাদী যতো ! রাজনীতির মানেই এই ! এর চেয়ে নোংরা আর কিছু হয় না। এর ভেতর থাকলে আমিও কোথায় তলিয়ে যেতাম ! অবশ্যি আমার লাইনেই যে খুব উঠতে পেরেছি তা নয়, এতে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা, তবে ভাই, সেটা অন্য ধরনের। তেমনি এতে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, আনন্দও আছে আবার।'

'দেশসেবায় দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারেও আনন্দ আছে ভাই !'

'তা হয়ত আছে। কিন্তু নিজের দুঃখ যন্ত্রণা কোনো রকমে সওয়া গেলেও, ছেলেমেয়ের দুঃখকষ্ট দেখলে সে আনন্দ যেন উপে যায় কোথায়। তাছাড়া এটা কেমন ভাই ? একদলের ত্যাগ স্বীকার, আরেক দলের মুনাফা শিকার ? কতক লোক সারাজীবন শুধু দিয়ে দিয়ে যায়, আর কতক কিনা উপর উপর এসে মজা লুটে নেয়। একদলের তলায় পড়ে মার খাওয়া, আরেক দলের উপরি পাওয়া ? এটা কী রকম ?

'তাহলেও ভাই, স্যাকরিফাইস ইজ স্যাকরিফাইস। তা কখনো বৃথা যায় না।'

'যারা করেনি তারা তো বটেই, কিন্তু যারা ছিটেফোঁটাও স্যাকরিফাইস করেছিল তারাও সবাই তাদের সেই স্যাকরিফাইসটুকুও এই তালে ক্যাশ করে নিয়ে নিয়েছে গুছিয়ে নিয়েছে। আর তুমি কিনা, সেই স্যাকরিফাইসটাও শেষে স্যাকরিফাইস করে দিলে। তোমারটাই সবার বড়ো স্যাকরিফাইস !'

কিন্তু আমার এই জ্ঞানদানে কোনো দুঃখ না পেয়ে তার সারা মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে। পিঙ্গল উজ্জ্বল চোখ আরো যেন জ্বলজ্বল করে তার।...

সেই স্বরাজ কুটীরের কথায় আসা যাক আবার। সকালে পান্তাহার পার হবার পর দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজ সেখানেই হোলো। সেই স্বরাজ কুটীরেই।

কচুপাতায় ভাতে ভাত, ডাল সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ--এইসব দিয়ে। মাছ তরকারির কোনো নামগন্ধ নেই। না থাক, সবার সঙ্গে বসে খেতে এমন ভালো লাগল যে বলা যায় না।

একটা ছেলে বাড়ির থেকে গাওয়া ঘি এনেছিল খানিক, সবার পাতেই দিল একটু একটু।

সেটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতই চমৎকার !

রাত্রের খাওয়া সারবার পর সেখান থেকে বিপিনবাবুর বৈঠকখানায় সেদিন আর গেলাম না। এইসব তাজা প্রাণ আর কচি কচি মুখের সান্নিধ্য ছেড়ে বিপিনবাবুর গোমস্তাদের গোমড়া উপস্থিতির ত্রিসীমানায় যেতে মন সরল না।

রাত্রে ছাতে গিয়ে শুলাম সবাই। খোলামেলা হাওয়ায় আকাশের তলায় শোয়ার আরাম— তারও বুঝি তুলনা হয় না। ফাঁকায় শুয়ে আকাশভরা তারার দিকে তাকানো—অনন্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার এক বিচিত্র অপরূপ অভিজ্ঞতা !

মাঝরাতে কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে টেরও পাইনি। যা আমার ঘুম ! ভূমিকম্প কখনো টলাতে পারেনি, বৃষ্টির ছাঁটে ভাঙবে কি ! সবাই উঠে গেছে কখন, আমি একাই পড়ে রয়েছি ছাতে। ভিজে নেয়ে গেছি, জামাকাপড় আগাপাশতলা শোয়ার চ্যাটাইটি পর্যন্ত জলে ভিজে জ্যাবজ্যাব করছে।

কিন্তু ঘুম থেকে আমায় তোলা গেল না। সেই স্যাঁতসেঁতে ছাতেই পড়ে রইলাম সারারাত— ঘুমিয়ে পড়লাম, দেখতে না দেখতেই। অঘোরে ঘুমালাম সকাল অব্দি।

ভোরে উঠে দেখি, জামাকাপড় সব শুকনো খটখটে। গায়ের উত্তাপেই শুকিয়ে গেছে বিলকুল। এবং আজন্ম ফ্যাচর ফ্যাচর সর্দিকাতর আমার হাঁচিকাশির কোনো লক্ষণমাত্র নেই এই—দারুণ বিপর্যয় সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি, এমন সময় বিপিনবাবুর কাছ থেকে লোক এল আমাদের সবাইকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

দেশবন্ধুর আসন্ন আগমন ব্যাপারে হয়ত কিছু হবে ভেবে আমরা সবাই তক্ষুনি ছুটে গেলাম সেখানে।

তিনি আমাদের প্রত্যেককে এক জোড়া করে মোটা খদ্দরের ধুতি দিলেন আর সেই সঙ্গে কয়েক প্রস্থ থান—খান দুই করে পিরান বানাবার জন্য। কলকাতার থেকে আনানো হয়েছিল ওগুলি। দেশবন্ধু আসার আগেই বিলিতি জামাকাপড় বর্জন করে সব স্বদেশী বেশভূষায় সজ্জিত হতে হবে আমাদের।

শহরের এক দর্জির দোকানে গিয়ে গায়ের মাপ দিয়ে জামাটামা বানিয়ে নিতে বাতলে দিলেন আমাদের। আর আমায় বললেন যে, আজকের দুপুরের গাড়িতে তিনি নবাবগঞ্জে যাবেন, কংগ্রেসেরই কী কাজে, ফিরে আসবেন আজ রাত্রেই আবার—আমাকে যেতে হবে তাঁর সঙ্গে!

অতএব এই ক'ঘন্টার ভেতরেই দর্জিকে দিয়ে আমার পিরানকুর্তা যা বানাবার তৈরি করে নিতে হবে আমাকে।

আদ্যিকালের প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হ'ত জানা যায়, আমাদের আদি যুগের খাদিও প্রায় সেইজাতীয় ইলাহী কাণ্ড ছিল—সেকালের জন্তুর মতন সে যুগের তন্তুজ খদ্দর প্রায় বিরল এখন। এখনকার খদ্দর বেশ শৌখিন ভদ্দর গোছের—অঙ্গে ধরলে শোভা বর্ধন করে।

কিন্তু প্রাক্‌কালীন সেই খদ্দর পরলে গা-টা ছড়ে যেত না অবশ্যই, তবে দেহভার কিছুটা বাড়ত বইকি, সেই ভারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার পরুয়াকেও বেশ একটু ভারিক্কিই দেখাত মনে হয়।

এবং পাক্কা দু' বছরের ধাক্কা। গীতোক্ত সেই আত্মার ন্যায় বছর দুয়ের জন্য ঐ বস্তু অচ্ছেদ্য অভেদ্য অমেধ্য। কিন্তু পরার দিকে যতই পাকাপাকি হোক না, তার কাচা কাজের মতন মারাত্মক আর হয় না। ভেজা ধুতির দুমুড়ো ধরে জল নিঙড়ে বার করতে দুজন লোক হিমসিম খেয়ে যেত। দস্তুর মতই এক ব্যায়াম—সে এক মহামারী ব্যাপার।

নবাবগঞ্জে গিয়ে বিপিনবাবু এক জায়গায় একটি সেকেলে চরকার নমুনা পেলেন, সেটি তিনি সংগ্রহ করে সঙ্গে নিলেন। বললেন, এই মডেলে ইংরেজবাজারের ছুতোরদের দিয়ে অঢেল চরকা বানিয়ে তিনি বাজারে ছাড়বেন—তার ভেতর আমাদের দিয়ে সুতো কাটানোর সদুদ্দেশ্যটা উহ্য রইলই।

চরকায় কাটার জন্য পাঁজ বানাবার এক বস্তা কাপাস তুলোও নিতে তিনি ভুললেন না সেই সঙ্গে।

এই লটবহর নিয়ে যাতে ভোরের আগেই শহরে ফিরতে পারেন সেই হেতু আমাকে সঙ্গে করে রাত তিনটের ফিরতি গাড়িতে চড়ে বসলেন তিনি।

গাড়িতে উঠেই তিনি বললেন আমাকে—আমি তখন কামরার জানলায় মাথা রেখে অন্ধকারের নৈসর্গিক শোভা নিরীক্ষণে ব্যাপৃত—'দ্যাখো শিবরাম, এই সুযোগে আমি একটুখানি বিশ্রাম করে নিচ্ছি, তুমি তো জাগাই রইলে, ইংরেজবাজারে গাড়ি এসে দাঁড়ালেই তুমি তুলে দিয়ো আমায়, কেমন?'

আমি সায় দেবার সাথে সাথেই তিনি শায়িত। আর আমিও এদিকে দেখতে দেখতে কখন যে আকাশের অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেছি নিজেই জানি না—ইংরেজবাজারও পেরিয়ে গেছে কখন এই ফাঁকে।

নিমাসরাই—এই হাঁকডাকে বিপিনবাবুর ঘুম ভাঙলো আপনার থেকেই। —'নিমাসরাই!

নিমাসরাই কেন ? এই-এই !! ওঠো ওঠো। আমাদের ইস্টিশন ছাড়িয়ে এসেছি। এখানেই নামতে হবে এখন। নামো নামো ! চটপট !'

বলতে না বলতেই আমি নেমে পড়েছি তড়াক করে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নামিয়ে দিয়েছেন তুলোর বস্তাটাও। চরকা হাতে নিজেও নেমে এসেছেন তৎক্ষণাৎ।

ইস্ ! আমাদের স্টেশনটা কখন যে পেরিয়ে গেল, টেরই পেলাম না। যাক্ এখান থেকেও যাওয়া যাবে ইংরেজবাজার। নদী পার হয়ে অনেকটা হাঁটতে হবে, তা হোক। ঠিক সময়েই গিয়ে পৌঁছব সেখানে।'

'আমি খুব হাঁটতে পারি।' জানালাম।

ইংরেজবাজার ইস্টিশনে নেবার জন্য আমার লোকজন এসেছিল নিশ্চয়। কিন্তু আমি যে এদিকে গান্ধিজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করছি তা তো তারা ভাবতে পারেনি। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস কামরায় আমায় না পেয়েই ফিরে গেছে। এদিকের ইস্টিশনে কুলিটুলি মেলে না, রাতবিরেতে লোকজনও বড় একটা থাকে না কেউ। কী করা যাবে ? তুমি এই তুলোর বস্তাটা ধরো, আমি চরকাটা হাতে নিলাম।'

'ঐ তুলোর বস্তা ?' আমার মনের অবস্থার তখন তুলনা হয় না।

'বেশি ভারী হবে না। মণ খানেক বড় জোর।' বলে না সেই তুলোর বস্তাটা তিনি আমার ঘাড়ে তুলে দিলেন।

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। কথাটা মিথ্যে নয়। এবং বস্তা সম্বন্ধেও সেকথা খাটে বোধ হয়।

যাই হোক, মণ খানেকের দুরবস্থা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে সেই আমার একমনে দেশের সেবায় লাগা– সর্ব প্রথম।

'এখান দিয়ে আদিনা গৌড় ইত্যাদিতেও যাওয়া যায় তা জানো ? এই পথ ধরেই।' যেতে যেতে তিনি কন : 'বাংলার আদি রাজধানী গৌড়-আদিনা। জানো বোধ হয় ?'

'আদি রাজধানীকে আদিনা বলার মানে কী ?' আমি জানতে চাই। কেমন যেন খটকা লাগে আমার।

'আমি জানি না।'

আমার মনে হোলো, আদিও যেমন ঠিক নয়, তার আগেও আদি থাকে আবার। অন্তত যেমন একেবারে অন্তিম হয় না, তার পরেও অনন্ত থেকে যায়। তেমনি আমাদের এই বঙ্গমাতাও। সেইরকমই বুঝি আদি অন্ত নেই আমাদের বাংলা মায়ের না-রূপের না-রহস্যের। সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল বুঝি বাংলার আদি রাজধানী এই আমাদের।

'আদিনার মসজিদ খুব বিখ্যাত। গৌড় একটা দর্শনীয় স্থান। গৌড়ের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন, ঐতিহাসিক পুরুষ। সেকালের অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে সেখানে। গিয়েছ কখনো ?'

'গেছলাম একবার ছোটবেলায় মামার সঙ্গে।' আমি জানাই। 'রামকেলীর মেলায় মামা নিয়ে গেছিলেন আমায়। হরিভক্ত তো মামা আমার। আর রামকেলী একটা বৈষ্ণব সম্মিলনী। সেবার মেলাটেলা দেখে মামা বললেন যে, চ। এই সুযোগে গৌড়টাও দেখে আসা যাক। প্রায় সন্ধ্যেবেলায় সেখানে আমরা পৌঁছেছিলাম। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'অ্যাঁ ? কী বললে ?' তিনি যেন চমকে উঠলেন। 'কোন্ লক্ষ্মণ সেন ?'

'সেই ঐতিহাসিক লক্ষ্মণ সেন। তিনি কি বেচেঁ আছেন এখনো, আপনার মনে হয় ? তবে সেই ভদ্রলোক কিন্তু সেই পরিচয়ই দিলেন আমাদের। তাঁর মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন, যার নাম নাকি সুলক্ষণা। তার নামেই তিনি নাকি ঐ জায়গাটার নাম রেখেছেন লক্ষ্মণাবতী !'

'লক্ষ্মণাবতী ! লোকটা পাগল।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল। বেশ গোলমাল ছিল তার মাথার। সেই রকমই দেখলাম আমরা। এই মাথাটা খুলছেন এই আবার পরছেন—নিজেরই আস্ত মাথাটাই—অনেকটা ঠিক পাগড়ির মতই যেন। সত্যি, তার মাথার ঠিক নেই একদম।'

'তোমরা ভূত দেখেছিলে আমার ধারণা, লক্ষ্মণ সেন নন, তাঁর ভূত।'

'তাও হতে পারে। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। আর, বলতে কি, ভারী অদ্ভুতভাবেই তিনি দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর সেই মেয়েও।...বলব ঘটনাটা ?'

'না। না। বলতে হবে না। এখন নয়, অন্যদিন শুনব'খন। দিনের বেলায় সেসব শুনতে হবে.... রাতবিরেতে ! বাবা ! গা ছমছম করে না ? রাত্তিরে ভূতপ্রেতের কথা ভাবাই যায় না বাপু ! ... ভয় করছে না তোমার ?'

'আপনি আছেন যে ! সেদিন মামা কাছে ছিল বলে ভয় করেনি। কেউ সঙ্গে থাকলে একদম আমার ভয় করে না।'

সেই দুর্লক্ষণ সাক্ষাতের কাহিনী ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রকাশিত আমার ভূতুড়ে অদ্ভুতুড়ে বইয়ে রয়েছে—এখানে তার সবিস্তার নেহাত বাহুল্য মাত্র।

সরু ফালির মতন রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগুচ্ছিলাম আমরা। নির্জন পথ অন্ধকার দুধারে গাছপালা ঝোপঝাড়। অনেকটা জঙ্গলের মতই—তার ভেতর দিয়ে চলেছি। চারধার যেন থমথম করছে।

আমার গা ছমছম করছিল বলতে কি।

ভারী বস্তা ঘাড়ে যতটা পারি তাঁর কাছাকাছি থাকার চেস্টা করছিলাম।

চরকাটা হাতে ঝুলিয়ে পথ দেখিয়ে বিপিনবাবু আগে আগে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর চরকার টাকুর সূচ্যগ্র ভাগ ঠিক পিনের মতই মাঝে মাঝে বিঁধছিল আমাকে।

'যেতে যেতে অমন উঃ আঃ করছ কেন হে ?' তিনি জিগ্যেস করেন : 'আর এমন করে ঘাড়ের ওপরেই বা এসে পড়ছো কেন আমার, বল তো ?'

পিনবিদ্ধ হয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে থাকব হয়ত। বস্তা ঘাড়ে আমি ঘাড় নাড়ি—'না না উঃ আঃ করিনি তো। কখন করলাম ?'

'ভয় করছে বুঝি তোমার ? না, না—ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই, বুঝেছ ?'

'না, না, ভয় কিসের ! আপনি আছেন না সঙ্গে ? কেউ কাছে থাকলেই হোলো।'

একবার ভাবলাম, টাকুর টক্কর থেকে বাঁচতে পিছনে না পড়ে থেকে আমিই না হয় এগিয়ে যাই বরং। কিন্তু উনি যে নেতা—নেতাকে ছেড়ে যাওয়া যেমন উচিত নয়, তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া তেমনি ঠিক হবে না নিশ্চয় ? ইত্যাকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে পিছু পিছুই যেতে হয় আমায়।

নেতৃত্বের খোঁচা খেতে খেতে যেতে হয় আমাকে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

জেলার হাটে হাটে সাতদিন ধরে ঢোল শহরতে দেশবন্ধুর আগমনবার্তা জানানো হয়েছিল : যেদিন তিনি এলেন, এক বিরাট উৎসবের মহরৎ সুরু হয়ে গেল যেন। সারা জেলাটাই এসে ভেঙে পড়লো মহানন্দার পাড়ে। বিরাট এক জনসমুদ্র—দশ বিশ পঞ্চাশ কতো লাখ কে জানে—একজনকে শুধু চোখের দেখা দেখার জন্যে এত জন। এক জায়গায় এহেন জনতা এর আগে আমি কখনো দেখিনি।

চাঁচলের বুধবারি হাটে পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক জড়ো হতে দেখেছি, মহরমের দিন রাজবাড়ির বারান্দায় বসে সামনের বিরাট প্রাঙ্গণে একশ দলের লাঠিখেলার জমায়েতও দেখেছিলাম—ব্যান্ডবাদ্য আর রকম-বেরকমের তাজিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে, কিন্তু এই বিপুল সমাবেশের সাথে সে সবের তুলনাই হয় না।

আনন্দের সাগর হতে এসেছে আজ বান—গানেই শোনা ছিল, কানেই শুনেছিলাম, চোখের ওপর দেখলাম এখন! সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী এই জনতা—চারি ধারে শুধু লোক আর লোক। নারী পুরুষ বালক, চাষী মজুর ভদ্রজন—আপামর সর্বসাধারণের বাদ নেই কেউ।

ফেরিঘাট পেরিয়ে দেশবন্ধুকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হোলো শহরে—সেখানে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদেরই অগ্রাধিকার। কিন্তু বিপিনবাবুর আস্তানায় পৌঁছে আর আমরা পাত্তাই পেলাম না তাঁর। তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন বাড়ির ভেতরে। শহরের মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোকরা সব আসতে লাগল মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে নিভৃত আলোচনা হচ্ছিল তাঁর। আমাদের ওপর ভার ছিল শুধু সদরে ভলান্টিয়ারি করার। দেশবন্ধুর জয়ধ্বনি নিয়ে তা-ই আমরা মহাসমারোহে করছিলাম।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন ছোট বড় নেতারাও। বিকেলে সভা বসলো—বিরাট জনসভা। সে সভায় দেশবন্ধু সামান্য কিছু বললেন, কী বলেছিলেন মনে নেই এখন। সুরেন সেন নামে এক নেতা, তৎকালে বেশ প্রসিদ্ধই—তাঁর বক্তৃতাটাই হয়েছিল সবার হৃদয়গ্রাহী। বেশ বাগ্মী তিনি। আর বক্তৃতা করেছিলেন পন্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী—তিনিও দেশবন্ধুর সাথে এসেছিলেন। আর রাজশাহীর কলেজ ছেড়ে সদ্য বেরিয়ে আসা মোহিত মৈত্র, ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বোধকরি তখন—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের বৃত্তান্ত দিয়ে তাঁর বক্তৃতাতেও উদ্বেল হয়েছিল অনেকে, মনে আছে।

রাত্তিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্যে লোক সংস্কৃতির আয়োজন হয়েছিল একটা। মালদহের বৈশিষ্ট্য গম্ভীরা গানের আসর বসেছিল বিপিনবাবুর বাড়ির প্রাঙ্গণে। আমন্ত্রিত হয়ে শহরের উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাই এসে জমেছিলেন, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও, এমনকি। দেশবন্ধুর পাশের আসনেই বসেছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনাও চলছিল দুজনের মধ্যে, দেখলাম।

বোলভাইয়ের পালা 'শিবো হে!' দিয়ে শুরু হয়ে নানান সামাজিক সমস্যায় গিয়ে পড়ে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনীতিক কিছুই বাদ যায় না—সে সব গানে সমস্তই উপস্থিত ; নানা রঙ্গের মধ্যে সাময়িক ঘটনাপ্রবাহের ইঙ্গিতও থাকত সেই সঙ্গে। যেমনটা এককালে

কলকাতার রাস্তায় পয়লা বোশেখের গাজনের যাত্রা-গানে দেখেছিলাম।

সেদিনকার আসরের দু-একটা পর্ব আমার মনে পড়ে এখনো। দু-একটা কলির রেশ এখনো মনের পলিমাটিতে তলিয়ে যায়নি একেবারে।

মজার একটা পালাই ছিল সেটা।

হঠাৎ গেঁয়ো চাষীগোছের একজন, মাতালের মতন ভাবভঙ্গী করে গাইতে শুরু করল এসে—তার ছেলেকে সম্বোধন করেই-

ওরে বাছা সোনার চান/ তোর মাকে যাইয়া ডাইকা আন্ /

সোনার চাঁদ তখনই লাফাতে লাফাতে ডাকতে গেল মাকে। মা আর কোথাও না, সেই আসরেরই এক কোণে ঘাপটি মেরে বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে আরম্ভ করল অমনি—

মরে যা পাঁঠা /গারোস্থালি/ব্যাচে খালি/জল খাবার নাই লোটা। / মরে যা পাঁঠা।

তারপরে, গানের সঙ্গে সমতালে নেচে, তাড়ি-নেশাতুর তার পতিদেবতাকে তাড়না করে আসরময় যেভাবে ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল—সে এক দৃশ্যই।

তারপরের পর্বটা আরও মজাদার। একটা লোক, স্বাভাবিকই হবে বোধ হয়, হাকিম সাহেবকে দেখে না তক্ষুনি মুখে মুখে গান বেঁধে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঘুরেফিরেই গাইতে লাগল :

চিনিতে পারো কি এদের ? /কিস্‌কিন্ধায় বাস/এই বেটারাই করেছিল/রাবণ রাজার সর্বনাশ ॥ / মা জানকীর কোপে পড়ে/মুখখানি গিয়েছে পুড়ে/লেজটি হয়েছে বেঁড়ে/বসে আছেন ভম্বল দাস ॥

ইঙ্গিতের খোঁচাটায় সভার সবাই খুব আমোদ পেলেও (আমরা তো যার পর নাই।) দেশবন্ধু দেখলাম গম্ভীর হয়ে গেলেন বেশ।

সাহেব অবশ্যি গানের মর্ম বোঝেননি কিছুই। বাংলাভাষাটা কাজ চালানো গোছের রপ্ত হয়ত তাঁর থাকলেও, ভাষার্থ বুঝতে পারলেও, ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ভাবার্থ তাঁর হৃদয়ঙ্গম হবার নয়। তাঁর মুখের কোন বিকার দেখা গেল না।

পরের দিনটাই আবার দেশবন্ধুর কলকাতায় ফেরার।

তিনি একাই ফিরে যাবেন সস্ত্রীক। মোহিতবাবু আর সমাধ্যায়ীমশাই কংগ্রেস সংগঠনের কাজে থেকে যাবেন আরো দিন কয়েক।

নির্ধারিত ক্ষণে দেশবন্ধু বেরুলেন—বোধ করি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সৌজন্যে তাঁর মোটর গাড়িটা পাওয়া গেছল, তাতেই চেপে—সোফারের পাশে আমি বসলাম দেশবন্ধুর পার্সনাল স্বেচ্ছাসেবক হয়ে, আর পিছনে বসলেন বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধু আর বিপিনবাবু।

খেয়াঘাট পর্যন্তই যাওয়া গেল গাড়িতে, তারপরে ফেরি পেরিয়ে একটুখানি রাস্তা হেঁটেই পৌঁছলাম আমরা স্টেশনে।

তাঁর আসার দিন কাল কী ভিড়, কী ভিড়! আর আজ এখন, যাবার কালে, লোকজন কেউ কোথাও নেই। বোধহয় জানেও না কেউ যে তিনি চলে যাচ্ছেন। ব্যান্ড বাজনা, স্বেচ্ছাসেবকের শোভাযাত্রা, জনতার জমায়েত—কিছু না।

শারদোৎসবের কথা মনে পড়ল আমার। আগমনীর দিন কী সমারোহ—কী না ঘটা। বিসর্জনের দিন প্রতিমা বওয়ার লোকই পাওয়া দায়।

স্টেশনে গিয়ে জানা গেল, কলকাতার গাড়ি ছেড়ে গেছে খানিকক্ষণ আগেই। ফিরতি ট্রেন সেই পরের দিন। কাল বিকেলে।

দেশবন্ধু স্টেশনেই থাকলেন ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে। শহরে আর ফিরে গেলেন না। কী জানি, কালকেও যদি ফের ট্রেন ফেল করে বসেন!

কলকাতায় সেদিন না যেতে পেরে তাঁর কাজের কতো ক্ষতি হল নিশ্চয়, কিন্তু মুখে একটু বিরক্তির চিহ্নও দেখা গেল না।

পার্সনাল ভলান্টিয়ার আমি, তার পার্শ্বচর হয়ে রইলাম স্টেশনেই।

রাত্তিরে দেশবন্ধু হান্টলি পামারের টিন থেকে খানকয় বিস্কুট আর এক গেলাস দুধ খেলেন মাত্র। বাসন্তীদেবী কী খেলেন দেখিনি।

বিপিনবাবু হাঁড়ি হাঁড়ি ভর্তি মালদার খাজাগজা কী সব দিয়ে গেছলেন দেশবন্ধুর জন্য। বাসন্তীদেবী তার থেকে বার করে খেতে দিলেন আমায়।

খাজা দিলেন গোটা কতক, আর দিলেন দুধের সর— কৃষ্ণনগরের মতন সরপুরিয়া নয়, পুরু সর। বিপিনবাবুর অবদান। সেই সরের সঙ্গে রসকদম্ব কুঁচিয়ে সুমধুর সম্মেলনে বাবার মহাপ্রসাদ বানিয়ে খাওয়া গেল অনেক দিনের বাদ।

সন্ধ্যের দিকে ওয়েটিং রুমের দুখানা ইজিচেয়ারই বার করে প্ল্যাটফর্মের ওপরে এনে রেখেছিলাম। দেশবন্ধু আর বাসন্তীদেবী এসে বসলেন সেখানে।

কাছেই একটা টুল নিয়ে বসেছিলাম। তাঁরা দুজনে কত কী আলোচনা করছিলেন, শুনছিলাম বসে বসে—সব ঠিক মতন বুঝতে না পারলেও।

যখন ওঁদের মধ্যে নিতান্ত ঘরোয়া কোনো কথা হচ্ছিল, তখন আমি উঠে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এধার ওধার।

হঠাৎ দেশবন্ধু ডাকলেন আমায়—'চাঁচলের রাজার সঙ্গে তোমাদের কী যেন সম্পর্ক আছে না? বিপিনবাবু বলছিলেন আমাকে। কী সম্পর্ক?'

'নামমাত্রই, ও কিছু না।' এক কথায় আমি উড়িয়ে দিয়েছি কথাটা।

'চাঁচলের রাজা দেশের জন্য এককালে প্রচুর টাকা দিয়েছেন, আমি জানি। বিপ্লবের কাজেও গোপনে অনেক টাকা ঢেলেছেন। বিনয় সরকারের কাছে শুনেছিলাম। এখন সরকার থেকে রাজাবাহাদুর খেতাব পাবার পর একটু নাকি রাজভক্ত হয়ে পড়েছেন, আজকাল। তবে সেটা হয়ত বাহ্যতই হবে।'

'তা হবে।' বলেই আমি থামলাম। আমি সেসবের কিছুই জানতাম না।

'কলকাতায় যাবে তুমি, আমার সঙ্গে! সেখানে পড়বে। পড়াশুনা ছেড়েচ কেন?'

'গান্ধীজী যে বলেছেন, এডুকেশন মে ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যানট। আর বিপিনবাবু বলেছেন, ইংরেজের গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে তোমরা সবাই দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো?'

'দেশের কাজ আর লেখাপড়া কি আলাদা? দুটো কাজ কি একসঙ্গে হয় না? পড়াশুনা করাও তো দেশের কাজ। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হবে কি করে? আর, মানুষ না হলে কি দেশের কোনো কাজ করা যায়? মানুষ হওয়ার কাজ, মানুষ গড়ার কাজ আর দেশের কাজ সবই আমাদের সমানে চালাতে হবে—সমস্ত চলবে একসঙ্গে।'

আমি চুপ করে শুনছিলাম।

'মানুষ গড়ার কাজ আমরা বন্ধ রাখিনি। গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন বলে ন্যাশনাল কলেজ খোলা হয়েছে কলকাতায়। ইস্কুল কলেজ ফেলে যেসব ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এসেছে, তারা সবাই সেখানে থাকে—দেশের কাজও করে, আবার সেই কলেজেও পড়ে। সুভাষ কলেজের প্রিন্সিপাল। শুনেছি তুমি টেস্ট দিয়েছিলে নাকি এবার—সুভাষকে বলব তোমায় কলেজে ভর্তি করে নিতে। কেমন ?'

'আচ্ছা।'

'পড়াশুনা করবে, মানুষ হবে। মানুষ না হলে কিছুই হবে না। মানুষ হওয়ার তিনটে লক্ষণ : স্বাস্থ্য বিদ্যা আর অর্থ। স্বাস্থ্য আর বিদ্যা না থাকলে টাকা রোজগার করা যায় না এবং টাকা না হলে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কি করে ? যে নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি, সে কি এগুতে পারে কখনো ! আর যে নিজেই এগুতে পারে না, সে তার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কি করে ? অতএব... বুঝতেই পারছো ?'

আমি ঘাড় নাড়ি। বুঝতে পারি আর না পারি।

কী যেন নামটা তোমার...নামটা কী যেন তোমার...

'শিবরাম চক্রবর্তী।'

'শিবরাম চক্রবর্তী ! শিবরাম চক্রবর্তী !! নামটা কেমন শোনা শোনা ! মনে হচ্ছে... কোথায় যেন নামটা দেখেছি আমি তোমার।'

'কোথায় দেখবেন—আর !'

'কোনো কাগজে-টাগজে দেখেছি বোধ হয়। কোথায় যে, মনে করতে পারছি না এখন।'

'দেখলে হয়ত ভারতীতেই দেখে থাকবেন।' অপরাধীর মতন কবুল করি।

'তুমি লেখটেখ নাকি ? কিছু লিখেছিলে বুঝি ভারতীতে ? কোনো গল্প-টল্প ?'

'দু-একটা ছোট্ট কবিতাই কেবল বেরিয়েছিল আমার, ঐ কাগজে।'

'কবিতা ? হ্যাঁ...'বললেন দেশবন্ধু—'হ্যাঁ, কবিতাই তো ! মনে পড়েছে এখন। কবিতাটা কী তা অবশ্যি স্মরণে নেই, তবে ভালোই লিখেছিলে মনে হয়। ভালো না লাগলে তোমার নামটা মনে থাকত না আমার।'

'না না। তেমন ভালো কিছু লিখিনি, তবে নামটাও তো আমার বিদ্ঘুটে, সেজন্যেও কারো মনে থেকে যায়।'

'শুনে, তিনি হাসলেন—'ও, তুমি কবি ? ছোটখাট একটা কবিই তুমি তাহলে ?

'আপনার কবিতার বই আমি পড়েছি। সাগরসঙ্গীত। আমাদের বাড়িতে আছে।' আমার প্রসঙ্গটা আমি চাপা দিতে চাই।

'ভালো লেগেছিল তোমার ? ঐ সাগরসঙ্গীত ?'

সত্যি বলতে আমার ভালো লাগেনি। বুঝতেই পারিনি আদপে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন ভালো লাগত, ভালো লাগবার মত, আমার বয়সী, সববয়সী সবারই ভালো লেগে যেত এমনিতেই—তাঁর কবিতা ঠিক তেমনটি যেন ছিল না। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ন্যায় ছন্দের তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত না আমাদের।

'আমার বাবার খুব ভালো লাগে আপনার কবিতা'—তাঁর কথার জবাবে আমি কই : 'তিনি বলেন, আপনি রবিঠাকুরের চেয়েও বড়ো। রবীন্দ্রনাথের কবিতা নাকি মেয়েলি ধাঁচের—তার কোনো মাথামুণ্ডু হয় না। মাইকেল হেম নবীন—বাবার মতে এঁরাই সব কবি। মহা মহাকবি।

আর তাঁদের পরেই আপনার স্থান। তিনি বলেন।'

'কোথায় রবিবাবু, কোথায় মাইকেল আর কোথায় আমি! রবিবাবুর কবিতার কি তুলনা হয়? উনি বিশ্বকবিদের একজন। কেবল বাঙালীর নন, সারা বিশ্বের।'

'কিন্তু বাবা যে বলেন...কবিতা ভালোই বোঝেন তিনি। তিনি নিজেও একজন কবি তো। 'শিবপ্রসাদ' বলে তাঁর একটা ছাপানো পদ্যের বইও আছে, জানেন?'

'তাই নাকি? তাহলে তাঁর থেকেই তুমি কবি হয়েছো বুঝতে পারছি। তোমার রক্তে ছিল কবিতা। কিন্তু তোমার বাবা যাই বলুন না, ওটা কোনো কথাই নয়। এই জন্যই বলছিলাম, তোমার পড়াশোনার দরকার। কলেজে গিয়ে শেলী বায়রন ব্রাউনিং শেকস্‌পীয়র কীটস্ পড়লে বুঝতে পারবে কবিতা কাকে বলে—কী বস্তু—কবি কাকে বলা যায়। আর তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করলেই রবিবাবুর মূল্য বুঝবে তখন।...আমি তাঁদের পায়ের নখের যুগ্যি নই।'

প্রতিবাদ করলেন বটে, কিন্তু বাবার কথাটায় যে খুশি হয়েছেন খুব, সেটা ওঁর প্রসন্নতায় বোঝা গেল।

পরের দিন দুপুরে স্টেশন মাস্টারের বাড়ি থেকে এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, বড় বড় মাছের মুড়ো, দই মিষ্টি ইত্যাদি সব এল—ওঁদের জন্য। কালকেই এই আতিথেয়তার উনি আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন।

গতকালের ট্রেন ফেলের হেতু নিজেকেই দায়ী মনে করে অনেক ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন তিনি। দেশবন্ধুর যাবার খবরটা যদি ঘুণাক্ষরেও তাঁর জানা থাকত, যদি কেউ কাকপক্ষীর মারফতেও একটু আগে জানিয়ে যেত তাঁকে, তাহলে দেশবন্ধুর অপেক্ষায় আরো খানিকক্ষণ ট্রেনটাকে তিনি দাঁড় করিয়ে রাখতেন। কিন্তু কেউ এসে একটা কথাও কয়ে যাননি তাঁকে।

সেই সময়েই আজ দুপুরের এই আতিথ্য স্বীকারের জন্য সপরিবার সনির্বন্ধ তাঁর অনুরোধ। তাঁর ন্যায় দেশবরেণ্যকে তিনি অতিথিরূপে পেয়ে ধন্য হবেন, এই সব বলেছিলেন। তিনি যদি অনুগ্রহ করে...তাঁর ন্যায় নগণ্য লোকের এই আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি কৃতার্থ বোধ করবেন...ইত্যাদি ইত্যাদি!

বিকেলের ফিরতি গাড়ি আসার আগে লোকে লোকে ভর্তি হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম। দেশবন্ধুকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতে সবান্ধব বিপিনবাবু এসেছিলেন, এসেছিলেন শহরের গণ্যমান্যরা, ছাত্রছাত্রীর দল আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

ফার্স্ট ক্লাসের গোটা একটা কামরা রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল তাঁর জন্য। তাঁদের সঙ্গে আমিও সেই কামরায় উঠে পড়লাম। বিপিনবাবুরাও উঠলেন।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সার বেঁধে দাঁড়ালো স্টেশনে। দেশবন্ধু কী জয়, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়, বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মুখর হয়ে গমগম করতে লাগল প্ল্যাটফর্ম।

গাড়ি ছাড়বার মুখে কামরার থেকে নেমে গেল সবাই, আমি থেকেই গেলাম সেখানে। কেউ লক্ষ্যও করল না সেটা। এমনকি বিপিনবাবুও আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

কারো পৌষ মাসে কারো সর্বনাশ হয় শুনেছি, কিন্তু কারো ব্যর্থতা কি অপর কারো সার্থকতা নিয়ে আসতে পারে? কে জানে! কিন্তু দেশবন্ধুর সেদিনের সেই ট্রেন ফেলটা না ঘটলে আমার জীবনের ট্রেন পাশ করত না। আমার ভবিষ্যতের পাশপোর্ট পেতাম কিনা

সন্দেহ। তাঁর সেদিনের সেই বৈফল্যই আমার জীবনের যা কিছু সাফল্য নিয়ে এসেছে—ঠিক পুরোপুরি না হলেও, আমার নবজীবনের রথযাত্রা শুরু হয়েছিল সেইদিনই।

ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অব সাক্সেস বলে যে, মিছে না।

রসা রোডে দেশবন্ধুর বাড়িটা, যা এখন কিনা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, তার গায়ে কেমন যেন একটা মায়া মাখানো ছিল। সেখানে গিয়েই আমার স্বপ্নের ঘোর লাগল, কে যেন মায়ার কাজল বুলিয়ে দিল আমার দু'চোখে। অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়িটা। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। চারধারে বিস্তর গাছ-গাছালি। নারকেল গাছও ছিল কয়েকটা—পেছনে একটা ছোটখাট পুকুরের মতন, একধারে আবার শিবমন্দির। এইরকম ছিল বলে আমার মনে পড়ে এখন।

যেতেই সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল অল্পক্ষণেই।

দেশবন্ধুর আগমনবার্তা পেয়ে নেতারা সব আসতে থাকলেন একে একে। একেকটা মোটর এসে দাঁড়াতে লাগল গাড়ি-বারান্দাটার তলায়। ছেলেগুলো চিনিয়ে দিতে লাগল আমায়।

'ইনি কে এলেন জানো ? মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।'

'আবুল কালাম আজাদ ?' নাম শুনেছিলাম। খ্যাতি জানা ছিল খবরের কাগজের খাতিরে।

কী সম্ভ্রান্ত চেহারা, চালচলন। দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। মোগল বাদশাদের মতই মনে হয়—যেন দিল্লীর তখ্‌ত্‌ তাউস থেকে সদ্য নেমে আসছেন।

'ইনি সুভাষচন্দ্র বোস। বিলেত থেকে আই সি এস পাশ করে...'

'জানি জানি, বলতে হবে না তোমায়।'

এই সেই সুভাষ বোস ? যার কথা রিনি তার চিঠিতে জানিয়েছিল আমায়। তার সেই প্রথম আর শেষ চিঠিতে।

সত্যি, দেবতার মতই দেখতে বটে। কী মিষ্টি চেহারা যে !

'এই যে ভদ্রলোক প্রকান্ড গাড়ি করে এলেন না ? ভেতরে গেলেন না ? ইনিই হচ্ছেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। কলকাতার এক নামজাদা অ্যাটর্নি—জানো ?'

'শুনেছি নাম। তিলক স্বরাজ ফান্ডের মালিক তাই না ?' ফান্ডামেন্টাল খবরটা সব সময়ই আমার মনে থাকে। নির্মল আনন্দ দেয়।

'আর ইনি হেমন্তকুমার সরকার।... ইনি কিরণশঙ্কর রায়। সত্যেন মিত্তির।' ইত্যাদি ইত্যাদি। আসতে লাগলেন এক এক করে। চলে যেতে লাগলেন ভেতরে সটান।

আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। দেখছি, গল্প করছি।

'এবার আমাদের ক্যাপটেন এলেন।'

'কী নাম ভাই ভদ্রলোকের ? লম্বা চৌড়া চেহারা—জ্বলজ্বল করছে যেন।'

'বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। নাম শোনেননি ?'

'না তো। আমি এক বিপিনবিহারী ঘোষকে জানি। মালদহ জিলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট।'

'ইনি কোনো ঘোষ নন।' ঘোষণা করে ছেলেটা—'কলকাতার ভলান্টীয়ার কোরের ক্যাপটেন বিপিন গাঙ্গুলি। আশ্চর্য! নামই শোনোনি তুমি এঁর ?'

আমি লজ্জিত হয়ে চুপ করে থাকি।

'বাঘা যতীনের নাম শুনেছ কি ?'

'শুনব না কেন ? কে না শুনেছে ? বালেশ্বর ফাইটের সেই... '

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সেই। তাঁরই সহকর্মী এই শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। একজন বিপ্লবী নায়ক। এখন গান্ধীমতের অনুবর্তী হয়ে অহিংস পথে এসেছেন।'

'তাই নাকি ?' শুনে শ্রদ্ধা হয়।

'সত্যি কী আর এসেছেন ? ওই বাইরে বাইরে। পুলিসের ছোঁয়াচ এড়াতেই। ভেতরে ভেতরে বিপ্লবের কাজ করছেন—আর নিজের দলের জন্যে ছেলে রিক্রুট করে যাচ্ছেন একধার থেকে। যেসব ছেলে এখানে এসেছে, আসছে এখন, তারা সব খাঁটি জিনিস তো।'

'খাটি জিনিস নাকি ?'

'খাঁটি না ? দেশপ্রেম খাঁটি নয় তাদের ? দেশের সেবা করতে—তার জন্যে প্রাণ দিতেই কি আসছে না তারা ? সারা বাংলার সেরা ছেলেরা সব জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। স্কুল কলেজ ছেড়ে এসেছে সবাই। তাদের ভেতরে তাঁর দলের ছেলেরাও সব স্বেচ্ছাসেবক সেজে ঢুকে পড়েছে—গান্ধী মহারাজের জয় দিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে তারা।'

শুনে সতীশের কথা মনে পড়ল আমার। মোসোপটেমিয়ার লড়াইয়ে না গিয়ে এখানে থাকলে তারও দেখা মিলত হয়ত এখন। এখানেই মিলত। কে জানে, এই বিপিনবাবুই, কিংবা তাঁর কোনো সাকরেদই তাদের লীডার ছিলেন কি না ?

'বিপিনদার নাম শোনোনি ? আশ্চর্য ?' ছেলেটির বিস্ময়ের রেশ কাটতেই চায় না। 'শরৎচন্দ্রের বই পড়নি ?'

'পড়ব না কেন ? রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে কত বই পড়লাম। কোন্‌টা না পড়েছি ?'

'পথের দাবী পড়েছো তুমি ?'

'পেলে তো পড়বো। পাবো কোথায়!'

'কেন, লাইব্রেরীতে ? পাবলিক লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় সব। সব বই—সবার বই-ই পাওয়া যায় সেখানে। পড়তে দেয় সবাইকে।'

'আমাদের দেশে কোনো পাবলিক লাইব্রেরী নেই ভাই। বাড়ির লাইব্রেরী আছে বটে, তবে সবার নয়, কারো কারো! কেউ কেউ হয়ত পড়তে দেয়—চাইলে পরে। কাউকে কাউকে দেয়, সবাইকে না।'

'দেয় না ?'

'না। কেন দেবে? পড়তে নিয়ে আর তারা ফেরত দেয় না যে!' রহস্যটা ফাঁস করি : 'বাবা বলেন, বই আর বউ পরের হাতে একবার গেলে আর ফিরে আসে না কখনো। বেহাত হতে হতে কোথায় যে চলে যায়, পাত্তাই মেলে না।'

'এখানে সবাইকেই দেবে। যে মেম্বার হবে, তাকেই। বীডন স্ট্রীটে হীরণ লাইব্রেরী একটা আছে, আমি তার মেম্বর।'

'আমাকে তারা মেম্বর করবে ?'

'কেন করবে না ? মাসে চার আনা চাঁদা, আর ভর্তি হবার সময় জমা দিতে হবে দু'টাকা...'

'টাকা পাব কোথায় ? টাকাই নেই আমার।'

'তবে আর কী হবে। আমার থেকে নিয়ে পোড়ো না হয়।'

'তুমি তাহলে পথের দাবীটা পড়তে দিয়ো। কী আছে তাতে ?'

'দেশের কথা। বিপ্লবের কথা। কেমন করে করতে হয় বিপ্লব আর বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বলা সব।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। তার মধ্যে সব্যসাচী বলে একটা অদ্ভুত চরিত্রের বিপ্লবী আছে, তা নাকি ওই বাঘা যতীন আর বিপিনদার মিকশ্চার করে ওদের আদলেই বানিয়েছেন শরৎবাবু।'

'তবে তো পড়তেই হবে নিশ্চয়।'

'বিপিনবাবু বেরিয়ে এলেন একটু পরে। —'তোমাদের মধ্যে শিবরাম কে ? শিবরাম কার নাম ?'

আমি এগিয়ে গেলাম—'আমিই শিবরাম।'

'রেডি হও। আমার সঙ্গে ফর্বেস ম্যানসনে যাবে।' বলেই তিনি চলে গেলেন ভেতরে আবার।

'ফর্বেস ম্যান্‌সনটা হচ্ছে—ঐ যে ওয়েলিংটন—সেটা ?' সঙ্গীদের শুধালাম।

'ফর্বেস ম্যান্‌সনটা—হচ্ছে ওয়েলিংটন স্কোয়ার জানো তো ? তার পূর্বদিকের প্রকাণ্ড বাড়িটাই ফর্বেস ম্যানসন।'

'ওয়েলিংটন স্কোয়ারটা কোথায় ?'

'ওমা !' শুনে যেন তার বিস্ময় ধরে না—'তাও তুমি জানো না ? স্কোয়ারটা বিধান রায়ের বাড়ির সামনেই।' সে খবর দেয় আমায়—'ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।'

শুনেই আমি লাফিয়ে উঠি 'বিধান রায়কে আমি জানি।'

'কী করে জানলে, কী করে তুমি তাঁকে জানবে ! অজ পাড়াগাঁর ছেলে !'

'জানি হে জানি...পাড়াগাঁর ছেলে, তবে অজ নই। সে এক কাণ্ড করে জানা। কই, তিনি তো এলেন না দেশবন্ধুর কাছে ? তিনিও তো কংগ্রেসের একজন পাণ্ডা ?'

'পাণ্ডাই। তবে ডাক্তার মানুষ, তাঁর সময় কই। কল দিলে তবে আসবেন।'

'কতো ফী নেন তিনি ? তাঁকে কল দিলে কত ভিজিট দিতে হয় ?'

'ওঁর বাড়িতে গেলে বত্রিশ। আর কেউ নিজের বাড়িতে ডাকলে চৌষট্টি।'

'ও বাবা !' শুনেই আমার পিলে চমকায়।

'ওমনিও উনি দ্যাখেন আবার—গরিবদের, যারা নাকি টাকা দিতে পারে না। আমাদের সব ওমনি ওমনি।'

'বটে ? ফর্বেস ম্যানসনের মানেটা কী ? কী হয় সেখানে ?'

'আমাদের ন্যাশনাল কলেজ আছে না ? গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন। সুভাষ বোস তার প্রিন্সিপাল। সেখানেই। সেইটাই। আমরা কেউ কেউ সেখানে পড়ি, কাজও করি আবার।'

'কী কাজ করো ? কী করতে হয় তোমাদের ?' আমি জানতে চাই।

'দেশের কাজ। স্বাধীনতার কাজ। আবার কী ? যা যা করতে বলবেন বিপিনদা, তাই করতে হবে আমাদের। বুঝেছ ?'

আমার ঘাড় নাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপিনদা বার হয়ে এলেন। বললেন, 'এস।' তাঁর পিছনে পিছনে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম।

'দেশবন্ধু সুভাষবাবুকে বলেছেন তোমাকে আমাদের ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি করে নিতে। তুমি তো এবার টেস্ট পাশ করে এসেছো, তাই না ? তা হলেও, কলেজে পড়তে হলে আদ্য পরীক্ষাটা তোমায় দিতে হবে। সুভাষবাবু তাই বলেছেন। তিনি ভারী স্ট্রিং ডিসিপ্লিনের মানুষ।

নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙার পক্ষপাতী নন। আমিও চাই যে তোমরা নিয়মানুবর্তী হও। পরীক্ষা তোমায় দিতে হবে। আগামী সপ্তাহেই সেই পরীক্ষা। পড়াশুনা তো সব তৈরিই আছে তোমার। পড়তে হবে না আর। সেই এন্ট্রান্স-স্ট্যান্ডার্ডেরই কোশ্চেন পড়বে তোমাদের।'

'দেবো পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে আমি ঘাবড়াই না। ভয় খাই না।' আমি জানাই।

'ভয় খাবে কেন! কত পরীক্ষা রয়েছে জীবনে। সব পরীক্ষাই পেরুতে হবে। উতরে যাবে সসম্মানে।'

'চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ। তবে কলেজের ক্লাসে তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারো এখন থেকেই। তাতে কোনো বাধা নেই। দুপুরবেলায় ক্লাস হয়।'

'কিসের কিসের ক্লাস? কী রকমটা?' আমি জানতে চাই।

'তোমার সেই ইস্কুলের মতন নয় কিন্তু। লেকচার শুনতে হয়, নোট নিতে হয় তার। খাতা পেনসিল ফাউন্টেনপেন কিনবে সব। বইপত্তর—যা দরকার পড়বে—অধ্যাপকরা যেসব বইয়ের নাম বাতলাবেন, সে-সবও তোমায় কিনতে হবে সমস্ত। কিন্তু সে-সব তোমার ওই আদ্য পরীক্ষা পাশ করার পরেই—এখন না।'

'কারা পড়াবেন? অধ্যাপক কারা?'

'সুভাষ বোস প্রিন্সিপাল। তিনিও পড়ান। কিরণশঙ্কর রায়, হেমন্ত সরকার এঁরাও ক্লাস নেন—কে কী পড়ান আমার জানা নেই ঠিক।'

একটু গুম হয়ে থাকার পর আমি গুমরে উঠি—'পড়ব তো দেশের কাজ করব কখন?'

'কলেজ তো সেই দুপুরেই। ঘন্টা কয়েকের।'

'দুপুরে কোনো দেশের কাজ নেই?'

'সকালে বিকেলে তোমাদের দেশের কাজ।'

আবার আমি গুম হয়ে যাই। চুপ করে থাকি তারপর।

'কী! কোনো কথা কইছ না যে? পড়তে ইচ্ছে করছে না?'

'করবে না কেন? কিন্তু-কিন্তু-কিন্তু-' আবার আমি চুপ।

'বলো না। বলেই ফ্যালো! এত কিন্তু কিন্তু কিসের।'

'পড়বো যে, বইখাতা যে কিনবো আমার পয়সা কই?'

'এই কথা!' বলে তিনি পকেটে হাত পোরেন—'দেশবন্ধু তোমাকে দেবার জন্য এই টাকাটা দিয়েছেন। এর থেকে তোমার যা যা দরকার, জামাকাপড় বিছানাপত্তর কিনবে সব। খদ্দর কিনতে হবে কিন্তু। খাদি প্রতিষ্ঠানের থেকেই কিনবে—কলেজ স্ট্রীট মার্কেট-এ। জায়গাটা যদি তোমার না জানা থাকে, এখানকার কোনো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ো। সেই তোমায় দেখিয়ে দেবে। কোথায় কী পাওয়া যায়, কী কিনতে হবে, সব।'

'আচ্ছা।'

দেশবন্ধুর নোটখানা তিনি আমার হাতে দিলেন—'এই নাও। কিনে নিয়ো আজই।'

'দশ টাকার নোট ষ্যাতো বড়ো হয়! জানতাম না তো!' দেখেই আমার তাক লাগে।

'এটা দশ টাকার নোট নাকি? একশ টাকার—দেখছ না?'

সেই প্রথম আমার একশ টাকার নোট দেখে ভাবসমাধিতে একশা হয়ে যাওয়া।

তবে প্রথম দর্শন হলেও, প্রথম দর্শনের বোধকরি দর্শনমাত্রেরই প্রথমে একটা আবেশ রয়েছে। প্রায় প্রথম দর্শনের ক্ষেত্রেই বলা যায় বুঝি সেটা। এখনো ঐ একশ দেখলে,

অবশ্যি কদাচিৎই ঐ একশ টাকার নজরানা আমার নজরে পড়েছে। তবে কদাচ হলেও, যখনই ঐ বস্তু নিজের করতলে এসেছে বা পেয়েছি-এখনও বলতে কি, সেই প্রথম স্পর্শের শিহরণ। সেই রোমাঞ্চ।

ফর্বেস ম্যানসনে পাঁচ-সাতশোর মতন ছেলে ছিল মনে হয়। সবাই তারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক।

অনেকেই তাদের গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনেও পড়ত। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের কাজও করত। আমিও তাদের দলে সেই দঙ্গলে এসে ভিড়লাম।

কয়েকদিন কলেজের ক্লাসে যোগ দিয়েছিলাম মনে পড়ে। কিন্তু বিশেষ উৎসাহ বোধ করিনি। সর্বদাই আমার মন বাইরের জন্য উড়ুউড়ু করত।

বিকেলে আমাদের শোভাযাত্রা করে বেরুতে হতো দল বেঁধে নানান ধ্বনি দিয়ে। বন্দেমাতরম, মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি জয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মুহুর্মুহু এইসব আওয়াজ ছেড়ে রাজপথ ধরে কুচকাওয়াজ করে যেতাম আমরা। দু'পাশের জনতা দাঁড়িয়ে পড়ত, দেখত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিধ্বনিও আসত তাদের দিক থেকে।

কিন্তু দিন কয়েক এই করেই অরুচি ধরে গেল আমার। এ আবার কী কাজ! এই করে কি দেশ স্বাধীন হবে নাকি। এই গলা ফাটিয়ে ডাক ছেড়ে?

এইসব কার্যকলাপের থেকে মাঝে মাঝেই আমি ডুব দিতাম। ডুব সাঁতারে চলে যেতাম, বেশি দূর নয়, সামনের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বিকেলে সেখানে রাজ্যের ছেলেরা, কচি আর কাঁচা, বালক আর কিশোরের দল মাততো এসে খেলাধূলায়। পার্কের একটা বেঞ্চে বসে বসে সেইসব দেখতাম-ভালো লাগত বেশ।

ফর্বেস ম্যানসনে আমাদের ওপর নজর রাখতে কয়েকজন পাহারোলাও বসে থাকত সেই স্কোয়ারে—তারা কিছু বলত না আমাদের, আমরাও না, তবে মনে হ'ত আমাদের প্রতি যেন তাদের বেশ সহানুভূতি রয়েছে। গান্ধী মহারাজের ভারী ভক্ত ছিল তারা! আমাদের ভলান্টীয়ারদের তারা হোলটীয়ার বলত।

এমনি একটা পাহারোলার একটা গানের এক কলি এখনো মনে আছে আমার। পার্কে আমাদের ছেলেরা জয়ধ্বনি দিয়ে প্যারেড করছিল, তাতে যোগ না দিয়ে একটা বেঞ্চে চুপ করে বসে আমি দেখছিলাম আর আমার পাশেই বসেছিল হোমরাচোমরা এক কনেস্টবল মাথা নেড়ে বিচিত্র সুরলহরীর এক বাংলা গান ধরেছিল সে

নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন
ফুল ফুটিয়েছে!
আরে নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন
ফুল ফুটিয়েসে...আরে, নৌতুন
গাসে নৌতুন নৌতুন...

পাহারোলা গান গাইছে! তাও আবার বাংলা গান! তার নৌতুনত্ব শ্রীকান্তর কাবুলিওয়ালার গানের মতই চমৎকৃত করেছিল আমাকে।

সেখানেই প্রায় আমার সমবয়সী একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। খবরের কাগজ বেচত সে। হিন্দুস্থানীদের মতন বাঙ্গালীর ছেলেকে অমন অল্পবয়সে এই হকারের কাজে দেখা সেই আমার প্রথম।

আমায় অমনি অমনি সব কাগজে চোখ বুলোতে দিত সে। ভাব হয়েছিল তার সঙ্গে। প্রথম দিন তো চমকেই গেছলাম আমি 'আরে, বসুমতীর আবার এ কী চেহারা!'

অবাক হবার মতই বটে। যে বসুমতীর আধখানায় শুয়ে বাকী অর্ধেক গা-মুড়ি দেওয়া যায়, তার এই বেজায় বেঁটেখাটো আবির্ভাব!

'কী আবার চেহারা!' ছেলেটি বলল : 'বসুমতী তো এইরকমই! চিরকালই এই রকম।' সেও কম অবাক হয়নি আমার বিস্ময়ে।

আমার বিস্ময়ের কারণ ব্যক্ত করার পর সে জানালো, 'আরে, সে হচ্ছে গে সাপ্তাহিক বসুমতী, মফস্বল সংস্করণের, আর এটা যে দৈনিক—তা দেখছ না! সব দৈনিকেরই এইরকমই চেহারা এখন।'

দেখলাম বটে, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার সব অভিন্ন আকারে প্রকাশিত। ভারতবর্ষই যেকালে নতুন রূপ ধরতে যাচ্ছে তখন বসুমতী যে চেহারা পালটাবে তা আর বিচিত্র কী! গোটা দুনিয়াটাই পালটাতে যাচ্ছে গান্ধিজীর মাহাত্ম্যে!

'তুমি এই বয়সে কাগজ বেচছ যে? ইস্কুলে পড়ো না?'

'পড়ি বই কি। মতি শীলের কলেজে পড়ি আমি। আর অবসরের সময় এই কাগজ বেচে দু' পয়সা উপায় করি।'

'কলেজে পড়ো তুমি? বলো কী হে?' বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! —'তুমি যে আমার চেয়েও ছোট গো।'

'এমন কি আর ছোটো! তাছাড়া, নামে কলেজ হলেও আসলে ওটা আমাদের ইস্কুলই। ফ্রী ইস্কুল। সব্ ছেলেই বিনা বেতনে পড়তে পায় সেখানে।' ছেলেটি জানায় : 'মহাত্মা মতি শীলের হয়ত বাসনা ছিল ইস্কুলের সঙ্গে কলেজ করবার, তাঁর মারা যাবার ফলে সেটা আর হয়ে ওঠেনি বোধ হয়।'

'তাই বলো। তা বেশ। তা, এই কাগজ বেচে কিরকম উপায় হয় তোমার?'

'মন্দ নয়। প্রত্যেক কাগজে এক আধলা। শতকরা পঁচিশ হচ্ছে আমাদের কমিশন— দু'পয়সা দাম তো কাগজের। একশ কাগজ বেচতে পারলে সাড়ে বারো আনা লাভ।'

'তাই নাকি? খুব লাভ তো। ভালো তো খুব।'

'চার-পাঁচশো কাগজ দেখতে না দেখতে কেটে যায়। কাগজ পাওয়াই দায়। কাগজের জন্যে রোজ সকালে মারামারি বাঁধে। তা জানো?'

'তাই নাকি? কোথায় বাধে মারামারিটা?' আমার কৌতূহল।

'কাগজের আপিসে আপিসে। আমি ভোর বেলায় উঠে গিয়ে কাগজ নিয়ে আসি লাইন লাগিয়ে—আর সব হকারও থাকে সেই লাইনে বেশি কাগজ পাবার জন্য সবাই কাড়াকাড়ি লাগায়।'

'আমি যদি কাগজ বেচি? বেচতে দেবে তারা আমাকে?'

'কেন দেবে না? যে যাবে, যে চাইবে, তাকেই দেবে।'

'নিয়মটা কি শুনি তো, ঐ কাগজ পাবার? খুব সকালে গিয়ে ঐ লাইন লাগাতে হয়— এই?'

'কমিশন বাদে পুরো দামটা জমা দিয়ে কাগজ নিতে হয় এই হচ্ছে নিয়ম। এছাড়া কিছু নয়।' সে বলে : 'আর তার জন্যেই পড়ে যায় কাড়াকাড়ি।'

'হোক গে কাড়াকাড়ি। মারামারি বাধে না তো ? মারামারির মধ্যে যাব কেন আমি ? নিক না সবাই কাগজ, যার যত খুশি আপত্তি কী ? সবার আশ মেটার পর যা থাকবে তার থেকেই নেব না হয়। মারামারির দরকার কী আমার ?'

'তাহলেও লাগবে মারামারি। হিন্দুস্থানী হকাররা সহজে ছাড়বার পাত্র না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেচে তারা। সেখানেই বিক্রি হয় বেশি বেশি। আর, বাঙালী ভদ্রলোকরাই তো কেনে যতো কাগজ। বাঙালীর ছেলে দেখলে তার কাছ থেকেই তারা কিনবে। তাই হিন্দুস্থানীরা তাদের ধারেকাছে কোনো বাঙালীর ছেলেকে দাঁড়াতেই দেয় না। পাশাপাশি বেচতে দেয় না। দাঁড়ালেই মেরে ভাগিয়ে দেয় তারা। একদিন এমন পিট্টি দিয়েছিল আমায়।...তারপরই আমি হ্যারিসন রোডের মোড় ছেড়ে দিয়ে বৌবাজার পেরিয়ে এই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে বেচতে লেগেছি। সব ভালো ভালো কর্নারেই হিন্দুস্থানী বেচনেওয়ালা। আমরা যাই কোথায় ? আমাদেরও তো বেচতে হবে, বাঁচতে হবে।'

'তুমি আমায় নিয়ে যাবে সেই খবরকাগজের আপিসে ? আলাপ করিয়ে দেবে কাগজওয়ালাদের সঙ্গে ? আমিও বেচব কাগজ।'

'নিয়ে যাব না কেন ? দুজনে মিলে পাশাপাশি বেচলে জোর পাওয়া যাবে কলজেয়। দুজনেরই বিক্রি হবে....কিন্তু একটা কথা, কাগজ নিতে হলে টাকা জমা দিতে হয় আগে, আপিসেই জমা নিয়ে থাকে। সে টাকা তুমি পাবে কোথায় ?'

'সে আমি পেয়ে যাব....'

'তা তুমি পাবে। আমিই তোমায় দেবো—দিতে পারব গোড়ায়। তারপর তুমি সুবিধা মতন সেটা আমায় শুধে দিয়ো।'

'না, তোমায় দিতে হবে না। একজনের কাছ থেকে ক'দিন আগে একশ টাকা পেয়েছি না? জামাকাপড় ইত্যাদি সব কিনেটিনেও পঁচিশ-ত্রিশ টাকার মতন পড়ে রয়েছে এখনো। তাতে হবে না ?'

'খুব খুব। কিন্তু তোমার একশ টাকার এত টাকা এই ক'দিনেই তুমি উড়িয়ে দিলে কী করে ?'

'খেয়েটেয়ে। আবার কী করে ?' আমি কই - 'টাকা তো ওই করেই ওড়ায়। খেয়ে ফতুর হয় না মানুষ ?'

'এত এত কী খেলে হে ?'

'কতো কী। কলকাতায় কতো যে খাবার জিনিস। কতো রকমের যে, চোখে দেখলে বিশ্বাস হয় না, চেখে দেখতে হয়। দোকানে দোকানে থরে থরে সাজানো। রকমারি সন্দেশ। অবশ্যি রসকদম আর খাজার মতন মেঠাই এখানে মেলে না তা ঠিক, কিন্তু তাহলেও তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না। তাছাড়া ঐ রাবড়ি। কী জিনিস যে ভাই।' বলতেই আমার জিভের জল চলকে ওঠে। —'এক সন্দেশের দোকানে পুরু দুধের সর পাওয়া যায় কিনা শুধিয়েছিলাম, পেলে রসগোল্লা কুচিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে খেতাম। সে যে কী চমৎকার খেতে কী বলব। তা, রসগোল্লা সেখানে অঢেল ছিল, বেশ বড়ো বড়ো সাইজেরই, তারা বলল যে, ওগুলো রসগোল্লা নয় ভাই, রাজভোগ। বুঝলাম যে রসগোল্লারই এক রাজসংস্করণ। কিন্তু তার কুচিকুচির সঙ্গে মেশাবো যে সেই দুধের সরই মিললো না। বলল যে, সর আর ক্ষীর একাকার করে একটা জিনিস আছে নাকি তাদের সেটা একবার চেখে দেখতে পারি ইচ্ছে করলে। ভাঁড়ে ভরে দিল—হাতে হাতে পরীক্ষা করে দেখলাম—জিভ

আর কানের বিবাদ মিটিয়ে....রসগোল্লা আর সরের সংমিশ্রণের চেয়েও সেটা ভাই আরো চমৎকার। সেই জিনিসটারই নাম রাবড়ি। অ্যাতো রাবড়ি এই ক'দিনে খেয়েছি না....চলো, আজ তোমায় খাওয়াবো।'

'আমার খাওয়া!' সে কয় : 'তার চেয়েও ঢের খাসা খাসা খাবার আছে কলকাতায়। রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায়।'

'রেস্টুরেন্ট! সে আবার কী ভাই?'

'সেও একরকমের খাবারের দোকান। তবে অন্য ধরনের খাবার—অন্য কায়দার দোকান। চেয়ার—টেবিলে সাজানো—সেখানে বসে খেতে হয় সব।'

'কী খাওয়ায় সেখানে? কী কী খাবার পাওয়া যায় শুনি?'

'চপ কাটলেট। কারি কোর্মা, মোগলাই-পরোটা....আরো কতো কী! যেয়ো-না আমার সঙ্গে আজ, যাবে? আমি তোমায় খাওয়াব না হয়।'

'আচ্ছা আচ্ছা, হবে'খন। প্রথম দিন আমিই আজ খাওয়াই....তারপর আরেকদিন তুমি আমায় খাওয়াবে, কেমন? তুমি আমায় খবর কাগজের আপিসে নিয়ে যাও তো আগে....টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করি....তারপর খাওয়াদাওয়ার দিন তো পড়েই আছে সামনে। কিন্তু ভাই, একটা কথা। আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাশাপাশি কাগজ বেচব না কিন্তু। আমি তোমার খদ্দের ভাঙিয়ে তোমার লাভের কড়িতে ভাগ বসাতে চাই না।'

'তা কেন? তা কেন? তাতে আমি কিছু মনে করব না।'

'না ভাই। কলকাতায় কাগজ বেচার কি জায়গা নেই আর? তবে বিকেলের দিকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে এসে আমরা মিলব। কোনো রেস্টুরেন্টে কি কোনো বায়স্কোপে?'

'বায়স্কোপও তুমি দ্যাখো নাকি? দেখেচ নাকি?'

'বাঃ, আমার অতো টাকা কি খালি খালি খেয়েই উড়ে গেল নাকি? এলমো দি মাইটি'র সিরীয়াল দেখেছি—এমন রোমাঞ্চকর, কী বলব! আর চার্লি চ্যাপলিন ম্যাকসেনেটের দু'তিন রীলের কমিক ছবি—এমন হাসির যে! দেখনি তুমি?'

'কচিৎ কদাচ। আমি খালি ঘুরে বেড়াই। রাস্তায় রাস্তায় খালি খালি ঘুরে বেড়াতে এমন ভালো লাগে আমার। কতো কী দেখা যায় যে।' সে জানায়।

'আমারও রাস্তায় ঘুরতে ভালো লাগে খুব। যদি চেনাশোনা কাউকে নজরে পড়ে যায় কখনো!'

'কলকাতায় তোমার চেনা লোক আছে নাকি কেউ?'

'নেই আবার? আমার এক বন্ধুই থাকে আহিরিটোলায়। তার নাম রিনি।'

'রিনি! ভারী অদ্ভুত নাম তো! ডাকনাম হবে নিশ্চয়। কতো নম্বর আহিরিটোলা?'

'নম্বরটাই যে মনে নেই আমার। ভুলে মেরে দিয়েছি—যা আমার মেমারি ভাই! তোমার ঐ আহিরিটোলা কি বড়ো একটা রাস্তা?'

'নম্বর না জানা থাকলে কলকাতায় ঠিকানা খুঁজে বার করা ভারী মুশকিল! বলে ঠিকানা জানা থাকলেই মেলে না। তবে তোমার ঐ আহিরিটোলা তেমনটা বড় রাস্তা নয়—চৌরঙ্গী কি হ্যারিসন রোডের মতন না। তাহলেও নেহাত ছোট নয়—শ' দু'তিন বাড়ি আছে বোধহয় সেই রাস্তাটায়।'

'থাক না। সেখানেই আমার কাগজ বেচব আমি। রাস্তার এ-মোড় থেকে ও-মোড়। ও-মোড় থেকে এ-মোড়। সকাল থেকে সন্ধ্যে। তার মধ্যেও কি সে একটিবারের জন্যেও

ঘরের বার হবে না ? তাহলেই তো দেখা হয়ে যাবে তার সঙ্গে আমার।'

'তা হতে পারে। যদি তুমি সারাদিন ঐ কাগজের তাড়া বগলে করে রাস্তার এ-মোড় থেকে ও-মোড় আর ও-মোড় থেকে এ-মোড়—খালি খালি তাই করো যদি—'

'তাহলে মোড়ে মোড়ে ঘুরে ঘুরে একদিন হয়ত বা বেঁচে উঠতে পারি চাই কি।'

॥ ছত্রিশ ॥

সেদিন সন্ধ্যের পরে ফর্বেস ম্যানসনে ফিরতে, দোতলায় উঠবার মুখেই বিপিনদার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

'বেড়াচ্ছিলাম।'

'বেড়াচ্ছিলে ? সেই দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছো, আর এখন রাত সাড়ে সাতটা।' তাঁর হাতঘড়িটা দেখালেন : 'কী করছিলে এতক্ষণ ?'

'বেড়াচ্ছিলাম।'

'এতক্ষণ ধরে বেড়াচ্ছিলে ? কোথায় বেড়াচ্ছিলে এত এত ?'

'এখানে সেখানে—ইতস্তত।' বলতে কোন ইতস্তত করি না।

তাঁর সঙ্গের ছেলেটি তাঁর কানে কানে কী যেন গুজগুজ করল। অনুচ্চ সেই গুঞ্জনধ্বনি দিব্যকর্ণে ধরা পড়ল আমার।

'একটা স্পাই। ইলিসিয়াম রো-এ গেছল মনে হয়।' তার ফিসফিসানি আমার কানে আসে।

'ইলিসিয়াম রো-এ গেছলে তুমি ?' বিপিনদার চোখ মুখ গলা রীতিমতন কড়া।

'কোথায় যে ইলিসিয়াম তাই আমি জানি না। জিনিসটা কী ঐ ইলিসিয়াম ?' আমি জানতে চাই।

যদি কোনো খাবার জায়গা কিংবা জিনিস হয় তাহলে যেতে কিংবা খেতে আমার দ্বিধা নেই, মনে মনে জানাই।

'সেখান থেকেই আসা হচ্ছে আর কোথায় তা তুমি জানো না ?' বিপিনদা আরো কঠিন।

'ন্যাকা।' সেই ছেলেটি উতোর গায়—'নেকু।'

'পিকেটিং নেই, প্যারেড করা নেই। টহল দেওয়া সব চুলোয় গেল, ইলিসিয়াম রো-এ গিয়ে রোজ রোজ এই স্পাইগিরি ?...না, না। এখানে থেকে ওসব কাজ তোমার করা চলবে না বাপু।'

'কোথায় গেছলাম জানতে চান ? দেখুন তবে।' বলে পকেট থেকে দু'খানা সিনেমা টিকিটের কাটা আধখানা ছুঁড়ে দিই সেই সঙ্গে আগাম কাটা ন'টার শোয়ের পুরো একখানাও —যদি অ্যালাউ করেন তবে ওই ন'টার শোয়েও যেতে চাই আবার আরেকটা সিনেমায়।'

ছেলেটা টিকিটগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বিপিনদার দিকে বাড়িয়ে দেয় তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। —'বুঝেচি। রোজ তিনটে করে সিনেমা দেখা হচ্ছে বাবুর ? এত টাকা আসছে কোথা থেকে শুনি ?'

'নির্ঘাৎ স্পাই।' ফোড়ন কাটে সেই ছেলেটা—টিকিটগুলো নিজের পকেটে পুরে নেয়। 'সেখান থেকেই আসছে সব। টাকার অভাবটা কী ওর ?'

'কেন, আপনিই তো সেদিন দিলেন আমায় অতগুলো টাকা...' কৈফিয়তের সুরে বলতে যাই। —'মনে নেই ?'

'দেশবন্ধু কি এর জন্যেই টাকা দিয়েছেন তোমাকে ? এই সিনেমা দেখবার জন্যে ? টাকাগুলো দাও আমায়। আমার কাছে জমা থাক।' তিনি হাত বাড়ান।

আমার পকেটের সিন্দুক থেকে বার করে দিই সব—বিন্দুমাত্রই বাকী ছিল আর।

'খুচরো-খাচরা মিলিয়ে এ তো দেখছি সাত-আট টাকা মোটমোট ? এই মাত্তর ? আর সব ?'

'খরচ হয়ে গেছে...খেয়েদেয়ে আর সিনেমা দেখেই উড়ে গেছে।' কবুল করতে হয়।

'না বাপু, এখানে থাকা আর পোষাবে না তোমার। তোমার সঙ্গদোষে আর সব ছেলেও নষ্ট হয়ে যাবে এখানকার। ঝুড়ির ভেতর একটা পচা ডিম থাকলে ভালোগুলোকেও পচিয়ে ছাড়ে। সুভাষবাবুর কাছে আমি রিপোর্ট করব। এখান থেকে যেতে হবে তোমাকে।'

আমি চুপ করে থাকি, কোন জবাব দিই না। কোথায় আমার কী গলতি হোলো তারই আমি ঠাওর পাই না কোনো।

'কী! কথা কইছো না যে—'

'আচ্ছা।'

'এখানে এসেছো দেশের কাজ করার জন্য। যারা মায়ের পায়ে শৃঙ্খল ভাঙতে যাচ্ছে, তাদের নিজেদের কড়া শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল হলে চলে না। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে তারা থাকে। এখানে রোজ বিকেলে প্যারেড করার নিয়ম। রাস্তায় রাস্তায় ....'

'জানি। কিন্তু ওসব কাজ আমার ভাল্লাগে না।'

'কী তোমার ভালো লাগে তাহলে ? ঐ সিনেমা দেখাটা ?'

'গান্ধীজীর জয়ধ্বনি হেঁকে শহরময় টহল দিয়ে বেড়ালে কি দেশ স্বাধীন হবে ? কী করে যে তা হতে পারে আমি তো ভেবে পাই না। খালি খালি পা ব্যথা করা কেবল। এই ছাগল চরানোর জন্যেই কি এখানে রাখা হয়েছে আমাদের ?'

'তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আসছে হপ্তা থেকে বিদ্যায়তনের আদ্য পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, সেটা তুমি দেবে। সুভাষবাবু বলেছেন, তোমায় দিতে হবে পরীক্ষাটা। তারপর তোমার যা খুশি তুমি করোগে। এখানকার নিয়মশৃঙ্খলা যদি তোমার না সয়—না মানতে পারো তো নিজের পথ দেখতে হবে তোমাকে।'

'দেখব।'

'কী করবে ? কোথায় যাবে ? ভেবেছ কিছু ?'

'ইলিসিয়াম রো-এর পথে।' ছেলেটির টিপ্পনি।

'ভাবিনি এখনো। ভাববো'খন। সময়মতন।'

'পথ আমার দেখা ছিল, ভাবাও হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ করাটা সমীচীন বোধ করলাম না। পদ্যাকারে শ্লোকাধারে গাঁথা বাবার কবিতা বইয়ের অসংখ্য সদুপদেশ পড়ে পড়ে আর শুনে শুনে মজ্জাগত হয়েছিল আমার, সারাজীবন ধরে পদে পদে কাজে লেগেছে। তার দুটি ছত্র কখনো আমি ভুলিনিঃ

মনেতে চিন্তিবে কার্য না কবে কথায়।
অন্যতে জানিলে কার্য সিদ্ধি নাহি পায়॥

এর আমি কোনোদিন অন্যথা করিনি। তাই, মনে মনে যা আমার ভাবা ছিল, ক্ষণে ক্ষণেই ভেবেছি, নিজের অন্তরালেই তাকে রাখলুম, সম্মুখে ব্যক্ত করলাম না।

'আসছে হপ্তায় পরীক্ষাটা চুকে গেলে পর যাবার আগে আমার কাছ থেকে তোমার টাকাটা নিয়ে যেয়ো। আর এর মধ্যে তোমার কিছুর দরকার পড়লে আমার কাছে রেফার করবে, বুঝেচ ?'

'আমার আর কিসের দরকার!' বলে আমি চলে আসি। —'টাকা নিয়ে আমি কী করব!'

রমাকান্ত বলে প্রিয়দর্শন একটি ছেলের সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল সেখানে আমার (গাঙ্গুলীই ছিল বোধ হয় সে, বিপিনদার সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও), সর্বঘটে বিরাজিত তার কাছে গিয়ে বললাম, ঘটনাটা।

'এখানে ঐ রকম!' এক কথায় সে উড়িয়ে দিল কথাটাই: 'সবাই এখানে সবাইকে স্পাই বলে সন্দেহ করে। আরও কিছুদিন থাকো না, দেখতে পাবে।'

'কিন্তু কেন ভাই?' ওর কথায় অবাক হয়ে যাই: 'গান্ধীজীর আন্দোলন তো লুকোছাপা কিছু নেইকো, রাখাঢাকা নেই কিছুই—সবই তো খোলামেলা। স্পাইয়ের এত ভয় কেন এদের তাহলে? স্পাইরা এখানে এসে করবেটা কী, শুনি?'

'কে জানে। তোমার ওই বিপিনদাই বলতে পারেন। আর ওঁর ওই চেলারাই।'

'দূর ছাই! এসব আমার ভালো লাগে না একদম।' আমি হাঁপিয়ে উঠি।

'ভালো না লাগলে চলবে কেন ভাই! নিয়মশৃঙ্খলা তো মানতেই হবে। নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়া কি কোনো কাজ চলে? চলতে পারে? বিশেষ করে দেশের শৃঙ্খল মোচনের এত বড়ো একটা কাজ? সেই জন্যেই তো বেপরোয়া হয়েও সাধ করে নিয়মের শৃঙ্খলে আমরা নিজেদের বেঁধেছি, তাই না? সোলজারদের কতো কড়া ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে হয় তা জানো?'

হয়ত তাই। তাই হবে বোধ হয়। দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে গোড়াতেই নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। মাতৃভূমির বন্ধন মোচন করতে হলে নিজেকেই বাঁধা রাখা নিয়ম হয়ত বা। সবার স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধ আছে হয়ত কোনোখানে।

কিন্তু দেশের মুক্তির জন্য নিজের অবলুপ্তি—এই অসাধ্য সাধন কি আমার দ্বারা হবার? বাধ্যবাধকতার সাধ্যসাধনা আদপেই আমার ধাতে সয় না যে! কী করে পারব? ছেলেবেলার থেকে বাড়ির আবহাওয়ার বেপরোয়াখানায় বেড়ে উঠে হঠাৎ এখন এত কিছুর পরোয়া করে চলা কি আমার পোষাবে?

না, চলেই যেতে হবে আমাকে এখান থেকে। সহিংসর মত অহিংস পথেও দেশোদ্ধার আমার দ্বারা হল না। কোনো নিয়মনিগড় মেনে চলার ক্ষমতাই নেই আমার। এই শৃঙ্খলাবোধহীনতার জন্যে পরে সুভাষচন্দ্রের কাছেও আমার একবার এই হেনস্তা—এ হেন অবস্থা হয়েছিল। যেমন এখানে তেমনি সেখানেও দোষটা ছিল সম্পূর্ণ আমারই—এই দস্তুর না মানার দোষ। বিশৃঙ্খল আমার কাছে বিশ্রী বলে ঠেকলেও ব্যাপারটার কোথাও কোনো খলতা ছিল না অবশ্যই।

না, বিপিনবিহার, দেখা যাচ্ছে, আমার বরাতে বরদাস্ত হবার নয়। এক বিপিন থেকে আরেক বিপিনের পরিব্রজ্যা শুরু না হতেই খতম হয়ে গেলে দেখতে না দেখতে।

মালদহের বিপিনে সেই পীনোন্নত চরকার খোঁচা খেয়েছিলাম, আর এখানকার ইনি নিজেই

পিনের মতন ফুটলেন।

না, চলেই যাব এখান থেকে। এই প্রস্ফুটিত পিনকুসুমের আওতা থেকে। কেবল ওই আদ্য পরীক্ষাটা হওয়া পর্যন্ত থেকে কিংবা আদ্যোপান্ত না দেখেই।

বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুনি।

হঠাৎ কী খেয়াল হতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি যে, স্পাই-আইডিয়ার ছেলেটি দূর থেকে নজর রেখে পিছু নিয়েছে আমার।

নিক গে, ইলিসিয়াম রো-র পথে যাচ্ছি না তো, আমার দৌড় ওই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড় অব্দি।

কাগজের হকার ছেলেটার দেখা পাওয়া—গেল সেখানে তখন পর্যন্ত কাগজ বেচছে কোণঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়ে। খবর কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ বেচছিল সে তখন।

'বসুমতী টেলিগ্রাম ! বসুমতী টেলিগ্রাম এক পয়সা, এক পয়সা।' হাঁকছিল সে তেড়ে ফুঁড়ে।

'ওঃ ! কখন থেকে হন্যে হয়ে আছি তোমার জন্যে। এলফিনস্টোনে ন'টার শোয়ে যাব না আমারা ! এর ভেতর কিছু খেয়েটেয়ে তৈরি হতে হবে না ?' ব্যস্তভাবে বলল সে।

'না ভাই, আমি আজ যাচ্ছিনে।'

'বারে ! আমার টিকিট কিনে রেখেছি যে ! দিনভোর কাগজ বেচি—ন'টায় ছাড়া তো যাবার উপায় নেই আমার।'

'তুমি যাও। একলাই যাও তুমি। আমার টিকিট বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে আজ।' আমি জানাই।

'তাতে কী হয়েছে ! কিনে নেব আবার।'

'পয়সা কড়ি আর কিচ্ছু নেই আমার ! তামাম্ ফর্‌ফাঁট্ !'

'তোমার না থাক, আমার আছে। আমিই না হয় দেখাবো তোমাকে। তুমি কতো দিন যে খাইয়েছো আমায় !'

'না, থাকগে। আজকে থাক। তুমি আমায় এই কাগজ ফেরির কাজটা পাইয়ে দাও তো আগে। তারপর দেখা যাবে, কতো সিনেমা দেখা যায়, খাওয়া যায় তারপর।'

'বেশ, কালকেই আমি নিয়ে যাব তোমায় বসুমতী আপিসে আর আনন্দবাজারে। কর্তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো তোমার...'

'কিন্তু দাম জমা রেখে কাগজ কেনার টাকা তো নেই আর আমার...?'

'আমি একটু কিন্তু কিন্তু হই।

'তাতে কী ! বিশ্বাস করে তোমাকে কাগজ দেবেন তাঁরা, বাঙালীর ছেলেরা নিজের পায়ে দাঁড়াক, তারা চান।' সে ভরসা দেয়—'তবে প্রথম প্রথম হয়ত কম কম দেবেন। তারপর তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে, যতো চাইবে, ততো পাবে।'

'বেশ। কাল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দেড়টায় যাব ইস্কুলে। এখন যাই। একজন নজর রাখছে আমার ওপর। তা জানো ?'

তারপর পার্কে তিন চক্কর মেরে মাথা ঠান্ডা করে ফর্বেস ম্যানসনে ফিরি—সেই ছেলেটিকেও তিন পাক ঘুড়িয়ে, তার লেজুড় নিজের পিছনে জুড়ে ফিরে আসি।

তার ক'দিন বাদে সেই আদ্য পরীক্ষাটা। বাধ্য ছেলের মতই বসে গেলাম পরীক্ষায়।

খাতাপত্তর সব বিদ্যায়তন থেকে যুগিয়েছিল। দেশবন্ধুর টাকায় গোড়াতেই একটা ফাউন্টেনপেন কিনেছিলাম বুক পকেটের শোভাবর্ধনে। আর সস্তা দরের একটা হাতঘড়ি কিনতেও কসুর করিনি সেই সঙ্গে।

কাগজের পিঠে লিখে দিলাম খসখসিয়ে তারপর—যা এল মগজে। আর আমার কলমের ঝর্ণায়।

এবং ঘন্টায় ঘন্টায় খেলাম কতো কী যে! বিদ্যায়তনেরই কয়েকজন মিলে পরীক্ষার্থীদের টিফিনের জন্য সাময়িক ক্যানটিন খুলেছিল। গরম গরম চপ কাটলেট বেচত তারা—আর ঘোলের সরবত।

সরবত তো নয়, যেন সুধাই! পরম উপাদেয় সুপেয়টি সেই প্রথম আমার জীবনে চাখা।

তবে ঘোল আমাকে অনেকবারই খেতে হয়েছে, নানা রঙের, নানা রকমের। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের সেই সুমধুর স্বাদ এখনো ঘোলাটে হয়ে যায়নি আমার স্মরণে।

সরবত শুধু নিজেই খেলাম না, পছন্দসই আমার বন্ধুদেরও খাওয়ালাম ধরে ধরে। দামটা? রেফার বিপিনদা! তাঁর কাছে আমার টাকা জমা রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে পাবেন। তাঁর নাম করতেই রেহাই! ঘোলের সঙ্গে চপ কাটলেট আর মাখন-রুটিরও সদ্‌গতি করলাম। প্রাণভরে খেয়েছি, খাইয়েছি।

শেষ পরীক্ষাটা দেড়টায় খতম হল যেদিন—মাত্র একখানা পেপার ছিল সেদিন। বাংলার। বাংলায় তো আমি দিক্‌পাল, দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন হয়ে পাশ করেছি চিরদিন, এবারও সেইভাবেই তার পাশ কাটালাম।

আদ্য পরীক্ষাটার আদ্যন্ত সেই ছেলেটার নজর ছিল আমার ওপর—বিপিনদার সহচর সেই ছেলেটির।

শেষ হতে না হতেই এগিয়ে এল সে। 'এবার তো তোমায় যেতে হচ্ছে এখান থেকে। মনে আছ বিপিনদার কথাটা?'

'নিশ্চয়! যাব বইকি!'

'কবে যাচ্ছ? কখন?'

'এক্ষুনি। চললাম এই। দ্যাখো না!' বলেই ফাউন্টেনপেনটা বুক পকেটে গুঁজে হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়েই আমি পা বাড়াই।

'কোথায় যাবে শুনি?'

'যেদিকে দু'চোখ যায়।' আমি ফোঁস করে উঠি: তোমার কী?'

'না, আমার কিছু নয়। বিপিনদার কথাটা কেবল মনে করিয়ে দিতে এসেছিলাম আমি।'

'মনে আছে আমার। সেকথা কি কখনো ভোলবার?' আমি জানাই।

'যাবার আগে বিপিনদার সঙ্গে দেখা করে যাবে না? দেখা করবে না?'

'কী জন্যে আবার?'

'তোমার টাকা রয়েছে যে তাঁর কাছে...'

'থাক্‌গে।'

'নেবে না তোমার টাকা?'

'কী হবে টাকায়? টাকার আমার কোনো দরকার নেই আর। ইচ্ছে করলে তুমি সেটা নিতে পারো চেয়ে।'

শুনে সে একটু খুশি হয়। —'আর আসবে না এখানে কখনো?'

'কী প্রয়োজন ?'

'আর কিছু না হোক, তোমার পরীক্ষার ফলাফলটা জানাতে ?'

'তার জন্যে কোনো মাথাব্যাথা নেই আমার—যা হবার হবে, সারা জীবনটাই তো পরীক্ষা। জীবনভোরই চলবে এই !' বলেই আমি পা বাড়াই।

'ও পথে যেয়ো না ভাই ! মারা পড়বে বেঘোরে।' আমার হিতচিকীর্ষায় সে সদুপদেশ দিতে আসে।

'কোন পথের কথা কইছো ?' থমকে দাঁড়াতে হয় আমায়—চমক লাগে ওর কথাটায়।

'ঐ ইলিসিয়াম রো-এর পথ। গোয়েন্দাগিরির অনেক ঝামেলা, অনেক জ্বালা। কাঁচা টাকা হাতে আসে বটে, কিন্তু একটু গড়বড় হলেই মারা পড়তে হয়। হয় পুলিসেই মার লাগায় নয়তো অ্যানার্কিস্টদের হাতে খতম হতে হয় শেষটায়।'

'মনে থাকবে আমার।' বলতে বলতে আমি এগোই। আরো সদুপদেশের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়াই না আর।

এই ভেবে সান্ত্বনা পাই, এই ক'দিনে নিজেও যেমন খেয়েছি এনতার, তেমনি বিপিনদাকেও খাইয়ে যেতে পারলাম খানিক।

আর কিছু না, ঐ ঘোল !

ছ'আনা দামের প্রায় ছত্রিশ গেলাশ বসিয়েছি এই ছ'দিনে। সবান্ধব চপ কাটলেট যে কতো ধ্বসালাম তার তো লেখাজোখা নেইকো।

আমার কাছে নেই অন্তত। থাকলে তাদের কাছেই রয়েছে—সেই বেচারাম বেচারাদের কাছেই। কেনারামের কোনো দায় নেই তার। তারা সবাই এখন গিয়ে ছিঁড়ে খাবে বিপিনদাকেই—পারে যদি। তাঁর কাছেই রেফার করার কথা।

নামমাত্র তো দাম না। সাতাশ টাকা তো নির্ঘাত, মনে মনে হিসেব কষে পাই।

আর তাঁর কাছে মজুত আমার সাত টাকা মাত্তর ?

সাত টাকা থেকে সাতাশ টাকা বাদ দিলে কী থাকে ?

মাইনাস বিশ। প্রায় বিষতুল্যই।

কিন্তু আমার কাছে নিছক আনন্দই !

এর চেয়ে ফুর্তি আর হয় না।

আর ফুর্তি নিজের মুক্তি লাভ করেও। সম্মুখে উন্মুক্ত ঐ পথ ধরে....স্বরাজলাভের পথে পা বাড়াবার আগে রাজপথের স্বরাজ আমার হাতে এসে গেল।

॥ সাইত্রিশ ॥

পরদিন দেড়টা না বাজতেই আমি মতিশীলের দেউড়িতে।

টিফিনের ঘন্টা পড়তেই হকার বন্ধু সেই ছেলেটি বেরিয়ে এসেছে। স্কুলের গেটেই তাকে ধরা গেল। —'তোমাদের দারোয়ান আমাকে আটকে রেখেছে ভাই। যেতেই দিচ্ছে না ভেতরে।'

'দেবে না তো। হেডমাস্টারের হুকুম না হলে বাইরের কাউকে কি যেতে দেয় কখনো ?'

'যাকগে, যেতে দাও। চলো এবার খবর কাগজের আপিসে যাওয়া যাক, কেমন ?'

'মল্লিক বাড়ি যাচ্ছি যে এখন। এখনই যে খেতে দেয়, এই টিফিনের সময়টাতেই ফাঁক পাই খাবার।'

'খাবার জায়গায় অভাব নাকি কলকাতায়? এই গেটের থেকেই পেটে দিতে থাকো না। এখান থেকেই শুরু করা যাক। কেমন আলুকাবলি ঘুগনি সব বিক্রি হচ্ছে এখেনেই। ডালমুট, চানাচুর, চিনেবাদাম ছড়ানো মোড়ে মোড়ে। খেতে খেতে যাই আমরা, যেতে যেতে খাই।'

'বাজে খরচা খালি। মল্লিকবাড়ি অমনি অমনি খেলে পেটও ভরে, তেমনি পয়সাটা বেঁচে যায় না আমাদের?'

'তোমার কোনো খরচা হবে না, আমি খাওয়াচ্ছি তোমায়।'

'তুমি কোথায় পাবে? কাল যে বললে তোমার কাছে কোনো পয়সাই নেই আর?'

'কাল ছিল না, আজ হয়েছে। ফাউন্টেন পেনটা বেচে দিলাম না সকালে? কী হবে আর কলম রেখে? লেখাপড়ার পাট চুকেছে, পরীক্ষাটাও মিটে গেল। কলমের আর কী দরকার আমার।'

'অমন ভালো কলমটা, অত শখের, বেচে দিলে অমনি?'

'কিনবো আবার কোনোদিন। কাগজের দাম জমা দিতে হবে না আজ? সেইজন্যেই বেচতে হোলো।'

'আহা, বললাম না তোমায় আমি, চেষ্টা করলে টাকা জমা না দিয়েও মিলত কাগজ? আনন্দবাজারের কর্তাদের তুমি জানো না ভাই! কী চমৎকার লোক যে সুরেশদারা! তাঁরা তো বাঙালীর ছেলেদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্যই উৎসাহ দেন, সবরকম সাহায্য করেন সব সময়। কেন নাহক বেচতে গেলে কলম!

'ওর চেয়ে ভালো কলম কিনবো দেখো। কাগজ বেচে টাকা হোক না! চলো তো এখন।'

আমরা বউবাজারের পথ ধরি। আগে বসুমতীর কাজটা সেরে তার পরে গোলদীঘিতে আনন্দবাজার কার্যালয়ে যাওয়া যাবে। তারপর সেখেন থেকে সে আমায় নিয়ে যাবে দেলখোশ কেবিন বলে খাসা একটা খাবার জায়গায়। হ্যারিসন রোড়ের মোড়ে।

ডানদিকের ফুটপাত ধরে যেতে যেতে চেরী প্রেস নজরে পড়ল আমাদের। বিজলীর সাইনবোর্ড লাগানো দেখলাম। দেখেই না আমি লাফিয়ে উঠেছি।

'আরে, বিজলী যে! সাপ্তাহিক বিজলী। দেশের বাড়িতে যেত আমাদের। বাবা নিতেন। বোমারু বারীন ঘোষদের কাগজ। দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে বের করেছে ওরা। বাবা ভারী ভক্ত তা জানো?'

'হপ্তায় একদিন বোরোয় মোটে।' সে বললে: দৈনিক নয় তো।'

'নাই বা হোলো। এ কাগজও তো বেচতে পারি আমরা? পারি না? পাওয়া যায় না বিজলী?'

'কেন যাবে না। একই কমিশন, ওই টোয়েনটি ফাইভ পারসেন্ট। বিজলীরও খুব বিক্রি, আমি জানি। ভেতরে গিয়ে খোঁজে নেওয়া যাক, এসো।'

হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল বিজলীর ম্যানেজার। মাটির মানুষ। এমন ঠান্ডা শান্ত প্রকৃতির যে, বোমার দলে কখনো যে ছিলেন তা ভাবাই যায় না। ভোলানাথের মতন চেহারা। আস্তে আস্তে কথা কন।

আমাদের আরজি শুনে সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন আমাদের।

আমার নামটায় কেমন একটা খটকা লাগল তাঁর। একটুকরো চিরকুটে কী যেন লিখে তিনি পাঠিয়ে দিলেন আমাদের নলিনী সরকারের কাছে।

নলিনীকান্ত বিজলীর সম্পাদক। চিরকুটখানা দেখে তিনি আমার দিকে তাকালেন— 'তোমার নামই শিবরাম ? তুমিই কি আমাদের কাগজে লিখেছিলে ?'

'হ্যাঁ। এক-আধটা লিখেছি কেবল। ঐ কবিতাই।'

'চাঁপদাড়িওয়ালা কোনো বয়স্ক লোকই হবে শিবরাম—এই আমরা ঠাউরেছিলাম।'

শুনে আমি গালে হাত দিই। নিজের গালে।

'দাড়ি পাবো কোথায় ?' আমাকে ছেলেমানুষ দেখে ভারী হতাশ হয়েছেন মনে হল।

'লেখার হাত আছে তোমার, হাতের লেখাটাও বেশ পাকা।' তিনি বলেন—'তাই দেখেই ঐ সন্দেহ হয়েছিল। খাতার পর খাতা লিখে লিখে বোঝাই করে হাত পাকিয়েছ বুঝি ?'

'না না। বেশি কী লিখেছি এমন ! ঐ দুয়েকটাই।' আমি জানাই—'ভারতীতে আর বিজলীতেই বেরিয়েছে যে-কটা। আচ্ছা, আপনাদের উনপঞ্চাশী কে লেখেন ? আর ওই খড়কুটো ? ওগুলো খুব ভালো লাগে আমার।'

মার্ক টোয়েনের থেকে আমি হাসির প্রেরণা পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু মনে হয়, ব্যঙ্গরচনার আমার প্রথম উদ্দীপনা ঐ উনপঞ্চাশীতে। সেই উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকোপেই আমি যেন খড়কুটোর মতই ভেসে গিয়েছি—এতদিন ধরে আমার এই অল্পবিস্তর লেখার সেইখানেই বুঝি উৎসাহ। উৎসর থেকেই অঙ্কুরিত আমার এই উৎসার। হাসির গল্পে এত উৎবসব এতদিনকার !

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে নলিনীদা শুধোলেন—'কী ছিল যেন তোমার কবিতাটা ?'

'জানি জানি/সবাই সবে/ছাড়বে।/ চলার পথে/কে কার....'

ঐ অব্দি গিয়েই আমার কেকা-ধ্বনি থামাতে হয়। খট্‌কার ছিটকিনিটা ভেতর থেকেই কে যেন এঁটে দেয়। বাবা ! এই বোমারুদের সামনে চুমা দিয়ে এগুবো ? সাহস হয় না আমার। যদিও আমার ধারণায় বোমা আর চুমা একই ধরনের প্রায়। দু-ই তোমায় মুহূর্তের মধ্যে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

'কে কার চুমু কাড়বে।' তিনি নিজেই কবিতাটাকে পদস্থ করেন। তারপরে 'শোনো শোনো বারীন।' হাঁকেন তিনি। 'শুনছো !'

ঘরের কোণায় আরো দু'জনা বসেছিলেন। নলিনীদার কথায় তাঁরা মুখ ফেরালেন।

'উপেনদা, দেখেছেন ছেলেটাকে ? সেই শিবরাম।...যুগান্তকারী লোকদের কাছে যে যুগান্তকারী কবিতা পাঠিয়েছিল।....'

নলিনীদা বিশেষ অত্যুক্তি করেননি। সেকালের বাংলা লেখায় চুমুর ছড়াছড়ি তেমন দেখা যেত না। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত সনেটটি বাদে শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীই দিবাকরের ভিজে ঠোঁটের উপর একটা চুমু খেয়েছিল যা ! শুনে আমি ভিজে বেড়ালটির মত চুপ করে থাকি।

'ঘরে ঢোকামাত্র দেখেছি, একটা বর্ণচোরা আম।' উপেনদা একটু দৃক্‌পাত করেন মাত্র। 'এক নম্বরের এঁচোড়ে পাকা। দেখলেই বোঝা যায়। নিজগুণেই পেকেছে, কাউকে কিলিয়ে পাকাতে হয়নি।'

এক নজরেই উপেনদা ঠিক চিনে নিয়েছিলেন আমাকে।

বারীনদা কিছু বললেন না। তিনি যেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির বলেই আমার বোধ হয়।

'ছেলেটার সাহস তো কম নয় ! বোমার লোকদের কাছে চুমার তত্ত্ব পাঠানো !' ঠাট্টার ছলেই কথাটা বলেন যেন নলিনীদা।

'উনপঞ্চাশী কে লেখেন তুমি জানতে চাইছিলে না? ঐ উপীনদা, আমাদের উনিই লেখেন। আর খড়কুটোর টিপ্পনীগুলো আমরা সবাই মিলে বানাই, বুঝেছো ?'

'ভারী চমৎকার হয়। ঐ দুটোই। দুটো অবশ্যি দু'রকমের চমৎকার।'

তারপর কাজের কথা চুকে গেলে পর সেখান থেকে আমরা বসুমতীতে গেলাম—সেখান হয়ে গোলদীঘির শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। আমার সঙ্গী ছেলেটির সহায়তায় সব জায়গাতেই সহজে কাগজ পাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কাল সকাল থেকেই কাগজ নিয়ে বেচতে লাগব ঠিক হল। সন্ধ্যেবেলায় কমিশন বাদে কাগজের দাম আপিসে জমা দিয়ে এলে পরের দিন ফের আবার কাগজ পাবার বন্দোবস্ত।

ছেলেটা বলল,'ইচ্ছে করলে তুমি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়েও কাগজ বেচতে পারো কাল থেকে।'

'আর তুমি ? তোমার কোনো অসুবিধা হবে না ?'

'আমি ভাবছি ভবানীপুরের দিকে যাব। সেখানে কাগজ বেশি কাটে বলে শুনেছি।'

'না। ওখানে কাগজ বেচতে পারব না আমি। আমার একটু অসুবিধা আছে। ফর্বেস ম্যানসন ছেড়ে এসেছি না আমি ? তারই সামনে দাঁড়িয়ে...।'

'কোথায় বেচবে তাহলে ?'

'ঐ ওয়েলিংটনের মোড় ছাড়া যে কোনো জায়গায়। কিন্তু এখান থেকে তুমি চলে গেলে তোমার পাত্তা পাব কোথায় ?

'মতিশীলের ইস্কুলে। টিফিনের ঘন্টা পড়লেই আমি বেরিয়ে পড়ি। মল্লিকবাড়ি খেতে যাই তো। তখনই খেতে দেয় সবাইকে।'

'আমাকেও সেখানেই যেতে হবে খেতে মনে হচ্ছে।' আমি কই—'কাগজ বেচে যা এক-আধ টাকা লাভ হবে তা যদি খেয়েদেয়েই ফুঁকে দিই তো সিনেমা দেখব কিসে ? একটা করে ছবি তো রোজ দেখতেই হবে আমাকে—ন'টার শোয়ে অন্তত।'

শোয়ের পরে শোয়ার কথাটা মনে পড়ে যায়—'খাওয়ার ধান্দাটা চুকলো না হয়, কিন্তু শোবো কোথায় ? রাত কাটাব কোনখানে হে ? তোমাদের ওই ইস্কুলে তোমার কাছে শুতে যাই যদি ? যে পাড়াতেই কাগজ বেচো না, শুতে তো হবে তোমায় সেইখানেই।'

'সেইখানেই শোব বটে. কিন্তু দারোয়ান তো তোমায় অ্যালাউ করবে না ভাই ! হেডমাস্টারের পারমিশন পেলে তবে সে দেবে। তাহলে আমাদের ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে তোমাকে।'

'বা রে ! ইস্কুলে ভর্তি হব কি ! কলেজের ছেলে না আমি ? কয়েকদিনের হলেও ন্যাশনাল কলেজে পড়েছি তো।'

'তাতে কি ! লোক দেখানো ইস্কুলে অ্যাটেণ্ড করবে কেবল, তাহলেই হবে। ফ্রী ইস্কুল তো, বেতন-টেতন লাগে না তো আর।'

'তাহলেও ভর্তি হতে গেলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লাগে.না? সেসব আমি পাচ্ছি কোথায়?'

'ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিলেই কি না দিলেই কি ! ওরা ওসব দেখে ভর্তি করে না। নিজেদের ইস্কুলে ছেলে নেবার আগে তাকে বাজিয়ে দ্যাখে। নিজেরা পরীক্ষা করে দেখে তবে নেয়। যে ক্লাসের যে উপযুক্ত সেই ক্লাসেই তাকে ভর্তি করে।'

'তাহলে...তাহলেই বা কি ! কোনো ক্লাসেই আমি পাশ করতে পারব না। সব পরীক্ষাতেই ফেল যাবো নির্ঘাত।'

'ফেল যাবে ? ফেল যাবে কেন ?'

'আঁকেই আমার আটকাবে।' নিজের আতঙ্ক প্রকাশ করি—'সামান্য যোগবিয়োগই কষতে পারব না, ভুল হবে, ফলে মিলবে না, একেকবার একেক রকম ফল হবে। আর গুণ ভাগ...?' নিজের গুণভাগ আর জাহির করি না—'তাহলে দেখছি সেই কেঁচে গণ্ডূষ করে তোমার ওই ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাসেই ভর্তি হতে হবে আবার। হাফপ্যান্ট পরে সেই ইন্‌ফ্যান্টে।'

আমার কথায় আমার গুণপণা প্রকাশ পায়।

ইনফ্যান্ট ক্লাসে ?' ছেলেটা হাসে।

'এ বি সি ডি আর অ আ ক খ ছাড়া কিছুই আমি জানি না যে।' আমার অকপট কবুলতি—'অক্ষর পরিচয় হয়েছে শুধু আমার। স্বাক্ষর করতে পারি কেবল।'

'সেটাও কি দেবাক্ষরে নাকি ?' আরো তার হাসি দেখা যায়। 'নাকি তোমার বুড়ো আঙুলের টিপ-সই দিয়ে ?'

'মা সরস্বতীকে চিরকাল বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এলাম না ?' তার টিপের ওপর আমার টিপ্পনি।

'তাহলে ওই মতিশীলের দরজা তোমার বন্ধ।' সে বলে।

'বললাম না তোমায়, আহিরিটোলার রাস্তাটা চিনিয়ে দাও আমাকে—সেখানে গিয়ে কাগজ বেচি গে... তা তুমি কেয়ারই করলে না। এখন আবার তুমিই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছো!'

'সেখানে গিয়ে কোনো লাভ হতো না তোমার। ক'টা কাগজ বিক্রি হবে সেখানে ? আহিরিটোলায় তো খালি হিন্দুস্তানী গয়লাদের খাটাল।

'গয়লাদের খাটাল ? তাই নাকি ? তা, নামটা শুনে তাই মনে হয় বটে, গয়লাদের আহীর বলে থাকে মৈথিলী ভাষায়...বৈষ্ণব পদাবলীতে পড়েছি না ? আহীরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন্ ছার। পরাণ নিছিয়া দিনু চরণে তোমার...'

'তার মানে ?'

'তার মর্ম তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। কোনো গোপনারী শ্রীকৃষ্ণকেই বলছে বোধ হয়, সামান্য গয়লার মেয়ে আমি, আমার মনপ্রাণ সব তোমার পায়ে বিকিয়ে দিলাম...' আমার ভাষাজ্ঞান প্রকাশ পায়—'মর্মটা হচ্ছে এইরকম। মর্মান্তিকও বলা যায়।'

'কিন্তু ভাই, এই আহিরিটোলায় আমি গেছি তো বার কয়েক, কোনো আহীরিণীর দেখা পাইনি কখনো। সেখানে কোনো গোপনারী নেই হে, সব গোপ। ইয়া ইয়া গোঁফ সবার।'

বলে সে তা দিয়ে দেখায়—যে গোঁফ তার গজায়নি তাইতেই।

'তাহলে থাক গে। কাজ নেই সেখানে গিয়ে। আজ ন'টার শোয়ে আমরা সিনেমায় যাব তো ? যাবে তো তুমি ? এলফিনস্টোন পিক্‌চার প্যালেসে চমৎকার একটা ছবি দেখেছিলাম, সেটা আবার এসেছে সেখেনে। আমি আবার দেখব। দারুন ছবি!'

'কী রকম শুনি ?'

'একটা ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে। আমাদের চেয়েও ছোট। বাপমা'র ঠিকানা নেই তার, এক অনাথ বালক। ইস্কুলের সামনের খোলা মাঠে তাকে আর সব ছেলের সঙ্গে খেলা করতে দেখা গেল। বড়লোক মেজলোকের ছেলে সবাই, চমৎকার পোশাক পরা তারা। সে-বেচারার তেমন ঝলমলে জামাটামা কিছু ছিল না। না থাক, ছেলেদের ভেতরে তো

কোনো ভেদাভেদজ্ঞান নেই—তাদের সঙ্গে সমানে মিলেমিশে খেলছিল সেও। খেলাধূলার মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে গেছল যেন সে। তারপর খেলতে খেলতে, ইস্কুল খোলার ঘণ্টা যেই পড়ল না, ছেলেরা সবাই ছুটে গেল ইস্কুলে, সেও ছুটল তাদের সাথে সাথে। কিন্তু আর সব ছেলেরা ভেতরে ঢুকে যাবার পর সে যখন গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো—লোহার রেলিং-দেওয়া দু'ধারের গেট দুটো আপনার থেকেই এসে বন্ধ হয়ে গেল তার সম্মুখে।'

'আপনার থেকেই ? ম্যাজিক নাকি ?'

'প্রায় ম্যাজিকের মতই। গেটের ধারেকাছে দারোয়ান-টারোয়ান কেউ ছিল না, কাউকে বন্ধ করতে দেখলাম না গেট...আপনার থেকেই সেটা তার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল যেন কেমন করে।'

'আশ্চর্য।'

'ছেলেটার মুখের চেহারা যদি দেখতে তখন ! ওধারে অত ছেলে...ক্ষণিক বন্ধুরা ওর...হাসছে লাফাচ্ছে। এধারে সে একলাটি। কেউ তার দিকে ফিরেও চাইছে না। ছেলেটার মুখের দিকে তাকানো যায় না, কান্না পায় এমন !'

'সেই কান্না পাবার ছবি দেখতে চাইছো তুমি আবার ?' সে অবাক হয়।

'জানো ভাই, আমিও ওর মতই একটা ছেলে যে ! আমার মা ছেলের জন্য মানত করে বিন্ধ্যাচলে পার্বতী দেবীর কাছে পুজো দিতে গিয়ে—পুজো দিয়ে ফিরে মন্দিরের বাইরে এসে কুড়িয়ে পেয়েছিল আমাকে। সেই জন্যেই আমার ডাকনাম পার্বতীচরণ, তা জানো ?'

'দূর। তা কি হয় নাকি ?'

'আমার দশাও ঐ ছেলেটার মতই হবে বোধ হচ্ছে। ওর মতন আমিও কোনোদিন ভদ্রসমাজে ঠাঁই পাব না। আমার সঙ্গেও মিশবে না কেউ। যেদিকেই যাব, সব জায়গায় দরজা আমার মুখে ওপর বন্ধ হয়ে যাবে ওর মতন...ওমনি করেই।'

'কী সব আজেবাজে বকছো ! যা-তা ভেবে মন খারাপ করছো নাহক।' সে আমাকে সান্ত্বনা যোগায় ; 'ওসব ভেবে মন খারাপ কোরো না মিথ্যে।'

'না, মন খারাপ করার কিছু নেই। করছিও না। বাবা বলেন, দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম মমায়ত্ত তু পৌরুষম্। মহাভারতের কথা, কর্ণ বলেছিল। কাকে বলেছিল জানিনে।'

'বলেননি সেটা তোমার বাবা ?'

'না, বলেছিল হয়ত বাবা, মনে পড়ছে না আমার। উৎকর্ণ কাউকে বলেছিল নিশ্চয়। অর্জুনকেই বলে থাকবে মনে হয়...'

'অর্জুনকে ?'

'হ্যাঁ। যে কর্ণপাত করবে তাকেই তো বলবে ? আর, অর্জুনই তো কর্ণপাত করেছিল জানি। কর্ণকে সেই নিপাত করেছিল না ?'

'অন্যায় যুদ্ধে।' ছেলেটা বলে : 'অন্যায় যুদ্ধে কর্ণপাত করাটা ভারী অন্যায় হয়েছিল অর্জুনের। ঐ কথাটার জন্যেই যদি করে থাকে তো আরো অন্যায়। আরো ঘোরতর অন্যায়। কেন, কথাটা এমন কিছু খারাপ কথা নয়।'

'নয়ই তো। কিন্তু আমার কথা আলাদা। কোন কুলে যে জন্মেছি তাও জানিনে, আবার এদিকে এক কড়ার পৌরুষও নেই আমার...'

'মন খারাপ করো না। বলেছি তো, তোমার সঙ্গে সিনেমায় যাব আমি আজকে।' সে আমার দুঃখ দূর করতে চায় : 'এলফিনস্টোন তো ? ন'টার শো'র দু'খানা টিকিট কেটে ফোর্থ ক্লাসের গেটে দাঁড়িয়ে থাকব ঠিক সময়ে তোমার অপেক্ষায়...বলছি তো আমি।'

'দুঃখ কিসের! জন্মেছি যে সেই ভাগ্যি! যে-কুলে যেভাবেই জন্মাই না-হওয়াটাই বড়ো কথা। কিছু যদি নাও হতে পারি, কিছু তো হবোই। হয়েছি তো...হচ্ছি তো...হলেই হোলো!'

বউবাজারের কর্ণার থেকেই কিক্ শুরু হোলো—কাগজ নিয়ে ফেরি করতে দাঁড়াতেই না! একশ' গজ ঠিকরে পড়লাম।

'আরে ইয়ে বংগালি ফিন কাঁহাসে আয়া রে!' গুঞ্জন উঠল সেখানকার হকারদের ভেতর। মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমনটা হয়।

'দো চার মুক্কা লাগা দেও না, আভি ভাগি।'

মনে করেছিলাম ওদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব কিন্তু মৌরসী পাট্টার বনেদীরা সহজে বনে না। কায়েমী স্বার্থ আপস করতে জানে না।

মুক্কার কথা উঠতেই আমি নিজেকে গুটিয়ে নিই, বেমক্কা পড়ে পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে বেমুক্কা এখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয়। এক ধাক্কায় চলে যাই মীর্জাপুরের গোড়ায়।

গোলদীঘির রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে হাঁকি—আনন্দবাজার! আনন্দবাজার! জোর জোর হাঁকতে থাকি।

আমার শোরগোল একজনের কানে লাগে—'এমন বিটকেল আওয়াজ ছাড়ছো কেন হে? চেঁচাচ্ছ কেন এখানে দাঁড়িয়ে ? এখানে তোমার আনন্দবাজার কিনবে কে ? পয়সা দিয়ে কিনতে যাবে কেন শুনি ? যখন একটুখানি এগিয়ে গেলে দীঘির ওপারে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের গায়ে লাগানো আনন্দবাজার অমনি অমনি পড়তে পাওয়া যায় ?'

কথাটা আমার মনে লাগে। আরে, আমিও তো তাই ভেবে রেখেছিলাম আজ সকালবেলায়।

কাগজ নেবার কালে প্রথমটায় ভাবলাম যে, শেষ কাগজখানা বেচব না, নিজের পড়ার জন্য রাখব। তার পরেই ভেবে দেখলাম, যদি সব ক'খানাই বেচা যায়, একটা কাগজও না বেঁচে যায় মন্দ কী! বিকেলে যখন আপিসে টাকা জমা দিতে আসব তখন বাইরের দেয়ালে সাঁটা (আমার নজরে ঠেকেছিল তখনই) কাগজটা পড়ে নিলেই চলবে তো!

সেখান থেকে সরে চলে গেলাম সোজা হ্যারিসন রোড়ের ধারে—কেষ্টদাস পালের ছত্রতলে।

মর্মর মূর্তির এলাকায় কাগজের ফেরিওয়ালা ছিল না একজনাও। হকারদের জমায়েত ছিল মুখোমুখি ঠিক তার উল্টোদিকে। খদ্দেরেরও ভিড় ওধারেই।

জনাকয়েক বাঙালীর ছেলেও বেচছিল সেখানে দেখলাম। বিক্রি হচ্ছিল বেশ তাদের।

কিন্তু হিন্দুস্তানীরা খানিক পরেই রুখে উঠল তাদের ওপর। কিন্তু ছেলেগুলোও দেখলাম বেশ তেড়িয়া, কোনো তাড়নাতেই নড়বে না সেখান থেকে।

পিঠোপিঠি পিটাপিটি শুরু হ'য়ে গেল। দোরোখা কিলচড়ঘুঁষি দু' তরফে। ছেলেরাও ছাড়বার পাত্র নয়। যেমন মার খাবার তেমনি মারবার জন্যে তৈরি। দু' পক্ষই নাছোড়বান্দা।

ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখা ভালো, বলতেন বাবা। তাছাড়া, যার বাহুবল নেই, মারামারির মধ্যে যাওয়া তার পক্ষে বাহুল্য! শখ করে ঠোকাঠুকির ঠক্করে না গিয়ে অলক্ষ্যে সেখান থেকে সরে পড়াই সমীচীন বোধ করলাম।

ভবী যেমন নিজের ভবিষ্যৎ ভোলে না তেমনি প্রথম আখর দেখেই আখেরের কথা ঠাউরে নিতে পারে।

দুর্জনদের দূরে পরিহার করে দূর থেকে নমস্কার ঠুকে সুদূরপরাহত হয়ে গেলাম। চলে এলাম ঠনঠনের মুখে।

সেখানে শুধু ভক্তজনের ভীড়। মা কালীর চন্নামৃতের তৃষ্ণা সবাইকার, খবরের খিদে নেই কারোই। বিশেষ সুবিধা না করতে পেরে সেখান থেকেও সরতে হোলো।

শঙ্কর ঘোষ লেন, শিবনারায়ন দাসের গলি, কৈলাস বোস স্ট্রীট একে একে পার হয়ে শেষে দাঁড়ালাম গিয়ে বিবেকানন্দ স্পার-এ। গোড়াপত্তনের কালে বিবেকানন্দ রোড়ের ঐ নামটাই ছিল তখন। সেখানেও কিন্তু কাগজের চাহিদা নেই।

একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক তাহলে।

স্পারের পাড়া পার হয়ে কাগজের তাড়া নিয়ে হেদোর মোড়ে গিয়ে খাড়া হলাম।

এক ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। —'দেখি তো আজকের কাগজটা।

তাঁর হাতে একখানা তুলে দিলাম। তিনি গোটা গোটা আখরের খবরে মোটামুটি চোখ বুলিয়ে মেজ মেজ ছোট ছোট হরফের ছোটখাট সংবাদগুলো খাঁটিয়ে দেখলেন। আমি অপলক প্রত্যাশায় তাকিয়ে রয়েছি।

মিনিট পনের ধরে কাগজখানার আগাপাশতলা নজর দেবার পর আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন আবার—'এই নাও বাপু,তোমার কাগজ।

আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছি দেখে অযাচিত উপদেশ দিলেন আমায়—'এখানে বাবা তোমার এক কপিও কাগজ বিক্রি হবে না। হেদোয় লোকে বেড়াতে আসে আর সাঁতার কাটতে আসে, সকালে বিকালে হাওয়া খায়—এখানে কারো কাগজ পড়ার গরজ নেই। কাগজ যদি বেচতে চাও তো চলে যাও হাতিবাগানের মোড়ে, নয়ত সেই শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়। এখানে তোমার কাগজ কিনবে কে?'

'আপনি অন্তত একটা কিনবেন আশা করেছিলাম।' আমি বলি। সত্যি, ওঁর হাতেই আজকের বউনিটা হবার ভরসা ছিল আমার। কিন্তু বউনির বদলে পেলাম বকুনি। এবং কিছু কথার বুকনিও।

'আমার এখন কাগজ পড়ার ফুরসত আছে নাকি? আমি যাচ্ছি এখন হাতিবাগান, বাজার করতে বেরিয়েছি দেখছ না!' দৃষ্টান্তস্বরূপ থলিটা আমার নাকের উপর তুললেন—'একদণ্ডও সময় আছে আমার!'

'বেশ তো মশাই এতক্ষণ ধরে পড়লেন আমার কাগজ। তার তো সময় ছিল খুব। কাগজ পড়ার ফুরসত ছিল আর কেনবার বেলাতেই...ইচ্ছে হলো বলি একবার। কিন্তু বলব কাকে? ততক্ষণে তিনি হাতিবাগানের দিকে সাত হাত এগিয়ে গেছেন।

কাগজের পাঁজা ঘাড়ে হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে হেদোচ্ছি, কতক্ষণ ধরে জানি না, হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে বইখাতা হাতে ওধারের ফুটপাথ ধরে চলেছে।

কিশোরী মেয়ে। চমক লাগল কেমন। রিনি। রিনিই না?

ট্রাম বাস মোটর কোনোদিকে না তাকিয়ে পড়ি কি মরি হয়ে ছুটে গেছি আমি ওধারে। পড়েছি প্রায় মেয়েটির ঘাড়ের ওপর।

হতচকিত হয়ে সে দাঁড়িয়েছে—'কী?'

না, রিনি নয়। আমি অপ্রস্তুতের মত বলেছি—'কাগজ নেবেন একখানা ? আজকের কাগজ ? মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন...'

আর বলতে হল না। মেয়েটি কোন কথা না বলে দাম দিয়ে কাগজখানা নিয়ে পাশের গেটের ভেতর দিয়ে সেঁধিয়ে গেল সটান।

দেউড়ির মাথায় দেখলাম, ঘোরালো সাইনবোর্ডে লেখা : বেথুন স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ।

দেখেই আমার চক্ষুস্থির ! আরে, এখানেই রিনি পড়ে যে ! এখানে পড়ানোর জন্যেই তো ওকে চাঁচল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

এ কী ! যে পর্বত কিনা মহম্মদের ডাকেও সাড়া দেয় না, তাই কি আজ মা পার্বতীর দয়ায় এই আহাম্মকের কাছে এসে গেল—না চাইতেই !

আহিরিটোলার পথ নাই চিনলাম, নাই কেউ দেখালো আমায়—আমার চাইনেকো আর। আহিরিটোলার আহীরিণীকে আমি এখানে দাঁড়িয়েই আহরণ করতে পারব। আমার কাগজের ফেরি নিয়ে সেখানে ঘোরাফেরা না করেও সেই বনহরিণীকে আমি ধরতে পারব এখানেই অনায়াসে।

বেচতে পারি আর না পারি, আমার পসরা নিয়ে এই পথেই আমি দাঁড়াব এসে রোজ। রোজগার হোক বা না হোক।

একটি দুটি করে আরো আরো মেয়েরা আসতে লাগল একে একে। একা একা, জোড়ায় জোড়ায়—বড় মেয়ে, মেজ মেয়ে, ছোট ছোট মেয়ে যত।

আর আমিও হাঁকতে লাগলাম জোর জোর—আনন্দবাজার ? আজকের আনন্দবাজার। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, আর দশ মাসের মধ্যে স্বরাজ দিব !

মহাত্মা গান্ধী ঠিক কী কথাটি যে বলেছেন জানি না, কাগজে চোখ বোলানোর ফাঁক পাইনি তখনো, কিন্তু ঐ বড়ো খবরটা মোটা মোটা হরফে গোটা পাতা জুড়ে কাগজের মাথায় জানানো হয়েছিল। যা পথচলতি লোকেরও চোখে না পড়ে যায় না।

সেই কথাটাই হাঁকছিলাম খালি খালি। আর কাগজ বিক্রি হচ্ছিল চোটপাট। আমার হাঁকডাকে চকিত হয়ে প্রায় মেয়েই কিনছিল একখানা করে।

সংবাদ পরিবেশনায় এই বাহাদুরি—এই নিত্য নতুনত্ব এখনকার মত তখনো ছিল ওই আনন্দবাজারের। এই নৈপুণ্য, এই স্বকীয়তা আর এই বৈশিষ্ট্য তার গোড়ার থেকেই।

প্রতিদিনকার জোর খবরটা জোরালো অক্ষরে ছাপানো থাকত পাতা জুড়ে। কাগজের মাথায়। কারো চোখে না পড়ার কোনো ওজর ছিল না।

এতে করে আমার কাগজ কাটানোর যা সুবিধা হতো !

দেখতে দেখতে সব কাগজ কেটে গেল আমার—শেষ মেয়েটিও চলে গেল কলেজের ভেতর।

পড়ে রইল খালি একখানা বসুমতী। এটা আর বেচব না। নিজেই আমি পড়ব এখন এক সময়।

রিনি আজ ইস্কুলে আসেনি কিন্তু। কেন আসেনি ? অসুখবিসুখ করেছে নাকি ওর ? নাকি বিয়েই হয়ে গেল শেষমেশ ?

না না, এখনই বিয়ে হবে কী, ওইটুকুন তো মেয়ে—মায়ের চোখে হলেও, সত্যিই ওর বিয়ের বয়েস হয়েছে নাকি ? এনট্রেন্স পাশের আগে বিয়ে করবে না বলেছিল না সে ? তাই ভেবেই আমি নিজেকে ভরসা দিতে চাই। সান্ত্বনা পাই।

আজ আসেনি, কাল সে অবশ্যি আসবে। ক'দিন ইস্কুল কামাই করবে ? তবে আমি দেখতে পাবই...একদিন না একদিন...এই এখানেই। নিশ্চয় !

রিনিকে দেখতে পাব ঠিকই, কিন্তু সেই ছেলেটির দেখা বোধ হয় পাব না আর। ভেবে মন ভার হয়। ভবানীপুরের থেকে যদি সে কোনদিনও এধারে আসে, কোনো রাস্তার মোড়েই আমার পাত্তা পাবে না। আমি যে কাগজ ফেরিতে বেরিয়ে ওয়েলিংটন—বউবাজার—হ্যারিসন রোডের সব ফেরিঘাট পেরিয়ে ফেরারী হয়ে শেষে এখানে এসে ঠেকেছি তা সে টের পাবে কি করে ?

হাতিবাগান-ফেরত সেই ভদ্রলোককে এবার বাজারের থলি হাতে ফিরতে দেখা যায়।

'ও বাবা ! তোমার সব কাগজই যে এর মধ্যেই বেচে ফেলেছো দেখছি ! দেখে বিস্মিত হন। —'না, একখানা রয়েছি দেখছি এখনো। দাও, তাহলে ওটা আমিই কিনে নি না-হয়।'

তিনি ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করেন।

'না, এখানা আমি বেচব না মশাই !

'বেচবে না, তার মানে ?' তিনি বিস্মিত আরও।

'মানে, এটা আমি নিজেই পড়ব বলে রেখেছি।'

'তুমি পড়বে! তুমি পড়বে কাগজ।' তাঁর বিস্ময় যেন ধরে না—'পড়তে পারো তুমি?' পড়লে বুঝতে পারবে? লেখাপড়া শিখেছ নাকি?' পয়সাটা তিনি ফতুয়ার পকেটে ভরেন—'আনন্দবাজারটা পড়েছি, তখনি পড়া হয়ে গেছে আমার—বসুমতীটা কিনতে চাইছিলুম তাই। তোমার ভালোর জন্যেই বাপু!'

'আমার ভালোর জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'চিনির বলদ চিনি খায়, কাগজের হকার কাগজ পড়ে ! অবাক কান্ড !' বিড় বিড় করে বিরক্তিভরে তিনি চলে যান।

'শুধু পড়ি না মশাই। এই কাগজে আমি লিখিও। লিখেও থাকি তা জানেন ?' ইচ্ছে হল ডেকে বলি ওনাকে। কিন্তু যেমন হন্যে হয়ে সকালে তিনি বাজার করতে বেরিয়েছিলেন তেমনি হন হন করে বাড়ির দিকে চলেছেন এখন।

এবং বললে পরে কথাটা প্রায় মিথ্যেই বলা হতো নাকি ? বসুমতী কি আনন্দবাজারে একছত্রও আমি লিখিনি তখনো, লেখার কল্পনাও ছিল না আমার, (লিখেছিলাম তার অনেক অনেক দিন পরে) তবে বিজলীতে লিখেছিলাম তো ঠিকই। আর বিজলী কিছু বসুমতীর চেয়ে খাটো নয় কোনো দিকেই।

হাতের কাগজখানা নিয়ে হেদোর ভেতরে গিয়ে বসলাম—ঘেরাটোপের ছত্রছায়ায়।

কয়েকখানা বেঞ্চি জুড়ে জনকয়েক ঘুমোচ্ছিল আয়েস করে। তাদের কারো আরামের বিঘ্ন না ঘটিয়ে একজনের পায়ের তলায় একটুখানি ফাঁক পেয়ে সেখানে বসেই কাগজটা পড়তে লাগলাম।

কাগজখানার গোড়ায় সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ থেকে শুরু করে শেষ লাইনে মুদ্রাকরের ঘোষণা পর্যন্ত গড়িয়ে যেতেই বারোটা বেজে গেল। টনক নড়ল আমার। মাথায় আর পেটে যুগপৎ ! এখন তো কিছু না খেলেই নয়।

মল্লিকবাড়ি যেতে হয় এবার। ছেলেটা বলেছিল একটার পরেই নাকি তারা খেতে দেয়। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে একটা বেজে যাবে।

গিয়ে দেখি প্রায় হাজার খানেক ভিখিরির ভিড়। তাদের সারির ভেতর খাড়া হয়ে গেলাম এক জায়গায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম মার্বেল প্যালেস।

এই সেই বিশ্ববিখ্যাত মর্মর প্রাসাদ! আপাদমস্তক মার্বেল প্রস্তরে গঠিত দেখে চোখ ঠিকরে যায়। দেশবিদেশ থেকে কৌতূহলী পর্যটক যা সাধ করে দেখতে আসে। সেই দানধন্য পুণ্যশ্লোক রাজেন মল্লিকের বাড়ি—যাঁর বদান্যতা ভারতবিদিত।

বিরাট প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা ফোয়ারায় জল উপচে পড়ছিল—এখানে-ওখানে মর্মরমূর্তির ভাস্কর-কীর্তি। সারস পাখিরা চরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। কয়েকটা হরিণও দেখেছিলাম মনে হয়।

এধারে আমরা সারবন্দী দাঁড়িয়ে—খাবারের প্রত্যাশায়।

আসতে আসতে আমার পালাও এল পাবার।

'কিসে দেবো হে তোমাকে? থালাটালা কিছু আনোনি?' শুধালো পরিবেশক।

'আনিনি তো। আনতে হয় জানতাম না। আজ প্রথম আসছি কিনা!'

'দেখছ না সবাই তাদের সানকিতে নিচ্ছে।'

দেখলাম বটে, সানকি কিংবা কলাই-চটে-যাওয়া প্লেটে করেই নিচ্ছিল সবাই।

দিচ্ছিল খিচুড়ি। চরাচরের খাদ্যাখাদ্যের মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয়তম।

'আমাকে এই কাগজটাতেই দিন না হয়। কাগজেই খাব আমি।'

'কাগজে খাবে? সে কী!'

'খাওয়া নিয়ে কথা। কাগজ তো আর খেতে যাচ্ছিনে'

পরিবেশক একটু হেসে বললে—'তুমি কি পড়োটড়ো কোথাও? ইস্কুলের ছাত্র নাকি?'

'হ্যাঁ। ছাত্র বইকি। কলেজে পড়ি আমি। ন্যাশনাল কলেজে।'

'তাহলে তোমায় এই ভিখিরিদের মধ্যে বসে খেতে হবে না। ছাত্রদের জন্যে ভেতরে খাবার ব্যবস্থা আছে। তাদের সঙ্গে বসে খাবে তুমি।'

ভেতরে গিয়ে ছাত্রদের পংক্তি ভোজনে বসলাম। সেখানে খাবার ব্যবস্থা ভালোই। তাদের মধ্যে সেই ছেলেটিকে কিন্তু দেখা গেল না। তার ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টা পড়েনি বোধ হয় এখনো, কিংবা হয়তো সে কাগজ বেচে ভবানীপুরের থেকে এসে পৌঁছতে পারেনি যথাসময়ে। ইস্কুল কামাই করেছে আজ।

মার্বেল প্যালেসে খাওয়া আমার সেই প্রথম হলেও সেই শেষ নয়। তার পরেও, অনেকদিন পরে আরো ভেতর গিয়ে খাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল।

প্রায় দশক দুই আগে হবে মনে হয়, মল্লিক বাড়ির ছেলে বীরেন্দ্র মল্লিক গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর সহযোগিতায় 'সম্প্রতি' নামে একটি আধুনিক সাহিত্যপত্র বার করেছিল, আর সব লেখকের সাথে আমার লেখাও ছিল তাতে—তার কয়েক সংখ্যাতেই। সেই সূত্রে বীরেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। তার বাবার সঙ্গেও যোগাযোগ।

সন্ধ্যেবেলায় সম্পাদকের বৈঠক বসত—একতলার বাঁদিক-ঘেঁষা ঘরে বীরেনের নিজের-ড্রইংরুমে। ওদের কুলদেবতা জগন্নাথের সান্ধ্য পূজার শেষে মহাপ্রসাদ আসত, প্লেটে করে বড়ো বড়ো সাইজের লুচি আর তরকারি। ঘি দিয়ে রাঁধা তরকারি সব—তার স্বাদই আলাদা। আর সেই সঙ্গে তাদের নতুন বাজারের ইয়া ইয়া কড়াপাক সন্দেশ। তুলনা হয় না যার।

চমৎকার সেতার বাজাত বীরেন। আর খাসা আধুনিক কবিতা লিখত—একেবারে নতুন ধাঁচের। প্রেমেনকে তার কবিতার প্রশংসা করতে শুনেছিলাম।

সেই ছেলেটির লেখাটেখা আর দেখা যায় না। সে কি আর সেই ছেলেটি আছে এখনো? তারই হয়ত তার মতন একটি ছেলে হয়েছে এতদিনে, সে ছেলেও হয়ত এখন আর ছেলেমানুষটি নেই।

বীরেনের বাবা কুমার দীনেন্দ্র মল্লিকের ছবি আঁকার প্রতিভা ছিল। আশ্চর্য পোর্ট্রেট আঁকতেন। তাঁর কয়েকখানা ছবি 'সম্প্রতি'তে প্রকাশিতও হয়েছিল। অন্য পত্রপত্রিকাতেও সম্ভবত।

তিনি একদিন আমায় মার্বেল প্যালেসের ভেতরে বিভিন্ন ঘরে বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর আর শিল্পীদের বহুমূল্য ভাস্কর্য আর চিত্রকর্ম দেখিয়েছিলেন ঘুরিয়ে। সেগুলির শিল্পব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মল্লিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাগজ বিক্রির আমার প্রাপ্য কমিশনের লভ্যাংশ থেকে তিনটে সিনেমা দেখলাম সেদিন। তিনটেয়, ছটায়, নটায়। তারই ভেতরে এক ফাঁকে কাগজের আপিসে টাকা জমা দিয়ে এসেছি গিয়ে।

সাড়ে এগারোটায় শেষ শো খতম হবার পর ফিরে এলাম ঠনঠনেয়। সকালে একটা পাঞ্জাবী হোটেল দেখে গেছলাম সেখানে।

সেইখানেই রাত্রের খাবার খাব ঠিক করা ছিল।

পাঞ্জাবী রুটি আর গরম গরম মাংসের চপ খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করা গেল এতক্ষণে। সকালের সেই খিচুড়ির পর এখন এই খাওয়া।

অবশ্যি সারাদিন ধরেই টুকটাক চলেছিল আমার। ডালমুট চানাচুর চিনেবাদামের ব্যত্যয় হয়নি। সেই সঙ্গে ফাঁকে ফোকরে ঝুনো নারকেলের টুকরোটাকরাও।

খাবার পরে এবার শোবার ধান্দা।

শোবার আগে সব কাজকর্মের কাবারে সারাদিনের শেষে মায়ের চরণদর্শন করা যাক এবার।

কালীমন্দিরে গিয়ে দেখি, আরে, এখানেই তো সারি সারি শুয়ে আছে কতজনা। ভিখিরিই বোধ হয়। এদের মাঝখানেই তো আমি শুতে পারি। এরই এক কোণে গড়িয়ে পড়ি না কেন? তোফা শোবার জায়গা!

সকালে ভিখিরিদের সামিল হয়ে খেয়েছি, রাত্রে তাদের সঙ্গেই শোয়া গেল না হয়, ক্ষতি কি।

সত্যি বলতে আমি তো ওদেরই একজন।

ভেবে দেখলে এ সংসারে কে ভিখিরি নয়? সকলেই কখনো না কখনো কারো না কারো কাছে কিছু না কিছুর প্রত্যাশী। স্বয়ং পরম শিবের থেকে অধম এই শিবরাম পর্যন্ত ভিখারী সবাই—পার্থক্য যা কিছু তা কেবল আপেক্ষিক।

কেউ চায় অন্নসুধা, কারো শুধু অন্নক্ষুধা।

ঘুমোবার আগে আরেক দুর্ভাবনা হানা দিল মাথায়। শোবার ধান্দা তো চুকেছে, এখন ওঠার সমস্যা? আমাকে যে ভোর চারটেয় উঠে ছুটতে হবে, কাগজের লাইনে গিয়ে জুটতে হবে সবার গোড়ায়—সেই সমস্যা? সেটা কে মেটায়?

আমার যে অঘোর ঘুম, তার থেকে টেনে তোলে কে আমাকে?

মতি শীলের ইস্কুলে সেই ছেলেটির কাছে শুতে পেলে তার সহজ সমাধান ছিল। সে নিজের গরজেই উঠত ছুটত, আমাকেও সঙ্গী করে নিত যথাকালে।

কিন্তু এখানে এখন—এই অকালে ?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন।

গভীর রাত্রে আমার ঘনঘোর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ—কাঁসর ঘন্টার শোরগোলে। মা'র মঙ্গলারতি শুরু হয়েছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। হাতঘড়িতে দেখলাম, চারটে বাজেনি তখনো।

না, রাত গভীর নয়। মন্দিরের সামনেও বেশ ভিড়। ভক্তজনরা জড়ো হয়েছেন সেই অতি ভোরে মা'র আরতি দর্শনে।

একপলক দেখেই না প্রণাম ঠুকতে হয়েছে আমায়। গোলদীঘির শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে গিয়ে এখনি লাইন লাগাতে হবে সবার গোড়ায়। তারপর সেখানকার কাজ সেরে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে বৌবাজারের বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে। যাক, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের এমোড় থেকে ওমোড়ে—সকাল ও দুপুরে মল্লিকবাড়ি আর রাত দুপুরে কালীতলা এই দুই মেরুর মধ্যে আমার গতিবিধির ছকবাঁধা হয়ে গেল। ব্যস্!

খাওয়া শোয়া আর অতি প্রত্যুষে কাজে যাওয়া-এই তিন ধান্দাই মিটে গেল এক যাত্রায়। অবলীলাতেই।

এখন নিশ্চিন্তি।

॥ আটত্রিশ ॥

অনেকদিন পরে আবার এক সকালে জনাব সাহেবের স্লিপারের ধুলো পড়ল আমার দোরগোড়ায়।

আরেক খাঁটি স্লিপার তখন আমার ঘরেই—আমার বিছানায় বিলম্বিত। স্বয়ং আমিই।

পরিপাটি ঘুম দিচ্ছিলাম কিন্তু দ্বারদেশে তিনি এসে দাঁড়াতেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে আমার।

কোনো আবির্ভাব ঘটলে অবচেতনায় কেমন করে যেন টের পাওয়া যায়। চট্‌কা ভেঙ্গে যায় চট্ করে।

তাকিয়ে দেখি তিনি আমার দরজার কড়া দুটি নেড়েচেড়ে দেখছেন। নিঃশব্দে।

'কী দেখছেন ? জানান দেবার জন্য এখানে কড়া নাড়ার কোনো কড়ার নেই, কড়াকড়ি নাস্তি।' আমি জানালাম : 'অহোরাত্র আমার অবারিত দ্বার।'

'দরজা খুলেই ঘুমান ? কিছু চুরিটুরি যায় যদি ? তাছাড়া...তাছাড়া যেমন দিনকাল...কোন ভয় করে না আপনার ?'

'ভয় কিসের ? চোর ডাকাত ঘাতক কি পকেটমারের দুর্ভাবনা আমার নেই। প্রথমত, আমার প্রাণের কোনো দাম আছে আমি ভাবি না—কারই বা প্রাণের দাম রয়েছে একালে? তাছাড়া চোরের ভয় করতে যাব কোন্ দুঃখে ? আমার ঘরের এই পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ইনক্লুডিং নেংটি ইঁদুর আর কাঁকড়াবিছেদের নিতে আসবে কে ? এবং আমার পকেট ফুটো। এক পয়সাও নেই সেখানে। কখনো থাকে না। তাহলে ?'

'এত এত টাকা উপায় করেন যে...?'

'এত এত ?' আমার চোখ বুঝি টাকার মতই গোলাকার হয়।

'এত এত না হলেও কিছু কিছু তো বটে। সেসব যায় কোথায় ?'

'কে জানে ! দু পয়সা উপায় না হতেই কী করে যে তারা উপে যায় দেখতে না দেখতেই—সেইটেই একটা রহস্য আমার কাছে। কখনই আমি তা ভেদ করতে পারিনি মশাই! জলেরমত খরচ করলেও তা চোখে পড়ত, হয়ত তা হাওয়া হয়ে যায় বলেই দেখতে পাই না।...সে কথা থাক, আপনি আমার দরজার ওপর অমন নজর দিচ্ছিলেন কেন ?'

'কড়া দুটো দেখছিলাম। একটা লোহার , একটা পেতলের—দরজায় দুটো পাল্লার দুরকম কড়া—অদ্ভুত না ? এরকম তো দেখা যায় না কোথাও।...এমনটা কেন বলুন তো ?'

'কড়া পাল্লায় পড়েছিল বোধ হয় একবার। সেইজন্যই।' আমি কই।

'কী বললেন ? কার পাল্লায় ?'

'কোনো সোনালি হাতের ছোঁয়া লেগে একটা কড়া হয়ত স্বর্ণময় হয়ে গিয়েছে। এই ঘরের দ্বার ভেঙে নয়, ঐ কড়া ভেঙেই ঢুকেছিল একবার—একটি মেয়ে ! তার স্মৃতিটা অক্ষয় করে রাখতেই ভাঙা কড়াটার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে ঐ অন্য রকমের লাগিয়েছি। অন্য কড়াটা সাবেক, তাই কালো ভূত, আর নয়া আমদানি ঐ সোনা, সোনা ! কি রকম কৃষ্ণ-রাধিকার মিলন রহস্যের ইঙ্গিতবহ—তাই না ?'

'আপনার জীবনেও আদিরস এসেছিল তাহলে একদিন ?'

'কার না আসে ? অনাদি কাল থেকে আসছে সবার জীবনে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই—আমার বেলাও তার অন্যথা হতে পারে না। তবে আমার আদিম রস সেই আদ্যিকালেই

ফুরিয়ে গেছে—ছেলেখেলা যত সেই ছেলেবেলাতেই খতম। তারপরই সব বিলকুল তামাদি।'

'আপনার ঐ কড়া কথাটা শুনতে চাই মশাই!'

'কথাটা কী আর! চাবি হারিয়ে গেছল, ঘরে ঢুকতে পারছিলাম না। রাত বারোটা বাজিয়ে বাসায় ফিরেছি, সব নিশুতি। এদিকে আমার ফুরফুরে পাতলা সিল্কের জামা ফুটো হয়ে ঘরের চাবি গলে রাস্তায় পড়ে গেছে কোথায়। এই রাত দুপুরে কি করি, কোথায় যাই, চাবিওয়ালা কোথায় পাই, এমন সময় মেয়েটা এসে হাজির! দু'পাক মুচড়েই ভেঙে ফেলল কড়াটাকে, কব্জির জোর ছিল তার। বস্তির মেয়ে তো।'

'বস্তির মেয়ে!'

'শ্রাবস্তীর মেয়ে কোথায় পাব! আমি যখন এ পাড়ায় প্রথম আসি তখন এর চারধারেই বস্তি ছিল। কোকেনের কারবার ছিল গলির ঐ কোণটায়...চোর ছ্যাঁচোর গুন্ডা বদমায়েস কিলবিল করত চারধারে।'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনার কোনো বোনটোন হবে বুঝি! বিনি-টিনি! ইতু-টিতু! তা নয়, বস্তির মেয়ে!' হতাশার সুর ধ্বনিত হয় তাঁর গলায়।

'ইতুটিতুর দেখা পাইনি তখনো...তখনো তারা জন্মায়নি। না, বিনিও না। আকৃতিতে হলেও আমার বোনেদের মত প্রকৃতিই ছিল না মেয়েটার। অন্য প্রকৃতির—একটু বন্য প্রকৃতির। তা ঈষৎ বন্যরূপ হলেও, আমার বোনেদের সঙ্গে এক জায়গায় ভারী মিল ছিল তার। শুধু তার কেন, তার মতই প্রায় আমার সব বন্ধুরই—কী ছেলে কী মেয়ে! সেটা তাদের ঐ লাবণ্যরূপ।'

'তার কথা বলুন।' কথাটায় আমায় পাড়বার জন্য তিনি উন্মুখ।

'তার কথা কী শুনবেন। সে কি একটা কথা হলো!' সেটা কোনো কথাই নয়। শোনবার মত কোনো কথা না—শোনাবার মতও নয়।' এক কথায় উড়িয়ে দিই কথাটা।

ততক্ষণে তিনি আমার দেয়াল-লিখন দেখতে লেগেছেন।

'দেয়াল জুড়ে এসব কী লিখে রেখেছেন মশাই? হিসাবপত্তর নাকি?'

'বেহিসেবী লোকের আবার কিসের হিসেব? নাম-ঠিকানা যত।'

'কাদের নাম-ঠিকানা?'

'বোনদের—বন্ধুদের। বোনদের বন্ধু—বন্ধুদের বোন—এইসব। আবার কার?'

'দেয়ালে লেখা কেন? খাতায় লিখে রাখলেই হয় তো।'

'খাতা যে হারিয়ে যায়। খাতায় যেমন আমার হিসেব থাকে না, তেমনি খাতারও কোনো হিসেব থাকে না যে! —কোনটা যে কোথায় যায় টেরই পাই না। দরকারের সময় পাওয়া যায় না। আবার কখন হয়ত বিনা প্রয়োজনে আপনার থেকেই আত্মপ্রকাশ করে বসেছে।'

'তাই দেয়ালে লিখে রেখেছেন?'

'ঠিক তাই। দেয়াল কখনো হারায় না—নেহাত যদি ভূমিকম্প না হয়। অশোকের শিলালিপির রহস্য এইখানেই। ভূর্জপত্রে না লিখে রেখে প্রস্তরগাত্রে খোদাই। খোদার বানানো পাহাড় ভূমিকম্পেও যাবার নয়, তার ওপর খোদকারি চিরদিনের জন্যই অটুট।'

'তাই দেখছি। আপনার এগুলোও হুবহু প্রায় তাই—অশোকের শিলালিপির মতই...কিছুতেই কোনো পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে না। কিন্তু আশ্চর্য, বোনদের নাম ঠিকানাও আপনার মনে থাকে না—লিখে রাখতে হয়, এই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি আরো।'

'বোনদের মনে থাকে ঠিকই, কিন্তু তাদের ঠিক-ঠিকানা থাকে কি ?' আমি কই। তাঁর কথাটায় আমিও কিছু কম অবাক হই না—'বিয়ের পর পদবীর সঙ্গে তাদের ঠিকানাও কি পালটে যায় না ? বিয়ের পর সব মেয়েই তো পর হয়ে যায়—তা বোনই কি আর বন্ধুই কি।'

'তারপরেই আমার পুনশ্চ অনুযোগ : 'বিয়ের আগে পরী, বিয়ে হলেই পর।'

'তাহলেও, যত পরই হয়ে থাক, চিঠি লেখালেখির সম্পর্কটা রাখেই। আর তাদের চিঠিতেই তো ঠিকানা থাকে।'

'থাকে নাকি! সেই প্রথম চিঠিতেই থাকে যা, তারপর আর না। তারা ভাবে, তাদের মতন তাদের ঠিকানাটাও আমি স্মৃতিপটে চিরদিনের মত অঙ্কিত করে রেখেছি! কিন্তু স্মৃতিশক্তিতে আমি একেবারেই পটীয়ান্ নই, আমার স্মৃতিপট হচ্ছে আসলে সেই যবনিকাই। যে-পটক্ষেপের পরে আর উত্তোলন করা যায় না।'

'তাহলেও ভায়ের বাড়ি বোনের যাতায়াত থাকেই।'...

'কই আর থাকে। দু-একজন বাদে সব বোনই তো প্রায় হারিয়ে যায়—চিরকালের মতই। সহোদরা হলে তেমনটা হয় না অবশ্যি। তারাই যাতায়াতটা বজায় রাখে। কিন্তু তা না হয়ে শুধু সহৃদয়া কাজিন মাত্র হয় যদি ? তাহলে ? হৃদয় একবার হারালে যেমন আর ফিরে পাওয়া যায় না, সহৃদয়াদের বেলাতেও তাই। সে সব বোন তখন অরণ্য হয়ে যায়। তাদের সংসার অরণ্যে হারিয়ে আরো গভীর হয়ে রীতিমতই শ্বাপদসঙ্কুল তখন। সেই অরণ্যে রোদন করতে কে যাবে ?'

'বোনদের ব্যাপার থাক, তাদের তো সব ওপর ওপর, গভীর কিছু নয়। আপনি এই বস্তির মেয়েটির কথা বলুন...তার সঙ্গে কতদূর গড়িয়েছিল শুনি...অবশ্যি যদি আপনার তেমন আপত্তি না থাকে।'

'না, আপত্তি কী, তবে কথাটা এই,' আমি তাঁর গভীর কথায় কান দিতে যাই না, নিজের কথার ভিড়েই থাকতে চাই—'জীবনের সবরকম সম্পর্কই তো মৌলিকতা : যৌনিক। সব সঙ্গই তো সঙ্গম—কার্যত তেমন গভীরতার গর্ভে না গেলেও আসলে ঠিক তাই নয় কি ? এমন কি, নিছক আদর করার মধ্যেও সেই আসঙ্গলিপ্সাই।'

'ঠিক তাই কি? অবশ্যি ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতরা সেই রকমটাই বলেছেন বটে!' তবুও যেন তাঁর দ্বিধা থেকে যায়।

'জীবনের মূলরস তাই হলেও, আর ওপরেও আরো সাফল্য আরো প্রফুল্লতা থাকে—থাকে না ? মূলের গর্ভ থেকেই তো ফুল ফোটে—ফল ধরে—জীবনের ডালপালায় সৌরভাহৃত পাখি আর মৌমাছিরা এসে জোটে, কিন্তু তাহলেও, মূলতঃ সেক্সই অস্তিত্বের আদি রস হলেও এবং দুনিয়ার সবাই সেই রসে বশে থাকলেও—এমনকি তিনিও নাকি ওই রসের ওপর বৈসে রইলেও—উপনিষদে তাঁকে রসো বৈ সঃ বলেছে না ? —সেই আদি রস অনাদি অনন্ত অফুরন্ত ইত্যাদি হয়েও তাই কিছু জীবনের আদ্যন্ত নয়। বৃন্দাবনের পরও কুরুক্ষেত্র থেকে যায়। এমন কি থোড়া বহুত ঐ মথুরাও থাকে। শিবের লিঙ্গপ্রত্যয় আর কৃষ্ণের রাস পঞ্চাধ্যায় বাদেও জীবনের অনেক প্রত্যয়, অনেক প্রকাশ থেকে যায়। আদিম রস ছাড়াও আরও নানা রস রয়েছে। এই জীবনে, যা নাকি অকৃত্রিম। এমন কি ওই কসের মধ্যেও রস রয়ে গেছে—কটু তিক্ত কষায়ের মধ্যেও রসায়ন। কদর্যের ভেতরেও সৌন্দর্য। আদি রসকে ছাপিয়ে উঠে ছাড়িয়ে গিয়েই যত রূপারূপ আর শিল্পরূপ—রসোত্তীর্ণ হয়েই না। আদ্যিকালের

থেকে জীবনও, মহাশূন্যের মতই, ক্রমেই আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে না কি ? সব হবার পরেও আরও কিছু বাকী থাকে। জীবনের সবখানে সেক্স থাকলেও সেক্সই কিছু জীবনের সবখানি নয়।'

আমি হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই তাঁর আরেক লাফ।

'যথা ?' তিনি আরো বিশদের পক্ষপাতী : 'দৃষ্টান্ত স্বরূপ ?'

'জীবনটা যেন সাতমহলা বাড়ি—তার সবটাই কিছু বাথরুম হয় না। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বিরাট প্রাসাদের মধ্যে তার জন্যেও একটুখানি আলাদা করা থাকে বটে। কিন্তু সেইটাই তার সর্বস্ব নয়। বিধাতার প্রসাদে কারো যদি এই প্রাসাদে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়, সে কি শুধু সেই বাথরুমেই বসে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেবে তার? সে কি তার ঘরে ঘরে ঘুরে—ঘুরেফিরে সবকিছু দেখবে না ? তার রঙমহল, রূপমহল, শীষমহল, নাটমহল... মহলে মহলে টহল দিয়ে নিজের কৌতূহল মেটাবে না ? এমনকি যেখানে গেলে সে রাজতুল্যই, তার সেই রাজমহলে গিয়েও নিজের সিংহাসন দখল করবে না সে ?... তা না হলে তার জীবনজোড়া অভিজ্ঞতার মালাই বা গাঁথা হবে কি করে ? হাটের সব সওদা না সংগ্রহ করলে তার এই ভবযাত্রার পালাই যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমার আবোলতাবোলের থেকে কী বোঝেন তিনিই জানেন। জনাব সাহেব আপন মনে ঘাড় নাড়েন তাঁর—কোনো উচ্চবাচ্য করেন না আর। আমার বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমি যেন কিছু হালকা হতে পারি।

'মহৎ উপন্যাস যেমনধারা, আমাদের জীবন বিন্যাসেও প্রায় তেমনটাই দেখা যায় না কি ? মহৎস্রষ্টা তাঁর উপন্যাসের পাঠককে সামনের সিংহদ্বার দিয়ে না নিয়ে হয়ত বা পিছনের, মেথরদের যাতায়াতের খিড়কিদোর দিয়ে ঢোকাতে পারেন, কিন্তু নিশ্চয় তাকে সেইখানেই বসিয়ে রাখেন না সব সময় ? জগৎস্রষ্টা কোনো মহান্ লেখকের চেয়ে কম যান না—একথাটা মানবেন অবশ্যি ?

...জগন্মাতাও তাঁর ছেলেমেয়েদের নিজের সব কক্ষেই নিয়ে যান, ভালো মন্দ সবরকমই দেখান, চাখান—সবার প্রতি তাঁর সমান টান। সম পক্ষপাত। আমার বেলাও তার কোনো অন্যথা হয়নি। লক্ষ্যপথ কী জানিনে, কিন্তু সব কক্ষপথেই ঘুরতে হয়েছে আমাকেও। তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বেড়িয়েছি, বাস করেছি, কিন্তু আটকে রাখেননি তিনি কোনোখানেও। আর, আমাকেও এমন কিছু কোষ্ঠবদ্ধতায় পায়নি যে, তাঁর একটিমাত্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে সেই বাথরুমেই গিয়ে বসে থাকব সারাটা দিন। আমার প্রাতঃকৃত্য যা কিছু জীবনের সেই প্রাতঃকালেই সারা হয়ে গেছে। সব।

...সেই বস্তি-নন্দিনীর কথা জানতে চাইছিলেন না ? হ্যাঁ, তার সঙ্গসুখেও নন্দিত হয়েছি বই কি কিছুকাল, কিন্তু সেটা তেমন কালান্তক হয়নি—সঙ্গীদের মতন সঙ্গিনীরাও এক সময় ছেড়ে যায়—ছাড়িয়ে যায়। এগিয়ে যায় কি পিছিয়ে পড়ে। আর আমার দৌড়ও তো বেশিদূর নয়। আমি ভালোই জানি যে নন্দনকানন আমার জন্য হয়নি।'

॥ উনচল্লিশ ॥

জনাব সাহেব তারপর পড়াশোনার কথায় এনে পাড়ার চেষ্টা করেন আমাকে—'না, ওকথা শুনচি না। বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ-র কথায় ভুলচিনে আমি। লেখাটেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আপনার বেশ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।'

'একদম কিছু না জানার ঐ তো মজা মশাই! কিছুই না জেনেও স্বচ্ছন্দে সবজান্তা হওয়া যায়।'

'তা কি হয় নাকি কখনো? লেখক হতে হলে অনেক পড়াশোনা করতে হয়। কল্লোল যুগের আপনার বন্ধুরা প্রায় সবাই দারুণ পণ্ডিত। তাঁদের বাড়ি গেলে ঘরবোঝাই আলমারি-ঠাসা বই দেখতে পাই, একালের সেকালের নামকরা দেশি বিদেশি নানারকম বই।'

'আমার এখানে দেখছেন কি? আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেও আমার নিজের লেখাও একখানা পাবেন না।'

'তার মানে?' তিনি মানতেই চান না—'এখানে বই না থাক, লাইব্রেরিতে গিয়ে আপনি পড়াশোনা করে থাকেন নিশ্চয়। অনেক লেখক যেমন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যান পড়তে, আবার সেখানে বসে লিখতেও।'

'রিসার্চ স্কলাররা। কিন্তু ট্রামবাসের ধকল ঠেলে সাত মাইল ঠেঙিয়ে ওখানে যাবার আমার উৎসাহ হয় না। কানেই শোনা, কোনোদিন চোখেও দেখিনি, কেমন দেখতে লাইব্রেরিটা। তাছাড়া, আমার রিসার্চ করার কিছু নেই। আমার যা-কিছু রিসার্চ তা শুধু আমাকে নিয়েই।'

'কিন্তু না পড়লে কি মশাই লেখক হওয়া যায়?'

'যায় না বোধহয়। গোড়ায় কিছু কিছু পড়তেই হয় বইকি—ঐ লেখার অক্ষরপরিচয়ের জন্যই। কী লিখব, কেমন করে লিখব—সেইটে জানতেই। কথাটা আপনার মিথ্যে নয়, রবীন্দ্রনাথও একদা ঐ কথাই বলেছিলেন আমার বন্ধু শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়কে।'

'কিরকম?'

'সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের শৈশব থেকেই লেখক হবার শখ। কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সেইকালেই। তিনি তাঁকে স্নেহ করতেন খুব। কী করে লেখক হওয়া যায় এই কথা শুধোতে তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, লেখক হতে হলে তার আগে পাঠক হতে হয়। বড় বড় লিখিয়েরা সব বড় বড় পড়ুয়া। বিস্তর পড়াশুনা না করলে লেখক হওয়া যায় না। লেখাপড়া শেখার কালে যেমন আগে লেখা, তার পরে পড়া। প্রথমে হাতে খড়ি হোলো, তারপরই তুমি প্রথম ভাগ ধরলে—লেখক হবার বেলায় ঠিক তার উল্টোটাই। আগে অনেক কিছু পড়া, তার পরেই লেখাটেখা। আগে তোমায় পড়তে হবে বিস্তর, তবেই তো তুমি লেখক হবে। গোড়ায় পড়ো, পরে পাড়ো।'

'ভারী চমৎকার কথাটা বলেছেন তো গুরুদেব।'

'কী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন জানিনে, তবে কথাটা এইরকমই। আমার ব্যক্তিগত ভাষণে বিবৃত করলাম। তবে এই ধরনের একটা কথা বিশুবাবুর মুখেই আমি শুনেছিলাম অনেক দিন আগে।'

'তা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না যান কলকাতায় আরো তো ঢের পাঠাগার আছে, তার থেকেও কি বইটই এনে পড়া যায় না?'

'পড়েছিলাম!' আমার মনে পড়ে—'যখন কলকাতার রাস্তায় খবর কাগজ ফেরি করতাম

না ? সেও আমার সেই কৈশোর কালেই, আমারই সগোত্র একটি ছেলে একটা লাইব্রেরির খবর আমায় দিয়েছিল, হিরণ লাইব্রেরি। বিডন স্ট্রীট দিয়ে বাঁ ফুট ঘেঁষে গেলে মিনার্ভা থিয়েটারের ঢের আগেই পড়ে সেই লাইব্রেরিটা, বাতলেছিল সে। সেখানে টাকা জমা দিয়ে মেম্বার হলে চাঁদার বদলে বই নিয়ে পড়তে দেয়, সে বলেছিল। সেখান থেকে বিস্তর বই নিয়ে পড়েছি একসময়। মানে, সেই সময়েই।'

আমার মনে পড়ে যায়—'কাগজের পাঁজা বগলে নিয়ে সাত-সকালে গিয়ে দাঁড়াতাম তো হেদোর ধারে। আমার আনন্দবাজার, বসুমতীর খদ্দের তো যতো দিদিভাইরা। তখনো ঢের দেরি তাদের আসবার। দশটার আগে তো কোনো দিদিভাই-ই আসছেন না আর!'

'দিদিভাই ? দিদিভাইরাই আপনার কাগজ কিনতেন নাকি ? অপত্যস্নেহ বলে একটা কথা আছে জানি, কিন্তু নাতিবৃহৎ বাৎসল্যের ব্যাপার বলে তো শুনিনি কখনো ?'

'আহা, সেই দিদিভাই নাকি মশাই ?' বাতলাতে হয় আমায়—'বেথুন স্কুল আর কলেজের মেয়েরাই তো খদ্দের ছিল আমার না ? দিদি আর ভাই পাতিয়ে পটিয়ে ফেলেছিলাম তাদের। মেয়েদের সঙ্গে, চেনাই কি আর অচেনাই কি, ভাব জমাতে আমি ভারী পটু, সেই ছেলেবেলার থেকেই—জানেন তো ?'

'জানলাম। তা কী রকমটা, শুনি একবার ?'

'আমার চেয়ে বড়ো মেয়েদের, কলেজের মেয়ে তারা, তাদের কাছে গিয়ে বলতাম, কাগজ নেবেন দিদি ? আর যারা বয়সে ছোট তাদের সাধতাম—কাগজ নেবে ভাই ? মহাত্মা গান্ধী আজ কী বলিয়াছেন শুনবে ? নাও না একখানা। পড়ে দ্যাখো।'

'নিত তারা ?'

'না বলত না কেউ। প্রায় সবাই-ই নিত। যত কাগজ আনতাম, যা পেতাম আর কি আপিস থেকে—হু হু করে কেটে যেত সব। তা শুনুন....সেদিন সকালে হেদোর মোড়ে দাঁড়াতেই ছেলেটার কথাটা খট করে আমার মনে পড়ল। সামনেই তো বিডন স্ট্রীট ? খটকাটা আজই মিটিয়ে ফেলা যাক না! আমার দিদিভাইরা আসবার আগে হিরণ লাইব্রেরির খোঁজ নিই না গিয়ে।'

কাগজের পাঁজা বগলে বিডন স্ট্রীট-এর পথ ধরলাম। মাঝে মাঝে এক-আধখানা কাগজও ঐ ফাঁকে বিক্রি হচ্ছিল না তা নয়—এমনি যেতে যেতে মিনার্ভা থিয়েটার পেরিয়ে গেছি—তখন আমার চৈতন্যোদয় হোলো। সামনে চৈতন্যোদয় দেখলাম।'

'সামনে চৈতন্যোদয় ? সে আবার কী ব্যাপার ?' তাঁর বোধগম্য হয় না।

'চৈতন্য লাইব্রেরির আবির্ভাব দেখলাম', আমি কই—'চৈতন্য লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রী রিডিং রুম। আরে, আরেকটা লাইব্রেরি যে রয়েছে এখানেই। বেশ বড় লাইব্রেরিই বোধ হচ্ছে। এর কথা তো কই বলেনি সেই ছেলেটা। ঢুকলাম ভেতরে। বড় হল-এ বৃহৎ টেবিলে নানান পত্র-পত্রিকা বিস্তারিত—বসে বসে পড়ছিল বহুৎ লোক। আমি ভেতরে যেতেই একজন, হয়ত ঐ পাঠাগারের কর্মকর্তাই হবেন কেউ, বললেন আমাকে—তোমার কোনো কাগজ আমাদের চাই না। খবর কাগজ কি পীরিওডিক্যাল আমাদের কিনতে হয় না, অমনি আমরা ওসব কমপ্লিমেন্টারি পাই। অনেক দিনের বিখ্যাত লাইব্রেরি আমাদের....অমনি মেলে তাই। যাও, এখান থেকে কেটে পড়ো ভাই।'

'কেটে পড়লেন ?'

'কী করবো ? এমন অকাট্য কথার পর আর কি এক মুহূর্ত সেখানে কাটানো যায় ? তবু তার মধ্যেই আমার কার্যোদ্ধার করেছি, জেনে নিয়েছি তাঁর কাছ থেকেই হিরণ লাইব্রেরির

ঠিকানাটা। এই রাস্তারই কোথায় যেন হিরণ লাইব্রেরি বলে আরেকটা লাইব্রেরি আছে না ? সেখানেই আমি যেতে চাইছিলাম মশাই। আরে, সে তো তুমি ছাড়িয়ে এসেছো অনেক আগে, জানালেন তিনি, এই ডান দিকের ফুট ধরে চলে যাও বরাবর, মিনার্ভা থিয়েটার পেরিয়ে খানিক এগিয়ে গেলেই নজরে পড়বে তোমার। সাইনবোর্ড আছে রাস্তার ওপর। কিন্তু, লাইব্রেরি তো সন্ধ্যের আগে খোলে না বাপু, তাও আবার ঘন্টা দুয়েকের জন্যেই। ছোট্ট লাইব্রেরি। আমাদের মতন এত বড় ফ্রী রিডিং রুম নেইকো তার।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী ? সেদিন ছ'টার শো-র সিনেমা না দেখে যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলাম যথাস্থানে। তারপর অনেক দিন সেই লাইব্রেরির সদস্য ছিলাম, প্রায় সব বই-ই পড়ে ফাঁক করেছি তার। লোকগুলো ভারী ভদ্র সেই লাইব্রেরির। যে বই-ই চাইতাম, দিয়ে দিত চটপট। চার আনা কি আট আনা দামের তাদের লাইব্রেরির একটা ক্যাটালগও দিয়েছিল আমাকে—দেখে দেখে বাছাই করে বই নিতাম। যেমন চমৎকার সেই লাইব্রেরিটা—তেমনি তার লোকগুলোও।'

'তারপর ?'

'তারপর সেই হিরণ লাইব্রেরি ফাঁক করার পর আর কোথাও তাক করার সুবিধে হয়নি। তাকাব কি, কলকাতার কোথায় কোন্ পাবলিক লাইব্রেরি আছে তার খবরই রাখতাম না। অনেকদিন বাদে একটা সুযোগ এল আবার। তখন আমি চোরবাগানের বাসায় থাকি, চোরবাগান আর কলাবাগান যেখানে এসে গলাগলি করেছে সেই চোরা গলির মোড়ে কি করে সেই গোপালবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল হঠাৎ। পুরো নামটা তাঁর মনে পড়ে না—গোপাললাল শীলই হবেন বোধ হয়। তিনি কী একটা লাইব্রেরির কর্মকর্তাদের একজন, জানলাম। সুহৃদ লাইব্রেরি, মহম্মদ আলি পার্কের কাছাকাছি কোথায় যেন সেই পাঠাগারটা। আলাপের পর তিনি আমায় তাঁর বাড়িতেও নিয়ে গেছলেন একবার। খাইয়েছিলেনও খুব মনে আছে।

'সেই জন্যেই তাঁকে আপনার মনে আছে বোধ হয়।'

'তা ঠিক। জনমভোর তো পরের খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছি আর ওই খাবার ঠেলায় আমার হৃদয়দেশ ডায়ালেটেড হয়ে উদরের কাছেই এসে ঠাঁই নিয়েছে প্রায়। আমার অন্তরে স্থান পেতে হলে যুগপৎ আমার উদর আর হৃদয় আক্রমণ করতে হয়। শুধু আমার বেলায় নয়, সবার বেলাতেই বুঝি তাই করতে হয়। যাক্ গে—গেলাম তো তাঁদের বাড়ি। বাড়ি দেখে মনে হলো তাঁরা অনেককালের বনেদী। পুণ্যশ্লোক মতিলাল শীলেরই কেউ হবেন কি না জানি না।'

'কি রকম বাড়িটা ? খুব জমকালো ? মার্বেল প্যালেসের মতন ?'

'তার ধারেকাছে না। বাড়িটার বৈশিষ্ট্য উচ্চতায় ততটা নয় যতটা গভীরতায়। কারো বাড়ি গেলে সদর দরজা পেরিয়ে উপরেই উঠতে হয় তো ? তাঁর বাড়িতে ঢুকতে হলে সদরের চৌকাঠ পেরিয়ে তিন ধাপ নামতে হয়। রাস্তার সমতল থেকে তাঁর গ্রাউন্ডফ্লোরের তলদেশ আরো তলায়। জব চার্ণকের আমলের বাড়িই হবে বোধ হয়। তার পরে কলকাতার পথঘাটের উন্নতি হয়েছে কিন্তু তাঁর বাড়িটা আর উন্নীত হতে পারেনি।'

'তারপর আর যাননি তাঁর বাড়িতে কখনো ?'

'বর্ষাকালে গিয়ে দেখবার কৌতূহল হয়েছিল একবার—সেই সময় তাঁর বাড়ির তলদেশের

কী দশা দাঁড়ায় দেখতেই—কিন্তু তার সুযোগ ঘটেনি। তাছাড়া, সাঁতার জানিনে, সেদিক দিয়েও বাধা ছিল আমার।...সে কথা যাক্, তাঁর সুহৃদ লাইব্রেরিতে বিদেশী বইয়ের বেশ ভালো সংগ্রহ ছিল। মোঁপাসা, হার্ডি, হামসুন, গোর্কি, ইবসেন, শ', পীরান্দেলো, মেটারলিঙ্ক, বেনাভেনতে, যোহান, বোয়েরপ্রভৃতি কতজনের বইয়ের সঙ্গেই সাক্ষাৎ পরিচয় সেখানেই আমার। সেই শীল মশায়ের সৌজন্যেই যা আমার বিদেশী সাহিত্যের অনুশীলন। আজও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা স্মরণ করি, চাঁদা না নিয়ে অমন জোর করে আমায় গিলিয়ে না দিলে যথার্থ সাহিত্যের আস্বাদই আমি পেতাম না কোনোদিন। সুহৃদ পাঠাগারেই বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় হল।'

'হয়ে আপনি লাভবান হয়েছেন, একথা আপনি মানবেন নিশ্চয় ?'

'আমার লাভ ? না, আমার কী হবে—তবে বাংলা সাহিত্যের যে লাভ হয়েছে তা আমি বলব। লিখতে হলে কী লিখতে হয়, আর কী করে লিখতে হয় টের পেয়ে গেলাম আমি। সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে অমনধারাই করতে হয়—অমনটাই হওয়া চাই। আর বুঝলাম যে তা আমার দ্বারা হবার নয়। ওদিকেই তাই গেলাম না আর—বেঁচে গেল বাংলা সাহিত্য—আর বাঙালী পাঠক—একটা উপকার হলো না ? সাহিত্যও বাঁচল, আমিও বেঁচে গেলাম। সাহিত্যের পাশ কাটিয়ে চলে এলাম এই সাংবাদিকতায়—যে বিষয়ে রপ্ত হচ্ছি এখনো- যেদিক দিয়ে আমার আমদানি রপ্তানি।'

'না না, আপনি গল্পটল্পও তো লিখেছেন কিছু কিছু—ছোটদের বড়দের। সাতসতের অনেক কিছুই লিখেছেন আপনি। সাহিত্যিকও বলা যায় বইকি আপনাকে।'

ভদ্রলোক তাঁর স্তোকবাক্য শোনান।

'ঐ টেনে-বুনে। সাত-সতের অনেক কিছুই লিখেছি বটে, সব মিলিয়ে সংখ্যায় সাত শো তেরই হবে হয়তো বা—লেখার ঐ মোট নামিয়ে মজুরি কুড়িয়েই তো মোটামুটি বেঁচে থাকতে হয়েছে এতকাল—কিন্তু সত্যি বলতে কিছুই কিছু হয়নি। শিশুসাহিত্য শিশুদের হয়নি, বড়দের লেখা বড়দের পড়ার মত নয়।'

'তবে কাদের জন্য ? কী লিখেছেন এতদিন ধরে তাহলে ?'

'আমিও তাই ভাবি। কী লিখলাম তবে ? আমার লেখা কী ধরনের ছোট-বড়রা পড়ে বলব ? যারা সত্যিকারের ছোট নয়, আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে বড়, বয়সে বারো কিন্তু মনের বাড় তার ঢের বেশি—আসলে ভেতরে ভেতরে তারা যুবকই বলতে গেলে। প্রায় যুবক, কিংবা যুবকপ্রায়—যাই বলুন। তারাই আমার লেখায় রস পায়। আর বড়দের কথা শুধোচ্ছেন ? যারা বয়সে অনেক বেড়ে গেলেও অন্তরে সেই শিশুটি কি কিশোরই রয়ে গেছে—মনের দিকে বদলায়নি বিশেষ—আমার বড়দের লেখা কেবল তাঁরাই পড়ে থাকেন। এককথায়, আমার লেখা—ফর অ্যাডালটস্ ওনলি। আর ঐ মার্কার যা কিছু, ছোটরাই তার গ্রাহক তা জানেন তো ? আর, ছোটদের বড়ো হবার শখ—বড়ত্বে ঝোঁক, কে না জানে ? এবং বিস্ময়কর শোনালেও বড়রা সব ছোট হতে চায়। তাই যারা ফের মনের কৈশোরে ফিরে যেতে চান—সেই বড়রাই আমার অনুগ্রাহক। এককথায় আমার লেখা আসলে অ্যাডালটারেটেড।'

'অ্যাডালটারেটেড ? মানে, ভেজাল বলতে চাচ্ছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ, ভেজাল বইকি ? আর এই কারণেই আমি সাহিত্যে না গিয়ে সাংবাদিকতায় এলাম।

অবশ্যি, বলতে পারেন, সাহিত্য আর সাংবাদিকতা একাকার হয়ে গেছে একালে। এও এক রকমের ভেজাল। কিন্তু ভেজাল হলেও বেশ মুখরোচক এবং পুষ্টিকারক, নয় কি ? তবে, আমার দিক থেকে সেটা বোধ হয় আরো। যথার্থ সাহিত্যিক যেমন হতে পারিনি, তেমনি যথোচিত সাংবাদিকও আমি হইনি সঠিক। গোঁজামিল রয়ে গেছে সেখানেও। হয়ত সেটা গাঁজার মিল। সেই কারণেই হয়ত একটু মৌজ লাগে, একদল অ্যাডিক্‌টেড পাঠক চিরকালই পাওয়া যায়—যারা কিনা ওই গাঁজাদারের মজাদারির লোভে তার রুজি-রোজগার বজায় রাখে। কিন্তু এটাকে তো নির্ভেজাল বলা যায় না কিছুতেই।'

'ওকথা থাক।' প্রসঙ্গটা তিনি চাপা দিতে চান—'কথা হচ্ছিল আপনার বই পড়ার বিষয়ে। সুহৃদ লাইব্রেরি না হয় গেল কিন্তু ও ছাড়া কি আর সুহৃদ ছিল না আপনার? ঐ কল্লোল গোষ্ঠীর? আপনার প্রায় সব বন্ধুরই তো চমৎকার ঘরোয়া পাঠাগার রয়েছে। আমি দেখেছি। আপনিই খালি ব্যতিক্রম। আপনার ঘরেই বইয়ের কোনো পাত্তা নেই।...তাহলেও আপনি বন্ধুদের বাড়ি কি পা বাড়ান না নাকি ? তাঁদের কাছ থেকে বই এনেও তো পড়া যায়।'

'তা যায়। পা-ও বাড়াই না যে তা নয়। মাঝেসাঝে বন্ধুদের সাক্ষাতে যাই বইকি। অন্তত প্রেমেনের বাড়ি তো গিয়েই থাকি। লেটেস্ট আমদানি আনকোরা বই সব দেখেছি তার বুক্‌শেলফে। কিন্তু সেলফ্-হেলফ্ করব যে তার সুযোগ কই ? হাত বাড়াবো কি, সেদিকে ঘেঁষতেই দেয় না। বইকে সে প্রায় বউয়ের মতই আগলে রাখে। ঐ বই আর বউ পরের হাতে গেলে পরীর মত হয়ে যায়, জানেন ? পাখা মেলে কোথায় যে উড়ে যায় তার পাত্তাই মেলে না আর। কিংবা...কিংবা...।'

'কিংবা ?'

'কিংবা বোধ হয় মার্ক টোয়েনের সেই বিখ্যাত বয়েতটা তাদের মনে রয়ে গেছে এখনো—ভুলতে পারেনি। তাঁর ঘরময় বইয়ের ছড়াছড়ি দেখে কে একজন শুধিয়েছিল—বই তো পড়বার জন্যে পরের কাছ থেকে নিয়ে আসি, কিন্তু ওই আলমারি আমায় কে দিচ্ছে! বই ধারে পাওয়া যায়, কিন্তু আলমারি তো কেউ ধারে দেয় না! দুঃখ করেছিলেন মার্ক টোয়েন।' ...তবে প্রেমেনের কাছ থেকে একেবারেই যে কোনো বই আনিনি তাও নয় ! আমার দেওয়া সব বইগুলিই নিয়ে এসেছি এক সময় না একসময়।'

'নিজের বই বন্ধুকে উপহার দিয়ে কেউ ফেরত নেয় নাকি আবার ?'

'বললাম না, আমি ব্যতিক্রম ? আমার কোনো বই-ই তো আমার কাছে কখনো থাকে না। হঠাৎ কোনো পাবলিশার এলে, এসে গেলে, তখন আমার বই মেলে কোথায় ? প্রেমেনের কাছেই পাওয়া যায়। সে তো কোনো বই সহজে হাতছাড়া করে না, এমন কি, আমার বইও নয়। ওখানে গেলেই মিলে যায়। এই করে আমার সব বই-ই তার কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছি পরম্পরায়।'

'পাবলিক লাইব্রেরিগুলোয় খোঁজ করলেও পেতে পারতেন আপনার বই।'

'তাও কি করিনি আর ? নিজে না যাই, ভাগনে-ভাগনীদের পাঠিয়েছি। তারা এসে খবর দিয়েছে যে লাইব্রেরির বইয়ের তালিকায় তোমার বইগুলোর নাম আছে—কিন্তু আসল জায়গায় নেই, লাইব্রেরিতে নেই একদম।'

'তার কারণ ?' তিনি বিস্মিত হন।

'ছেলেদের বই তো যতো আমার। ছেলেরা নিয়ে গেছে। হাতে হাতে ঘুরছে সে-সব বই। তারপর হাতাহাতি হতে হতে তার সামনের পাতাগুলো উড়ে গেছে, শেষের পাতাগুলো খসে

গেছে—তখন সেই ছেঁড়াখোঁড়া বই ফেরত দেওয়া তারা বাহুল্যই বোধ করেছে। লোকপ্রিয় লেখক না হয়েও, নেহাত বালকপ্রিয়তার হেতুই আমার বইয়ের এই বিরলদশা। এই আমার ধারণা। তবে এটা একরকমের আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। এই ভাবেই বোধহয় আমার বইয়ের কাটতি বেড়েছে। লাইব্রেরিতে পায় না বলে কিনে পড়তে হয়েছে তাদের। কিন্তু আমার বই না পড়লেই বা তাদের কী আসে যায়? খেলাধূলায়, সিনেমা-দেখায় সময় কেটে যায় তাদের।'

'তাদের না হয় কাটলো, কিন্তু আপনার কাটে কী করে? একদম কোনো বইটই না ছুঁয়ে, কিছু না পড়ে-টড়ে সময় কাটান কী করে?'

'কিছু পড়ি না যে কে বললে? পড়তে হয় বইকি—বই না হলেও ঐ খবরের কাগজ পড়তে তো হয়ই। তিন-চারখানা কাগজ পড়ি রোজ—আগাপাশতলা খুঁটিয়ে পড়তে হয় আমাকে। তিন শ' লাইন পড়ে তবে হয়ত একটা লাগসই খবর পাই, যা আমার ওই তিন লাইনের টিপ্পনিতে লাগে। লেখা অল্প—কিন্তু পড়া বিস্তর—এই আমার অল্পবিস্তর লেখাপড়া এখনকার। বললাম না, সারা জীবনটাই আমার সাংবাদিক? খবরের কাগজ ফেরি করে এই জীবনের শুরু, এখনও সেই ফেরিঘাটেই রয়ে গেছি। খবরের কাগজের হকার থেকে খবরের কাগজের জোকার এখন।'

'তা আছেন বেশ।'

'তা আছি। এই খবরের কাগজই আমায় বহালতবিয়তে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেইসঙ্গে ঐ বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরাও। বেথুনে পড়া বাঙালীর মেয়েরা কাগজ কিনত, তা-ই বেচে খেয়েছি এককালে। আর, ছোট-ছোটরা আমার বই কিনেছে বলেই আমি খেয়ে বেঁচেছি, বড় হয়েছি। এবং যখন আর লিখতে পারব না, এই কলম চলবে না, মগজে কিছুই আসবে না আর, কাগজে আমার কোনো লেখাই নেবে না ভুলেও...তখন...তখন...'

'তখন কী করবেন?'

'সেই বেকারি দশায় গিয়ে হয়ত আমায় এই কাগজের হকারিতেই ফিরে আসতে হবে আবার। ঐ একটা কাজ তো কেবল জানা আছে জীবনে। অবশ্যি, এখন এটা আরও লাভজনক হবে আশা করি। তখন দু'পয়সার আনন্দবাজারে আধ পয়সা কমিশন মিলত মোট, এখন কাগজের দাম বেশি, কমিশনও বেশি। মোটামুটি লাভ। বেশ আনন্দেই কাটাবো।'

আমার ধারণায় সাহিত্যের সঙ্গে দায়িত্ব জড়িয়ে আছে...।

জনাব সাহেবের দরবারে আমার জবানবন্দী খতম করি: 'সমাজ আর সময়ের সহিত গেলেই তার হয় না। তার থেকে এগিয়েও যেতে হয় তাকে। শুধু পথের সঙ্গী হওয়াই নয়, পথ দেখাতেও হয় আবার। সাহিত্য কথাটায় সহিত-ত্বর ওপরই জোরটা বেশি দেওয়া বটে, কিন্তু তার জের ঐখানেই মেটে না। সহিতের মধ্যে যতটা সহ-তা ততখানিই কি হিত-ত্ব নেই আবার? তৎকালীন সমাজ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শুধু তাকে প্রতিবিম্বিত করেই তার দায় খালাস হয় না। ভাবীকালের দাবিও মিটিয়ে যেতে হয় সেই সাথেই।'...

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, যথার্থ সাহিত্যিক, আমার ধারণায়, তাঁর নয়া সাহিত্য সৃজনের সাথে নতুন সমাজও সৃষ্টি করে থাকেন, সমাজব্যবস্থা পালটে দেন, সময়ের ধারা বদলে দিয়ে যান।

যেমন রুশো, ভলটেয়ার, গোর্কি, সিনক্লেয়ার, ইবসেন ইত্যাদি। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল আর সুকান্ত।'

'এক নিশ্বাসে পাঁচটা নাম উচ্চারণ করলেন ?'

'পাঁচজন অবশ্যি পাঁচ ধারা—সেকথা সত্যি। ধার এবং ধারণাও তাঁদের পাঁচ রকমের কিন্তু তাঁদের স্বতন্ত্র সৃষ্টিপ্রয়াস উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে অভিন্নই। সামাজিক গতিমুক্তির উদ্দেশ্যেই সেই প্রয়াস। আর, সেইদিক দিয়েই তাঁদের ঐক্য আর সার্থকতা।'

'বিশদে বলুন।'

'বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই পথিকৃৎ, তাঁর সম্বন্ধে দ্বিরুক্তির অবকাশ নেই। তা হলেও তাঁর সমকালীন প্রায় সকলেই বিপ্লবী। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ—নিজের নিজের পথে কে নন ? নিজের নিজের খাতে পুরাতনের উৎখাতে সকলেই উচ্ছ্বসিত নবযুগ নিয়ে এসেছেন। খতিয়ে দেখলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো অনেক ভগীরথের সন্ধান মিলবে।...'

'আমরা এখানে সাহিত্যক্ষেত্রেরই আলোচনা করছি।' জনাব সাহেব আমায় মনে করিয়ে দেন। আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গান্তরে যেতে তিনি নারাজ।

'সাহিত্যের কথাই কইছি তো। শরৎচন্দ্রকেই ধরুন না। তিনিও কি তাঁর লেখার ধারে সমাজের রূপরেখা বদলে দেননি ? তাঁর কালের পল্লীসমাজের অরক্ষণীয়ারা কি আছে এখনো ? তাঁর পথের দাবী কি সমসাময়িক যুগবিপ্লবের প্রয়োজন মেটায় নি ? পথ দেখায়নি সেকালের বিপ্লবীদের ? অথচ তিনি আমাদের সমাজব্যবস্থা পালটে দিয়ে গেছেন সকলের অগোচরে, তাঁর শিল্পকলার একটুখানিও ক্ষুণ্ণ না করে তাঁর রচনার কোথাও একটুও সোচ্চার না হয়ে। কত বড়ো আর কী নিপুণ শিল্পী দেখুন। একেই আমি সত্যিকারের সাহিত্যিক আর যথার্থ সাহিত্য-সাধনা বলব—যা নাকি সমাজের দাবী, সময়ের দাবী, সেই সাথে ভাবীকালের দাবী মেটায়।'

'কথাটা ঠিক।' মানতে তিনি রাজী।

'আর, রবীন্দ্রনাথের কথা তো বলাই বাহুল্য। তিনি তো সব দিক দিয়েই আমাদের জাতির ধারা পালটে দিয়ে গেছেন—তাঁর নানান সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনা আর শিল্পসাধনায়—যা নাকি দস্তুরমতই বৈপ্লবিক। রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র দুজনে মিলে আমাদের হৃদয়মন মথিত করে নয়া মানসিকতায় উন্মথিত উদ্বর্তিত আনকোরা আরেক জাতের মানুষদের নিয়ে এসেছেন এদেশে। নিজের সাহিত্য-শিল্পের দাবী আর নিজের যুগের সঙ্গে যুগোত্তর দাবী দুই-ই তাঁরা মিটিয়েছেন যুগপৎ।'

'আর নজরুল ও সুকান্ত ? তাঁরাও কি তাই ?'

'তাই না কি ? তাঁদের কাজ সবজনকে নিয়ে হয়ত নয়, কেবল তাঁদের কালের বৈপ্লবিক উদ্বোধনে—বিপ্লবীজনদের জন্যেই। তাহলেও নজরুল নিজেকে 'যুগের নন হুজুগের কবি' বলে গাইলেও সত্যিকারের যুগের দাবীও তিনি মিটিয়ে গেছেন—তাঁর গানেই তাঁর কালের বিপ্লবীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আর সুকান্তও তেমনি, তাঁর অনুসরণেই একালের বিপ্লবপথিকরা এসেছে সব, দল বেঁধে এগুচ্ছে তারাই—এ যুগের বিপ্লবচেতনা যুগিয়ে গেছে সে-ই তো।'

'কিন্তু যুগের দাবী মেটানো ছাড়া কি সাহিত্যের আর কোনো দায় থাকতে পারে না ? সাহিত্যিকের নিজের কোনো দাবী থাকতে নেই ?'

'হ্যাঁ, আছে বইকি। তার আত্মপ্রকাশের দাবী। তাও আছে। মনের রূপ তো সাহিত্য

সেই মনোরূপের কলাসম্মত অপরূপ প্রকাশ—ব্যক্তিগত সেই দাবীও সাহিত্যিকের থাকতে পারে বইকি। —সে দায়ও তাকে রাখতে হবে অবশ্যই। যুগের নয়, জাতির নয়, নিছক নিজের গরজে নিজের জন্যই সাহিত্য, হ্যাঁ, তাও আছে। কেউ কলা বাঁচিয়ে যুগের সঙ্গে নিজের দায় দু-ই মেটায়, দু-ই পারে ; কেউ শুধু একটাই বজায় রাখে, একটাই পারে। জাতির এবং সমাজের কথা না ধরে কেবল সাহিত্যের দিক দিয়ে ধরলে কেউই এদের ফ্যালনা নয়। তবে যে কলাও বেচে আবার রথও চালায়, আমার বিবেচনায় সেই বড়ো। একাধারে রথী এবং সারথী যে—সে-ই যুগন্ধর।

'তবে কথা কী জানেন ? একটা হল শুধুই রূপশিল্প, আরেকটা জীবনশিল্প। তবে উভয়েরই শিল্পরূপসম্মত হওয়া চাই। একজন কেবল নিজের জীবনকেই টেনে বুনে দেখায়, অপরজন সবার জীবনকে গড়ে দিয়ে যায়—তাদের অজ্ঞাতসারে। পার্থক্য এইখানে। একজন শুধুই সাহিত্য সৃষ্টি করে, আরেকজন সাহিত্যের সঙ্গে নয়াসমাজও তৈরি করে দেয়। কোথাও আমাদেরই বদলে দিয়ে নতুন করে বানায়, কোথাও বা নব প্রজন্মে আনকোরা নয়া আমদানির পথ গড়ে যায়। আসে নবীন জাতি, অভিনব জাতীয়তার। যেমন গান্ধীজী, চলতি মানুষদের বদলে নিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন ; আর রবীন্দ্রনাথ নতুন মানুষদের গড়ে দিয়ে গেছেন—সাংস্কৃতিক, মানবিক দু'দিক দিয়েই।'

আর, আপনার ক্ষেত্রে ? এটা যদিও একটু ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা, মাপ করবেন।'

'মাপ করব বই কি, আপনাকে আমাকে দু'জনকেই। আমাকে আমার মাপাই আছে। যারা নিজের দায় আর যুগের দায় একসঙ্গে মেটায়, সেই মহৎ স্রষ্টা মহারথীদের সগোত্র আমি নই। আমার কোথাও কোনো দায় নেই—নিছক আদায়। আমার ভাগ্যে দায়ভাগ ন্যস্ত, আছে কেবল আদায়ভাগ। দায়সারা কাজে নিজের আদায় সারা। আর কলাকারুর দিক দিয়ে ? আদায় কাঁচকলা।

'তারপরে হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল আমাদের, সত্যিকারের সাহিত্যিকদের নিয়ে...দেখা যায়, তাঁদের সাহিত্যসাধনার একদিকে দেখি রূপ-শিল্প, অপর দিকে কেবল শিল্পরূপ। বিভূতিভূষণ প্রথম সারির, তাঁর রচনায়, পল্লীরূপ, প্রকৃতিরূপ, প্রকৃতির অনুষঙ্গী নিজের মনোরূপ—তারই আশ্চর্য প্রকাশ ; দ্বিতীয় সারিতে আছেন প্রমথ চৌধুরী, যাঁর কাছে শিল্পরূপটাই সার। একের লক্ষ্য কী বলব ; আরেকের কেমন করে বলব ; একজনের কলা বজায় রেখে বলা, অপরের বলাটাই হচ্ছে কলা।

'রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় এই দুই ধারারই অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখি আমরা। তিনি তো সব সময়ই সবাইকে টেক্কা দিয়ে গিয়েছেন—সর্বকালের জন্যই।

বঙ্কিমের কালেও এমনটা দেখা যায়। তারক গাঙ্গুলির স্বর্ণলতায় (এই একটি বইয়েই সমকালীন সবাইকে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছেন) অপরূপ শিল্পসুষমায় সেকালের সমাজের নিখুঁত রূপচিত্রণ দেখা যায়, কিন্তু তার পাশাপাশি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ আর সধবার একাদশী দেখুন, সেখানে পাবেন সামাজিক রূপ আর চেহারা দেখাবার সঙ্গে সেটা বদলাবার বৈপ্লবিক প্রয়াস।

'এমনি ধারাই চলছে সাহিত্যে ; চলেছে, চলবে বরাবর। শ্রেয়ঃ আর প্রেয়-র দুটি ধারাই পাশাপাশি। আবার কোথাও বা এই দু'য়ের সংমিশ্রণের সঙ্গে তৃতীয় এক সারস্বত

ধারা—সরস্বতী নদীর মতই যা অপ্রকাশিত থেকে উভয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত—সম্মিলিত হয়ে পরমাশ্চর্য এক ত্রিবেণীসঙ্গম।'

'গ্রন্থকারদের কথা থাক, গ্রন্থের কথায় আসা যাক।' প্রসঙ্গের গ্রন্থিমোচনের প্রয়াস পান জনাব : 'লিখিয়েদের ছেড়ে পড়ুয়াদের কথায় আসি বরং। কল্লোল গোষ্ঠীর আপনার বন্ধুদের...কার কেমন পড়ার ঝোঁক ছিল বলুন এবার। সেটাই আমি জানতে চাই আপনার কাছে।'

'বন্ধুদের ভেতর ? অচিন্ত্যকে দেখতাম প্রায়ই সে নামজাদা কোনো না কোনো লেখকের ঝামকরা বইয়ের আনকোরা আমদানি হাতে করে আনত—আসত যখন কল্লোলে। তার হাতেই আমি হামসুনকে প্রথম দেখি...কী বইটা মনে নেই। প্যান-এর সে অনুবাদ করেছিল। চমৎকার রচনা ! পড়েছিলাম আমি, মূলে এবং অনুবাদে। আমাদের পানসে প্রেমের প্যানপ্যানানি নেই প্যানে—অদ্ভুত বই। অভিনব হামসুন !'

'পবিত্র গাঙ্গুলী হামসুনের হাঙ্গার অনুবাদ করেছিলেন না ? পড়েছিলেন ?'

'অনুবাদে নয়, অরিজিন্যালে পড়েছি। সেটাও দারুণ। বইটা আমায় স্পর্শ করেছিল। আরো এই কারণ যে, হামসুনের হাঙ্গার হজম করার কালে আমার নিজের হাঙ্গারই হজম করতে হতো আমার একেক সময়—ক্ষুধাতুর হয়ে কতোদিন না কাটিয়েছি ! তবে আমার মতন অমন অবস্থায় এদেশের প্রায় সব লেখককেই বোধ করি পড়তে হয়, না খেয়ে কাটাতে হয়, হয়েছে কোনো না কোনো সময়। তবে হাঙ্গারের ওই হামসুনী চেহারা আমার জানা ছিল না—জানতেও হয়নি। একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে তার মধ্যেই।...

'অচিন্ত্য ছাড়া আর কে কে বই পড়ুয়া ছিল—শুধোচ্ছেন ? নৃপেনের মুখে প্রায়ই নানা বিদেশী বইয়ের উল্লেখ শোনা যেত, কালিদাস ভবভূতি আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়ানো বাই ছিল তার। উদ্ধৃতি দিত শেলি ব্রাউনিং কীটস্-এরও। নৃপেন এক গ্রন্থকীট ছিল, আমার ধারণা।

হ্যাঁ, নৃপেনও একাধিক বইয়ের অনুবাদ করেছিল। গোর্কির মাদার তারই অবদান। কিশোর সাহিত্যে তো তার বিস্তার বিস্তর। তার লেখার হাত এমন মিঠে ছিল যে বলবার নয়, শিশু-সাহিত্যে ওর তুলনা হয় না।...

'প্রেমেনের ঘরোয়া বুক-কেসের কথা তো বলেছি আগেই, তারপর ওই অচিন্ত্য আর নৃপেন, ওদের কাছেই যা দেখেছি আর শুনেছি। তার বাইরে এ বিষয়ে আর কোথাও আমার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের সুযোগ ঘটেনি। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণু দে মশাই একবার নিয়ে গেছলেন আমায় তখনকার তাঁর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায়, আমাদের মতন তাঁরও তখন তরুণ বয়স। সেই বয়সেই তাঁর পড়াশোনা অবাক হবার মতই। তাঁর বাড়ি আমি আলমারি আলমারি ঠাসা বই দেখেছি...ভারী ভারী বই সব।'

'নিয়ে গেছলেন আপনাকে উনি ওঁর বাসায় ?...আপনার সঙ্গে খুব ভাব ছিল বোধ করি ?'

'এমন কিছু না। কল্লোল কার্যালয়ে উনি আসতেন খুব কমই—হয়ত বা আসতেন, আমার চোখে পড়েনি তেমনটা—আমিও তো কমই যেতাম। কল্লোল গোষ্ঠীর উনি কতটা অন্তরঙ্গ ছিলেন বলা আমার পক্ষে সম্ভব না, তবে আমার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও, তবুও যে উনি আমায় ডেকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেছলেন সেটা বোধ হয় তাঁর অহেতুক করুণাই। আমার ন্যায় মুখ্যুসুখ্যু একজন পড়াশুনা না করে, নেহাত গবেট থেকে যাচ্ছে, তাই

শিক্ষাদীক্ষার দিকে আমার চোখ ফোটানোর ঝোঁকেই হয়ত সেটা হবে। নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা নিরসনের পর অপরকে জ্ঞানদান করতে পাগল হয় না মানুষ ? ...জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে বহুৎ উপলখণ্ড কুড়োবার পর তার এক-আধখানা ছুঁড়ে অপরকে মার লাগাবার সাধ যায় না ?'

'হোলো আপনার জ্ঞান ? ওঁর বইয়ের স্তূপাকার দেখে চোখ ফুটলো আপনার ? প্রেরণা পেলেন বই পড়ার ? ওঁর বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখার উৎসাহ হয়েছিল ? দেখেছিলেন ?'

'নাড়ব কি মশাই, দেখেই আমার চোখ কপালে উঠে গেছে। বললাম না, ভারী ভারী বই সব। বিদেশী পণ্ডিতদের লেখা ইয়াহ্ মোটা লম্বা চৌড়া ইলাহী ব্যাপার ! সারগর্ভ ভারগর্ভ বই যতো ! শ', রাসেল, নীটসে, বার্গ সঁ, রোলাঁ, লরেনস ইত্যাদির ! উনি এই বয়সেই ওই সব পড়ে শেষ করেছেন, আমি একশ জন্ম ধরেও পড়ে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।'

'তা হলেও এক-আধখানা হাতে নিয়ে দেখতে হয়েছিল কী !'

'দেখব কি মশাই, অদূরে দাঁড়িয়েই যা আঁচ পাচ্ছিলাম তাতেই আমার হয়ে গেছল ! তাঁর বইয়ের দরবারী আমে গিয়ে আম-জনতার আমি কী আরাম পাব ? সেই আঁচেই মনে ফোস্‌কা পড়ার যোগাড়। তার বেশী ছোঁয়াচে যায় আর ? বৈশ্বানরের আঁচড়ে যেমন ঝলসে দেয়, বিশ্বনরের পুঞ্জীভূত ঐ চিন্তানল তার চেয়ে কিছু কম নয় মশাই। জতুগৃহের অগ্নিকুণ্ডে কি খাণ্ডব-দাহনের দাবদাহে সাধ করে সেঁধিয়ে বিদগ্ধ হবার বাসনা কোনদিনই আমার নেই। তবে হ্যাঁ, সেই কালেই বিষ্ণুবাবুর ঝলসানো চেহারা দেখে আমার মনে হয়েছিল তখনি যে, হ্যাঁ, উনি রীতিমতই বৈদগ্ধ্য লাভ করেছেন বটে !...'

'তারপর আর আপনারা পরস্পর সংস্পর্শে আসেননি কখনো ?'

'আর না। আমিও তাঁর বৈদগ্ধ্যের আঁচড় খাবার ভয়ে এগুইনি আর এবং তিনিও বুঝি তাঁর ভালো ভালো বইয়ের প্রতি আমার ঐ আচরণ দেখে মনে মনে চটেছিলেন বেশ। তারপর কখনো আর আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষেননি। বুঝেছিলেন যে, সব জীবের উদ্ধার নেই, সব অধমকে তারণ করা যায় না। বিশেষ করে আমার মতন এই অধমাধমকে, নিজের বাবাও যাকে এত ধমকে একটুও মানুষ করতে পারেননি। তারপর...তারপরে কেমন করে আমরা যেন পরস্পরের থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম !...দুজনেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম বোধ হয়।'

'অদ্ভুত আচরণ আপনার ! অমন চমকদার চটকদার চমৎকার বই সব হাতে পেয়েও...' কী ভাষায় নিজের বিস্ময় ব্যক্ত করবেন তিনি ভেবে পান না।

'হাতিয়ে নিয়ে বাজারে এনে ঝেড়ে দিলে মন্দ হত না নেহাত ? দু-পাঁচ টাকা হাতে এসে যেত ! তখন ওটা আমার মাথায় খেলেনি কিন্তুক !'

মাথায় হাত দিয়ে এখন আমি আপসোস করি। যদিও পোস্তার বাজার পার হয়ে এসে পোস্তর জন্য পস্তানির কোনো মানে হয় না।

'না, না, ওকথা আমি বলেছি কি ? বলছি কী ?'

'বলতে হয় না বোঝাই যায়। শোনাও যায় বই কি ! কানে তো আসেই যে আমাদেরই কেউ কেউ প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় পন্ডিত লোকের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁদের দুর্লভ পাঠাগারকে দুর্লভতর করে দিয়েছেন... এখন তো সুদুর্লভ !'

'কি রকম ? কি রকম ?' তারপরই তাঁর কে—কবে—কেন—কোথায়—কাহার ? ইত্যাকার প্রশ্নমালার উৎসার হতে থাকে।

কিন্তু আমি উৎসের খবর রাখি না, তাঁর উৎসাহ মেটাই কি করে ? 'আমাকে যেন সন্দেহ করবেন না মশাই ! শ্রীচৌধুরীর ত্রিসীমানায় যাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি কখনো।' এইটুকুই শুধু বলতে পারি। আর বলি যে, 'কাজটার মধ্যে আমি তো নিন্দনীয় কিছু দেখি না। নগদ নারায়ণ সর্বদাই নমস্য, তা ছাড়াও, এর দ্বারা সমাজবাদী মতে লক্ষীলাভের সমভাগ্য সবাইকে দিতে না পারলেও এটায় প্রায় সমভাগেই সরস্বতীর সমবন্টন হয়ে যায়। যায় না? সেটা মন্দ কী—বলুন ?'

'সে কথা আমি কইছি না। নতুন বই হাতে পেলে...না না, বউয়ের কথা নয়, কারও বউয়ের বিষয়ে বলছিনে, বইয়ের কথাই হচ্ছে ! নতুন বই হাতে এলে কে না একটু নেড়েচেড়ে দ্যাখে ! অদ্ভুত লোক আপনি। সেই কৌতূহলটুকুও হল না আপনার ! নতুন বই তো আগ্রহভরে শুঁকেও দেখে থাকে অনেকে, আমি শুনেছি। তার ঘ্রাণ নাকি চমৎকার !'

'আমিও কি দেখিনি নাকি ? সত্যি বলতে, ঐ শুঁকে দেখা পর্যন্তই বইয়ের জ্ঞান আমার। ঘ্রাণেই অর্ধভোজন হয়ে যায়, গোটা বইটা গোগ্রাসে গেলার দরকার করে না। ও ছাড়াও কি বই আমি পড়িনে নাকি ? মস্ত মস্ত বইও পড়ি। আগাপাশতলাই পড়ে ফেলি একরকম। হস্তগত হলেই তার প্রথম প্যারা আর শেষ প্যারাটা পড়ে দেখি একবার—চোখ বুলিয়ে নিই বেশ করে—তাতেই আমার আদ্যোপান্ত পড়া হয়ে যায়। তখন আগাগোড়াই বইটা আমার পড়া যে, সে কথা জানাতেও বাধা থাকে না কোথাও, মিথ্যেও বলা হয় না বিশেষ। আমার বিদ্যের দৌড় বইয়ের ঐ প্রথম আর শেষ প্যারা। পড়ার ব্যাপারে আমার প্যারালাল আপনি পাবেন না !'

তার কোনো জবাব না দিয়ে শ্রী জনাব, 'আচ্ছা, বিষ্ণু দে-র কবিতা আপনার কেমন লাগে বলুন দেখি ?' রগ্ ঘেঁষে গুলি করার মতই রগরগে প্রশ্নটা তিনি ছুঁড়ে বসলেন হঠাৎ !

ভাবিত হতে হলো। আমাদের কালে সামাদ যেমন তালের মাথার পায়ে বল পেলে কোণের থেকে টুক করে তা গোলের মুখে ফেলে দিত, তেমনি ইনিও যেন এই প্রশ্নটায় আমায় একেবারে কর্নার করলেন ! কোণঠাসা করে আমাকে কোনো গোলের মধ্যে ফেলার মতলবেই কি না কে জানে, উনি তো অবলীলায় এই প্রশ্নটা পাশিয়ে বসেছেন—এখন এর ফলে কোনো গোল না বাধলেই হয়। স্বভাবতই আমি গোলমেলে কিছুর মধ্যে যেতে চাই না।

'গ্রীক ল্যাটিনে লেখা ওঁর কবিতার আমি বুঝবো কী মশাই ? আমি তো ওসব ভাষা জানিনে।' সবিনয়ে জানাই।

'গ্রীক ল্যাটিন ! বলছেন কী মশাই ? বাংলা ভাষায় লেখা যে ?'

'বাংলা হরফে লেখা হলেই কি বাংলা হয় ? বাঙালী পাঠকের বোধগম্য হওয়া চাইনে ? সংস্কৃত যদি আমি বাংলা বর্ণমালায় লিখি তা হলেই কি তা আর সংস্কৃত থাকবে না ? ওঁর লেখা সব সংস্কৃতের সগোত্রই—ক্লাসিক নয় কি ?'

'ক্লাসিক অবশ্যই এবং ফার্স্ট ক্লাস বটে', একটু থেমেই ওঁর পুনশ্চ যোগ : 'দেখুন, আপনার ছোঁয়াচে এসে আপনার বাকভঙ্গীর ব্যারাম আমাকেও পাকড়াচ্ছে... কিন্তু মাপ করবেন, আপনার কথাটা আমি মেনে নিতে পারলুম না। বেশ, সুধীন দত্তর কবিতা সম্বন্ধে আপনার কী মত ?'

'অভিন্ন মত। ঐ জাতীয়, উনিও পুরোদস্তুর ঐ ক্লাসের। মানে, ঐ ক্লাসিকই।' বলার

পর আমারও পুনর্বিন্যাস : 'হ্যাঁ, ঐ সুধীন দত্তই। উনিই বিষ্ণুবাবুর কবিতার সমঝদার হতে পারতেন। আর, সেটা হতো সমান পাল্লার, সমানে সমানে কোলাকুলি—এ গ্রীক মীটিং এ গ্রীক!'

'মানতে পারছি না ঠিক। আচ্ছা, বিষ্ণু দে-র এখনকার কবিতা আপনার কেমন লাগে?'

'এখনকার কবিতা? মহাকবি মাইকেলের মতন উনিও শেষে স্বদেশে এসে পৌঁছেছেন। নিজের মাতৃভাষায় ফিরেছেন এখন। বলতে হয় ওঁর বেশ অবনতি ঘটেছে সম্প্রতি। পাঠকদের পৈঠায় নামিয়ে এনেছেন নিজেকে। ভালোই করেছেন। এখন ওঁর কবিতা আর আগের মতন অস্বচ্ছ নয়। প্রায় মোটামুটি বোঝা যায়। এমন কি, আমিও এক-আধটু বুঝতে পারি।'

'আর ওঁর আগেকার কবিতা...'

'আমার কী মনে হয় জানেন?' বাধা দিয়ে আমি মনের কথাটা বলে নিই : 'মানে না হলেও সে-সব লেখা অতিশয় উচ্চ মানের। ওগুলি বাংলায় অনূদিত হলে আমাদের সাহিত্যের সম্পদ বাড়বে যে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহই।'

॥ চল্লিশ ॥

এই কাগজ ফেরি করার কালে রবিবারটা ছিল আমার আকালের। সেদিন প্রায় দুর্ভিক্ষপীড়িত দশায় কাটাতে হত আমায়।

বেথুনের স্কুল-কলেজ বন্ধ সেদিন! দিদি-ভাইয়ের কারোই দর্শন নেই। তাই অন্যদিনের মত ইস্কুল-কলেজ শুরুর আগে আধ ঘন্টার ফাঁকেই পাঁচশো কাগজ কেটে যাবার কোনো অর্ধোদয় যোগ ছিল না সেদিন!

হেদোর কিনারে দাঁড়িয়ে হেদায়েৎউল্লা খাঁর মতন রাজত্ব করার কোনো মানে ছিল না সেদিন। চারধারই সেদিন খাঁ খাঁ।

রবিবার তাই অল্প কাগজ আনতাম, শ'দেড়েকের বেশি নয় কখনই। কিন্তু তাই কাটাতেই হিমসিম খেতে হত আমায়।

সেদিন তাই চলে যেতাম সিনেমাপাড়ায়। হাতিবাগান এলাকায়। সিনেমা হাউসের সামনেই যা কাগজ বেচার জো ছিল রবিবার।

আমার সেই দেড় শো কাগজ কাটাতেই সিনেমার তিনটে শো লাগত। তিনটে, ছ'টা, ন'টায় গিয়ে খতম হত যত কাগজ।

তিনটের শো শুরুর আগেই দাঁড়াতাম গিয়ে হাউসের সামনে। গোড়াতেই নিজের একখানা চার আনা দামের ফোর্থ ক্লাস টিকিট কিনে রাখতাম। তারপর আমার কাগজ বেচবার পালা।

আহার আর ওষুধ সেদিন এক যোগেই আমার : সিনেমা দেখা আর কাগজবেচা—রথদেখার মেলায় গিয়ে কলা দেখানোর বিদ্যেকে টেক্কা দিয়ে।

সেকালে ঐ হাউসগুলির নাম ছিল বুঝি কর্নওয়ালিস থিয়েটার আর ক্রাউন সিনেমা, উত্তরকালে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়ে এখন যা নাকি উত্তরা আর শ্রী-তে দাঁড়িয়েছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল সন্ধ্যের দিকে কারো খবর কাগজের ঝোঁক থাকার কথা নয়, সত্যিকার পড়ুয়াদের সেই সাত-সকালেই কাগজ পড়ে দুনিয়ার সব খবর জেনে নেওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া, সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে কাগজ পড়াও যায় না। সেখানে ছবি দেখতেই যাওয়া, কাগজ পড়তে নয়—তা হলেও অপ্রত্যাশিতভাবে আকস্মিক কাগজ কেনার

ধুম পড়ে যেত—আর কাগজের গাদা খতম হত আমার তখনই। ভুঁইফোড় পাঠকদের তাগাদায়।

দেখতাম যারা খানিক আগেও আমার কাগজের আবেদনে কর্ণপাত করেনি, অবহেলার নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে আমার দিকে, সিনেমা শুরু হবার একটু বাদেই তারাই আবার হাউসের থেকে ক্ষিপ্তভাবে বেরুচ্ছে—কে যেন ধরে ধরে সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত করছে তাদের।

আর চট করে আমার কাছ থেকে কিছু বাছবিচার না করেই দু পয়সার যে কোনো একটা কাগজ কিনেই না তীব্র বেগে ফের হাউসের ভেতর ফেরত যাচ্ছে ফের।

সিনেমার টিকিট পকেটে রেখেও তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কাগজ বেচে চলেছি।

সিনেমার আসল বই (বেশির ভাগই সিরিয়াল ছবি ছিল সেকালে, পার্ট বাই পার্ট দেখানো হত হপ্তায় হপ্তায়) শুরু হবার গোড়ায় বিদেশী নিউজ রীল কি দু'রীলের কমিক ছবি কিছু দেখানো হত তখন—তারপর মিনিট পনের বাদেই আরম্ভ হত আসল বইটা। তারপর কাউকে আর তীরবেগে বাহির হতে দেখা যেত না, আমিও তখন হলের ভেতর ঢুকে জায়গা দখল করে বসতাম।

বেশির ভাগ কাগজ তিনটে ছ'টায় কাটত, বাকী যা থাকত তা ন'টার শো শুরু হবার পরই শেষ হয়ে যেত—শুধু একটা বাদে। সেই একখানা কাগজ আমি কিছুতেই বেচতাম না, তিন গুণ দাম দিলেও নয়। সেটা আমার নিজের কাজেই লাগত।

সিনেমা হলে, বিশেষ করে চার আনার সিটে যা ছারপোকাদের গুলজারি তখন! মহামারী কান্ড বাধত যেন। তখন এক গন্ডার ছাড়া এক দন্ড বসে থাকে সাধ্যি কার! সিনেমা হল অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে আমার গন্ডা গন্ডা কাগজ মুহূর্তের মধ্যে ফরসা হয়ে যেত।

ভেবে দেখলে, এ দেশে সংবাদপত্র-প্রচারে, আর এই সূত্রে শিক্ষার প্রসারেও, ছারপোকার অবদান নেহাত কম নয়। এমনকি আমি রিকশাওয়ালাকেও বাংলা কাগজ কিনতে দেখেছি, বাংলার ব-বোঝারও যার ক্ষমতা ছিল না। এইভাবে আমি কীর্তিমান জ্যোতিষবাবুর ঢের আগেই লোকসমাজে বাংলা ভাষার বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেছি বলতে পারি।

আর, সত্যি বলতে আমার জীবনে ছারপোকার পৃষ্ঠপোষকতা কিছু কম ছিল না। কেবল যে তারা প্রথম জীবনেই দাঁড় করিয়েছে তাই নয়, সারা জীবন ধরেই আমায় খাড়া রেখেছে...বরাত খারাপ হতে দেয়নি কখনো। যেমন কাগজ কাটাতে তেমনি অবাঞ্ছিত অনাহূত আমার আত্মীয়সঙ্কটের ফাঁড়া কাটিয়ে দিতেও তাদের জোড়া নেই, আমি বলব। ছারপোকারা এমনই এই ছার জীবনের অঙ্গীভূত যে কেউ আমাকে কখনই নচ্ছার বলতে পারে না। তেমন কটূক্তি কেউ করলে তা আমি অত্যুক্তি বলেই উড়িয়ে দেবো।

রবিবারটায় একশো কি সোয়া শো কাগজ বেচে যা পেতাম তার লভ্য কমিশনের ষোল আনাই তিনটে সিনেমার শো আর চিনেবাদামেই ফুঁকে যেত। শো দেখা আর শোয়া ছাড়া কোনো ধান্দা ছিল না। রাজেন মল্লিকের বাড়ি দুপুরেই সেই যা খেয়েছি বিকেলের দিকে তারা আর খাওয়ায় না। আর, সেদিন শোয়ার জন্য ঠনঠনের সেই অ্যালার্মবেলওয়ালীর চত্বরে গিয়ে হাজিরা দেওয়ারও কোনো গরজ নেইকো।

তখনকার কালে সপ্তাহে কাগজ বেরুতো মাত্র ছ'দিন। রবিবার ছুটি থাকত খবর কাগজের কার্যালয়ে, তাই সোমবারটা কোনো কাগজ বেরুত না একদম। কাজেই সে রাত্তিরে ভোর

চারটেয় উঠে কাগজের লাইনে গিয়ে খাড়া হবার কোনো তাড়া ছিল না। চারটে পাঁচটা ছ'টা পার করে সাত সকালে উঠলেও চলত সেদিন।

রাত্তিরে সেদিন হরিমটর। হরিনাম বাদেই মটর-আস্বাদ। এক পেট খিদে নিয়ে অদ্দূর হেঁটে শোবার জন্যে সেই কালীবাড়িতে সেদিন কে যায়? চতুর্থ প্রহরে সাধ করে নিজের সাধের ঘুমটি ভাঙাতে যাবে কে? সেই ঘুটঘুটি ভোরে সজাগ হবার কোনো দায়ই ছিল না আমার সেদিন। মা কালীও সেদিন আমার অতি ভক্তির প্রাতঃপ্রণাম আদায় করতে পারতেন না।

পয়সা চারেকের চানাচুর চিবিয়ে সিনেমা হলের কাছেপিঠে ফুটপাথের ওপর কোথাও তখন গড়িয়ে পড়লেই হল আমার।

অনেককে দেখেছি রাস্তায় শুতে হলেও শোবার আগে চারধারের ধুলোবালি সব ঝেড়েঝুড়ে নেয়, হয়ত গায়ের ওড়না দিয়ে ঝেঁটাতে গিয়ে সেটাকেই ময়লা করে বসে রাস্তা সাফ করার প্রেরণায়। কিন্তু তার কি কোনো মানে হয়? সমুদ্রে শয্যা পাততে গিয়ে শিশিরবিন্দুতে সন্তাপ? হাজার ঝেঁটিয়েও কলকাতার রাস্তাকে কখনো পরিষ্কার করতে পারে কেউ?

রাস্তায় শুলে ধুলোকে তো ধূলিজ্ঞান করাই উচিত। দুনিয়ার আবর্জনা কি কেউ কখনো সম্মার্জনায় শেষ করতে পারে? এক জায়গার দুঃখ আরেক জায়গায় জমা করে কেবল।

না, আমার ওসব ঝামেলা পোষায় না। পথে বসলাম কি গড়ালাম, আর গড়ালাম কি ঘুমোলাম।

বেশ ঘুমিয়েছিলাম, এমন সময় কে যেন এসে ঠেলে তুলল আমাকে: এই! এই! এখানে ঘুমিয়ে কে?

ঠেলা খেয়ে উঠে বসতে হল—'আমি।' নিদ্রাজর্জর স্বরে জবাব দিয়েছি।

'আমি! আমি তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে শুয়ে কেন?' ভদ্রলোক শুধান।

'কোথায় শোবো তা হলে?' চোখ মুছতে মুছতে বলি।

'ভদ্রলোকের ছেলে, ছোটলোকের সঙ্গে রাস্তায় শোয় নাকি? ওঠো ওঠো। এসো আমার সঙ্গে।'

ঘুমিয়ে ছিলাম বেশ ছিলাম। ঠেলার চোটে ঘুম ভাঙার পর এখন পেটের খবর টের পাওয়াচ্ছিল। খিদের চোটে অস্থির হয়ে উঠতে হল।

সামনে সমানে দুর্ভিক্ষ। কাল দুপুরে মল্লিক বাড়ির সেই অন্নসত্রে—তার আগে কোথাও কিচ্ছুটি নেই।

কাগজও পাচ্ছিনে কাল সকালে যে, তাই বেচে কিছু নগদ পাব, কিনে খাবটাব তখন।

এই নিরন্ন মুহূর্তে এই ভদ্রলোক ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূতের মতই এসে যেন দেখা দিলেন। পিছু পিছু যেতে যেতে ভাবি। ওঁর বাড়িতে বোধ হয় ঠাঁই হবে আজ আমার। খাওয়াবেন তো বটেই, কোনো কাজও দেবেন নিশ্চয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়ানোর বিনিময়ে কারো কারো বাড়িতে থাকা-খাওয়ার কাজ পাওয়া যায় কলকাতায়। পড়ুয়া ছেলেরাই পেয়ে থাকে, সেই হকার ছেলেটি জানিয়েছিল আমাকে। তেমনি একটা কাজ হয়ত আমার জুটে যাবে এঁর কৃপায়। তাই যদি পাই তো বর্তে যাই—বেশ হয় তা হলে। কাগজ বেচার ওপর এই উপরি পাওনাটা হলে মন্দ কি? তা হলে আর আমার ফি সোমবার এই উপোষ পোয়াতে হয় না। পোষ মাস এসে যায় নগদ। খুলে যায় আমার বরাত—কেটে যায়

ধরাশায়ী হবার রাত।

ভদ্রলোকের পিছনে ভাবতে ভাবতে চলেছি আমি। আর কিছু না হোক, আজ রাত্তিরের মত খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাটা তো হবে।

কদ্দুর চলেছেন ভদ্রলোক ? চলেছেন তো চলেছেনই যে! খিদে পেটে কি হাঁটতে ভালো লাগে কারু ?

হেঁটে হেঁটে বিডন স্ট্রীট মোড়ের চৌমাথা পার হলাম আমরা। —'এটা হেদো। জানো তো ?'

'জানি বইকি।' ঘাড় নাড়লাম আমার। হেদো জানব না ? এই এলাকায় আমার রাজত্ব! রোজ সকালে রাজ্যির খবর কাগজ বগলে আমার বিরাজত্ব এইখানেই।

হেদোর প্রথম গেটের পাশ দিয়ে যেতে তিনি বললেন—'এটা দেখছি বন্ধ।'

তারপর মাঝখানের মেন গেটের মাঝামাঝি গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

'ওমা! এখানেও যে তালা মেরে দিয়েছে দেখছি!'

তাঁর এই বেতালা কথার কোনো তাল্ পাওয়া যায় না।

'রাত্তিরে পার্কটা বন্ধ করে দেয় বুঝি ?' এমনি শুধাই।

'হ্যাঁ। যত গুন্ডা বদমাসরা ভেতরে গিয়ে গুলতানি করে কিনা! জটলা পাকায় রাতভোর। পার্কগুলো রাত্রে তাই বন্ধ করে রাখে।'

'ও!'

'যাক, লাফিয়েই যেতে হবে তা হলে। কী আর করা যাবে ?' অগত্যার মতন তিনি কন—'লাফাতে পারবে তো ?'

আমি ইতস্তত করি। এই ক্ষুধিত ক্লান্ত দেহে আপাদমস্তক ঘুম নিয়ে লাফিয়ে ওই রেলিং পেরুতে হবে ? হাই জাম্পের কসরতে কোনদিনই আমি পোক্ত ছিলাম না, হ্যাঁ, সতীশ হলে পারত বটে অনায়াসেই। স্পোর্টস-এ সে প্রায় অদ্বিতীয়। এক হাই জাম্পেই ঐ রেলিং পার হওয়া তার পক্ষে কিছু না!

'ডিঙিয়ে যেতে পারি।' আমি বলি—'ডিঙোব কেন বলুন তো ?'

তার জবাব না দিয়ে তিনি বলেন—'তা হলে ডিঙোও। ওঠো তা হলে।'

রেলিং ধরে উঠি।

'ধরতে হবে ? ধরব তোমায় ? ধরে নামিয়ে দেবো ওধারে ?'

'না না, ধরতে হবে না আপনাকে।' ধৃত হবার আগেই আমি নিজেকে উধৃত করেছি। খাড়া হয়েছি রেলিং-এর মাথায়।

'বাঃ! আর কী ? লাফিয়ে পড় এবার। বেশ। এবার, সামনে ঐ বেঞ্চি দেখছ তো সব ? দীঘিটার চারধারেই রয়েছে। সকালে বিকেলে হাওয়া খেতে এসে বসে এখেনে লোকেরা। এখন সব ফাঁকা। ওর একটায় গিয়ে শুয়ে পড় স্বচ্ছন্দে। নিশ্চিন্তে ঘুমোও। কেউ কিচ্ছুটি বলবে না।'

বলে আর দ্বিরুক্তি না করে তিনি নিজের পথ ধরেছেন। দেখতে না দেখতে নিরুদ্দেশ।

আমিও আর কী করব ? রাত্রের আহার বাসস্থানের দুরাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে খিদে তেষ্টা মেটাতে সিধে হেদোর ঘাটে গিয়ে অঞ্জলি ভরে জল খেলাম। এক পেট জল ঠেসে এক পিঠ বেঞ্চির তক্তায় গড়িয়ে পড়লাম এসে। নিমেষের মধ্যে আমিও নিরুদ্দেশ!

একজনের ঠেলায় পড়ে এখানে এসে শুয়েছি, আরেকজনের ঠেলার চোটে উঠে বসতে হলো এখন।

চোখ মেলে দেখি এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের চোটপাট আমার ওপর।

'আজকালকার ছেলেরা যেন কী! কখন সেই পাঁচটায় ভোর হয়েছে, ছ'টা বাজে এখন। এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। দ্যাখো না। সেই কোন্ প্রত্যুষে আমি উঠেছি—উঠে বেড়াতে বেরিয়েছি, এর মধ্যে এই হেদোয় আমার সাত পাক ঘোরা হয়ে গেল আর এখনো পড়ে পড়ে ঘুম বাবুর! আশ্চর্য! ওঠো হে! এটা নাক ডাকানোর জায়গা নয়, লোকজনের বসবার জন্যে। জোয়ান ছেলে, শরীর ভালো করতে চাও তো ওঠে পড়ো চটপট। উঠে দৌড়াও এখন—হেদোর চারধারে চার চক্কোর লাগাও গে...' চক্কর বর্তিকে চক্কোরবর্তী করার তাঁর অপপ্রয়াস।

চোখ মেলে তাঁর হিতোপদেশ শুনছি, আলস্যি আমার ভাঙেনি তখনো। আমার পাঁজরায় তাঁর ছড়ির এক টোক্কর লাগিয়ে আমেজটা তিনি ভাঙিয়ে দিলেন তক্ষনি।

'উঠে সামনের ঘাটে মুখহাত ধোও গে! দৌড়োতে বলছি না তোমায়? আমি...কখন সেই প্রত্যুষে উঠেছি, উঠে আমার দন্তধাবন সেরেই না...'

'এখানে এসে পরের পশ্চাদ্ধাবনে লেগেছেন!' ধড়মড় করে উঠে বসলাম—তাঁর ছড়ির খোঁচায়। আমেজ যাওয়ার পর মেজাজ দেখা দিয়েছে আমার।

পাঁজরার খোঁচাটা যেন পেটের মধ্যেও গিয়ে খোঁচাতে লাগল—যেমন কানের গোড়ায় তেমনি যেন আমার প্রাণের গর্ভেও খচখচানি শুরু হয়ে গেল কেমন।

কোনো কোনো রাক্ষসের যেমন ভোমরার মধ্যে প্রাণ লুকোনো থাকে, উপকথায় শোনা গেছে, আমার অন্তরাত্মা তেমনি যেন আমার পেটের অন্তরালে। ঘুম ভাঙার সাথে সাথেই তিনি খিদের জ্বালায় জ্বলে উঠেচেন।

না, উঠতেই হয় এবার। উঠে ঘাটের পৈঠেয় গিয়ে আবার এক পেট জল না খেলেই নয়।

রাজেন মল্লিকের মহাপ্রসাদ তো সেই বারোটা বাজিয়ে তারপরেই না!

ততক্ষণ যুঝতে হলে...সারা কলকাতা খুঁজতে গিয়ে ঐ দীঘিটাই নজরে পড়ে!

ঘাটের থেকে এক-আধ আঁজলা মুখে তুলেছি কি না, অমনি সেখানেও ফের আরেক ঠোক্কর!

'আরে আরে! এই! তুমি করছো কী!'

আমার সমবয়সী একজন পৈঠায় বসে দাঁতন করছিল, সে-ই বাধা দিয়েছে: 'এই, জল খাচ্ছো যে?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'পুকুরের জল কি খেতে আছে নাকি?'

'খিদে তেষ্টা পেলে কী করব তাহলে? খালি পেটে থাকলে পিত্তি পড়ে না? সেই পিত্তি পড়ার দাবাই—পেটে কিছু দিতে হয়। জল পথ্যি করে তাই দিচ্ছিলাম। তোমার তাতে আপত্তি কিসের?'

'জল খাও না কেন, আমি কি বাধা দিতে গেছি! শুধু ঐ পুকুরের জলটা খেতেই মানা করছি তোমায়। বাইরে রাস্তায় ফুটপাথের ওপর জলের কল আছে—কলের জল খাও না গিয়ে। কলের জলই তো খায় সবাই, পুকুরের জল কেউ খায় না কখনো।'

'বলেছে তোমাকে! দেশ পাড়াগাঁয় পুকুরের জল খেয়েই বাঁচে মানুষ। সেখানে কল কোথায় গো? কল তো তোমার এই কলকাতাতেই কেবল। কিন্তু দেশে? সেই অজ পাড়াগাঁয়ে?'

'দেশে কি ওই পুকুর ছাড়া কিছুই নেই আর ?'

'কোথাও কোথাও নদীও আছে বই কি ! তারা নদীর জলই খায় । কারও কারও বাড়ি কূপও রয়েছে আবার । আমাদের বাড়ি ইঁদারা আছে একটা—সেই কোন্ সাবেক আমলের । অতি প্রাচীন ইঁদারা । তার জল ভারি মিষ্টি । যেমন মিষ্টি তেমনি হজমি ।'

'আমাদের কলকাতায় ইঁদারা তুমি পাবে না কোথাও । প্রাচীন ইঁদারা তো নয়ই ।'

ইঁদারা না থাক, ইঁদুর আছে তোমাদের । বেশ ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর—বেড়ে ইঁদুর সব ! লক্ষ্য করলে তেমন প্রাচীন ইঁদুর চোখে পড়ে বই কি !'

'দেখেছ তুমি ?'

'বিস্তর । তুমি দ্যাখোনি বুঝি ? রাস্তায় শোওনি বোধ হয় কখনো ?'

'রাস্তায় ? রাস্তায় শোব কেন ? শুতে যাব কেন ? রাস্তায় কি শোয় নাকি কেউ ? সেটা কি শোবার জায়গা ? খাটের ওপর গদি পাতা বিছানায় মশারি খাটিয়েই তো শোয় সবাই—কিংবা, চৌকিতেও তোশক পেড়ে শোয় কেউ কেউ। রাস্তায় কেউ শুতে যায় নাকি?'

'কিন্তু যার বাড়ি নেই, ঘর নেই, খাট নেই, পালঙ্ক নেই, এমন কি খাটিয়াও নেই একখানা—মশারি খাটিয়ে শোয়া তো দূরস্থান...সে কোথায় শোবে শুনি তবে ?'

'তুমি শুয়েছ কখনো রাস্তায় ?'

'আকচার । রাস্তাই তো আমার শোবার জায়গা হে ! নইলে তোমাদের ওসব প্রাচীন ইঁদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল কি করে ?'

'রাস্তায় শোয়া কখনই ভালো নয় । নিরাপদও নয় ভাই ! রাত্তিরে অবশ্যি ট্রাম চলে না, তা সত্যি, কিন্তু লরি মোটর এসব তো যায়—যদি তোমার ওপর দিয়ে চলে যায় একখানা ? আচমকা চাপা পড়ে যাও যদি ?'

'আহা, রাস্তার মাঝখানে কি আর ? আশেপাশে । ফুটপাতের ওপর । সেখান দিয়ে কি গাড়িফাড়ি যায় নাকি ? আর, রাত একটু গভীর হলেই ফুটপাথে যত ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুররা জড়ো হয়—তাদের যাতায়াত শুরু হয়ে যায় । তারা কাউকে গেরাহ্যিই করে না । গায়ের ওপর দিয়েও চলে যায় কখনো কখনো । রাস্তায় শোয়ার ভাগ্যি করোনি বলে সে-দেখার সুযোগ তোমার কোনোদিন হবে না ।'

ছেলেটি সে কথার জবাব না দিয়ে তার দাঁতনের গোছার থেকে একটা কাঠি আমার দিকে এগিয়ে দেয়—নাও, দাঁতন করো ।'

'বাঃ ! এ যে নিমের দাঁতন দেখছি । কোথায় পেলে ? কলকাতায় এত ঘুরেছি কিন্তু কোনো রাস্তায় নিমগাছ তো কই চোখে পড়েনি আমার !'

'রাস্তার/নিমগাছ নয় হে । জেলখানার ।'

'জেলখানার !' দস্তুরমতো অবাক হতে হয় ওর কথায় : 'জেলখানায় তো ঘানিগাছ আছে জানি, সেই ঘানির তেল বিক্রি হয় বাজারে । কিন্তু নিমগাছের দাঁতনও যে সেখান থেকে যুগিয়ে থাকে শুনিনি তো !'

'আহা ! তারা যোগাতে যাবে কেন গো । সেখেন থেকে নিয়ে এসেছি যে । এক গোছা নিয়ে এসেছি বেরোবার সময় ।'

'জেল থেকে নিয়ে এসেছো ? জেল কি চিড়িয়াখানার মতই নাকি ? ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় সেখানে ? দেখেশুনে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ফিরে আসা যায় আবার ?'

'মোটেই তা নয়। জেলে যাওয়া ভারী শক্ত ব্যাপার। গেলে পরে বেরুনো আরো কষ্টসাধ্য।'

সে জানায় : 'সহজে সেখানে ঢুকতে দেয় না। সেখান থেকে বেরুনোও সহজ নয়।'

'তাহলে তুমি জেলের ভেতর গেলে কি করে?'

'কেন, পিকেটিং করে? রোজ রোজ শত শত ছেলে যে পিকেটিং করে জেলে যাচ্ছে, তুমি কি কোনো খোঁজ রাখো না তার? খবর কাগজ পড় না বুঝি?'

'পড়ব না কেন? শত শত কাগজ পড়তে হয় রোজ আমায়।'

'শত শত?' ছেলেটি আবার হতবাক : 'অতগুলো কাগজই নেই আমাদের। কাগজ তো মোটে এই ক' খানা—আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, বসুমতী আর স্টেটস্‌ম্যান।'

'আহা, কাগজ কেবল পড়া কেন, কাগজ পাড়াও যে আমার কাজ হে! কাগজের হকারি করি যে! পাঁচশো কাগজ বেচতে হয় আমায় রোজ।' আমি বিশদ হই : 'একখানা কাগজ শুয়ে বসে ধীরে সুস্থে আরাম করে আগাগোড়া পড়ব যে, তার সময় পাই কী! একটুখানি পড়তে না পড়তেই সেটা বিক্রি হয়ে গেল, তখন আরেকখানা নিয়ে পড়লুম। ফের সেখানাও আবার....ঐ যতক্ষণ হাতে থাকে ততক্ষণই যা পড়ি....এমনি করে একটু একটু পড়ে সব খবর জানতে আমার সন্ধ্যে উতরে যায়, জানো?'

'তারপর, কী করো? সে কাগজখানাও বেচে দাও?'

'সেখানা পেড়ে বসি তারপরে। ন'টার সিনেমায় যাই না? কী ছারপোকা ভাই, তোমাদের ঐ সিনেমায়। পেড়ে না বসলে আর চোখে কানে দেখতে দেয় না—ছবিটার মাথামুন্ডু বোঝা যায় না কিছুই।'

'যা বলেছো।' হাসতে থাকে সে।

'বায়স্কোপ দেখতে ইচ্ছে করে না তোমার?' আমি শুধুই : 'যাবে তুমি আজ? যাও তো বলো, তাহলে দু'খানা কাগজ না হয় বেচব না আজকে। দু'জনের পেতে বসার জন্য রাখব তাহলে।'

'দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এই কি আমোদ-প্রমোদ করার সময় ভাই? ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চলছে না আমাদের? আবার আমি জেলে যাব যে। হয়ত আজই, না হয় তো কাল। কাল তো নিশ্চয়ই।'

'কালই আবার? কালই আবার ফিরে যাবে সেখানে?'

'নিশ্চয়। কাল বিকেলে মীর্জাপুর স্কোয়ারে সভা আছে না? আইন অমান্যের সভা—যারাই যাবে সেখানে, যোগ দেবে সেই সভায়, তাদেরকেই পাকড়াবে পুলিস। আগের থেকে বলে দিয়েছে। সভা-টভা করার নিষেধাজ্ঞা আছে না এখন? একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা সব জায়গায়। আইন ভাঙলেই ধরে নিয়ে যাবে থানায়, সেখান থেকে একবার আদালত ঘুরিয়ে সটান সেই জেলে চালান দিয়ে দেবে।'

'তাই বুঝি?'

'তাই। তোমার জেলে যেতে ইচ্ছে করে না? করছে না?'

'এক-আধটু করে—একেক সময়। বেশি নয়। গেলে পর সেই নিমগাছটা দেখতে পাব বোধ হয়?'

'পাবে। তবে তেমনটি পাবে না। সেই নিমগাছ আর সে রকমটি নেই কো।'

'গেল কোথায় তাহলে? যদ্দূর জানি, নিমগাছরা তো চলাফেরা করতে পারে না। পাদপ বলা হলেও ওদের কোনো পা নেই আদপে। হাঁটতে পারে না একদম।'

'আহা, হাঁটতে যাবে কেন হে? একটি তো নিমগাছ মোটে। আর চার হাজার ছেলে আমরা জেলখানায়। সারা জেল ছেলেয় ছেলেয় ভর্তি। স্বরাজের আন্দোলনে টইটম্বুর। আমাদের জন্যে এবার আরেকখানা জেল খাড়া হয়েছে তা জানো। সে-ই খিদিরপুর ডকেই।'

'তা হলই বা অতো ছেলে, তা তোমার নিমগাছের কী! লড়াই তো আমাদের ইংরেজের সঙ্গে। নিমগাছের সঙ্গে নয়।'

'সকাল হলেই আমরা সবাই নিমগাছটার ডালে উঠে বসি। ছেলেরা যতো সব ডাল ভেঙে দাঁতন করতে লাগে.....'

'কেউ কিছু বলে না?'

'কে বলবে? বলবার কেউ নেইকো। আমরাই জেলে থাকি কেবল তিন চার হাজার ছেলে।' আমি হাঁ করে ওর কথাগুলো গিলি—'সেই জেলে আগে যে সব চোর ডাকাত খুনী বদমায়েস থাকত, জেল খালি করে তাদের সব মফস্বলের জেলে ঠেলে দিয়েছে—এখন কেবল কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার, তারাই থাকে।'

'এখন ঐ নিমের ডালে দাঁত বসাচ্ছো, তারপরে দাঁত শানিয়ে ইংরেজের ঘাড়ে গিয়ে বসাবে, তাই না?' বলেই আমার অনুযোগ: 'যার নাম মরণ কামড়?

'যা বলেছো!' সে হাসে: 'সকালে ঘুম ভাঙলেই সবাই আমরা সেই নিম গাছটায় উঠে বসি....মুখ ধুতে হবে না আমাদের? কেউ কিছু বলে না—বলবেটা কী?'

'আর নিম গাছটা?'

'সে আবার কী বলবে? তার মুখে কোনো ভাষা আছে?'

'ভেঙে পড়ে না সে? তোমাদের অতজনের ভারে?'

'চার হাজার কি একসঙ্গে গাছে ধরে? ক্ষেপে ক্ষেপে ওঠে। নিমগাছটা কিন্তু ক্ষেপে ওঠে না। দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। ক্ষেপেও ওঠে না, জ্বলেও ওঠে না দপ্ করে। তোমার ঐ পাদপ হওয়া সত্ত্বেও। কিংবা সেইজন্যেই বোধ হয়। সব সময় এক পায় খাড়া। আমাদের জন্যেই....'

'অসহায় একলা পেয়ে তার ওপর তোমরা বেজায় অত্যাচার করছ কিন্তু?'

'সে কথা আর বলবার নয়, আস্ত নিমগাছটাই দাঁতন করে খতম করে দিয়েছি বলতে গেলে।'

'বল কি হে? একটা গোটা নিমগাছ সবাই মিলে দাঁতন করে ফেললে?'

'ফেলব না? চার হাজার লোক দাঁতন করলে একটা নিমগাছ কদিন টেকে আর?'

'ভারী আশ্চর্যি তো!' একটু ভাবতে গিয়েই আমার সংশয় জাগে 'তার শাখাপ্রশাখা সব সমেত?'

'না না! বড় বড় শাখাপ্রশাখা কী আর? ছোট শাখাপ্রশাখা। তোমার ওই গুঁড়িটাও বাদ।'

'গোড়ায় দাঁত বসাতে পারোনি তাহলে? গোড়াতেই গলদ!'

'হ্যাঁ, গলদ নিয়ে তেমনি খাড়াই হয়েছে গাছটা, তবে একেবারে ন্যাড়া করে রেখে এসেছি। কিছু আর নেই তার। যেয়ো না জেলে, দেখবে তখন। চেহারাটা তার দেখতে পাবে গেলে।'

'যাব তো। কিন্তু কবে যাই কিছু কি তার ঠিক আছে!'

'মীর্জাপুর স্কোয়ারে এসো না পরশু বিকেলে, আইন অমান্য করার সভা হবে সেদিন। সেদিন ফের আমি জেলে ফিরে যাব এঁচে রেখেছি।'

'সেই গাছটাকে দেখতে আবার ?' আমি জিগ্যেস করি : 'তাকে না দেখে থাকতে পারছো না বুঝি ? মন কেমন করছে তোমার ?'

আমি অবাক হয়ে ভাবি. গাছের জন্যে এমন টান কারো হতে পারে নাকি কখনো। গাছের আবার দেখবার কী আছে ? সে তো একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়। তাছাড়া, এ গাছটার তো রূপ যৌবন বলতে কিছুই আর নেইকো। সবটাই প্রায় তার দাঁতন হয়ে গেছে।

'আহা, গাছ কেন গো ! সেখানে একজন রয়েছে যে আমাদের ! তাকে দেখতেই যাব তো আমি।

'তোমার কোনো বন্ধু বুঝি ?'

'হ্যাঁ, বন্ধুও বলা যায় বইকি। শুধু আমার নয়, সবাইকার। তবে বন্ধু বলতে যা বোঝায়, সমবয়সী ইয়ার, ঠিক তো নয় অবশ্যি।'

'তবে ? একজন মানুষমাত্রই ! তোমার যদি প্রাণের বন্ধু না হয় তবে শুধু একজন মানুষকে দেখেতে ফের আবার জেলে যাবার কোনো মানে হয় ?' আমি বলি : 'গাছের মত একটা মানুষকেও তো একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়।'

'সব মানুষ কি ফুরোয় ? সবাই কি ফুরিয়ে যায় ? একেক জন এমন মানুষ থাকে না যে নাকি অফুরন্ত, ফুরোবার নয় ! কখনো ফুরোয় না ! যাকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে, দেখে দেখে আশ মেটে না, দেখলে পরে চোখ জুড়োয় ; মন ভরে যায় !'

'কে, শুনি না মানুষটা ?'

'যে-সে মানুষ নয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ঐ জেলেই আছেন এখন। তিনি কারাবরণ করেছেন তুমি জানতে না ?'

'জানব না কেন, কিন্তু ঐ জেলেই যে রয়েছেন তা আমি জানতুম না।'

'দেখেছ কখনো দেশবন্ধু দাশকে ?'

'কতোবার ! খুব ভালো করেই দেখেছি।'

'কোথায় দেখলে ? তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করা তো ভারী মুশকিল। মানে, তোমার আমার পক্ষে। আর সভায়-টভায় সেই দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু খুব কাছাকাছি পেতে হলে তোমায় যেতে হবে ওই জেলে।'

'আমি খুব কাছাকাছিই তাঁকে দেখেছি।'

'কি করে দেখলে শুনি ? দেখলে কোথায় ?'

'আমাদের জেলায়। কিছুদিন আগে তিনি বাংলাদেশের শহরে শহরে সভা করতে বেরিয়েছিলেন না ? সেই সময়।'

'ও, সেই দেখা। জেলায় দেখা আর জেলে দেখা এক দেখা নয়। তুমি দাড়িওলা সি আর দাশ দেখেছো ?'

'না।' আমি কই, 'আমি দেখেছি বেশ চাঁছাছোলা সি আর দাশ।'

'জেলে গিয়ে উনি দাঁড়ি রেখেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে তবে কামাবেন—ওর নিজের নাপিতের কাছে।' সে জানায় : 'জেলে না গেলে এই সি আর দাশকে তুমি আর দেখতে পেলে না। তোমার এ জীবনে নয়।'

ভাবিত হতে হয়। চাঁছাছোলা দেশবন্ধুর গালে চাচাওলা দাড়ি কেমনটা দাঁড়িয়েছে ভেবে আমি ঠাওর পাই না।

'গাছপালা নদীনালা খালবিল একবার দেখলেই হয়, দেখবার সাথে সাথেই ফুরোয় মানি, কিন্তু গঙ্গা ?' সে বলে যায়, 'গঙ্গা কি ফুরোয়, না ফুরোবার ? গঙ্গা অফুরন্ত। গঙ্গার দিকে তুমি অনন্তকাল ধরে তাকিয়ে থাকতে পারো। দেখেচ তুমি গঙ্গা ?'

'কে না দেখেছে ?' তার প্রশ্নটাই আমায় অবাক করে।

'সে তো হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে ? যেতে আসতেই ?' তার কথা : 'তার কিনারে বসে তাকিয়ে থেকেছো তার দিকে ?'

'কতো দিন! দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা, মাসের পর মাস।'

'কোথায় দেখলে ? তোমাদের গাঁয়ে গঙ্গা আছে ?'

'না। সেখানে মহানন্দা। বর্ষাকালেই তার আনন্দটা দেখা যায়—তখন নৌকো যায় তার ওপর দিয়ে। কিন্তু অন্য সময় শুধু তার হাড়পাঁজরা।'

'তা হলে দেখলে কোথায় অমন করে ? ভারী তোমায় হিংসে হচ্ছে আমার।'

'কেন, এই কলকাতাতেই। কাশীপুরে। বরানগরের পাশ দিয়ে যায়নি গঙ্গা ?'

'সেখানে তোমাদের কেউ থাকে বুঝি ?'

'কেউ থাকে না। খালি পড়ে থাকে বাড়িটা। প্রকান্ড বাড়ি। অট্টালিকাই বলা যায়।'

আমি আরও জানাই : 'অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রকান্ড এক বাগানের মধ্যে বাড়িটা।'

'বাগানবাড়ি বুঝি ?'

'হ্যাঁ, বাগানবাড়িই তো। বাগানের ভেতর বাড়িটা, গঙ্গার ঠিক ওপরেই। ছোটখাট বাঁধানো ঘাট রয়েছে আবার। সেখানে বসে দ্যাখো না কেন গঙ্গা যত খুশি। কেউ দেখবার নেই। আমি তো তাই দেখতাম।'

'বাগানবাড়ি ভারী খারাপ।' তার মন্তব্য। 'খারাপ বলে সবাই।'

'কেন, খারাপ কিসের ? বাড়িটাও খারাপ নয়, বাগানটাও বেশ ভালো। কতো আম গাছ, লিচু গাছ, নারকেল গাছ আছে বাগানে। কী মিষ্টি আম সব! কতো বড়ো বড়ো লিচু। ডাব ধরে রয়েছে এনতার। পাড়ো আর খাও। আর ফুল গাছ তোমার কতো রকমের যে! সৌরভে মন ভরে যায়—চাঁপার গন্ধ তো পাগল করে দেয় ? আমাদের দেশের সোনালি রঙের চাঁপা নয় কিন্তু এগুলো, যাকে বলে কি না কনকচাঁপা—এগুলোর নাম হচ্ছে কাঁঠালি চাঁপা। কিন্তু গন্ধ দুর্দান্ত।.... ফুলবাগানটার কেয়ারি করা রাস্তা আছে কেমন—ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো দু'ধারে। ছোট্ট লাল সুরকির রাস্তা সব—কী চমৎকার!'

'তোমাদের বাড়ি ?'

'না, আমার এক কাকার।'

'তোমরা খুব বড়লোক তাহলে ?'

'কাকারা বড়লোক। বেজায় বড়লোক।...কাকা বড়লোক তো আমার কী!'

'তোমরা হচ্ছো রাজাগজা, বুঝেছি।'

'ঐ কাকা ভদ্রলোককে বলতে পারো। রাজা খেতাব আছে তাঁর—যুদ্ধের সময় ক' লাখ টাকা দিয়ে নাকি সরকার থেকে খেতাবটা পেয়েছেন। আর, গজা তো নিশ্চয়ই। পিলখানায় হাতী পিলপিল করছে—অতিকায় হাতী সব—একটার নাম তাদের মোহনপ্রসাদ। এত বড়ো তার দাঁত।'

'ঐ হলো। কাকা যদি রাজা হয়, ভাইপোও কিছু কম নয়। একই ঝাড়ের তুমিও ঐ রাজাগজাই।...বুঝলাম!' আমার প্রতি সে উপেক্ষার কটাক্ষ করে।

'কাকস্য পরিবেদনা। কী সম্পর্কের যে কাকা আমি জানিও না তা ঠিক। তবে রাজা না হলেও গজা তুমি বলতে পারো আমায় অবশ্যি। জিবে গজা। সেই জিবে গজাই আমি। যা ময়রার দোকানে গজায়, জিভে যার সোয়াদ পাই। কিন্তু তাই বা সব সময় পাচ্ছি কোথায়!'

'বোঝা গেছে।' আমার প্রতি তার কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব দেখা যায়। —'রাজা গজা না হলেও, তুমিও প্রায় তার কাছাকাছি।'

'তা হ্যাঁ, তার কাছাকাছি গেছি বটে আমি কয়েকবার। হ্যারিংটন স্ট্রীটের বাড়িতেও তাঁর থেকে এসেছি বার কয়েক। বাড়ির থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসতাম তো প্রায়ই, তখনই কিছুদিন কাটিয়েছি...সেখানে...'

'হ্যারিংটন স্ট্রীটেও তাঁর বাড়ি আছে আবার? বরানগরের গঙ্গার ধারে এত বড়ো একখানা থাকতেও?'

'হ্যাঁ, দশ নম্বর হ্যারিংটন স্ট্রীটে। আর কাশীপুরে রতনবাবু রোড ধরে গেলে, গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িটার কাছেই রতনবাবুর ঘাট। নড়ালের রাজা রতন রায়, নাম শুনেছ? তাদের ঘাটের পাশেই মড়াপোড়ানোর জায়গা। ছোটখাট শ্মশানের মতই। মাঝে মাঝে সেখানে মড়া পোড়ে—আর এমন বিচ্ছিরি গন্ধ বার হয় সেই সময়! সেই গন্ধ বাতাসে ভেসে কাশীপুরের বাড়িটায় আসে। সেই কারণেই উনি থাকেন-না সেখানে, কখনো থাকেননি। খালিই পড়ে আছে এমনি অত বড় বাড়ি।'

'কেউ থাকে না একেবারে!'

'দু'জন থাকে—এক দারোয়ান আর এক মালী। দারোয়ানটার নাম সীতারাম। বুড়ো দারোয়ান। তার সঙ্গে যা ভাব হয়েছিল আমার না! —সেই ছোটবেলায়! রোজ তাকে একখানা করে চিঠি লিখতাম আমি—বেশ লম্বা লম্বা চিঠি।'

'কী লিখতে?'

'কে জানে! মনেই পড়ে না এখন। যা মনে আসত, যা খুশি তাই লিখতাম। লিখে লিখে দিয়ে আসতাম। সে তো আর বাংলা জানে না। বলতে জানে, পড়তে পারে না তো তাই আবার তাকে পড়ে শুনিয়ে দিতে হত আমায়। চিঠিগুলো সব সে যত্ন করে জমিয়ে রেখেছে। বাড়ি নিয়ে যাবে, তার নাতিকে বাংলা শেখাবে বলেছে—সে তখন তাকে পড়ে শোনাবে, আবার দুঃখু করে বলত, তার তো ওই বাংলা শেখার বয়স নেই আর।'

'বা রে সীতারাম!' ছেলেটি উচ্ছ্বসিত হয়। 'লেখাপড়া না জানলেও, লেখানো পড়ানোর দিকে ঝোঁক আছে তার!'

'আর বাগানের মালী ছিল রহিম। শেখ রহিম। তার সঙ্গেও আমার ভাব ছিল খুব। তার মুর্গি ছিল একগাদা। কতো মুর্গির ডিম খাইয়েছে সে আমায়। বাগানের এক কোণে তার ছোট একখানা ঘর ছিল। সেখানে গেলেই সে ডিম ভেজে দিত। বাজারে বেচত না, বেচতে হতও না তাকে, রাজার কাছ থেকে মোটা বেতনই পেত সে বোধ হয়। আর নারকোল গাছের থেকে কচি ডাব পেড়ে এনে কেটে খেতে দিত আমায়। ওরকম ডাবের জল আমি কক্ষনো খাইনি।'

'সেই জন্যই ভাব হয়েছিল তোমাদের। ডাব পাতিয়ে ভাব।' বলে সে হাসে।

'ডাবের জন্য না ডিম!'

'রহিমের ভালোবাসাকে তুমি ডিম বলে উড়িয়ে দিচ্ছো?' তাকে যেন একটু ক্ষুণ্ণ দেখতে পাই।

'মোটেই তা দিচ্ছি না। বলছি যে, ভাবটা হয়েছিল তার ওই ডিম ভাজার জন্যেই—গাছের পাড়া ডাব আর মুর্গির পাড়া ডিম—দুয়ের জন্যই।'

'তাই বলো! যাই হোক, তোমার বন্ধু দুটি হয়েছিল মন্দ না। দারোয়ান সীতারাম আর বাগানের মালী শেখ রহিম!'

'ছোটবেলায় ঐ বয়সে এমন বন্ধু পাওয়া যায়? তুমিই বলো!'

'একেবারে স্বদেশী গানের মতই মিলে গেছল তোমার বরাতে। সেই যে, গানটায় আছে না—আমরা কতো গেয়েছি তো! ঐ গান গেয়েই জেলে গেছে কতো ছেলে!'

'কী গানটা? বন্দেমাতরম্? নাকি, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা? নাকি, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়...?'

'সেই যে, রাম রহিম না জুদা করো ভাই! দিলকো সাচ্চা রাখো জী। হাঁ জী হাঁ জী করতে রহো, দুনিয়াদারী দোখো জী! —তাই করেছো তোমরা রাম আর রহিমকে আলাদা করোনি, এক জায়গায় এনে রেখেছো।'

'আমি নাকি? এই ধন্যবাদ সেই কাকার প্রাপ্য। তিনিই তাঁর বাগান মন্দিরে ওদের দুজনকে এনে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'

'যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করে সে যেমন ধন্য, তেমনি তার যে পূজারী সেও কিছু কম নয়।'

'পূজারীটা আবার কে?'

'তুমিই তো! তুমিও কিছু নগণ্য নও।'

'আমার তো নিজের পেটপূজো। আমার যা ভালোবাসা আর ভাব তা হোলো ওই ডিম আর ডাব।'

'তাহলেও, যে কারণেই হোক, ভালোবাসাই তো? ভালোবাসা কি আর অকারণে হয়? আর রবিঠাকুর বলেছেন না, যার নাম ভালোবাসা তারই নাম পূজা এই রকম কী একটা কথা বলেছেন যেন কোথায়!'

'মোটেই বলেননি। আমার কাছে তুমি রবিঠাকুর কপচাতে এসো না! গুল মারতে এসো না আমার কাছে। রবিঠাকুর আমার গুলে খাওয়া। তিনি বলেছেন, মোরা ধরণীর নর, কথা পাবো কোথা? দেবতারে প্রিয় বলি, প্রিয়রে দেবতা॥ এই কথাই বলেছেন তিনি।'

কচ ও দেবযানীতে ওদের দুজনের মধ্যে এই কচকচিটা আছে, মনে করিয়ে দিই।

'ওই হলো। একই দাঁড়ালো কথাটা...এখন শুনি ভাব জমিয়ে তুমি কতো হাজার ডিম আর ডাব সাবাড় করেছিলে তার, তাই কও।'

'হাজার হাজার। আমি কি গুণে রেখেছি? পেটের মধ্যে গিয়ে জমেছে। আর পেট হচ্ছে গিয়ে খাবারের যমালয়, জানো তো? এমন একটা জায়গা, যা যাবে তাই হজম। আমার পেট অদ্ভুত। মা বলে যে, আমি নাকি একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস।'

'বলেন নাকি তোমার মা?'

'বলবেন না? আমি যে কী আমি নিজেই কি আর জানিনে? গোপালের ন্যায় সুবোধ বালকের মত যাহা পাই তাহা তো খাই-ই, তা ছাড়া যা আমার খাওয়া উচিত নয়, হয়ত উচিত নয়...এমন সব জিনিসও আমি খেয়েছি।'

'কী রকম? কী রকম?'

'এমন একটা জিনিস যা নাকি খেলেই পাওয়া যায়, আর পেলেই খাওয়া উচিত।'

'আহা, শুনিই না জিনিসটা।'

'শুনলে তোমার পিলে চমকে যাবে সে জিনিস সাত জন্মেও তুমি কল্পনা করতে পারো না। তোমার বয়সের কোনো ছেলে সে খাবার খেতে পায় না বা কদাচিৎ কোথাও কেউ হয়ত খেয়ে থাকতে পারে... যদি কেউ তাকে কখনো খাইয়ে থাকে...'

'কী জিনিসটা শুনিই না।'

'সে জিনিস হচ্ছে রিনির। বুঝে নাও এইতেই।'

'রিনিটা আবার কে? রিনির আবার কী জিনিস?'

'ওই তো! ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ বলে না? যে তা খায় সে তো ঋণীই হয়ে থাকে। হয় না? সেই ঋণীইর থেকে খাওয়া...'

'ঘি খাওয়ার কথা বলছো তো? সে আর কে না খেয়েছে ভাই!'

'ঘি বলো, মধু বলো, পঞ্চগব্য বলো। যা বলো তাই বলো। মোটের ওপর অমৃত। খেয়েছো অমৃত?'

'আলবৎ খেয়েছি, অমৃতি তো? মোটাসোটা সেই জিলিপি রসে টইটম্বুর। সেই জিনিস! তা অমৃতির দোকানদার অমনি দিলে কে না খায়? আমাদের পাড়ার দোকানদারটা ধারে দেয় না যে! ধার চাইলে ধরে মারতে আসে। তার ধারেকাছে ঘেঁষতেই দেয় না।'

'যাক গে ওকথা। তুমি গঙ্গার কথা বলছিলে না? আমি যেমন করে গঙ্গা দেখেছি তুমি তার একশো ভাগের একভাগও দ্যাখোনি ভাই। ওই রহিম না? গঙ্গার বুকে আমায় নিয়ে বজরা চালিয়েছে—বুঝলে?'

'বলো কি? বজরাও চালিয়েছ তুমি রহিমের সঙ্গে?' শুনে তো সে রীতিমতই অবাক: 'আটা না ছাতু?'

'আটা না ছাতু—তার মানে?' আমিও কম অবাক হই না—'বজরাই তো। আটা-ছাতুর কথা আসছে কেন?'

'বজরার আটাও হয়, ছাতুও হয় আবার। কোনটা চালিয়েছিলে তোমরা? অবাক করলে ভাই! বাঙালীর ছেলে ডালভাত চালাতেই হদ্দ হয়ে যায়, হিমসিম খায় তাই হজম করতেই। আর তুমি কিনা বজরাও চালিয়েছ তার ওপর। তোমার মা মিথ্যে কন না! সত্যিই তুমি নমস্য। তোমায় দণ্ডবৎ! তোমার ক্ষুরে ক্ষুরেই।' সে আমায় নমস্কার করে।

'আহা, সে বজরা কেন গো!' আমি যেন বজরাহত হই, বজ্রাহতর মতই কই—'তুমি কী হে। বজরা কাকে বলে তাও তুমি জানো না? দেবী চৌধুরাণী পড়োনি তুমি? বঙ্কিমবাবুর লেখা? তুমি কী একটা!'

'বঙ্কিমবাবু এখানে আসছে কোত্থেকে!' সে বঙ্কিম নেত্রে তাকায় আমার দিকে—'হচ্ছে গিয়ে বজরার কথা।'

'দেবী চৌধুরাণীর বজরা ছিল। গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িওয়ালা বড়লোক মাত্তরই থাকে। সেই বজরায় চেপে তারা গঙ্গার বুকে বেড়ায়। হাওয়া খায়। আমার কাকারও কাশীপুরের ঘাটে একটা বজরা বাঁধা আছে। বড়োসড়ো নৌকোর মতই হচ্ছে বজরা—তবে নৌকো ঠিক নয়কো। ছাদওয়ালা দু-তিনখানা ঘর আছে তার। ছোটখাট বাড়ির মতই বলা যায়। ভাসমান বাড়ি। রহিম সেই বজরায় আমায় নিয়ে বেড়াত গঙ্গায়। সেই কথাই বলছিলাম। বলছিলাম যে আমি যেমনতর গঙ্গা দেখেছি তা তুমি দ্যাখোনি। বলছিলাম তাই।'

'যাক্, দেখেছো গঙ্গা ? তাহলেই হলো। জন্ম সার্থক হয়েছে তোমার।' সে বলে : 'আমিও সেই গঙ্গা দেখতে যাবো পরশুদিন আমার জন্ম সার্থক করতেই।'

'এই যে বললে পরশুদিন তুমি জেলে যাচ্ছো আবার ?'

'আহা, জেলেই এখন গঙ্গা হে! সেখান দিয়েই গঙ্গা বইছে যে!'

'ও, গঙ্গার ধারেই বুঝি এই জেলখানাটা ? সেখান থেকেই গঙ্গা দেখা যায় বেশ ?'

'আহা, কী সে গঙ্গা, কী মহিমা তার! কেমন তার রূপ! আর কতো তার ঢেউ যে...! পাড়ে বসে ঢেউ গোনো—ঢেউয়ের পর ঢেউ—গুনে যাও না! আর কিনারায় তোমার পা ডুবিয়ে ঢেউ খাও তার। গঙ্গায় যদি ডুব দিতে হয়, দেশের জন্যে জেলে যাবার এই সময়।'

'আহা, জেল তো তোমার পড়েই রয়েছে, গঙ্গাও কিছু পালাচ্ছে না। দেশও পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও। যেতে চাও তো যাবে, গেলেই হোলো এক সময়। তার চেয়ে বরং পরশু বিকেলে চলো আমরা কোনো সিনেমায় যাই। এমন তাড়াটা কিসের জেলে যাবার ?'

'তাড়া নেই? তুমি বলো কী? কখন তিনি ছাড়া পান, চলে যান তার কিছু ঠিক আছে? শুনেছি সরকার বাহাদুর যে কোনো মুহূর্তে তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন।...চলে গেলে তো আর দেখা পাব না এ জীবনে। এমনটা করে পাব না তো।'

'কী সব আবোলতাবোল বকছো গো! দেশের জন্যে জেলে যাবে তো কী হয়েছে...!' আমার জেলে যাওয়া দেশের জন্য নয়, দাশের জন্যই। সি আর দাশকে দেখতেই। সি আর দাশই সেই গঙ্গা ভাই!'

॥ একচল্লিশ ॥

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে হাঁফ ছেড়েছি। বড্ডো বাঁচন বাঁচা গেছে আজ। ঘোড়ার ক্ষুরে মাথা মুড়োতে হয়নি আমায়।

মাথা বাঁচলে তো দেশের জন্য মাথা ঘামাব। মাথা খাটাবো আমার। দেশের জন্য নিজের মাথা দিতে পারব না কোনোদিন।

ঘোড়ার পায়ে মাথা দেবার কোনো মানে হয় না।

দেশোদ্ধার আমার মাথায় থাক, মাথাটা আগে বাঁচানো যাক। দেশের কাজ পড়েই আছে জীবনভোর। করলেই হবে এক সময়, দেশ কিছু কোথাও পালাচ্ছে না।

মুক্ত বায়ুর জন্য খোলা জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।...চিত্তরঞ্জন আমার মাথায় থাকুন বাবা!

স্বগতোক্তিটি অস্ফুট স্বরে ব্যক্ত হয়েছিল বুঝি, যে কিশোরটি জানালাটার কিনারায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, উঠে বসেছে আমার কথায়।

'কিছু বলছ নাকি আমাকে ?' শুধিয়েছে সে।

'তোমায় ? না তো। জায়গা খালি পেয়ে তার পাশটায় আমি বসলাম। 'তোমায় তো আমি চিনি না ভাই! কে তুমি ?'

'বাঃ, এই মাত্তর আমার নাম করলে! আমার নামই তো চিত্তরঞ্জন।'

'ও মা! তুমিও চিত্তরঞ্জন ? তাই নাকি ? চিত্তরঞ্জন এখন ঘরে ঘরেই নাকি ?' আমি হাসলাম—'ঘরে ঘরেই প্রবাহিত গঙ্গা! এক চিত্তরঞ্জনের জন্য একটু আগে প্রাণটা খোয়া যাচ্ছিল আমার। সেই কথাই বলছিলাম। তোমায় কিছু বলিনি। ....অচেনা একটা লোক

সোজা তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে দেখে খুব অবাক হয়েছ বুঝি ?'

'আমাদের বাড়ি কেন হবে ? পাবলিক লাইব্রেরি তো এটা।' বলল ছেলেটি, 'এখানে বই নিতে আসে সবাই।'

তাকিয়ে দেখি, তাই তো। লাইব্রেরিই তো বটে। অদূরে কাউন্টার ঘিরে লোকরা দাঁড়িয়ে—লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে বইয়ের আদান-প্রদানে তটস্থ। চারিধারে পাশাপাশি সাজানো যত আলমারি হাজারো বই ঠাসা।

'বাঃ! এখানেও একটা লাইব্রেরি! আরেকটা লাইব্রেরি এত কাছাকাছি রয়েছে জানতাম না তো!'

'সে কি! 'এমন নামজাদা রামমোহন লাইব্রেরির নাম তুমি শোনো নি ?' সে অবাক হয়।

'আমি শুধু হিরণ লাইব্রেরি আর চৈতন্য লাইব্রেরি জানি কেবল। ওদের একটার আমি মেম্বর। তুমি এই রামমোহনের মেম্বর বুঝি ?'

'না, ইস্কুল ছুটির পর আমি চলে আসি এখানে সটান। পছন্দমত বই নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পড়ি, তারপরে বাড়ি ফিরে যাই। পড়ার বই নিয়ে বসি তারপর। এখানে বসে পড়লে এরা এমনি বই দেয় পড়তে। কোনো কিছু দিতে হয় না, কি মেম্বর হতে হয় না। আমি এই জানালাটার আলসেয় শুয়ে শুয়ে পড়ি রোজ।

'কিন্তু এটা কি এই আলসেমির সময় ভাই ? দেশ আমাদের ডাকছে না এখন ?'

কথাটায় একজনের টনক নড়ে বুঝি। —'কী বললে খোকা ?' ভদ্রলোক লাইব্রেরিয়ানদেরই কেউ হবেন হয়ত, পাশের আলমারির বই ঘাঁটকাচ্ছিলেন, তিনিই পাড়লেন কথাটা ফস্ করে—'কোন ইস্কুলে পড় তুমি ?'

'আমি পড়িটড়ি না', তীব্র প্রতিবাদ করি—'তাছাড়া, আমি কোনো খোকা নই।'

'কী করো তুমি তাহলে ?'

'যা আমাদের করবার এখন। সবাই যা করছে। দেশের কাজ করি।'

'দেশের কাজ ?' ভদ্রলোকের মুখে বক্র হাসি দেখা যায়—'মুখ্যু হয়ে থেকে দেশের কাজ ? তা করা যায় নাকি ? আগে নিজেকে গড়া—তারপরই না দেশের মানুষের সকলের কাজ করা।'

'পড়াশুনা তো পড়েই আছে, দেশের কাজ কিছু পড়ে থাকতে পারে না।' আমি কই : 'কী বলেছেন মহাত্মাজী জানেন না ? এডুকেশন মে ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যানট। সব নেতাই তো সেই কথা বলছেন—বিপিন পাল, সুভাষ বোস, সি আর দাশ...।'

'থামো থামো! ওই নেতারা কি মুখ্যু নাকি! সবাই ওঁরা পণ্ডিত, রীতিমত পড়াশোনা করেছেন, তারপরেই কিনা দেশের কাজে নেমেছেন তাঁরা। তাঁদের মত হবার চেষ্টা করো আগে, তার পরে দেশের কাজ কোরো। এই বয়সে পড়াশুনা করাটাই তোমাদের কাজ এখন। কাজ করার উপযুক্ত হও, তারপর না কাজ করবে। যাও, এক্ষুনি ইস্কুলে ফিরে যাও, মন দিয়ে পড়োগে। যাঃ-ও!'

তিনি যেন মাছি তাড়ানোর মতই তাড়িয়ে দিতে চান আমায়।

আমার রাগ হয়ে যায়—'যান, পড়ব না আমি। আপনি কী করবেন আমার ? কী করতে পারেন আপনি ?'

'আমি আর কী করতে পারি। মুখ্যু হয়ে থাকবে, কষ্ট পাবে জীবনে, এই মাত্র বলতে পারি। জীবনে চারটি মাত্র বন্ধু, বুঝেছ ভাই? বিদ্যে, স্বাস্থ্য, টাকা আর ভগবান, হ্যাঁ, ঐ তোমার ভগবানও। এছাড়া আর কেউ কোত্থাও নেই কারো. সময়ে অসময়ে কেউ দেখার নেই ওরা ছাড়া। তাছাড়া এই কথাও আমি বলতে চাই, মুখ্যু হয়ে থেকে দেশের স্বাধীনতা আনা যায় না।' গড় গড় করে গড়িয়ে যান তিনি এক নিশ্বাসে—আর এত খারাপ লাগতে থাকে আমার যে! 'তাই যদি হতো ভাই, তাহলে তো আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই তো ওই নিরক্ষর। তাহলে দেশ স্বাধীন হয়ে যেত কোন্ কালে! হচ্ছে না কেন? এত গাধা থাকতে, বুঝেছ, এ দেশ কোনোদিন তা হবেও না।...'

'গাধা থাকতে যদি না হয়, তাহলে আপনার ঐ ঘোড়া থাকতেও দেশ স্বাধীন হবার নয়। যা সব ঘোড়া বাবা!' ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হয়।

'মাউন্টেড পুলিসদের কথা বলছ বুঝি? তাদের তাড়া খেয়েই পালিয়ে এসেছো এখানে?' শুনে তিনি হাসেন—'ও, তাই বলো? ওই অশ্বদের টেক্কা দেবার মতলবেই অশ্বতর হতে চাইছ তাই?'

'অশ্বতর?'

'ঘোড়ার চাট তো ওই ঘোড়াতেই সইতে পারে। ঘোড়াকে তাদের থোড়াই কেয়ার। অশ্বতর হলে তুমিও পারবে। চাই কি দেশের নেতাও হয়ে যেতে পারো কোনোদিন বা! পলিটিশিয়ানরা তাই তো—গাধাদের চালিয়ে চরিয়ে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। এক নম্বরের অশ্বতর না হলে কি তা পারা যায় নাকি? চরানো যায় তোমার মতন গাধাদের কখনো?'

বইখানা বার করে নিয়ে ভদ্রলোক কাউন্টারের দিকে চলে গেলেন।

'ভদ্রলোক তোমায় গাল দিয়ে গেল।' চিত্তরঞ্জন বলল—'ওই অশ্বতর বলল তোমাকে। শুদ্ধ বাংলায় বলল তাই, সাদা বাংলায় কথাটা ভাই মুখে আনা যায় না। আমি অন্তত আওড়াতে পারব না।'

'তোমায় বলতে হবে না। জানি আমি কথাটার মানে। খচ্চর বলেছেন ভদ্রলোক। উনি বললেই হবে? উনি বললেন আর আমি হয়ে গেলাম? গান্ধী চিত্তরঞ্জন সুভাষ বোস কি সবাই বুঝি তাই?'

'তাঁদের বলেননি তো? বলেছেন ঐ পলিটিসিয়ানদের। তাঁদের সঙ্গে এমন সব মতলববাজ ধড়িবাজ লোক আছে না? বাবাও তো বলেন এই কথাই। তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন উনি মনে হয়।'

'বলুন গে, আমার বয়ে গেল! উনি খচ্চর বললেই আমি খচ্চর হবো নাকি? আমি তো আর পলিটিসিয়ান হতে যাচ্ছিনে, চাচ্ছিও না তাই হতে?'

'ছেড়ে দাও ওঁর কথা। আমাদের বাড়ি একদিন বেড়াতে এসো, কেমন?' সার্কুলার রোডের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে সে বলল—'আমার নাম চিত্তরঞ্জন দে। চিত্ত চিত্ত বলে ডাক দেবে নীচের থেকে, নেমে আসব তক্ষুনি।'

'চিত্তরঞ্জন দে? তুমি কি দেবেন দে'র কেউ হও নাকি? এই—ভাইটাই?'

'কে দেবেন দে? চিনিওনে আমি তাকে।'

'না চিনলেও তার অনেক চিহ্ন রয়েছে কিন্তু তোমার চেহারায়—অনেক মিল পাচ্ছি তোমাদের। তোমার হাসিটা ঠিক তার মতই আর তেমনি জ্বলজ্বলে বড় বড় চোখ!

দেবেনের মতই তুমি দেদীপ্যমান, দেখছি কিনা।'

'তাই নাকি?' শুনে সে হাসে—'তাহলে আসছো তো রোববার?'

'আসবো একদিন পরে হয়ত কখনো। এই রবিবার কি করে হবে? এখন তো আমার জেলে যাবার পালা, ঐ দেবেন দে'র সঙ্গেই। আরেক চিত্তরঞ্জনকে দেখতেই, বুঝেছ?' আমি জানাই—'দেশবন্ধু এখন যে জেলে রয়েছেন জানো না?'

ভদ্রলোকটি ফিরে এলেন সেই আলমারির কাছে। আবার কোনো বইয়ের তাগিদেই বোধ হয়। আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন যেন—'সে কী! এখনো তুমি এখানে? যাওনিকো? এখনো এখানে বসে রয়েছো? না না, ইস্কুলে যেতে বলছিনে তোমায়। মীর্জাপুর পার্কেই যেতে বলছি গো! দেশ তোমায় ডাকছে না এখন? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—যাও। ঘোড়ার ভয়ে পিছিয়ে থাকলে কি চলে ভাই? ঘোড়া দেখে খোঁড়া হলে চলবে কেন?'

বক্রদৃষ্টির সঙ্গে তাঁর বাঁকা বাঁকা বুলি শুনতে হয়।

'যাবই তো, যাচ্ছি তো?' বলতে বলতে উঠে পড়ি—'চললাম তো? ঘোড়ার ভয় আমি করি নাকি মশাই? তাদের আমার থোড়াই কেয়ার!'

'আসতে হবে কিন্তু!' যাবার বেলায় পিছু ডাকে ছেলেটা—'মনে রেখো আমায়!'

ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসি নীচেয়। ঘোড়াটা দোর গোড়ায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই আর। না থাক, আমি আর বড় রাস্তা ধরছি না, ঘোড়াসঙ্কুল পথ ছেড়ে ঘোরালো পথে অলি গলি দিয়ে কেটে পড়ব গিয়ে সেই মীর্জাপুর স্কোয়ারে।

যেতে যেতে মনের মধ্যে ছেলেটির সাড়া পাই, তার ওই পিছু ডাকা—মনে রেখো আমাকে।

মনে তো রেখেছি অনেককেই। মনের মধ্যেই রয়েছে তারা। মনেই রাখা যায় কেবল—ফিরে আর চোখের দেখা হয় না তো তার সঙ্গে আর! সেই যে বাড়ির থেকে চুটকি কবিতাটা পাঠিয়েছিলাম না বিজলীতে—জানি জানি সবাই সবে ছাড়বে/চলার পথে কে আর কবে/কার বা চুমু কাড়বে!

আমার সারা জীবন যে ওই চুটকিই। তার মতই ছুটকো হয়ে ওঠা—সেই কবিতার টুকরোটার মতই টুকরো টুকরো টুটা ফুটা হয়ে ভেঙেচুরে যাওয়া!...'কারে বেঁধে রাখা নয়/কোথাও বন্দী থাকাও নয়/লেনা দেনা/যাক চুকে না/হোক ক্ষণিকের জয়!'

ভবিষ্যদ্বাণীর মতই এক বালকের কলমে যা একদা বেরিয়েছিল তাই বুঝি জীবনভোর সত্যি হয়ে দাঁড়ালো। তার কৈশোর জীবনে আজ তাই যথার্থ হয়ে উঠেছে।

মীর্জাপুর পার্কের অতো ভিড়ের ভেতর দেবেনের দেখা পেলে হয় এখন। ছেলেটি কিন্তু দেবেনের মতই দেখতে—একটু ছোট সাইজের এই যা। দীপশিখার মতই দপ্ দপ্ করে জ্বলছে তেমনি।

ওর বয়সের, বারো-চোদ্দর সব ছেলেই আলোর মতন অমনি ঝলকায়, আমি দেখেছি। অমনই ধারালো—অতই সপ্রতিভ। তারপরে যতই তারা বয়সে বাড়তে থাকে, পড়াশোনার চাপে কি সংসারের তাপে—কী জন্য যে কে জানে, কেমন করে কীরকমটা হয়ে যায় তারা দিনকের দিন! কালো হয়ে যায়, ভোঁতা হয়ে আসে, অকালে বুড়িয়ে যায় কেমন।

কেন এমনটা হয়? দেশ আমাদের পরাধীন বলেই নাকি?

দেশ স্বাধীন হলেই আমাদের সব দুঃখ দূর হবে। ছেলেদের দুঃখ, বড়দের দুঃখ, চাষী-মজুরের—সবার। জ্বলজ্বল করবে সারা জীবন।

সেদিন ধূমকেতুর পাতায় নজরুল ইসলামের কবিতাটা পড়ছিলাম না ? কারার ঐ লৌহকপাট/ ভেঙে ফেল কর রে লোপাট/রক্ত জমাট শিকলপূজার পাষাণ বেদী/ওরে ও পাগলা ঈশান/বাজা তোর প্রলয়বিষাণ/ধ্বংসনিশান/উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি ।...পড়লে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ওঠে না ?

ঐ জেলে গিয়েই জেলের শেকল ভাঙতে হবে আমাদের—বলছিল দেবেন।

সেও নজরুলের একটা কবিতার পদ আউড়েছিল তখন—এই শিকল পরা ছল আমাদের/শিকল পরা ছল।/ঐ শিকল পরেই শিকল তোদের করব যে বিকল !

কিন্তু জেলে যাওয়াও খুব সহজ নয়, বলছিল সে। জেলে একবার ঢুকলে যেমন তার থেকে বেরুনো বেজায় কঠিন, তেমনিই শক্ত নাকি ঐ জেলের মধ্যে ঢোকাটাও।

আমি শুধিয়েছিলাম, কেন, শক্তটা কিসের ? গেলেই তো হয় জেলে।'

'অত সোজা নয় ভাই !' বলেছিল সে। মাঝপথে ঘোড়ার এই বাধার কথাটা ভেবেই বলেছে নাকি ? —'আমি তিন তিনবার চেষ্টার পর তবে সাকসেসফুল হয়েছিলাম, জানো ?'

'কী রকম, শুনি তো ?'

'ধরে নিয়ে গেলেও তোমায় জেলে যেতে দেবে না। থানার থেকেই পত্রপাঠ ভাগিয়ে দেবে তোমাকে।'

'থানার থেকেই ? কেন হে ? সরকারের আইন ভেঙে গেছি। যেতে দেবে না ? আবদার নাকি ?' আমার প্রশ্ন : 'ল ইজ ল ? তা কি কখনো হ্ য ব র ল হয় !'

'হয়ই তো ভাই ! প্রথমেই ওরা তোমার নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে, কেয়ার অফ-এর কথা জানাতে হবে তোমাকে।'

'কেয়ার অফ-এর কথা ? কেয়ার অব আবার কি ?'

'সেই যে খামের ওপর ঠিকানায় লেখা থাকে না কে.। অ. অমুক ? বাবা কি কাকা কি কারো নাম গো ?' বলল দেবেন : 'তা আমায় যখন শুধালো তোমার নাম কি ? তুমি কার কেয়ার অফ। আমার নামটা ঠিক বলেছিলাম, কিন্তু বাবার নাম, কি বাড়ির ঠিকানা দিইনি। টের পেয়ে বাবা যদি আমায় ঠেঙায় তখন ? তাই মামার নাম-ঠিকানা দিয়েছিলাম আমি।'

'কী হলো তারপর ?'

'থানার থেকে পাহারাওলা পাঠিয়ে খবর দিয়েছিল মামাকে। মামা তক্ষুনি ছুটে এসে আমার হয়ে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল থানার থেকে আমায়।'

'মুচলেকাটা কী জিনিস ভাই ?'

'কী তা কে জানে ! হিন্দী কোনো কথা হয়তো।'

'ও বুঝেচি। মোচ লেখা ! মোচ মানে হচ্ছে গোঁফ। একজন বলেছিল আমাকে। তোমার ওই গোঁফটোফের মতই কিছু হবে হয়তো।'

'তাই হবে বোধ হয়। ছেড়ে দিল তো সেবার আমায়। তার পরদিনই আমি আবার ধরা দিলাম—সেবারও আমায় ভাগিয়ে দিল থানার থেকে। আমার দাড়ি গোঁফ কিছু বেরয়নি বলে—আমি নাকি নাবালক এই ছুতোয়। নাবালকদের জেলে নেয় না কিনা।'

'তোমার নাবালকত্ব তুমি জাহির করতে গেলে কেন ?'

'জাহির করতে হয় না। দারোগা গালে হাত বুলিয়ে দেখে নেয়...এমনি করে ভাই...' বলে সে গালে হাত দেয়। নিজের নয়, আমার গালেই।

'এটা কী হলো তোমার ?'

'একটু আদর করলাম আর কি। কেন, তুমি কি আদর করবার মত নও ?'

হেদোর দীঘির দীঘল আয়নায় ওর মুখের হাসি ভেসে ওঠে উছলে—দেখতে পাই। দেখে আমার চিত্তির জ্বলে যায়।

'বেশ, আমিও তোমায় একটু করি তা হলে। তুমিও তো আদর করার মতই।'

'উঃ!' আদরের ঠেলায় ককিয়ে ওঠে সে—'এই কি আদর করা নাকি ? এই তোমার আদর করার নমুনা ? আমি কোথায় আলতো করে একটুখানি ছুঁয়েছি মাত্র আর তুমি কিনা, উঃ!'

'যার যেমন টিপ্ ভাই!' আমার টিপ্পনি রাখি : 'আমার টিপসই ওই রকম! আনাড়ির মার তো!'

আনাড়ি আমি সত্যিই—এ বিষয়ে। এর আগে আর কোনো ছেলেকে এভাবে আমি আদর—করিনি রিনির বাইরে আর কাউকে না—এ পর্যন্ত। মিথ্যে বলিনি সত্যিই!

ইস্। এমন লেগেছে না আমার! তুমি যদি ভীমভবানী হতে না, তা হলে তোমার এই আদরের চোটে দাঁতগুলো আমার চুরমার হয়ে যেত। ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ত এতক্ষণ।'

'ভালোই হোতো তাহলে। ঝুরিভাজা আর খেতে হোতো না জীবনে তোমায়। দারোগা এর প্রতিশোধ দেবে তোমাকে থানায় : আমি শাপ দিচ্ছি। কড়াপড়া হাতে কষে এমন তোমায় টিপবে না...' শাপান্ত করে শান্তি পেয়ে সে শুধায় তারপরে—'থানায় তোমার নাম-ঠিকানা শুধালে কী জানাবে তুমি তখন, বলবেটা কী ?'

'ঠিক ঠিকই বলব, আবার কী ? বলব যে আমার কোনো ঠিকঠিকানা নেই মশাই ?'

'বললে তাই শুনবে নাকি ? পাগল আর বাউণ্ডুলে ছাড়া সেরকম কারো হয় না। তোমার নিজের না থাক, তোমার কেয়ার অফ-এর তো রয়েছে। কে তোমার কেয়ার অফ ?'

'কেয়ার অফ ফুটপাথ। তার নামও যা ঠিকানাও তাই—' ঐ এক কথায় আমি প্রকাশ করি—'ফুটপাতেই আমার বাড়ি আপাতত।'

'বেঁচে গেছ তাহলে। তোমার হয়ে মুচলেকা দেবার কেউ নেইকো আর।' তার স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে।'

'মুচলেকা দিতে হবে কেন আমাকে ? আমার মুচলেকা তো বেরিয়েই রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ না!'

'মুচলেকা বেরিয়ে আছে! সে আবার কী ?' সে অবাক।

'কেন, এই যে আমার মোচ!' আমার প্রদর্শনী দেখাই : 'আমার গোঁফের রেখা বেরিয়েছে যে দেখছ না ? চোখে পড়ছে না তোমার ? রোজ আমি আয়নায় দেখি যে। দাড়িটা বেরোয়নি এখনো এই আমার দুঃখু।'

'এই তোমার মুচলেকা ?'

'হ্যাঁ, এই তো! এ দেখলেই তারা আমার গালে হস্তক্ষেপ করবে না। ভাববে যে দাদা রয়েছে যে কালে, তার ভাইও আছে, গোঁফের ভাই ঐ দাড়িও রয়েছে কাছাকাছি। তোমার শাপ লাগবে না আর আমাকে।' আমি হেসে জানাই : 'দাড়ি বার করা ভারী শক্ত ভাই। গোঁফ নিজ গুণে দেখা দেয়, কিন্তু দাড়িকে অনেক তোয়াজ করে অর্জন করতে হয়। নিত্য কামাতে হয় তাকে ঐ টাকার মতই। রোজ কামালেই দাড়ি বেরোয় আর টাকা বাড়ে, বুঝেছ? তা, না থাকগে দাড়ি, গোঁফ তো আছে, সেই ঢের। এই গোঁফ জোড়াতে

দিলে চাড়া তোমার মতন অনেক পাবো।' ওঁর মুখের ওপর দ্বিজেন্দ্রলাল ছুঁড়ে হতবাক্ করে দি।

'গোঁফ না ডিম !' সে ভ্যাঙচায়।

'ডিমের মত হলেও তো বাঁচতুম! একটু একটু তা দিতে পারতুম তাহলে। সান্ত্বনা থাকত। মোচের ডিম ফেটে চিকেন গোঁফ বেরুতো একদিন ! তারপর তাই হয়ে উঠত HEN গোঁফ—এহেন গোঁফ ?'...

বলে আমার যে গোঁফ নাকি নেই তাই আমি চুমড়ে দেখাই।

দেবেনকে ভিড়ের ভেতর পেলে হয় এখন ! ভাবতে ভাবতে আঁকা-বাঁকা অলিগলি পেরিয়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছেছি।

ভিড় তখন আরো গভীর, জনতা আরো উত্তাল।

ঘোড়াদের দুর্জনতা আরো বেজায়। কিন্তু তাদের লম্ফঝম্প সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বড় রাস্তা ধরেই। ওদের ত্রিসীমায় কে যায় ? সে পথ না মাড়িয়ে আমি পার্কটার অন্য ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সে ধারেও ভিড় আছে। অনেকেই খাড়া, তবে সে ধারে একটু কম। কিন্তু ভেতরে সেঁধুবার জো নেই কোনো ধারেই, ঘোড়া না থাকলেও পাহারাওলারা চারধার ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি করে।

ছেলেরা সব পার্কের রেলিং টপকে টপকে ঢুকছে—কেউ আটকাচ্ছে না। পাহারাওলারা কোনো বাধা দিচ্ছে না। তাদের বাহুবেষ্টনী ভেদ করে চলে যাচ্ছে মাঝখানের সভায়। ভলান্টীয়ারদের ওপর তাদের কেমন যেন সহানুভূতি রয়েছে মনে হোলো। ঘোড়ার সোয়ারী গোরা সার্জেন্টদের মত নয়।

'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয় !' জয়ধ্বনি দিয়ে তারা পার্কের ভেতরে টপকে পড়ছে গিয়ে।

পশ্চিমা পাহারাওলারা বাধা দিচ্ছে না তাদের কাউকে। মনে হোলো সেই জয়ধ্বনির স্বরে তাদেরও ঠোঁট যেন নড়ে উঠছে একটু করে নিঃশব্দেই। নিঃশব্দে তারাও যেন আওড়াচ্ছে সেই কথাই। তারাও মনে মনে চাইছে ভারতের স্বাধীনতাই।

আমিও রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়াই। যা খাড়া রেলিং ! পারব টপকাতে ?

ওদিকের রেলিং টপকে কে একটা মেয়ে ভেতরে গেল না ? ফ্রকপরা মেয়ে একটা ? এই চোদ্দ-পনেরর মতন ?

একটা বাচ্চা মেয়ে টপকাতে পারে আর আমি পারব না ? সে জেলে যাবে আর আমি পিছিয়ে পড়ে থাকব পেছনে ?

আমিও টপকালাম। ছেঁচড়ে-মেচড়ে ঢুকলাম কোনো গতিকে।

ইস্ এক কড়ারও বাহুবল বিধাতা দেননি আমায় ! ভেতরে গিয়েই এক ছুটে সেই মেয়েটির মুখোমুখি গিয়ে পড়েছি।

দেখি ওমা ! এ কে ? রিনি নাকি ? কাছাকাছি হয়ে চিনি, হ্যাঁ, রিনিই তো। 'রিনি, তুমি এখানে ? তুই এখানে কী করছিস রিনি ? কী করতে এসেছিস তুই ?'

'ওমা, তুমি এসেছো এদ্দিনে ? পৌঁছেচ তাহলে ? যথাসময়ে যথাস্থানে ? কথা-কাহিনীর সেই উপগুপ্তর মত সেই যে—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত...?'

'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।' আমিও রবীন্দ্রনাথ আউড়ে ওর কথার উত্তোর গাই। 'তা, তুই এখেনে যে। কী জন্যে এসেছেস শুনি?

'তুমিও যেজন্যে আমিও ঠিক সেইজন্যেই। জেলে যেতে হবে না আমাদের এখন? এই দেশ স্বাধীন করবার যুদ্ধে মেয়েরা পিছিয়ে থাকবে নাকি? কী লিখেছিলাম তোমায়? অ্যাদ্দিন বাদে তুমি এলে। ...একবার তোরা মা বলিয়া ডাক/জগতজনের শ্রবণ জুড়াক/হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক /...। সঙ্গে সঙ্গে রিনি একবারে সুরধুনী।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

'কবে তোমায় লিখেছি চিঠি! সে কি আজকে?' বলছিল রিনি—'এত করে লিখলাম তোমায় যে চটপট চলে এসো কলকাতায়। দু'জনে মিলে দেশের কাজে লাগব—তোমার সঙ্গে একসাথে জেলে যাব, লিখিনি? তা, না তুমি এলে, না-দিলে চিঠির একখানা জবাব!'

রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলাম দু'জনায়।—'জবাব দেবো কি করে? তোর ঠিকানা জানলে তো?' আমার সাফ জবাব। 'কোনো ঠিকানা-মিকানা ছিলো নাকি তোর চিঠিতে?'

'জানতে না তুমি? চাঁচল ছাড়বার দিন তোমায় বলে আসিনি ঠিকানা? আহিরিটোলায় আমাদের বাড়ির ঠিকানা বলে আসিনি তোমাকে?'

'বলেছিলিস বটে, কিন্তু আমার মনে থাকলে তো?'

'এতো যদি তোমার ভুলো মন হয়, কি করে পরীক্ষা পাশ করবে গো?'

'করিনি তো পাশ। করব না তো! সব পরীক্ষার পাশ কাটিয়ে এসেছি আমি। দ্যাখ রিনি, তোদের মেয়েদের এই একটা বড্ডো দোষ। তোদের ধারণা তোদের মতন তোদের বাড়ির নম্বর-টম্বরও ছেলেদের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। আমি আরো অনেক মেয়ের দেখেছি এই রকম।'

'ক'টা মেয়ের দেখেছ এ রকম শুনি? ক'জনার সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছে গো?'

'এ পর্যন্ত একজনার সঙ্গেও না। আর ওইজন্যেই তো। আমার ভাগনি, সুশীলাদির মেয়ে প্রিসিলা, অন্নপ্রাশনের সময় তার নামকরণটা আমিই করেছিলাম। এইটুকুন মেয়ে। কিন্তু এই বয়সেই মেয়েদের সব দুর্লক্ষণ তার মধ্যে বর্তমান! তাদের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে চিঠি দিয়েছিল আমাকে। ঐ প্রথম চিঠিটাতেই যা ঠিকানা দেয়া ছিল—তারপর আর যত চিঠি লিখল তার কোনটাতেই কোনো ঠিকানা নেই। প্রথম চিঠিটা কি করে যে হারিয়ে গেল—তার কোনো চিঠিরই আর উত্তর দেওয়া হলো না তাই। কি করে হবে? সে বোধহয় ভেবেছিল প্রথমখানায় ঠিকানা দিয়েছি সেই ঢের—তারপর নিশ্চয় আমি তার মতন তার ঠিকানাটাও মুখস্থ করে ফেলেছি... আমার স্মৃতিপটে তার মতই আঁকা হয়ে রয়েছে।'

'তাকেও মুখস্থ করা হয়েছে বুঝি তোমার?' কেমনধারা চোখ করে সে তাকায়।

'বা রে! ভাগনি না আমার? ভাগনি কি আদরের জিনিস নয়? এইটুকুন তো।...সত্যি, তুই ভারী সন্দেহবাদী, দারুণ সন্দিগ্ধচেত্রী।'

'ঠিকানা মনে না রাখতে পারো তো তোমার ইতিহাসের পরীক্ষার বেলায় করতেটা কি? রাজা-বাদশা লাট-বেলাটের জন্ম-কর্মের সাল তারিখ লেখবার বেলাতে?'

'যারা মেমারি রাখে তাদেরই ওসব মুখস্থ থাকে। তারিখ-টারিখের কোনো উল্লেখ না করে আমি মন থেকে সব বানিয়ে দিতাম। সব রাজাগজা লাট-বেলাটের স্বভাবচরিত্র

কার্যাবলী প্রায় এক ধারার—সবাই হিতকর পরোপকারী প্রজারঞ্জক ইত্যাদি ইত্যাদি—কোনো ইতরবিশেষ নেই কারো। সাল তারিখ না দেওয়ার জন্য কিছুটা নম্বর কাটা যেত অবশ্যই কী আর করা? আরে, ইতিহাস পাশ করা তো সবচেয়ে সোজা রে।'

'বানিয়ে বানিয়ে লিখতে ইতিহাস।' সে হাসে—'সে একটা নতুন ইতিহাস হতো নিশ্চয়।'

'ইতিহাস তো সব মনগড়া ব্যাপার রে! যে কালে ওসব কাণ্ড ঘটেছিল সে সময় কি এখনকার কেউ থেকেছিল, দেখেছিল? সব ইতিহাসই তাই।'

'তোমায় বলেছে!' বলতে বলতে সভার মাঝখানে শোরগোল উঠল খুব। 'নেতা-টেতা এলেন বোধ হয়', বলল সে।

গান্ধীটুপি মাথায় বয়স্ক কয়েকজনকে আসতে দেখা গেল সভাস্থলে—তাঁদের ঘিরে জয়ধ্বনি হতে লাগল।

'কে জানে কে! আমি তো চিনি না সবাইকে।' আমি বলি—'এবার বোধ হচ্ছে শুরু হবে সভাটা। চল সবার মাঝখানে বসি গে।'

'দাঁড়াও না। এখন কী। এখনই কী। পুলিস পাকড়াবার সময় এলে তখন। ততক্ষণ গল্প করা যাক না!...বক্তৃতা শুনতে আসিনি, বক্তৃতা করতেও না। জেলে যাবার জন্যেই এসেছি তো!'

'জেলে যাওয়া অতো সোজা নয় মশাই! জেলের থেকে বার হওয়া যেমন শক্ত ব্যাপার, জেলের মধ্যে ঢোকাটাও তেমনই! একটা ছেলে বলছিল না আমায়...সে তো আজ...'

'বলতে হবে না কাউকে, আমার জানা। রিনি জানায় ক'দিন ধরেই তো চেষ্টা করছি আমি। কিছুতেই যেতে পারছি না। নিচ্ছেই না আমাকে। ধরবামাত্র ছাড়ছে, নয়ত থানায় নিয়ে গিয়ে-'

'কেন, ছেড়ে দিচ্ছে কেন তোকে?'

'মেয়েছেলে বলে, তাই। কেন, মেয়েরা কি মানুষ নয়? তাদের কি দেশ না? তারা কিছু করতে পারে না দেশের জন্যে?' বলতে বলতে সে উস্‌কে ওঠে—'ছেলেরা জেলে যাবে আর আমরা যেতে পাব না? আজও যদি না নেয় আমায় তো কাল আমি আসব আবার একেবারে ভোল পালটে—একটা ছেলে হয়ে, তুমি দেখো।'

'কি করে ছেলে হবি?' শুনে তো আমি হতবাক্‌—'তা হওয়া যায় নাকি কখনো?'

'ফ্রক খুলে হাফ প্যান্ট পরব, চুল কেটে ফেলব ছোট করে—এই লম্বা বিনুনি আমার ছেঁটে ফেলব দেখো না!'

'না না না!' আমি চেঁচিয়ে উঠি—'খবর্দার না, দেশের জন্য আর যা করিস কর, কিন্তু তোর নিজের কোনো অঙ্গহানি করতে দেবো না।'

ওর এক চুল এদিক-ওদিক হওয়াটা যেন আমি সইতে পারি না। ওর বেণীসংহারে আমার আপত্তি।

'দেশের জন্য এক চুল স্বার্থ ত্যাগ করতে পারো না এই তোমার দেশকে ভালোবাসা?' তার দু চোখ যেন জ্বলে ওঠে।

'আমার চুল হলে করতাম। আমি ন্যাড়া হয়ে যেতে পারি দেশের জন্যে। কিন্তু তোর চুলের স্বার্থ ত্যাগ করা আমার পক্ষে ভারী শক্ত। না, তুই ও কাজ করতে পাবিনে।'

'এখনো এ চুল তোমার হয়নি মশাই। আমার যা ইচ্ছে করব। তুমি কে বলবার?'

কথাটায় আমি একটু চোট খাই। মনে কেমন লাগে। ওর একচুলের তফাত আমার অসহ্য, আর ও কিনা এক কথায় আমায় সাত হাত সরিয়ে দিল। নস্যাৎ হয়ে গেলাম!

'তাহলেও তুই ধরা পড়ে যাবি হাজার চুল ছোট করে ছাঁটলেও। তুই যে মেয়ে তা একটুতেই টের পেয়ে যাবে সবাই।' আমি সেই একটুখানির প্রতি কটাক্ষ করে কই—'হাজার তুই চেষ্টা কর্ না, লুকোতে পারবি না কিছুতেই।'

'তাও আমি ভেবে রেখেছি।' আমার অপাঙ্গদৃষ্টি লক্ষ্য করে সে বলে—'বাবার কাছে ব্যাণ্ডেজ আছে না? তাই দিয়ে বেশ টাইট্ করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নেব, একাকার করে ফেলব দেখো না তুমি।'

'তাহলে আর দেখবার কী থাকবে। আমার মতে সেটাও ভালো হবে না। তবে তেমনটা হলে কেউ টের পাবে না হয়ত বা, কিন্তু সেটা কেবল ওই তোর পক্ষেই সম্ভব। তুই আর সব মেয়ের মত নয়তো ঠিক...তুই বোধ হয় তত বড় হোস্‌নি এখনো, নইলে আর সব মেয়েদের যেমন...যেমনটা কিনা... তোর এটা একটা খুঁতই হবে বোধ হয়।' 'একটুখানি আমার খুঁতখুঁতুনিই থেকে যায়।

রিনির ওই ইতরবিশেষ লক্ষ্য করেই আমার বলা। কিন্তু সেহেতু তার বিশেষ দুঃখ দেখা যায় না—'এই তো ভালো বেশ। তেমনটা হলে আমি ফ্রক পরতে পেতুম না আর দিদির মতন আমাকেও শাড়ি পরতে বাধ্য করত মা—অ্যাদ্দিনে আমার বিয়ে হয়ে যেতো তাহলে।'

'শাড়ি হলেই শ্বশুরবাড়ির সুখ থাকে কপালে? তাই বুঝি?' আমি বলি—সুখের সঙ্গে শাড়ি জড়ানো? তবে হ্যাঁ, জানি, শুকসারী বলে থাকে কথায়।'

'তবে তবে? এবার আমার দোসরা শ্বশুরবাড়ি আটকায় কে?' আমার সবিস্ময় দৃষ্টি দেখে সে কয়—'জেলখানাকে দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি বলে জানো না বুঝি?'

'তাহলেও এই বিয়ের যেমন বর নেই'—আমি প্রকাশ না করে পারি না—'তেমনি সেই শ্বশুরবাড়ির সুখও নেই তোর বরাতে। থানায় নিয়ে গিয়েই তোকে ছেড়ে দেবে আবার দেখিস।'

'কেন, ছাড়বে কেন? আমি তো আর মেয়ে নই, ছেলেই তো তখন।'

'ছেলে হলে কী হয়? ছেলেদের গালেও এমনি করে তারা হাত বুলিয়ে দ্যাখে...' আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করি—'এই ভাবে।'

পুনশ্চ বলি, 'দাড়ি বেরিয়েছে কিনা দেখে নেয়। আর না বেরুলেই তারা ছেলের সঙ্গেও ঐ মেয়ের মতই ব্যবহার করে থাকে। থানার বার করে দেয় ধরে।'

'দিলেই হোলো। আমার গায়ে...মানে, আমার গালে হাত দিতে দেব কেন তাদের?'

'তোর বাধা তারা মানছে কি না! পুলিশ কারো কথা শোনে! তবে কারো গালে হাত দেওয়াটা উচিত নয় তা বটে... বিশেষ করে গালের মতন গাল হলে। আমিই যে এখন একটু হাত বুলিয়ে নিলাম, সেটাই কি ঠিক হোলো নাকি? গাল হস্তক্ষেপের জায়গা নয় জানি, হাত হচ্ছে হাতাহাতির জন্য আর গাল হচ্ছে...গাল হচ্ছে গিয়ে...কিন্তু এখন এখানে তোর সঙ্গে গালাগালি করলে সেটা কি ভালো দেখাবে? বলবে কি লোকে!'

'রাখো! ...ঐ দ্যাখো, একজন আইন ভঙ্গ করছে...বেআইনি সভায় বক্তৃতা করতে উঠেছে দ্যাখো!'

গান্ধী টুপি-পরা লোকটা দু'একটা কথা বলতে না বলতেই একজন ইন্‌স্পেক্টর এসে তাকে

অ্যারেস্ট করেছে...তক্ষুনি উঠেছে আরেকজন...তাকেও তৎক্ষণাৎ। তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে 'বন্ধুগণ' পর্যন্ত সম্ভাষণ করতেই না, ধরা পড়ে গিয়েছে সেও। এরপর পরের পর একজন করে উঠে দাঁড়ায় আর ধরা পড়ে ধরা দিয়ে যায় পরম্পরায়।

ডজনখানেক ধরে ইনস্পেক্টর তাদের সভার বাইরে নিয়ে যায়, সেখানে পাহারাওলাদের জিম্মা করে দেয়। পুলিসরা একটা গন্ডীর ভেতর তাদের ঘিরে রাখে। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা বন্দেমাতরম্, গান্ধী মহারাজ কী জয়! দেশবন্ধু কি জয়। ইত্যাদি হাঁকতে থাকে।

এমনি করে মাথা মাথা জনাপঞ্চাশেককে পাকড়ে পার্কের বাইরে নেয়। সেখানে সারি সারি প্রিজনভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তার ভেতরে ভরতে থাকে। তারপরও সভায় বালখিল্য যারা বাকী ছিল তারাও মহাজন পদাঙ্ক অনুসরণে একে একে খাড়া হতে থাকে—ভারতের স্বাধীনতা চাই। মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়! ইত্যাদি বহুৎ বাগবিস্তার করলেও পুলিস তাদের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না। পালের গোদাদের পাকড়ে নিয়ে চলে যায়। সেদিনকার সভাটা সেখানেই সমাপ্ত।

'দূর। এ কী হলো। ধরলই না তো আমাদের...' রিনি বললে—'আইন ভাঙবার সুযোগই পেলাম না আমরা।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলাম কেবল...ধরা পড়লাম কোথায়?' আমিও আক্ষেপ করলাম।

'দাঁড়াও, চেষ্টাচরিত্র করে দেখা যাক-না। প্রিজনভ্যানে গিয়ে উঠে পড়ি না কেন? ফাঁক পেলেই উঠে পড়ব, কেমন?' রিনি পথপ্রদর্শন করে—আমরা প্রিজনভ্যানগুলোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই—'আমি আগে উঠব, বুঝলে? তুমি তার পরেই এসো।... আমি আগে, আমাকে যদি না নেয়, তুমি ধরা পড়তে যেয়ো না যেন। কেমন?'

'তুই না গেলে কিসের জন্যে যাবো শুনি? কোন্ সুখটা আছে আমার সেখানে? তোর বিহনে জেল তো আমার কাছে অন্ধকার! কে আছে সেখানে আমার?'

ওর পিছু পিছু আমিও প্রিজনভ্যানের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই। তটস্থ হয়ে থাকি দু'জনাই।

রিনি একটুখানি ফাঁক পেতেই না এগিয়ে প্রিজনভ্যানের হাতল ধরে টুক করে লাফিয়ে উঠে পড়ে কেউ বাধা দেবার আগেই।

এইবার দেবেনকে এগিয়ে আসতে দেখি।

এতক্ষণ তাকে দেখতেই পাইনি। রিনির আলোয় চারধার যেন অন্ধকার হয়ে ছিল, নজরে পড়েনি তাই আমার। এবার সে এগিয়ে এল।

এগিয়ে এসে একটু তাকে পিছিয়ে যেতে দেখলাম। একটু পিছিয়েই না, দৌড়ে এসে হাইজাম্প দিয়ে সে ভ্যানের ভেতরে গিয়ে পড়ে। বাঘরা শুনেছি এমনি করে নাকি লাফ মারার আগে একটুখানি পেছোয়।

আমিও তার পিছু পিছু গিয়ে হাতলটা পাকড়াই—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সামান্য বাহুবলে আমার কিছুতেই আর নিজেকে টেনে তুলতে পারি না। হাতল ধরে ভ্যানের দরজায় ঝুলতে থাকি। বৃথাই আমার জেলে যাওয়ার এই ভ্যানিটি—কেবলই আমার মনে হয়।

কাছেই একটা গোরা সার্জেন্ট দাঁড়িয়েছিল, সে না আমার পেছন থেকে এইসা এক শট্ মারলে না...!

তার সেই ধাক্কাতেই দরজা গলে ভ্যানের ভেতরে গিয়ে ছিটকে পড়েছি অবলীলায়। এই অযাচিত সাহায্যের জন্য সার্জেন্টকে 'থ্যাংকিউ' বলে যে ফিরে ধন্যবাদ জানাবো তার ফুরসত পাই না।

॥ তেতাল্লিশ ॥

সার্জেন্ট যা কিক্‌খানা ঝাড়ল না, আমি একবারে কর্নার! তার সেই এক শটেই আমার কর্নার হয়ে গেছে। দরজার গোল দিয়ে গলে ভ্যানটার কোণ ঘেঁষে গিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। নড়নচড়ন নেই, জবুথবুর মত পড়েই রইলাম তেমনি।

না, বেহুঁশ হইনি, তবুও কেমন আচ্ছন্নের মতন পড়ে রয়েছি অনেকক্ষণ।

মনে হচ্ছিল অনেকক্ষণ, কিন্তু তা হয়ত নয়, একটু বাদেই একজনের সবল বাহু আমাকে টেনে তুলে তার পাশে বসিয়ে দিয়েছে বোঝা গেল।

চেয়ে দেখি দেবেন।

'লেগেছে? লেগেছে খুব?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানাই—না। তেমনটা নয়।

'হাড়গোড় ভেঙে যায়নি তো?'

'কে জানে!'

'কে জানে—তার মানে? ভেঙে গেলে তো টের পাবে—ব্যথা করবে বেজায়। হাত-পায়ের কোথাও কোনো টনটন করছে না তোমার?'

মুখে বললাম বটে যে, না, কিন্তু যেহেতু হতজ্ঞান হইনি, মনের মধ্যে জ্ঞান টনটন করছিল বেশ।

ঘোড়ার চাট তো খেতে হয়নি আর, এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলাম। সামান্য এক জনবুলের চোটেই যদি এই হয় তা হলে ঐ সব অসামান্য অশ্বতমর পায়ের তলায় পড়লে কী দশাটাই না হত আজ আমার!

খুব বাঁচনটা বাঁচা গেছে আজকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি তাই ভেবেই।

আমি দেখেছি, এইভাবেই জীবনের দুঃখকষ্ট লাঘব করতে হয়, খেদ-বেদনা ভুলতে হয় সব। পায়ে কাঁটা ফুটলে ভাবতে হয় পা-টা কাটা পড়তেও তো পারত ট্রেনে কিংবা মোটরে। তাহলে কী হতো? একটু কাঁটার ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কাটানো গেছে।

এ ছাড়া আর দুঃখ ভোলার কোনো সূক্ষ্ম উপায় নেই।

স্থূল পথ আছে অবশ্যি। রাবড়ি।

এক ভাঁড় তাই নিয়ে চাখতে চাখতে চললে জীবনের যত জুলুম, যত না দাবড়ি পলকে ভোলা যায়। এমন কি, পথ-চলতি যে-শ্রীময়ীরা আশপাশ কাটিয়ে চকিতের দেখা দিয়ে অবলীলায় চলে যাচ্ছেন চিরদিনের মত, অচেনা থেকে শুধু স্মৃতিটুকু রেখে হারিয়ে গেলেন চিরকালের মত—একেবারেই, সে কষ্টও আর মনে তেমনটা লাগে না।

মিষ্টি জিনিসের কোনোটা অধর পথে সেঁধিয়ে হৃদয়ে গিয়ে জমে, কোনোটা আবার হৃদয় ভেদ করে উদরদেশে গিয়ে পৌঁছয়। তাই এক মিষ্ট বস্তু হারানোর মর্মভেদী দুঃখ ভুলতে হলে আরেক মিষ্টি দিয়ে তার মর্মান্তিকতায় গিয়ে শরণ নেওয়া, এক প্রিয়জনের বিরহে যেমন আরেকজনার প্রয়োজন। অন্য মিষ্টের দ্বারা অভাব মোচন না হলে তখন বিকল্প ওই মিষ্টান্নই!

জীবনের যত দুঃখ ভোলার মুখ্য উপায় সেই রাবড়ির ভাঁড়েই রয়েছে—অভাবনীয় ভাবে 'গতি ত্বং গতি ত্বং ত্বমেকা'—সেই ভবানী।

পাশে বসিয়ে দেবেন আমার হাত পা ঘাড় পিঠ কোমর সব টিপে টিপে দ্যাখে—লাগছে?'

'খুউব। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

'তা হলে তো ভেঙেছে হাড়।'

'না না না, ভাঙেনি কিছু, তবে এইবার যদি ভাঙে!' আমি বলি, ' যা জোর টিপছ—না! ঘোড়ার চাটে কেমন লাগে কে জানে। তবে তোমার টেপার চোটে তো আমি গেলাম। তুমি আমার এই পদসেবা না করলে বাঁচি ভাই!'

'আমার দেখাদেখি তুমিও হাইজাম্প দিয়ে উঠতে গিয়েছিলে বুঝি?'

হাইজাম্প ? হ্যাঁ,তাই বটে। তবে ঐ জাম্পটাই শুধু আমার, হাই তোলাটা অন্যজনের। তবে হ্যাঁ, তুমি যা হাইজাম্পটা দিলে না, দেখবার মতই! বাঘরা যেমন-না পিছিয়ে গিয়ে লাফ মারে সামনে—দেখিনি কখনো, কানেই শোনা, তোমার ঐ লাফানিটা প্রায় সেই রকমই হয়েছিল ভাই! তবে আমি—আমি কিন্তু তোমার লাফাবার বাঘে ছিলাম না, ছিলাম পালাবার বাগে! কিন্তু পালাতে পারলাম কোথায়!'

'পালাতে যাচ্ছিলে নাকি?'

'পারলুম কই। সামনে চুম্বকের টান ছিল না? সেটা আর কাটানো গেল না।'

'বুঝেছি! ঐ গঙ্গা! গঙ্গাই! দেশবন্ধুর আকর্ষণ!' সমঝদারের মত সে মাথা নাড়ে।

'না, তোমার সে-গঙ্গা নয় ভাই! আমার সুরধুনি ! কিন্তু...।'

কোথায় গেলেন উনি? এতক্ষণের পর আমি রিনির দিকে নজর দিই। কয়েদী গাড়ির সামনের বেঞ্চিতে আর সব ছেলের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে রিনি ভয়ে যেন শিঁটিয়ে কি রকম চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার ক'খানা হাড়ের শরীর নিয়ে সত্যিই আমার সর্বাঙ্গীণ সঠিক টিকে আছি কি না সেই সংশয়েই সে মুহ্যমান ছিল বুঝি।

তার দিকে তাকিয়ে আমায় এখন একটু হাসতে দেখে এতক্ষণে বুঝি স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল তার।

'তুমি রেলিং ডিঙিয়ে ঢোকার মুখেই তোমাকে আমি দেখেছিলাম', নীচু গলায় বলছিল দেবেন, 'কিন্তু তোমার বোনের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে আছো বলে আমি আর তোমায় ডিস্টার্ব করিনি।...'

'বোন?' শুনে আমার চমক লাগে।

'ওই তো সামনেই বসে!' সে ইঙ্গিতে দেখায়—'বোন না?'

'হ্যাঁ, বোনই বটে।' আমি বলি—'যখন ভাইফোঁটা দিয়েছে তখন বোনই তো।'

'মা-র পেটের বোন নয় বুঝি?'

'না। সহোদরা নয়, তবে সহৃদয়া বোন বলা যায় নিশ্চয়।'

বোনকে কনটেন্‌শনের ব্যাপার করে তুলে কথা আর না বাড়িয়ে ঐ একবাক্যেই আমার সেরে নেওয়া।

'সে আবার কী ভাই?...সে আবার কী রকম বোন?'

'কি রকমটা বলব? ঠিক তোমার ঐ গঙ্গার মতই। তুমি তো খালি দেশবন্ধুর মধ্যেই গঙ্গা দেখেছ কেবল? উনি হচ্ছেন মোহানা মুখের গঙ্গা—যেখানে মহাসাগরের সঙ্গে মিশে গিয়ে উনি উন্মুখর, উদার, উচ্ছল—তাঁর মহাসঙ্গীত শোনাচ্ছেন সবাইকে। তেমনি আবার গোমুখীর গঙ্গাও রয়েছে না? হরিপাদপদ্ম থেকে বিগলিত হয়ে যে গঙ্গা শিবের কেশস্পর্শ করে...অম্বর হইতে সমশতধারা জ্যোতিপ্রপাত তিমিরে—দ্বিজেন্দ্রলালের সে-ই যে, মনে পড়ছে ? সেও

এক গঙ্গা আবার। গো অর্থে অনেক কিছু—'বলেন বাবা—গো বলতে এই পৃথিবীকেও বোঝায়। ধরিত্রী মায়ের অন্তর থেকে উৎসারিত সেই করুণা—সেও তো ভাই ঐ গঙ্গাই—তোমার আমার মায়ের স্নেহধারার মতই নয় কি...'

'এ আবার কী কপ্‌চাচ্ছ এসব?'

'আমার মা'র কথাই। গঙ্গা শুধু দেশবন্ধুর মধ্যেই না, তোমার আমার সবার ভেতর দিয়েই সমানে বয়ে যাচ্ছে। উনি মোহানায় আছেন, মানে ঐ দেশবন্ধু—আর আমরা আছি গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে। কেউ গঙ্গোত্রীতে, যেমন আমার সন্ন্যাসী বাবা ছিলেন এক সময়, কেউ হরিদ্বারে, যেমন আমার মামা, কেউ কাশীর মনিকর্ণিকায় আমার অন্নপূর্ণার মত মা যেমনটা, কেউ বা আবার এই কালীঘাটে। যেমন ধরো এই আমরা।'

'হয়েছে। হয়েছে!' তত্ত্বকথায় আমার মস্ত হওয়া তার পছন্দ হয় না। তার বিরক্তি প্রকাশ পায়।

'তেমনি সেই এক গঙ্গারই ফের অনেক নাম।' আমিও সহজে ছাড়বার পাত্র নই; সুযোগ এলেই সুবিধা পেলেই মাকে আমার না জাহির করে যেন নিস্তার নেই। 'অলকানন্দা, জাহ্নবী, পদ্মা, ভাগীরথী—কত কী! আবার যার টানে রসাতলে যেতে হয়, ভূতলের সেই ভোগবতীও বলতে গেলে প্রকৃতরূপে গঙ্গাই। গঙ্গা, মানে হচ্ছে ভালোবাসা। আমাদের ভালোবাসাই আসলে গঙ্গা।'

'জানি জানি। তোমাকে আর অত ব্যাখ্যান করতে হবে না।' সে অধৈর্য হয়।

'কিচ্ছু জানো না। কী করে জানবে? এ সব মা'র কাছ থেকেই তো জানা যায়। কোনো বইয়ে মেলে না। তোমার মা কি বলেছেন তোমায়? তিনি না জানিয়ে থাকলে জানবে কোথা থেকে শুনি? গঙ্গার আবার কতো না ধারা—তা জানো? কত যে সঙ্গম। ধারণা করতে পারো?'

'গঙ্গাসাগর সঙ্গম কে না জানে বাবা!'

'গঙ্গা মানে তো ভালোবাসাই? কিন্তু ভালোবাসা আবার কত রকমের হয় যে। মনের ভালোবাসা, প্রাণের ভালোবাসা, দেহের ভালোবাসা—ভাগীরথী, যমুনা, সরস্বতী—এই ত্রিধারায় মিলেই না সেই ত্রিবেণীসঙ্গম। তার খবর রাখো?'

'সবাই রাখে। হাওড়া লাইনের হুগলি জেলায় বাঁশবেড়ে পেরিয়ে খানিকটা গেলেই সেই ত্রিবেণী। আমরা একবার চড়ুইভাতিও করে এসেছি সেখেন থেকে। আবার গয়া প্রয়াগ পার হয়ে এলাহাবাদের কাছেও বোধ হয় আরেক ত্রিবেণী আছে।'

'আরো আছে, আরো আছে। আরো ওপরে, আরো ওপরে—গঙ্গোত্রীর পথে। জলধর সেনের হিমালয় পড়ে দেখো। আবার আমাদের সবার মধ্যেও রয়েছে সেই ত্রিবেণী—পরস্পরের সম্পর্কে এসে দেহমনপ্রাণের ভালোবাসা মিলেমিশে সেও এক ত্রিবেণী। পরস্পরের জীবনধারার সঙ্গমে ত্রিবেণী হয়ে ওঠা।'

'আর তোমার ওই সাগরসঙ্গম?'

'সেও ঐ ভালোবাসাই—আরো বিপুল, আরো বিরাট। ভগবানের প্রতি ভালোবাসা হলে সেটাই হলো সাগরসঙ্গম—সে কি সবার হয় নাকি? সে শুধু তোমার ঐ চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ আর পরমহংসদেবেরই হয়েছে। আমার তো কালীঘাটের গঙ্গা—আমাদের জল কাদাগোলা ঘোলাটে। খালকাটা কালীগঙ্গার সেই ঘোলা জলেই স্নান সারতে গিয়ে খালি নাকানিচুবানি খাওয়া আমাদের।'

'ঘোল খাওয়া আর কি!' সে হাসে—'ঘোল খাওয়ানোও বলা যায়। আমাদের ভালোবাসাটাই হচ্ছে তাই। ঘোল খাও আর খাওয়াও।'

'তবে কারো কারো বরাতে কি আর ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটে না?'

'ঘটে বোধ হয়।' চাপা গলায় কথাটা সে কয় রিনির দিকে আড়াআড়ি কটাক্ষে চেয়ে—'কিন্তু দুটো বেণীই তো দেখছি মেয়েটার। বুকের দু-দিকে এসে পড়েছে।... আরেকটা মানে তোমার ত্রিবেণীর তৃতীয় বেণীটা বোধ হয় ওধারে ঝুলছে। তোমার বোন যখন, ত্রিবেণী না বলে ত্রিবোনী বলাই ভালো।'

'বোন আর কোথায় ও? গঙ্গার ঢেউ খেয়ে খেয়ে বোনটোন সব ধুয়েমুছে গিয়ে বন্ধুই বলা যায় এখন।' মনে মনে বলি—ওর কাছে যতই ঋণী হই না, রিনি আমার বন্ধুই। বোনও আবার সে আমার।

পাশাপাশি সার বেঁধে দাঁড়ানো সব ক'টা কয়েদী-গাড়িই ভর্তি হয়ে উঠল একে একে—লোহার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখে যাচ্ছি আমরা।

বোঝাই হবার পর গাড়িগুলো ছাড়তে লাগল একটার পর একটা। কোমরের বেল্টে রিভলবার বাঁধা, বেটন হাতে একজন করে সার্জেন ঢুকছিল গাড়ির ভেতরে আর একটা করে খাড়া থাকছিল বাইরের পা-দানিটায়।

আমাদের গাড়িটাও ভরে গিয়েছিল, সবগুলো ছেড়ে যাবার পর এটাও ছাড়ল শেষটায়।

বেটন হাতে সার্জেনটা ভেতরে এসে সেঁধুতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছেড়ে দিল প্রিজন ভ্যান। ছুটল ভোঁক ভোঁক করে।

গাড়িটা ছাড়তেই আমার এ-পাশের ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠেছে—মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

অমনি সেই সার্জেনটা রুলের এক গুঁতো বসিয়ে দিয়েছে তার পেটে—আর সে কোঁক করে উঠে কুঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নিজের হাঁটুর ওপরে।

তারপরই দেবেন ও-পাশ থেকে চেঁচাতে গেছে—'বন্...'

অমনি তার হাঁটুর ওপর এমন এক চিমটি কেটেছি না আমি—যার নাম রামচিমটি! চীৎকারটা তার বন্ করে উঠে গিয়েছে মাথায়! বন্দে মাতরম্-এর ছন্দপতন হয়ে গেছে তার। সূত্রপাতেই বন্ধ!

সেও একটা শ্রীরাম চিমটি বসায়—'ভীতুর ডিম কোথাকার!' চাপা গলায় সে আওড়ায়।

'এখানে আর টুঁ শব্দটিও না!' হাঁটুতে হাত বোলাতে বোলাতে সেই গলাতেই আমার জবাব 'জানো না? পড়েছ মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে।...এখানে কোনো গোল পাকিয়ো না আর।'

রিনির দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা আঙুল নিজের ঠোঁটে চেপে রয়েছে। নীরবে একই অনুপ্রেরণাই দিচ্ছিল সে আমায়।

পাশের ছেলেটা তেমনি কুঁকড়ে পড়ে আছে—নড়ছে চড়ছে না একদম। যতক্ষণ গাড়িটা চলল সেই রকমই পড়ে রইল সে। মাথা তুলতে পারল না আর।

থানায় গিয়ে গাড়িটা খাড়া হতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। প্রথম ছেলেটা লাফ দিয়ে নীচে নেমেই হাঁকল—বন্দে মাতরম।

সেই সার্জেনটা তক্ষুনি তার মাথায় মেরেছে বেটনের বাড়ি।

মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ছেলেটা। শুয়ে শুয়েই চেঁচাচ্ছে আবার—'বন্দেমাতরম'। বন্দে...'

এগোতে পারেনি আর সে। আওয়াজের সঙ্গেই সার্জেনটা তার পেটে মেরেছে বুটের এক ঠোক্কর।

কোঁক করে উঠেছে ছেলেটা! আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই তার—অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধ হয়। মাথার ফাটল দিয়ে রক্তের ফিনকি বেরিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে তার জামাকাপড়। রক্তে ভেসে গিয়েছে জায়গাটা।

'মারা গেল নাকি ও?' রিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে সভয়ে শুধোয়।

'বুটের চোটে তো পিলে ফেটে মারা যায় শুনেছি—কতো লোক ওদের বুটের ঘায়ে মারা গেছে ওরকম।'

'কী হয়েছে ওর কে জানে!' রিনি কাঁদো কাঁদো হয়ে কয়ঃ 'ভাগ্যিস, তুমি আমার কথাটা রেখেছিলে, চেঁচাতে যাওনি। তা হলে তোমারো ঠিক ওই দশাটাই হতো।' বলে সকৃতজ্ঞ নেত্রে সে আমার দিকে তাকায়।

তার কথা রেখে আমি যেন তাকে কত কৃতার্থ না করেছি!

প্রায় ওই দশাই হয়েছিল আমারও...গাড়িতে ওঠবার মুখটাতেই। সে কথাটা ওর কাছে আর প্রকাশ করি না।

ভাগ্যিস, আমার পিঠের দিকে পিলে ছিল না, (কারোরই থাকে না বোধকরি)। তা হলে গোরার ওই সবুট পদাঘাতের পর এতক্ষণ আর আমায় এমন অটুট থাকতে হত না। সেই ঠোক্করেই টক্ করে বৈতরণী পার হয়ে যেতাম।

রিনির সশঙ্ক নেত্রের মিনতি রেখে সেদিন ওকে যত না কৃতার্থ করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি চরিতার্থ হয়েছি আমি—টের পাচ্ছি আজ। সেদিনকার সেই রুলের গুঁতো উদরসাৎ করলে আজ আর এই চরিত-কাহিনী লিখতে হত না আমায়—এ বাবদে দক্ষিণার অর্থটাও মাঠে-মারা যেত, আমার মতই প্রায়। সবদিক খতিয়ে দেখলে সেদিন আমি খরচ হয়ে গেলে কোনোভাবেই তার কিছুমাত্র ক্ষতিপূরণ ছিল না।

সবাই আমরা নেমে এসেছি ভ্যানটা থেকে। আমার পাশের সেই ছেলেটি কিন্তু তেমনি কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে। নড়ছে-চড়ছে না।

দেবেন এবং আরো দুজন ছেলে উঠে গিয়ে ধরাধরি করে তাকে নামিয়ে আনল ভ্যানের থেকে। রাখল এনে থানার চত্বরে।

সে বেচারীও চৈতন্য হারিয়েছে। কোনো হুঁশ নেই তারও।

থানার ও-সি বেরিয়ে এলেন থানার ভেতর থেকে তক্ষুনি। আমাদের সবার দিকে তাকালেন একবার। বেহুঁশ ছেলে দুটির দিকেও দৃষ্টি গেল তাঁর। এক পাহারাঅলাকে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে বললেন।

একটু বাদেই একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে তাদের দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

থানার একটা ঘরে গিয়ে আমরা জমা হলাম সবাই। বাড়িটার সামনে একটা পার্ক আছে নজরে পড়ল। ছোটখাট পার্কটা। সেন্ট জেম্‌স স্কোয়ার, বলতে শুনলাম একজনকে।

মুচিপাড়া থানায় নিয়ে এসেছে আমাদের, সে জানালো।

ঘরজুড়ে আমরা গুলতানি পাকাচ্ছি সবাই মিলে।

রিনি আর আমি একধারটিতে বসে গল্প করছিলাম। দেবেনও ছিল কাছাকাছি।

একেকজনকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল পাশের ঘরে, ও-সির কাছে। যে যাচ্ছিল সে আর ফিরে আসছিল না।

তারপর ডাক পড়ছিল আরেকজনের।

'ফিরছে না কেন ওরা ? গালে হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে নাকি ? না, কী করছে কে জানে!' আমার আশঙ্কা প্রকাশ পায়।

না-না-। নামধাম জিজ্ঞেস করে লক-আপ্-এ নিয়ে পুরছে। সেখানে আমাদের সবাইকেই পুরবে, দ্যাখো না।'

'লক্-আপ্টা কী ব্যাপার ভাই?'

'থানার হাজত বলে না ? তাই।' দেবেন বলে, 'সারা রাত আজ হাজতবাস আমাদের। কাল সকালে দশটার সময় সবাইকে প্রিজন্ ভ্যানে করে ব্যাংশাল কোর্টে হাজির করবে। সেখান থেকে একেবারে সটান জেলখানায়।'

'আমি ফ্রক না পরে শাড়ি পরে এলে বোধ হয় ভালো করতাম।' রিনি বলল মাঝখান থেকে।

'কেন, এ কথা বলছিস কেন?'

'বড় দেখাত আমায়। শাড়ি পরলে মেয়েদের বড়সড় দেখায় না? তা হলে আর ওরা বয়েস টের পেত না আমার...ছাড়া পেতুম না...ছেড়ে দিতে পারত না আমাকে।'

'তা বটে! এমনিতেই তো মেয়েদের বয়েস টের পাওয়া যায় না! শাড়ি পরলে তো আরও।' তার কথায় আমি সায় দিই।

'ফ্রক পরলে কেমন বাচ্চা বাচ্চা দেখায় না? খুকী ভেবে আমায় ছেড়ে দেয় যদি' শাড়ি পরলে আমি নিজেকে চব্বিশ বলে চালিয়ে দিতে পারি অনায়াসেই।'

'মেয়ে বলেই তোমায় ছেড়ে দেবে ওরা, খুকী বলে নয়।' দেবেন তাকে কয়।

'তা হলে আমি দেখে নেব...কালকেই দেখে নেব ওদের...।' বলতে বলতে তারও ডাক এসে গেল।

সেও পাশের ঘরে চলে গেল। সেও ফিরল না তারপর আর।

'লক-আপেই পুরেছে। ছেড়ে দিলে সে নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করে যেত। যেত না? এ ঘরে তার আসার তো বাধা ছিল না কোনো।'

দেবেন আমায় ভরসা দেয় বটে, কিন্তু তার কথায় আমি কোনই সান্ত্বনা পাই না। এবারও রিনি তার ঠিক ঠিকানাটা দিয়ে যায়নি। কে জানে সে আবার আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল কি না। এবারে একেবারে চিরদিনের মতই হয়ত বা।

মুচিপাড়া থানার থেকে আমরা সেই রাত্রেই লালবাজারের হেডকোয়ার্টারে রপ্তানি হয়ে গেলাম।

প্রিজন্ ভ্যানে উঠে আমি দেবেনকে বলি, 'রিনি কোথায়? সে তো কই নেই আমাদের সঙ্গে এই ভ্যানে?'

'একটাই ভ্যান ছিল নাকি? পাঁচ পাঁচটা ভ্যানে করে এলাম না আমরা? সেই পার্কের থেকে? আর কোনো ভ্যানে তাকে তুলে দিয়েছে। ঠিকই রয়েছে সে।'

আহা, তাই যেন হয় গো। মনে মনে বলি। তাই ভেবে ভরসা পেতে চাই নিজের মনে।

কিন্তু না, লালবাজার লক-আপ-এ গিয়ে যখন আমরা নামলাম, সেখানেও দেখা গেল না রিনিকে।

'তুমি যে বললে, সে আমাদের সঙ্গে এসেছে? কোথায় সে?' শুধাই আমি দেবেনকে।

'আলাদা ঘরে তাকে রেখেছে।' জবাব পাই দেবেনের—'মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে রাখে নাকি কখনো? বিশেষ করে এই রাত্তির বেলায়!'

'রাখে না? কেন রাখে না? কী হয় রাখলে?'

'কী হয় কে জানে! কেন রাখে না তা কে বলবে! তবে রাখতে নেই নাকি। রাখে না যে তাই জানি।'

রিনিকে এখানে রাখলে, আমাদের সঙ্গে থাকলে কী যে ওর ক্ষতি হ'ত আমি তো তা ভেবে পাই না। এমন বিচ্ছিরি লাগে আমার যে!....জেলে যাওয়াটাই যেন কেমন ব্যর্থ বলে মনে হতে থাকে।

যে জেলখানা স্বর্গোদ্যানের ন্যায় চোখের সামনে উদ্ভাসিত ছিল, তা যেন পলকের মধ্যে অশোকবনের মত নির্বাসিত হয়ে যায়। সব আলো যেন নিবে যায় এক লহমায়।

লালবাজারের হাজতঘরে পৌঁছনোর পরে আমরা চা আর টোস্ট পেলাম। দেবেন বলল, রাত্রের মত এই যা খেলে। এর পর হরিমটর! এসো এখন শুয়ে পড়া যাক আরাম করে—কী বলো?'

সকালে উঠে আবার আমরা সেই এক কাপ চা আর খান দুই টোস্ট পেলাম।

কিন্তু রাতউপোসী খিদে কি তাতে বাগ মানে? পেট চুঁই চুঁই করতে লাগল আমার।

'আর কিছু খেতে দেবে না এরা? একদম্ না?' আমি কুঁই কুঁই করি—'আবার কখন খেতে দেবে তাহলে?'

'এখানে বোধ হয় আর নয়।' দেবেন কয়, 'দুপুরে টিফিনের সময় সেই আদালতের লক্ আপ- এই যা চা টোস্ট দেবে হয়ত—এই রকম আবার। সেখান থেকে জেলে নিয়ে যাবার পর সেইখানেই মিলবে ভরপেট খাবার। ডাল রুটি তরকারি—বেশ মোটা মোটা রুটি, পাতলা পাতলা ডাল আর জংলী যত তরকারি। সন্ধ্যের আগেই খেতে দেবে সবাইকে। খাইয়েই ঢুকিয়ে দেবে যার যার সেলে।'

'সেই সন্ধ্যের সময়?' শুনেই আমি মুষড়ে যাই। তার কথাটা কেমন যেন খট্ করে কানে লাগে—খট্‌কাটা লেগেই থাকে।

'জংলী তরকারিটা কী ভাই?' উস্‌কে উঠি আমি তার পরেই। জানতে চাই।

'বনজঙ্গল কেটে বানানো। পাড়াগাঁর ঝোপঝাড়ে যে সব কাঁটা গাছফাছ আর আগাছা গজায় না? তাই সব কেটে ছেঁটে নিয়ে আসে কোত্থেকে। তারই জগাখিচুড়ি করে দারুণ এক ঘ্যাঁট বানায়। যত খুশী খাও—যত চাও। এন্‌তার দেবে।'

কি রকম খেতে?'

'ওই একরকম।' সে বলে—'রোজই ওই একরকম। রোজ বিকেলেই ওই রুটি তরকারি। সকালে ঘুম থেকে উঠে অবশ্যি কিন্তু অন্য রকম—গাদাখানেক লপ্‌সি দেবে তোমায়—মুখ ফেরাতে পারবে তখন। খাও না কষে যত খুশি। পেটভর্তি পাবে তোমার।'

লপ্‌সিটা কী জাতীয়? কি রকম আবার?'

'ডালে চালে মেশানো ঘন্টের মতন।'

'ও! খিচুড়ি! তাই বলো না! সে তো খেতে ভালোই হে! খাসা! উপাদেয়!'

'খাসা ? হ্যাঁ, খাসাই বটে।' দেবেনের দ্বিমত দেখি না—'সকালে খিদে পেটে খেতে মন্দ লাগে না বলতে কি।'

'রোজ দেয় ? ঐ লপ্‌সি—রোজ রোজ ?'

'রোজ রোজ।' সে বলে—'কিন্তু সে ওই সকাল বেলাতেই কেবল।'

'তবে তো ভালো। খুবই ভালো তা হলে।' এতক্ষণে আমি উৎসাহ পাই, লালায়িত হয়ে উঠি—'সকালবেলাতেই আমি অনেকখানি করে নিয়ে রাখব। আর সারাদিন ধরে খাব—একটু একটু করে—যখনই আমার খিদে লাগবে। ওই লপ্‌সিই তো আমি মল্লিকবাড়ির সদাব্রতে খাই হে। সেখানকার ভাণ্ডারায় তাই তো দেয়!'

লপ্‌সির কথায় মল্লিকবাড়ির স্মরণে খিদেটা যেন চাগাড় দিয়ে উঠল আরো। পেটের ভেতর ছুরি মারতে লাগল কেমন!....এমন সময় অভাবনীয় এক আবির্ভাব!....

জনকতক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক চাঙ্গারি চাঙ্গারি পুরি কচুরি লাড্ডু চাপাটি প্যাড়া বরফি হালুয়া বালুসাই নিয়ে হাজির, আমাদের সবাইকে খাওয়াবার জন্যই। অযাচিত অভাবিত আমন্ত্রণ!

'আরে! এ লোকগুলো যে আমাদের চেনা রে।' দেবেন চেঁচিয়ে উঠেছে আচম্‌কা।

'চেনা কি রকম?' আমি জানতে চাই—'আমি তো কস্মিনকালেও দেখিনি কাউকে এদের।'

'আমি দেখেছি। অনেক অনেক দিন দেখেছি। এরা সব বড়বাজারের মাড়োয়ারি পট্টির মারাঠী গুজরাটি ব্যাপারী যত। বিলিতি কাপড় বিক্রি করে এরা সবাই। বড়বাজারে দিনের পর দিন এদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করেছি আমরা। কোনো খদ্দেরকে কিনতে দিইনি কিছু, ঢুকতেই দিইনি দোকানে—এদের চিনব না ?'

'বলো কী হে ?'

'এরাও চিনে রেখেছে আমাদের। ভালো করেই চিনে রেখেছে। কত দিন আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছি—এরা সব চিনে রাখছে আমাদের, লক্ষ্য করছিস ? এদের যা ক্ষতি করছি না আমরা ? কোনদিন গুন্ডা লেলিয়ে দেবে আমাদের পেছনে। গুমখুন করবে আমাদের। মওকা পেলেই হয়ত বা খতম করে দেবে আমাদের দেখিস্।' আড়ালে আবডালে অলিগলিতে সেই সব গুন্ডারা বেটপকা পেলে বেমক্কা মার লাগাবে আমাদের।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তাই আমাদের ধারণা হয়েছিল। যাদের আমরা লাখ লাখ টাকার লোকসান করেছি তারাই আজ খাবার নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছে আমাদের! আশ্চর্য!'

'মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য!' এই বলে অম্লানবদনে তাদের পুরি কচুরি মুখের মধ্যে পুরতে থাকি আমরা।

খেয়েদেয়ে হাঁক ছাড়ি —'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!'

খাইয়ে দাইয়ে খুশী হয়ে হাসি মুখে চলে যায় তারা সবাই।

লক্‌আপের পাহারাওলারাও মৃদু স্বরে আমাদের জয়ধ্বনিতে যোগ দিয়েছে। আমাদের পুরি কচুরির ভাগ তারাও পেয়েছিল কিছু কিঞ্চিৎ। সেখানকার ঝাড়ুদাররাও বঞ্চিত হয়নি।

ভাগ্য কারো একলার নয়, একজনের জন্য প্রসন্ন হয় না—বলতেন মা। সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয় বলেই তার নাম ভাগ্য। ভাগের যোগ্য বলেই ভাগ্য—আমার মা'র ব্যাখ্যায়। একজনের বরাত যে খোলে হঠাৎ, তার কারণ তার সঙ্গে অনেকের বরাত দেওয়া থাকে তাই। কারো মানসসরোবরের ভাণ্ডারে আকাশ থেকে বর্ষণ নামে, জল জমে ওঠে, গোমুখী

বেয়ে নেমে আসে তাই—ছড়িয়ে যায় সারা ভূভারতে। কেবল গঙ্গাধরের জন্যই নয় গঙ্গা, জাহ্নুমুনির জন্যও না, যে ভগীরথ টেনে আনলো তারও একলার নয়কো—সবার জন্যেই সেই ভাগীরথী।

সবাইকে খয়রাতির এই দায়ভাগ যে মানে না, রাতারাতি ক্ষয় পায় তার ভাগ্য। ভাগ্যের সঙ্গে এহেন ফেরেববাজি যে করে, তার বরাতেই ফের আর দেখা দেয় না সেই সৌভাগ্য। নেহাত মন্দ ভাগ্য হয়ত না হলেও তার আদায়ভাগে মন্দা পড়ে যায়। তার নিজের বরাতই বাড়ন্ত হয়।

লালবাজার থেকে যথাসময়ে আমরা চালান হয়ে গেলাম ব্যাংশাল কোর্টে। সেখানে দু মিনিটের মামলা। খানিকক্ষণেই পালা খতম।

কলকাতার বিভিন্ন এলাকার থেকে পিকেটিং আর আইন লঙ্ঘন করে যারা যারা ধরা পড়েছিল, গোছায় গোছায় জজ সাহেবের সামনে কাঠগড়ায় এনে খাড়া করা হচ্ছিল তাদের। তারা বন্দে মাতরম্ হেঁকে গান্ধিজীর জয়ধ্বনি দিয়ে হাজির হচ্ছিল দলের পর দল।

তারপর মামুলি বাঁধা গৎ।

আদালতের থেকে প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে থাকে পরম্পরায়।

'তোমরা দোষী না নির্দোষ?'

কিচ্ছু আমরা কবুল করি না।

'আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাও তোমরা? নিজেদের উকীল—টুকীল দেবে?'

'না, একদম না। এ আদালতকে মানিনে আমরা! করব না নিজের পক্ষ সমর্থন। যা করেছি, বেশ করেছি। ছাড়া পেলে আবার করব। ইংরেজের আদালতকে আমাদের থোড়াই কেয়ার! আপনাদের আইনকানুনের ধার ধারি না।'

ইত্যাকার নানা জনের নানান জবাব।

ব্যস্। ঐ পর্যন্তই। ঐখানেই আমাদের খেলা খতম। পরব শেষ। তারপর দু'মাস, চার মাস, ছ' মাস করে জেল হয়ে যায় জজসাহেবের মর্জি মাফিক।

তারপরেই আমরা প্রিজন্ ভ্যানে চড়ে চলে যাই সটান কলকাতার যতো কয়েদখানায়।

গান্ধিজীর জয়ধ্বনি দিয়ে আমাদের পিঁজরেয় গিয়ে ভর্তি হই আমরাও। নামি এসে একেবারে জেলখানার সেই চত্বরে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে জেলের সেই চত্বরটা, তার চৌহদ্দির ভেতর অনেক ছেলে, নানা বয়সের, বয়স্ক যুবকরাও ছিল তার মধ্যে, ঘুরছিলো ফিরছিলো ইতস্তত। আমরা নামতেই বন্দেমাতরম্—এর হুঙ্কার দিয়ে সমাদরে তারা সবাই অভ্যর্থনা করে নিল আমাদের।

এগিয়ে গেলাম আমরা।

জেল আমার এই প্রথম দর্শন জীবনে। অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলাম চারদিকে। সবার দিকেই। এমন কি, যদিও তার আগেকার দেখা, তবু দেবেনেরও তাক লেগে গেছে মনে হল। সেও বেশ তাকিয়ে তাকিয়ে জেলটাকে দেখছে লক্ষ্য করলাম।

'এ আবার কোন জেলে নিয়ে এলো হে আমাদের!' চারধার দেখে সে বললে অবশেষে।

'এখানে তো এসেছো তুমি আগে, তবুও চিনতে পারছ না?'

'না, এ জেল সে জেল নয়।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'কোন জেল যে কে জানে! ধরতে পারছিনে ঠিক।'

'তোমার সেই নিমগাছটা কই ? দেখতে পাচ্ছ না তাকে ?' গোড়াগুড়ি সবটাই দাঁতন করে ফেলল নাকি আমার সন্দেহ হয়।

'নাঃ, কোথায় নিমগাছ ! কোথ্থাও নেই।'

'দেশবন্ধুও নেই তাহলে এখানে ?'

'নাঃ !' তার দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বিতীয় প্রস্থ।

'হায়, কোথায় এলে ? তোমার গঙ্গাও হারিয়ে গেল শেষটায়।' হা—হুতাশে আমার সহানুভূতি জানাই।

'গঙ্গা হারাবে কেন ? ওই সামনেই তো গঙ্গা। অচেনা একজনা মাঝখান থেকে কথা পাড়ল, যোগ দিল আমাদের আলোচনায়—'গঙ্গার ধারেই তো আমাদের এই জেলটা হে। এসো না দেখবে, দেখবে এসো গঙ্গা পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

গেলাম গঙ্গার সামনে।

গঙ্গার বুকে দূরে অদূরে অতিকায় যতো মানোয়ারী জাহাজ নোঙর করা।

'খিদিরপুর ডক ছিল এটা। আর সব জেলে কয়েদী আঁটছে না কি না, হাজার হাজার ছেলে আসছে তো ঠেলে, রোজই আসছে। তাই খিদিরপুরের এ ডকটাকে ঘিরে নিয়ে আনকোরা এই জেলখানাটা বানিয়েছে। এর মধ্যেই হাজার চারেক এসে গেছে এখানেও।' ছেলেটি জানাল।

'না ভাই ! এ গঙ্গা সে গঙ্গা নয়।' গঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ল দেবেন। —'গঙ্গা আমাদের হারিয়ে গেল ভাই ! গঙ্গা বোধহয় আর পেলাম না আমরা—পাব না আর এ জীবনে !'

'আমার সুরধুনীও বুঝি হারিয়ে গেল সেই সঙ্গে।' নিজের মনে মনেই আমি আওড়াই। জীবনের মতই বুঝি এবার ! অন্তরের মধ্যেই আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে !

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে মা'র কথাগুলোই মনে পড়ছিল কেবল....সকলের দায় মিটিয়ে সবার ভাগ বিলিয়েই ভাগীরথী।

দুনিয়ায় কেউ একলার ভাগ্য নিয়ে আসে না রে, বলেছিলেন মা, সবার সঙ্গে সবার ভাগাভাগি। নিজের ভাগ্যে খায় না কেউ, সবাইকে ভাগ দিয়ে সবার ভাগ থেকে নিয়েই খেতে হয়, পেতে হয় সবাইকে। দিলে পরে তবেই পায়। সবাই সবার ভাগ্যের ভাগীদার।

একই দেহের অংশ প্রত্যংশের ন্যায় সবাই সবার অংশীদার। সবার সুষ্ঠুতায় সর্বাঙ্গীণ কুশল।

দাঁড়াতে হয় অবশ্যি নিজের পায়েই, পরের ওপর ভর দিয়ে নয়—সেভাবে দাঁড়ানোই যায় না আদৌ, এমনকি খাড়া থাকাটাই দায়, কিন্তু তাছাড়া আর সব বিষয়ে স্বভাবতই আমরা পরমুখাপেক্ষী। দিয়েই পেতে হয়, পেয়েই দিতে হয়—সব কিছুই—সব কিছুতেই। না দিয়ে পাওয়ার উপায় নেই—ঠিক যেন ওই চুমুর মতই।

এমন সময় একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এল—'তোমাদের নাম কি শিবরাম আর দেবেন?'

'হ্যাঁ, কেন ? কী হয়েছে ?'

'ডাক পড়েছে আপিসঘরে। জেলের আপিসে। নাম রেজেস্ট্রি করতে হবে না ? কম্বল-টম্বল থালা গেলাস দেবে যে তোমাদের।'

গেলাম আমরা। দুখানা করে কম্বল দিল দুজনকে—একটা গায়ে দিতে আর একটা পাতবার জন্যে। এনামেলের থালা গেলাসও পেলাম সেই সঙ্গে।

'এসো আমার সঙ্গে তোমরা। কোথায় থাকবে ঠিক করে নাও, এসো। দেখে শুনে নাও সব।'

গেলাম তার সঙ্গে।

বিপুল পরিধি নিয়ে বিরাট গুদামঘর। থাকে থাকে খাড়া করা যত স্টীলফ্রেমের শেল্ফ পরের পর সাজানো—চলে গেছে সারি সারি এধার থেকে ওধার অব্দি। শেল্ফ-গুলি তাকিয়ে দেখার মতই—পাঁচ ছ'টা করে তাক প্রত্যেক শেল্ফে—তাকগুলো লম্বা চওড়ায় পাঁচ-ছ' হাত করে।

বেশির ভাগ তাকেই কম্বল বিছানো। কম্বলের নিশানায় জানা গেল কারো না কারো দখলে। বুঝলাম এই তাকগুলিই আমাদের থাকবার জায়গা।

'এবার পছন্দ করে বেছে নাও, কে কোনটা চাও।' বলল ছেলেটা।

'নিলেই হোলো একটা। নিতেই হবে যখন—পছন্দটা কিসের!' আমি বলি—'আচ্ছা ভাই, এইসব তাকগুলোয় থাকত কী আগে? ইয়া ইয়া এই সব তাকে?'

'ডক ছিল না আগে এটা? ডকের গুদাম ছিল তো—ডকের যত আসবাব—মালপত্তর থাকত কিনা এখানে। লোহা-লক্কর যন্তর-টন্তর—এই সব মনে হয়।'

ছেলেটি ব্যক্ত করে—'নাও, পছন্দমত যে কোনটায় তোমরা কম্বল বিছিয়ে ফেলো। এই দুটো তাক্ নাও, কেমন?'

তাকিয়ে দেখি—দু'জনে এক তাকে থাকলে হয় না? আমরা বন্ধু তো, একসঙ্গে থাকি যদি? শুয়ে শুয়ে বেশ গল্প করা যায় তাহলে।'

'কোনো বাধা নেই। দু'জন করে একটা তাকে থাকলে ভালোই তো। এর মধ্যেই অনেক ছেলে এসে গেছে, আরো কত আসবে। জায়গার টানাটানি পড়বে তখন। কাউকেই তখন একটা তাক একলার জন্য দেওয়া যাবে না।'

'সব জেলেই তো ওয়ার্ডাররা থাকে। থাকে না? কিন্তু এখানে তেমন দেখছি না কে হে?' জানতে চায় দেবেন। —'এ এক সৃষ্টিছাড়া জেল। সত্যি।'

'হঠাৎ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা। আছে জনকতক জেলের ওয়ার্ডার। খাবার দেবার সময় তাদের দেখতে পাবে। পুলিস পাহারাওলারাও আছে কয়েকজনা—ঐ সদরেই থাকে। গেটের কাছে আপিস না? সেখানেই গেট আগলে রাখে, পাহারা দেয়।...নাও, থালা বাটি সব রেডি করো, রেডি হও, রুটি তরকারি—রাতের খোরাক সব এসে পড়বে এক্ষুনি।'

আহারপর্ব সমাধার পর শয়নপর্ব। এমন ঘুম পাচ্ছিল আমার যে...

সবে শীতের মৌসুম। কলকাতার মধ্যে হলে তেমন কিছু শীত নয়। কিন্তু এই গঙ্গার ধারে ডক-এরিয়ায় শীত যেন ডাকাতের মতই পড়ল। এমন হঠাৎ পড়ল যে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল আমাদের—রাত খানিকটা এগুতেই না! শেষ রাতে যা দাঁড়ালো তা আর বলবার নয়।

কম্পান্বিত কলেবরে গুটিসুটি মেরে যে করেই হোক কাটালাম তো রাতটা। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়েছি বাইরে। ঠাণ্ডায় হাত-পায়ে খিল লেগে যাচ্ছিল, সূর্য উঠতেই বেরিয়ে পড়েছি চত্বরে—রোদ লাগিয়ে একটুখানি গা গরম করতে। ঠাণ্ডামারা অবশ দেহটা বাগিয়ে

নিতে হবে। সব ছেলেই রোদ পোহাতে বেরিয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা বিরাট সেই প্রাঙ্গণটা এখন ছেলেয় ছেলেয় ভর্তি—গুলতানিতে গুলজার! বাঙালী আছে, বিহারী আছে, পাঞ্জাবীরা আছে সেই দঙ্গলে—কত হবে সংখ্যায়? এক হাজার? দু হাজার? আড়াই হাজার? কে জানে কতো!

খাতার 'পরে হিসেব কষতেই আমি পোক্ত নই, এমনি মাথাগুনতিতে পাত্তা পাবো?

দেবেনও এসে জুটেছে একটু পরে।

খানিকবাদে ঘণ্টা বাজল সদরে। সদর ফটকের কাছটায়।

'কিসের ঘণ্টা ভাই?' শুধালাম একজনায়।

'খাবার ঘণ্টা।' সে বললে—'খিদে পায়নি তোমাদের? ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা পড়ল। লপ্সি দেবে এবার। তোমাদের থালা বাটি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও গে! লাইন দিতে হবে—জানো?'

'তাই নাকি?'আমি আর দেবেন আমাদের থালাবাটি আনতে দৌড়ই। ঘুম ভাঙার পর থেকেই খিদের ঘণ্টা বাজছিল পেটে। সকালের খিচুড়িভোগের ভিড়ে গিয়ে ভিড়তে মোটেই দেরি করি না।

গাদাখানেক লপ্সি গেলার পর শীতটা যেন কাটলো সত্যিই। শীত শীত ভাবটা গেল। একটু গরম হোলো হাত-পা।

'এতক্ষণে যেন বাঁচলাম—উঃ!' হাঁফ ছাড়লাম আমি। —'ঠাণ্ডাটা কাটলো ভাই।

ইস্, কী ঠাণ্ডাই যে গেছে কাল রাত্তিরে। কী বলব ভাই, সারা রাত্তির আমি ঘুমোতে পারিনি...।'

'নাক ডাকিয়েছ সমানে।' আমি বাধা দিয়েছি তার কথায়।

'সে ওই তন্দ্রার ঘোরে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা লাগে না? না ঘুমোলেও? লাগে না? সেটা তাই।'

'তোমার তন্দ্রায় আমারো ঘা লেগেছে ভাই...'বলতে যাই।

সে বলে—'ঐ দারুণ শীতে কি ঘুমোনো যায় নাকি? একটা কম্বলে শানায় কখনো? ওরকম চারখানা কম্বল হলে তবে যদি গিয়ে এই বাঘা শীত কাটে।

'তা বটে।' আমার কোনো দ্বিমত ছিল না এ বিষয়ে।

দুপুরের খাওয়ার পর স্টীলের তাকে গিয়ে গড়িয়েছি খানিক। তারপর ঘুরে বেড়িয়েছি সারা ঘরে। বিরাট গুদাম ঘরে যেন তার চেয়েও বিরাট এক মেলা বসেছিল—মেলাই ছেলে মিলে জমজমাট চারধার।

কোথাও তাস পিটছে কয়েকজনায়। দাবা নিয়ে বসেছে ফের কোথাও। কোথাও আবার স্বদেশী গান গাইছে কেউ কেউ।

মাঝে মাঝে কয়েকটা ছেলে দেখি টেক্সট বই নিয়ে বসে গেছে—পড়াশোনায় মন দিয়েছে ওর মধ্যেই।

আলাপ হোলো ওদের সঙ্গে।

টেস্ট পরীক্ষায় পাস করে এসেছে তারা সব। তাদের অভিভাবকরা বইপত্তর জমা দিয়ে গেছল আদালতে। জজ সাহেব এখানে বই আনতে কোনো বাধা দেননি। ফাইন্যালের জন্যে তৈরি হচ্ছিল তারা। দু-এক মাস করে জেল তো সবার। বেরিয়ে গিয়েই তারা পরীক্ষা দিতে বসবে। তারপরে ফের জেলে আসবে। ফের আবার—ডাক পড়ে যদি।

ভালো ছেলে তারা সবাই। আমার মতন বাউণ্ডুলে ভবঘুরে নয়।

বিকেল একটু গড়াতেই গুদামের ভেতরে ঠাণ্ডা ছড়াতে শুরু করেছে।

বাইরের চত্বরে চলে এলাম। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এমন মিষ্টি লাগে যে—।

দেবেন একা একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল।

'তোমার অপেক্ষায় ছিলাম হে। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

'ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম জেলখানাটা।...আগাপাশতলা দেখলাম।'

'খানা আবার কোথায় ? একখানাই তো ঘর মোটে। —যদিও একটু বড়োসড়ো। জেল বলতে হয় তো হ্যাঁ, আমাদের প্রেসিডেন্সিকে। কতো সেল, কতো ঘর—ক'খানা ব্লক। কতোরকমের কয়েদী যে। ফাঁসীর আসামীও রয়েছে তার ভেতর—কনডেম্‌নড্ সেলে—একেবারে পৃথক। ফাঁসিকাঠ দেখতে পাবে তুমি, যেখানে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল হাসতে হাসতে ফাঁস পরেছিল গলায়। সেই হচ্ছে জেল—যার ভেতর দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে এখন। জাগ্রত গঙ্গা—সেই দেশবন্ধু। এটা কি জেল নাকি ? এটা তো স্রেফ ডক ইয়ার্ড। জেলের নামে ইয়ার্কি একটা।'

'তা হোক. তোমার সে জেল তো আমি দেখিনি ভাই ! এখানে একখানা ঘর তা ঠিক—কিন্তু কতো বড়ো একখানা ! কী বিরাট ঘর বাবা ! একটা গোটা ফুটবল মাঠ এঁটে যায় ! একখানাই অনেক। কতোজনের সঙ্গে আলাপ হলো যে এতক্ষণে...।'

'খুব সাবধান ! যার তার সঙ্গে ভাব জমাতে যেয়ো না, বেঘোরে মারা পড়বে শেষটায় বলে দিলাম।'

'কেন, মারামারিটা কিসের আবার ?'

'এর মধ্যেই বিপ্লবী দাদারা রয়েছেন তা জানো ? টের পেয়েছি কালকেই। গান্ধীমার্কা টুপি মাথায় দিয়ে নিজেদের দলে ছেলে রিক্রুট করার তালে ঢুকেছেন তাঁরা। তার পেছনে আবার সি আই ডি-র স্পাইরাও সেঁধিয়েছে নিজেদের তালে। এই দুই চাকার চাপে পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে না যাও।'

'চ্যাপটাতে গেলে তো। ও ব্যাপারে হাতেখড়ি হয়ে গেছে আমার। ঢের ঢের আগেই। মা আর দারোগা—দুজনের কাছে নাকে খত দিয়ে ছাড়ান পেয়েছিলাম। ছেড়ে দিয়েছি সে পথ। ও-পথ আমার নয়, জেনে গেছি আমি।'

'নাকে খত দিয়ে পথ ছেড়েছো—কিরকমটা ?'

'পিস্তল সমেত ধরা পড়েছিলাম না ? অমনি ছাড়ান মেলে নাকি ? রীতিমতন মন্তর আওড়াতে হয়েছে তার জন্য...।'

'মুচলেকা দিতে হয়েছিল বুঝি ? জামিন দাঁড়িয়েছিলেন বাবা ?'

'না না। বললাম না মন্তর ?'

'শুনি মন্তরটা।'

'এই দিই নাকে খত/এই করি দণ্ডবৎ/আর প্রভু/আমি কভু/মাড়াবো না ওই পথ।...এই মন্তর।'

'বাজে ! দারোগার সামনে আর ছড়া কাটতে হয় না কাউকে। ইয়ার্কি করবার জায়গা পাওনি আর ? পীরের কাছে মামদোবাজি ? আমি বুঝিনে বুঝি ?'

'বেশ। ইয়ার্কি তো ইয়ার্কি।'

'রাত হলেই আবার সেই শীতের ধাক্কা। এমন ভয় করছে আমার না !...'সুর পালটায় তার—'তাই ভেবে এখন থেকেই কাঁপুনি দিতে লেগেছে।'

'কাঁপছি আমিও। তবে শীতের ভয়ে ততটা নয়, যতোটা কিনা তোমার ভয়ে ভাই।'

'আমার ভয় ? তার মানে ? আমাকে আবার কিসের ভয় ?' সে হতবাক্ হয়।

'অধঃপতনের একটা আশংকা থাকে না মানুষের ? পদে পদে ভয় থাকে না তার ?'

'কিসের অধঃপতন শুনি ? খুলে বলবে তো !'

'তুমি যে এমন তুখোড় খেলোয়াড় তা কি আমি জানি! কাল রাত্তিরে সেটা টের পেলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখছো খালি ! বল নিয়ে চষে বেড়িয়েছো সারা মাঠ। এই পাস করছো, এই শুট করছো, এই কর্নার করলে ! এই মধ্যেই আবার গোল বাঁধিয়ে বসেছো একেবারে। গো-ও-ও-ও-ওল !'

'গো-ও-ল গো-ও-ল বলে চেঁচাচ্ছিলাম নাকি ?' সে হাসে।

'চেঁচালে তো রক্ষে ছিল ! শুধু কি চেঁচানি ! তোমার পাসের ধাক্কায় আমার প্রাণ যায় যায় ! এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। এমন শট ঝাড়ছিলে মাঝে মাঝে যে তেতালার থেকে পড়ি মরি আর কি ! শেষটায় যখন গোল বাঁধালে না, তখন কোনো-রকমে অধঃপতনের হাত থেকে সামলেছি। সেই তেতলার তাক থেকে বেতালায় পড়লে হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে যেতাম।'

'জাগিয়ে দিলে না কেন আমায় ?'

'হ্যাঁ, জাগিয়ে দিই আর তুমি ঘুম ভেঙে উঠে মার লাগাও আমায়।'

'কেন, মারবো কেন ? মারতে যাবো কিসের জন্যে ?'

'ঠিক শট করার মুখটাতেই গোলটা তোমার আটকে দিলুম বলে ? অমনটা হলে রাগ হয় না তখন ? আমি কি জানিনে ! গোলে শুট করতে যাচ্ছে এমন সময় রেফারি অফ্ সাইড হাঁকলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে প্লেয়ারদের ? তখন ওই রেফারিকেই মেরে বসে—আমি কী ছার !'

'আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি তোমায়—আজ অমনটা হবে না আর। তুমি আমায় জাগিয়ে দিয়ো।'

'না ভাই, আজ আর আমি তোমার সঙ্গে এক তাকে শুচ্ছিনে। ঐ তেতলায় তো কিছুতেই নয়। আমি আজ একতলার তাকে শোবো। একলাই। তার থেকে ঘুমের ঘোরে পড়ে গেলেও ততটা আর লাগবে না গায়।'

'আরো বেশি শীত শীত করবে তখন। দেখো তুমি। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যাবে। জায়গাটা ভয়ঙ্কর ড্যাম্পো না ? যত না ওপর থেকে ছপ্পর ফেড়ে পড়ে, তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা নীচের থেকে মাটি ফুঁড়ে ওঠে। গঙ্গার ধারের গুদোমঘর—মানুষ বসবাসের জন্যে তো বানানো হয়নি। স্যাঁতসেঁতে মেজেটা দ্যাখোনি কি !' সে দম নিয়ে কয় : 'আকাশের চেয়ে মাটির ঠাণ্ডার জোর বেশি তা জানো ? তাতেই মানুষ বেশি ঘায়েল হয়। তাতেই প্লুরিসি, নিউমোনিয়া ধরে—বুঝেছ ?'

'না ভাই !' অবুঝের মত বলি—'সেই ভুঁইফোড় ঠাণ্ডাও সইবে আমার, কিন্তু তোমার শ্রীচরণের মার...মানে, ঐ ঠ্যাংএর ঠ্যাঙানি খেলে আর বাঁচবো না।'

'তোমার যা খুশি।...কিন্তু একজনাকে একটা তাক নিয়ে থাকতে দেয় না যে—বলল না সেই ছেলেটা কালকে ?' সে অন্য কথা পাড়ে। 'ঢের ঢের ছেলেরা আসছে না আরো ? ধরবে কোথায় জেলে, শুনি ?'

'না যদি থাকতে দেয়, তুমি তোমার মতই আরেকজন খেলোয়াড়কে জুটিয়ে নিয়ে শোও

গে ! এত ছেলের ভেতর কি তোমার মতন প্লেয়ার আরেকটা পাবে না ?'

'আর তুমি ? তোমাকেও তো একটা তাকে একলাটি থাকতে দেবে না। তুমি কী করবে?'

'দেখি নেহাৎ ঠাণ্ডা গোছের কাকে পাওয়া যায় আমার তাকে। কে থাকে দেখা যাক। তার তাকে থাকতে হবে।'

'থাকো গে !' বলে রাগ করে বিরাগভরে সে চলে যায় আমায় ত্যাগ করে। আমি একা একা ঘুরতে থাকি গঙ্গার ধারটায়। ঘুরেফিরে মা'র কথাগুলোই মনে পড়তে থাকে আমার। গঙ্গার কলধ্বনির সঙ্গে মিশিয়ে।

এমন সময় প্রিজন্ ভ্যানে করে আদালতের থেকে আমদানি একদল ছেলে এসে পড়ল জেলের সদরে। দেখতে পেলাম দূর থেকেই।

গেট খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গাড়িটা ঢুকল এসে চত্বরের মধ্যে। বন্দেমাতরম্ হেঁকে নামল নতুন ছেলের দল।

এধার থেকেও সমধ্বনি উঠল তাদের সংবর্ধনায়—তাদের অভ্যর্থনায়। এ ধারের যে ছেলেগুলো এখানে সেখানে ঘুরছিল, ভ্যানের সামনে ছুটে গেল সবাই। একটু বাদেই দেবেন এসেছে আমার কাছে ছুটতে ছুটতে।

'তোমাকে আর তাকে তাকে থাকতে হবে না। পেয়ে গেছো তাকে। না চাইতেই পেয়ে গেছ। তোমার বরাত।'

'বলছো কী ?' কথাটার ঠিক ঠাওর পাই না।

'সেই মেয়েটার ভাই...তাই হবে বোধ হয়। সে আজ এসেছে—আজকের আমদানিতে। তার ভাই নিশ্চয়—তার মতই দেখতে হুবহু।'

'কার মতন দেখতে ?'

'তোমার সেই মেয়ে বন্ধুটির মতন গো ! তোমার তাকের পার্টনার। যার তাকে তুমি ছিলে গো !' সে জানায়—'আর তোমাকে কে পায় এবার !'

শোনামাত্রই আমি দৌড় লাগাই। একটু এগিয়েই দেখতে পাই...

সেও দেখতে পেয়েছিল আমাকে। ছুটে এল আমার দিকে। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। জড়িয়ে ধরল আমাকে...

'ইস্ ! তোমাকে এখানে পাব আমি আশা করিনি...' বলল সে।

তার দিকে চেয়ে আমি কথা কইতে পারি না।

'ইস্; কী করেছিস রে রিনি ! তোর এমন সুন্দর বেণী—চুলটুল সব ছেলেদের মতন ছেঁটে ফেলেছিস !'

'ঠিক ছেলেদের মত না। বরং বেবিদের মতন বব করা—বলতে পারো।'

'কিন্তু সেই চুল ? আহা !' ওর কথায় আমার খেদ চুলমাত্র কমে না।

'আবার হবে। দেখতে দেখতে হয়ে যাবে, দেখো না !...এখন বলো তো হাফপ্যান্টে আমায় কেমন মানিয়েছে বলো না ?'

এবার ওকে আপাদমস্তক দর্শন করি—মাথার থেকে পা পর্যন্ত।

'কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোকে না, কী বলব ! তুই ছেলে হয়ে জন্মালেই ভালো করতিস বোধহয়। তাহলে, এই হাফপ্যান্ট পরে থাকতে পারতিস চিরকাল। তাহলে আর কোনোদিন তোকে শাড়ি—ফাড়ি পরতে হোতো না। এখন দুদিন বাদেই তো শাড়ি ধরতে হবে তোকে—পরতে হবে দিনরাত।'

'ওরা কিন্তু ধরতে পারেনি একদম। কেমন ধোঁকা দিয়েছি ওদের দেখছো তো। বলেছিলাম না যে আমি আসবই ? এলাম না ঠিক ? আটকাতে পারলো আমাকে ? আমার সঙ্গে কেউ পারে ? শুধু কেবল এই ভয় করছিল আমার...' বলতে বলতে সে থেমে যায়।

'কী ভয় করছিল ?'

'কোন্ জেলে পাঠায় আমাকে কে জানে ! জেলে ঢুকে যদি তোমার দেখা না পাই, তখন ?...এ কি, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছো না যে ? খালি খালি আমার পা দেখছো কেবল...কেন, আমার পা কি তুমি দ্যাখোনি নাকি আগে ?'

'দেখব না কেন ? ফ্রক পরেই তো থাকতিস দিনরাত—কতো দেখেছি।'

'তবে এখন ওদিকে নজর দিচ্ছ যে খালি খালি। কেন, আমি কি আর দ্রষ্টব্য নই ?'

'তোর মুখ্য অংশ তো দেখছিই, দেখবই, সম্মুখেই পাব চিরদিন, কিন্তু—'আমি বলি—'কিন্তু তোর অ্যাতোখানি খালি পা তো দেখিনি কখনো। ফ্রকে যে অনেকটা ঢাকা পড়ে থাকে। হাফপ্যান্টে আরো অনেকখানি বেশি দেখা যাচ্ছে না ? চেয়ে দেখছিলাম তাই। হ্যাণ্ডসাম মেয়ে তো অনেক আছে, তোর মতন আছে কি না জানি না...'

'আহা ! কী আমি এমন হ্যাণ্ডসাম। কী রূপের ছিরি আমার। আমার চেয়ে ঢের ঢের সুন্দর মেয়ে দুনিয়ায় আছে, আমারই চোখে পড়েছে। বুঝলে ? অনেক দেখেছি আমি।'

'আমি দেখিনি। একটাও দেখিনি এখনো। আমার নজরে পড়েনি অন্তত। থাকে থাকুক গে। আমার বয়ে গেল। আমি তা দেখতে চাইনে। তবে একথা আমি বলবই, হ্যাণ্ডসাম মেয়ে আরো থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তোর মতন এমন লেগসাম মেয়ে আর দুটি নেই।'

'যাও। তোমার যতো ফক্কুড়ি কথা...'

'একটা কথা বলবো, রাখবি ? তুই কখনো ভুলেও শাড়ি পরিসনি, ফ্রক পরে থাকিস চিরটাকাল... বুঝেছিস ?'

'কেন, শাড়ি পরলে কী হয়? ভালোই তো দেখায় গো।' আরো ভালো দেখায় মেয়েদের।'

'তা হলে তোর এই সুন্দর পদপল্লব তো আমি আর দেখতে পাব না।...'

'তাতে কি। মুখপদ্ম তো দেখতে পাবে।' বলেই সে কী মিষ্টি না হাসে যে। —'তাতেই তোমার লোকসান পুষিয়ে যাবে মশাই।'

॥ ছেচল্লিশ ॥

কাঁটাতারের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রিনি, দুজনেই আমরা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে।

'সেই গানটা একটু গা না রিনি, গাইবি ? পরশু মীর্জাপুর পার্কের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গাইছিলিস যেটা ? গুন গুন করে ধরেছিলি যে সেই—'

তার দিকে তাকাই। তার রূপ গুণ দুই-ই বুঝি একাধারে পেতে চাই।

'সেখানে আবার কী গান গাইলুম গো ? সেই পার্কে ? সেটা কি গান করবার জায়গা ছিল নাকি ?'

'আহা ! চাপা গলায় গাইলি না একটুখানি ? আপন মনেই গেয়েছিস, মনের ভুলেই হয়ত বা। টের পাসনি তুই—কিন্তু বেশ লেগেছিল আমার। সেই যে...বহুদিন পরে/বঁধুয়া

এলে/দেখা না হইতো/জীবন গেলে। পদাবলী কীর্তনের এই কলিটা ধরেছিলি না তুই। ঐ একটা কলিই...তারপর সভায় কে একজন হোমরাচোমরা লোক এসে গেল, আর তোর কলিটা ভালো করে ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়ল। সে আসতেই যা চেঁচামেচি পড়ে গেল না! তুইও থেমে গেলি তখন।'

'সে কলি তো সেদিনের গো, আজ আবার কেন? আজ তো সে কলি ফুল হয়ে ফুটেছে। এসে গেছি তো আমরা।...সে গান ফের এখন কিসের জন্যে?'

'সেই সুরটা কানে লেগে রয়েছে কিনা আমার এখনো, শুনছি সব সময়। তাই বলছিলাম। কী মিষ্টি যে গাইছিলি না!'

সেদিনের আত্মবিস্মৃতক্ষণের তার স্বগতোক্ত সম্ভাষণের সেই অস্ফুট কলি—তার সুমৃদু সুরভি এখনো যেন আমার কানে লেগে। কোনোদিন প্রস্ফুটিত না হয়েই অকালে যদি ঝরেও যায়, তবু বুঝি তা চিরকালের মতই আমার প্রাণে লেগে থাকবে।

'জেলখানায় কি কেউ গান গায়? এই কি গান গাইবার জায়গা?' রিনি বলে—'উপযুক্ত পরিবেশ কী এটা?'

'নয় কেন? যেখানে কিনা একটি বেশ পরী আমার পাশটিতেই, তার মতন পরিবেশ আর আছে নাকি? আমার সামনে গঙ্গা আর পাশেই এই সুরধুনী—এর চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে বল্?'

'গঙ্গা আর সুরধুনী আবার আলাদা নাকি? অবাক করলে!'

'গঙ্গা সবার আর সুরধুনী শুধু আমার—শুধু আমারই।' আমার ভাষ্যকরণঃ 'তুই-ই আমার সুরধুনী!'

'আমি আবার কিসের সুরধুনী!'

'প্রথম সুর আমি তোর গলাতেই শুনি। সুরের সাড়া আর আমার প্রাণের সাড়া পাই তোর কাছ থেকেই। তোদের দিকের বারান্দা থেকে গাইতিস না, এধার থেকে আমি শুনতাম...কতো শুনেছি...সেই যে একদিন গেয়েছিলিস, ও গো দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে/আমার সুরগুলি পায় চরণ/আমি পাইনে তোমারে।...তোর ওই গানটা শুনেই না আমার প্রাণে সাড়া পড়ল প্রথম। প্রথম যেদিন এই গানটা শুনি...আমাকে লক্ষ্য করেই গাইছিলিস তো?'

রিনি হাসতে থাকে। 'তোমার মাথা! কী না কী! ছেলেরা কী যে সব আলতু-ফালতু ভাবে...কিসের থেকে কোথায় আসে, নিজের মনেই কতো কী যে ধরে নেয়!...আশ্চয্যি! এটা যে রবিঠাকুরের গান গো, তাও জানো না? ভগবানের উদ্দেশে রচনা—কোনো মানুষ—টানুষের উদ্দেশে নয় আদপেই! তোমার জন্যে গাইতে যাবো কেন—কোন দুঃখে?'

'না গাইতেও পারিস, কিন্তু আমার তাই মনে হয়েছিল, তাই আমি বলছিলাম। রবিবাবুর গানগুলো সব কেমনধারা! সব কিছুতেই খাপ খায়—সবখানেই লাগে। মশারির মতন চারদিকেই খাটানো যায়। গানটাকে তুই ভগবানের জন্যে বলছিস? তাও হতে পারে, সত্যি! ভেবে দেখছি তাও হয়। কিন্তু অন্য কাউকে বাগানোর জন্য হলেও এমন কিছু মিথ্যে হয় না।...আমি ভাবছিলাম তুই আমার কানটাকে হাতের নাগালে পাচ্ছিস না, কান ধরে টানতে পারছিস না আমার, তাই ওই সুরের আঁকশি বাড়িয়েছিস। কিন্তু যাই বল তুই,

ওই গানটা, কানে আসা মাত্রই তোদের বাড়ি ছুটে গেছলাম, মনে আছে তোর ?'

'তুমি তো হরদমই আমাদের ধারটায় ছুটে আসতে তোমাদের ভাঁড়ারের দরজার ছিটকিনি খুলে—তা যে আমার জন্যেই আসতে তা কী করে জানব। আমি ভাবতাম বুঝি খাবার লোভেই। মা তোমাকে এটা ওটা সেটা খাওয়াতেন না....'

'এখন তো জানলি।....তাতে কী হয় ? বিস্কুটের জন্যে গেলে আর অমৃত হাতে পেলে....কিংবা যদি একটু ঘুরিয়ে বলি, অমৃতের নাগালে যেতে অযাচিত বিস্কুট গালে এলে এমন কি ইতরবিশেষ হয় শুনি ? কোনো পাওয়াটাই তাতে মিথ্যে হয়ে যায় না। তারপরে তোর সেই গানটা ? আমার বকুল বনে/যেদিন প্রথম ধরেছে কলি/তোমার লাগিয়া/তখনই বন্ধু।/ গেঁথেছিনু অঞ্জলি। 'এটা....এটাও কি তোর সেই ভগবানের জন্যেই গাওয়া ? ভগবানের জন্যেই বাঁধা কবির এ গানটাও ?'

'জানিনে বাপু। ছেলেরা এত কিছু ভাবতেও পারে। এমন সব ধরে নেয় যে, তার কোনো মাথামুন্ডু যদি পাওয়া যায় ?'

'তারপর, তোদের সেই কলকাতায় চলে আসার দিনটায় সকালে সেই আমাদের ছাদে ছুটে এলি না ? সেদিন যে গানটা তুই গেয়েছিলি, এখনো তা আমি ভুলিনি....সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে/ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা/ভুলো না....ভুলো না।/ সেদিন বাতাসে কী ছিলো তা জানো ?/তোমারই মনের মাধুরী মাখানো/আকাশে আকাশে আছিলো ছড়ানো/তোমার হাসির তুলনা....।'

'মানেটা কী এর শুনি ?'

'যাই মানে হোক, ভগবানের কিছু নয়। আমি ভগবানের হাসি কখনো দেখিনি ভাই—তুই হয়তো দেখে থাকতে পারিস। আমি মা কালীর জিভ ভ্যাঙানি পর্যন্ত দেখেছি....দেখলে ভয় করে। তবে হ্যাঁ, আমার মা দুর্গার মুখ টিপে টিপে ঐ হাসিটা আমি ভালোবাসি। কী মিষ্টি যে। তবে এই চর্মচক্ষে নয়, দেখেছি তোর ঐ প্রতিমাতেই। তুইও দেখেছিস। সকলেরই দেখা।'

'গানের মানে....মানে, তার মর্মটা তুমি কী টের পেয়েছিলে বলো তো ?'

'মানে, এই যে আমার সামনেই। তোর হাসি তো তুই নিজে দেখতে পাসনে, কী বুঝবি তার। ভগবান তোদের নিজেদের দিকে দেখতে দেননি, নিজেকে দেখতে পাস না তাই রক্ষে—নইলে তোরা কি কোনোদিন এই সব কালো ভূত ছেলেদের দিকে ফিরে তাকাতিস ? কোনো ছেলে কি তোদের কৃপাদৃষ্টি পেতো আর ? নিজেদের দেখে, নিজেদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতিস। ভুলেও তাকাতিসনে আমাদের দিকে।'

'এই বুঝি সেই গানের মর্ম ?'

'আমার মনে হয়েছিল কী—বলব ? মনে হয়েছিল যাবার আগে, সেই যে আমরা বিকেলে রোজ মাঠের ধারে ধারে ঘুরতাম, পাটালি গুড় দিয়ে চিঁড়ে খেতাম না ? যাবার আগে সেই কথাটাই গানের ছুতোয় মনে করিয়ে দিচ্ছিলি তুই আমায়। সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে—ওর মানে হচ্ছে সোজা বাংলায় গদ্য করে বললে, গুড় চিঁড়ের দোলনায় সেদিন আমরা যে ঝুলে পড়েছিলাম, সে কথাটা যেন তুমি কখনো ভুলে যেয়ো না।...'

'এই তুমি বুঝেছিলে। চিঁড়ের জোরে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেছি আমরা—এই ?

গানটায় তো তোর কথা ছিল না, আমার মনের কথাটাই ছিল যে। যে কথাটা নাকি আমার বলবার, সেইটাই তুই আমার হয়ে বলে দিয়েছিলিস! ওটা আমারই মর্মের গাথা ছিল....আমার মর্মেই গাঁথা হয়েছিল....সেই আমার মর্মগাথা এখনো এই মর্মে গাথা হয়ে আছে....এইখানটিতে।' ওই সুরের ভিতে আমার মর্মর-গাঁথনি খাড়া করি নিভৃতে—'আসল কথাটা হচ্ছে, তোর গানের কোনো তুলনা হয় না—যেমন কিনা আমার কাছে তোর কেউ সমতুল নেই। এত গান আর এত এত সুর তুই তুলোর মতন আমার মনের মধ্যে ধুনেছিস না! তাতে তোকে আমার জীবনের সুরধুনী ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারিনে।'

এক কথায় ওর গানের সঙ্গে ওকে আমি তুল্যমূল্য করি। ধুনে ধূল পরিমাণ করে দিই।

'এতক্ষণে বুঝলাম! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার!' সে হাসতে থাকে।

তুলনাহীন যে হাসিটি নাকি আকাশে আকাশে ছড়ানো ছিল সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার আমার ফুরসত নেই তখন—তাই যেন নিমেষের মধ্যে আমার সকাশে সুরের নির্ঝরিণী হয়ে প্রকাশ পায়—সেই রিনি।

এমন সময় সদরে ঘণ্টা পড়ে।

তৎক্ষণাৎ আমি সচকিত—'গান থাক, খাবার ডাক পড়েছে এখন। চল আপিসে যাই, তোর নাম লিখিয়ে লোটা কম্বলগুলো নিয়ে আসি গে...'

'লোটা কম্বল? লোটা কম্বল কিসের?'

'দুখানা করে জেলের কম্বল দেবে না আপিস থেকে? বিছানা করে পাতবার আর গায়ে দেবার জন্যে—নিতে হবে তাই। সেই সঙ্গে রুটি তরকারি ইত্যাদি—রাত্তিরের খাবার যা দেয় তারপর।'

'আর ঐ লোটাটা কিসের জন্যে?'

'জল খেতে—লোটা মার্কা গেলাস দেবে একখানা। তাকে ঘটিই করো আর বাটিই বানাও।'

রিনির নাম রেজেস্ট্রি করে আপিসের থেকে কম্বল দুটো জোটানো গেল।

'চল, এখন বিছানাটা পেতে ফেলা যাক গে...'

'আর খাবার?'

'খাবার এসে দিয়ে যাবে সীটে সীটে ওয়ার্ডাররা। একটু বাদেই দেবে আর। থালা রেডি করে রাখতে হবে।...খিদে পেয়েছে বুঝি তোর?'

'তা একটু পেয়েছে...তবে খুব নয়...'

'বাস্, খাবার পর আর তো কোনো কাজ নেই। খেয়েই ঘুম। সারা রাত যত পারিস ঘুমো না! তবে শীত এখানে বেজায়, ঘুমোতে পারলে হয়। মাঝ রাত্তিরে না, হাড় কাঁপিয়ে দেয়—বলতে কি!'

'কিন্তু কম্বলগুলোও বেশ ধক্কর দেখা যাচ্ছে।' খুঁটিয়ে দেখে সে বলে—'ঘোড়ার কম্বল।'

'জায়গাটা গঙ্গার ওপরেই তো, দারুণ ড্যাম্প—মেজেটাও বেশ স্যাঁতসেঁতে। রাত্তিরে গোটা গুদোম জুড়ে যা কাশির সাড়া পড়ে যায় না—একাধার থেকে যা ঐক্যতান শুরু হয়! ...এটা গঙ্গার পশ্চিম কূল কিনা কে জানে

'তার মানে?'

'বাবা বলেন যে, গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। কাশীক্ষেত্রের মতই সেটা পুণ্যভূমি নাকি। এটা তাই হবে বোধ হয়। কাশীবাসের পুণ্যফলে কাশীপ্রাপ্তি না হয় শেষটায়...হাড় ক'খানা এখানেই না রেখে যেতে হয় আমাদের।'

'তোমাকেও ধরেছে নাকি কাশিতে ? সারা রাত তুমি কাশবে নাকি গো ? তাহলে তো ঘুমোতে দেবে না দেখছি—'

'এখনো তো ধরেনি কাশিতে, পরে কী হবে কে জানে।'

গুদোম ঘরে ঢুকে দেখি আমাদের তাকটা একেবারে ফাঁকা। আমার কম্বলগুলো পড়ে রয়েছে কেবল। দেবেন তার কম্বল গুটিয়ে কোথায় চলে গেছে। যতদূর চোখ যায় তাকের পর তাক তাকিয়ে দেখি, কোনো ফাঁকে কোথাও আর তাকে দেখা যায় না। কোনখানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে কে জানে!

'এই উপরের তাকটায়...এই যে আমার কম্বল পাতা রয়েছে...দেখছিস তো ? উঠতে পারবি এই তিনতলায় ?'

'অক্লেশে। তোমাদের দেশে গিয়ে কতো পেয়ারা গাছে উঠতাম দ্যাখোনি ? তবে এটার একতলা দুতলা সবই তা খালি পড়ে রয়েছে—এগুলোয় বিছানা পাতলে হয় না ?'

'পাতা যায়। তবে বললাম না, ঠাণ্ডাটা বেজায়। ওপর থেকেও পড়ে আবার নীচের থেকেও ওঠে—ড্যাম্‌পো কিনা জায়গাটা। তেতালায় যা ঠাণ্ডা একতালায় তার তিন ডবল হবে বোধ হয়। এক কাজ করা যাক, আমাদের দুজনের চারখানা কম্বল তো ? একটা কম্বল শুধু পাতি, তাতেই দুজনের কুলিয়ে যাবে—যাবে না ? শীতের রাত্তিরে হাত-পা না ছড়িয়ে গুটিসুটি মেরে শুতেই আরাম...।'

'তাই হবে না হয়।' তার দ্বিমত দেখি না—'শিবরাম আর আরাম একাধারে নিয়ে না হয় শোয়া যাবে এখন।'

'আর তিনখানা কম্বল এক করে যদি গায়ে চাপাই ? তা হলে শীতের বাবাও সেই দুর্গ ভেদ্ করতে পারবে না। তিনগুন শীত পড়লেও।'

'বেশ, তবে তাই হোক।'

সন্ধ্যের খাবার সেরেই না কম্বলের 'ঘরে গিয়ে সেঁধুলাম দুজনায়—'ঘুমোনো যাক এবার, কী বলিস ?'

'হ্যাঁ। যা ঘুম পাচ্ছে না!...' বলতে বলতে ওর চোখের পাতা বুজে এসেছে। সেদিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকেই আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনে।

মাঝরাতে গুদামঘরের ছাদে ঝমঝম বৃষ্টি নেমেছে। সেই আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে আমাদের

'ও কি গো ? কিসের শব্দ ও ?'

'বৃষ্টি পড়ছে বোধ হয়। শীতকালে মাঝে মাঝে অকালবর্ষণ হয় না ?'

'এটা তো মাঘ মাস।' খনার বচন আওড়ায় সে—'যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।... ইংরেজকে তা হলে ধন্যি বলতে হয়। কী বলো ?'

ইংরেজ আমাদের রাজা নাকি ? তার রাজত্বের প্রজা আমরা ? এখনো তাই আছি নাকি ? আমাদের হচ্ছে গান্ধী মহারাজ—তিনিই ধন্য। তাঁকেই ধন্যবাদ! আর পুণ্য আমাদের এই

চড়বড় করে আমার কথাটার সাড়া পাওয়া গেল ছাদের ওপর। রিনি চমকে উঠে বসেছে তৎক্ষণাৎ। 'শিল পড়ছে! শিল পড়ছে!' তার উৎসাহ দেখবার মতন।

'কুড়িয়ে আনব বাইরে গিয়ে? কেউ কিছু বলবে না তো?'

'পাহারাওলারা গার্ড দিচ্ছে না বাইরে? পাকড়ায় যদি?'

'কী করবে আমার? জেল তো হয়েইছে, তার ওপর আবার কী হবে? আবার জেল দেবে নাকি? দেয় দিক, না হয় আরেক মাস জেল দেবে, তাই খাটব, তার কী হয়েছে?'

রিনি বলে, 'তোমার ক' মাস হয়েছে গো?'

'দু'মাস। তোর?'

'মোটে এক মাস। আমার সঙ্গী আর যারা ছিল, তাদের দু'মাস, তিন মাস করে সব।'

'জজসাহেব তোর চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলে গেছে, বুঝেছিস? তাই তোর এত কম। এক যাত্রায় পৃথক ফল সেই জন্যেই। বঙ্কিমবাবু বলে গেছেন না, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।'

আমি বঙ্কিম দৃষ্টিতে ওকে নজর দিই। বঙ্কিমের নজরানাও।

'বঙ্কিমবাবুর বউ খুব সুন্দর ছিল বোধ হয়, তাই না?'

'সে আর বলতে! জান কী হয়েছিল একবার? বঙ্কিমজীবনীতে আমি পড়েছি। বঙ্কিম সস্ত্রীক যাচ্ছিলেন ট্রেনে। কোন ষ্টেশনে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোকরা তাঁর বউয়ের দিকে ঘুরেফিরে আড়চোখে তাকাচ্ছিল আর ঘুরঘুর করছিল তাঁর কামরার সামনে। বঙ্কিম তাকে ডাকলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কী করো তুমি, কতো মাইনে পাও, এই সব। তারপরে বললেন, দেখ বাপু, তাকাতে হলে ভাল করে তাকাও। কোনো আপত্তি নেই। দোষও নেই কোনো—সুন্দর জিনিস দেখবে—তাতে কী। সুন্দর তো দেখবার জন্যই হে, তবে অমন চোরা চাহনি হানা কিসের জন্যে? ও তো কিছু ঘোমটা টেনে বসে নেইকো। তাকিয়ে দ্যাখো না ভালো করে! দেখবার মতন মুখখানা বটেই তো। তবে মুখ দেখেই যা, মন পাওয়া ভার। আমি আড়াই হাজার টাকার চাকরে, মাসকাবারে সব টাকাটা পায়ের গোড়ায় ধরে দিয়েও মন পাইনে ওঁর। আর তুমি কি ওই সামান্য টাকায় পাবে আশা করো?'

ছেলেটা বোধ হয় মাথা নামিয়ে চোঁচা দৌড় দিয়েছিল তার পর?'

'কে জানে! তা আর লেখেনি বইটায়। তবে আমি ভাবছি কি, বাইরে গেলে পাহারাওলারা তোকে ধরে যদি...'

'ধরে ধরুক। আমার কুড়োনো শিলের আদ্দেক ভাগ দেবো না হয়...'

'তারা যদি অতো সুশীল না হয়। তাতে না ভোলে যদি...এমন কি, তোর এমন সুন্দর মুখ দেখে—?'

'এর জন্যে আরো এক মাস জেল হয় যদি আমার? ভালোই হবে তা হলে বলব। দুজনে মিলে এক সাথে বেরুতে পারব এখান থেকে।'

'আরে না না, সে কথা ভাবছিনে। ধর যদি তোকে পাকড়ে নিয়ে জেলখানার বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসে। বলে যে, যাও ভাগো হিঁয়াসে। চরে খাওগে যেখানে খুশি—এখানে আর তোমার ঠাঁই হবে না। তা হলে?'

'তা হলে তো মুশকিল। সেটা ভাবনার বিষয় বটে।' ওর মুখে গুমোট দেখা দেয়।

'তোর চেয়ে আমার ভাবনা আরো।' বৈষ্ণব পদাবলীর একটি কলি, ঠিক গুঞ্জন-ধ্বনিতে নয়, আমার বেসুরো গলার গঞ্জনায় দমকা গমক হয়ে বেরয়...তিমির দিক ভরি ঘোরা

যামিনী/অথির বিজুরিক পাতিয়া/এ ভরা বাদর মাহ্ ভাদর/কৈসে কাটাওব দিন রাতিয়া।'

'রাখো ! কী সব উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছো—বলো তো !'

'কি রকম ? এটা মাঘ মাস নয় তাই বলছিস বুঝি। বৃষ্টি পড়লেই বাদলা হলেই মাঘ মাস ঘনিয়ে আসে। ঋতুতে না হলেও—মনের মধ্যে। মানে মনের মাঘ-বুঝেছিস ?'

'আহা ! আমি জানিনে বুঝি ? পদাবলীর বই পড়িনি নাকি ? তোমাদের বাড়ির সব বই-ই তো তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে পড়েছি—কেবল একটা বাদে। একটা সংস্কৃত বই—তবে তার সঙ্গে বাংলা মানে দেওয়া ছিল। বাৎসায়ন না কার যেন—কামসূত্র না কী ! বইটা তুমি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে, পড়তে দাওনি।'

'খুব খারাপ বই কিনা তাই। তার মধ্যে বিচ্ছিরি সব কথা। আমার হাতে একদিন দেখে না মা আমাকে পড়তে মানা করেছিলেন—এই বয়সে ওসব বই পড়তে নেই নাকি।

'তুমি পড়োনি ?'

'আগাগোড়া। কামসূত্রের তামাম আমার পড়া। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি পড়েছিলাম, টের পায়নি মা। টের না পেলেই তো হলো। মা'র মনে দুঃখ না দেওয়া নিয়ে কথা।'

'কী ছিলো সেই বইটায়, শুনি ?'

'সেসব কথা মুখে আনা যায় না। মানেও বোঝা যায় না ঠিকঠিক। আন্দাজে বুঝে নিতে হয়—তবে একটুখানি ওঁর আঁচ পেয়েছি তার মধ্যেই। এককথায়, সেসব বলবার নয়, বলনীয় না, করণীয়।'

'তাহলে মা'র কথাটা তুমি রাখোনি ? শোনোনি একেবারে ?'

কোন্ কথাটা শুনেছি মা'র ? জীবনে কোন্ কথাটা রাখলাম ! মা'র কথা শুনলে তো মানুষ হয়ে যেতাম রে। এ দশা কি হতো আজ আমার ! চাই কি কোনো মহামানব হয়ে যেতেও পারতাম হয়ত। কী সর্বনাশটা যে হতো আমার তাহলে !'

'মহামানব হওয়াটা কি সর্বনাশের ?'

'কোনো স্বাধীনতা থাকত না তখন কোনো কিছুর। আষ্টেপৃষ্টে বাঁধাছাঁদা ছক বাঁধা গণ্ডীর ভেতর একলাটি—এদিকে ওদিকে তাকাবার যো নেই—এ পাশে সে পাশে বেড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে যে, উপায় নেই তার। সর্বদা ঘেরাওয়ের মধ্যে বাস করো। ঘোরো ফেরো দিন রাত।'

'তোমায় বলেছে ! কেন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ হওয়াটা কি খারাপ ?'

'কে বলেছে ? তাঁরা সব ওপর থেকে নামেন, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন—ভগবানের বিশেষ নির্দেশ নিয়ে। তাই পালন করতে আসা তাঁদের। এ কথা তো মা-ই বলেছেন। আর আমরা ? মাটি ফুঁড়ে উঠেছি সব—ভুঁইফোড় সবাই। যা খুশি করার, যা কিছু হওয়ার স্বাধীনতা গেলে সবই গেল, আমাদের রইলো কি আর। ব্যক্তিস্বাধীনতা সবার চেয়ে বড়ো। তা জানিস ? একথাটাও মা'রই বলা। কিন্তু এটা আমার মনের মতন কথা। এটাই আমি মানলাম। এত উল্টোপাল্টা কথা বলে না মা।'

'মানেটা কী ওর ? ঐ ব্যক্তিস্বাধীনতার ?'

'কে জানে কী মানে ! তবে মোটামুটি আমি বুঝেছি যা—বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর হতে গেলে আর রঙ্গলাল হওয়া যায় না।'

'রঙ্গলালটা কে আবার ?'

'সেই যে—যিনি বলেছিলেন—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায় ?'

'সে হচ্ছে ইংরেজের অধীনতার থেকে মুক্তি—সেই স্বাধীনতার কথাই ওতে বলেছিলেন কবি।'

'আমি সেটা সব রকমের স্বাধীনতায় ধরে নিয়েছি ! স্বাধীনতার কি আবার ভাগাভাগি আছে নাকি ? যোগবিয়োগ হয় ? তবে তুই যে বললি, আমি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়েছি—কোথায় চাপালাম শুনি ?'

'পদবলী কীর্তনে ছিলটা কী, আমার মনে নেই নাকি ? ছিল যে, সখিরে/ হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শুন্য মন্দির মোর।' বলতে বলতে সে গুনগুনিয়ে ওঠে মৌমাছির মতই: তিমির দিক ভরি/ঘোরা যামিনী/অথির বিজুরিকো পাতিয়া/কান্ত পাহুন/বিরহ দারুণ/ফাটি যাওত ছাতিয়া...'

'এই ছিল ?'

'এই ছিল, নয় তো—বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়ব/হরি বিনু দিন রাতিয়া...।...এও হতে পারে।'

'বিদ্যাপতি খুব বিদ্বান লোক হতে পারেন কিন্তু সত্যবাদী নন। আমি বলব।'

'সত্যবাদী নন ?'

'এ ক্ষেত্রে যে না, তা আমি বলতে পারি। বাদলার দিনে মোটেই হরির জন্যে বিদ্যাপতির প্রাণ কাঁদছিল না...'

'তবে কার জন্যে শুনি ?'

'হলে পরে বিদ্যাপত্নীর জন্যেই হবে...'

শুনে সে হাসে—'বিয়ে না হতেই বউয়ের কান্না কাঁদতে লেগেছো ? বউ-এর বিবহ বুঝতে শিখেছ ? টের পেয়ে গেছ এর মধ্যেই ? বটে ?'

'বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনে কী জিজ্ঞাসা ছিল তা জানিস?—'শুধু বৈকুণ্ঠের লাগি বৈষ্ণবের গান ?' বলেছিলেন না তিনি—তাঁর কবিতায়? পড়িসনি?'

'পড়েছি তো।'

'আবার নিজেই সেই প্রশ্নটার জবাবও দিয়ে গেছেন। বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত রহে নিজ কুণ্ঠাভরে। বৈষ্ণবের গান শুধু বৈষ্ণবীর তরে।'

'কোথাও বলেননি এমন কথা, আমার মনে আছে বেশ। এটা তুমি মুখে মুখে বানালে এক্ষুনি।'

'মুখে মুখে বানাবো এত বড়ো কবি আমি হইনি এখনো। মুখে মুখে শুধু একটা জিনিসই আমি বানাতে পারি, কবিতাই হয়ত সেটা, না হলেও কবিতার মতই প্রায়। বানাবো ? বানাবো এখন ? একটা মোটে !' আমি সাধি—'কিংবা আধখানাই—যদি বানাই ?'

'না না না।' সে নিজের মুখ চাপা দিয়ে কয়, 'এখানে ওসব নয়। কেউ যদি দেখতে পায় না—পেলেই আমাদের ধরে জেলের বার করে দেবে। দু'জনকেই। ব্ল্যাক লিস্টে নাম তুলে দেবে আমাদের। কক্ষনো আর জেলে ঢুকতে দেবে না। তোমার এই ব্যক্তি স্বাধীনতা শিকেয় উঠবে—কি করে রঙ্গলাল হবে তখন ?'

॥ সাতচল্লিশ ॥

বেশ কিছুক্ষণ গুম থাকার পর গুমোট কাটে ওর। 'তুমি অবাক করে দিয়েছ আমায়। বড়ো হবার বাসনা নেই তোমার? বিদ্যাসাগর হতে চাও না তুমি?'

'চাইলেই হওয়া যায় বুঝি ? বিদ্যাসাগর হওয়া কি এতই সোজা ভাই।' আমি গুমরাই।

'চাইতে দোষটা কী ? সবাই বড়ো হতে চায়। উচ্চাশা পোষণ করে। তুমি কেমন সৃষ্টিছাড়া যেন ! বাবা বলেন, সাত হাত লাফাতে চাইলে তবে লোকে পাঁচ হাত লাফাতে পারে— সেটাও কিছু কম নয়। সকলেই ধনে মানে জ্ঞানে গুণে বড়ো হতে চায় ; তুমি যেন কী?'

'আমি কিছুই না।' আমার সায় তার কথায় : 'কিছুই হতে চাইনে আমি। আমি শুধু আমিই হতে চাই— আমিত্বের এই অহমিকা ছাড়া কিছুই আর নেই আমার, বুঝেছিস। কিছু না হওয়ার মজাটাই কিছু কম নয় রে!'

'বুঝেছি। কিন্তু ওই আমিত্ব ফলিয়ে চলা তোমার চলবে না—তোমাকে মানুষ হতে হবে—মানুষের মত মানুষ। বড়ো হতে হবে, উঁচুতে উঠতে হবে—আরো—আরো—আরো...'

'রক্ষে কর। আমার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—মনের কোনো কোণেও না। উঁচু নজর নেই আমার, নীচু নজরও নেই অবশ্যি তেমনটা, আমার ইচ্ছাটা কী জানিস? সবার সঙ্গে সমান—সবার মতন সাধারণ হতে চাই—যাকে বলে সমদৃষ্টি—সমতার প্রতি মমতা...'

'তুমি বড়ো হতে চাও না! আশ্চর্যি!' ঘুরে ফিরে তার মুখে সেই এক কথা। আমার নিরাকাঙ্ক্ষা নিয়েই তার মাথাব্যথা যত না!

'বড়ো হওয়ার মত বড় দুঃখ আর নেই। বড় হওয়ার ভারী কষ্ট—তা জানিস? বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনী তুই পড়েছিস? চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, বাড়িতে আছে আমাদের। তোদের পাড়ার লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে পড়িস না। পড়লে জানবি তখন। অনেক দুঃখে তিনি বড় হয়েছিলেন, বড় হয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন। অত দুঃখ কষ্ট সইবার সামর্থ্য আমার নেই ভাই। আমি অমন কষ্টসহিষ্ণু না।'

'অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে বড় হয়েছিলেন তাতে কী, বড় হতে হলে অমনি করেই হতে হয়। তাতেই জীবন সার্থক।'

'কে বলেছে ? ছোট হয়েই বড় সুখ। ছোটখাটতেই যতো সুখ আর মজা আর আনন্দ। অনেক কিছু ছেড়ে ছেড়ে, অনেকখানি ছেড়ে দিয়ে তবেই গিয়ে বড় হতে হয়। বহুৎ ছাড়াছাড়ির পর একটুখানি বাড়াবাড়ি। আমি জীবনের কোনো কিছুই ছাড়তে চাইনে, ছাড়তে পারব না, সব কিছুই পেতে চাই, সব কিছুই হতে চাই আমি। সর্বত্যাগী বিদ্যাসাগর হয়ে কোনো সুখ নেই রে। অনেক আত্মত্যাগ করেই বিদ্যাসাগর আর অনেক আত্মসাৎ করেই আমরা—সর্বসাধারণ! তাঁর দিয়ে যাওয়া আর আমাদের হয়ে যাওয়া। মুহূর্তে মুহূর্তে আদান-প্রদানের মুহুর্মুহু এই হওয়া আমাদের।'

'তোমায় বলেছে! তার মানে তুমি মোটেই পরিশ্রম করতে চাও না— শ্রম বিমুখ—সেই কথাই বলো? অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করলেই বিদ্যাসাগর হওয়া যায়। বিস্তর পড়াশুনা করতে লাগে। বিদ্যার্জন করতে করতেই তো বিদ্যাসাগর হয়।'

'আর, ওইটিই আমার দ্বারা হবার নয়। বিদ্যার্জনে আমার উৎসাহ নেই। আমার বিদ্যাস্থানে

ভয়ে বচ—'

'অথচ ভয়ের কিছু নেই তো পড়াশুনায়। রোজ রোজ অল্প অল্প বিদ্যালাভ—তার ফলেই মহাবিদ্বান হওয়া যায়। বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠা যায় এক দিন। বিন্দুর সঙ্গে আরেক বিন্দু জল—এই মিলেই —বিন্দু বিন্দু জলযোগেই সাগর হয় তা জানো?'

'বিন্দু বিন্দু জলযোগে ডিসপেপসিয়াও হতে পারে তেমনি আবার। স্বাস্থ্য সমাচারে আমি পড়েছি। যখন-তখন টুকটাক খেয়ে খেয়েই অম্বল দাঁড়ায় একদিন।'

'যেটা কিনা তোমার ব্যারাম। সব সময় মুখ নড়ছে! চলছে টুকটাক...'

'পেলে তো খাই, খেলেই তো পাই। টুকটুকে দেখলেই টুকটাক খাই... কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?'

'হচ্ছে কী? বলেছি না যে, কেউ দেখলে পরে তক্ষুনি ধরে জেলের বার করে দেবে? ঢুকতে দেবে না এখানে আর?'

'না দেয় বয়েই গেল আমার! এখানে আসার জন্যে প্রাণ যেন কাঁদছে এমন!'

'না আসতে চাও নাই এলে! কে আসতে বলছে জেলে? কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে পড়াশুনায় মন দেবে বলো! আমিও তাই করব। ইস্কুলে ফিরে যাব আবার। তুমিও যাবে তো, কেমন? পড়াশুনা না করলে মানুষ হবে কি করে? মানুষের মত মানুষ? বিদ্যাসাগর না হতে পারো উপসাগর তো হতে পারবে! মাথা থাকলেই হওয়া যায়।'

'মাথা থাকলেই হওয়া যায় না মশাই, হৃদয় থাকা চাই। মাথা তো কতজনারই দেখা যায়, কিন্তু হৃদয় ক'জনার হয়? বিদ্যাসাগরের মতন অমন হৃদয়—আছে আর কারো? সেই তাঁর ছিল আর আছে এই চিত্তরঞ্জনের।'

'অতশত জানিনে বাপু, বিদ্যালাভ হচ্ছে অর্থলাভের জন্যে এই বুঝি। বিদ্যে না হলে টাকাকড়ি হবে না তাই জানি। আর টাকা কড়ি না হলে কোনো সুখই নেই জীবনে।'

'বিদ্যার মানেই জানিসনে তুই। বিদ্যে তোর ওই পুঁথিগত নয়—অত সোজা নয় ওর মানে।'

'বিদ্যালাভ যে সহজ নয় সবাই জানে।' রিনি বলে : 'কিন্তু সহজ না হলেও ওই বইপত্তর পড়েই তা আয়ত্ত করতে হয়, বুঝলে?'

'বিদ্যা মানে বিদ্যামানতা। সেটা পুঁথিগত নয় মোটেই, অস্তিত্বগত। সোজা কথায়—হওয়ার মধ্যে। বিদ্যে বিদ্যে তো সবাই করে, কিন্তু তার মানে জানে ক'টা লোক? জানে শুধু আমার মা—মা'র কাছ থেকেই জানা আমার।'

'মোটেই সহজ মানে না। তা জানি।'

'নয়ই তো! বিদ্যার মর্ম বোঝা মোটেই সহজ নয়, বিদ্যাটাই সহজ। বিদ্যা সর্বদাই হচ্ছে—আমাদের দেহে মনে জীবনে—হচ্ছেই। হয়ে চলেছি অবলীলায়। যেমনটা নিশ্বাস প্রশ্বাস, যেমন কিনা রক্ত সঞ্চালন, তার মতই হচ্ছি সহজে। সেটা টের পাবার বুদ্ধি যখন তোর হবে....তোর কিংবা আমার, কিংবা অপর কারো—তখনই তার বিদ্যাবুদ্ধি হয়েছে, বুঝলি?'

'ছাই বুঝলাম।'

'তুই নিজে হচ্ছিস তা বুঝতে পারিস না? কিসে হচ্ছিস, কিসে তোর নিজের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিস, সেটা ঠাওর হয় না তোর? বলিস কি রে! সেই অস্তিত্ববোধ হওয়াটাই তো

বিদ্যমানতা—সেইটেই বিদ্যা। মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে হলে তো জানা যায়, যায় না? সেটা মনের বিদ্যমানতা। মনের সেই ইচ্ছাটাকে কর্মের দ্বারা জীবনে বিদ্যমান করা, মানে কিনা, রিয়্যালাইজ করার কৌশলই হচ্ছে বিদ্যা—কৌশলই বল আর বুদ্ধিই বল। বিদ্যা আর বুদ্ধি প্রায় এক জিনিস—হরিহরাত্মা। একটা হলেই আরেকটা হয়।'

'এই হচ্ছে বিদ্যার মানে?'

'হ্যাঁ, এই বিদ্যার দ্বারাই, সেই যে বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে বলেছে না—সেই অমৃত লাভ করা যায়। আমার বাবা কথাটা প্রায়ই আওড়ান কিন্তু মানে জানেন না মোটেই—জানে আমার মা। এবার তো বুঝলি?'

'বিদ্যায় অমৃত লাভ করা যায়? অমৃতটা কী? সেই যে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে লেখা থাকে দেখেছি—যেনাহাং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিম কুর্য্যাম? সেই অমৃত?'

'সেই অমৃতই। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবো?'

'দাও।' সে ঘাড় নাড়ে।'

'ধর এখন আমার মনে যে ইচ্ছাটা বিদ্যমান, যে ইচ্ছেটা হচ্ছে, সেটা যদি আমার কাজ দিয়ে এই জীবনে ফলাও করি তাহলে যা হয় কিনা তাই হোলো বি-বি-বি-বি-'

বিদ্যা বিতরণে বাড়ে। বিতাড়িত বিভূতি লাভের পর আমার মুখ ফোটে—'এই যে আমরা মুহূর্তের জন্য বিদ্যমান হলুম না? পরস্পরের অস্তিত্ব বোধ করলুম তো? সেই বিদ্যাটাই হোলো গে অমৃত। আর তাই হোলো গে আমাদের হওয়া।'

'তুমি মোটেই কোনো শিষ্ট আচরণ শেখোনি। হচ্ছে একটা সিরিয়াস কথা, তার মধ্যে এই ছ্যাবলামি? এটা কি শিষ্টতা?'

'সেই জন্যেই তো বিশিষ্ট হতে চাইনে রে। বিশিষ্ট হতে গেলে শিষ্ট হ'তে হয় গোড়াতেই। বড় হওয়ার ভারী অসুবিধে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা চলে যায়। আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকে না। যা খুশি হওয়া যায় না, যা ইচ্ছে করা যায় না। যা ইচ্ছে তাই হওয়ার করার অধিকার চলে যায়।'

'তুমি যাচ্ছেতাই হয়ে যেতে চাও?'

'পদে পদে বাধা পেয়ে বাঁচতে চাই না। প্রতি-পদে বাধ্য হয়ে বেঁচে কী সুখ? সামনে ঘোর অমাবস্যা নিয়ে? আমি চতুর্দশীর চোদ্দ কলায় পূর্ণ হয়ে বাঁচতে চাই—যখন কিনা সামনে আমার পূর্ণিমা। মানে, তুই বা তোর মতই কেউ আমার সম্মুখে। তখন আমার মুখে যা আসে বলব, করব।'

'নাঃ, তোমাকে মানুষ করতে পারলাম না।' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার—'আমি চাইছিলাম তুমি মানুষ হও, মানুষের মত মানুষ হও একটা।'

'আমাকে মানুষ করতে চাইছিলিস নাকি? আমার মা হার মেনে গেল আর তুই পারবি?' আমি হাসলাম —'তবে হ্যাঁ, কখনো যদি তুই হার ম্যাজেষ্টি হোস তখন কী হয় বলা যায় না। তখন আমার হার অনিবার্য।'

'যাঃ—ওঃ!'

'তবে এ মণিহার আমায় নাহি সাজে—এ কথা আমি বলবই। তা হলেও এমনই হার চাই আমি, যে-হার কিনা কবির ভাষায় মুক্তোর হারই হবে নির্ঘাৎ! তা হলেও আমার সে হার.....

সেই হার...কবির ভাষায়...তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়। জয় আবার ইংরিজি বাংলা দুই বানানেই হয়। এক কথায়, পরাjoy স্বীকার।'

'কথা শিখেছ খুব। আজেবাজে যত নভেল পড়ে বেজ্ঞায় পেকে গেছ এই বয়সেই। পাকা পাকা কথা কইতে পারো খুব।' সে বলে, 'তোমার মত কোনো ছেলের মুখে এ সব কথা—এ ধরনের কথা কখনো শুনিনি।'

'তারা সব বিদ্যাসাগর হবে—সাগর না হলেও বিদ্যের আড়ত হবে নিশ্চয়ই। আদব কায়দায় রপ্ত হয়ে কায়দাকানুনে পোক্ত হয়ে একেকটা দিগ্‌গজ হবে তারা। আমি সে অসুবিধার মধ্যে পড়তে চাই না...'

'অসুবিধার মধ্যে?'

'অসুবিধা নয়! যখন যা খুশি করতে পারব না, যা ইচ্ছে খেতে পাব না, তার চেয়ে ঘোরতর আর কী আছে? সাধারণ লোকের নানান সুবিধে, অসাধারণের তা নেই। ধর, আমি রাস্তায় আলুকাবলি খেতে পারি...খেতে খেতে যেতে পারি, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর হলে? লোকে আঙুল দিয়ে দেখাবে—বিদ্যাসাগরটা কী করছে দ্যাখো না! আমার ওপর নজর থাকবে সবাইকার। আমি কাউকে নজর দিতে পারব না, নজরানা তো নয়ই। তা হলেই নিন্দে রটবে। আমার নিন্দের আমি পরোয়া করিনে...অতো নিন্দে-মন্দর ভয়ে ভয়ে চললে বাঁচার মতন বাঁচাই হয় না কিছু করা যায় না জীবনে। নিজের কলঙ্ক কেয়ার করিনে, কিন্তু বিদ্যাসাগর-গোত্র হয়ে সারা বিদ্যাসাগর সমাজের মুখে কালিমা লেপন করতে চাইনে আমি।'

'রাস্তায় ওই আলুকাবলি খাবার খাতিরেই?'

'কেবল আলুকাবলি কেন, আরো কতো কীই তো খাওয়া যায় রাস্তায়। রাস্তা ছাড়া জায়গা কোথায় খাবার? আমার কি বাড়িঘর আছে? আমার খাবার রাস্তা ওই রাস্তাতেই। পাবার রাস্তাও সেইখানে। ভালোমন্দ কিছু খেতে হলে, পেতে হলে, ওই পথচলতি। পথে যেতে যেতেই খেতে হয় আমায়!'

'কোনো ভদ্রলোক কখনো রাস্তায় খায়?'

'ভদ্রতার বালাই অনেক, বলছি না? ভদ্রলোক হতে চাইনে সেই কারণেই। এমন কি, চলার পথে সাথী, মনের মত সঙ্গী হলে—কবির কথায়, আমার পথ চলাতেই আনন্দ! দুজনে মিলেই খেতে খেতে যাও না! বাধা কী? কিসের অসুবিধে? এমন কি, যে জিনিস দুজনে মিলেই খাব, খাওয়া যায় নাকি যুগপৎ, পেলেই খায় আর খেলেই পায় যে জিনিস, তাও তুমি ওই যেতে যেতেই খেতে পারো, খেতে খেতেই যেতে পারো...'

'সেই যুগপৎ জিনিস? রাস্তায়?' শুনেই সে হাঁ হয়ে যায়।

হাঁ-করা মেয়ে আমার মোটেই সহ্য হয় না। বিশেষ করে চোখের সামনে। আমি সেই হাঁকারটা অবলীলায় বুজিয়ে দিতে যাই...

কিন্তু আমার মুখবন্ধের ভূমিকাতেই সে হাঁ হাঁ করে ওঠে—। 'ও কী হচ্ছে? বারণ করলাম না তোমাকে?'

'না দিস নাই দিলি! তার জন্যে তোর সঙ্গে মারামারি করতে চাইনে। জানি তো, এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। তবু যতই বেড়ে হোক না, কেড়ে নেবার জিনিস নয়। তবে একথাও কই, একটা না হোক, আধখানা দিতে

পারতিস। চাঁদমুখের অর্ধেক দিয়ে ওইভাবেও কি আমায় অর্ধচন্দ্র দেওয়া যেত না?'

'অমন করলে এখান থেকে উঠে যাবো—একতলায় শোব গিয়ে।'

'তোর কম্বল-টম্বল সব নিয়ে? তাই যা। কোন দুটি তোর, মার্কা মেরে রাখিনি তো। ওপরের দুটোই টেনে নে তাহলে...'

'দুটো চাইনে, একটাই ঢের। একটাতেই হবে আমার। সেটাই পাতবো, তারই আধখানা গায়ে জড়ানো যাবে। একটাতেই হবে।'

'শীত করবে না?'

'আমাদের মেয়েদের অতো শীত করে না গো। দার্জিলিঙের ঠাণ্ডাতেও মেয়েরা ফিনফিনে শাড়ি পরে ঘোরে, দ্যাখোনি?'

'কবে আর দেখলাম। তোরা বড়লোক, দার্জিলিং গেছিস— আমার এজন্মে দার্জিলিং নেই। তবে হ্যাঁ, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি বটে, আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় আকাশ ফাঁকা থাকলে।...আরেকবার দেখেছিলাম বটে কাঞ্চনজঙ্ঘা.. .সেই ছাদেই...' আমার মনে পড়ে। — 'সে-সে-সে-সে-সেই কা-কা-কা-কানচন...' কথাটা মুখে আনতে দাঁতে দাঁতে খিটিমিটি বাধায়, কাঁপুনির মধ্যে কাঁদুনি হারিয়ে যায় আমার।

'ও মা! এ কী, কাঁপছ যে তুমি?'

'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ...' হি হি করতে করতে আমি হাঁ হাঁ করি।

'এত শীত করছে তোমার?'

'করবে না? একটু আগে বর্ষাটা হয়ে গেল না? তারই বর্শা এসে আমায় বিদ্ধ করছে এখন। এতক্ষণে। কী রকম করছে যে! দারুণ শীতে মানুষ হার্টফেল করে তা জানিস?'

'বাবার মুখে শুনেছি বটে। তুমি এমন শীতকাতুরে তা তো জানতুম না।' সে আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখে—'হ্যাঁ, কাঁপছো তো সত্যিই!'

এক হাতে শক্ত করে জড়িয়ে আমার কাঁপুনি সে থামাতে চায়।—

'তিনখানা কম্বলে কি এই শীত শানায় রে।' তার বাহুবেষ্টনে কম্পান্বিত আমি কই।

'আরেকটা কম্বল এখন কোথায় পাই!'

'কম্বল নয়, লেপ হলে হতো।... লেপের বদলে তুই হলেও হয়...তুই যদি কিনা সেই লেপ হয়ে যাস্! গায়ের ওপর তোকে লেপের মতন টেনে বিছিয়ে নিলে হয়। তা হলে তোর চাপে আর গায়ের তাপে শীতটা যায়। কিন্তু তা কি আর হয় নাকি! সেটা তো অভদ্রতা হয়ে যাবে। তাই না?'

সে চুপ করে থাকে। তাকে ভাবিত দেখা যায় যেন।

'থাক গে। তা চাই না। তার চেয়ে তার চে-চে-চে-চে...' হিহিকারের সাথে আমার হাহাকার ব্যক্ত হয়—'আজ রাত্তিরেই আমার হার্টফেল হয়ে যাক না-হয়! রাত আরো গভীর হলে শীত আরো পড়বে। শেষ রাত্তিরেই...'

রাত্রিশেষ অবধি এগুতে হয় না, তার আগেই— সেই মুহূর্তেই সে নিজেকে আমার ওপর বিছিয়ে দিয়েছে—প্রলেপের মতই।

স্বর্গীয় উত্তাপে সঙ্গে সঙ্গেই গরম হয়ে উঠেছে আমার মন। আর মন, যেকালে দেহেরই অঙ্গীভূত, অথবা দেহই মনের অঙ্গীকার—সঙ্গীভূত হয়ে সেও গরম তৎক্ষণাৎ।

'বাব্বা! এতক্ষণে কাঁপুনিটা থামলো তোমার? যা কাঁপছিলে না! কিন্তু এভাবে আমাদের কেউ দ্যাখে যদি,কী ভাববে কে জানে!'

'দেখছে কে? এই শীতে কম্বলের বাইরে মুখ বাড়িয়ে বসে আছে কেউ? সবাই এখন গুটিসুটি মেরে কুকুরকুন্ডলী। তা ছাড়া, ভাববেটা কী? তুই তো আর মেয়ে নোস। ছেলেই এখন। একটা ছেলের ওপরে আরেকটা ছেলে শুয়ে—তাতে কার কী ভাবার আছে? ভাবাভাবির কী আছে এতে?'

'তুমি জানো না, ভাবুক লোকরা ভাবেই। না ভেবে তারা পারে না।' সে তার ছোট্ট মাথাটি নাড়ে, 'সবতাতেই তারা ভাবে, সব কিছু নিয়েই ভেবে থাকে। ছেলেদের এই বেয়াড়াপনাও তাদের ভাবনার বিষয় হতে পারে। যারা নিজেরা কাউকে ভালোবাসেনি, বাসে না, বাসতে পারে না, তাই কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাদের ভারী খারাপ লাগে। বেজায় বিসদৃশ লাগে তাদের কাছে।'

'লাগুক গে, বয়েই গেল আমাদের! আমাদের কাছে তো অমৃতসদৃশ! তাহলেই হলো। কিন্তু আমি কী ভাবছি জানিস?' বলে একটুখানি ভাবি—'বলবো কথাটা?'

'বলো।'

'মুখ ফুটে বলা যায় না যে কথাটা। মুখ বুজেই বলতে হয়। আর, মুখটি বুজেই শুনতে হয়--বুঝলি? মুখ বুজেই কথাটা বুঝবার, তা বুঝেছিস?'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! তুমি হাঁ করলেই তোমার কথার আমি আঁচ পাই। পেয়ে যাই এক আঁচড়ে—তা জানো?'

আঁচ পেলেও, না আঁচানো পর্যন্ত ঠাওর পাওয়া যায় না ঠিক। মানে পাওয়া যায় না প্রমাণে। কথাটা বৈষ্ণব পদাবলীরই একটা কলি, কিন্তু মুখের ভাষায় তার তত্ত্ব ঠিক ব্যক্ত হয় না, গানের ভাষাতেই বলা যায় বোধ হয়। কিন্তু যেভাবে মুখর হব, সুরের সেই গলা কই আমার?'

বৈষ্ণব পদাবলীর সেই কলিকে অগত্যা আমার সম্মুখেই প্রস্ফুটিত করি—'কথাটা কী জানিস , এখন আমার যা মনে হচ্ছে না, তার কথাটাই রয়েছে এই কথায়। বৈষ্ণব কবির এই কথাটা রে। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে। পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।'

'বুঝেছি। কিন্তু বুঝলেই বা আমি তার কী করছি ! তোমার এ কান্না থামানো তো আমার কম্ম নয়। বিয়ে করে টুকটুকে একটি বউ নিয়ে এসো ঘরে। সে-ই যথাসময় যে তোমার এই দুঃখ দূর করবে। তাতেই গিয়ে সুরাহা হবে তোমার।'

'আমাকে আর এখানে সেখানে রাহাজানি করে বেড়াতে হবে না বলছিস? কিন্তু তেমনটি পাই কোথায়! সেই বহুরত্ন—তোর মতই হুবহু আরেকটা কি কোথাও পাওয়া যায়?'

'তপিস্যে করো।' সে বলে—'আমরা যেমন বর চেয়ে শিবরাত্রি করি...'

'আমার তপস্যা করা লাগে না। না চাইতেই পেয়ে যাই সব। আমার মা-ই আমায় পাইয়ে দেয়। এই যেমন, অযাচিত তোকে এখন আমার বুকের ওপরেই পেয়েছি...আমার মুখের এত কাছটিতেই...'

আমি ঐরূপ বলি। আর বলতে বলতে বৈষ্ণব পদাবলীরই আরেকটি কলি আমার মুখের ওপর ফুটে ওঠে—

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু/
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা/
জীবন যৌবন সফল করি মাননু...
দশদিশ ভেল নিরদন্দা/
আজু মঝু দেহ/দেহ বলি মাননু/
আজু মঝু গেহ ভেল গেহা/
আজু বিহি মোহে/অনুকূল হোয়অল/
টুটল সবহু সন্দেহা/পাঁচ বান অব/
লাখ বন হোউ/মলয় পবন বহুমন্দা/
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু...'

'চুপ।' এক কথায় সে চুপ করিয়ে দেয় আমায়—যে কথাটা মুখ বুজেই কইতে হয় আর মুখ বুজেই শুনতে হয় নাকি সব সময়। হ্যাঁ-করা নেহাত অবুঝ ছেলেরও বুঝবার দেরি হয় না যে কথা।

॥ আটচল্লিশ ॥

সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে দেখি সে আমার পাশটিতে শুয়ে। বক্ষ বিহারের থেকে কখন সে আমার পার্শ্বদেশে নেমে এসেছে কিছুই টের পাইনি।

'নামলি কখন? টের পাইনি তো!'

'যখন তোমার কাঁপুনিটা থামল, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ দেখলাম—তার পরেই।'

'ঘুম হয়েছিল তোর?'

'ঐ ভাবে শুলে কখনো ঘুম আসে? অমন করে ঘুমোনো যায় নাকি?'

'আমি তো তোর গরমের আওতায় চমৎকার ঘুমিয়েছি। কিন্তু আমি তোর লেপের আরাম পেলেও তোকে তো আর গদির মজা দিতে পারিনি...খটখটে এই ক'খানা হাড়ের খট্টাঙ্গে শুয়ে...সত্যিই।' যথার্থই আমার দুঃখ হয় ওর জন্যে।

'শরীরটা বাগালেই পারো। কষ্ট করে দিনকতক নিয়মমত একটু ব্যায়াম করলেই মাসকুলার বডি বানানো যায়। তোমার বন্ধুর মতই চমৎকার চেহারা হতে পারে।'

'বন্ধু আবার কেটা আমার? কার কথা কইছিস?'

'দেবেন তোমার বন্ধু না। তার কথাই বলছিলাম।'

'তার চেহারাটা খুব ভালো বুঝি?' ওর কথায় আমার কান জ্বালা করে, প্রাণে জ্বালা ধরে যায়।

'ভালো নয়? গদির মতন নাদুস-নুদুস না হলেও...তাহলেও গদ্‌গদ হবার মতই চেহারা বইকি।'

'বুঝেছি।'

আমার মনে গুমোট নেমে আসে, আমি কোনো কথা কই না আর। দেবেনের ওপর এমন রাগ হতে থাকে আমার যে...! কিন্তু সেই অন্তর্দাহের ওপরেই রিনির সদুপদেশের কথামৃত বর্ষিত হতে থাকে।

'খালি যদি তোমার শরীরটাই বানাও, স্বাস্থ্যটাই মজবুত করো, কেবল দেহটা বাগাতে পারলেই অর্ধেক মানুষ হওয়া যায়। তার পরে ফের কিছু বিদ্যে সাধ্যিও হয় যদি —বাকী আট আনাও এসে গেল তোমার। তার ওপর যদি টাকাকড়িও হয় আবার...এমনটা হলে হতে বাধ্যই, তখন তো ষোলো আনার ওপর আঠারো আনাই হোলো— পুরোপুরিই মানুষ হয়ে গেলে।'

'মানুষ হয়ে কাজ নেই আমার। কোনো গরজও নেই তেমন।'

'আর কিছু নয়, রোজ একটুখন আলাদা করে সময় রেখে একটুখানি ফ্রি-হ্যান্ড একসারসাইজ করলেই হয়। তাতেই ঢের। আমার দাদারা তো তাই করে। তাদের শরীর দেখেছো কেমন? তোমার ওই দেবেনের মতন অত সুঠাম না হলেও ভালোই বলতে হবে। তাও যদি না পারো—না করতে চাও তো মাইলটাক রোজ দৌড়লেও হয়। বাবার মতে দৌড়টাও কিছু খারাপ ব্যায়াম নয়। এমন কি, জোর কদমে কিছুক্ষণ হাঁটলেও হয়, তাতেও দম বাড়ে। সেও অনেকখানি।'

'কার জন্যে দৌড়ব শুনি?'

'কেন, আমার জন্যেই। রোজ সকালে কি বিকেলে, যখন তোমাব সুবিধে, আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবে। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। আর তোমার সেই আসাটা নেহাত পায়চারিতে না হয়ে এক দৌড়েই হয়ে গেল না হয়! একটু তাড়াতাড়িই এসে পৌঁছবে তাহলে।'

'যাব যে, তোদের বাড়ির ঠিকানা কি দিয়েছিস আমায়?'

'ঠিকানা দিতে লাগে না। কতো বড় রাস্তা আহিরিটোলা, ক'খানা বাড়ি সেখানে। একটা রাস্তায় ক'জনা ডাক্তার থাকে গো? পাড়ার সবাই সেখানকার ডাক্তারকে চেনে। চিনে রাখে, এলাকার প্রায় সবাই পেশেন্ট, কখনো না কখনো যেতেই হয় ডাক্তারের কাছে—খবর রাখতে হয় ডাক্তারের।'

'খবর কেউ কখনো দেয় নাকি কাউকে? কলকাতার লোকদের তুই এখনো চিনিসনি রিনি। কাউকে যদি শুধোই তিপ্পান্ন নম্বর বাড়িটা কোথায় দাদা? বলবেন দয়া করে? তক্ষুনি তার জবাব আসবে, ঐ যে, বাহান্ন নম্বরের ঠিক পরেই—বুঝলে দাদু? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। লাও ঠ্যালা।'

'আহা, নাই কেউ জানলো, তাই বলে কি কোনো ডাক্তারের পাত্তা পাওয়া যায় না নাকি? ডাক্তারের বাড়ির সদরে দরজার গায়ে তাদের নেমপ্লেট লাগানো থাকে না? তাই দেখেই তো বোঝা যায়, কে ডাক্তার, আর কে ডাক্তার নয়—কার নাম কী। তার থেকেই তুমি ঠাওর পেতে কোন্ বাড়িতে আমি থাকি। পেতে না?'

'তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু আমি এধারে তোর জন্যে ছুটোছুটি করে মরি আর তুই ওধারে পাড়ার কোনো মাসকুলার বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়িস বেড়াতে। আমার আসার আগেই ফুড়ুৎ!'

'তা কখনো হয় না গো। বাজিয়ে একবার দেখলেই না হয়?'

'না বাজিয়েই তোর যা ঢং দেখছি না।' আমার ঢনৎকার ওর কথায় : 'বাজালে তো' তোর ঢঙের আর অন্ত থাকবে না!'

রিনি বলে, 'আমি কোথ্থাও নড়বো না বাড়ির থেকে—তুমি দেখো। তুমি আসবে আর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব , তোমার ওপর কি একটুখানিও টান নেই আমার—তুমি বলতে চাও?'

'বেশ, সেটা হাতে হাতেই বাজিয়ে দেখা যাক্ না। আমার ওপর যা তোর টান তা বোঝাই গিয়েছে।' আমি তক্ষুনি তাকে টেনে দেখতে চাই।

'না না না। দেখছ না কখন সকাল হয়েছে। এতক্ষণে জেগে উঠেছে সব্বাই। কেউ আর এখন কম্বলের তলায় মুখ গুঁজে শুয়ে নেই।'

'কেউ তোর দিকে তাকাচ্ছে না। তুই তো আর মেয়ে নোস যে, তোর দিকে তাকাবে। আমি ছাড়া তোর দিকে দৃকপাত করার কে আছে এখানে আর?'

'অনেকে আছে। তুমি জানো না—তুমি কিছুই জানো না। সুন্দর ছেলেকেও লোকে তাকিয়ে দ্যাখে। তা জানো?'

'সে খালি তোরা মেয়েরাই তাকাস—এই ছেলেদের দিকে।'

'না মশাই, অতো নেকনজর নেই আমাদের ছেলেদের ওপর। আমরা মেয়েদেরই বেশি লক্ষ্য করি। মেয়েদেরও ঠিক নয়, তারা কী পরেছে আর কেমন সাজগোজ করেছে তাই দেখি আমরা। কিন্তু তোমাদের ছেলেদের দুদিকেই নজর—মেয়েদের দিকেও তাকাও, আবার ছেলেদের দিকেও লক্ষ্য থাকে।'

'তোর ওপর এখানে তাক পড়েছেও নাকি কারো? কারো নজরানা পেয়েছিস তুই?'

'বলব কেন? আর বললেও তুমি বুঝতে পারবেনা। সে অন্য রকম চাউনি—যার জন্য কেবল সেই বুঝতে পারে, আর কেউ নয়। যে বোঝে সেই বোঝে কেবল। সে আরেক রকমের দৃষ্টি!'

'কি রকমের দৃষ্টিটা? দেখে মূর্ছা যাবার মতন? নাকি, একটু একটু সন্দিগ্ধ? হয়ত তুই ঠিক ছেলে নোস তাই ভেবেই...?'

'না না, সে সব নয়। সে রকম সন্দেহ কারো হয়নি। কি করে হবে, যা একখানা ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি না ধরবার যো নেই কারো।'

'তবে আবার কী ভাবে তাকাবে...আহা মরি চাউনি যদি না হয়!' রকমারি নজরের কোনো আমি ঠাওর পাই না। তার কোনো নজির কখনো পাই নি তো?'

'সে তুমি বুঝবে না। সে আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারব না । সে যেন কেমন একরকমের চাওয়া! যাকে চায় সেই টের পায় কেবল।'

'বুঝেছি। ওই বলে তুই আমায় ভোলাতে পারবিনে। তুই যে তোর বাসায় আমার মুখাপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকবি আমি তার প্রমাণ চাই। সেটা আমি হাতে হাতে পরীক্ষা করে দেখতে চাই...'

'হাতে হাতেই?'

'হাতে হাতে নয়, মুখোমুখি। আমার সম্মুখেই...এখানেই..এক্ষুনি।'

'কক্ষনো না। বাড়ি যেয়ো আমাদের—তখন যত চাও, যত খুশি... যত ইচ্ছে তোমার...'

'না। তুই কাল সারা রাত আমায় গাল দিয়েছিস, আমি তার কোনো জবাব না দিয়ে ছাড়বো? তার শোধ আমি নেব না—ভেবেছিস তুই ?'

'না না না। এখানে এত লোকের সামনে, এত জনার চোখের ওপর...কে কোথায় তাকিয়ে আছে, লক্ষ্য করছে আমাদের—কে জানে! এখানে না, এখন না, দোহাই লক্ষীটি। দেশের জন্যে জেলে এসে এমন করে নিজেদের মুখ পোড়াতে নেই।'

'না..আমি শুনব না...কিছুতেই না...'

'ওমা, সত্যি তো! মুখটা তো পুড়িয়ে দিলে সত্যিই! কী হয়েছে তোমার গা? গালটা এমন ছ্যাঁৎ করে উঠল যে আমার?'

'কিচ্ছু হয়নি—কী আবার হবে আমার ? কেন, এখন আবার যে ?... আমায় গাল দিচ্ছিস যে বড়ো ? না সাধতেই নিজের থেকেই দিচ্ছিস যে ফের ?'

'তোমার গা এত গরম কেন গা ? জ্বর হয়েছে বোধ হয়। রাত্তিরের সেই কাঁপুনি দেয়া ঠান্ডাটা লেগেই...' ভালো করে আমার আঁচ নিয়ে তার পরে সে আঁচায়—

'বেশ জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জাই হবে হয়ত। তোমার এমন জ্বর হয়েছে আর তুমি তা টের পাচ্ছ না ?'

'তুই থাকতে তোকে ছাড়া আর কিছুই আমি টের পাই না। টের পেতেও চাই না আর কিছু।'

'দাঁড়াও, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আগে।' বিছানার ওপর সে উঠে বসে—বসে চারদিকে তাকায়—'জেলের আপিসে গিয়ে খবর নিই গে। জেলখানায় ডাক্তারখানা থাকে আমি জানি। সব জেলেই থাকে, না থেকে পারে না। এখানেও আছে নিশ্চয়। হাসপাতাল, ডিসপেনসারি সব আছে। আমার বাবা যখন মহকুমা শহরে কাজ করতেন তখন তিনি যেমন জেলার ডাক্তার, তেমনি ঐ জেলের ডাক্তারও ছিলেন। রুগী দেখতে বাবাকে নিয়মিত যেতে হত জেলখানায়।'

'না, তোকে কোথাও যেতে হবে না। এখানে থাক। আমার কাছে থাক। তুই থাকলেই ভালো থাকব আমি।'

'কতক্ষণের জন্যে গো ? যাব আর আসব তো। তারপর সারাক্ষণই থাকব এখানে। আমার তো জেলে থাকা ছাড়া কোনো কাজ নেই আর। খালি খাওয়া আর শোয়া।'

'আমারও কাজ প্রায় তাইতো ভাই। শোয়া আর খাওয়া। শুয়ে শুয়ে খালি খাওয়া কেবল।'

'সেকথা বলছিনে। বলছি যে এখানে নাওয়া-টাওয়া তো নেই একদম—সে পাটই নেই যে দু'মাস এখানে আছি। যা-ব্যান্ডেজ বেঁধেছি না, কাউকে আর টের পেতে হবে না আমাকে। কিন্তু নাইতে গিয়ে খালি গা করলেই হয়েছে।'

দরকার কি নাইবার ? নেয়ে-টেয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে। আমিও তো নাইব না। শীতে আবার নায় কে ?'

'কেন, তোমার আবার কী হোলো ? নাইবে না কেন ? নাইতে কী হয়েছে তোমার ?'

'আমারো খালি গা হতে লজ্জা করে ভারী। এত লোকের সামনে...সবার কেমন সুগঠিত শরীর—আর তার মধ্যে আমার এই হাড়-জিরজিরে চেহারা নিয়ে সকলের চোখের ওপর...'

'ব্যায়াম করতে বলছি তো সেই জন্যেই গো। দেখতে না দেখতে ওদের মতই হয়ে যাবে দেখো।'

'ওদের সব জন্ম থেকে পাওয়া—ব্যায়াম করে পায়নি কেউ। তবে কেউ কেউ তার ওপরেও ফের ব্যায়াম করে কিছু বাড়িয়ে থাকতে পারে—ঐ দেবেনের মতই হয়ত।'

'একই কথা। কেউ বড়লোক হয়ে জন্মায়, কাউকে আবার জন্মাবার পর বড়লোক হতে হয়। বড়লোক হওয়া নিয়ে কথা।'

'তবে হ্যাঁ, বাহাদুরি বটে তোর।' কথাটা আমি পালটাই : 'যা একখানা ব্যান্ডেজ বেঁধেছিস না। তোর বাঁধুনির তারিফ করতে হয়। তুই ডাক্তারি পড়লে পারিস—বড়ো লেডি ডাক্তার হবি। নির্ঘাৎ।'

'হবো তাহলে। পড়বো তাহলে—যদি তুমি ডাক্তারি পড়ো, ডাক্তার হও—আমি কথা দিচ্ছি তোমায় তুমিও ডাক্তার হবে, আমার সঙ্গে তোমাকেও হতে হবে কথা দাও তবে।'

'ইস, কী মুশকিলে যে পড়লাম! তুই আমায় মানুষ না করে ছাড়বি না দেখছি—তোর মতন মেয়ের পাল্লায় পড়লে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কারো কিছু থাকে না আর।' আমি হাঁফ ছাড়ি—'আচ্ছা, হবো ডাক্তার। হবই না হয়,কী হয়েছে ? এখন তো নয়, পরে। পরের কথা পরে। যখনকার কথা তখন। যখন হব তখন দেখা যাবে।'

'এখনকার কথা হচ্ছে, এখানকার ডাক্তারের খবর নেওয়া। এক্ষুনি যাই—দেরি করলে বেশি বেলায় ডিসপেনসারিতে ভিড় জমে যায় বেজায়।'

আলতো করে একটুখানি আদর ছুঁইয়ে সে উঠে পড়ে—'চুপ করে শুয়ে থাকো লক্ষীটি। নেমেটেমো না। বেরিয়ো না বাইরে। জেলের গেটের কাছেই আপিসটা তো ? যাবো আর আসবো।'

একটু বাদেই ফিরে এসে জানাল—'হ্যাঁ, আছে এই জেলে ডাক্তারখানা। ওষুধ দেয় রুগীদের—তবে এখানে তারা কেউ তোমায় দেখতে আসবে না, সেখানে গিয়ে দেখাতে হবে।'

'বলল বুঝি আপিসে ?'

'না, আপিস পর্যন্ত যেতে হয়নি। বেরুতেই তোমার বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তার কাছেই জানলাম। এর মধ্যেই সে এখানকার সব কিছু জেনেছে...দেবেনদাই বলল আমায়।'

'অ্যাঃ, তুই কী বললি ?' ফোঁস করে উঠলাম আমি শুনেই না—'এর মধ্যেই দেবেনটা তোর দাদা হয়ে গেছে ? দেবেনদা ?'

'বাঃ রে। সে আমায় গোড়ায় রিনিদি বলল যে ? দাদা না বলে আমি কী করি তখন ?'

'রিনিদিও বলা-টলা হয়ে গেছে বটে ? টের পেয়েছে সে এর মধ্যেই ? সমস্ত ?'

'হ্যাঁ, আমাকে ও রিনিদি বলেছে বটে, কিন্তু আমাকে ঠিক বলেনি। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সে-ই আগ বাড়িয়ে এসে শুধোলো—তুমি রিনিদির ভাই না ? তাই না ? তক্ষুনি আমি যা সামলে নিয়েছি না। বলেছি—কী করে টের পেলেন ? সে বলল, রিনিদির মতই দেখতে কিনা অবিকল। তোমার নামটি কী ভাই ? আমি বললাম—রিনটু। আবার কেমন সামলে নিয়েছি দ্যাখো। তখন সে বলল, বাঃ, বেশ নাম তো। রিনি নম্বর টু রিনটু। রিনিদিকে আমি দিদি বলি তো। তুমিও তাই বলো। আমরা তাহলে ভাই ভাই হলাম আজ থেকে, কেমন কিনা ? তার জবাবে তখন আর আমি কি করি ? বললাম, হ্যাঁ, দেবেনদা। আজ থেকে তাই। আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছি তার কথায়, কী করব ?

'কি আর করবি। সত্যি। ছেলের মতই কাজ করেছিস। কিন্তু সেই পার্কের থেকে থানায়

আসার পথে কোন্ ফাঁকে যে সে তোকে দিদি বলে ডেকেছিল, আমি তো টেরই পাইনি।'

'আমিও না। এর আগে তার সঙ্গে আলাপই হয়নি আমার। দিদি হওয়া তো দূরের কথা। ...হয়তো মনে মনে ডেকে থাকবে।'

'ভারী মিথ্যুক তো ছেলেটা।' এমন রাগ হতে থাকে আমার দেবেনের ওপর—'এক নম্বরের লায়ার। হামবাগ কোথাকার। ফেথলেস, ট্রেচারার্স, বিশ্বাসঘাতক।'

'ছেলেরা ওরকম বানিয়ে বলে, বাড়িয়ে বলে থাকে, ওতে কোনো দোষ হয় না। পরের মন-রাখা কথা কইতে ওরা ওস্তাদ। পরী হলে তো কথাই নেই।'

'ওর মন-রাখা কথা আমি বার করছি। বদমাইসের ধাড়ি। পাজি ইস্টুপিড গাধা আহাম্মোক...।'

'আহা, রাগছো কেন এত ?'

'রাগব না ? পরের দিকে হাত বাড়াতে চায় ? পরের জিনিস লুফে নিতে হাত বাড়ায় ! লোফার একটা—!'

'রাগ করছো কেন ? রাগের কী হল ? ভাই-ভাই কি ভাই-বোন, এসব সম্পর্ক কি খারাপ ?'

'বাঃ! আমি দাদা হতে পেলুম না, তুই আমায় দাদা বলে ডাকলিই না কোনো দিন—আর ও হতভাগাটা কোথা থেকে উড়ে এসেই না দাদা হয়ে গেল হঠাৎ ?'

'দাদা হতে চাও তুমি ? দাদা হবে আমার ? বললেই হয় !' সঙ্গে সঙ্গে সে সতর্কবাণী আওড়ায়—'ডাকতে কী আর ! কিন্তু মনে রেখো, দাদা হলে কিন্তু দাদাই হয়ে গেলে চিরদিনের মতন—তারপর আর আপসোস করতে পারবে না। কোথাও যদি কিছুতে আটকায়, আমার কোনো দোষ নেই, সেটা কিন্তু বলে রাখলাম।'

'কোথায় আটকাবে ? কোনো বাধা আমি মানলে তো ? কেন, দাদাদের কি নিজের বোনদের আদর করার রাইট থাকে না ?'

'তা থাকে। দাদার তো বার্থরাইট আদর, তবে যতটা শোভা পায় ততটাই। আদর করতে পাবে তুমি আমায়—কিন্তু ঐ বোনের মতই। মনে রেখো।'

'তবে আর কোথায় আমার আটকালো শুনি ? তার বেশি আর আমি চেয়েছি কী ?' আসলে, পেলেই হলো আমার।'

'যখন আটকাবে তখন টের পাবে।...এখন তার কী।'

'তাহলে আর কোথায়, কখন আমার আটকাতে পারে...। শুনি ? শুনিই না ?'

'গোধূলিলগ্নে গিয়ে।' সে মুখ টিপে হাসে—'যদি আমাদের বিয়ে আটকায় ?'

গোধূলিলগ্নীকৃত দশায় সেই সুতহিবুকযোগের সমস্যাটা আমি আমলই দিই না। অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ, চিরকালের বাউন্ডুলের ভবিষ্যৎ ভাবনার বালাই নেই।

'কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। 'আমি মানুষ হলে তবে তো তুই আমায় বিয়ে করবি...আমি ডাক্তার হব, শরীর ভালো করব, খুব টাকা কড়ি উপায় হবে আমার...তোকে দোষ দিইনে, সব মেয়েই তাই চায়। নিছক ভালোবাসার জন্যে কখনো কাউকে বিয়ে করে না মেয়েরা—আমি ভালোই জানি। নভেলেও পড়েছি বিস্তর। তা আমিও মানুষ হয়েছি, আর তুইও আমায় বিয়ে করেছিস ! দুই-ই শিবের অসাধ্য। শিবরামের সাধ্য কী ! সাত মণ তেল পুড়লে তবেই নেচেছে আমার রাধা !' আমি বলি—'না, আমি অত গাধা নই ভাই ! গাছের মেওয়ার জন্যে হাতের নগদ লাভটা ছাড়তে যাই কেন ? তার

আগে, ঢের আগেই—এখনই তো আমি দাদা হতে পারি যখন।'

'তা পারো। হতে চাও তো বলো।'

'হ্যাঁ, চাই হতে। এক্ষুনি—এই দণ্ডেই...'

'বেশ, ডাকছি তবে। দাদা...দাদা...দাদা...'

'কী বললি ? শুনতেই পেলাম না। কানেই এল না—কথাটা ভালো করে বলবি তো ? যেমন করে বললে শুনতে পাব তেমনিভাবে বল্, যাতে বেশ করে টের পাই আমি।'

'খুব চেঁচিয়ে বলব ? গলা ফাটিয়ে ? জেলখানা চৌচির করে ?'

'তাহলেও কানে ঢুকবে কি না কে জানে।' আমার সন্দেহ থাকে—'কান ফাটিয়ে বললেই কি শোনা যায় রে সব কথা। কান দিয়ে শোনাও যায় না—শোনাবারও নয় সব—অন্যরকমের বলতে হয়, শুনতে হয়—তবেই কিনা শোনা যায়।'

যে কথায় কর্ণপাত করা যায় না, দৃক্‌পাত করারও নয়, তা বুঝি মুখপাতে মুদ্রিত হলেই ভালো হয়। কিন্তু আমার সেই ধারণা ব্যক্ত করার আগেই কালকের রাতের অপ্রত্যাশিত শিলাবৃষ্টির মতই আচম্বিতে অকালবর্ষণ নেমে আসে...

'শিব্রাম্‌দা...শিব্রাম্‌দা...শিব্রাম্‌দা...' মৃদুল ছোঁয়ার রিনিঝিনি শুনি ওর মুখে 'শিব্রাম্‌দাঃ ! হয়েছে ? টের পেয়েছো তো ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। এতক্ষণে টের পেলাম।'

যথোচিত কথাটা যথাযথভাবে কইলে কে না শুনতে পায় ? কে-বা না বুঝতে পারে ? কার বা বোঝার অসুবিধে ?

॥ উনপঞ্চাশ ॥

'হলো তো ? এবার ছাড়ো তাহলে লক্ষীটি ! জেলের ডাক্তারখানা থেকে তোমার ওষুধটা নিয়ে আসিগে, কেমন ?'

'জেলের ডাক্তারখানা কোথায় তুই জানিস ?'

'দেবেনদার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব আজ।'

'না, দেবেনের সঙ্গে যেতে পাবিনে।'

'আজই তো খালি। কাল থেকে আমি একলাই যাবো। আজ দিনটা কেবল।'

'না। আজকেও না। কারো সঙ্গে আমি তোকে যেতে দেব না। আজও না, কালও না, কোনোদিনও না।'

'বাবারে বাবা ! দেবেনদা কি খেয়ে ফেলবে আমায় ?'

'না খেলেও। আমি প্রাণ ধরে তোকে আর কারো সঙ্গে ছাড়তে পারব না বলে দিচ্ছি সাফ। তাতে ওষুধ না খেয়ে মরে যাই সেও আমার ভালো।'

'ইস্ ! কি হিংসুটে গো তুমি ! ভারী সন্দিগ্ধ মন তো তোমার। ভাগ্যিস্ , তুমি দাদা পাতিয়েছ সেই রক্ষে ! বড্ডো ফাঁড়াটা কেটে গেছে আমার। বৌ হলে তো তুমি বোরখা পরিয়ে রাখতে আমায় বোধ হয়।'

'মোটেই না। আমি নিজেই তোর বোরখা হয়ে থাকতুম দিনরাত। বোরখার মতই তোকে ঘিরে রাখতুম সব সময়। কারো নজর পড়তে দিতুম না তোর ওপর।'

'কি রকম ?'

'কোনোদিকে তাকাবার ফাঁক পেতিসনে তুই। তোর পূর্বে আমি, পশ্চিমে আমি, উত্তরে আমি, দক্ষিণে আমি...এক আমি একাই একশ। যেমন কিনা, আমাদের এই বঙ্গদেশ। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ব্রহ্ম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহারের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনি...'

'বুঝেছি। রাতদিন পাহারা দেবে আমায়—বুঝলাম। কাজকর্মের ধান্দায় বেরুতে হত না তোমাকে?'

'আমার আবার কী কাজ? এক বৌ-ই তো বহু কাজ। তার ওপর কারো কাজ আছে নাকি আরো? থাকে নাকি?'

'খেতে কী?'

'সে আমি ঠিক খেতাম। ঠিকই খেতাম, খাওয়ার ব্যাপারে কিছু অবহেলা, কোনো ত্রুটি থাকত না আমার।'

'তাতে পেট ভরত না মশাই। আমি বলছিলাম, অন্নবস্ত্র জুটত কোত্থেকে শুনি? কাজকর্ম না করলে।'

'মা অন্নপূর্ণা যোগাতেন। তিনিই যুগিয়ে যেতেন ঠিক ঠিক। সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। মা'র একটা গল্প বলি শোন্ তাহলে—উসিতর্‌সের গল্প। শুনেছিস এর আগে?'

'না তো। উসিতর্সেটা কী? কে?'

'এক সাধু। গল্পটা বলি তোকে। একবার এক সাধু নাকি আমাদের রাজবাড়ির পিলখানায় এসেছিল। এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতীদের খাওয়া দেখছিল সে। বড় বড় গামলা ভর্তি চাল, গুড়, কলার থোড়, আরো কত কী—মেখেচুখে বড় বড় গরাসে করে মাহুতরা হাতীদের শুঁড়ে ধরে দিচ্ছে আর তারা আয়সা আরামে চোখ বুজে আয়েস করে চিবুচ্ছে—প্রত্যেক হাতীর জন্যেই আধ মণ করে বরাদ্দ। সবচেয়ে বড় দাঁতালো হাতী মোহনপ্রসাদের জন্যে তার ওপর রাজাবাহাদুরের পাঠানো নিত্যকার রাজভোগ—তার প্রিয় খাদ্য এক হাঁড়ি বাণিজ্যার দোকানের ইয়া বড়ো বড়ো রসগোল্লা। তাই দিয়ে রাজোচিত মর্যাদায় তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হোতো রোজ। একজন মাহুতকে সাধু নাকি শুধিয়েছিল, কেন, এমন করে এদের খাইয়ে দিতে হচ্ছে কেন? এরা কি গোরু-ভেড়ার মত চরে খেতে পারে না, নিজেরা মুখে তুলে নিতে পারে না? খেটে খুটে খেতে শেখেনি? কি পাখিদের মতন খুঁটে খুঁটে? না সাধুজী। জবাব দিয়েছিল মাহুতটা, হাতী সেরকম জানোয়ার নয়। এদেরকে এমনি করে খাইয়ে দিতে হয়। নইলে এরা এমনিতে খাবে না। মুখে তুলে না দিলে কিছুই মুখে তুলবে না কিছুতেই। উসিতর্‌সে খিলানে হোগা। খোদা এইসা বানায়া এলোগ কো না। উন্‌হি ইসি তরে বানায়া, উন্‌হি উসিতর্‌সে খিলাতা।'

'তারপর?'

'শুনে তো সাধুটি হাঁ; তারপর করল কি সে, রাজবাড়ির শ্রীরাম মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ল—পড়ে থাকে দিনরাত, খায় না টায় না, কারো কাছে কিছু চায় না। পূজারী পুরুতরা রামচন্দ্রের প্রসাদ এনে ধরে দিল ওর সামনে, ও ছুঁলো না, শুধু বলল, উসিতর্‌সে। যে কিছু ভালোমন্দ খাবার-দাবার ফলমূল নিয়ে আসে—সাধু ছোঁয় না—খায় না—খালি বলে, উসিতর্‌সে। রাজাবাহাদুর খাবার নিয়ে এলেন, রানী কাকিমাও এলেন তাঁর সঙ্গে—সাধুর শুধু ঐ এক বুলি—উসিতর্‌সে। সবাই হাঁ করে তাকায়, হতাশ হয়ে ফিরে যায়, ওর কথার মর্ম কেউ বোঝে না।

সাতদিন এইরকম ঠায় উপোসে পড়ে থাকার পর একদিন শেষরাতে কে নাকি এসেছিল তার কাছে খাবার হাতে করে—খাওয়ার জন্য সাধতে। তার বহুৎ সাধ্যসাধনায় চি চি করে সাধু বললে—ঐ এক কথাই। উসিতরসে। শুনে লোকটা যেই না তাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে গেছে, অমনি সাধু গরাসটা ফেলে দু'হাতে পাকড়ে ধরেছে তার পা—ঠাকুর। এইবার তো ধরেছি তোমায়। ধরা পড়ে গেছ তুমি। আর তো তোমায় ছাড়ছিনে! আর কোথায় পালাবে! যিনি হাতীকে খাওয়ান, তুমিই সেই তিনি! আমার ভগবান! তুমি ছাড়া তো আমার এই কথাটার মানে আর কারো জানবার কথা নয় ঠাকুর!'

'ভোর রাতের সেই কান্ডটা কেউ দেখেছিল নিজের চোখে?' রিনি শুধোয়।

'কেউ না। কে জেগে বসেছিল তখন? তবে তার পরদিন সকালে কেউ আর সে সাধুটির দেখা পাইনি। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দিব্য অঙ্গ মিশিয়ে গেল কি না কে জানে!'

'তুমি এসব বিশ্বাস করো?'

'মা বলে তাই বলছি। মা'র কথায় কি কেউ অবিশ্বাস করে?'

'তোমার বাবা কী বলেন এ বিষয়ে?'

'বলেন, গাঁজাখুরি। তিনি আবার কবিতাও আওড়ান, মহাকবি হেমচন্দ্রের। ছিল বটে আগে তপস্যার বলে/কার্যসিদ্ধি হত এ মহীমন্ডলে/আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে/সংগ্রাম করিত অমরগণ/এখন সেদিন নাহিক রে আর/দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার/হবে না হবে না খোলো তরবার/এসব দৈত্য নহে তেমন॥'

'তোমার বাবাই ঠিক কথা বলেন। দেবতার সাহায্যে, দৈবলীলায় যেমন ভারত উদ্ধার হবার নয়, তেমনি কেউ নিজেকেও উদ্ধার করতে পারবে না। তুমিও পারবে না। তোমাকে কাজ করতে হবে—রীতিমতন, সবার মতন। প্রাণপণে কাজের মানুষ হতে হবে, মানুষের কাজ করতে হবে... উসিতরসের কৃপা কখন বর্ষে তার ভরসায় হাঁ করে বসে থাকলে চলবে না।'

'বাবা আরো কী বলেন জানিস? বলেন উদ্যোগিনঃ পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্স্মী/ দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তী। এর মানে হচ্ছে...'

'বলতে হবে না, আমি জানি। দৈবের কৃপায় কিছু মেলেনা, সব কিছুই চেষ্টা করে পেতে হয়-এই তো! তোমার বাবার কথাই ঠিক।'

'তুই তো বলবিই। তোর কথার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলছে কি না! কিন্তু আমি ওকথা মানিনে। চেষ্টা করে কিছুই আমি কখনো পাইনি, যা আমি চাই—আমি যা পাবো বলে কখনো ভাবতেই পারিনি, তাও কেমন করে কে জানে আচম্‌কা পেয়ে গেছি। দৈবাৎ আমি পেয়ে যাই।'

'দৈবাৎ পাও? দেবতার কাছে প্রার্থনা করে পাও? কোন্ দেবতার কাছে শুনি?'

'কোনো দেবতার কাছেই কিছু প্রার্থনা করিনে। এমন কি চাইতেও হয় না। এম্‌নিতেই আসে...এই যেমন তুই! এলি না এই আমার জীবনে? ঠিক সেইরকমটাই।'

'এম্‌নিতেই মিলে যায়? তা কি করে হয়! হতে পারে কখনো? আশ্চর্য তো।'

'তাই তো দেখছি জীবনভোর। কবি তুলসীদাসের একটা কথা বলেন মা। যো যাকো শরণ লিয়ে/সো তাকো রাখে লাজ। /উলট্ জলে মছলি চলে/ভাসি যাওয়ে গজরাজ॥'

'মা'র কাছে শোনা তুলসীদাসের দোঁহা-র গাওয়া আমার।

'তার মানে ?'

'যে যার শরণ নেয়, সেই তার লজ্জা বাঁচায়, রক্ষা করে। মাছরা সব নদীর আশ্রিত তো ? তারা বিপরীত স্রোত কাটিয়েও অনায়াসে কেমন উতরে যায়। কিন্তু মহাশক্তিধর মদমত্ত ঐরাবতও স্রোতের মুখে পড়ে কুটোর মতন কোথায় যে ভেসে যান তার হদিশ মেলে না। তেমনি কেউ যদি ঠিক ঠিক ভগবানের প্রত্যাশায় থাকে সে কখনো ভেসে যায় না, বুঝলি ?'

'ভেসেও যায় না, ডুবেও যায় না হয়ত সে ঠিকই, কিন্তু তার ঐ ভেসে থাকাটাই সার হয়। নাই বা সে তলালো, কোনোদিন সে কোথাও পৌঁছতেও পারে না কখনো, তাও ঠিক। তুমি কি ফকির বৈরাগী ভিখিরিদের দ্যাখোনি, খালি ভগবানের প্রত্যাশায় হাঁ করে বসে থেকে কী দশা হয়েছে তাদের ?'

'দেখব না কেন ? মামাকেই দেখেছি আমার। ভালো চাকরি করতেন, কোন্ সদাগরী আপিসে, সুখদেব না দুখদেব কোন্ এক গুরুর পাল্লায় পড়ে চাকরি-বাকরি ছেড়েছুড়ে হরিনাম কীর্তনে মজেছেন, আর সেই গুরুদেবটা তাদের আশ্রমে চাকরের মত খাটাচ্ছে তাঁকে—তার মতন আরো সব শিষ্যদের —বিনা বেতনের খানসামাগিরিতে। কী দুর্দশা যে তাদের কী বলব ! মামাকে আমি বলেছিলাম, কৃষ্ণকে ভজে আর গুরুসেবায় মজে তোমার এ কী হাল হোলো মামা। মামা আবার তাঁর সাফাই গান—যে করে আমার আশ/করি তার সর্বনাশ ॥ /তবু যদি না ছাড়ে আঁশ/হই আমি তার দাসের দাস।'

'তাতে লাভ ? কী এল গেল আমার ?'

'তাই তো বলে কে ? আমারই বা দাস হবার দরকার কী তাঁর, আর তাঁকেই বা দাসের দাস বানিয়ে কী চতুর্বর্গ লাভ আমার ? তোর কথাটা যে মিথ্যে তা আমি বলিনে। তবে আমি ভগবানের ভরসা করিনে রে। ভগবানের দ্বারা কারো কখনো কিছু ভালো হতে আমি দেখিনি। তাঁর কাছে হাজার প্রার্থনাতেও কচু হয়। আমি তাঁরই প্রত্যাশা করি ভাই, সবাই যাঁর প্রত্যাশায়, এমন কি ঐ ভগবানও, স্বয়ং শিবও যার দুয়ারে ভিখারী।'

'কার ?'

'আমার মা'র। আমীর মা, তোর মা, আমার মা'রও মা সবার মা, সারা বিশ্বের মা বিশ্বজননীর। তাঁকে ডেকে কেউ কখনো ভিখিরী হয়ে যায় না, না চাইলেও তিনি তোর দু'হাতের মুঠো ভরে দেবেন মুহুর্মুহু দশ দিক থেকে দশ হাতে। তাঁরই ভরসা করি আমি। করবও চিরকাল।'

'আমার বাবা কী বলেন জানো ? ভগবানকে ডাকো—তাঁর কাছেও চাও, আবার সেই সঙ্গে তোমার প্রাণপণ চেষ্টাও চালাও—দুইই চালিয়ে যাও—তবেই হবে তোমার। কে একজন জেনারেলও এই কথা বলে গেছেন নাকি। প্রে টু গড বাট কীপ ইওর পাউডার ড্রাই—যদি যুদ্ধে জিততে চাও। সংসার-সংগ্রামেও ঠিক সেই কথাই।'

'তোর কথাটা মিথ্যে না, তোর বাবার কথাও সত্যি। জেনারালি কথাটা খাটে কিন্তু সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে না ? সত্যকে যা প্রমাণ করে ? আমি আমার মা'র কথাটাই মানব। কথাটা আমার মনের মত।'

'তার মানে, কথাটায় তোমার কুঁড়েমির সায় পাও কিনা। মোটেই খাটতে চাও না তুমি। তোমার মা-ই তোমার মাথা খেয়েছেন বুঝতে পারছি।'

'আর আমার মা কী বলে জানিস ? তুই-ই আমার মুড়ুটা চিবিয়ে খেয়েছিস। বখিয়েছিস আমাকে।'

সবার মা-ই সেই রকম বলে। সব মা-ই একরকম। তাঁরা নিজের ছেলেমেয়েদের কোনো দোষ দেখতে পান না, বিশ্বাস করেন না—পরের ছেলেমেয়েদের দায়ী করেন তার জন্যে। জানি আমি।... বেশ তো, তোমার মা'র কথাটাই মানো না।...সেই বিশ্বমায়ের ওপর ভরসা রেখেই ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার ওষুধটা নিয়ে আসিগে। ভয়টা কিসের ? তিনিই দশ হাতে আমাকে সামলাবেন—দেবেন-টেবেন সবার খর্পর থেকে বাঁচিয়ে, তোমার হাতে তুলে দেবেন শেষ পর্যন্ত।'

'তা তুই যা-ই বল, তোর কথায় আমি ভুলছিনে। ছাড়ছিনে তোকে। তুই এখানে থাক—আমার কাছটিতে বসে। মা'র কথা মতন আমি সেই মা'র ভরসাতেই থাকি বরং, দ্যাখ তুই, আমি বিনা চিকিৎসায় কোনো অষুধ-বিষুধ না খেয়েই সেরে উঠছি কিনা। তাহলে তো তখন বিশ্বাস হবে তোর ?'

'নেচারেও সারে। সারে নাকি ? বাবা বলেন, ন্যাচারালিও সারা যায়, কিন্তু ভুগতে হয়। ওষুধ থাকতে অকারণে ভোগবার দরকারটা কি ?'

'মা'ই বল, আর নেচারই বল, তার ভরসার থেকে বরং নাচার হবো, তবু কারো ভরসাতেই আমি তোকে ছাড়তে পারব না। আমি জানি, দেবেনটা তোর জন্যে ওত পেতে আছে বাইরে। হাড়ে হাড়ে শয়তান। তাকে আমি চিনিনে।'

'সব ছেলেই তোমার মতন নয়। উদার মন অনেকের। কেন, অন্য ছেলের সঙ্গে মিশলে কি আমি ক্ষয়ে যাবো নাকি ? কই, আমি তো তোমার মতন নই। তুমি অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশলে আমার তো কোনো রাগ হয় না, মনের কোণেও কোনো সন্দেহ জাগে না, হিংসে করে না মোটে।'

'মিশব যে, মেয়েটা কোথায় ? তাহলে প্রমাণ পাওয়া যেত তোর কথার। হাতে হাতে বাজিয়ে দেখতাম।'

'মিশতে চাও তুমি ?'

'মেয়ে কোথায় এই জেলে ? আছে এখানে কোনো মেয়ে ?'

'আছে বইকি। আমার মতই আছে কত। তোমারা ধরতে পারবে না। আমাদের চোখে ধরা পড়বে। ধরতে পেরেছি আমি ক'জনাকে। তারাও আমায় ঠাউরে নিয়েছে ঠিক!'

'বলিস কি রে ? এখানে...'আমি জানতে চাই—'এসেছে কেন তারা ?...দেশের জন্যে ? নাকি, বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার নেশায় ?'

'তারাই জানে! তবে তুমি যে বলো ওই ব্যক্তি স্বাধীনতা সবাই চায়, এমন কি ঐ মেয়েরাও। কেন, মেয়েরা কি ব্যক্তি নয় ?'

'কে বলে নয় ? তুই তো রীতিমতই এক অভিব্যক্তি।'

'আবার এমনও হতে পারে, বাড়িতে বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল, সেদিকে এখন মন নেই ওদের, এই সুযোগে ওই ছুতো করে পালিয়ে এসেছে বাড়ির থেকে...তুমি কি ওদের কারো সঙ্গে ভাব করতে চাও ? চাও তো বলো।'

'আমি চাইলেই তারা চাইবে কেন ভাব করতে—ভূতের মতো চেহারা এই আমার সঙ্গে মিশতে কেন যাবে ?' আমি নিশ্বস ফেলি—'আমার সঙ্গে কোনো মেয়েই মিশতে চায় না—এমন কি তোর দিদিও নয়।'

মেয়েরা চেহারায় ভোলে না গো। মন বুঝে মেশে। যার সঙ্গে মনের খাপ খায় তার সঙ্গেই মেশে তারা, বুঝেছ ? তার সঙ্গেই ঘর বাঁধে গিয়ে শেষটায়।'

'অতো মন বোঝাবুঝির গরজ নেই আমার। একে তো মেয়েদের মন বোঝাই যায় না লোকে বলে! বইয়েও লেখে তাই। এখন নতুন করে মেয়ের মন বুঝতে যাবার সময় নেই আমার! কষ্টেসৃষ্টে যে একজনের একটুখানি বুঝতে পেরেছি তাই বজায় রাখতে পারলেই বাঁচি! ও! বুঝতে পেরেছি! আমি এদিকে নতুন মন বোঝার চেষ্টায় হয়রান হই গে, আর তুমি ওদিকে দেবেনের সঙ্গে গিয়ে ভাব জমাও! না বাবা, সেটি হচ্ছে না। গাছের ফলে হাত বাড়াতে গিয়ে হাতেরটা আমি খোয়াতে চাই না।'

'ঘাবড়াচ্ছো কেন তো ? আমি তো হাতের পাঁচ, হাতেই আছি, যাচ্ছি কোথায় ? যেমন তলারটা কুড়োবে তেমনি গাছেরটা পেলে আরো ঢের মজা না ? তাছাড়া, তারা প্রত্যেকেই খুব সুন্দর—আমার চেয়েও। দুরণ সুন্দর সব! দেখো তুমি।'

'সুন্দর না ছাই। আমি কারো সঙ্গে আলাপ করতে চাইনে। দেখতেও না।'

'মেয়ে যে তা তুমি টের না পেলেও, সুন্দর যে সেটা দেখলেই মালুম হবে—ওই ছেলে সেজে থাকলেও। ওই তো একজনা ওধারে দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রয়েছে এই দিকে—আমাদের দিকে নজর দিচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো না!'

'আমার দরকার নেই দেখবার।' সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিই আমি—'একটি যে আমার আছে তাই বেঁচে বর্তে থাকলেই ঢের, তার বেশি আমি চাইনে। তুই ওদেরকে দেবেনের সঙ্গে ভাব করিয়ে দে বরং, দেখিয়ে দে দেবেনকে। যা শত্রু পরে পরে...ওদের ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে যাক আমার।'

'আমার দরকার করবে না দেখাবার। দেখবার হলে তারাই নিজেরাই ঠিক দেখে নেবে।' বলে সে নিশ্বাস ফেলে—'ভালোই করেছিলাম তোমার, আরো আরো মেয়ের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিচ্ছিলাম কেমন। বোনের কাজ, বন্ধুর কাজই করছিলাম। অনেকের সঙ্গে আলাপ হলে তুমি নিজের মনের মতনটিকে খুঁজে পেতে তার ভেতরে...সুখী হতে পারতে হয়ত একদিন...'

'আবার সেই এক কথা! বলছিনে সুখী হবার আমার দরকার নেই। এই বলে ভুলিয়ে তুই যদি আমায় ছেড়ে যেতে চাস, তোকে অতো করে বোঝাতে হবে না, এমনিই সোজাসুজি চলে যা। আমার ঘাড়ে আর কাউকে গছিয়ে দিয়ে যেতে হবে না।' আমিও নিশ্বাস ফেলি—'তোকে না পাই না-ই পাবো, আর কাউকে আমি চাইবো না। চাইও না। কক্ষনো নয়।'

'আমি ঠিক তোমার মনের মতটি নই, আমি জানি—কিন্তু তুমি তা জানো কি ? এখন না জানলেও আর সবার সঙ্গে মিশলে তুলনায় জানতে পারতে তখন। জানো, আমাকে চাইলে পরে অনেক কষ্ট পেতে হবে তোমায়। আমায় নিয়ে বৃহৎ দুঃখ আছে তোমার বরাতে—অনেক ভোগান্তি জীবনে...'

'আমি জীবনের মত চেয়েছি কি ? তুই তো বোনের মতই হতে চেয়েছিস—তাহলে আর দুঃখটা কোথায় ? বোনরা কি কষ্ট দেয় ? বন্ধুর মত পেলেই আমার ঢের।'

'সেভাবে পেতে হলেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে তোমাকে। আমার মনের মতটি হতে হবে তোমায়। বন্ধুরাও বেশ কষ্টদায়ক হয়—তা জানো ? যে বন্ধু তোমার সত্যিকার

ভালো চাইবে, সে তোমায় দুঃখ না দিয়ে পারবে না। আমার বন্ধু হতে হলে গোড়াতেই তোমায় আলসেমি ছাড়তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, পরের প্রত্যাশায় থাকলে চলবে না...'

'আমি মোটেই অপরের প্রত্যাশায় নেই। পরের কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনে, যদি করি তো কোনো পরীর...'

'কথা ঘোরালে চলবে না। একটু আগেই তুলসীদাসী দোঁহা আউড়ে কতো কী গেয়েছো, ভুলে গেলে এর মধ্যে ? তুমি পরের ভরসাতেই থাকো কি ঐ পরাৎপরের ভরসাই রাখো, ফল একই। তোমার ভবিষ্যৎ ফর্সা। স্বখাত সলিলে ডুবে মরলে জগন্মাতাও দশ হাতে তোমায় টেনে তুলতে পারবে না। কোমর বেঁধে তাঁর শরণ নিয়েই যদি ডোবো, তাহলেও নয়।'

'জগন্মাতা তার আগেই বাঁচাবেন আমায়, নির্ঘাৎ জানি। খাত কাটতেই দেবেন না আমাকে। স্বখাত হলে তবে তো সলিল জমবে, ডুবে মরতে হবে ? সেই খাল কেটে কুমীর আনতে আমায় দিচ্ছে কে ?' আমি কই : 'তাহলে তুই গাইতিস কেন চাঁচলে—নিশিদিন ভরসা রাখিস/ওরে মন হবেই হবে/যদি তুই পণ করে থাকিস/সে পণ তোর রবেই রবে॥ / গাইতিস কেন তাহলে ?'

'ওসব হচ্ছে ভাবের কথা—কাব্যে গানেই শোভা পায়। উচ্চ কথারা যতো তুচ্ছ কথাই অভাবের মুখে পড়লে কোথায় যে এ সব তত্ত্ব উড়ে যায় তার পাত্তাই মেলে না।'

'এত সব তুই শিখলি কি করে ? কোত্থেকে ? ভারী যে পাকা পাকা বুলি ঝাড়ছিস ?'

'মেয়েরা অনেক কিছুই জানে, মনেতে চেপে রাখে, মুখের বাইরে আনে না। সব সময় তাদের চোখ কান খোলা থাকে তা জানো ? চারদিকে নজর রাখে, দেখে শিখতে পারে তারা। ছেলেদের সেখানে ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়। ঠকে ঠকে শেখে তারা। তাই বলছিলাম, যদি জীবনে কোথাও ঠেকতে না চাও, ঠকতে না চাও তাহলে আগে নিজেকে মানুষ করে গড়ো, তারপর অপরকে মানুষ করো, দেশের সেবায় লাগো।'

'কি রকম মানুষ হতে বলছিস তুই ? কার মতন মানুষ ?'

'কেন, ঐ সুভাষ বোস, কি ঐ দেশবন্ধু ! আগে হয়েছে, পেয়েছে—তারপরে দিয়েছে, বিলিয়েছে। তোমার কোনো কিছু পুঁজি নেই—না স্বাস্থ্য না অর্থ না বিদ্যে—এই দু'আনার মানুষ হয়ে তুমি দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে, দুঃখ বাড়াবে পৃথিবীর। ষোলো আনা হয়নি যে, নেই যার, সে কি ষোলো আনা দিতে পারে ? এই ভাবে চললে দেখো তোমার হাড়ির হাল হবে একদিন। তোমার দুঃখে দেশের শেয়ালকুকুর কাঁদবে।'

শুনে আমি চুপ করে থাকি, জবাবদিহির ভাষা খুঁজে পাই না।

'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি ! যাই আমি, ওষুধটা নিয়ে আসি গে তোমার। চুপটি করে শুয়ে থাকো ততক্ষণ। আমি যাবো আর আসব।'

'না, আমিও তোর সঙ্গে যাব তাহলে ডিস্‌পেনসারিতে।'

'না। তোমার গিয়ে কাজ নেই। নড়াচড়ায় জ্বরটা বাড়বে। বাবা বলেন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় কম্‌প্লিট রেস্ট। আমি তোমার সিম্‌টম্‌ বলে ওষুধ আনতে পারব। ডাক্তারের মেয়ে না আমি ? ওষুধ চিনি।'

'কিন্তু ওই দেবেনটা যে ওত পেতে আছে ওখানে...।'

'দেবেন মোটেই ওখানে বসে নেই। ছেলেরা ছটফটে হয়—জানো না ? দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এক জায়গায় ? কোথায় চলে গেছে এতক্ষণ। দেবেনের সঙ্গে আমি মিশব না, তাকে আমার সঙ্গে মিশতে দেব না কথা দিচ্ছি, গায়ে পড়ে মিশতে এলেও আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাবো তক্ষুনি।'

'বেশ, যা তুই। কিন্তু যদি সে এই ফাঁকে একটুখানিও মিশে নেয়, আমার কত ক্ষতি হবে যে...! সেই ক্ষতিপূরণ কে দেবে আমায় ? সেই ক্ষতিপূরণটা দিয়ে যা তুই তা হলে।'

'পরে দেব। রাত্তিরে। মাঝ রাত্তিরে সবাই ঘুমোবার পর—সেই কালকের মতন...।'

'না। এখন। আগাম চাই। বেশি না, মোটমাট পাঁচটা। তা না হলে ছাড়ব না...'

'চার দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে দেখেছো ? এর ভেতর মেয়েরাও সব রয়েছে...বেশি বেশি নজর দিচ্ছে তারাই...না, তুমি যতই বলো, তাদের সামনে নিজের মান আমি খোয়াতে পারব না। কিছুতেই না। তারা কী ভাববে বলো তো !'

'তবে তোর ভাবনা নিয়েই তুই থাক্। ওষুধ আনতে গিয়ে কাজ নেই তোর। শান্তিতে মরতে দে আমায়।'

'আচ্ছা চুমোখোড়ের পাল্লায় পড়লাম তো ! কী মুশকিলেই যে পড়েছি...।'

বয়সে বড়ো একজনা যাচ্ছিলেন আমাদের তাকের পাশ দিয়ে। রিনির কথায় থমকে দাঁড়ালেন—'কী হয়েছে ? কী মুশকিল ! কিসের মুশকিল শুনি ?'

'দেখুন না, কাল রাত্তিরে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে দাদার, জেলের হাসপাতালে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে আসব, কিছুতেই দিচ্ছে না আমাকে...বলছে, তুই থাক এখানে। এদিকে দেখুন ! দাদার গাটা কী গরম হয়েছে যে !...'

বলে সে তার গালটা আমার কপালের ওপর এনে রাখল—'ইস্ ! পুড়ে যাচ্ছে আমার মুখখানা ! কী গরম !'

তারপর কপালীটোলার থেকে নেমে তার মুখ আমার গালের ওপর এসে থামল, ইস্ট গালুডি স্টেশন থেকে গালুডি ওয়েস্টে চলে গেল সটান—মাঝখানের মধুপুর জংশন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে জানান দিয়ে—একবার নয়, এমনি পাঁচবার।

রেলওয়ে ভূগোলে এমনটা ঠিক না মিললেও সেদিনের গণ্ডগোলে কেমন করে যেন মিলেছিল ? ভেবে এখন অবাক হই।

যে নাকি এতক্ষণ ধরে এত ওজর করছিল, এতজনের নজরের পরোয়া ছিল যার, সেই কিনা এখন প্রায় এক দাদুতুল্য লোকের চোখের ওপর অকাতরে অম্লানবদনে...এক লহমার এক ম্যাজিক দেখিয়ে দিল যেন !

আশ্চর্য এক ভেলকি খেলাই দেখলাম।

॥ পঞ্চাশ ॥

এত ঢঙও জানে মেয়েরা !

যদিও তখন অব্দি রিনিই আমার কাছে অদ্বিতীয়, তার বাইরে দ্বিতীয় কোনো মেয়ের দেখা আমি তখনো পাইনি, তবুও এই চকিতদর্শনেই চরাচরের তাবৎ মেয়ের সাক্ষাৎ আমি

পেয়ে যাই। এই রিনির এই চাল থেকেই দুনিয়ার সব মেয়ের হাঁড়ির খবর মিলে যায় আমার। তাদের সহজাত স্বয়ংসিদ্ধির সংবাদটাও অবিদিত থাকে না।

রিনির যে কাণ্ডে আমি থ, থই পাচ্ছিনে, সেই দৃশ্য দেখেও নেতৃস্থানীয় ঐ দাদাটি কিন্তু অবিচলিত। তাঁর মুখে কোনো বিকার দেখলাম না। আশেপাশের কেউ কোনো ভ্রূক্ষেপ করেছে, তা আমি দেখতে পেলাম না। সেদিকে আমার চোখই ছিল না আদপে। দাদাটি আমার কপালে হাত ছোঁয়ান—'হ্যাঁ, একটুখানি গা গরম হয়েছে বটে। এমন কিছু নয়। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে—সর্দির জন্যই এটা হবে।...নাক টানো তো!'

'কার নাক?' আমি জিগ্যেস করি।

হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নিতে হয়।

'ওর নাকটা ধরে টানতে বলছেন আমাকে?'

'ওর কেন, তোমার নিজের নাক নেই?'

'তা তো আছে।' বলে আমি চুপ মেরে যাই। নিজের নাক—কান ধরে খামোখা টানাটানি করতে যাব কেন আমি ভেবে পাই না। তাছাড়া, ব্যাপারটা পছন্দসই বলেও বোধ হয় না আমার। নিজের কান কিংবা ঐ নাকই হোলো—টেনে কি কেউ কখনো আরাম পায়?

'কি করে নাক টানতে হয় জানো না বুঝি?' গলাখাঁকারির মত তিনি নাক খাঁকারি করে দেখান—'এমনি করে টানতে হয়।'

'বুঝেচি। আপনি নাক ঝাড়তে বলছেন।'

ওঁর অনুকরণের প্রয়াস পাই কিন্তু নাক আমার ডাকে সাড়া দেয় না।—'ঝাড়া যাচ্ছে না যে, কী করব?' নিরুপায় হয়ে কই—'নিশ্বাসই ফেলতে পারছি না, ঝাড়ব কি করে?'

'নিশ্বাস নিতে পারছ না, বলছ কী হে?' তিনি বিস্মিত হন—'বেঁচে আছো কী করে!'

'হাঁ করে।' আমি জানাই—'নাক বোজা আমার, সর্দিতে বোঝাই। মুখ দিয়ে তাই নিতে হচ্ছে নিশ্বাস—বাধ্য হয়েই। হাওয়া খাচ্ছি একরকম—বলতে পারেন!'

'এখন ধরতে পারলাম। ঐটেই হচ্ছে তোমার ব্যায়রাম! ওই হাঁ করে থাকাটা। মুখ বুজে থাকতে হয় সব সময়—বুঝেছ? মুখ হচ্ছে খাবার জন্যে—খাবার খাতিরেই শুধু যা ঐ হাঁ করবে, তা ছাড়া নয়।' (তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বলার ইচ্ছে হয়েছিল, বহুৎ খাদ্য আবার মুখ বুজেও খেতে হয় মশাই। কিন্তু গুরুজন না হলেও লোকটা দাদুস্থানীয় আর বেশ গুরুগাম্ভীর—তাই কোনো উচ্চবাচ্য করি না।) মুক্তকণ্ঠে তিনি কন—'আর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে রয়েছে নাক—বিধাতার ব্যবস্থায়। বিধাতাই বলো আর প্রকৃতিই কও, তার অন্যথা করলে অসুখে পড়তে হবে বই কি।'

আমি কোনো জবাব দিই না, চুপ করে থাকি। সর্দির জন্যই নাক বোজা না নাক বোজার হেতুই এই সর্দি—বোঝা আমার পক্ষে সহজ হয় না।

তিনি কিন্তু বোঝাই করে যান—'নাক দিয়ে নিশ্বাস নিলে হয় কী জানো? বাতাসটা নাকের গোড়ার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ভেতর দিয়ে যাবার কালে পরিশোধিত হয়ে লাংসে গিয়ে পৌঁছয়—ঘুরপথে যাবার জন্যে একটু গরমও হয়ে যায় আবার। কিন্তু হাঁ করে নিলে, বিশেষ করে এই শীতকালটায়, বাতাস গরম হতে পায় না তো, সোজাসুজি বুকে গিয়ে সেঁধোয়—সরাসরি ঠাণ্ডা লাগিয়ে দেয়। ফলে এই সর্দি। তার ফলে এই নাক বোজা। তদ্দরুণ ঐ হাঁ করে থাকাটা। প্রতিফলে ফের আবার বুকে ওই ঠাণ্ডা লাগাটা—তার ফলে

বুকে শ্লেষ্মা জমা হওয়া, তাই আবার নাকে এসে জমাট বাঁধা, তস্য ফল তোমার নাক বোঝাই, তার দরুণ তোমার ঐ হাঁ করে থাকা, পরিণামে ফের আবার ঠাণ্ডা লাগা—ফের আবার...সর্দি নাক বোঝাই, হাঁ করে থাকা, তার ফলে ফের—' তিনি হাঁকড়ে যান এক নাগাড়ে। —'ফের আবার ঐ সর্দি লাগা...আবার ফের...' বারম্বার সর্দির ফেরেববাজির তিনি ফিরিস্তি গান।

'ফলতঃ এই পাকচক্র—যা আপনি বলতে চাইছেন। আমি বুঝতে পেরেছি।'

তাঁর ওই কমপ্লেকস্ সেনটেনস্, যা মোটামুটি আমার ডেথ পর্যন্ত গড়াতে পারত, এক কথায় সেরে দিয়ে তার সেই ডেথ সেনটেনসের হাত থেকে অব্যাহতি পাই। সেই বক্চক্রের ব্যূহ ভেদ করে বেরুতে পারি।

'যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন ওষুধ খেতে হবে, যাতে আর না বাড়তে পারে। খোকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো। জেলের ডাক্তারখানাটা কোথায় জানো না বোধ হয়। দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। ডাক্তারবাবুকে রোগের ব্যাপার খুলে বলবে। সীমটম সব বুঝিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে পারবে তো? মিকশ্চার ট্যাবলেট যা উনি দেন। আনলেই হবে না, নিয়মমত খাওয়াতে হবে। ন্যাসাল ড্রপের মতন কিছু পাওয়া যায় কি না খোজ কোরো, তাই এ-নাকে এক ফোঁটা ও-নাকে এক ফোঁটা দিলে তক্ষুনি সাফ হয়ে যায় নাক। শুধিয়ো সেটা ডাক্তারবাবুকে, কেমন?'

নম্র খোকাটির মত তাঁর কথায় সায় দিয়ে রিনি তাঁর সঙ্গে যায়-যায়, এমন সময় জেলের সদর থেকে ঢনৎকারের আওয়াজ এলো। সব এলোমেলো হয়ে গেল সেই আওয়াজে।

রিনির ঢঙ দেখে হাঁ হয়েছিলাম, তার পরে এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোকের মুখে বাতাসের নাসিক শহরে গতিবিধির 'পর্যটন' কাহিনী শুনছিলাম হাঁ করে, কিন্তু সদরের এই ঢঙঢঙানি শোনার পর মনে হল, আমার ওই হাঁ করে থাকাটা রিনির ঢঙ দেখে নয় ঠিক, বা এই নাসিক অবরোধের দরুণ হাওয়া খাওয়ার হেতুও না, আসলে সকাল বেলাকার প্রাতরাশের প্রত্যাশাতেই।

কারণ নিজের গর্ভগৃহেও ঐ ঘন্টার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল।

রিনিকে ডেকে বললাম, 'যাচ্ছিস যখন, লোহার প্লেটগুলোও নিয়ে যা। ওষুধ নিয়ে ফেরার পথে তখন তোর-আমার খাবারটাও নিয়ে আসবি ঐ সঙ্গে।'

'জ্বরের ওপর জেলের খাবার খাবে ও?' রিনি ওঁকে শুধোয়।

'এখানে সাবু বার্লি কোথায় পাবে! ঐ লপসিই খেতে হবে বাধ্য হয়ে। দ্যাখো, যদি পাঁউরুটি-টুটি পাও কিছু—খোঁজ নিয়ো হাসপাতালে।'

'তা তো আনবিই,' আমি বলে দিই: 'কিন্তু ঐ সঙ্গে খিচুড়িটাও চাই আমার। খিচুড়ি দিয়ে আমি পাঁউরুটি খাবো।'

'তোমার খালি খাই খাই। খাওয়া ছাড়া আর কিছু শেখোনি তো!' রিনি বলে—তার কথার ভেতর কোনো গুহ্য কথার কিছু কি উহ্য থাকে?—'বুঝলেন মশাই, আমার দাদাটি বিদ্যাসাগর মশায়ের আদর্শ একটি সুবোধ বালক—যাহা পায় তাহাই খায়। তার ওপর যাহা খাওয়া উচিত নয়, পেলে পরে তাহাও ছাড়ে না।'

ভদ্রলোক তার জবাব শুনে হাসেন। —'তাই বটে! জেলের লপসিকে বলছে কিনা খিচুড়ি!

অখাদ্যও ওর কাছে খাদ্য।'

'না না। পাঁউরুটি পাই আর না পাই—খিচুড়ি আমার চাই। চাই-ই চাই।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তাই হবে গো।' মাথা হেলিয়ে হেসে চলে যায় সে।

রিনি যাবার পর আমি ভাবনায় পড়লাম আবার। ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন ওর? জেলের গেট আর আপিস তো সামনেই, ডিসপেনসারিটা আর কদ্দূর হবে? এইটুকুন তো পথ! সামান্য ওষুধপথ্য নিয়ে ফিরে আসতে এত দেরি হয়?

দেবেনের খর্পরে পড়ল না তো?

যাবার পথে ভাবার কিছু ছিল না। দাদুজনোচিত দায়িত্ব নিয়ে জাঁদরেল গোছের যে ক'জনা দাদা জেলের মধ্যেকার ছেলেদের ওপর অযাচিত মোড়লী করতেন, তাঁদের একজনার সঙ্গেই গেছে সে। কাজেই মাঝখানে পড়ে হামলা করার সাহস হবে না দেবেনের।

কিন্তু সেখান থেকে একা ফেরার পথে রেহাই কোথায় তার? পাকড়াবেই তাকে সে—যে করেই হোক। নির্ঘাত।

সকাল থেকেই ওর রিনিদির ভাই রিনটুর জন্যে ও যে বাইরে ওত পেতে ছিল, সেকথা আমি হলফ করেই বলতে পারি। কিন্তু অভাবিত এক দাদার সাথে ওকে বেরুতে দেখে আগ বাড়িয়ে গা-পড়া হয়ে তখন না এলেও তাদের পিছু পিছু ফলো করেছে সে নিশ্চয়। (ছেলেদের কোনো মেয়ে বা মনের মত কাউকে এই ফলো করে যাওয়ার রহস্য আমার অজানা নয়, কলকাতার পথে আমিও কিছু কম যাইনি—যদিও ফলোদয় আমার ভাগ্যে কাঁচকলাই।) কিন্তু দেবেনের বরাতে অন্য রকম ফলার জুটতেও পারে। কী সুন্দর তার চেহারা! অমন ফলোয়ার পেলে কোন্ অগ্রণী নায়িকাই না ফিরে তাকাবে, থমকে দাঁড়াবে ওর জন্যে? আঙুলের স্পর্শ থেকে আঙুরের অভ্যর্থনা নিয়ে তৈরি থাকবে না?

আর, যদি থমকি থেমে যাও পথ মাঝে/আমি চমকি চলে যাব আন কাজে/—বলে সরে পড়ার পাত্রই নয় সে! রবিবাবুর নায়কের ন্যায় অমন লজ্জাকাতর নয় আদৌ।

আর কী খেলোয়াড় ছেলে সে, টের পেয়েছি প্রথম রাত্রেই। তাকের ওপর ফাঁকে পেয়ে যা ফাউল খেলছিল না! তার শটের চোটে পদাহত বলের মতন ফিল্ডের থেকে প্রায় পাস আউট হয়ে যাই আর কি! পড়তে পড়তে কোনোমতে আপনাকে সামলেছি!

আমার জায়গায় অসহায় রিনিকে আজ যদি পায় সে। অফসাইড থেকেই ওকে কর্নার করবে। আর সেই পাল্লায় এই আমাকেও কোণঠাসা করবে নির্ঘাত। রিনিকে নিয়ে একটা গোল না বাধিয়ে ছাড়বে না সে।

খিচুড়ি, পাঁউরুটি আর মিকশ্চারের শিশি হাতে হাসতে হাসতে ফিরল রিনি।

'ওব্ বাবা! বাঁচলাম।' হাঁফ ছাড়লাম আমি—'যা ভাবনায় পড়েছিলাম না।'

'এই জগাখিচুড়ির জন্য এত ভাবনা।' সে প্লেটটা আমার সামনে রাখে—'নাও, ধরো, খাও। এখন বাঁচলে তো!'

'খিচুড়ির জন্যে ভাবছিলুম বুঝি! হা কপাল! জানতাম যে মেয়েরা বেশ বুঝদার হয়! কিন্তু তুই দেখছি তার অন্যথাই।'

'কী তাহলে ভাবছিলে এত শুনি?'

'ভাবছিলাম যে, দেবেনটা তোকে অফসাইডে পেয়ে সেখান থেকে পাসিয়ে ক্যারি করে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে কে জানে! সেন্টার ফরোয়ার্ড-এর খেলোয়াড় সে, বলছিল

আমায়। যা ভাবনা হচ্ছিল আমার না।'

'দেবেন কোথায়? দেখতেই পেলাম না তাকে। সে এই ইন্দ্রলোকের ছদ্মবেশী কোনো দেবীকে নিয়ে কোন নন্দনবনে বিহার করছে এখন কে জানে!'

'বাঁচি তাহলে! আহা, তাই যেন হয়। তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কোনো দেবীর সঙ্গে যদি তার একটা হিল্লে হয়ে যায়, মনের মত মেয়ে নিয়ে ঘর বেঁধে সুখে ঘরকন্না করে—তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না। তারও, আমারও।'

'তা আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কিসের গো!'

'ভাবনা নেই? তুই বলিস কী রে! তুই-ই তো আমার একমাত্র ভাব আর একটি মাত্র ভাবনা।'

'ভাব হতে পারি, কিন্তু ভাবনা নয়। বোনের জন্য কেউ ভাবে কখনো? বোন আর কদ্দিন? কদ্দিন ভাব রইবে তার সঙ্গে? সে তো পরের জন্যেই, পরের বাড়ি যাবে, পর হয়ে যাবে—একদিন না একদিন! তার জন্যে কেউ ভাবে নাকি?...পরের জন্যেই জন্মেছে সে—পরই তো।' এক কথায় আমায় সে ভাবনামুক্ত করতে চায়।

'হ্যাঁ, মানি সে কথা। মায়ের পেটের বোন হলে তাই হয় বটে, কিন্তু পেটের না হয়ে প্রাণের বোন হয় যদি? তার জন্যে প্রাণ আইঢাই করে না? যখন পর হবে, যখন হবে তখন, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সে তো আর পর নয়—পরীই বটে...প্রাণের বোন, বুঝলি কি না. প্রাণের মতই—প্রাণ যখন যাবে তখন যাবে, কিন্তু তার আগে অবধি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!'

'আমার আশা রাখা কি আশায় থাকা তো উচিত নয় তোমার'—সে কয়—'তুমি আমায় কোনোদিন বোনের চোখে দেখতে পারবে না দেখছি। ঠিক ঠিক বোনের মতন ভাবতে পারবে না।' তাকে বেশ ভাবিত দেখা যায়। —'এমন কি, বন্ধুর মত ভাবতে পারলেও বাঁচতাম।'

'বোন আর বন্ধুর মধ্যে তফাৎটা কী? কোনো তারতম্য আছে কিছু?'

'নেই? সব ভালোবাসাই কি এক নাকি?'

'এক নয়? একই রকমের তো সব। আমার তো তাই মনে হয়। যেমন কি না মায়ের প্রতি টান তেমনিই ওই ছেলেমেয়ের ওপর, যেমন বন্ধুর জন্যে মন কাঁদে, বোনের জন্যও তেমনটা। মন কেমন করার থেকে আদর করা পর্যন্ত—সবই তো প্রায় এক ধারার...এর ভেতর তারতম্যটা কোথায়? কেবল ওই বউয়ের বেলাতেই যা একটু ইতরবিশেষ। সেই ইতরতম পর্বটা বাদ দিলে তো একই পার্বণ ভাই—একই মহোৎসব সব। ...এমন কি, ওই ভগবানকেও যদি একান্ত আপনার করে পেতে চাই, কান্তভাবে ভজনা করি যদি...'

কথা হচ্ছে দাদা-বোনের সম্পর্ক নিয়ে তার মধ্যে এই সব গভীর তত্ত্ব আসছে কোত্থেকে? আমি বলি কি, বলছিলাম যে—দাদার অধিকারেরর সীমানাটা কোনখানে? তুমি তো জানো না ঠিক। দাদার দৌড় কদ্দূর?'

'আমি কী জানি তার! আমার কি নিজের বোন আছে যে জানব। আমার তো পরের বোন সব—পরীর মত হলেও তারা বোনের মতন...দূরের মাঠ যেমন আরও সবুজ, পরের বোন তেমনি আরো মধুর, গভীর, মায়াময়—সেই বোনান্তরালে কতো কী রহস্য আরো—কতো না আলো-আঁধারি—তার কিছু জানি, কিছু জানিনে!'

'এ তো গেল তোমার কাব্যকথা, আমার কথার ঠিক জবাব হোলো না তো!'

'মোল্লার দৌড় জানি মসজিদ পর্যন্ত, কিন্তু দাদার দৌড় কদ্দুর তার আমি কী বলব! দিদিরাই জানেন। তুই-ই বলবি তো।'

'দাদার দৌড় বোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত—(যদ্দিন সে পরের না হয়—তদ্দিনই তার বোনের ওপর অধিকার) তার পর আর না।'

'বললেই হোলো!' আমি ফোঁস করে উঠি : 'তার পর আমার বার্থরাইটটা চলে যাবে বুঝি? গেলেই হোলো?'

'যাবে না? তোমার কি আর আমার নিজের দাদাদেরই কি—আমার ওপর ওই বার্থরাইটটুকুই তো খালি। তার পরে বিয়ের পর আমার কপিরাইট অন্য লোকের হয়ে গেল না? যার কপিরাইট তারই অধিকার তখন।..কপিরাইট মানে জানো?'

'কেন জানব না? সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। সে তো শুধু বইয়ের বেলাতেই রে।'

'বউয়ের বেলাতেও তাই। যার সেই রাইট আছে, বইয়ের মত, বউয়ের ও মুদ্রণের, প্রকাশের, যন্ত্রস্থ করার তারই অধিকার। সে যেমন খুশি ছাপাবে, বাঁধাবে, যেমন করে ইচ্ছে তার শো-কেসে সাজিয়ে রাখবে। অন্য কারো কিছুটি কওয়ার নেই।'

'না থাকে নাই থাকলো। সর্বসত্ত্ব চাইছে কে! আমসত্ত্ব আমার থাকলেই ঢের। মিষ্টি জিনিস পেলেই খুশী—চাইলেই যেমন আমি তা পাই—তাই হলেই হোলো। নিজের বোনকে আদর করার সেই আমার বার্থরাইট আমি ছাড়ছিনে ভাই!

'তা অবশ্যি থাকবে তোমার। বছরে দু'দিন মাত্র—ভাইফোঁটার দিনটিতে আর আমার জন্মদিনে। আমার আর সব ভাইয়ের সঙ্গে তোমারও বাঁধা বরাদ্দ।... হ্যাঁ, আরেক দিনও হতে পারে, তোমার জন্মতিথিতে। ভালো কথা, তোমার জন্মদিনটা কবে গো?'

'জানিনে।' আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে—'এবার আমি জন্মেছি কোথায়, জন্মালাম কবে। সত্যি বলতে আমি জন্মাইনি এখনো। এ জন্মে আর জন্মলাভ হল না আমার।'

এমনকি আমি যথার্থই জীবিত কি না আমার সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে।

'তবে আর কী হবে।' নিশ্বাস ফেলে রিনিও—'তা হলে আরেক দিন হত আবার! কিন্তু জন্মদিন না থাকলে আর...'

'মৃত্যু দিনটা আছে ঠিকই। সেই দিনটি পেছোনোর জন্য যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে ভাইফোঁটায় তোদের বাড়ি যেতেই হবে আমায়।'

'তা ছাড়া যাবে না আর?'

'কীসের জন্যে আবার? বোন যদি সংসারের গভীরে হারিয়েই গেল—তা সে সহোদর বোন হোক, আর সুরভিত উপবনই হোক-সে তো তখন বোনও নয় বন্ধুও নয় আর! তার জন্যে হন্যে হয়ে নিরুদ্দেশে গিয়ে লাভ? সেই কন্টকিত বন্ধুর পথে শ্বাপদসঙ্কুল বনস্পতিদের আওতায় সেই মহারণ্যে রোদন করতে যায় কে? তবে হ্যাঁ, তোর জন্মদিনগুলোয় যাব আমি নিশ্চয়ই, সেদিনটি আমার মনে গাঁথা রয়েছে, আমার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত যাব, তুই নিশ্চিন্ত থাক। খুব ভালো হয় যদি তোর জন্মদিন আর আমার মৃত্যুদিন একদিনেই আসে। তার চেয়ে ভালো বুঝি আর হয় না। আমার শেষ খাওয়াটা খেয়ে চলে যেতে পারি বেশ। বেশ খাওয়াটা খেয়ে চলে যাই শেষটায়!'

॥ একান্ন ॥

পরাদন সকালে চোখ মেলতেই কানে এল আমার—প্রথম প্রশ্নেই রিনির কুশল জিজ্ঞাসা, 'কেমন আছো গো? ভালো তো? সর্দিটা কমলো?'

'কমবে কি রে? আরো জমলো বরং। বুকটা কেমন ভার ভার ঠেকছে।' আমি বলি—'তার ওপর কাশি হয়েছে আবার। ভারী কেশেছি কাল সারা রাত। জানিস?'

'তাই নাকি?'

'এত কাঁসি বাজালাম তোর কানে গেল না? আচ্ছা ঘুম তো তোর! এরপর যখন সানাই শুনবি টের পাবি তখন।'

'কিসের সানাই? বিয়ের?'

'বিয়ের নয়, হাঁপানির। বুকে সর্দি জমলে, কাশি হলে, ব্রঙ্কাইটিস হয়ে গোড়ার সেই সর্দি হাঁপানি হয়ে দাঁড়ায় শেষটায়। জানিসনে?'

'না তো।'

'জানবি কি করে, তোর মা তো হাঁপায় না আর। হাঁপানি আছে আমার মা'র। আমি জানি। যখন তা হয় না, এমন সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরোয়—ঠিক যেন সানাইয়ের মতই।' আমি জানাই : 'সারা বাড়ি গমগম করে আওয়াজে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তিন চারদিন এমন ভোগায় যে. সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না রে! যার হয় তার যে কী করে কে জানে।'

'সারায় না কেন তোমার মা? ওষুধ নেই হাঁপানির?'

'এখন অব্দি বার হয়নি। ওষুধ খেয়ে একটু কমানো যায় কেবল। একবার হলে তিন চারদিন ভোগাবেই। ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তর একটা মিকশ্চার খেয়ে মা খুব উপকার পান। আর ডাক্তার বিধান রায় একবার আমার চিঠির জবাবে প্যালল বলে একটা ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন, হাঁপানি থেকে সেরে ওঠার পর সেটা খেলে, নিয়মিত খেয়ে গেলে অনেকদিন ধরে তিনি ভালো থাকেন বেশ।'

'খেলেই হয় তাহলে।'

'তা তো হয়। খায়ও তো মা। কিন্তু হাঁপানি যখন হবার ঠিক হবেই। কিছুতেই আটকানো যাবে না। দিন কয়েক হদ্দমুদ্দ ভোগাবেই তোমাকে। আর তাতে যে ভোগে তারই শুধু কষ্ট না, যাদের সেই ভোগান্তি দেখতে হয়, তাদের কষ্টও কিছু কম নয়। অন্য ব্যারামের সঙ্গে হাঁপানির কী পার্থক্য তা জানিস?'

'কী?'

'আর সব রোগ হলে একেবারে শুইয়ে ফেলে, শুয়ে থাকা যায় মজা করে বেশ, কিন্তু হাঁপানির বেলায় সেটি হবার নয়। হাঁপানি এসেই তোকে বসিয়ে দেবে।'

'বসিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, শোবার নামটি নেই। বসে বসে হাঁপাও দিন রাত। কী কষ্ট, কী কষ্ট! একটুও শুতে দেয় না রে—আগাগোড়া ঠায় বসিয়ে রাখে।'

'ভারী খারাপ তো।'

'খারাপ বলে! শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে যা কষ্ট হয় না—যেন প্রতি মুহূর্তে দম আটকে আসে—দমকে দমকে আসে হাঁপটা—হাঁপানির ধমকটা।'

'কখন আসবে হাঁপানির ঐ ধকম আগের থেকে কি তা টের পাওয়া যায় না একদম?

'যায় বইকি। প্রথম একটু সর্দি হয়, সবারই যেমন হয়ে থাকে। হয়ে থাকে, ফের সেরে যায়—কিন্তু হাঁপানি রুগীর বেলায় সেটি হয় না। সেই সর্দি শুকিয়ে গিয়ে বুকে বসে হাঁপানির সুখটান হয়ে দাঁড়ায় শেষটায়।'

'সর্দি না হতে দিলেই তো হয় বাপু।'

'তা তো হয়। ডাক্তার রায়ের প্যাললটা বোধহয় সেইজন্যই দেওয়া। লাংস-এর প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে সর্দিটাকে আটকায় গোড়াতেই—'

'তুমি বাপু সাবধান হও তো! বাবার মুখে শুনেছি, কতগুলো ব্যারাম আছে যা বাপ-মা'র থেকে ছেলেমেয়েতে এসে বর্তায়—ঐ হাঁপানি তার ভেতর একটা—উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মতই।'

'জানি তো। মা-ই বলেছে আমায় যে, আমারও হতে পারে। হবে হয়ত বা। তবে একটা সান্ত্বনার দিকও আছে জানিস? হেঁপোরুগীরা অনেকদিন বাঁচে, দীর্ঘজীবী হয় নাকি!

'কাজ নেই ছাই অমন দীর্ঘজীবী হয়ে—কষ্ট পেয়ে কষ্ট দিয়ে ওরকম বেঁচে সুখ?'

'মা'র ধারণায় ওটা একটা আধ্যাত্মিক অসুখ। যাদের কিনা আত্মার আকূতি থাকে না...আকূতি মানে জানিস?

'উঁহু। ...আকূতি আবার কী? তুমি জানো?

'জানি না ঠিক। আঁকুপাঁকু গোছের একটা হবে বোধ হয়। ইঁদুর কলে পড়লে যেমনটা হয়, কিংবা তোর জন্যে মাঝে মাঝে যেমনটা আমার হয় না?...'

'আত্মারই বলে কোনো পাত্তা নেই! তার আবার আঁকুপাঁকু।'

'মানুষ যা মনের থেকে চায় না? যখন পায় না, যারা নাকি তা পায় না—অনেকে না পেলে কিছু মনে করে না, ভুলে যায় এক সময়, কিন্তু যাদের নাকি মনের ভেতরে তা চাপা থাকে—যারা কিনা সেই না-পাওয়াটা অন্তরে অন্তরে ফীল করে, তাদেরই নাকি ঐ হাঁপানিতে ধরে ভাই! প্রতিভাবান আর সাধক মানুষদেরই বেশি হয় এই ব্যারামটা।'

'চাইনে আমার প্রতিভাবান হয়ে।' প্রতিভা আর হাঁপানিকে সে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে চায়।

'আমি কিন্তু চাই যে, আমার হোক। মাঝেসাঝে এক-আধটু হক আমার...প্রতিভাবান না হতে পারি, ওই হাঁপানিবান তো হতে পারব। বিবেকানন্দর ছিল নাকি ওই হাঁপানি, আর রবি ঠাকুরেরও নাকি...'

'হোক গে, থাকুক গে, তোমার হয়ে কাজ নেইকো...'

'আমিও সেটা ভাবি একেক সময়। কাল রাত্তিরে যখন কাশির ধমকটা আসছিল না, ভাবলাম, ধরল বুঝি হাঁপানিতে আমাকেও, মা'র মতন আমিও গেলাম বুঝি! সম্ভাবনাটায় একটুখানি সুখ হলেও ঘাবড়ে গেছলাম বেজায়। কাশির ধমকের ওপর আবার যদি আমায় হাঁপানির ধমকানি খেতে হয়, তাহলেই আমার হয়েছে! আর দেখতে হবে না। বারোটা বেজে যাবে আমার।'

'সর্দিটা সারাও দেখি বাপু দয়া করে...'

'সর্দি কোথায়? সেরে গেছে তো। তার বদলে কাশিই আমার এখন...'

'মোটেই সারেনি তোমার সর্দি। বসে গেছে বুকে। কাশি হচ্ছে সেই জমাট সর্দিকে তোলবার জন্যে শরীরের স্বাভাবিক প্রয়াস। বুঝেছ? বাবার মুখে শোনা আমার। জানো?

'ডাক্তারের মেয়ে হয়ে শোনা কথার বিদ্যে ফলাচ্ছিস যে ভারী।' আমি ঠাট্টা করি—'লেডি ডাক্তার হবার আগেই তোর এই ডাক্তারি।'

'ঐ হাঁ করে থাকাটা বন্ধ করো দেখি। হাঁ করে ঘুমোনোটা বন্ধ করো তো তোমার...জেলের দাদাটি কী বলে গেলেন কালকে? শুনলে না? কানে তুলছ সে কথাটা?

'কানেই তোলা রয়েছে, নাকে নামানো যায়নি। নাক বোজা থাকলে, বোঝাই থাকলে, আমি তার কী করব? নাক কি আমার বাধ্য নাকি? মুখও অবাধ্য। নিতান্তই অবুঝ আমার মুখ, কিন্তু নাক আমার বেশ বুজদার। বুঝেছিস?'

'সারারাতই কাল বুঝতে হয়েছে আমাকে। বুজুতে হয়েছে। যতবারই হাত দিয়ে তোমার মুখ বুজিয়ে দিয়েছি না, পরমুহূর্তের দেখি তুমি ফের হাঁ করে বসে রয়েছো।'

'কি বললি? আমার মুখে হাত চাপা দিচ্ছিলিস তুই?' আমি ফোঁস করে উঠি।

'একবার নাকি? যখনই আমার ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখেছি যে, তুমি বদন ব্যাদান করে শুয়ে, তখনই আমি...কেন, টের পাওনি তুমি?'

' টের পেলে কি রক্ষে রাখতুম তোর? তোকে এই অযথা হস্তক্ষেপ করতে দিতুম নাকি?'

'অযথা?'

'অযথা নয়? দস্তুর মতন অনধিকার চর্চা, আমি বলব। হাত হচ্ছে হস্তগত করার জন্য—পরের কিংবা পরীর পাণিগ্রহণের হেতু। কারো মুখ হাতাবার জন্য হয়নিকো। আর ঐ মুখের সঙ্গে সব সময়ই মুখোমুখি হতে হয়।'

'হলেই বা কী! তুমি তো তখন ঘুমোচ্ছিলে গো! টের পেতে কী করে? বাজে বরবাদ যেত কেবল।'

'যেত যেত আমার যেত—তোর কী! সে আমি বুঝতুম।' আমি বলি—'তুই তো ভারী কেপ্পন রে! আমি যে কতো ঘুম ভেঙে উঠে, তুই অঘোরে ঘুমুচ্ছিস দেখে, অকাতরে, অপব্যয়ের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে...না, মেয়েরা ভারী হিসেবী হয় বলে যে, তা মিথ্যে নয়।'

'এখন বুঝলে তো! এখন দয়া করে তোমার ওই মুখটিকেও বোঝাও। বোঝাও এবং বোজাও।'

'বুঝেছি। এখন আমার খেসারত চাই। আমার ওপর তোর এই অনধিকার হস্তক্ষেপের...'

'তুমি যে শেষমেস এদিকেই ঠেলে আনছো তোমার কথার ধরনে আগেই তা টের পেয়েছি। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! তুমি হাঁ করলেই আমি তার আঁচ পাই, তা জানো? তা খেসারত তুমি পাবে কিন্তু তার আগে তোমাকে মুখ বুজে থাকতে হবে, নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে পাঁচ ঘন্টা।'

'আবার ঘন্টা!' পাঁচন খাওয়ার মত মুখখানা করে জানাই—'প্রাণায়াম আমার ধাতে পোষায় না—অঙ্কের মতই অবিকল। বাবা আমায় ছোটবেলায় অনেক শিখিয়েছিল জানিস? অষ্টাঙ্গ যোগের নাম শুনেছিস কখনো?'

'যাদব চক্কোত্তির পাটিগণিত? পাটিগণিতের যোগ আর জানিনে!'

শিব্রাম চকর্‌বর্‌তির খাঁটি অ-গণিত। যোগফোগ সব অঙ্কের ব্যাপার, আতঙ্কের ব্যাপার আমার আছে। পাটিগণিতের যোগের মতই বাবার ওই প্রাণায়ামযোগ করা সহজ নয়, দারুণ কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধন। আমার দ্বারা হবার নয়। আমি অমনি পেলাম তো পেলাম, ঐ উসিতরসে...যা বলেছিলাম। উসিতরসে পেলাম—তর হয়ে গেলাম। নইলে অত কষ্ট করে যোগের অঙ্ক কষে আমার অঙ্কশায়িনীকে যদি পেতে হয় তো আমার তা চাইনে।'

'তোমার ভালোর জন্যেই বলেছিলাম। হাঁ-করা ছেলেদের কোনো মেয়েরা পছন্দ করে না তা জানো?'

'কোনো মেয়েদের চাইছে কে? আমি সেই মেয়েটির অপেক্ষায় থাকব, যে নাকি বেশ সমঝদার, যা বোজাবার—যা যা বোঝাবার—মুখে মুখে বোঝাতে পারবে আমায়। তোর মতই যে কিনা আমি—হাঁ করলেই তার আঁচ পাবে, আর আঁচ পেলেই আঁচাতে দেবে আমাকেও। খাবার পরেই না আঁচাবার কথা!'

'আঁচিয়ে কাজ নেই তাহলে। তুমি ওই হাঁ-করাটাই প্র্যাকটিস করে যাও। ওর একটা ভালো দিকও আছে ভেবে দেখলে। নাকডাকা বরকে নিয়ে ঘর করা যায় না। হাঁ করে থাকলে তোমার নাক ডাকবে না। সেটা মন্দের ভালো। কানের পাশে সারা রাত নাক ডাকলে, ঘুমোনোর দয়া রফা!'

'হ্যাঁ, কথাটা তোর খাঁটি। কানের গোড়ায় নাকের ডাকাতি হলে ঘুমটাই মাটি। কান পাতাই দায় হবে, চোখের পাতা বুজবি কি, তবে সে ভাবনা তোর কিসের! তুই তো আমায় বিয়ে করতে যাচ্ছিসনে...'

'আহা, নিজের কথাই ভাবছি নাকি আমি। যে তোমার বউ হবে গো তার কথাটাই ভাবছিলাম...তোমার নাক ডাকলে তাকে নাকাল হতে হবে না?'

'তার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। সে কোনোদিন হবার নয়... এসব আলতু-ফালতু কথার আগড়ম-বাগড়ম আউড়ে আসল কথা তুই ভুলিয়ে দিতে পারবিনে। খেয়াল আছে আমার—খেসারত চাই। চাই-ই। নইলে ছাড়ছি না।'

'আচ্ছা নাছোড়বান্দা তুমি।' সে তার গালটা এনে আমার হা-এর ওপর রাখে। একটুক্ষণ। —'হোলো তো? এখন যাই, তোমার ওষুধটা নিয়ে আসি গে চট করে। পাঁচ দাগ তো ফাঁক করেছো, দুদিনের ওষুধ একদিনেই খেয়ে বসে আছো দেখছি...'

'দু' দিনের ওষুধ ছিল বুঝি? বলিসনি তো আমায়?'

'প্রত্যহ তিন দাগ—তিন ঘন্টা বাদ বাদ। লিখে দেয়নি শিশির গায়ে?'

'শিশির দিকে নজর দিলাম কখন? শিশির-সম্পাতে কি নজর দেওয়া যায়—চোখের সামনে সমুদ্র উথলালে?'

'যাক, খেয়ে ভালোই করেছ বোধ হচ্ছে। জ্বরটা ছেড়ে গেছে তোমার ওই জন্যেই মনে হয়।'

'জ্বর নেই যে কি করে টের পেলি? তুই কি থার্মোমিটার?'

'বাঃ, এক্ষুনি আঁচ পেলাম না? গা তোমার গরম নয় গাল ঠেকিয়ে দেখলাম যে!'

'দেখলি তো! না আঁচালে বিশ্বাস হয় না! আঁচ নিলি বলেই না...কিন্তু বাপু যাই বল, কাজটা তোর ঠিক হোলো না। উচিত হয়নি। কাল রাত্তিরে আমার অজান্তে আমার প্রতি বিমুখতা করেছিস, আর আজ সকালে এম্‌নি করে আমাকে তোর গাল দেওয়াটা...এই অপমান? যাক, এখনকার মত সয়ে গেলাম। দাবী আমার রয়েই গেল। পাওনা আমার

মিটলো না কিন্তু।'

'যেতে দাও তো আমায়। ছাড়ো এখন লক্ষীটি। ওষুধটা নিয়ে আসি গে। দেরি করলে ভারী ভিড় জমে যাবে ডিসপেনসারিতে। ফিরবার পথে ফের তোমার খাবারটা—খিচুড়িভোগ—নিয়ে আসতে হবে না আবার? কী বলবো ডাক্তারবাবুকে? জ্বরটা সেরেছে কিন্তু কাশি হয়েছে বেজায়? এই তো।

'আমিও যাব তোর সঙ্গে আজ। আজ তো আমার জ্বর নেই আর। তবে যাবার বাধা কোথায়?'

'এসো তাহলে চটপট।'

ডক—জেলখানাটার এক টেরে ডিসপেনসারি। ডাক্তারের হাবভাব মোটে নেই এমন এক কম্পাউন্ডার মার্কা ডাক্তার বসে ঘরটার একধারে। তাঁর সামনে জনাদশেক রুগী দাঁড়িয়ে আর পাশের টেবিলে প্রকাণ্ড এক কাঁচের জার-ভর্তি রঙচঙে কী এক মিকশ্চার।

তিনি ব্যাজার মুখে রোগবৃত্তান্ত শুনছেন, আর জার থেকে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছেন সবাইকে--আর বলছেন—'দুদিনের জন্য দেওয়া হল। প্রত্যহ তিন দাগ খাবে। তিন ঘন্টা অন্তর। আসতে হবে দুদিন বাদে।'

কারো সর্দি, কারো সর্দিকাশি, কারো জ্বর, কারো আমাশা, কারো সেটা রক্তঘটিত, কারো বা পেটের অসুখ—কিন্তু সবার জন্যে সেই এক দাবাই। কারো নাড়ি দেখা কি বুকে নল ঠেকানোর কোনো বালাই নেই।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই ওষুধ খেয়েই জ্বর ছেড়েছে আমার। কাশিটাও আমার কমল। কিন্তু তার পরেই এসে হাজির হোলো গলা ব্যাথা আর পেটের অসুখ।

'একি ওষুধ রে বাবা! একটা সারায় তো আরেকটা এসে পাকড়ায়।' আমি তাজ্জব হই—'বুক সারলো তো এদিকে পেট ছাড়লো!'

'ওষুধ খেয়ে হয়নি। অসুখের উচিত পথ্য তুমি পাচ্ছো কী? —খিচুড়ি কি রুগীর পথ্যি নাকি? তাই খেয়েই তোমার এই পেটের অসুখটা। আমি বলি কি, এসব যা তা না খেয়ে এর চেয়ে বরং উপোস করে থাকো আজ দিনটা। শুধু উপোস করলেও অনেক রোগ সেরে যায়, বাবা বলেন।

'বারে! বলছিস মন্দ না! পেটেও কিছু পড়বে না, মুখেও কিছু পড়বে না—না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরি আর কি!'

সত্যি বলতে, উপোস দিয়ে রোগকে পোষ মানানোর পক্ষে আমি নই। আমার মতে না খেয়ে বাঁচার চেয়ে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে মরাটা ঢের ঢের ভালো—গণ্ডের খাদ্য আর খাদ্যপিণ্ড যদি এক সঙ্গে মিলে যায়।

'তাহলে অমন পেট ঠেসে না খেয়ে কম কম করে খাও বরং।'

পরদিন আমার আমাশা দেখা দিল—তারপর সেটা দাঁড়াল রক্তামাশায়। তারপর দিন জ্বরটা ঘুরে এলো তার ওপর। আবার এলো কাশিবাসের ধকল।

রোজ ডিসপেনসারিতে যাই। সেই ডাক্তার-কাম-কম্পাউন্ডারকে সবিস্তার রোগ বৃত্তান্ত জানাই। সেই একই জারের একমাত্র দাবাই কয়েক মাত্রা করে পাই। তাই খাই তিন ঘন্টা বাদ বাদ। খেয়ে যাই —ঘন্টায় ঘন্টায়। দুদিনের দাবাই একদিনে সাবাড় করি। আবার যাই পরদিন।

'ওষুধ খেতেও তুমি কম ওস্তাদ নও বাপু!' দশদিনের দিন ডিসপেনসারি থেকে দশম

শিশিটি এনে রিনি বললে—'ডাক্তারেরও তাক লেগে গেছে দাদা! বলছিলেন যে, কোন রোগই সারছে না, এত ওষুধ যাচ্ছে কোথায়?'

সেদিন আমি ডিসপেনসারিতে যেতে পারিনি—কাহিল হয়ে শুয়ে ছিলাম নিজের বিছানায়। দশরকমের রোগ এসে আমায় শুইয়ে দিয়েছিল।

'এই দশ দিনেই এই দশা আমার! এত রোগ! কোনটাই সারছে না, সবগুলোই বাড়ছে। আর বিশদিন বাদে যখন তুই থাকবিনে, আরো কী দুর্দশা হবে আমার কে জানে!'

'কেন, থাকবো না কেন আমি?'

'তুই তো এক মাসেই খালাস! আমার যে দু মাস রে! ছাড়া পেয়ে তুই চলে যাবি আমার চোখের ওপর দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে...আমি এখানে একলাটি পড়ে থাকব বেঘোরে।'

'তুমিও কেন সেই সময়ে চলে এসো না আমার সঙ্গে? শুনেছি আপিসে গিয়ে আন্ডারটেকিং দিলেই ছেড়ে দেয়...ছেড়ে দিচ্ছেও...ছাড়াও পেয়েছে নাকি কেউ কেউ।'

আমার আন্ডারটেকার কে হবে? কে আছে এখানে আমার? 'আমার কথায় সে হাসল—'বালাই ষাট! আন্ডারটেকার কী গো! আন্ডারটেকার কাকে বলে তুমি জানো? ক্রীশ্চান ইস্কুলে পড়ো নি তো, জানবে কি করে? আমি সেন্ট মেরিতে পড়ি, আমি জানি...'

'তুই সেন্ট মেরিতে পড়িস, বলিসনি তো আমায়? এদিকে আমি দিনের পর দিন বেথুন ইস্কুলের সামনে মাথা খুঁড়ে মরছি...আর ওদিকে তুই কিনা...হায় হায়, আমার এত খাটাখাটনি সব বৃথায় গেল!'

'আমিই তোমার হয়ে আন্ডারটেকিং দেব না হয়। তুমি অসুস্থ তো, আমিই তোমার গার্জেন এখন। তোমার ভাই না আমি? খাতায় লিখে দিয়েছি তাই।'

'আচ্ছা, তাই হবে। তাই হবে না হয়। কিন্তু এই একটা মাসই কাটাই কি করে? এই মাসটাই কি কাটবে আর আমার? কাটলে হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, সারা মাসটা আমার এক রাত্তিরেই কেটে গেল সেদিন...কি করে যে! অদ্ভুত! সেই রাত্তিরেই আমার তামাম রাত কাবার হলো!

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। শুয়ে শুয়ে ছটপট করছিলাম। জ্বরটা বেড়েছে। পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রনা। বুকের ভেতরেও কেমন যেন করছিল। হার্টফেল করবো নাকি আমি?

রিনি প্রায় মা'র মতই সেবা করছিল আমার। জলপটি লাগিয়েছিল কপালে। রুমাল নেড়ে হাওয়া করছিল সে। হাত বুলাচ্ছিল গায়ে। আর মাঝে মাঝে অযাচিতই সারা মুখে মুখ বুলিয়ে দিচ্ছিল—বলছিল 'উঃ! কী গরমই না হয়েছে গাটা তোমার। আজ রাতটা কাটলে হয়। কাল সকালেই আন্ডারটেকিং দিয়ে চলে যাব আমরা এখান থেকে। এখানে থাকে কেউ? এই নরকে...এমন নরকযন্ত্রনায়? এখানে থাকলে মারা পড়বে তুমি। কী ড্যাম্‌পো জায়গাটা বাবা! ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, কিচ্ছু নেই এখানে। আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফেললে আমার বাবা দুদিনে সারিয়ে দেবেন তোমায়—দেখো না।'

এমনি সব আবোল-তাবোল কতো কী যে বলছিল—যেমন করে ছেলে ভোলায়, তেমনি করে আদর দিয়ে, সান্ত্বনা দিচ্ছিল সে আমাকে।

আমার তো নেই-ই, তার দু'চোখেও ঘুম ছিল না। মাঝরাতে হঠাৎ সে উঠে বসলো—'চুপটি করে শুয়ে থাকো, আমি একটু বাইরে থেকে আসি। এক্ষুনি আসব।'

'এত রাত্তিরে বাইরে কেন রে?'

'একটু বাইরে যেতে হবে যে। এক্ষুনি আসব।'

'জলবিয়োগে বুঝি? বুঝেছি। শীতের রাত্তিরে এত বেশী করে জল খায় নাকি কেউ? —খেলেই এই ঝঞ্ঝাট। যা তবে।'

গিয়েই তক্ষুনি সে ফিরে এল—'না, গেলাম না আর।'

'তার মানে?'

'দেবেনদা বাইরে দাঁড়িয়ে। দেখেই চলে এলাম।'

'আর কেউ নেই এখন বাইরে?'

'না, সে একলাটি দাঁড়িয়ে...কেন কে জানে!'

'কী করছে সে ওখানে? চল দেখি তো। আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি, চ।'

বাইরে গিয়ে দেখি তাই বটে। চুপ করে একলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবেন। কেন, কে জানে। 'দেবেন, তুমি? এত রাত্রিরে একলা দাঁড়িয়ে কী করছো এখানে?'

'পাহারা দিচ্ছি ভাই!'

'কিসের পাহারা?' শুনে আমার তাক লাগে। 'কাকে পাহারা দিচ্ছো আবার?'

'পাছে কেউ জেল থেকে না পালায়। আমাদেরকেই আগলাচ্ছি। পাহারা দিচ্ছি তোমাদের সবাইকেই।'

'কেন, জেলের পাহারা নেই? তারা সব গেল কোথায়?'

'কে জানে কোথায়! জেলের গেট খোলা, দেখছো না? সদর গেট খুলে রেখে পাহারাওলারা ঘুমুতে চলে গেছে সবাই। কেউ কোথাও নেই, দেখছ না?'

'দেখছি তো, কিন্তু কেন বল তো? জেলে তো পাহারার ভারী কড়াকড়ি থাকে শুনেছি—এখানে এমনটা কেন?'

'এখানকার সবই অদ্ভুত! ডিসপেনসারিতে ডাক্তার নেই, সদর দরজায় পাহারা নেই! রিনির টিপ্পনি।

'কর্তারা ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছেন। জেল থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে সুবিধে করে দিচ্ছেন সবাইকে। পালাতে ওসকাচ্ছেন জেলের ছেলেদের। এত ছেলের ধাক্কা সামলাতে পারছেন না তাঁরা—জেলের এত খোরাক যোগাতেও হিমসিম খেতে হচ্ছে বোধ হয়। ফতুর হয়ে গেল সরকার। তাই এই ব্যবস্থা নিয়েছেন মনে হচ্ছে। যার খুশি সে না জানিয়ে চলে যাক না! কোথাও কোনো বাধা নেই।'

'দিনের বেলায় আন্ডারটেকিং দিয়েও তো চলে যাওয়া যায় শুনেছি। যেতে পারে না ছেলেরা?'

'যায় বইকি কেউ কেউ। কিন্তু কারো কারো চক্ষুলজ্জায় বাধে না কেমন? তাই রাত্তিরে পালায় তারা, তাদের জন্যেই আমি...আমরা...জেলের দাদারা পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। ওরা গেট খুলে রাখলে কী হবে, আমরা কাউকে ওই গেট পেরুতে দিচ্ছি না, পালাতে দেব না কারুকেই। এখন আমার পাহারা দেবার পালা কিনা।'

'তাই বুঝি! তা রিনির—মানে—রিন্টুর যে একটু বাইরে যাবার দরকার পড়েছিল। দিনভোর ঢক ঢক করে জল গিলেছে তো তার জলাঞ্জলি না দিলেই নয় এখন।'

'যাক্ না! গেট তো খোলাই আছে...সেরেই আসুক গে চটপট। আমরা তো এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়টা কিসের।'

না না, ভয় কিসের দেবেনদা! কোনো ভয় করছে না আমার।'

গেট পেরিয়ে সে বেরিয়ে যায়—বাইরের আলো-আঁধারি দিকটায়।

খানিক বাদেই তার আর্তনাদ আসে—'শিব্রাম্‌দা-শিব্রাম্‌দা...শিব্রাম্‌দা...চট করে এসো তো একবারটি!'

'দাঁড়াও, দেখে আসি তো কী হোলো আবার। সাপে কামড়ালো নাকি ছোঁড়াটাকে!'

'আশ্চর্য নয়! গঙ্গার এ-ধারটায় গর্তে গর্তে খানাখন্দে ভরতি—সাপ-খোপ বেজায়। কিন্তু আমি তো ভাই এখান থেকে নড়তে পারবো না এখন!' সে বলে : 'দাদাদের কড়া হুকুম। তুমি গিয়ে দেখে এসো গে। যদি ধরে নিয়ে আসতে হয়, একলা না পারো, তখন আমায় ডেকো। আমি যাবো।'

আমি বাইরে বেরুতেই রিনি আমার হাত চেপে ধরে—'চলো, এখুনি পালাই এখান থেকে। কেউ কোথ্থাও নেই। রাস্তায় একটা ছ্যাকরা গাড়িটাড়ি পাকড়ে বাড়ি চলে যাই সটান!'

'সাপে কামড়ায়নি তো তোকে?'

'না গো! তোমাকে বের করে আনার জন্যেই ওই ফিকিরটা বার করলাম... আর দেরি করো না, এক মুহূর্ত নয়। দেবেনদার সন্দেহ হতে পারে।'

জেল ভেঙে নয়, পাঁচিল টপ্‌কে নয়, কোনো বীরোচিত ভাবের ধারকাছ দিয়েও নয়কো, নিতান্তই কাপুরুষের ন্যায় সেই রাত্তিরেই জেলের থেকে পালালাম আমরা। বুক টান করে গিয়ে সেই আমাদের পিঠটান দেওয়া।

॥ বাহান্ন ॥

ডক্ এরিয়া ছেড়ে খানিকটা এগুতেই একটা গলির টেরে খানকয়েক ছ্যাকরা গাড়িকে খাড়া দেখলাম। তারই একশো এগারো নম্বরের একখানাকে ভাড়া করে রিনি গিয়ে চেপে বসল আমায় নিয়ে।

'ভাড়া তো করলি, কিন্তু মেটাবি কি করে?' আমি বললাম 'পকেট ফাঁকা, গড়ের মাঠ! একটাও টাকা নেই আমার।'

'তোমার তো খালি টাকাই নেই, আমার যে একটা পয়সাও নেই গো!'

'তা হলে?'

'বাড়ি তো গিয়ে পৌঁছুই আগে। বাবার কাছে চাইবো। তিনিই মিটিয়ে দেবেন তখন।'

'মা'র কাছে চাইলেও পারিস।'

'মা? বাব্‌বা! মা'র সামনে এখন আমি এগুচ্ছি না সহজে। আমাকে দেখলে আর রক্ষে রাখবে না মা—কী যে আমার অদৃষ্টে, ভগবানই জানেন!'

'রক্ষে রাখবে না? জেলে যাওয়ার জন্যে বকবে বুঝি খুব?'

'শুধু জেল! কতো কী! সে তুমি কি বুঝবে তার!' সে গুমরায়।

'মাকে এড়িয়ে কতক্ষণ থাকবি? বাড়িতে মা'র সামনে না পড়ে থাকা যায় নাকি?'

'ঢাল দিয়ে যেমন তরোয়াল আটকায় না? তেমনি আমি বাবার আড়ালে আড়ালে থেকে মাকে ঠেকাবো।'

'আমার বরাতে ঠিক উল্‌টোটাই। আমায় মা'র আড়াল দিয়ে বাবাকে ঠেকাতে হয়। বাবার মার এড়াতে মা'র আবডাল লাগে আমার।'

'বাবা খুব মারে বুঝি তোমায়?'

'বাঃ! মারে না? না মারলে তো বাবা কিসের! মারবার জন্যেই তো বাবারা জন্মেছে রে। বাবার এক এক চাপড়ে পাঁচ পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায় আমার গায়ে। মা তখন কতো আহা আহা করে হাত বুলিয়ে রগড়ে দেয় জায়গাটা—তখন ডবোল আরাম। তাইতেই পুষিয়ে যায় আমার। মার খাবার ইচ্ছে করে আবার!'

'আমরা যখন বেরুলাম জেল থেকে, জেল-ফটকের ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা দেখেছি। এতক্ষণে চারটে বেজেছে মনে হয়। এখান থেকে আহিরিটোলা তো কমখানি পথ নয়, বেতো ঘোড়ারা যেমন ঢিমে চলছে না, এমনি টিকিয়ে টিকিয়ে যেতে যেতে বাড়ি পৌঁছতে সাতটা বেজে যাবে নির্ঘাত। বাবা নীচে নেমে এসেছেন ততক্ষণে। তাঁর চেম্বারে রুগীপত্তর আসতে শুরু করেছে। বসে বসে তিনি রুগী দেখছেন তখন, দেখব গিয়ে আমরা।'

'বৈঠকখানার ঘরে বসে রুগী দেখেন? মা সেখানে আসেন না কখনো?'

'নেহাত দরকার পড়লে আসেন, নচেৎ নয়।' রিনি কয়ঃ 'বাবা ঘুম থেকে ওঠেন কাঁটায় কাঁটায় চারটেয়—শীত কি গ্রীষ্ম কী! চানটান সেরে চা-টা খেয়ে তৈরি হতে পাঁচটা বাজে ভোর। সাড়ে পাঁচটায় তিনি নীচের চেম্বারে নেমে আসেন। হকার সেই ভোরেই স্টেটসম্যান দিয়ে যায়, পড়েন বসে বসে। তারপর রুগীরা সব আসতে থাকে একে একে। আশপাশেরই তো রুগী যতো, পাড়ারই বেশির ভাগ। তাদের দেখেন। যে যা দেয় তাই নেন।'

'আর দুপুর বেলায় করেন কী? পড়ে পড়ে ঘুমোন বুঝি আমার বাবার মতন?'

'ঘুমুবেন বাবা? তবেই হয়েছে। ওঁর খালি কাজ আর কাজ। কাজ ছাড়া কথাটি নেই। এগারোটা না বাজতেই খেয়েদেয়ে ফের তিনি বেরিয়ে পড়েন—শহরতলীর কোথায় কোন এক জুটমিলে চলে যান। সেখানকার বাঁধা ডাক্তার তিনি। মাস গেলে সেখান থেকেও হাজার আড়াই আসে তাঁর। সেই জুটমিলের থেকেই।'

'তার ওপর এখানে সেখানে উপরি কল তো রয়েছেই। নেই কি রে? ঘরে বসে রুগী দেখে তার থেকেও তা পান আবার? মোটামুটি জোটে তাঁর বেশ, কী বলিস?' আমার অনুযোগ।

'তা তো জোটেই। তবে বাবার বেশির ভাগ আয় ঐ জুটের থেকেই।'

'আর ওই এধারে-ওধারে যা জুটে যায়! তাই বা কম কী রে?'

'ডাক্তারদের উপায় কি কম নাকি গো? সেইজন্যেই তো ডাক্তার হতে এত সাধছিলাম তোমায়!...এবার তুমি সেরে উঠে পড়াশুনায় মন দেবে তো, কেমন? দেশোদ্ধার তো হয়ে গেল। দেখলে তো সব। এবারটি নিজেকে উদ্ধার করতে লাগো এখন।'

'বাঃ, এ কী হোলো! দেশের জন্যে প্রাণ দিতে হয় না? দিয়েছি কী?'

'দিতে বসেছিলে প্রায়। বুদ্ধি করে তোমায় বাঁচিয়ে আনলাম—তাই না? দেশের জন্য একবার করলেই হোলো, ছেলেমেয়ে তো কম নেই এদেশে। তারা করুক এবার। দেশোদ্ধারে কাজ তো ভাই একজনের নয়—সবাই মিলে করবার—তাই না? তাদের সবাইকে চান্স দাও এবার। দেশের কাজ করার সবাই সুযোগ পাক। নিজেই একলা দেশটাকে টেনে তুলবে, এমন স্বার্থপর হয়ো না গো!'

আহিরোটোলা পৌঁছুতে সাতটা বাজলো প্রায়। রিনির বাবা চেম্বারে এসে বসেছেন তখন। একজন রোগীকে দেখছিলেন খুব যত্ন করে। রিনি গিয়ে বলল, 'বাবা, গোটা কয়েক টাকা দাও তো, গাড়িভাড়া মেটাবো।'

রুগী দেখার ফাঁকে চোখ তুলে তাকালেন একবার, একটি কথাও না বলে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিতে বললেন ইশারায়।

'রুগীদের ফীসের টাকা টেবিলের ওপরে ছড়ানো পড়েছিল, তার থেকে নিয়ে রিনি বেরিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপটি করে।

'রিনি ফিরে আসার আগেই সে রুগীটিও ফী দিয়ে চলে গেছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল কেমন। সামনের সোফাটায় গিয়ে বসে পড়েছি।

রিনিও এলো, আমিও এলিয়ে পড়েছি সোফায়।

'বাবা, রামদাকে একটু দেখবে? কী হয়েছে ওর!' রিনি বলল, 'ক'দিন ধরেই ও ভুগছে বেজায়?'

শোনা মাত্রই ওর বাবা উঠে এসে আমাকে দেখতে বসলেন। রিনি তাঁর চেয়ারটা সোফার কাছে টেনে এনে রাখলো।

প্রথমে আমার হাত নিয়ে নাড়িটা দেখলেন তিনি। তারপর বুকে স্টেথোসকোপ বসালেন, তারপর পিঠের দিকে...ওরই ভেতর এক ফাঁকে রিনিকে বলেছেন—'ছোট সিরিঞ্জটা ধো তো বেশ করে। টেবিলের থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আয়।'

বেহুঁশের মত হলেও আমি হুঁশ হারায়নি তখনো। প্রায় আচ্ছন্নের ন্যায় হয়েও, টের পাচ্ছিলাম সব। শুনতে পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম বেশ।

উনি আমায় একটা ইনজেকসন দিলেন আর বললেন—'তোর মাকে ডাক তো একবারটি। দুধ গরম করে আনতে বল চট করে।'

'মাকে এখন বিরক্ত করার দরকার কী বাবা? মোড়ের মেঠাইওলার দোকানে তো পাওয়া যায় গরম দুধ। আনব?'

'তাই আন না হয়। ভাঁড়ে করে আনবি তো? ভাঁড়টা গরম জলে ভালো করে ধুয়ে দিতে বলিস গোড়ায়।'

'গরম জল যদি না থাকে? ওদের তো চায়ের দোকান না!'

'বেশ ফুটন্ত দুধ তো? তাহলে ওই গরম দুধ দিয়েই ভাঁড়টা গরম জলে ভালো করে ধুয়ে নিবি একটুখানি, বুঝেছিস?

আমি কি বেহুঁশ হয়ে পড়ছি নাকি? এক্ষুণি কি অজ্ঞান হয়ে পড়ব? মারা যাব এবার? কী হয়েছে আমার যে!....

গলার থেকে বোল সরছে না আমার—মাথার ভেতর যতো আবোল-তাবোল ভাবনা।

বাবার মতই হোলো নাকি আমার? বাবার যেমন মাঝে মাঝে হয়? দিন কয়েক অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন বিছানায়। তারপর একদিন আপনার থেকেই সেরে ওঠেন—জ্ঞান ফিরে পান আবার।

কী হোতো যে বাবার কে জানে! তখনকার কালে ওসব রোগের নামধাম, চিকিৎসা কিছুই বেরয়নি নাকি।

চাঁচল রাজ হাসপাতালের ডাক্তার বিপ্রদাসবাবু আসতেন—দেখতেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাবাকে তাঁর যথাসাধ্য পরীক্ষা করতেন। দেখেশুনে শেষমেস বলতেন-'কোমা হয়েছে তোমার বাবার। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কোনো দাবাই নেই। আমার জানা নেই অন্তত।'

'সারবেন না বাবা? কাচুমাচু হয়ে শুধাতাম। মারা যাবেন নাকি? সে কথা জিগ্যেস করার সাহস হত না, মন যে কেমনটা করত তখন।

'সারলে আপনার থেকেই সারবেন। এখন ক'দিন এভাবে থাকেন কিছুই বলা যায় না। জল খাওয়াতে হবে খুব। আর ফলের রস-টস। এই চলুক।'

'হাঁ করছেন না তো। খাবেন কি করে?'

'হাঁ করিয়ে খাওয়াতে হবে। ঐ জল আর ফলের রস। খুব একটু একটু করে। মাঝে মাঝেই।'

'ওষুধ দেবেন না?'

'এর কোনো ওষুধ নেই, বেরয়নি এখনো। কবরেজি শাস্ত্রে এই ব্যামোকে সন্ন্যাস রোগ বলে থাকে। আমরা বলি কোমা!'

'কোমাটি কী?'

'কোমা হচ্ছে কোমা—আবার কী? মরবার আগে হয়ে থাকে অনেকের, আচ্ছন্নের মতন এই পড়ে থাকা। আবার মরবেই যে তারও কোনো মানে নেই। ভালোও হয়ে উঠতে পারে ভগবানের ইচ্ছায়। সবই তাঁর হাত।'

'কিন্তু মা যে বলেন, উনি এখন সমাধিতে রয়েছেন?'

'সেই কথাই বলেন। ঐ কোমাই। সংস্কৃত ভাষায় সমাধি। একেবারে খতম হবার আগে, মানে সমাধার আগে হয়ে থাকে।'

'না না, তা নয়। ঠাকুর পরমহংসদেব বলেন না..?'

'সেই সমাধি তো? জানি। যে-সমাধি হলে, উনি বলেন, লোকে আর ফেরে না, কদাচ দু-এক জনা ফিরে আসেন লোকশিক্ষা দেবার জন্যই? সেই তো? সেই কথাই তো কইছি আমি।'

মা'র কিন্তু ভিন্ন মত ছিল। মা বলতেন, ছাই জানে ওই ডাক্তার। উনি এখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে রয়েছেন। দেবদেবীদের সঙ্গে মুলাকাত করছেন এখন।

একেবারে মূল ধরে টানতেন মা। সিরিয়াস্‌লি বলতেন, কি ঠাট্টাতামাশায়—তা মা-ই জানেন।

মুলাকাতের কাতর দশা কাটিয়ে ফেরার পর বাবাকে আমি শুধিয়েছি, বাবা, তুমি নাকি ইন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে? দেখা হয়েছিল মহাদেবের সঙ্গে? মা দুর্গাকে দেখেচ? দশ হাত নিয়ে লটর-পটর করছে মা? দশ-দশটা হাত নিয়ে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ওঁর। ঘুমোতে পারছেন? পাশ ফিরে শোন কি করে?

মা হাসতেন আমার কথায়।—'বোকা ছেলে কোথাকার। মা'র কি চোখ বুঁজবার ফুরসত আছে একদণ্ড? বিশ্বজোড়া এত ছেলেমেয়ের দায়ভাবনা ঘাড়ে নিয়ে... ? এক মুহূর্তের জন্যে তিনি চোখ বুঁজলেই আমাদের চক্ষুস্থির। মায় মহাদেব সমেত সবার।'

'বলো না বাবা, কী হয়েছিল তোমার ওই? সমাধি না কী?'

'আমার কী হুঁশ ছিল রে। আমি বাঁচতে বসেছিলাম।'

তার মানে, তিনি মরতে বসেছিলেন তখন। বাবা বলতেন, মন্দ কথা কখনো মুখে আনতে নেই। মুখের কথা ফলে যায় অনেক সময়। তাই মরতে বসে না বলে ঘুরিয়ে অমনি করে বলা ঐ কথাটা।

বাবার জবাবে ডাক্তারের জবানির সায় ছিল যেন...

অর্ধাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার মনে হতে লাগল, বাবার সেই রোগটাই ধরেছে বুঝি আজ আমায়। উত্তরাধিকার সূত্রে মা'র হাঁপানি যেমন নাকি আমার পাওনা হয়ে রয়েছে, মা বলেছেন, তেমনি সেই জন্মসূত্রেই বাবার সন্ন্যাসের এই দায় আমার ঘাড়ে এসে চাপল এখন। বাবা সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে গিয়ে যে-পাহাড়ে ব্যাধিটা তাঁর জটাজুটে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন, হিমালয়ে না গিয়েই, ঘরে বসেই সেটা অমনি আমার জুটে গেল বোধহয়—নিখরচার এই আমদানি।

সেই কোমাই ধরেছে, ধরতে যাচ্ছে বুঝি আমায়?

কোমা? কোমাটা কী? আধা বেহুঁশ অবস্থায় নিজেকেই আমি শুধাই।

কোমা মানে কোমা—আবার কী? আপনার থেকেই জবাব পাই। বাক্যরচনার গোড়ায়, প্রথম পদক্ষেপেই যিনি দেখা দেন—সেই কমা-ই একরকম আর কি? ডাক্তারি ব্যাকরণে ঐ কোমা। অর্থাৎ বাক্য সম্পূর্ণ হয়ে সমাপ্তির দাড়ি টানার আগে, স্থানে অস্থানে মাঝে মাঝেই যিনি দেখা দিয়ে থাকেন। লাইফ সেনটেন্সের মাঝ-মধ্যের হলটিং স্টেশন—যার শেষে কিনা সেই ডেথ্। অনিবার্য ডেথ সেনটেন্স?

আমি কি তাহলে দাঁড়ি টানার আগে সেই কমাতেই এখন দাঁড়িয়ে আছি?

রিনি গরম দুধের ভাঁড়টা রুমালে জড়িয়ে ধরে আনল, চোখের কোণে দেখতে পেলাম।

দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি যখন, তাহলে এখনো আমি হতজ্ঞান হইনি একেবারে।

কমার লক্ষণ নেই এখনো—এখনো আমি বাড়ার দিকেই রয়েছি। তবে? তাহলে?

'হাঁ করিয়ে চামচেটা দিয়ে একটু একটু করে খাইয়ে দে তো ওকে।' বললেন উনি, কিন্তু বসবি কোথায়? বসে খাওয়াতে হবে যে। সোফায় তোকে ধরবে না তো? কী করে খাওয়াবি তবে? তাহলে এই চেয়ারটায় বস না হয়। বসে বসে খাওয়া।'

চেয়ারে বসে অ্যাদ্দূর থেকে হাত বাড়িয়ে কি খাওয়ানো যায় বাবা?' বলে রিনি চেয়ারটাকে হটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তাই তো বলছিলাম রে! তাহলে?' তিনি কন: 'সেইজন্যেই তো তোর মাকে ডাকতে বলছিলাম।'

বাবার জবাবে সে সোফায় বসে আমার মাথাটাকে নিজের কোলের ওপর টেনে নিল। নিজেই মা হয়ে বসল যেন। তারপর কোলের ছেলেকে মা যেমন ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ায় না, তেমনি করে আগে ফুঁ দিয়ে গরম দুধটাকে একটু জুড়িয়ে নিয়ে খাওয়াতে লাগল আমায়। চামচের পর চামচ।

হাঁ করাতে হোলো না আমাকে। চিরকালের হাঁ-করা ছেলে হাঁ করেই ছিলাম, ঢক ঢক করে গিলতে লাগলাম বেশ।

এমন সময় রিনির মা দরজা ঠেলে ঘরে এলেন।—'একী? এ কে? চাঁচলের রাম না? এখানে অমন করে শুয়ে কেন গো? কী হয়েছে ওর?'

'ভারী শক্ত ব্যারাম গিন্নি। বুকে জল জমেছে।' বললেন রিনির বাবা: 'প্লুরিসি হয়েছে ছোঁড়াটার।'

॥ তিপান্ন ॥

না, কোমা না। কমা নয়, সেমিকোলনেই ছিলাম এতক্ষণ। এমন কি, কোলনেও ছিলাম বলা যায়। রিনির কোলে মাথা রেখে দুধ খেয়েছি মনে পড়তে থাকে আমার। আচ্ছন্ন ভাবটা

কাটার পর চোখ মেলে দেখি আমি বিছানাতেই শুয়ে। এ কোথায়? এ তো সেই সোফা নয়, এমন কি ডাক্তারবাবুর রুগী দেখার ঘরও নয় এ।

রিনি আমার বিছানার পাশে বসে। —'কোথায় রে আমি?'

'আমাদের তিনতলার ছাদে। চিলকোঠায়। রিনি বলল, 'বাড়িতে তো ঘর খালি নেই। ছাদের এই ঘরটাই ফাঁকা। এখানেই তুমি থাকবে।'

'চিলেকোঠায়? এই এক চিলতে ঘরে?'

'তোমার একলার থাকার পক্ষে তো যথেষ্টই —তাই নয়?'

'একলা থাকতে হবে আমায়? না বাবা, একলাটি থাকতে পারব না। দারুণ ভয় করবে আমার।'

'ভয় কিসের গো?'

'ভূতের ভয়, আবার কী?' আমি বলি : 'ছোটবেলায় ভূতে ধরেছিল না আমায়? সেই থেকে ভূতের ভয় আমার ভারী।'

'ভূত কোথায় এখানে? কলকাতায় কি ভূত থাকে নাকি? থাকতে পায়? তিষ্ঠোতে পারে কখনো? ভূত যতো সব পাড়াগাঁয়।'

'সেই ভূতটা আমায় ছাড়েনি এখনো। জানিস? মনের মধ্যে রয়ে গেছে আমার। অন্ধকার ঘরে একলাটি পেলেই চেপে ধরে, ভয় দেখায় আমায়, বুকের মধ্যে এমন গুড় গুড় করে। একলা থাকতে হলে...আমি...আমি হয়ত হার্টফেল করেই মারা যাবো।'

'বেশ। আমিও থাকব না হয় তোমার কাছে। তুমি রুগী মানুষ, রাত-বিরেতে কখন কী দরকার পড়ে, ওষুধ-টষুধ খাওয়াতে হয় যদি, এই সব বলে-কয়ে মাকে রাজী করানো যাবে—থেকে যাব না হয় তোমার কাছে, কী হয়েছে!'

'তাই বল্। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো আমার।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলি—'একতলায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম না? একটু আগে...যখন তুই দুধ খাইয়ে দিচ্ছিলিস আমায়? তিনতলায় এলুম কি করে? কিছুই তো মনে পড়ছে না আমার।'

'আমি তুলে আনলাম যে তোমাকে!'

'তুই! তুই আনলি? কি করে আনলি রে তুই। কিছুই তো টের পাইনি।'

'কোলে করে আনলুম তো। একলাই আনতে পেরেছি...'

'বলিস কি রে! অবাক্ করলি আমায়!'

'অবাকটা কিসের? 'এমন কিছু ভারী কাজ নয়। কেন, চাঁচলে থাকতে তুমি যে আমায় কোলে করে মহানন্দা পার করেছিলে একবার—মনে পড়ে না তোমার?

'তুই তো হাল্কা পলকা ছিলিস তখন। এখন আর পারব কি? আর তোকে কোলে নিয়ে মহানন্দা পেরুনো...সে তো মহানন্দের কাজ। তাছাড়া তোকে কোলে করতে পাওয়া তো এক বিলাস! আর আমি—আমি যে একটা দস্তুর মতন লাশ রে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি ব্যাপার...'

'তুমিও এমন কিছু ভারী নও। ক'দিন ধরে ভুগে ঠিক যেন ফড়িংটি হয়ে গেছ। তোমাকে তুলতে এমন কিছু বেগ পেতে হয়নি।'

'এখনো তুই ঐ ছেলের পোশাক বদলাসনি? সেই হাফপ্যান্ট পরে রয়েছিস? মা কিছু বলছে না?'

'বলবে না আবার? তবে এখনো বলার ফুরসত পায়নি বোধহয়। তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছ, প্লুরিসি নাকি যেন হয়েছে তোমার—তাই নিয়ে বাড়ি সুদ্ধ ব্যস্ত সবাই। তাই এখনো আমি আস্ত রয়েছি এতক্ষণ। দেখো না কী হয়...আমার অদৃষ্টে কী আছে দ্যাখো না! আমাকে নিয়ে কী হয় এরপর দেখতেই পাবে।'

'তা নাহয় দেখব'খন। কিন্তু তুই যে চামচেয় করে আমায় দুধ খাইয়েছিস তাতে...তাতে যা দুঃখ পেয়েছি কী বলব! সে আমার দুধ খাওয়া নয় বিষ খাওয়া হয়েছে।' আমি সখেদে কই : 'তোকে এত করে সেদিন বোঝালাম যে, মুখ থাকতে হাতের কোনো কাজ নেই—হাত কিসের জন্যে? আর তুই কি না! ...কোনো উন্মুখ লোকের কাছে, এমন কি সে যদি মরণোন্মুখও হয় না...মুখের কাছে দুধের পাত্র তুলতে হলে মুখটাকেই পাত্র করতে হয়, নিজেই মুখপাত্র হবি। তা না হয়ে...?'

'মুখপাত্র হব? কি করে মুখপাত্র হবো?' সে বুঝতে পারে না বুঝি।'

'কি করে আবার? মুখটাকেই পাত্র করবি তোর। মুখের মধ্যে দুধ নিয়ে না...চুমুকে চুমুকে খাওয়াবি আমায়। তাই তো নিয়ম।'

'তাই নিয়ম? কোথাকার সৃষ্টিছাড়া নিয়ম। —শুনি একবার?

মোটেই সৃষ্টিছাড়া নয়। এই সৃষ্টির মধ্যেই। তোর সৃষ্টির মধ্যেই তো? তুই-ই আমাকে অমনি করে খাইয়েছিলিস একবার...একটা মিষ্টি জিনিস...তাতে ঐ মিষ্টি আরেকটা মিষ্টির সঙ্গে মিশিয়ে ডবোল মিষ্টি করে আমি পেয়েছিলাম...তোর কাছেই খেয়েছিলাম সব প্রথম। আর...আর বোধ হয় সেই শেষ। মনে নেই তোর?'

'কক্ষনো না! কবে আমি খাওয়ালুম গো তোমায়?'

ওর কথায় আমি আঘাত পাই সত্যিই! যে মুহূর্তক্ষণটি আমার প্রতিমুহূর্ত—আমার সারাজীবন তাই ওর কাছে বিস্মরণ হয়ে রয়েছে। ওর যে ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি থেকে আমার আত্মবিস্মৃতি—কোনোখানেই তার বিন্দুমাত্র স্থিতি নেই আর একটু ও?'

মেয়েরা বুঝি এমনিই। এমনি করেই মুহূর্তের লীলাবিলাসে কাউকে বাজা করে দিয়ে তার পরেই অবহেলায় তাকে ফকির করে ছেড়ে দেয়। ঈশপের ব্যাঙের গল্পটা মনে পড়ে যে, ব্যাঙ নাকি ঢিলছোঁড়া একটা ছেলেকে বলেছিল (নাকি মেয়েকেই ?), তোমার কাছে যা নেহাত হাসিখেলা, আমার বেলায় তা ভাই মরণদশাই নির্ঘাত।

আমার সেই ব্যাঙের জিম্মায়, মনের ব্যাঙ্কে সযত্নে এতদিন ধরে যে আধুলিটি জমিয়ে রেখেছিলাম তা আজ এই অর্ধচন্দ্র হয়ে দেখা দিল আমায়।

'তাহলে তুই নোস, আর কেউ হবে বোধ হয়। ভুল করে গুলিয়ে ফেলেছি।'

'আমি ছাড়া আবার কে খাওয়ায় তোমায়? তির্যক চাউনি তার—'কার খাও আর?'

'তাও তো বটে! কার খাবো আর? তুই ছাড়া আমায় খাওয়াবার কে আছে আবার?' আমি ভাবিত হই—'তুই-ই খাইয়েছিলিস—তবে সেটা স্বপ্নই হবে বোধহয়। স্বপ্নেই দেখে থাকব হয়ত।'

'তাই বলো!' সে হাঁপ ছাড়ে : 'হ্যাঁ, স্বপ্নে ওরকমটা দেখা যায় বটে। কতোদিন আমিও স্বপ্ন দেখেছি অমন—যে তুমি আমায় খাচ্ছ, আমিও তোমায়. ..হ্যাঁ, সেটা হতে পারে।'

'সে কথা যাক, তুই যে অসহায় অসতর্ক পেয়ে আমায় সঙ্গে ঈদৃশ আচরণ করবি তা

আমি কখনো ভাবতে পারিনি...'

'কী ঈদৃশ আচরণ?'

'পথ্য দেবার ছলনায় আমার প্রতি অপত্যস্নেহ দেখাবি—এই রকম বাৎসল্য করবি? এটা করা কি তোর উচিত হয়েছে?'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু যদি বুঝতে পারি?'

'অজ্ঞান অবস্থায় ঝিনুকে করে দুধ খাইয়েছিস আমায়? ও তো খোকারা খায় রে। আমি কি খোকা নাকি এখনো? বড় হইনি আমি?'

'সন্দেহ হয়।'

'ঝিনুকে খাবার বয়েস আমার গেছে। আমি এখন চুমুক দিয়ে খেতে পারি। তাই খাব। চুমুকে চুমুকে খাওয়াবি তো তুই আমায়?'

'হয়েছে! থামো তো। চুপ করো এখন। এখানে ওসব উচ্চবাচ্য একদম না। কেউ শুনলে কি দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এ তোমার জেলখানা নয়। জেলের স্বাধীনতা এখানে নেই। এটা বাড়ি। বুঝেচ?'

'ভারী শেখাচ্ছিস আমায়। বাড়ি যে জেল তা আমি অনেককাল আগেই জানি—তুই বাড়িয়ে কী বলবি আর! সেই জন্যেই বাড়ি থেকে পালিয়েছি কবে। চিরদিনের জন্যই—ঘর ছেড়ে আমি এই হাঘরে।'

'তোমাদের বাড়ি জেলখানা? বোলো না, বোলো না—অমন কথাটি বোলো না। তোমার বাড়ির পরিবেশ আমি জানিনে নাকি? ওরকম স্বাধীনতা ক'টা বাড়িতে আছে? আর কী ভালো যে খাও-দাও তোমরা! কতো আম, কতো রসগোল্লা, কতো ক্ষীর সর পায়েস! আঃ!' আয়েসে ওর চোখ বুজে আসে। 'ওই বাপ-মা, অমন ভাই—ক'জন পায় গো? আমি পেলে বর্তে যেতাম।'

'হাজার এ-ক্লাসের হলেও জেল সেই জেলই! বুঝেছিস?'

'অমন সুখের বাড়ি হয় নাকি! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় তোমায়। সেই ভূত, যাকে তুমি নাকি দেখেছিলে ছোটবেলায়, এখনো তোমায় ছাড়েনি তুমি বলেছিলে না? সেই ভূতটাই। সে-ই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে-ভূত আর কোথাও নেই বাপু, তোমার ওই মনের মধ্যেই বাসা বেঁধে রয়েছে। তোমায় শান্তিতে থাকতে দেয় না।'

'তোরা মেয়েরা তো সেকথা বলবিই রে! তোদের দুঃখ ক'দিনের আর! ক'দিনের কারাবাস। বিয়ে হোলো কি বাড়ির জেলখানা ছাড়লি, রাতারাতি আরেক রাজ্য জয় করে বসলি। তোর সেই নিজের রাজধানীতে তুই-ই রাণী—রাজা নেই কেউ সেখানে। নামমাত্র একজন থাকে বটে, সে গোলাম। ভূতের ব্যাগার খাটবার, কি পেত্নীর ব্যাগার যাই বলো।'

'আর তোমাদের?'

'বিয়ের পরই বনবাস—সেই রামচন্দ্রের মতই। জন্মের থেকে বাপ-মা'র অধীন—তার মায়াপাশ আর বিয়ের পর স্ত্রীপুত্রের তাঁবেদারি—সেই নাগপাশ—আমাদের মুক্তি কোথায়? আজন্ম কারাবাস আমাদের...আমরণ!'

'আহা!' কপট সহানুভূতিতে সে নিশ্বাস ফেলে।

'কন্যারাশির রাশি রাশি সুখ, আর কন্যালগ্নের...মানে ওই হতভাগ্যদের দুঃখের সীমা নেই আর। একযাত্রায় পৃথক ফল যদি কোথাও থাকে তো সে এই গোধূলি-যাত্রাতেই।'

'বোলো না, বোলো না।'

'বলব না? খুনের আসামীরও হয় ফাঁসি হয়, নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—একটাই হয়, দুটো কখনোই নয়। কিন্তু বিয়ের স্বামীদের গোড়াতেই ওই ফাঁসি, তার পরে যাবজ্জীবন কারাবাস।'

আমার কপট দীর্ঘনিশ্বাস।

'তোমার ভাবনা কিসের? সে-ফাড়া তো তোমার কেটেই গেছে। নতুন করে আর তো কোনো ফাঁদে তুমি পড়তে যাচ্ছো না আবার!'

'তাতে কী, যাবজ্জীবনটাই এড়ানো গেছে, ফাঁসির দণ্ড তো মুকুব হয়নি আমার। ফাঁস তো লেগেই রইলো এই গলায়! তুই তো দু'দিনেই ভুলে যাবি, আমার কিন্তু তোর জন্যে হাঁসফাঁস করে কাটাতে হবে সারা জীবন!'

'আর আমি বুঝি খুব সুখে থাকবো!'

'সেই জন্যেই বলছিলাম কি', ওর দুঃখের কথায় কান না দিয়ে নিজের বিনীত নিবেদন রাখি—'ফাঁসির আসামীও যা চায় জেলে বসেই পায়, যা খেতে চায় তাই দেওয়া হয় তাকে—জানিস তো? কিন্তু আমার কী বরাত দ্যাখ। এত করে চাইছি কিন্তু আমার সেই ফাঁসির খাওয়াটা পাচ্ছিনে আর।'

'পাবে পাবে—কিন্তু এখন না। আমার ফাঁসির আগে, ফাঁসি হবার আগের দিনটায় কোনো এক ফাঁকে খাইয়ে যাব তোমায়—অনেকক্ষণ ধরে একখানা। কথা দিচ্ছি। কিন্তু এখন না—লক্ষ্মীটি! দোহাই তোমার। এখন নয়। এক্ষুনি কোত্থেকে কে এসে পড়বে, দেখে ফেলবে—সর্বনাশ হয়ে যাবে। বলেছি না যে জেলখানায় রয়েছি? জেলার সাহেব এখানে না থাকলেও—জেল ঠিকই আছে।'

বলতে বলতে জেলার মেম এসে হাজির।

আমার প্রতি বিরূপ দৃষ্টি হেনে এমন এক ঝঙ্কার তুললেন যে, দু'জনেই আমরা চমকে গেলাম।

'বলি, এই ধড়াচুড়োগুলো কি ছাড়া হবে রাজকন্যের? নাওয়া-খাওয়া নেই বুঝি আজ?'

'যাচ্ছি মা এক্ষুনি। বাবাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখলুম না। এই দশ দিন চান করতে পাইনি জানো মা? কীরকম করছে যে গা-টা!'

'ছিলি কোথায় এই দশ দিন—শুনি? পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেল, এসে আশীর্বাদ করবে, দিনক্ষণ সব ঠিকঠাক, মেয়ে ইদিকে উধাও। বলা নেই কওয়া নেই, বেপাত্তা? কোথায় নেচে নেচে বেড়ানো হচ্ছিল ধিঙ্গি মেয়ের?'

'কোথাও না মা!—পুলিসে ধরেছিল যে, আমি কী করব!'

'পুলিসে ধরেছিল?' শুনেই মা আঁতকে ওঠেন—'অ্যাঁ। ...পুলিসে ধরেছিল তোকে?'

'ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম তো! এক জায়গায় ছেলেরা সব পিকেটিং করছিল! পুলিসে ওদের ঘেরাও করে জায়গাটা ঘিরে রেখেছে, আমি কী করে জানব! সেই ফুটো দিয়েই আসছিলাম, যেমন আসি না রোজ? ধরা পড়ে গেলাম। ছেলেদের সঙ্গে আমাকেও ধরে নিয়ে গেল থানায়। আমি কী করব?'

'পুলিসের হাতে পড়েছিলিস, বলিস কি? থানায় নিয়ে গেল পাকড়ে? তোর অমন সুন্দর চুল—কোথায় খোয়ালি?'

'পুলিসে ছেঁটে দিয়েছে যে। আমার কোনো হাত ছিল?'

'পুলিস ছেঁটে দিয়েছে? মেয়েদের গায়ে হাত দেয় পুলিস?'

'পুলিসের যে কী অত্যাচার তুমি জানো না মাসিমা?'

মাঝখান থেকে বলতে হয় তখন আমায়—'প্রাণে মারা যাচ্ছে কত জনা। আমার পাশেই একটা ছেলেকে এমন রুলের গুঁতো লাগালো না, সে কোঁক করে উঠেই ঢলে পড়ল, চোখ মেলল না আর। রিনি তো তবু রক্ষে পেয়েছে খুব। চুলের ওপর দিয়েই গেছে ওর—অল্পের জন্য রেহাই। এক চুলের জন্যেই বেঁচে গেছে বেচারা।'

॥ চুয়ান্ন ॥

'পুলিসে ধরে নিয়ে গেছল তোকে?'—শুনে তো রিনির মা'র গালে হাত।

'হ্যাঁ মা, ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম, পথে এক জায়গায় ছেলেরা বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে দেখবার জন্যে একটুখানি দাঁড়িয়েছি কেবল, ওদের সঙ্গে পাকড়ে প্রিজন ভ্যানে পুরে আমাকেও ধরে নিয়ে গেল থানায়। সেখানে ছোকরাগোছের এক বাঙালী পুলিস না, পুলিস হলেও লোকটা ভালো, সে আমায় বলল কি—দিদি, মেয়েদের এখানে ভারী অসুবিধে, নানান বিপদ-আপদ, তুমি বরং ছেলেদের পোশাক পরে নাও, নিরাপদে থাকবে। তারপরে সেই আমায় এই হাফপ্যান্ট আর হাফ শার্ট এনে দিয়েছে, বিনুনি ছেঁটে বব্ চুল বানিয়ে দিয়েছে সেই তো?'

আমি হাঁ করে রিনির কাহিনী শুনছিলাম। সত্যি, মুখে মুখে এমন বানাতেও পারে বটে মেয়েরা।

গালগল্পে তাদের জোড়া মেলে না। কাহিনীবিন্যাসে তো অতুলনা। গল্প গাঁথনিতে তাদের জুড়ি নেই। উপমাহীন—তারা প্রত্যেকেই।

এই নিরুপমার কথাই ধরুন না। প্রায় সেই সময়েই নিজের 'দিদি' নিয়ে প্রবাসীর আসরে এসে সারা ভারতবর্ষে কী শোরগোলই না তুলেছিলেন তিনি। লোকে প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে, এই নিরুপমা দেবী আর কেউ নন, সেই শরৎচন্দ্রই—যিনি এর আগে আরেকবার অনিন্দিতা দেবীর ওরফে হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ভাগ্যিস তিনি যথাকালে ষোলোকলায় বিকশিত হয়ে দেখা দিয়েছিলেন তাই রক্ষে, নইলে আমাদের বাংলা সাহিত্যের একছত্রতলে তৃতীয় সম্রাটের স্থলে তাঁর বদলে আমরা একজন সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীকেই পেতাম! ঐ নিরুপমা দেবীকেই।

সব মেয়েই গল্প রচনায় নিরুপমা। মালা গাঁথার মতই গল্পগাথায় ওস্তাদ।

জানো মা, সেই পুলিসটা কী বলেছিল আমায়? বলল যে, তোমার সঙ্গে এই যে বোনের মত ব্যবহার করলুম না,এর জন্য আসছে ভাইফোঁটায় তুমি আমায় নেমন্তন্ন করবে,বুঝলে? করবে তো?

'মরে যাই আর কি! সুখের আর সীমা নেই আমার।' বললেন রিনির মা—'কনস্টেবলকে ভাইফোঁটা দেবো না তো দেবো কাকে! শুনেই আমি মূর্ছা যাচ্ছি।'

মূর্ছা যাবার কথাই বটে! চুল ছাঁটাইয়ের পরই যে ভাই পাতিয়ে বসে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় আসতে চায়, সেই অদ্বিতীয় ধুরন্ধর ফের ভাইফোঁটায় এলে উলটে জামাই হতে চাইবে কিনা তাই কে জানে!...পেয়াদাদের শ্বশুরবাড়ি হয় না, হতে নেই, সেই রক্ষে।

রিনির নিপুণ বর্ণনায় ওর মা আর আমি দুজনেই হাঁ।

তখনই আমার মনে হয়েছিল, অনুপমা আমার এই রিনিই একদিন হয়ত আমাদের নিরুপমা হয়ে উঠবে। নিরুপমার মতই সুলেখিকা।

সেটা হলে আমাদের সাহিত্যের এই বারো ভুঁইএঞা রাজ্যে প্রথম সম্রাজ্ঞী হয়ে সে-ই বিরাজ করত বুঝি আজ।

তবে সে আকাশ-কল্পনা না ফললেও দুঃখ নেই, উক্ত অভাবমোচনে, চতুর্থ সম্রাট তারাশঙ্করের পর অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞীরূপে একজন এসে আমাদের সেই আশা পূর্ণ করছেন এখন। আশাপূর্ণাই।

'তা, সেই শাড়ি ফাড়িগুলো সব গেল কোথায় শুনি?' মা শুধান।

'আমি কি জানি। পুলিসটাই রেখে দিয়েছে হয়ত। জেলে গিয়ে শাড়ি যখন পরতেই পাব না তখন আর তার খোঁজ নিয়ে কী করব মা?'

আমার আন্তরিক সায় তার কথায়। শুকসারির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হলেও জেলের মধ্যে যেখানে কোনোই নাকি সুখ নেই, সেখানে ফের শাড়ির প্রয়োজনটা কিসের।

'চুলোয় যাক শাড়ি, তার জন্য ভাবছিনে, কিন্তু তোর সেই চুল! তাও তো তুই খুইয়ে এসেছিস!' তাঁর খেদোক্তি : 'আহা, সেই চুল।'

'আগুল্‌ফচুম্বিত!' মানে না জানলেও বঙ্কিমরচনায় পঠিত কথাটা এই সুযোগে আমি যুগিয়ে দিই।

আমার প্রতি রোষকটাক্ষ হানেন মাসিমা। কিছু বলেন না।

'হতভাগী। তোর সেই চুল দেখেই যে তারা পছন্দ করে গেছল রে। বেয়ানঠাকুরণ সেই চুল যদি না দেখতে পান মেয়ের...কী যে হবে তাহলে!'

কী যে হবে ভেবে না পেয়ে তিনি মুহ্যমান, আর আমি ভাবি, এই চুলের ব্যত্যয়ে যদি বিয়েটা না হয় তাহলে তার চেয়ে ভালো বুঝি আর কিছুই হয় না।

লক্ষ কথায় যে বিয়ে নাকি ঘটে থাকে, লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে এক কথায় তা ভেঙে যাওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। এমন কি বিয়ের পরও তো কতই না ভাঙচুর হয়ে থাকে...হায়, দাম্পত্য জীবনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর আর কিছুই নয় বুঝি।

এক চুলের হেরফেরে রিনির বিয়ে বাতিল হওয়ার তিলমাত্র সম্ভাবনায় ভর দিয়ে আমি দাঁড়াতে যাই। ভরসা পেতে চাই।

'বেয়ান তো দেখে গেছেন, এখন শুনছি ছেলের মাসিপিসীরা নাকি দেখতে আসবেন আবার। এসে যদি মেয়ের চুল না দেখতে পান...'

ভাবতে গিয়ে আবার উনি দিশাহারা।

'যারা আমায় দ্যাখে না মা, আমার চুল দ্যাখে খালি, একচুল মাত্র দাম দেয় আমায়,' ফোঁস করে ওঠে রিনি, 'তাদের বাড়ি আমি নাই বা গেলাম মা!'

'সত্যি, যেখানে মেয়ের কোনো দর নেই, তার চুলেরই শুধু কদর...' আমি ওর সানাই হতে যাই।

'তুমি থামো তো বাছা!' এক ঝটকায় আমায় উনি চুপ করিয়ে দেন—'এ সবের কী বোঝো তুমি?'

'আমায় তোমরা পড়তে দাও না মা? বিয়ে পাশ করতে দাও না আগে? বিয়ের কী হয়েছে এখন? আমি আরো পড়ব... বাবার মতন ডাক্তার হই যদি? বি. এস-সি. পাশ করার পর আমি ডাক্তারি পড়তে চাই।'

'তুই থাম।' ঝাঁঝিয়ে ওঠেন উনি—'বিয়ের বয়েস পার হয়ে যাচ্ছে, সে হুঁশ আছে তোর? বারো বছরে বিয়ে হয়েছিল আমার, সেই বারো কবে পেরিয়ে ষোলোয় পড়তে চলেছিস। বিয়ের সব ঠিক, এদিকে মেয়ে উধাও! কুটুমমহলে কান পাতা যাচ্ছে না—যে কেলেঙ্কারিটাই না হোলো!'

'কেলেঙ্কারি কিসের মা? দেশের জন্যে কি মেয়েরা আজ যাচ্ছে না জেলে? বাসন্তীদেবী, উর্মিলাদেবী, আরো কতো সব বড় বড় বাড়ির মেয়েরা যায়নি কি? তুমি তো জানো মা?'

'কুটুমদের কী আর, তারা তো সব মুখিয়েই রয়েছে কি করে এমন সম্বন্ধটা ভাঙচি দিয়ে ভাঙতে পারে, কোমর বেঁধে তৈরি সবাই! কতো বড়ো ঘর, বংশ মর্যাদা, বাড়ি গাড়ি, আরো কত কী! কেমন পাত্তর! মরবে না হিংসেয়? বিয়ের সব পাকা, ইদিকে এনার পাত্তা নেই। আত্মকুটুম মহলে মুখ দেখাবার যো নেই! কোথায় যে কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে মুখ পুড়িয়েছে ছুঁড়িটা! কানাঘুষা করছে সবাই।'

'কিন্তু মেয়ে তো আপনার কুলত্যাগ করেনি মাসিমা, চুলত্যাগ করেই ফিরেই এসেছে তো। মুখটুখ কিচ্ছু পোড়েনি, চেয়ে দেখুন এক চুল কম হলেও নিখুঁত সেই রকমটিই।'

আমি রিনির সাফাই গাইতে যাই, উনি এমন ধমক লাগান আমায়! এক চুলের ফারাকে এমনটা কী যায় আসে, আমি তো তা ভেবে পাই না।

'তুমি থামো তো বাপু! মেয়েটাকে আমার তুমিই বখিয়ে দিলে । ওর মাথাটা খেয়েছো তুমিই।'

'আমার মা কিন্তু বলে যে...' বলার মুখেই বাধা পাই। অদূরে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আমার কথার মুখে সে হাত চাপা দেয়। সেদিনকার কয়েদ গাড়িতে তার সেই তর্জনী সঙ্কেত দেখি।

আমি চেপে গেলেও উনি নিজের ক্ষোভ চাপতে পারেন না : 'আমার এমন সোনার টুকরো তোমার পাল্লায় পড়ে বিগড়ে গেল। এত ভালো মেয়ে, যার কেউ নাকি কখনো এতটুকু বেচাল পায়নি, সেই কিনা জেল খেটে এলো আবার। ওর মাথায় দেশোদ্ধারের এইসব পোকা কে ঢোকালো? চাঁচলে থাকতে পিস্তল নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে মারতে গিয়েছিলে তুমি, আমি জানিনে কি? ওর কচি মাথার দেশের ধান্দা কে ঢুকিয়েছে? কী মতলবে যে তুমি ওকে এমনি করে ফুসলে নিয়ে গেছলে তুমিই জানো।'

'তুমি কী বলছো মা!' রিনি চেঁচিয়ে ওঠে—'রামদা কোথায়! আমি তো সেই জেলে গিয়েই না ওর দেখা পেলাম। ও যে কলকাতায় এসেছে তা-ই আমি জানতুম নাকি? রামদা এখানে এসে আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে কি ও তো আমাদের বাড়ির ঠিকানাই জানত না। মিথ্যে দোষে দোষী করছ ওকে। অমন করে বলছ কেন রামদাকে? শক্ত রোগ হয়েছে না ওর? মনে লাগল অসুখ ওর আরো বেড়ে যাবে না? তুমি যে কী মা?'

ওর মা কিছু বলেন না আর। চুপ করে শোনেন।

'সত্যি বলতে গেলে, রামদার জন্যেই ছাড়া পেলাম তো! চার মাসের জেল হয়েছিল না আমার? এত তাড়াতাড়ি ছাড়ত নাকি? কিন্তু শক্ত অসুখের জন্য দশদিনের মধ্যেই ছেড়ে

দিলো ওকে, আর আমি ওর ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিলাম তাই ওর তদারকের জন্যে আমাকেও ছাড়তে হোলো তাদের। ও না হলে—ওর অসুখ না হলে এত শীগগির আমি ছাড়া পেতুম নাকি? অসুখটা বাঁধিয়েই তো রামদা বাঁচিয়ে দিয়েছে আমায়! তা জানো?'

'কর্তা এতক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন। যা এবার তুই নেয়েটেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ। সেজেগুজে তৈরি হয়ে থাক। রোজই ওরা ফোন করে খবর নিচ্ছে, কবে আসবে মেয়ে দেখতে। কখন এসে পড়বে ঠিক নেই। হয়ত আজ বিকেলেই তোকে দেখতে আসতে পারে। এই যা চুল আছে শাম্পু-টাম্পু করে একেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে হবে। এই ক'দিনে যা ছিরি হয়েছে না মেয়ের!'

এতক্ষণ যেন বিষদৃষ্টি হানছিলেন, এবার মনে হল, আমার দিকে একটু উনিশ নজরে তাকিয়ে রিনিকে নিয়ে উনি চলে গেলেন। আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এই ইতর-বিশেষে, আমার মনে হল, আমাকে আর বিশেষ ইতর বলে বোধ করছেন না বোধহয়। হাঁফ ছেড়ে আমি বাঁচলাম।

খানিক বাদেই তিনি ফিরে এলেন আবার—আমার খাবার নিয়ে। দুধ আর পাঁউরুটি।

'খেয়েদেয়ে বেশ করে ঘুমোও। রেস্ট নাও এখন। উনি বলেছেন, গোড়াতেই ধরা পড়েছে রোগটা, এমন কিছু শক্ত হয়ে দাঁড়ায়নি। তেমন ভয়ের কিছু নেইকো। দশ বারো দিনেই তুমি সেরে উঠবে। সেরে উঠলেই উনি তোমার টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবেন—সোজা বাড়ি চলে যেয়ো। কোনো হুজ্জুত হাঙ্গামায় মাথা গলিয়ো না। এখানে থেকো না আর, বুজলে? উঠতি বয়েসের ছেলেদের পক্ষে এই হইচই-এর সময় কলকাতায় থাকাটা ঠিক নয়। বুঝেছ?'

আমি চুপ করে শুনি। কী জবাব দেব ওঁর কথার?

'রিনির বিয়েটা তুমি দেখেই যেয়ো বরং। দশ বারো দিনের মধ্যেই চুকে যাবে আশা করছি। হ্যাঁ, তোমার নাকি পদ্যটদ্য লেখা আসে, বলছিলেন দিদি। তুমি তাহলে ওর বিয়ের প্রীতি উপহার লিখে দিয়ো, কেমন? পাড়ায় ছাপাখানা আছে, কর্তার পেশেন্ট তারা—সেখান থেকে ছাপিয়ে নিয়ে বিয়ের রাতে বিলি করা যাবে। কন্যাযাত্রী-বরযাত্রীদের তুমিই বিলি কোরো না হয়।'

বিলক্ষণ! রিনিকে যে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে, সে কি আর তার বিয়ের পদ্য বিলি করতে পারবে না?

'লিখব বই কি মাসিমা! এমন একখানা কবিতা লিখব না!'...

বিকেলের পড়ন্ত রোদ জানালা গলে মুখের ওপর এসে পড়তেই ঘুম ভাঙলো আমার। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি রিনি বসে বিছানার পাশটিতে। এমন সেজেগুজে এসেছে যে!

'কি রকম আছো এখন?'

'ভালোই তো। কেবল গা-হাত-পা একটুখানি কামড়াচ্ছে যেন কেমন।

'টিপে দেব একটু?'

'না।'

'টিপতে পারি বেশ। বাবার পা টিপে দিই তো আমি। দিই না কেন?'

'না। তোকে আমার পায়ে হাত ঠেকাতে দেব না, কক্ষনো না।'

'তুমি যে একদিন আমার পায়ে....আর আমি তোমার পা ছুঁতে পর্যন্ত পারব না?'

'আমার পা কামড়াচ্ছে না আর। ইস, দারুণ সেজেছিস যে। সত্যিই ইন্দ্রাণীর মতই দেখাচ্ছে যেন তোকে।'

'ইন্দ্রচন্দ্ররা দেখতে আসছে না আমায় আজ? আরেকটু বাদেই এসে পড়বে।'

'তবে যে শুনলাম জটিলা কুটিলা? পূতনা সূর্পনখারা? ছেলের মাসিপিসীরা আসবেন বললেন না তোর মা?'

'পূতনা আসেন কি তাঁর পুত্ররা আসেন ঠিক নেই এখনো। ছেলে তার বন্ধুদের নিয়েও আসতে পারে শুনছি।'

'পুত্র মিত্ররা? মানে, পাত্র মিত্ররা? বুঝলি রিনি, তার মধ্যেই তোর বরও থাকবে রে, ছেলের বন্ধুর ছদ্মবেশে।

'সে জানি। তা আর বলতে হয় না। কোন্‌টি যে, তাও টের পাবো এক নজরে।' রিনি হেসে কয়, "এই প্রথম বিয়ে পাশের পরীক্ষায় বসছি না মশাই! চাঁচল থেকে এসে অবধি এই পালাই চলছে আমার। ছেলেরা হলে সহজেই পার পাওয়া যায়, একটু মুচকি হাসি, একখানা গান গাইলেই মিটে যায়, কিন্তু মেয়েদের কাছে পরীক্ষায় পাশ করা দারুণ শক্ত—মহামারী ব্যাপার।'

'কিসে কিসের পরীক্ষা দিতে হয় রে? ইংরেজি অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল গ্রামার সমসকৃত সব? এই বৈতরণী পেরুবার কোনো বই-টই নেই—নোট-ফোট?'

'বই নেই, কোন তরণীও নেই—তবে হ্যাঁ, নোটের গোছা পণ দিতে পারলে হয়!'

রিনি কয়—আগাপাশতলা পরীক্ষা দিতে লাগে—মাসিপিসীরা কিছু বাকী রাখে না পরখ করার.... চুলটুল টেনে টেনে দ্যাখে সব; জানা গেল রিনির কথায়, ঝুটো কিনা ঝুঁটি নেড়ে ভালো করে দেখে নেয়, দাঁতে টোকা মারে তার ওপর, বাঁধানো কিনা দেখতেই। দাঁতের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কথা কয় তারপর—হাঁ করো তো বাছা! হাঁ-টা কিসের জন্যে? না, মেয়ের হাঁ কতো বড়ো, তার সঙ্গে নাকি সুলক্ষণের কোন সম্পর্ক আছে। উহুঁ, আমি বলি, তা নয়। বাড়ির ডাল-ভাত কতো ধ্বসাবে, কেমন খাইয়ে মেয়েটা, তাই দেখবার জন্যেই ঐ হাঁ-করানোটা। কিন্তু ওভাবে কারো দাঁতে ঘা দিয়ে কথা কওয়াটা ঠিক কি? কিন্তু ছাড়ান নেই তার পরেও—পরীক্ষা আছে আরো। ঐ অতটুকুন ঘরের মধ্যেই ঘোড়দৌড় করিয়ে ছাড়ে। ঘোড়দৌড়টা কিসের জন্যে? মেয়ে খোঁড়া কিনা বাজিয়ে দেখতে হবে না? পদে পদে পরীক্ষা—হাতে হাতে বাজিয়ে নেওয়া।

সেই ভগবানের মতই কুমারী ভগবতীদেরও।

এমন করে আপাদমস্তক পরখ করার পর শেষ পর্যন্ত সেই এক কথা-'বাড়ি ফিরে খবর দেব ভাই। জানাবো আপনাদের।' সে-খবর কিন্তু আর কোনো দিনই আসে না।

বাঁচা যায়! আমি হাঁফ ছাড়ি।

'বাড়ি গিয়ে জটলা করে মেয়েরা একটা না একটা খুঁত তারা বার করেই। বেরুবেই খুঁত। অমন চাঁদের খুঁত আছে আর মেয়ের খুঁত থাকবে না? নিখুঁত কেউ হয় নাকি কোথাও?'

আর ছেলেদের কাছে পরীক্ষা দিলে?'

'সঙ্গে সঙ্গে পাশ। একটুখানি আড়চোখে তাকালেই হোলো। বাড়ি গিয়ে মরে থাকবে সব ক'টাই। সবারই বাসনা হবে ওই মেয়েটিকেই।

'ভাগ্যিস, একালে সুন্দ উপসুন্দর লড়াই হয় না—সুন্দরের জন্য! কিন্তু হলে কী হবে, মেয়ে

আর পাত্রস্থ হয় না। ছেলের পছন্দ হলেও ছেলের বাবা-কাকারা আসেন তারপর—দরে দামে পটে না। বাপের পণের কাছে ছেলের প্রাণপণ ভেসে যায় কোথায়।'

'তাই যাক না।' আমি সায় দিই। 'সেই তো ভালো।...আচ্ছা, আড়চোখে তাকানোটা আবার কী রকমের রে? কাকাতুয়ার মতন ঘাড় বেঁকিয়ে নাকি?'

'না না। এই রকমটা।' তারাটাকে সে চোখের কোণে ঠেলে আনে—'এই যে! আর এইটে হোলো গিয়ে চোরা চাউনি। আর একেই বলে কটাক্ষপাত।'

তিনটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমার মনের পিঠে যেন কশাঘাত। তিনখানা সপাৎ! —'ও বাবা! তাই নাকি? বইয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু চোখে পড়ল এই! আমার জীবনে এই প্রথম বটে! এমনি মারাত্মক একেকখানা? আমার জানা ছিল না।'

'কি করে জানবে! মেয়েরা জানে। জন্ম থেকে—আপনার থেকেই। তুমি তো কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশনি কখনো? আমার আগে কোনো মেয়ে তো মেশেনি তোমার সঙ্গে—জানবে কি করে?'

'আচ্ছা, যদি ছেলেরাই আসে আজ? আর তোকে গান গাইতে বলে, কোন গানটা গাইবি তুই?' আমি শুধাই?'

'মনে করো—শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর/অন্য সবে কথা কবে/তুমি রবে নিরুত্তর।/বিয়ের ভাঙচি দেবার পক্ষে মোক্ষম হবে—কী বলো?'

রাস্তা থেকে মোটরহর্নের আওয়াজ এলো। মা ডাকতেই রিনি নেমে গেল। কারা এলো কে জানে! সূর্পনখারা? না, সুলক্ষণরা?

একটু বাদেই রিনির গলা পেলাম ওপরে শুয়েই। সুরলহরী ভেসে এলো তলার থেকে। গাইছে রিনি.... কিন্তু এ তো সেই চরম গানখানা না, গানের যা নাকি চরম।....আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো। তোমা ছাড়া এ ভুবনে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।

আড়চোখের ওই চাউনির ওপর এই যদি গানের বউনি হয় ওর, তাহলে আর দেখতে হবে না। বউয়ের জন্যে ছেলে হন্যে হয়ে উঠেচে এতক্ষণে—বউ না নিয়ে বাড়ি ফিরছে না আর। তাই কি এখুনি হয়ত ঘাড়ে করে ঘোড়দৌড় লাগাবে সে—সেকালের পৃথ্বিরাজের মতই সংযুক্ত হয়ে।

এ কী গান গাইছে রিনি? আমার মনের কথাগুলোই আমার কানের গোড়ায় উজাড় করে দিচ্ছে যেন....আমি তোমারই বিরহে রহিব বিলীন/আর তোমাতে করিব বাস/দীর্ঘদিবস, দীর্ঘরজনী, দীর্ঘ বরষমাস।....

অনেকক্ষণ পর পকেটভর্তি সন্দেশ নিয়ে এলো রিনি—'তোমার জন্যে আগের থেকে সরিয়ে রেখে ছিলাম....'

'আমার খিদে নেই।' তাকালাম না সন্দেশের দিকেও। জীবনে এই প্রথম।

মিত্রদের সঙ্গে পাত্রও ছিল, জানা গেল, আর ছিল নাকি ওর মামা। —বরের অভিভাবকদের ভেতর হলেও আবার তার বন্ধুও বটে সে। মেয়ে দেখে তাঁদের পছন্দ হয়েছে, এই তাঁদের পাকা কথা, পাকাপাকি তিনি বলে গেছেন নাকি! বরের কোনো পণের দাবিদাওয়া নেই জানা গেল তাঁর কাছেই।

'এই সপ্তাহেই আমার আশীর্বাদ, পরের হপ্তায় বিয়ে।...নাও, এবার খেয়ে নাও তো লক্ষ্মীটি।'

'না! আমি দুধ-বার্লি খাবো। রুগীর পথ্য নাকি এ?'

ওদের বাড়ির বাচ্চাটা একটা ক্যাম্পখাট এনে খাড়া করলো আমার চৌকির পাশে।

'এটা কি জন্যে রে ?'

'বা, আমি থাকব না এখানে রাত্তিরে ?'

'ঐখেনে শুবি ? আলাদা ? কেন, সেই জেলের মতন....!'

'এটা জেল নয়....ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে সারা রাত, মা বলেছে। সিঁড়ির আলোটাও জ্বলবে। বুঝেছ ? মাঝে মাঝে এসে মা দেখে যাবে আমাদের।'

'কেন রে ?'

'কেন যে তা কী বোঝাবো তোমায় ! ঘরে সোমত্ত মেয়ে থাকলে মা'র যে কী অশান্তি—কতো ভাবনা—তা সে মা'রাই জানে।'

'তুইও জানিস ! তুই মা হয়েছিস কিনা !'

'আমরা মেয়েরা জন্ম থেকেই মা হই তা জানো ? এইটুকুন-টুকুন খুকীদের পুতুল নিয়ে ঘরসংসার পাততে দ্যাখোনি ? ছেলেমেয়েকে খাওয়ায় শোয়ায় নাওয়ায়, মাই খাওয়ায় আবার !....তা, কী করেই বা দেখবে। তোমার তো কোনো বোন নেই, দ্যাখনি তুমি, জান না তাই।'

'মাই খাওয়ায় ? ওই বাচ্চা খুকীরা ? কিন্তু তাদের কি....তবে মা-ই খাওয়ায় বটে, সারা জীবন ধরে....তার পরেও...জন্ম-জন্মান্তরে।'

'তবেই বোঝো।'

'আমার মাকে এমনি ধারার একটা কথা বলতে শুনেছি বটে। মেয়েরা জন্ম থেকেই মা। মা হয়েই জন্মায়—মা হবার জন্যেই। বলতেন বটে মা! কিন্তু তার মানেটা ঠিক ঠিক বুঝিনি তখন।'

'এখন তো বুঝলে? সব সময় মায়ের ভাবনা ভাবতে হয় আমাদের....একটা কথা বলব?'

'বল।'

'এবার তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে পড়াশুনায় মন দাও—কেমন ? তারপর মনের মতন কাউকে বে-থা করে সংসারী হয়ে সুখে থাকো সারা জীবন।'

'ও কথা বলিসনে।....সংসার করা আমার ধাতে সইবে না।'

'বৈরাগযোগ কঠিন উধো, হাম না করব হো।' —কোন্ বইয়ে যেন পড়েছিলাম কবে ! সেই কথাটাই একটু পালটে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিই—'সংসার ভারী কঠিন ঠাঁই ভাই ! সংসারযোগ কঠিন উধো, হাম না করব হো ! সে আমি পারব না উদ্ধব !'

আমার এই উদো মার্কা জবাবে একটু চুপ করে থেকে সে বলে—'সে কথা থাক তাহলে। যখন করবার করবে ঠিকই। সে রকম মেয়ের পাল্লায় পড়োনি তো! ঘাড় ধরে করিয়ে নেবে। আচ্ছা, বিয়ে না হয় নাই করলে এখন, রাস্তাঘাটে ওরকম হাঘরের মতন পড়ে থেকো না আর। একটা মেসবাড়ি খুঁজে নিয়ো। কলকাতার অলিতে গলিতে বাসা বেঁধে থাকে কেরাণী-ছাত্ররা, চাকরি করে পড়াশোনা চালায়, জানো না? খুব সস্তা খরচে থাকা যায় সেখানে, জানো?'

'জানব না কেন ? চরিত্রহীন পড়েছি আর মেসবাড়ির খবর রাখিনে ? সেখানে যে সাবিত্রীরা থাকে তাও বেশ জানি।'

'সাবিত্রীদের খপ্পরে পড়তে যেয়ো না যেন, সাবধান। শক্ত রোগে ধরবে। বাবার ডেস্ক থেকে একটা বই এনে পড়তে দেব তোমায় পড়ে দেখো, তাহলে বুঝবে।'

'জানি আমি। পাঁজির বিজ্ঞাপন পড়েই কবে আমার জানা! নেহাত যারা পাঁজির পাঝাড়া, তারাই সাধ করে ওই সব ফ্যাসাদ ডেকে আনে—ওই সব নোংরা অসুখ বাধায়।' সে বিষয়ে আমি ওকে আশ্বস্ত করি-'তাছাড়া সতী-সাবিত্রি বলে না? সাবিত্রিদের সতীশদের ওপর নজর। আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না কেউ, তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

'আহা, তারা নজর না দিলেও তোমার নজর পড়তে তো কোনো বাধা নেই?'

'যে কারণে আমি স্ত্রৈণ হতে পরব না, ঠিক সেই কারণেই আমার ঐ পথে যেতে বাধবে, বুঝেছিস? আর, যে চেহারা নিয়ে জন্মেছি না, কারো পাতে পড়ার কোনো কথাই নেই....আমাদের জেলার সতীশ কি তোদের জেলার ঐ দেবেনের মতও যদি শরীরটা পেতাম না, তা হলেও কথা ছিল একটা, কিন্তু এ যা একখানা.....মরে গিয়ে ভাগাড়ে আমায় ফেলে দিলেও শেয়াল-কুকুরেও মুখে তুলবে না। সে কথা থাক, তোর কথাটা বল্। তোর এই ূল নিয়ে কোনো কথা উঠল না? একচুলও নয়?' জানার কৌতূহল হয়।

'এই বব্ চুলের জন্যেই আরো বেশি পছন্দ হয়েছে ছেলের, তা জানো? বলেছে যে, এমন মর্ডান মেয়ে, এমনটাই নাকি সে চাইছিল। চুলের জন্যেই কোনো পণ লাগছে আমার বিয়ের। এক কাঁড়ি চুল নিয়ে এক কাঁড়ি টাকা বেঁচে নিয়েছে বাবার। মা বেজায় খুশি তাই আমার ওপর এখন। এমন কি, তোমার ওপরও।'

'হিতে বিপরীত না হয়ে বিপরীতে হিত হয়ে গেল তো!'

আমার পার্বণের পালা ফুরোলো এবার, শেষ পর্বে এসে পড়লাম শেষটায়। উৎসবের দিন কাটলো অবশেষ।....

সেদিন বিকেলে অপরূপ সাজসজ্জায় রিনি এলো আমার ঘরে আবার।

'আজ সন্ধ্যায় আমার আশীর্বাদ। কালকেই আমার বিয়ে।....তুমি কিছু বলছ না যে?'

'আমি কী বলব আবার? আমার কী বলার আছে? বিয়ে তো ভালোই রে! বে-থা করে সুখে ঘর বেঁধে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারী হ, সুখি হ।'

'এই তোমার কথা? আমার কথাগুলোই শোনাচ্ছ তুমি ঘুরিয়ে আমায়? আর কিছু বলার নেই তোমার?....এতো কথা ছিল যে তোমার গো!'

'কই, কিছু তো মনে পড়ছে না এখন?'

'মনে পড়ছে না? আমার মনে আছে। বলেছিলাম না, বিয়ের আগে তোমার কথাটা আমি রাখব। বলেছিলাম না যে খাইয়েটাইয়ে যাব তোমায় শেষবারের মতো—যতো চাও।'

ও! সেই কথা। আমার মনে পড়ে। আমার সেই ফাঁসির আগের সাধ—তার এই আশীর্বাদের দিনটাতেই।

'না। আমার কিছু চাইনে আর। অনেক পেয়েছি তোর কাছে। এমন কেউ বুঝি পায় না কখনো। তবে তুই কী আর দিয়েছিস? আমার মা দিয়েছেন বলেই পেয়েছি। মা-ই তো দেয়।....তা ছাড়া তুই পরের হতে যাচ্ছিস এখন, পরদ্রব্যে লোভ করা কি ভালো?'

'এমন কি তুমি যদি চাও....চাও তো....'

সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে -'এখন তো আর ভয় নেই—ভাবনারও কোনো কারণ নেই আমার! বিয়ে তো হচ্ছেই।'

'না না....কক্ষনো না।' আমি চেঁচিয়ে উঠি—'ও সব নয়। আমি তোর নই? দাদা না? তোকে আমি নষ্ট করতে পারি?'

তখনকার সেই কথায় এখন আমার হাসি পায়। কিন্তু সে সময়ে এমনটাই ছিল বুঝি। শরৎবাবুর বই পড়ে সব ছেলেমেয়েই অপ্লাবিত হয়ে গেছল তখন। তাঁর ভাবধারায় মোহাচ্ছন্ন হবে সবাই তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা - সব ছেলেই সতীশ, সব মেয়েই সতী।'

সেই মোহনার মুখে তখন একটিই দ্বীপ কেবল। সন্দীপের চর। রক্ত-মাংসের মানুষ বলতে ঘরে-বাইরের সেই সন্দীপ। একটি মাত্রই ব্যতিক্রম সেই।'

তখনো গৃহদাহের পর্ব আসেনি। ঘরপোড়া হনুমানদের সাক্ষাৎ মেলেনি তখনো।

আমার কথায় সে হাসল। বলল, 'বেশ, তাহলে দাদার মতই তুমি আশীর্বাদ কোরো আমায় আজ। সন্ধ্যেয় যখন সবাই আশীর্বাদ করতে আসবে, আমাদের দোতলার ঘরে এসো, আসবে তো?'

'যাবো। কিন্তু কি করে আশীর্বাদ করে জানিনে যে। করিনি কখনো।'

'মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে করতে হয়—আবার কী? সবাই যেমনটা করবে....'

'তাই করব না হয়....আচ্ছা, মনে মনে করলে হয় না?'

সত্যি বলতে, ওকে নিয়ে সবই তো আমার মনে মনে করা। গড়া, ভাঙা, আবার নতুন করে গড়া।

আশীর্বাদের ক্ষণটিতে ওর দিদি এসে ডেকে নিয়ে গেল আমায়। খবর পেয়ে শ্বশুর বাড়ির থেকে একটুকু আগেই এসেছিল সে।

কার্পেটমোড়া ওদের দোতলার ঘরটায় আর সবার পাশে গিয়ে বসলাম।

ঘরের আসবাবপত্তর দেখে আমার চক্ষুস্থির! ঝকঝকে কতো কি—নামও জানিনে। সবকিছুই রিনির শ্বশুরবাড়ি যাবে—বিয়ের তত্ত্বে ওর।

বরের বাবা মা মামা আশীর্বাদ করলেন রিনিকে। ব্রেসলেট নেকলেস গিনি মোহর আংটি ইত্যাদি দিয়ে। রিনির গায়েও ছিল অনেক কিছু—ঐসবই—অন্য প্যাটার্নের।

আমার দিকে তাকালো সে। একটুখানি হাসলো বুঝি।

কিন্তু শুকনো ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতে আমার হাত উঠলো না। হায়, কাউকে কিছু প্রেজেন্ট দেবার মতন বরাত দিয়েও যে পাঠায়নি আমায় বিধাতা। কোনো রকমে আমাকেই প্রেজেন্ট করে দিয়েছে কেবল।

কিন্তু এ প্রেজেন্ট কারো পাতে দেবার নয়। হাতে দেবার নয়।

আশীর্বাদের পালা চুকলে কর্তারা সব পাশের ঘরে চলে গেলেন। মেয়েরাই রইলো শুধু সেই ঘরে—রিনির মা মাসি পিসি দিদি এরাই। বসে বসে গুলজার করতে লাগল।

রিনিও রয়ে গেল এক পাশটিতে চুপটি করে বসে, সেজেগুজে তেমনটিই।

আর, আমিও রয়ে গেলাম সেখানে স্থাণুর মতই। ওদের কেউ কিছু বলল না আমায়,—ধর্তব্যের মধ্যেই ধরল না। গালগল্প চলতে লাগল তাদের।

চোখ জড়িয়ে আসছিল রিনির। সারাদিনের ঝাড়পোঁছ সাজগোজ—কম ধকলটা যায়নি তার ওপর। ঘুমের আবেশে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল সে।

নিজেদের গল্পেই গিন্নীরা সব মশগুল। কেউ লক্ষ্য করছিল না তাকে—আমিই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। আমিই কেবল চেয়েছিলাম হাঁ করে...ফাঁসির আগেকার এই

খাওয়া আমার—গিলছিলাম আমার দু' চোখ দিয়ে।

ঘুমের ঘোরে গড়াতে গড়াতে কখন সে আমার চেয়ারের গোড়ায় চলে এসেছে—আমার পায়ের কাছটিতেই।

পা গুটিয়ে নিয়েছি আমি—পাছে ওর মাথায় পা ঠেকে যায় আমার।

ঘুমের ঘোরেই যেন সে হাত তুলেছে, আলতো করে পা ছুঁয়েছে আমার, তার পরে সেই হাত নিয়ে যেন ঘুমের আবেশেই মাথায় ঠোঁটে ঠেকিয়েছে নিজের।

এটা কি ওর বিদায় নেওয়া নাকি ? চিরবিদায় তার ? এমনি করেই ?

আমার মনটা কেমন করে উঠল। আমি আর বসতে পারলাম না। উঠে পড়লাম তক্ষুনি।

সিঁড়ির মুখে রিনির দিদির সঙ্গে দেখা।—'কোথায় বেরুচ্ছ এখন ? এখনই সবাই খেতে বসবে, তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে আজ। তোমার তো অসুখ নেই আর। বাবা বলল।'

'মাথাটা বড্ডো ধরেছে দিদি। ঘুরে ফিরে একটু বাইরের হাওয়া লাগিয়ে আসি।'

'দেরি কোরো না যেন। জানো, এই আশীর্বাদের খাওয়াটাই হচ্ছে আসল। বিয়ের ভোজটা কিছু না—চয়েস করার মতো খাবার না। এটাতেই পরিপাটি থাকে। বুঝেছ ?'

ঘাড় নেড়ে সিঁড়ি টপকে উতরে আসি রাজপথে, আমার স্বরাজ পথে। সোজা রাস্তায় আমার—চিরদিনের আস্তানায়।

আর কেন ?

এবার চলে যাই আমার মায়ের উঠোনেই সটান। সেই ঠনঠনেয়। সেখানে গিয়ে লম্বা হইগে এখন।

কাল ভোর হতেই ফের লাইন লাগাতে হবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। আর, একটা মেসের খোঁজ করতে হবে তারপরই।

আচ্ছা, এটা কি করলো রিনি ? যেতে যেতে ভাবি। ভাবতে ভাবতে যাই।

ঘুমের ঘোরে আড়মোড়া ভাঙার ছলনায় সবার অলক্ষ্যে সে আমার পায়ে হাত ঠেকিয়ে এই যে নিজের মাথায় মুখে ঠেকানো—মানেটা কী এর ? এ কী রকমের তার বিদায় নেওয়া ? কী ধরণের বিদায় দেওয়া ?

অনেকদিন ক্ষণে ক্ষণে সেই কথাটা মনে মনে ভেবেছি, ভাবি আমি আজও। কিন্তু মানে খুঁজে পাই না। মনে হয়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে বয়সে অভিজ্ঞতায় মেয়েরা যতই পরিণত হোক না, সারা জীবন ধরে আসলে তারা সেই একরকমটাই থেকে যায়—সেই পরিণীতাই। এক আঁচড়েই সেটা ধরা পড়ে।

বাংলার মেয়েদের চিনেছিলেন শরৎচন্দ্রই। সব মেয়েই আচরণে এক। সবারই এক আচরণ।

দেবদাসরা নেই আর। অরক্ষণীয়ারাও নেই। কিন্তু পরিণীতারা সবাই রয়েছে। তারা আর পরিণত হয়নি। হবার নয়।

॥ পঞ্চান্ন ॥

বহুদিন বাদ সেদিন হঠাৎ জনাব সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত আবার। ঠনঠনের মাথাতেই ঠোকাঠুকি !

মা'র মন্দিরের সামনেটায়।

'এখানে কী করছেন মশাই ?' মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিগ্যেস করি।

'কিছুই না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার ভক্তি নিবেদন দেখছিলাম আর কি! এতক্ষণ ধরে তাই দেখছি।'

'এতক্ষণ! এক মিনিটও তো হয়নি আমার। আর ভক্তির কথা কী বলছেন, ভক্তি-ফক্তির ধার আমি ধারিনে। আমার হচ্ছে অতি ভক্তি--নিতান্তই চোরের লক্ষণ। আদায়ের ফন্দি ফিকির।...আমার মা বলেছেন তাই দিনান্তে একবার অন্তত যাওয়া-আসার পথে এই প্রিমিয়ামটা দিয়ে যাই আমার।'

'প্রিমিয়াম না প্রণাম—কী বললেন?'

'প্রিমিয়াম। লাইফ ইনস্যুরেন্সের। মা বলে দিয়েছেন যে, কলকাতায় পথে পথে অপঘাত—পদে পদে বিপদ—তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিরাময় ভাবে নিরাপদে নির্বিঘ্নে টেকসই হয়ে থাকতে হলে এই টেক্স দিতে যেন কখনো না গাফিলতি করি।'

'বাঁচা যায়!'

'বেঁচেই তো আছি মশাই। এবং একরকম নিরাপদ নির্বিঘ্নেই। তেমন কোনো শক্ত অসুখ-বিসুখও করেনি কখনও, এবং এক-আধবার যাও বা হয়েছে তাও খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি—প্রায় মিরাকলের মতই। একলাই থাকি, দেখাশোনার কেউ নেই, তবু চার যুগ তো পার হয়ে এলাম নির্ভাবনায়। আপনার জন কেউ কোথাও নেই—আত্মীয় বন্ধুহীন নিরূপদ্রব নিশ্চিন্তিতে এমনি করেই—খাসা আছি মশাই। আবার কী চাই।'

'কিন্তু এই কালী মন্দিরে এসে মাথা ঠোকা, এটা তো নিছক পৌত্তলিকতাই।'

'হ্যাঁ, পৌত্তলিকতা তো বটেই। ভাবতে গেলে তাই বইকি। কিন্তু, কতো দূর আমরা ভাবতে পারি বলুন? এই জড় জগতের নিছক জড়তার উৎস থেকেই তো প্রাণ আর চৈতন্যের উৎসার। এই শ্রী-সমৃদ্ধি—এত শিল্পকলা—সব কিছুর আমদানি। কিন্তু কোথায় যে সেই জড়তার শেষ আর এই চৈতন্যের সঞ্চার, তার কিছু কি ছাই জানি আমরা? আধুনিক বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানীরা কি সেই রহস্যের ধারেকাছেও পৌঁছতে পেরেছেন? একটুও কিনারা করতে পেরেছেন কোনো কিছুর? কিনারেই যেতে পারেননি বলতে কী!'

'চেতনাই সর্বশক্তির মূলে আর তার ভিত্তি নাকি অবচেতনাতেই—আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ একথা বলেছেন বটে।' তিনি কন—'কেউ কেউ আবার নির্জ্ঞানের কথাও বলেছেন।'

'একই কথা। আরো এগিয়ে যান—একেবারে অজ্ঞানে, অচেতনে,—জড়তায়—জড়পিণ্ডতায়। ...মানে, আমাদের সম্মুখীন ঐ পুতুলে—প্রতিমায়—প্রতীকে।'

'সেটা কি নিতান্তই জড়োপাসনা হবে না মশাই? জড়ত্বেই আত্মনিবেদন হবে তো?'

'নিশ্চয়ই জড়োপাসনাই তো! মনকে জড় করা। সর্বের মতন যে মন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডর নানান বিষয়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাকে পাকড়ে এক জায়গায় জড়ো করে আনা—পরমহংসদেবের কথায়। এই জড় পুত্তলিকায় মন দিয়েই সহজে সেটা হয়ত সম্ভব হয়। আর তখনই হয়ত, সেই পুতুলই প্রতিমা হয়ে ওঠে একদিন—জড়ের আড়ালেই অনন্ত শক্তি বিশ্বচৈতন্যের সাক্ষাৎ মিলে যায় কারো কারো।'

'মনকে জড়ো করা কি রকম মশাই?'

'মা বলতেন, সব কিছুর থেকে মনকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই দুই ভুরুর মাঝখানে নিয়ে এসে একেবারে নির্ভাবনা হয়ে যাওয়া। সেটা মুহূর্তের জন্য হলেও হয়। যে মুহূর্তেই তোর সব ভাবনা থেকে মুক্ত হবি, বলতেন মা, সেই মুহূর্তেই অভাবিত কতো কী'র যে উন্মুক্তি

ঘটবে।—মা খুব সহজ করে বলতেন কথাগুলো, কিন্তু কী ভাষায় যে বলতেন, সঠিক মনে পড়ছে না—তবে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে তার এই। আমার নিজের ভাষণে ব্যক্ত করলাম।'

'ধারণা করতে পারছি না।'

'আমিও পারিনি। এখনও পারি না। কেউ পারে কিনা সন্দেহ! তবে তার কোনো দরকারও নেই নাকি, মা বলতেন। যেহেতু, বস্তুটা ধারণা করার নয়, প্রত্যক্ষ করার। গাছের ধারণা করে কী হবে, ফলের আস্বাদ নিয়ে কথা—বলতেন না ঠাকুর? ফলেই পরিচয়।'

'ফলে?'

'ফলে বই কি। করে দেখুন না। একটুক্ষণের জন্যেও মনকে জড়ীভূত করে সব ভাবনা দূর করতে পারলেই অফুরন্ত নতুনের উদ্ভাবনা—দেহে মনে জীবনে—গোচরে অগোচরে। সব কিছুর নবনবোন্মেষ ঘটে। যতো আধিব্যাধি সারার পথ ধরে তক্ষুনি কত সুযোগ সন্ধানের পথ খুলে যায়। এমন কি, আমার গল্পের যত না নতুন নতুন আইডিয়া—সে তো আমি এই করেই পাই মশাই। রামের পাদুকা মাথায় জড়ভরত হতে পারলেই আরামের রামরাজ্য লাভ।'

'তাই বুঝি এখানে এসে প্রার্থনা করছিলেন? প্রার্থনা করেন সেই জন্যেই।'

'প্রার্থনা কিসের! কিছু চাইবার দরকার করে না। আসল কথা, দেহে নিস্পন্দ আর মনে নিঃশব্দ হওয়া—অন্তত ক্ষণেকের জন্যেও। বাস্, তাহলেই হোলো। হয়ে গেল তক্ষুনি। সেই অচিন্তন থেকেই অচিন্তনীয় লাভ। নিশ্চিন্তির থেকেই নিঃশেষে প্রাপ্তি। কম ভাবনার থেকেই যতো সম্ভাবনা। অবশ্যি ঘরে বসেও যে নির্ভাবনায় জড়িয়ে যাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু এখানে এই সাক্ষাৎ জড়তার সামনে দাঁড়িয়ে জর্জর হওয়াটা একটুখানি সহজতর নয় কি? বিশেষ পরম শিব যেখানে স্বয়ং জড়ীভূত হয়ে দেশকালাতীত নিজের বুকের মহাকাশ বিস্তারে মহাকালীর অনন্ত লীলায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন? জীবশিবের খণ্ডকালের নব নবদ্বীপে নিত্য চৈতন্যলীলা?'

'আপনি পুতুল, প্রতিমা, প্রতীক—তত্ত্ব, রহস্য, ইঙ্গিত—সব গুলিয়ে একাকার করছেন।'

'একাকারই তো। এক বস্তুরই নানা আকার। মূলত সেই জড় কিংবা চৈতন্য—যাই বলুন—এক বস্তুরই এপিঠ ওপিঠ—আসলে যা উৎস, যার থেকে সব কিছুর উৎসার—তাবৎ উৎসাহ! জড়ের থেকেই অজর অমরত্ব! সেই আদিম জড়ভাবের থেকেই যত কিছুর উদ্ভব—যত না উদ্ভাবনা—জীবনের সব উৎসব। কিন্তু সে কথা যাক্, আপনি এই অসময়ে অকুস্থলে এমন হঠাৎ এই বেপাড়ায় যে...?'

'বেপাড়া?'

'বেপাড়া না? নেহাত বে-র বরযাত্রী না হলে কেউ কি এ পাড়ায় পা বাড়ায়? কলাবাগান আর চোরবাগানের এই চত্বরে সাধ করে নিজের পকেট খোয়াতে আসে?'

'খোয়ানোর কথা বলছেন? খোয়ার কথা? তা, আপনার খোঁজে এসে এই ক'দিনেই আমার যথেষ্ট খোয়ার হয়েছে!'

'আমার খোঁজে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কিছুতেই আপনার সেই বাসার খোঁজ পাচ্ছিনে আর।'

'সে কি! আপনি কয়েকবার আমার বাসায় এসেছেন তো এর মধ্যে।'

'তা তো এসেছি। দেখেও গেছি ভালো করে। কিন্তু এখন এসে কিছুতেই তা আর খুঁজে পাচ্ছি না। এখানেই ছিল, অথচ কোথায় গেল যে এখন।'

'ক'দিন ধরেই টহল মারছেন এই রাস্তায় ?...কেন, আমার বাসার নম্বরটা আপনার মনে নেই নাকি ? যাতে ক্ষণে ক্ষণেই মনে পড়ে সেই হেতু খনার বচনের মতন করে ছড়া বানিয়ে দিয়েছিলুম না ? 'এক দুই তিন চার/গুনে যান বার বার/বাদ দিন দ্বিতীয়কেই/পেয়ে যাবেন তা হলেই/অ-দ্বিতীয় আমার ন্যায়/আমার বাসাও যে মশায় ! মনে নেই আপনার ? ভুলে মেরেছেন বুঝি ?'

'ভুলব কেন ? একশ চৌত্রিশ নম্বর তো আপানার ? কিন্তু রাস্তায় তার হদিশ কোথায় ? ১৩০ অব্দি পাচ্ছি, কিন্তু তার পরেই একেবারেই গিয়ে ১২০-মাঝখানের দশটা বাড়ির পাত্তাই নেই। বিলকুল লোপাট।'

'এই জন্যেই তো মশাই, গোড়াতেই আমি বলেছিলাম না আপনাকে ? প্রথম যেদিন কোন্ এক অভিনয় আসরে না সাহিত্য বাসরে আলাপ হতেই আপনি আমার ঠিকানা চেয়ে বসলেন, আমি দিতে চাইনি কিছুতেই। বলেছিলাম না, সে আপনি খুঁজে পাবেন না সহজে, হয়রান হবেন নাহক। বলিনি কি ? জানি তো, আমার পাত্তা পাওয়া কী সুকঠিন ? ঠিকানা পেয়েও কলকাতায় কোনো বাড়ির ঠিক পাওয়া যায় না, আমি তো পাইনে অন্তত, আর তা খুঁজে বার করা যে কী দায় মশাই ! আর কী যে ঝকমারি, তার ওপর আমার বাসার খোঁজ পাওয়া তো এক ফ্যাসাদ ! সেই বাসায় গিয়ে ওঠার পরও কতোদিন যে আমি নিজেই তার কোনো ঠাওর পাইনি তা জানেন ? পার্কে শুয়ে কতো রাত যে কাটাতে হয়েছে আমাকে...'

'খোঁজ পান না তো, কী করে বাড়িটা খুঁজে পেয়েছিলেন গোড়াতে ?'

'আমি ঠিক খুঁজে পাইনি, খুঁজতেও যাইনি। সত্যি বলতে, বাড়িটাই যেন কী করে খুঁজে পেয়েছিল আমায়...চিনে নিয়েছিল কেমন করে।'

'আগের জন্মের আপনজনকে যেমন চেনা-চেনা মনে হয়, সেই রকমটা ? পূর্বজন্মের পরিচিত বুঝি বাড়িটা ?'

'তাই বা বলি কি করে ? আমার চোখের সামনে জন্মাতে দেখলাম বাড়িটাকে। আগের জন্মে কোনো বাড়িই ছিল না, একটা দীঘি ছিল নাকি ও-জায়গায়। বসাকদের দীঘি। বসাকদীঘি নাম নাকি তাই রাস্তাটার, জানতে পারলুম। আর আমার চোখের ওপরই বড় হলো বাড়িটা। বাড়লো, হৃষ্টপুষ্ট হলো। আমি যখন ওটায় সেঁধিয়েছিলাম তখন সবে ওর তৈরি শুরু। সম্পূর্ণও হয়নি তখন। আমি এলাম, দেখলাম, সেঁধুলাম—মৌরসী পাট্টা গাড়লাম আপনার। একালের উদ্বাস্তুরা যেমনটা করে না ? ভিনি-ভিডি-ভিসি। সেই রকম বাস্তুঘুঘু হয়ে বসে গেলাম।'

'ভারী মজার লাগছে তো ব্যাপারটা, বলুন শুনি।'

'আগের রাত্তিরে আমার এক বোন—হ্যাঁ, বোনই বটে, তবে বন্ধু বলতেও বাধা নেই, বলেছিল আমায় যে, রাস্তায় ঘাটে অমন করে পড়ে না থেকে একটা বাসাটাসা খুঁজে নিয়ে আসতানা গাড়ো নিজের। তাই সকাল বেলার খবর কাগজ বেচার কাজটা সেরেই রাবড়ির ভাঁড় মুখে চুমুকে চুমুকে চাখতে চাখতে বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি। অলিগলির ভেতর দিয়ে একটু গলাগলি করতেই মার্কাস স্কোয়ার মাঠটার সামনে এসে পড়লাম—এক

নির্মীয়মান বাড়ির সামনে সৌম্যমূর্তি বর্ষীয়ান এক ভদ্রলোকের সম্মুখে। এধারে একটা মেসবাড়ির সন্ধান দিতে পারেন আমায়? শুধিয়েছি তাঁকেই। 'চোরবাগানে আবার মেসের অভাব?' তিনি বললেন, চারধারেই তো মেস। এই রাস্তাটার ক'খানা বাড়ি ছাড়িয়ে করিম সাহেবের দোতলার পাশে বাঁহাতি গলির ভেতরে পর পর তিনখানা বাড়িই তো মেস। ল কলেজ মেস। ল কলেজের ছাত্ররা থাকে সেখানে। তুমি কি ল-র ছাত্র?'

'ছাত্র? হ্যাঁ, ছাত্র তো বটেই। তবে ল-র নয়, হ-য-ব-র-ল'র।' আমি বলেছি।

'তবে তো ওখানে থাকতে দেবে না তোমায়। তাহলে দিনকতক অপেক্ষা করো, আমার এই বাড়িটা মেস-পারপাসেই করা হচ্ছে, মেস হলে পর এখানে এসেই উঠতে পারবে তখন।'

'এখন ওঠা যায় না?'

'এখন তো সবে দুটো তালা হয়েছে মাত্তর। তিনতলাটা উঠবে এরপর। তারপর ছাদ হবে, ছাদের ঢালাই পেটাই হবে, চুনবালির পলস্তরা পড়বে, দরজা জানালা বসবে, ইলেকট্রিক ফীটিংস আছে—বিস্তর কাজ বাকী এখনো।'

'থাক না। হতে থাক। দোতলার সিঁড়িটা হয়ে থাকলে এখনই তো ওঠা যায়। যায় না?'

'তা যায়, দোতালায় গিয়ে ওঠা যায় বটে। কিন্তু মেসবাড়ি কাকে বলে তার কোনো আইডিয়া তোমার নেই বোধহয়? বিশ-ত্রিশজনায় মিলে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ভাগ করে থাকে, ঠাকুর চাকর রেখে মেস চালায়—বখরায় খাওয়া-থাকা চালায় বলে খরচা কম পড়ে—একজনায় তো একটা মেসবাড়ি হয় না।'

'এখন একজন মেম্বারই আগাম চলে এল না-হয়। তারপর বাকীরা যখন এসে জুটবে তাদের একজন হয়ে থাকব আমি তখন। কিন্তু...কিন্তু...'একটু কিন্তু কিন্তু করে কথাটা পাড়ি : 'কিন্তু ততদিন গোটাবাড়ির ভাড়াটা কি একলাই আমায় গুণতে হবে নাকি?'

'না, তা কেন। এমনি তুমি থাকতে পারো। আমার বাড়ির এক কেয়ারটেকার হিসেবে। তুমি থাকলে বাড়ির দরজা জানালাগুলো ঠিক থাকবে, সিমেন্ট বালি বেহাত হবে না—চোর ছ্যাঁচোরের উপদ্রব থেকে বাঁচব। সেজন্য তোমাকে যেমন কোনো বেতন দেব না, তোমারও কোনো ভাড়া দিতে লাগবে না। তা না হয় হল, কিন্তু তুমি খাবে কোথায়?'

'খাওয়ার জন্যে চিন্তা করিনে। এই পাড়ারই এক জায়গায় আমার খাবার ব্যবস্থা আছে...তাছাড়া এইরকম কয়েক ভাঁড় রাবড়ি হলেই আমার সারাদিন চলে যায়।' হাতের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কথাটা সারি।

'কিন্তু সিঁড়ির রেলিং এখনো হয়নি, বাড়িতে আলো নেইকো। রাত-বিরেতে ওঠা-নামায় অন্ধকারে পড়ে যাও যদি?'

'পড়লেই উঠে পড়ব তক্ষুনি—তার কী হয়েছে।'

'বেশ, তাহলে দোতলার যে-কোনো ঘর বেছে নাও গে। তোমার শোবার জন্যে একটা চৌকি পাঠিয়ে দিচ্ছি বরং, একটা হেরিকেন লণ্ঠনও। হেরিকেন দেব, নাকি টর্চ?'

'হেরিকেনের দরকার নেই, টর্চ একটা আমি কিনে নেব না-হয়।' তাঁকে বললাম—'আপনার বাড়িটার চৌকিদারির জন্যে একটা চৌকিই যথেষ্ট। তার বেশি আর টর্চার করতে চাইনে আপনাকে।'

'আস্তানা গাড়লে কী হবে—রাস্তা মুখস্থ হয়নি তখনো। যে ধরনের পাঠ মুখস্থ করায় আমি অভ্যস্ত এ-পড়া তার থেকে আলাদা। কেবল মুখে মুখে সুখে আয়ত্ত হবার নয়, যার

বার চোখস্ত করার পরই মুখস্থ হয়। রাস্তার নামধামেও ফারাক বিস্তর। নম্বরটা মুক্তারামের, বাড়িখানা এদিকে বসাকদীঘির লেনে। পাড়াটাও যেন কী রকমের। কারো কাছে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না। পরদিনই আর পথঘাটের কোনো হদিশ পাইনে। সকালের কাগজ ফিরি করে ফেরার পর দেখি আমার বাড়িও ফেরার। বাসার কোনো পাত্তাই নেই। কোথায় গেল সেটা ? এই তো সকালেই দেখে গেছি—এখানেই ছিল কোথায়—এর মধ্যে উধাও ? সারা চোরবাগান চষেও তার টিকির নাগাল পাই না। আপনি তো তবু দু-চারবার ঘোরাফেরা করার পরই ঐ ১২০ নম্বর কুড়িয়ে পেয়েছেন, আমি তো মশাই একশ কুড়িবার চক্কর মারবার পর তবে তার কিনারা পাই....।'

'একশ কুড়িবার ?'

'কী বলছি তবে ? কিন্তু সেটা আমরা চক্করবরতী বলেই হয়ত হবে। ১২০ কিংবা ১১৮ নম্বর যাই হোক, কিন্তু তারপরেই ওই ১৩০ আসে কী করে—সেটা হচ্ছে আবার চোরবাগানের বিখ্যাত চাটুজ্যেবাড়ি—যাই হোক, মাঝখানের দশ-দশটা বাড়ি লোপাট হয়ে যায় কী করে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এমন সময় সামনের বাড়ি থেকে একটা ছেলে, প্রায় আমার সমবয়সী কি কিছু ছোটই হয়ত, বেরিয়ে এসে শুধোলে, আমাদের বাড়ির সামনে আপনি এত ঘোরাফেরা করছেন যে ? কিছু চাই আপনার ? বাবা জানতে পাঠালেন।—জিজ্ঞাসাবাদে জানলাম, আমি যেখানে ডেরা নিয়েছি, সেই বাড়ির মালিক আনন্দ সাহা মশায়ের বড় ছেলে সে। প্রভাতকুমার সাহা—বলল নাম। আমি বললাম—চাই বই কি তাই। তোমাদের সেই বাড়িটাকেই চাই। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনে সকাল থেকে।'

'আসুন আমার সঙ্গে ' বলে সে তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া একটা শুঁড়ি পথ ধরে (সাহাদের সঙ্গে কলকাতার শুঁড়িপথ একদা অবিচ্ছেদ্য ছিল) ছোটখাট একটা বস্তি ভেদ করে আমার বাসার পশ্চাদ্দেশে এসে, তারপর তার পাশ কাটিয়ে বাড়িটার সামনের রাস্তায়—বসাকদীঘি লেনে (এখন নাকি যেটা কেদার বাঁড়ুজ্যে লেনে নামান্তরিত) এনে ফেলল। বলল যে, এ গোলমালটা হয় কেন জানেন ? মুক্তারামবাবু স্ট্রীট থেকে এই বসাকদীঘি গলি অব্দি পুরো এলাকাটাই আমাদের—বাঁ দিকের সব বাড়িগুলিই আমাদের...সরু গলিটার সব বাড়ির নম্বরই মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের, এমন কি, এ বাড়িটা বসাকদীঘিতে হলেও ইচ্ছে করেই আমরা এটার নম্বরও ওই মুক্তারামের নামেই রেখেছি, স্ট্রীটের বাড়ির ভ্যালুয়েশন গলির বাড়ির চাইতে বেশি হয় কিনা, তাই। বিক্রি করার কালে ভালো দাম মেলে।'

'আরে মশাই, আমিও যে ওই বস্তিতেই গিয়ে ঠেকেছিলাম। এর ভেতর দিয়ে এগুতেই দিল না আমাকে। আপনাদের তিন তলাটা আমায় দেখিয়ে দিল অবশ্যি ; বলল, ঐ বাড়িটাই। কিন্তু এধার দিয়ে রাস্তা নয় তার, আপনাকে যেতে হবে ওধার দিয়ে...সে ধার দিয়ে, অন্য ধার দিয়ে—পূব দিকের গলি দিয়েও যেতে পারেন, আবার পশ্চিম দিক দিয়েও যেতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু এখান দিয়ে না, এটা পাবলিক রাস্তা নয় ; এসব ভদ্রলোকের বাড়ি, এখানে এসে অমন ঘুরঘুর করলে গায়ে গরম জল ঢেলে দেব আপনার...এই বলে শাসালো আবার আমায় !...সেই ভদ্রজনরা !'

'দেবেই তো গরম জল, শাসাবেই তো! প্রাইভেট রাস্তা ওটা—জনান্তিকের নেপথ্য যাত্রার। ও পথ দিয়ে আসতে হলে বাড়িওলার ছেলের পাসপোর্ট লাগে...'

'তাই বলে গায়ে গরম জল ঢেলে দেবে নাকি ? বস্তির বাসিন্দাদের এতখানি গুমোর ?'

'সুন্দর সুন্দর মেয়েরা নেই কি সেই বস্তিতে ? আপনি ইতিউতি চাইছিলেন বোধ হয় ? আশা করেছিলেন, আপনার কপালেও হয়ত কুন্তলা ফলবে, এসে বলবে, পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ? অনেকে ইচ্ছে করে পথ হারাতে ওখানে যায় যে। গিয়ে পথ হারায় কি না। তাই ঐ গরম জলের ঢালাও ব্যবস্থা। ওরা ঘন্টায় ঘন্টায় চা খায়, গরম জল সর্বদাই রেডি। বড্ডো বেঁচে গেছেন মশাই।'

কিন্তু তথাপি তাঁর ক্ষোভ যায় না—'কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি—বস্তির লোকের এত গুমোর...।' তিনি গুমরোন তবুও।

'বস্তি বলছেন কেন ? শ্রাবস্তি বলুন। সুন্দর মেয়েরা যেখানে—স্বর্গ সেখানেই। স্বর্গের অলকনন্দা সেখান দিয়ে প্রবাহিত। সেই অলখ্ ঝোরার সন্ধানে বেরিয়ে হাজার হাজার বছর পর্যটনের পর ক্লান্ত পথিকরা অবশেষে শ্রাবস্তির কারুকার্যের কিনারায় এসে পৌঁছায়, জীবনের আনন্দ (কিংবা কবি জীবনানন্দকেই) নিজের অন্তরে খুঁজে পায় বুঝি। কত কান্ড করে পেতে হয়—তা কি অত সোজাসুজি পাবার ? তবে হ্যাঁ, আপনার একথা আমি মানব, এই ক'দিন বাসাটার খোঁজাখুজিতে যে পরিশ্রমটা করেছেন, পরীর মত কেউ নজরে পড়লে, তেমন কাউকে একটু নজরানা দিতে পারলে শ্রমটা আপনার সার্থক হতো বই কি।'

'যাই হোক, বাসাটা আপনার পালটান মশাই। আপনার সন্ধানী ভদ্রসন্তানদের আর এমন নাহক হয়রান করবেন না।' তাঁর উপরোধ শুনতে হয়।

'হ্যাঁ, আপনার কথায় বাসা পালটাই আর ধরা পড়ে যাই শেষটায়।' ও-কথা আমি আমলই দিই না।

'তার মানে ?'

'তার মানে, কলকাতায় থেকেও ঢাকায় থাকার মত, গা-ঢাকা দিয়ে থাকার মত এমন আরেক খানা বাড়ি নেই শহরে। আছে আর কি ? যেখানে কিনা আপনিও ফেরার, আপনার বাসাও ফেরার—যুগপৎ। কারো পাত্তা পাবার যো নেই। ঠিকানা পেলেও যার ঠিকঠিকানা মিলবে না কোনোদিন।'

'পুলিসের ভয় আছে বুঝি আপনার ?'

'কার নেই ? পুলিসের ভয় সবাই করে—সর্বত্র—সব সময়। জানেন, বিনয় বাদল দীনেশের একজন, কোন্‌জন আমি ঠিক জানি না, একরাত্তির ঐ বাসায় কাটিয়ে গেছেন ? তারকদা'র খোঁজে এসেছিলেন তিনি। তারকদাও এক বিপ্লবী, আমাদের দেশের গাঁয়ে ইনটারনী হয়ে ছিলেন দিনকতক। মাঝে মাঝে কার্যগতিকে আমাদের বাসায় উঠতেন, থাকতেন আমার ঘরেই। 'তাঁর আসবার কথা ছিল যে আজ। আজকালের মধ্যে এসে যাবেন নিশ্চয়', বলল ছেলেটি, 'আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব এখানে।' 'করুন, আপত্তি কিসের।' কিন্তু আমার গেস্ট হয়ে ছিলেন তিনি শুধু ঐ এক রাত্তিরই। পরদিন সকালে উঠে আর তাঁর দেখা পাইনি। আমার ঘুম ভাঙার আগেই কোনো কথা না কয়েই কখন যে তিনি চলে গেছেন টেরও পাইনি আমি। টের পেলুম তার পরদিন—তখন তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া গেল। রাত না পোয়াতেই দমাদ্দম ঘা পড়তে লাগল আমাদের সদর দরজায়। উঠে দেখি, গোটা পাড়াটা ছেয়ে গেছে পুলিসে। যেদিকে তাকাই খালি পুলিস আর পুলিস। বাসাড়েরা ভয়ে কাঁপছে সবাই—আমরা ঘেরাও। আর সশস্ত্র পুলিস আর গোরা সার্জেন্টদের নিয়ে

এসেছেন অপর কেউ নয়—স্বয়ং টেগার্ট সাহেব।'

॥ ছাপান্ন ॥

সদর দরজা ভেঙে ফেলার যোগাড়, কিন্তু ভয়ে কেউ উঁকিটি মারছে না পর্যন্ত। সবাই নিঃসাড়।

কিন্তু আমি তো জানি পুলিসের ডাকে সাড়া না দিয়ে যাবার জো নেই, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সেই কারাবরণের সময় থেকেই জানা আমার।

পুলিসের সঙ্গে পারা যায় না। দে ক্যান শুট্। আর, সব সময় যে বন্দুক দিয়েই—তা নয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের গুলতানিতে ঘোড়ামুখো এক গোরা সার্জেন্ট কেমন শুট করে আমায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল কয়েদগাড়ির ভেতরে—তার এক লং শটেই না।...বলপ্রয়োগ, মানুষকে বলের মত অপপ্রয়োগে তাদের দ্বিধা বাধা নেই আমি জানি।

এর মধ্যেই অগ্রপশ্চাত খতিয়ে দেখা হয়েছে। যম যে সব সময় পিছে থাকেন, পিছিয়ে থাকেন তা নয়, এখানে সামনে বাঁয়ে ডাইনে পিছনে সর্বত্র। পিছনের খিড়কি ধরে বস্তির দিকে সরে পড়া যাবে, সেপথও বন্ধ—সেধারেও পুলিস। বাঁ দিকের দেয়াল টপকে পালাবো যে, সেদিকেও পাহারা। দরজা যদি না খুলে দি, আর কবিগুরুর সেই গানের মত তারা দ্বার ভেঙে এসে পড়ে যদি, তাহলে প্রাণের আর কিছু বাকী থাকবে না। আস্ত রাখবে না।

নামতে হল আমাকে, বাধ্য হয়েই।

দরজা খুলে বেরুতেই এক পুলিস অফিসার—তিনিই টেগার্ট সাহেব জানা গেল—এগিয়ে এলেন—নাম কী তোমার?

বললাম নাম।

'ক'দ্দিন আছো এখানে? কতজন থাকে এ বাসায়? কী করে তারা সব?'

যথাযথ উত্তর দেবার পর তাঁর প্রশ্ন হল আবার—'বাইরের ফালতু লোকের যাতায়াত আছে এখানে?'

'মাঝে মাঝে। কারো আত্মীয়স্বজন কখনো-সখনো এলে কয়েকদিনের জন্যে থাকেন—তার গেস্ট হয়ে। তারপরে চলে যান।'

'এর ভেতর কেউ এসেছিল কি? তোমাদের এখানে?'

'না তো।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে—'হ্যাঁ, এসেছিল। পরশু রাত্তিরে একজন এসেছিল বটে, এক যুবক. তাকে আমি চিনি না। ভালো করে আলাপ হবার আগেই কাল সকালে সে চলে গেছে—কোথায় জানি না। আমাকে কিছু না বলেই চলে গেছে সে।'

'কীরকম দেখতে যুবকটি?'

বর্ণে বর্ণে তার পরিচয় দিতে না পারলেও একটা বর্ণনা দিলাম সাধ্যমতন। শুনে টেগার্ট পাশের সহযোগী বাঙালী অফিসারের দিকে ইঙ্গিত করলে—দ্যাটস্ দা ম্যান। 'এসেছিল কেন সে তোমার কাছে?'

'আমার কাছে আসেনি ঠিক। তারকদা বলে একজনের খোঁজে সে এসেছিল এখানে।'

'হু ইজ দিস তারক? এখানে থাকে সে? এ মেম্বর অফ দিস মেস?'

'না। মাঝে মাঝে এখানে আসে। এসে দুয়েক দিন থাকে, থেকে চলে যায় আবার। কোথায় যায় জানি না।'

'এনি রিলেটিভ অফ ইয়োরস্?'

'নো সার। আমাদের মালদায় ইনটার্নী হয়ে ছিল সে কিছুদিন। সেখানেই তার সঙ্গে আমার আলাপ।'

'সিওরলি এ টেররিস্ট। কামস্ টু ইউ হিয়ার ফর সাম টেররিস্টিক অ্যাকটিভিটি—আনডাউটেড্‌লি?'

'সে টেররিস্ট কিনা আমি জনি না। তেমন কোনো কাজে আমার কাছে আসে না। সেরকম কোনো কথাও বলে না সে। হি রাইটস্ নভেল্‌স্। আমাকে শোনাতে চায়—তাই নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি করার জন্যেই আসে।'

'নাউ হি ইজ এ রাইটার? নট এ টেররিস্ট, ইউ মীন?'

'বাট টু লিসন টু হিজ রাইটিংস নো লেস এ টেরর সার। আই ডোন্ট লাইক ইট, বাট—কী করতে পারি বলুন। সে নাছোড়বান্দা। শুনতেই হবে আমায় বাধ্য হয়ে। না শুনিয়ে ছাড়বে না।'

'তুমি কী করো? আর ইউ এ রাইটার ট্যু? এ নভেলিস্ট?'

'নো, নো। আই অ্যাম এ জার্নালিস্ট। আই হক দা পেপারস্ ইন দা মর্নিং।'

'ওঃ! দ্যাট জার্নালিস্ট দ্যাট ইউ হক দা জার্নালস?'

'নো সার। নাহক নয়। আই অলসো রাইট ইন দেম। স্টোরি অ্যান্ড পোয়েমস্। ইন সাম অফ দেম।'

'চলো, তোমাদের বাসাটা আমি সার্চ করব। হ্যাজ দ্যাট ম্যান লেফট্ এনিথিং হিয়ার ইন ইওর রুম?'

'পারহ্যাপস্ নট। আসুন। ইউ আর ওয়েলকাম। অলওয়েজ ওয়েলকাম।'

পুলিস আর প্রেমিককে অভ্যর্থনা না করে উপায় নেই—মিথ্যে বললেও দোষ নেই কোন—যদি তাঁদের সন্তোষ হয়। যতই আনওয়েলকাম হোক না, তাদের কাম্য আচরণ করাটাই দস্তুর।

বাসার সব ঘর ঘরগুলোই তাঁরা ঘুরেফিরে দেখলেন। অন্য ঘরগুলো ওপর ওপর, আমারটা তন্ন তন্ন করে। ছাদটাও বাদ গেল না।

কোথাও আপত্তিকর কোনো কিছু না পেয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোকেরা।

যাবার আগে টেগার্ট সাহেবকে আমি জানিয়েছিলাম, আমার কিছু ধন্যবাদ তাঁর পাওনা আছে। দিনকতক আগে আমার ফাউন্টেনপেনটা খোয়া গিয়েছিল, অ্যান্ড বিকজ আয়্যাম এ রাইটার, আমার কলম গেলেই খোয়ার। আমি হাতে খোঁড়া। কিন্তু হারাবার দু-একদিন পরেই একজন—এই পাড়ারই কোনো পিকপকেট হবে, আমি চিনি না, খুব বিরক্তিভরে অযাচিত কলমটা ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন আমায়। থানায় ডায়েরি করেছি নাকি, সে শুধিয়েছিল আমাকে। পাগল! থানায় খবর দিলে কী হয় আমার জানা আছে ভাই! যে জানাতে যায় তাকেই তারা নাজেহাল করে ছাড়ে। অমন কথা বোলো নাকো—থানার ত্রিসীমানায় আমারা নেই। আমার জবাবে খুশি হয়ে সে বলেছে—উয়োবাত তো ঠিক হ্যায়। শালা টেগার্টের জ্বালায় না খেয়ে মরতে হবে আমাদের, কারো পকেট মারবার যো নেই দেখুন না! রাস্তায় এক টাকার নোট পড়ে থাকলেও কেউ তা কুড়োতে পারবে না'ক বলেছে নাকি শালাটা। তাহলে সে তাকে দেখে নেবে। দেখুন তো! কী মুশকিল। কী রকম হারামি!

শুনে টেগার্ট হাসতে লাগলেন—'তুমি দেখেছ এরকম পড়ে থাকতে?'

'নোট ? এক টাকার নোট রাস্তায় পড়ে থাকতে ? না সার, কক্ষনো দেখিনি। দেখলে তো আমি নিজেই তা কুড়িয়ে নিতাম তৎক্ষণাৎ। না, টাকা পয়সা আমি কখনো পড়ে থাকতে দেখি না। তেমনটা এ পোড়া চোখেই পড়ে না আমার। আমার বরাত।' শুনে না টেগার্ট সাহেব আমার করমর্দন করে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

'কী হোলো তার পরে ?' জনাব সাহেব জিগ্যেস করলেন।

'কী আর হবে। পাড়ায় আমার বেশ পজিশন হয়ে গেল তারপর। বড়রা সবাই ভাবতে লাগল আমায় পুলিসের স্পাই বলে, আর ছোটরা মনে করল, আমি বুঝি বিপ্লবী। দুই মহলেই আমার মর্যাদা বেড়ে গেল বেজায়। আর সবাই বেশ সমীহ করে আমার স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলতে লাগল। ছায়া মাড়াত না কেউ। নির্ঝঞ্ঝাট ছিলাম পাড়ায় তারপর। সাধনবাবুর সন্দেশের দোকানে ধারেও রাবড়ি পেতাম আমি তখন থেকে—চাইলেই না।'

'বাঃ বাঃ ! আপনার বরাতে মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়ে গেল ব্যাপারটা। বেশ বেশ।' তিনি বললেন—'পুলিসে ছুঁলে আটারো ঘা হয়ে থাকে, সেই বিপাকে আপনার হলো মিষ্টান্ন লাভ! এই অসাধ্যসাধন !'

ইতরজন বলেই বোধহয় ! সাধনা না করতেই এই সিদ্ধিলাভ। সাধুনবাবুর মেঠাই-মন্ডা পাওয়া ! সেদিনকার প্রাতঃকালীন দৃশ্য দেখতে পাড়ায় বেশ ভিড় জমে গেছল তো—দূরে অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল সবাই, সম্ভবত সাধনবাবুও সেই উপরিদর্শকদের দলে থাকবেন। খোদ পুলিস কমিশনারের সঙ্গে আমার খাতির দেখে তিনি আমায় হাত করতে চেয়েছিলেন হয়ত, সেইটে খতিয়ে আমিও তাঁর রাবড়ি হাতাতে লাগলাম।'

'সেই সুমধুর হাতাহাতিটা ক'দ্দিন গড়িয়েছিল ? ক'বছর পর্যন্ত ?'

'এখন অব্দি। এখন অবশ্যি সাধনবাবু জীবিত নেই আর, বহুদিন স্বর্গত, এখন তাঁর ছেলে শৈলেনের দোকান। তাহলেও সেখান থেকে ধারে কিছু নিলে তারা পরে চেয়ে নিতে ভুলে যায় দেখছি, সেটা ইচ্ছে করেই মনে হয়।

'সব পেয়েছি-র দলে না হলেও সব পাওয়ার মেসে আপনি এসে পড়েছেন দেখছি। কিন্তু যাই বলুন, ঠিক গা ঢাকাটি দিয়ে থাকা যায় না ওখানে। পুলিসে ঠিক খবরটিও পায়, আর ঠিকানারও পাত্তা পায় ঠিকই। কেমন খুঁজে পেল দেখলেন তো ?'

'তা ঠিক। পুলিসের সঙ্গে আড়ি করে ফেরারী হওয়া যায় না সত্যি। পুলিস ঠিক পিঁপড়ের মতই। কোথায় ওদের খাদ্য আছে, টের পেয়ে যায় যে কেমন করে—খুঁজে বের করে হানা দেয় শেষ পর্যন্ত। ঐ পুলিস আর পিঁপড়েরা।'

'পিঁপড়েরাও !'

'হ্যাঁ। দেশের থেকে একবার শ'খানেকের ওপর আম পাঠিয়েছিল যেন কে। এককালে আমাদের দেশ ছিল সেই মালদায় জানেন তো ? ওখানে গিয়ে একবার ঘুরে ফিরে এসেছিলেন না আপনি ? তাহলে সেখানকার আম খাওয়ার বিধি-ব্যবস্থা কী রকম তাও জানেন নিশ্চয়। আমের নামেই সেটা মালুম হবে। গোপালভোগ, বাদশাভোগ, ক্ষীরসাপাতি—এইসব আম। আমের নাম ! বুঝতেই পারছেন, এহেন আম গোপালকে নিবেদন করে পাতক্ষীরের গামলায় ডুবিয়ে বাদশার মত আয়েস করে খেতে হয়। কিন্তু এই একশ' আম, আমি একাই একশ' হলেও একা একা খাই কি করে—খেয়ে ফুরোবার আগেই বেশির ভাগ

এর তো পচে গলে একশা হয়ে যাবে...'

'পাড়ার আমজনতাকে ডেকে এনে খাওয়াতে পারতেন।'

'আসবে কেন তারা ? বলেছি না, টেগার্ট সাহেবের সৌজন্যে আমি কিঞ্চিৎ নামজাদা হলেও তারা আমাকে এড়িয়ে চলত—তখন না হয় একটু আমজাদাই হয়েছি, তাই বলে তারা আমায় আমল দেবে নাকি ? সাধনবাবুর দোকান থেকে সের দুয়েক রাবড়ি নিয়ে এসে আমার বোনেদের—জবা পুতুল কাবেরী ইতুদের ডেকে আনতে চলে গেলুম। আমার অনেক বইয়ে ওদের গল্প পড়ে থাকবেন, ওরা আপনার অজানা নয় বোধ হয় ? 'ভালোবাসার অনেক নাম'—বইটার গোড়ার গল্পটাই তো জবাকে নিয়ে। আবার 'নিখরচায় জলযোগ'—বইয়ের শেষের গল্পটাও তাই—আমার সেই জবাই ! সত্যি বললে, এক সম্পর্কে ওরা আমার কাজিন হয়। সে সময় ওরা সবাই কৃপার স্ট্রীটে থাকত, বিয়েও হয়নি কারু—সেই কৃপার থেকে পাকড়ে আমার অন্ধকূপে টেনে আনলাম সবাইকে—আম খাওয়ার আমন্ত্রণে। আনলাম তো, কিন্তু এসে দেখি, ওমা ! আম যথাযথই আছে বটে, কিন্তু রাবড়ির গামলাটা পিঁপড়েয় ভর্তি, রাবড়ির সরের ওপর রঙচঙে এক স্তর পিঁপিড়ের পুরু পলস্তারা।'

'সে কী মশাই !'

'বলছি কি তবে ? আমার সেই ঘরের জঞ্জাল তো দেখেছেন ? তার ওপরে সেদিনের খবর কাগজটা পেতে তার ওপরেই গামলাটা বসিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছি-'

'পিঁপড়েরা গন্ধ পায় মশাই ! এদিকে পুলিসের সঙ্গে বেশ মিলে আছে তাদের।'

'ভাবলাম গন্ধ পেলেও সন্ধান পাবে না। রাজ্যের ওই নোংরা মাড়িয়ে, খালি পায়ে আবর্জনার সেই উচ্চাবচ পর্বতশৃঙ্গদের ডিঙিয়ে, দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে এত কষ্ট করে তারা সেই অমৃতকুম্ভের নাগাল পেতে আসবে, ধারণাও করিনি—কিন্তু পাত্তা পেয়েছে ঠিকই। যাই হোক, ওপর ওপর চেঁছে ফেলে রাবড়ির তলানিটাই সদ্ব্যবহার করা গেল আম দিয়ে—কতো কী ভালো-মন্দ তো তারা খেয়েছে জীবনে। তাদের বাড়ি আমিই কি কম কিছু খেয়েছি নাকি, তবু আমার মনে হয়, সেই খাওয়ার সোয়াদ এখনো বুঝি তাদের—আমার সেই বোনদের মুখে লেগে রয়েছে !'

'সত্যি !' জনাব সুরুৎ করে জিভের জল টানলেন। ঝালের মত মিষ্টিটাও পরের মুখেই খেতে হয় বুঝি।

ইতু বলল, দূর, বাড়ি বসে কি এসব জমে নাকি? চলো আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ময়দানে গিয়ে পিকনিক করিগে। তাই গেলাম সবাই। গ্রেট ইস্টার্ন থেকে কেক প্যাটিস্ক কাটলেট স্যানডউইচ ইত্যাদি নিয়ে খবরের কাগজ বিছিয়ে সেখানে গিয়ে বসলাম আমরা। খানিক বাদেই চেঁচিয়ে উঠেছে ইতু—ওমা ? কান্ডটা দেখেচ ! তোমার সেই পিঁপড়েরা আবার এখানেও এসে হানা দিয়েছে দ্যাখো ! এখানে আসব আমরা, কী করে টের পেয়েছে কে জানে। আমি যখন ভিক্টোরিয়ার কথা বলছিলুম না, তখনই শুনেছিল বোধ হয়। আর সটান চলে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। পুতুল তো ওর কথায় অবাক। এগুলো সেই মেসের পিঁপড়ে বলছিস তুই ? না তো কী ! দ্যাখ্ না, একেকটা ঘাড় তুলে তাকাচ্ছে কেমন আবার ! সেই পিঁপড়েরাই ! তোর দিকেই তাকাচ্ছে বোধ হয়—এর মধ্যে আহ্লাদরি তো তুই-ই কেবল। ইতুকে আমি সান্ত্বনা দিই।

'সেই থেকেই আমার ধারণা মশাই,' পুলিসের মতন পিঁপড়ের হাত থেকেও পার পাওয়া

যায় না। যে করেই হোক, টের তারা পাবেই—এড়ানো যাবে না তাদের। তবে একটা কথা আমি বলব, পিঁপড়ে প্রমুখদের ফেরানো না গেলেও পাওনাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে থাকা যায় বেশ ঐ বাসাতে...।'

'মানে, আপনাকে আর পালাতে হয় না, বাড়িটাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় বলছেন তাই ?' জনাব কন—'নাকি সদরে পাওনাদারদের দর্শন পেলেই আপনি খিড়কির শুঁড়িপথ ধরে সরে পরতে পারেন ? সেই কথাই ?'

'না, না মশাই। এদিকে পাওনাদারের টিকি দেখলেই ওদিক দিয়ে টিকিট কাটব সে বরাত করিনি—আমার আবার পাওনাদার কে হবে ? কে ধার দিতে যাবে তখন আমায় ? তেমন ধারালো বন্ধু—তেমন কেউই ছিল না যে। তখন আমার স্ট্রাগলিং পিরিয়ড চলছিল না ? সেই দারুণ দুঃসময়ে কেউ কারো মিত্র হয় ? সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়, পড়েননি পদ্যপাঠে ?'

'কেন, দেশবন্ধু তো ছিলেন আপনার ? পাননি—পেতেন না তাঁর কাছে ?'

'পাব না কেন ? পেয়েছি তো, অনেক অনেক—অনেকবার ! কাছে গেলেই কেমন করে যেন তিনি টের পেতেন, তখন যা তাঁর পকেটে থাকত, সব উজাড় করে বের করে দিতেন, কিন্তু তাঁকে পেলে তো ?

'পাবার বাধাটা কী ছিল ?'

'আমি নিজেই বাধা। মুহুর্মুহু গিয়ে চাওয়া যায় খালি খালি ? চক্ষুলজ্জা করে না ? বুড়ো ধাড়ি হয়ে বার বার তাঁর বাড়ি গিয়ে...তা ছাড়া, আমার প্রতি তাঁর বদান্যতার কথা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাও টের পেয়ে গেছল যে...সেই বদ অন্যরাই তাঁকে দুইত বোধ হয়—তারাই তাঁকে ঘিরে থাক সব সময়। ধারে-কাছে ঘেঁষতেই দিত না আমাকে। বাড়ি থাকলেও বলে দিত বাইরে চলে গেছেন ! এমনি নানা ফন্দি ফিকিরে বাধা দিত তারা আমায়...'

'চিঠি লিখে জানাতে পারতেন...মাইকেল যেমন বিদ্যাসাগরকে পত্রাঘাত করতেন...কেবল আপনাকেই নয়, অনেক লেখককেই তিনি সাহায্য করতেন জানা গেছে, আর তিনি বিদ্যাসাগররের মতই তাদের প্রতি মুক্তহস্ত ছিলেন।'

'তা বটে, নিজেকে তিনি উঠতি প্রতিভাদের প্রতিভূ বলে জ্ঞান করতেন বোধ হয়। তা বলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না—সে তুলনা করবেন না। এদিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিনি বড়ো ছিলেন এমন কথা আমি বলতে চাইনে, তিনি ছিলেন তাঁর থেকে আলাদা। একেবারে স্বতন্ত্র। বিদ্যাসাগর যোগ্য লোককে দিতেন আর দেশবন্ধু অযোগ্য ছাড়া দিতেনই না। বিদ্যাসাগরের বিচারপূর্বক দান আর তাঁর ছিল নির্বিচার। বর্ষার মেঘপুঞ্জ যেমন কোন বাছবিচার না করে স্থানে-অস্থানে সমানে অকাতরে ঝড়ে পড়ে—নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে বাঁচে ঠিক—তেমনটাই। বিদ্যাসাগরের করুণা ; আর দেশবন্ধুর স্নেহ। দু'জনের তুলনা হয় না।'

'আপনি দেশবন্ধুর স্নেহধন্য ছিলেন, জানি আমরা।'

'তেমন অনেকেই ছিল। আমি এমন বিশেষ কিছু নয়। তবে নজরুল আর সুভাষকেই তিনি বেশি ভালোবাসতেন মনে হয়। তবে বললাম না ? তাঁর স্নেহলাভের বাধা ছিল বিস্তর। আমার মতন অনেক স্নেহভাজন, তারা আবার নিকটজনও, তাঁকে ঘিরে রাখত—আমার মত অভাজনদের এগুতেই দিত না তাঁর কাছে—সেই দুস্তর বাধা পেরিয়ে পৌঁছনো যায়

কি করে? তা ছাড়া তিনিও মাঝে মাঝে সুদূরপরাহত হয়ে যেতেন। অল ইন্ডিয়া লীডার ছিলেন তো তিনি—প্রায়ই হিল্লি-দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, নাগপুর ঘুরতে হত তাঁকে—তখন? সেই দুঃসময়ে কী করি বলুন?'

'কী করতেন?'

'অসহায়ের পাশে কে দাঁড়াবে আবার? কে সহায় হয় তার? সে সময় শুধু দু'জনই আছে কেবল—মা-কালী আর বাবা কাবুলি। সামনের মন্দিরের ওই প্রতীকাকার আর সেই প্রতিকার।'

'কাবুলির কাছে ধার করতে হতো আপনাকে?'

'হ'ত বইকি। হয়েছিল একবার—সেই একবারই মাত্র। আমাদের দেশের একজন—শরৎ ঝা—চাঁচলের ইস্কুলে এক বছরের সিনিয়র ছিল আমার—সেই শরৎদাই আমায় নিয়ে গেছল তাঁর চেনা কাবুলিটির কাছে। দেখে-শুনে সে ধার দিতে রাজী হয়ে গেল এক কথাতেই। অদ্ভুত এই কাবুলিরা, সত্যিই! দিয়েছিল সে শ'দেড়েক টাকা ধার।'

'কী দেখেশুনে দিল শুনি?'

'আমার কথা শুনে। আর আমার ঠিকানায় এসে বাসাটা দেখে—তারপরে। কেয়া কাম করতে হো? শুধিয়েছিল সে শুধু। সকালে খবর কাগজ বেচার কথাটা আমি বলেছি। সে শুনে বলল—আচ্ছা কাম হ্যায়। বহুৎ আচ্ছা কাম। লেকিন উওতো ফজিরকা কাম। আউর সমুচা দিন... বিলকুল বেকার? কুছভি নেহি আউর?'

কাহে নেহি? হাম্ এক মোকামকা কেয়াটেকার হ্যায় না? কেয়ারটেকারকা কেয়া বোলতা? দারোয়ান। যাঁহা হাম রহতা হ্যায়, ওই কোঠিকা দারোয়ানি ভি করতা হ্যায়।

'বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ আচ্ছা। ইয়ে আউর ভি বড়িয়া কাম। এহি দারোয়ানিসে জবর কাম্ আউর কুছভি নেহি।' সে বলেছে।

'জী হাঁ।' আমি সায় দিয়েছি তার কথায়—'ইস্‌সে জেয়াদা কাম আউর কেয়া হ্যায়? এই পেয়াদা কাম?'

'জরুর, জরুর।' সে ঘাড় নাড়ে—'হাকিমসে ভি জবর ইয়ে কাম। হরবখৎ মোকামকা দরওয়াজা পর খাড়া।...হাকিমকা সাথ দোস্তি-রহনে সেকতা, লেকিন পেয়াদাসে দোস্তি বেগর হাকিমসে মিলনা ভি মুশকিল। পেয়াদা দরোয়াজামে রোক দেনেসে তোম উপর জায়গা কিস্তরে?'

'ওহি তো বাৎ। পেয়াদা নেহি কাৎ হোনেসে হাকিমসে ভি মোলাকাৎ নেহি।'

'কাবুলি আমার বুলিতে খুশি হয়েছিল বোধ হয়। সে তার ঝুলির থেকে কিসমিস বাদাম বার করে খেতে দিয়েছিল আমায়। আমার হকারির চাইতেও আমার দারোয়ানিকে বেশি মর্যাদা দেওয়ায় আমিও মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাকে সঙ্গে করে মহাসমাদরে নিয়ে এসে বাসাটা দেখিয়ে দিলাম আমার।

'সে জানালো, মাসের একটা নির্দিষ্ট তারিখে বাড়িটার এক ফার্লং দূরে এই ল্যাম্পপোস্টের সামনে এসে সে খাড়া হবে, তাকে দাঁড়াতে দেখলেই আমি যেন সুড় সুড় করে সুদের টাকাটা গিয়ে তার হাতে গুঁজে দিয়ে আসি। তা হলে সে বাসায় এসে হানা দেবে না, ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে চুপচাপ—কিন্তু তাকে দেখার পরেও আমি নেহাত যদি না যাই, তখন সে বাধ্য হয়ে এখানে এসে চড়াও হবে কিন্তু। আর যদি তাকে দেখেই আমি দিয়ে

দিয়ে আসি গিয়ে, তা হলে সে আমাকে পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, মনাক্কা, আখরোট, আঙুর ইত্যাদি মেওয়া খাওয়াবে আবার। কিন্তু দিতে দেরি করলে—সবুরে সে মেওয়া ফলবে না।

'যাবার আগে সে বেশ করে দেখে গিয়েছিল বাড়িটাকে। কিন্তু সেই তার প্রথম দেখা আর সেই-ই শেষ।'

'সেই শেষ কেন ? কী হলো তারপর ?'

'তারপর তার সৌজন্যে আমার স্ট্রাগলটা শেষ হলো বটে, অন্তত তখনকার মতন। কিন্তু তার স্ট্রাগলটা শুরু হয়ে গেল তারপরই। আমার বাড়িটা খুঁজে বার করতে লাগল সে তারপর—কিন্তু পাত্তা পেল না কিছুতেই। আমিও তার দেখা পাইনি আর। সেই বাসাটার দৌলতেই না ? সেই বাসা আমায় আপনি বদলাতে বলছেন মশাই ?'

॥ সাতান্ন ॥

'চলুন, আজ ভালো করে দেখব।' জনাব সাহেব কথা পাড়েন মাঝখানে : 'আপনার মেসটা চিনে আসব বেশ করে।'

'কী হবে চিনে ?' আমি কোনো উৎসাহ দেখাইনে—'আমি তো আপনার কাছে কোনো ধার চাইতে যাচ্ছিনে। আপনার ধার ধারবারও কোনো মতলব নেই আমার। না, সেজন্যে নয়। এত ঘুরেফিরে, এতবার ঘোরাঘুরির পরেও যা চিনতে পারেননি, তা না হয় নিশ্চিহ্ন হয়েই থাক। তাতে আপনারও শান্তি এবং হয়ত আমার—আমারও...'

তার বেশি বলতে পারি না। নিজের শান্তিপ্রিয়তা ব্যক্ত করতে সঙ্কোচ হয় স্বভাবতই।

'বাসায় তো ফিরছেন এখন ? চলুন না !'

'না, বাসায় কেন আবার ? বেরুলাম তো এই। নানান বিষয়কর্মে বেরিয়েছি। হাতে ওষুধের শিশি দেখছেন না ? বোস কম্পানিতে মিকশ্চারটা বানাতে দিতে হবে। সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে, বিবেকানন্দ রোড পেরিয়ে চাচার দোকানের পাশে সাঙ্গুভেলির কেবিনে...সেখানে চা-টা খেয়ে ফেরার পথে ওষধটা নিয়ে আসব বোস কোম্পানির থেকে... এর ভেতরে তাঁরা বানিয়ে রাখবেন মিকশ্চারটা।'

'কিসের মিকশ্চার ?'

'অ্যাজমার। মা'র ছিল না ঐ ব্যামো ? আমারও হয়েছিল একবার। আমারও হবে, বলেছিল মা। অ্যাজমা মা'র, ঐ অ্যাজমা আমারও। সেই রকমটাই হয়েছিল একবার—ভারী জোর হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর হতে দিইনি। এখন মাঝে মাঝে এক-আধবার একটু-আধটু না হয় যে তা নয়—এর কয়েক দাগ খেলেই সেরে যায়।...ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন এটা মশাই, সেই কোন সেকালে। আমরা যখন যদুনাথ সেন লেনে থাকতাম—বাড়িটার এগারো নম্বর বোধ হয়, আর ডাঃ সেনগুপ্ত তখন সবে প্র্যাকটিশ জমিয়েছেন, চার টাকা মাত্র ফি ছিল তাঁর তখনকার—থাকতেন মানিকতলা স্ট্রীটের কোথায় যেন—এসে মাকে ভালো করে দেখেশুনে ঐ মিকশ্চারের ব্যবস্থা করে গেছলেন।'

'দেখে তো মনে হয় না আপনার অ্যাজমা-ট্যাজমা আছে ? হেঁপো রুগীকে দেখলেই তো চেনা যায়। কোনো অসুখই আপনার রয়েছে বলে বোধ হয় না। আপনি বোধ হয় কলকাতার সুস্থতম ব্যক্তি।'

'অসুস্থতম। হেন আধিব্যাধি নেই, যা নাকি হয়নি আমার—আর নেইকো এখন। যে

রোগটা একবার আমায় ধরেছে সে আর আমায় কখনো ছাড়েনি, ছাড়তে চায়নি বুঝি। এবং আমিও যে ওষুধটা একবার ধরেছি তার ছাড়ান দিইনি আর। শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্—বলেছে না? বাঁচতে হলে, বুঝলেন মশাই, হয় অসুখে ভুগুন, নয়তো ওই ওষুধেই—ভুগতেই হবে। অসুখে ভুগলে অশান্তি, নিজের এবং আশপাশের সবাইকার, কিন্তু ওষুধে ভুগলে সেটা নেই। কমপেয়ারিটিভলি অনেকটা শান্তি—তাই না কি? তবে যতই ওষুধ খান না, মৃত্যু এড়ানো যাবে না সত্যি, তবু যতটা স্বচ্ছন্দে থাকা যায়—আর শান্তিতে মরা যায়। আমার ভোগসুখে যেমন অনীহা, অসুখ ভোগেও সেই রকমটাই। সুখ ভোগ নাগালের বাইরে বলে সাধ করে অসুখ ভোগ বাগাতে যাব, এমন ভোগলালসা নেই আমার। তাই যতটা সম্ভব যথাসাধ্য তাদের প্রকোপ এড়িয়ে যেতে চাই।'

'সবাই তো তাই চায় মশাই!'

'আর আজকাল এমন এমন ওষুধ বেরিয়েছে না! মন্ত্রের মতন রোগ সারায়, রোগ আটকাতেও তাদের জোড়া নেই।'

'তা, এখন বোস কোম্পানিতে যাচ্ছেন যে। হাঁপানি হয়েছে নাকি?'

'না, হয়নি। সে একবারই যা হয়েছিল, বললাম না। সেই একবার ভুগেই আমার ভোগস্পৃহা মিটে গেছে...হতেই দিই না এখন আর, হবার আগেই সারিয়ে রাখি। যে দাবাইয়ে সারায়, তাই দিয়ে দাবিয়ে রাখি আগের থেকে। নিয়মিত এক-আধ দাগ খাই রোজ, খেয়ে যাই—তাতেই আর ওটা পাত্তা পায় না। আমলই দিই না অসুখটাকে। ভালো আছি বেশ।'

'আশ্চর্য! রোগ না হলেও ওষুধ খায় লোকে?'

'আশ্চর্য বটে! এ তো মিরাকল্-এর ন্যায়। ওষুধ সব থাকতেও লোকে যে এত অসুখে ভোগে তা দেখে আমি কিছু কম অবাক হই কি মশাই? আমার কী মনে হয় জানেন? ভোগবাসনা মানুষের অন্তর্গত, কিছুতেই তা যায় না, যেতে চায় না। যেমন সুখের জন্য তেমনই আবার যেন অসুখের জন্যেও মন তার কেমন করে যেন। সেটি না হলে কেমন যেন ভালো লাগে না, মনে মনে, চায় যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সবাই মিলে তার জন্য আহা-উহু করুক, সেবা করুক ঠেলে, অসুখে না পড়লে তো পারিবারিক প্রীতি প্রকাশ পায় না; তার পরিচয় পাবার তরেই হয়ত সে ওই লালায়িত। সেই হেতু সাধ করে রোগ ডেকে আনে—মারা পড়ে অনেক সময় সেইজন্যই। চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। ওষুধটা করতে গিয়ে সাঙ্গুভেলিতে বসি গিয়ে—সেখানে বসেই গল্প করা যাবে'খন। চা টোস্ট কফি যা চান, অমলেট পোচ কাটলেট যা চাই, স্ট্যু কারি কোর্মা সব পাওয়া যায় সেখানে। চমৎকার সস্তায়।'

বোস কম্পানিতে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সাঙ্গুভেলিতে গিয়ে বসলাম আমরা। দু'প্রস্থ খাবারের অর্ডার দেওয়া গেল।

'এখানেও ধারে খাওয়ায় নাকি?' টেবিলের ওধার থেকে তাঁর জিজ্ঞাসা।

'আরে না না। কাবুলিওয়ালার দক্ষিণা কি সবারই থাকে নাকি? সেকালে যখন খবর কাগজ বেচতাম সকালে, আমাদের দেশের শরৎদার সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হঠাৎ। তাঁকে আমি বললাম, শরৎদা, গোটা কুড়ি পঁচিশ টাকা ধার দাও না আমাকে? এই কারবার

তাহলে জমিয়ে করা যায়। 'তোর এই কাগজ বেচার ব্যবসা ?' হ্যাঁ, আনন্দবাজার, বসুমতী আমি অবশ্য ধারেই পাই, কিন্তু সব কাগজ তো তাই নয়। হ্যাঁ, আরো কতো কাগজ আছে, অমৃতবাজার, ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, স্টেটসম্যান, নামক সব রকম কাগজই চায় খদ্দের। কিন্তু সেসব তো এই টার্মে মেলে না। কমিশন বাদে কাগজের দাম আগাম মিটিয়ে দিয়ে আনতে হয়। সেটা করতে পারলে আরো কতো উপায় হত আমার। তাই তো ধার চাইছিলাম। 'তা তো চাইছিস। কিন্তু তুই কি আর এ ধার শুধতে পারবি কখনো ?' পারব না ? কেন বলো তো ? পারব না কেন ? 'আরে, যে ধার করে সে কি আর তা শুধতে পারে ? পারলে তো তাকে আর ধারই করতে হ'ত না রে। ধার করার দরকারই পড়ত না তার—পড়ার আগেই সে রোজগার করে রাখত।' ও বাবা এ যে আমার সেই রোগ হবার আগেই সারাও-থিয়োরির মতই আরেকখানা। 'তা, টাকাটা দিয়ে তুমি আর ফেরত নাই-বা নিলে শরৎদা ? তোমার ঋণ কি শুধবার ? তোমার কাছে না-হয় চিরঋণী হয়েই থাকতাম। তিনি বললেন, না ভাই তা হয় না। আমি কারুর কাছে চির পাওনাদার হয়ে থাকতে চাই না। সেটা আমার ভাল্লাগে না। চল্ তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই, কিন্তু তারা আবার দশ বিশ টাকা ধার দিতে চায় না যে, দুশো পাঁচশো হলে দেয়। নিবি দুশো পাঁচশো ?' নেব না কেন, নিতে বাধা কিসের। পেলে তো ভালোই হয় আরো—কিন্তু অতো টাকা শুধব আমি কি করে ? 'শুধতে হবে না', জানালেন শরৎদা,'তাদের টাকা কখনো শুধতে হয় না, শুধতে পারেও না কেউ, শুধু সুদ দিয়ে গেলেই হয়। শুধতে গেলেই আমার মনে হয়, তারা হয়ত কেঁদেই ফেলবে ভ্যাক করে। তাই নাকি ? 'হ্যাঁ, ওই টাকায় তারা কিনে ফেলল না তোকে ? জন্মের মতন তুই তাদের জমিদারি হয়ে গেলি, তোর থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় করাটাই কাজ দাঁড়ালো তাদের। সে কাজ গেলেই তারা বেকার। তাই সুদ পেলেই তারা খুশী, আর কিছুই চায় না। সেই কাবুলিওলারা। এই বলে সে নিয়ে গেল আমায় সেই কাবুলিওলাদের এক ডেরায়, বউবাজারের কোথায় যেন তাদের আস্তানাটা। তাদের খাতায় সই দিয়ে দেড়শ টাকা ধার করলাম, টেন পারসেন্ট হিসেবে সুদ তার পনের টাকা, সেটা বছরের নয়, মাসে মাসে। প্রথম মাসের সুদের পনেরটাকা প্রথমেই সে উসুল করে নিল—সেটা কেটে নিয়ে বাকীটা দিলো। আর বলে দিল যে, পরের মাসের ঠিক এই তারিখেই ফের এই পনের টাকা যেন তাকে দিয়ে আসি গিয়ে—এমনি মাসের পর মাস পরম্পরায়—তার যেন অন্যথা না হয়। এসব তো বলেইছি আপনাকে গোড়ায়। বলিনি ?'

'হ্যাঁ, তাহলে যে বছরে প্রায় একশো আশী পার্সেন্ট সুদ দাঁড়ায় মশাই।'

'দাঁড়াক না। আমিও দাঁড়ালাম তো তার দৌলতেই। —বছরে সেটা যত পার্সেন্টের ধাক্কাই হোক না, সে সময় যেন আমার কাছে সেটা বিধাতার আশীর্বাদের মতই এসেছিল।' আমি বলি—'তুলনাটা একটু অশোভন হলেও, রবীন্দ্রনাথ যেমন কাবুলিওয়ালার সাহায্যেই সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন...

'অ্যাঁ ?' শুনেই চমকে উঠেছেন জনাব : 'তাঁকেও কি ওই কাবুলির কাছে ধার করতে হতো নাকি ?'

'না না। সে ধার দিয়ে বলছিনে। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটা লিখেই কথাসাহিত্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে না ? এবং পরে—বহুকাল পরেই যদিও—সেই কাবুলিওয়ালার থেকেই সিনেমা জগতেও তাঁর প্রতিষ্ঠা—সেটা রবি আর তপনের যুগপৎ সমুদয়ে যদিও—তেমনি আমারও

যা-কিছু জারিজুরি তা সেই কাবুলিওয়ালার প্রেরণাতেই।'

'তার মানে ? পরিষ্কার করে বলুন।'

'প্রেরণ করো ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে। সে আহ্বান আর কার হতে পারে ? কাবুলিওয়ালা ছাড়া আবার কে? তারই প্রেরণায় আমি পড়ি কি মরি করে গল্প লিখতে বসলাম। মাসের অমুক তারিখে অত টাকার সুদ গুণতেই হবে আমাকে, ছাড়ান ছোড়ন নেই, কী করা যায় তখন বলুন? না লিখে উপায় আছে? তিন টাকা কি পাঁচ সিকে, কিংবা সাড়ে চার বা দশ টাকাই গল্পের দর তখন আমার। রোজ লিখি সকালে দুপুরে রাত্তিরে, রাত জেগেও লিখতে হয়—একেক দিন এমনকি তিনটে করেও ওতরাতে হয়। লেখাগুলো ওতরায় কিনা জানিনে, কিন্তু আমার লেখনীকে ওগরাতে হয়ই। নামকরা কোনো কাগজে লিখি না তখন, নেয়ও না, চায়ও না তারা আমার লেখা। লিখি ছোট ছোট কাগজে—ছোটদের পত্রিকায়—বেঁটেখাটো দক্ষিণায়। তিল কুড়িয়ে তিল পাকাই, কিন্তু পনের টাকার মত লিখতে গেলেই যে সেই আন্দাজে লেখা যাবে তা হয় না, লেখার ঠেলায় লেখা বেড়ে চলে—বাধ্য হয়ে কোনো কোনো মাসে পনেরর জায়গায় পঁচাত্তর উপায় করে বসি। আবার সেই গল্পগুলির জোট পাকিয়ে ছোটখাট বই হয়ে যায় একেকটা। যে কোনো প্রকাশককে যে কোনো দামে দিয়ে দিই—আমার খাসী তখন দ্বিতীয়বার জবাই হয়—মোটমাট অনেকগুলি বই এ করেই বেরিয়ে যায় আমার তখন। আর এমনি করেই, যৎসামান্য যা আমার প্রতিষ্ঠা—সব সেই কাবুলিওয়ালার প্রেরণাতেই। তার কাছে আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। আর চিরঋণী তো বটেই। সুদ আসল কিছুই তার শোধ করতে পারিনি।'

'বেশ করেছেন।'

'মোটেই বেশ করিনি। অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও আমার সেই অবিশ্বস্ততায় প্রাণে সে কতো ব্যথা পেয়েছে কে জানে। কাবুলিওয়ালাও প্রাণে ব্যথা পেতে পারে, তারও প্রাণ আছে, আমার মত প্রাণীই সে। কতো মেয়ের স্নেহের কথা আমি বেমালুম ভুলেছি, কিন্তু কবে কে পাঁচ টাকা ধার নিয়ে দেয়নি, তার শোক এখনো আমার যায়নি—এখনও মনে পড়ে ক্ষণে-ক্ষণে। অন্য শোক ডালেপালে, অর্থশোক ধক্ষস্থলে—বলে না ? ঠিক তাই। নাঃ, অনিচ্ছাকৃত হলেও, কাজটা আমার খুবই গর্হিত হয়েছে। কিন্তু এমনই এই সংসারটা, গর্হিত কিছু না করলে গড়পড়তায় কারও হিত হয় না বোধ হয়।'

'যাই হোক, যে করেই হোক, অসাধ্যাসাধন করেছেন বটে। আমি এটাকে আপনার জীবনের যুগান্তর বলব। কাগজের হকার থেকে কাগজের লেখক হওয়া যুগান্তকারী নয় কি ?'

'হ্যাঁ, তাই। যুগান্তকারীই। কাবুলিওয়ালার সেই দেড়শ টাকা পুঁজি সম্বলে লেখক থেকে আবার সম্পাদক হয়ে যাওয়া—যুগান্তকারী ঘটনাই বটে। আমার জীবনের সেই যুগান্তর-সাধন।'

'সম্পাদক হলেন আবার কী রকম ?'

'তারপরই আমি সম্পাদক হয়ে নব পর্যায়ে যুগান্তর বার করলাম না ?'

'যুগান্তর। সে তো বারীনদাদের কাগজ ছিল বলে জানি।'

'হ্যাঁ, । তাঁদেরই ছিল বটে। অগ্নিযুগের গোড়ায় বারীনদা উপেনদারা মিলে সেটা বের করেছিলেন। তারপর তাঁরা নির্বাসিত হয়ে আন্দামানে চলে গেলেন না ? কাগজখানা

বাজেয়াপ্ত করে নিলেন সরকার। পরে যথাসময়ে আন্দামান থেকে ফিরে এসে তাঁরা বের করলেন সাপ্তাহিক বিজলী—নলিনীকান্ত সরকারের সম্পাদনায়। আর উপেনদা বার করলেন তাঁর নিজস্ব 'আত্মশক্তি'—রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম। আর কবি নজরুল ইসলামের ছিল ধূমকেতু—কবিগুরুর আশীর্বাদধন্য। ধূমকেতুর মাথায় সেই আশীর্বাদ-লিপি লেখা থাকত, দেখেননি ? 'আয় রে আয় ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু/দুর্দিনে এই দুর্গ শিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন। /অলক্ষণের তিলক রেখা/রাতের ভুলে হোক না লেখা/জাগিয়ে দে রে/চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন।'

তারই সমসাময়িক ভুঁইফোড় সাপ্তাহিক আমার এই যুগান্তর—সরকারী বাজেয়াপ্ত হওয়া বারীনদাদের কাগজ জবরদখল করে নেওয়া আমার।'

'জবরদখল করে পাওয়া ?'

'তাছাড়া কী ? উদ্বাস্তুদের মতই প্রায়—এমনিতেই যার সব হারায় সে। সর্বহারারা যা পায় অমনিই পায়, নয় তো জোর করে আদায় করে। ভুঁইফোড় আমি জন্ম-উদ্বাস্তুই তো। আমার জীবনের সব কিছুই জবর দখল করা। কী শিশুসাহিত্যে, কী নাট্য জগতে, কী বড়দের লেখাটেখায়, কিছুই আমার পরিশ্রম নৈপুণ্যে নিজগুণে পাওয়া নয়,সাধনোচিত লাভ নয় কোনটাই, সত্যি বলতে যা পেয়েছি তার কোনটাই আমার পাওনা ছিল না। আমার জীবনের যা-কিছু পেলাম, সবই ওই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতই ? যেমন কিনা, ওই কাবুলিওয়ালাকে পেয়ে যাওয়া— সেই চৌদ্দ আনাই তো ? সে আমায় তার দেয় টাকার থেকে সুদের দু'আনা কেটে চোদ্দ আনা দিলেও, তার থেকে আমি ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা লাভ পিটেছি। কার অযাচিত পৃষ্ঠপোষকতায় কে জানে !'

'কে আবার ? আপনার ঐ মা কালী ছাড়া আর কে ?' ফোড়ন কাটেন জনাব সাহেব—'উনিই তো আপনার পৃষ্ঠপোষক।'

'মাখতে না চাইলেও উনি যেন জোর করে গায়ে মাখিয়ে দেন। কথাটার ঝাল কানে না তুললেও ঝাঁজটা নাকে লাগেই।—হ্যাঁ, নিশ্চয়। সামনে না থাকলেও সবার পিছনেই উনি রয়েছেন—ঐ ভগবান। সবার পিঠোপিঠি।'

'পিঠোপিঠি ?'

'হ্যাঁ, শুধু পার্থের ন্যায় যুগন্ধরদেরই উনি সারথ্য করেন, সামনে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। আমাদের মত লোকদের পিছন থেকে *ঠেলা* মারেন—*ঠেলা* দেন ঠিক পথটিতে। আমাদের তো রথ নেই, রথী নই আমরা—তাই আমাদের ঘাড়েই চেপে রয়েছেন। এই পিঠেই তাঁর পীঠস্থান—সেখান থেকেই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা।'

'তাই পিঠোপিঠি বলতে চাইছেন ?'—তিনি কন : 'মানে, আপনার স্কন্ধপুরাণের পৃষ্ঠায় তিনি রয়েছেন ? মাপ করবেন, কথাটা আপনার কায়দায় বলা হয়ে গেল।'

'তাই বইকি ! মাকে তো কোনো দিনই হৃদয়ে ঠাঁই দিতে পারিনি, না নিজের মাকে না ঐ পরমাকে— কিন্তু মা তো কখনই ছাড়বার পাত্রী নন, নাছোড়বান্দাই। সিন্ধবাদ নাবিকের সেই বৃদ্ধের মতই মাথার ওপর চেপে রয়েছেন—সেখানে বসেই আমার মুন্ডু ঘোরাচ্ছেন-ফেরাচ্ছেন তাঁর অলক্ষ্য নির্দেশে। খালি আমার নন, সবাইকার।'

'মুন্ডুপাত করছেন সকলের ? বলতে চাইছেন ?'

'তাছাড়া কী ? মা'র বাঁ হাতে যে মুন্ডু-ধরা সে কার ? আমারই তো। আমাদেরই।

তাঁর গলা জড়িয়ে যে-মালা করে পরানো সে তো আমরাই—তাঁর ছেলেমেয়েরাই—কণ্ঠলগ্ন গলগ্রহরা যত! বাঁ হাতে তিনি আমাদের মাথা উদ্ধার করছেন, যদিও দক্ষিণ হস্তে তাঁর চতুর্বর্গই। বরমাল্যই। তাঁর সে-বর আগ বাড়িয়ে যে বরণ করে নিতে পারে তারই, কিন্তু ক'জন তা পারে? আর সবাইকে তাই হাতে তুলে তাঁকে দিতে হয়। তাদের ঘাড়ে ধরে তাঁর প্রসাদের পায়েস-পিঠে তিনি হাঁ করিয়ে গিলিয়ে দেন। তা নইলে সেই অক্ষমদের অভুক্ত থাকতে হোত। এই পিঠে দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া—এটা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া আর কী?'

'আপনাকে তাই ওই কাবুলি দাওয়াই দিয়ে গিলোতে হোলো? পথে আনতে হলো বুঝি?'

'না তো কী? মা আমায় কবে বলেছিলেন, স্ববৃত্তিতে যাবি—তাই তোর স্বধর্ম, যা তুই মন থেকে চাস, যেদিকে তোর প্রবৃত্তি—সত্যিকারের ঝোঁক সেই হোলো তোর আসল বৃত্তি—স্ববৃত্তে তুই প্রবৃত্ত হবি—বৃত্তিলাভেই সিদ্ধিলাভ—স্ববৃত্তেই স্বয়ংসিদ্ধি। কিন্তু মা'র কথাটা শুনেছিলাম কী! কী যে আমি চাই! তার খোঁজ করেছি কি কখনো? যার-তার যা-কিছুর পিছনে ছুটে মরেছি—আর পরে টের পেয়েছি যে সেটা আমি চাইনি। কিন্তু তখন সেই কালে মা'র কথা দূরে থাক, মাকেই আমার মনে পড়ত না কখনো। না নিজ মাকে, না পরমাকে। একটু আগেই বললাম না আপনাকে? মা'র সব কথাই মন থেকে ভেসে গিয়েছিল কোনকালে! মা'রই ঠাঁই ছিল না আমার মনে—বলতে কি! যত আজেবাজে মেয়েরাই মনের সবখানি জুড়ে বসেছিল, সুন্দর সুন্দর মুখরাই ফুলের মতন ফুটফুট করত সব সময়—আলপিনের মতও ফুটত আবার! মা'র দিকটায় ছিল ঘুটঘুটে অমাবস্যাই—কিন্তু অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো! সেই তো তোমার আলো! বলে না? সেই অন্ধকারের পৃষ্টপট থেকেই আমার উৎসবের দিন এগিয়ে এল। যুগান্তর ঘটে গেল আমার জীবনে!'

'হকার থেকে রচনাকার—যুগান্তর বইকি!'

'কিন্তু হোতো কি, মা অমন করে ঘাড় ধরে না গিলিয়ে দিলে? কাবুলিওয়ালার ঠেলায় না পড়লে স্ববৃত্তির পথে যেতুম নাকি কোনোদিন? সে-পথ খুঁজেই পেতাম না হয়তো! কাগজ বিক্রির কমিশনে দিলখোসের মটন চপ আর সাধনবাবুর রাবড়ি সাবাড় করেই আত্মসুখী আমার স্বচ্ছন্দে দিন কাটত—কখন-সখনো এক-আধটু এখানে সেখানে লিখে-টিকে। তারই আত্মসন্তোষে কোনরকমে টিকে থাকতাম। লেখাটাকে বৃত্তি করার প্রবৃত্তিই হত না, তার থেকে জীবিকার্জনের ধারণাই করতে পারতাম না—কাবুলিওলার সুদ মেটানোর দায় ঘাড়ে না চাপলে সম্পাদকের কাছে লেখার জন্য টাকা আদায় করার ভাবনাই হত না আমার। আর যাদৃশী ভাবনার্যস্য—ভাবনার থেকে তো সাফল্যের উদ্ভাবনা? মাথায় ভাবনা জাগল বলেই না এটা হোলো!'

'কাবুলি পর্বর আগে আপনি লিখে কোথাও টাকা পাননি? চাননি বুঝি?'

'লেখার জন্যে টাকা দেওয়া নেওয়ার রেওয়াজই ছিল না তখন। এমনকি প্রমথ চৌধুরীও অমনি প্রবন্ধ লিখতেন সেকালে, রবীন্দ্রনাথ কবিতা দিতেন চাইলেই। লেখার জন্য দক্ষিণা—আদানপ্রদানের পত্তন হয়েছিল নজরুলের থেকেই—করেছিলেন পবিত্র গাঙ্গুলি।'

'স্বনামধন্য পবিত্র গাঙ্গুলি?'

'পত্রিকাওলাদের বদ্ধমুষ্টি থেকে তার কবিতায় দক্ষিণা উদ্ধার করে আনতেন ওই পবিত্র

বাবুই—সেই টাকা জেলখানার দরজায় গিয়েও কাজীকে পৌঁছে দিয়েও আসতেন আবার। তার বেলায় পবিত্রর আদায়, আমার বেলা সেই কাবুলিওলার দায়। শৈলজার মতই পবিত্র ছিল কাজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার সব কাজ, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্য আর সাহিত্যসেবীদেরও কাজ সে এগিয়ে দিয়েছিল। আমার বন্ধু বলতে সেই কাবুলিওলাই, আর তো কাউকে দেখতে পাই না। সে-ই আমার কাজ গুছিয়ে দিয়েছে।-তার খেই ধরানোর থেকেই আমার খেয়া-শুরু।'

'কাবুলিওলার প্রেরণাতেই আপনার কলম ধরা তাহলে? প্রেরণা বা ঠেলাতে—যাই বলুন। ঠেলার নাম বাবাজী বলে যে, তা মিছে নয়।'

'আমার বেলায় মাইজী। আমার বেলায় মায়ের ঠেলাই—একটু পরস্মৈপদীভাবে যদিও। দক্ষিণ হস্তের বরাভয় তো নয়, বাঁ হাতের দাক্ষিণ্যই—মাথার টিকি ধরে খড়্গহস্তর টান। যাই হোক, মা'র স্নেহ তো। দু' দিকেই সমান। আমার মা বলেছিলেন নিজের বৃত্তিপথে পা বাড়ালেই সিদ্ধি পাবি তৎক্ষণাৎ। আর সিদ্ধি মানেই তাঁর সাক্ষাৎ। পদে পদে তাঁর পরিচয়, হাতে হাতে তার প্রমাণ। নিজের মুঠোর মধ্যে নগদ নারায়ণ লাভ করতেই টের পেলাম, কথাটা তো মার মিথ্যে নয়। এই লেখাই আমার পথ—এই পথই আমার তো। আস্ত নোটখানা হাতে আসতেই রাস্তা আমার পরিষ্কার হল।'

'প্রথম কোথা থেকে টাকা পান আপনি লেখার জন্য?'

'মৌচাক। মৌচাক ছোটদের মাসিক, সুধীর সরকার সম্পাদক। আমাদের আধুনিক কিশোর সাহিত্যের পথিকৃৎ-তিনিই। নিজে যে খুব বেশি কিছু লিখেছেন তা নয়, যদিও তাঁর লেখার বেশ হাত ছিল—'আমার দেশ, আমার কাল'—বইয়েই তার প্রমাণ আছে, তবে সাহিত্যকৃতির চেয়েও তাঁর বড়ো কৃতিত্ব সাহিত্যিক সৃষ্টিতে—যে-কীর্তির অংশীদার বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম,সাধনার রবীন্দ্রনাথ, সবুজ পত্রের প্রমথ চৌধুরী, প্রবাসীর রামানন্দ, বিচিত্রার উপেন গাঙ্গুলি, কল্লোলের দীনেশ দাশ থেকে শুরু করে সসাগরা ভারতবর্ষের আরো অনেকে—সম্পাদকরূপে সুধীরবাবুও তাঁর স্বক্ষেত্রে সেই রকম এক অগ্রগণ্যই। স্বয়ং সারথি হয় সেকালের অনেক সাহিত্যরথীকে শিশু সাহিত্যের কর্মক্ষেত্রে টেনে এনেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, রাজশেখর, কেদার চাটুজ্যে, বিভূতি বাঁড়ুজ্যে, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে কল্লোল গোষ্ঠীর বড় বড় লিখিয়েদেরও ছোটদের জন্য কলম ধরিয়েছিলেন, প্রায় কেউই বাদ ছিল না। বড়রা লিখতে ধরেছিলেন বলেই আমাদের শিশুসাহিত্য বড় হল। বড়দের লেখা, বড় দরের লেখা পেলে তবেই না দেশের ছেলেমেয়েরা বড় হবে। তাঁর প্রেরণালব্ধ লেকখদের সাহিত্য সৃজনেই সেই সুধীরবাবুরই জয় হয়েছে, আমি মনে করি।'

'সুধীরবাবুর কাছ থেকেই আপনার প্রথম লেখার দক্ষিণালাভ?'

'হ্যাঁ, তাঁর দাক্ষিণ্যই সব প্রথম। তবে সেটাই আমার প্রথম লেখা নয়। তার আগে বিস্তর লিখেছিলাম—বড় বড় কবিতা, মেজ মেজ গল্প, আর মাজাঘষা প্রবন্ধ কম লিখিনি—একাঙ্কিকা নাটক-ফাটক কী না! সে সব লেখা বড় পত্রিকার পৃষ্ঠায় বয়স্কদের পাতে পরিবেষিত। বেরিয়েছিল ভারতী, ভারতবর্ষ, উত্তরা, কল্লোল, বিজলী আর ধূমকেতুতে। সিরিয়াস যত লেখা। কিন্তু তার কোনটার জন্যেই কিছু পাইনি। চাইওনি কোথাও হাত বাড়িয়ে। চাইবার সাহসই হয়নি বলতে কি! লেখা ছাপানোর জন্যই, নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছি, সাধুবাদ দিয়েছি সম্পাদককে। তখন মনের আনন্দে লিখতেন লেখকরা, আর

লেখা ছাপা হলেই কৃতার্থ। তার থেকে কৃত অর্থের কোনো কথাই ছিল না, অর্থমূল্যে রচনা বিক্রীত (কিংবা বিকৃত) করার গরজ ছিল না তাঁদের। সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে লিখে যেতেই এনতার, তারপর বয়স্থা কন্যা পাত্রস্থ করার ন্যায় সেই সব রচনা পত্রস্থ করার একটা দায় ছিল যেন তাঁদের। বুঝতে পারছেন অবস্থাটা ? কাগজে লিখে কিছু উপায় করার কথাটা তখন গজাতই না আমার মগজে....'

'তাহলে ?'

'যদি না কাবুলিওলার আসন্ন তাগাদার কথাটা গজালের মত লেগে থাকত মাথায়—গজগজ করত সব সময়। সেই কথা ভেবেই—তারই গঞ্জনায় আমায় আদায়ের পথে এগুতে হলো। সুধীরবাবু যখন আমায় মৌচাকে লেখার জন্য বললেন, আমি মুখফোঁড় হয়ে চেয়ে বসলুম—টাকা দেবেন তো ?'

'নিশ্চয়। টাকা দেব বইকি ? কতো দাবি বলুন ?' সুদের ধান্দা ছিল আমার মাত্র পনের টাকার—তা-ই আমি চেয়েছিলাম। 'এই নিন আগাম' বলে তক্ষুনি টাকাটা আমার হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন। দিতেই, টাকাটা পেতেই না, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হেসে উঠল তক্ষুনি। সেই হাসিই ক্রমে বন্যার আকার ধরে আমার আগেকার সব লেখাপত্তর ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে হাসির গল্প হয়ে দেখা দিয়েছে তার পরে...বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই, শিশু সাহিত্যেও প্রথম নয় নিশ্চয়, কিন্তু আমার হাতে প্রথম হাসির গল্প সেইটাই।'

'কী ছিল গল্পটা ?'

'একটা ঘোড়ার গল্প। গরীব পঞ্চাননের একটা বেতো ঘোড়া ছিল, খেতে পেত না বেচারা। পেট ভরে খেতে দিতে পারত না, তার ওপর বেদম খাটাত পঞ্চানন। খিদের জ্বালায় ঘোড়াটা ছটফট করত সর্বক্ষণ। কোনীর থেকে শুরু করে টর্চ বাতি, লেপ মশারি যাহা পাইত তাহাই খাইত—পঞ্চানন করল কি দাঁও বুঝে একদিন গাঁয়ের এক মোড়লকে ধরে গছিয়ে দিল ঘোড়াটা। হয়েছিল কি, জেলার হাকিম সেখানকার ডাকবাংলোয় এসেছিলেন সেদিন, আর মাতব্বর লোকটি তাঁর সাক্ষাৎকারে যাচ্ছিলেন। পঞ্চানন তাকে বুঝিয়েছিল, পায়ে হেঁটে হাকিমদর্শনে গেলে কি আর কদর হবে, ঘোড়ায় চেপে গেলে আদর মিলতে পারে। নামমাত্র দামে ঘোড়াটা পেয়ে তাতেই চেপে ডাকবাংলোয় হাজির হলেন ভদ্রলোক। তার ঘোড়াটাকে নিয়ে যাওয়া হলো বাংলোর আস্তাবলে—হাকিম সাহেবের ঘোড়া বাঁধা ছিল যেখানে। সেখানে হাকিমের ঘোড়ার মতই তাকেও বালতি ভরে দানাপানি দেওয়া হল। সেই সব বাদাম ছোলা, আরো কতো কী, খাওয়া দূরে থাক, জীবনে কখনো চোখেও দেখেনি বেচারা। তাই না দেখেই, বালতিতে মুখ ডোবাবে কি, আকাশের দিকে মুখ তুলে হাসতে শুরু করে দিয়েছে সে-চ্যাঁ হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ হ্যাঁ ! ভূরি ভোজে মুখ না ছুঁইয়ে ভূরি ভূরি তার সেই অভ্রভেদী অট্টহাসি। খাবে কি, খাবার দেখেই তার চক্ষুস্থির। সে আত্মহারা। মর্মভেদী হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসতে হাসতেই মারা গেল বেচারা শেষ পর্যন্ত ? এ-ই গল্প।'

'গল্পটার নাম পঞ্চাননের অশ্বমেধ, তাই না ? বইটা পড়েছিলাম যেন কোনকালে। এখন আর পাওয়া যায় না বোধ হয় ?'

'আসলে সেই ঘোড়াটা আর কেউ না, এই আমিই। এই যে ঘোড়েল—আপনার সামনেই। সেই ঘোড়ার হাসি, লিখে প্রথম টাকা পাওয়া আমার সেই গোড়ার হাসিই তারপর আমার

সব গল্পে আমদানি—আমার সব লেখাতেই ছড়িয়ে যাওয়া এখন অবধি। আগাগোড়া একই হাসাহাসির ব্যাপার।'

'মা-কালী বা বাবা কাবুলিওলা—যার প্রেরণাতেই হোক না, প্রেরণা বা ঠেলা যাই বলুন—এই মেলাই গল্প—এত গল্পের মেলা—এ কীর্তিও কিছু কম নয় মশাই। কালী কমলিওলার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু কালী কাবুলিওলার দৌলতে যা কান্ডটা আপনি বাধালেন না!'

'এমন কিছু মহৎ সৃষ্টি নয়, আমি মানব। তেমন কিছু করতে পারিনি জানি আমি। সেটা মা'র দিকের কোনো গলদ নয়, আমার দিকেই বলহীনতা। নয়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, জানেন তো? মহাকালের বৃত্তে, স্বয়ং শিবকে বৃত্ত করে যিনি মুহূর্তে মুহূর্তে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করছেন আমার ন্যায় অক্ষমের সামান্য বৃত্তে এসে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তির পরিধিতে তিনি আর এর বেশি কী করবেন। বৃত্তই তো আধার—যেমন আধার তেমনটি হবার, বলতেন না ঠাকুর? কল্পতরুর কান্ডে যাঁর অসামান্য ফলসম্ভার, সামান্য ঘেঁটুগাছের ডগায় এসে তাঁর তেমনি ধারাই সাফল্য হবে তো। গুল্মকে তো আর বনস্পতি বানানো যায় না। কাঁটা গাছের বাদাড়ে ফুল নয়, কাঁটাই ফুটবার। আমার ভাগ্যে যা জুটেছে তাতেই আমি প্রফুল্ল। মহাকালের বক্ষে যিনি মহাকালী, আমার মতন মাকালদের পক্ষে তিনিই মাকালী।'

॥ আটান্ন ॥

'আমি ভগবান-ফগমান মানি না...'

'আমিও না...'

'ভগবান কিছু করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না। যা কিছু করার মানুষই করছে, মানুষই করবে।...'

'আমারও তাই মত।' আমি প্রকাশ করি—'ভগবান যে মানুষ করে ছেড়ে দিয়েছে সেই ঢের। এখন আমাদের চরে খাওয়া উচিত।'

'মানুষের ব্যাপারে ভগবানের কিছু করণীয় আছে আমার মনে হয় না। মানুষই নিজের ভালোমন্দ সব করছে, আর সে-ই করতে পারে। এ বিষয়ে ভগবানের কোনো হাত নেই।'

'ভগবানও সেই কথাই বলতে চান, আমি মনে করি।'

'ভগবানের মনের কথা টের পান আপনি? তাঁর উক্তিতে বক্তৃতার কটাক্ষ।'

'তা কি করে পাব? কেউ পায় নাকি? পেয়েছে কেউ কখনো? তবে এই আমার মনে হয়। ভগবান নিজেই কি একথা বলে দেননি?'

'কোথায়? গীতায়?' জনাব সাহেবের জিজ্ঞাসা।

'গীতায় কেন? গীতার ভাষ্য ছাড়া তাঁর বক্তব্য কি আর কোথাও প্রকাশ্য হয়নি? সর্বজনবোধ্য ভাষাতেই তিনি কত রকমেই তো সেকথা প্রকাশ করেছেন...'

'কী রকমের ভাষাটা? শুনি তো।'

'কবিসুলভ ভাষায়। ভগবান আসলে কবিই তো। কবি ছাড়া আর কী? আদি কবি আমাদের।'

'এই বিশ্বসৃষ্টি তাঁর কবিতা, এই কথা বলছেন?'

'না না, সে কথা নয়। এটা তাঁর লীলা কি কবিতা তার তত্ত্ব কে জানে। না, সে কথা বলছিনে। কবির একটা অর্থ হচ্ছে স্রষ্টা, অতএব স্বয়ং স্রষ্টাও কবিই। কবি হতে বাধ্য।

অভিধান মতে কবিই। —অর্থাৎ তাই দাঁড়ায়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, সেই আদি কবিও আমাদের আধুনিক কবিদের মতই প্রতীকী ভাষায় কথা কন।'

'যেমন?...'তিনি দৃষ্টান্তর মুখাপেক্ষী।

'যেমন আপনি বললেন না, ভগবানের কোনো ব্যাপারেই কিছু হাত নেই—বললেন না? সাক্ষাৎ জগন্নাথরূপে ঠিক সেই কথাটিই কি তিনি বাতলাননি ঐ প্রতীকী ভাষায়? কিংবা অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে—যাই বলুন।'

'ঐ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে?'

'হাতের দিকে তিনি শূন্য। যেমন হাতে শূন্য তেমনি তিনি শূন্যহস্তই। তাঁর হাতেও কাউকে দেবার কিছু নেই। যা পাবার তা আমাদের অর্জন করে নিতে হবে, উপার্জন করে পেতে হবে। তার কোনো ভুল নেই মশাই। তবে কিনা...'

'তবে কিনা?'

'তবে কিনা সেই শূন্যতার থেকেই সমস্ত আসে, সব কিছু মেলে যে। সেই শূন্য হাতই আমাদের দু-হাত পূর্ণ করে দিতে পারে...দেয়, বুঝি বারে বারে...স্বতোৎসারে। সেই শূন্যের থেকেই আসে পূর্ণতা, শূন্যতা ছেঁকেই সব পাই। তার কাছে কিছু চাইতে হয় না, না চাইতেই পাওয়া যায়। কেন্দ্রবিন্দুর সেই পরম শূন্যের দিকে, মানে কেন্দ্রমূলে মন নিয়ে সেই শূন্যের দিকে উন্মুখ থেকে নিজের পথে এগুলেই পদে পদে পেয়ে যাই, হাতে হাতে মিলে যায় সব।'

'শূন্যের দিকে মন দেয়া যায় কি করে শুনি?' জনাবের জিজ্ঞাসা।

'মনকে শূন্য করেই। শূন্যমনা হয়ে যদি মনোবৃত্তির সাধনায় লাগি, প্রবৃত্তির পথ ধরি, সেই শূন্যচিত্তের থেকেই নিত্য নব অমৃতায়ন। তাঁর সঙ্গে সংযোগই হচ্ছে অমৃত, আর তাঁর হাত ধরে যাওয়াটাই সার্থক যাত্রা।'

'তা না হয় হোলো, কিন্তু তাঁর এইসব প্রতীকী রূপ?...'

'তাঁর প্রকৃতির পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। তাঁর প্রকৃতিরই প্রতিকৃতি। জীবনের দশ দশার বৃত্তে আমাদের সঙ্গে তিনি নিত্য বিদ্যমান। সেই সব বৃত্তিপথে তাঁর যে চেহারা, তাঁর থেকে যা প্রাপ্তিযোগ, সেই কথাই তো দশমহাবিদ্যার রূপে প্রকাশিত। আসলে মা'র এই প্রতীক-কৃতিই প্রতীকের সাহায্যে বলার ধরনটা আমাদের চলার সাহায্যে তাঁর পথনির্দেশ মাত্র।'

'কী পথ? কিসের নির্দেশ?'

'বৃত্তপথ। আমাদের বৃত্তির পথ। তাঁর ঐ প্রতীকী মহাবিদ্যার রূপগুলিকে সেই পথের ম্যাপ বলে ধরতে পারেন। ওগুলি যেমন তাঁর হওয়া তেমনি তাঁর সঙ্গে আমাদেরও হওয়া তো—পরস্পরের সহাবস্থান—কোএকজিসটেন্স্। কোএকজিস্টেনসিয়ালিজমও বলা যায়। পরস্পরের আবহাওয়ায় পরস্পরের সব হওয়া। পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার প্রতীক-কৃতিই মা'র ওই প্রতিকৃতিগুলিতে বিচিত্র বিদ্যমানতার বিভিন্ন বিকাশে প্রকাশিত।'

'তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?'

'বৃন্তের সঙ্গে ফলের যেমনটা। বৃত্তের সঙ্গে বৃত্তির যেমন কিনা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমরা যেমন বৃত্তে যাব, যা বৃত্তি বেছে নেব, তার ফল কী রকমটি হবার, তাঁর বিদ্যারূপের ঐ

প্রতীকী আবৃত্তির দ্বারাই বিশদ করা রয়েছে। সত্যি বলতে, তিনিই তো সব হয়েছেন, সব কিছু করছেন—কিন্তু আমাদের বাদ দিয়ে নয়। আমরাও যা কিছু করছি, তাঁকে বাদ দিয়ে নয়। দেবার উপায় নেই। পরস্পরের মুখাপেক্ষী আমরা। তাঁর হওয়াতেই আমাদের হয়ে যাওয়া, তাঁর হওয়ায় আমাদের বয়ে যাওয়া। তাঁরই বৃত্তপথে আমাদের বৃত্তিরথ চালিয়ে—তাঁর হাত ধরে অবাধে অবলীলায় আমাদের উতরে যাওয়া। সেই উত্তরণ যেমন তাঁর তেমনি আমাদেরও।'

'আপনার বা আপনার মা'র—যাই হোক না, আপনাদের মোদ্দা কথাটা মোটামুটি বুঝলাম। কিন্তু সেকথা নয়, কাগজের হকারির থেকে কি করে সম্পাদকারিতে উতরে এলেন, আপনার কাগজই বা ওতরালো কেমন—সেই কথাটা বল।'

'আমি আর ওতরালাম কোথায়। আমি জীবনের কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারিনি, পাশ না করে সব ক'টারই পাশ কাটিয়েছি। তবে হ্যাঁ, কাগজটা উতরেছিল বেশ। সেটা আমার কোনো বাহাদুরি নয়, তার নাম-মাহাত্ম্য—ঐ যুগান্তর নামটাই।

'নামটা মাথায় এল কী করে শুধোচ্ছেন ? হঠাতের মাথায়। কাগজ ফিরি করতে করতেই মাথার পোকারা নড়ল একদিন—আমার মনে হলো, এই চিনির বলদ হয়ে কী লাভ? চিনির আসল সোয়াদ তো পাচ্ছিনে। পরের ভূতের বোঝা না বয়ে নিজেই যদি কাগজ একখানা বার করি তো কেমন হয়? চিনির মোট বওয়ার চেয়ে চিনি পয়দা করার ফয়দা আরো বেশি হবে নিশ্চয়? আর তার মোট নিজে না হেঁকে ফিরে অন্য ফিরিওলা হকারদের দিয়ে বেচলে মোটামুটি দু-পয়সা উপায় হতে পারে হয়ত।

'কাবুলির সেই একশো পঁয়ত্রিশ টাকার পুঁজি সম্বল করে একশো চৌত্রিশ নম্বর থেকে যুগান্তর বেরুল—আমার ঘরের বিছানাটাই তার কার্যালয়। পরে এই কাগজকে দেশবন্ধুর থেকে বিধান রায় পর্যন্ত অনেকেই অর্থ সাহায্য করেছেন, তবে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি ঐ নামটার কাছেই।'

'হ্যাঁ, তারই কুদরতে প্রথম সংখ্যার পাঁচ হাজার কপি বাজারে পড়তে না পড়তেই উড়ে গেছল। যুগান্তর—নামখানাই অর্ধেক কাজ এগিয়ে রেখেছিল, আর সময়টা ছিল তো অগ্নিগর্ভ। বেরুতে না বেরুতেই আমি বিখ্যাত হয়েছিলাম। রাতারাতি।'

'কাগজের কাজে কৈশোর কালের বন্ধু গিরিজাকে আমার সহযোগী পেয়েছিলাম। জিলা স্কুলের থেকে চাঁচলের ইস্কুলে পড়তে আসার সময় থেকেই ওর সঙ্গে ভাব আমার। এন্ট্রেন্স দিয়ে আমাদের মেসেই এসে উঠেছিল সে, কলেজে ভর্তি হবার আগেটায়। এখন একখানা কাগজ বেরুতে দেখে আপনার থেকেই সে এগিয়ে এল। আর সে-ই নিয়ে এল বীরেন্দ্রকুমার সেনকে যুগান্তরের যুগ্ম-সম্পাদক করে। নামমাত্র সম্পাদক। গিরিজা আমাকে বুঝিয়েছিল যে, বীরেনদা লিখিয়ে বলে বেশ নাম আছে বাজারে, আর খাতির আছে লেখক মহলে ; সম্পাদকের স্থলে তাঁর নামটা আমার সঙ্গে থাকলে কাগজের মর্যাদা হবে। তাই হোলো। গিরিজা হোলো কাগজের প্রিন্টার পাবলিশার। চুটকি লেখারাই আমার সব রচনার চেয়ে (পাঠকের চোখে অন্তত) চটকদার হয়ে বৈতরণী-উত্তরণের আগে পর্যন্ত তরিয়ে দেবে আমায়। ওই চড়াই পাখির পাখায় ভর দিয়েই জীবনের যত চড়াই উৎরাই সব উতরে যাব অবহেলায়, তা আমি ধারণাও করতে পারিনি।

'কী থাকত কাগজে ? যা যা দস্তুর। প্রথম পাতাতেই একটা কবিতা—একটু গরম গরম। তারপরে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় ও সম্পাদকের মন্তব্য, তারপর গল্প-টল্প এক-আধটু, অনেকটা রূপকগর্ভ কথিকা জাতীয়, বিজলীতে উপেনদার ঊনপঞ্চাশীর মত একটু পলিটিক্যাল রসরচনা (উপেনদার লেখা সেকালে আমায় প্রভাবিত করেছে গোড়াতেই বলেছি) আর টুকরো খবরের ওপর টিপ্পনির চুটকি—কলম দুয়েক। এখনকার অল্পবিস্তরের প্রথম ভ্রূণ সেটাই। যখন ভ্রূণাক্ষরে ঐগুলি লিখেছিলাম তখন কি ঘূণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছি, যে, শেষ পর্যন্ত ঐ চুটকি লেখারাই আমার সব রচনার চেয়ে (পাঠকের চোখে অন্তত), চটকদার হয়ে বৈতরণী-উত্তরণের আগে পর্যন্ত তরিয়ে দেবে আমায়। ওই চড়াই পাখির পাখায় ভর দিয়েই জীবনের যত চড়াই উৎরাই সব উৎরে যাব অবহেলায়।

'কে লিখতেন আমাদের যুগান্তরে? যুগান্তকারী কোনো লেখক নয়। কে যাবে তাঁদের কাছে? গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে ভাব জমানোর স্বভাব ছিল না আদৌ, একটু মুখচোরা, সেইহেতুই অমিশুক ছিলাম বোধহয়। তখন লেখার জন্য কোনো স্বনামধন্য লেখককেও টাকা দিতে হত না, একটু সাধাসাধি করলেই হত—কিন্তু সাধ্যসাধনার ধাত ছিল না যে। প্রমথ চৌধুরি সাপ্তাহিক বিজলীতে নিয়মিত বীরবলের চিঠি লিখতেন, তাঁর কাছে গিয়ে চাইলেই হত। লেখক হিসেবে তত দিনে আমি তাঁর কাছেও পরিচিত হয়েছিলাম মনে হয়। একবার বিজলীতে, তাঁর পৃষ্ঠায়, যুগান্তরের আমার চুটকিগুলির তারিফ করে তিনি লিখেওছিলেন। তবু, এমনকি, ধন্যবাদ জানাবার ছলেও তাঁর কাছে যাবার আমার সাহস হয়নি, উৎসাহও বোধ করিনি, কেন জানি না।

'বড় লেখক বলতে আলাপ হয়েছিল শুধু শরৎ চাটুজ্যের সঙ্গে। আর উপেন বাঁড়ুজ্যে—আমাদের উপেনদা তো ছিলেনই। এই দুজনাই কেবল—তখন পর্যন্ত।

শরৎচন্দ্রের কাছে নিয়ে গেছলেন আমায় তারকদা। তাঁর লেখা একটা উপন্যাসের প্রকাশক পাবার দরবারে। ভূমিকার মতন দু-ছত্র লিখে দিলে প্রকাশক মহলে যদি লেখাটার দর বাড়ে। পড়ে দেখবেন, তারপরে লিখবেন বলে পাণ্ডুলিপিটা তিনি রেখে দিলেন। বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের শুধু স্নেহ নয়, অন্তরের টানও ছিল মনে হয়।

'শরৎচন্দ্রের সম্মুখীন হতে আমি ভয় খাইনি, স্বাভাবিক আকর্ষণেই গেছি। শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লেই তাঁকে কেমন দরদী আপনজন বলে মনে হয় না? যেমন তার রচনার পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে তেমনি যেন তাঁর পাঠকদের সঙ্গেও তিনি একাত্ম হয়ে যেতেন—তাঁর ঐকান্তিকতা সংক্রামকই ছিল। তাঁর লেখার আয়নায় পাত্রপাত্রীদের মনস্তত্ত্বমোচনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলনে তাঁর নিজের মনটিও ধরে দিতেন যেন, সেই লেখার সংস্পর্শে এলে, তাঁর মনের স্পর্শ পেলে পাঠকপাঠিকারা তাঁর আপনার হয়ে যেত নিজের অগোচরেই কেমন করে যেন। তাঁকে নিজের একান্ত বলেই মনে করত তখন। সহজভাবে তাঁর সঙ্গে মেশার কোনো বাধা থাকত না আর।

'আর তিনিও মিশতে পারতেন সহজভাবেই। সাহিত্যিক-সুলভ কোনো ব্যবধান না রেখেই। বড় কঠিন সাধনা যার বড় সহজ সুর। খুব কঠিন জীবনসাধনার জন্যই শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনে অত সহজ হতে পেরেছিলেন আমার মনে হয়। কেবল অভ্রভেদী লেখক বলেই নয়, সাধারণ স্তরের মানুষদের সঙ্গে অত সাধারণের মতই মিশতে পারতেন বলেই তিনি অসাধারণ।'

'আর, তেমনি আশ্চর্য মানুষ ছিলেন উপেনদা। কলমের আঁচড়ে যেমনটি, ব্যবহারে

আচরণেও ঠিক তেমনিই—যত সহজ ততই যেন গভীর। তাঁর লেখার মতই তিনিও অবিকল—মিলিয়ে দেখা যেত। বিজলীর পাতায় তাঁর ঊনপঞ্চাশীর যে হাওয়া তিনি বইয়ে দিয়েছেন, সেই আবহাওয়াতেই সত্যি বলতে শুধু আমি কেন, অনেকেই তখন বয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গ রচনায় হালকা চালে গভীর কথা বলার যে ধারাটি তিনি সূত্রপাত করেছিলেন, সেখানে শুধু তিনি অগ্রগণ্যই নন, অনন্য আজও।

'গিরিজা কিন্তু এর মধ্যেই অনেকের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল বেশ। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, বিধান রায়, শরৎ বোস—এহেন উচ্চস্তরের মানুষদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারলেও মাঝামাঝি এলাকায় আমি যেন বেখাপ্পাই ছিলাম—সেখানে আমার কোনো পাত্তা ছিল না। উচ্চলোকের পরেই মিশবার পাত্ররা আমার তুচ্ছলোকে—পাড়ার যত ছোট লোক (তারা তা না হলেও তাই বলে আমরা ভাবি যাদের) আর ছোট ছোট বালকরা। তাদের সঙ্গই আমার মিষ্টি লাগত—আর তাদের সঙ্গেই মিশ খেতাম সহজে।

'মধ্যবর্তী স্তরের স্কলারলি উন্নাসিক'পণ্ডিতম্মন্যদের কাছে খাতির ছিল গিরিজার। তাঁদের সঙ্গে উচ্চমার্গের আলোচনা বিতর্কে উৎসাহিত ছিল সে, যেটা আমি সতর্কভাবে সবসময়ই এড়িয়ে চলতাম। হয়ত, তাবচ্চ শোভতে...হিসেব করেই নিজের শোভা বজায় রাখতে চাইতাম ঐভাবে।'

'কিংবা উত্তম পুরুষ হিসেবে (নিজের ধারণায় নয়, ব্যাকরণ মতে) শুধু পুরুষোত্তমদের সঙ্গে যা একটু খাপ খেত আমার—মধ্যপদস্থরা মধ্যপদী সমাসের মতই একেবারে লুপ্ত ছিল আমার কাছে। আর, তাঁদের কাছে আমি যেন ছিলামই না। উচ্চরা আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেননি, হয়ত তাঁদের সমুচ্চ মহানুভবতায়, কিন্তু মধ্যবর্তীরা সর্বদাই আমায় এড়িয়ে চলেছেন। কারণ বোধ হয়, উত্তম নির্ভয়ে চলে অধমের সাথে। তিনিই মধ্যম যিনি থাকেন তফাতে। মাঝারিদের বাজারে এই অধমের কোনো কদরই ছিল না।'

॥ উনষাট ॥

তখনকার দিনে কাগজ বের করা এমন কিছু শক্ত ছিল না। চাইলেই ডিক্লেয়ারেশন মিলত, হিল্লি-দিল্লি দৌড়-ঝাঁপের মুশকিল ছিল না এখনকার মত। কাগজ ছিল সস্তা, কম পাউন্ডেজের ডবোল ডিমাইয়ের রীম বোধকরি দশ টাকাতেই পাওয়া যেত, ছাপাই খরচাও ছিল প্রায় তেমনই।

দশ টাকায় ফর্মা। ডবোল ডিমাই আট পাতার কাগজ পাঁচ হাজার ছাপতে পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশি পড়ত না। কাগজের দামও প্রায় তাই।

কাগজটা কিনতে হত নগদ। প্রিন্টিং বাবদ যা দেবার কাগজ বেচে দিলেই চলত। যেখানে বিজলী, আত্মশক্তি প্রভৃতি ছাপা হত, বউবাজারে সেই চেরী প্রেসেই আমরা ছাপাতাম।

ছাপাখানাটা ছিল পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহের। এমনিই পড়েছিল নাকি, বারীনদারা আন্দামানের থেকে ফিরে এসে কাগজ বার করতে চাইলে অরুণবাবুরা অমনিই সেটা তাঁদের ছেড়ে দেন—ব্যবহারের জন্য।

ছাপাখানাটা চালাতেন ঋষিদা—ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল—আন্দামান-ফেরত তিনিও। যেমন নামে, তেমনি চেহারায়, তেমনি কিনা আচারে আচরণে প্রায় ঋষিতুল্য, তিনি অনেক সুযোগ-সুবিধে দিতেন আমাদের।

আর সুবিধে পেয়েছি শ্রীপাতিরামের কাছে। বিখ্যাত পত্রিকাদের সুবিখ্যাত এজেন্ট—বেচবার

আগেই সাতষট্টি পারসেন্ট দাম দিয়ে দিত নগদ আর কাগজও বেচে দিত অবলীলায়। শিবরামের কাগজ পাতিরাম কাটাতেন। পোকারা কাটবার ফুরসত পেত না।

এক আনা করে দাম ছিল একখানার। শতকরা তেত্রিশের কমিশন বাদেও প্রায় দু'শ টাকার মতন উপায় হত হপ্তায়। তার একশ টাকাই নেট লাভ।

'কী করতেন টাকাটায়?' জনাব সাহেবের জিজ্ঞাসা।

'পরের হপ্তায় ছাপা কাগজের দামটাম মজুদ রাখতাম।...'

'আর বাকী টাকার কী গতি করতেন? কী হতো?'

'আমার গর্ভে যেত। খেয়েদেয়ে ফুঁকে দিতাম সব। গিরিজা কিছু নিত বোধ হয়। আর কাউকে বিশেষ কিছু দিতে হত না।'

'রাজেন মল্লিকের লঙ্গরখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন নাকি?'

'বাসাতেই খানা পাকত যে তখন। তদ্দিনে মেস আমাদের জমজমাট। তারকদা তাঁর চেনাজানাদের নিয়ে এসে বাসাটা চালু করে দিয়েছিলেন—তিনি নিজেও মাঝে মাঝে এসে থাকতেন তো। যদ্দিন ইচ্ছে খুশি মতন। সেকালে বাসা-খরচাও বিশেষ কিছু পড়ত না। সস্তার বাজার ছিল তো তখন।'

'তেমন নামকরা কেউ ছিল আপনাদের বাসায়?'

'তখন বিনামা, পরে তাঁদের কেউ কেউ বেশ নাম করেছেন বইকি। তখনই খুব নামকরা দুজনা ছিলেন অবশ্যি—

একজন বিখ্যাত ধ্রুপদ-গাইয়ে ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এখন স্বর্গত), অপরজন নামজাদা খেলোয়াড় সূর্য চক্রবর্তী—ইস্টবেঙ্গলে খেলতেন সেকালে—তাঁরা দু'জন আমার দু'পাশের ঘরে থাকতেন আর থাকতেন সতীশচন্দ্র সরকার, বগুড়ার কংগ্রেসী নেতা, কর্পোরেশন না কোথায় কাজ করতেন যেন। আর ছিলেন প্রসিদ্ধ গবেষক প্রাবন্ধিক বাংলার বাউলের লেখক উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য—তখন তিনি বিদ্যাসাগরের ছাত্র। আর থাকতেন স্বর্গত তারানাথ রায়। প্রাক্তন বিপ্লবী। পরে ইনি নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। তার পরে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে। উপন্যাস ইত্যাদি লিখেছেন।

বীরেন্দ্রকুমার সেন থাকতেন, আগেই বলেছি। তাঁর মা বিরজাসুন্দরী দেবীও মাঝে মাঝে এসে থেকেছেন ছেলের কাছে—সেই সূত্রে নজরুলেরও যাতাযাত ছিল। বীরেনদার বোনের সঙ্গেই পরে নজরুলের বিয়ে হয়েছিল। সে তো এখন ইতিহাস—সবার জানার কথা। ছান্দসিক প্রবোধ সেনও একবার এসেছিলেন মনে হয়, দু'একদিন থেকেছিলেন আমাদের বাসায়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের উপরে প্রবন্ধ লিখে তখনই উনি বেশ নাম করেছেন। গিরিজা ছিল তাঁর বন্ধু, তার আমন্ত্রণেই তিনি এসেছিলেন। দু'জনের ভেতর লম্বা লম্বা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলত। —সেগুলি চিঠি কি গল্প কি বিতর্কমূলক গবেষণা আমি জানি না। প্রবোধবাবু যুগান্তরে লিখেছিলেন কিনা মনে পড়ে না। তখনই তাঁর লেখার বেশ কদর হয়েছিল, প্রবাসীতে লিখে টাকা পেতেন তখনই। তাই আমাদের কাগজে বেগার লিখতে যাবেন বলে মনে হয় না।'

'নজরুলের ধূমকেতু কি তখনকার কাগজ না? কেমন চলত ধূমকেতু?'

'দারুণ। বিশ পঁচিশ হাজার কপি বিকিয়ে যেত বাজারে পড়তে না পড়তেই। সময়ের মতন কাগজটাও ছিল গরম। সে সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঐ ধূমকেতু—সবার চেয়ে বেশি চাহিদা ছিল তার। তাছাড়া, বারীনদা নলিনীদাদের বিজলী, উপেনদার আত্মশক্তি, আর

'শঙ্খ' বলেও একটা যেন কাগজ বেরুত তখন, কাদের জানি না। সমসাময়িক সাপ্তাহিক সব। সাপ্তাহিক পত্রের যেন জোয়ার এসেছিল সে-সময়টায়।'

'সেই জোয়ারেই আপনারা গা ভাসিয়েছিলেন সবাই?'

'আমার বেলায় অনেকটা তাই, আপনি বলতে পারেন। নজরুলের বেলা তা নয়, ওর একটা মিশন ছিল না? বিপ্লববার্তা ঘোষণার? সে যেমন কবি তেমনি এক যুগন্ধর নেতাও যে আবার। আর, বিজলী ছিল এক অভিজাত পত্রিকা। বীরবল, পণ্ডিচেরির নলিনী গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ জাতলিখিয়েরা লিখতেন তাতে। নলিনীদার দারুণ খাতির ছিল সাহিত্য সমাজে—এমন চমৎকার হাসির গান গাইতেন তিনি, আবার বানাতেও পারতেন তিনি। দাঠাকুরের (শরৎ পণ্ডিতমশাই 'কলকাতার ভুলে ভরা' গানখানা তাঁর গলার থেকে তো চালু হয়ে যায়। রবীন্দ্রজয়ন্তীর কালে অমল হোমকে নিয়ে তাঁর রচিত গানটাও বাজার মাত করেছিল। চমৎকার গানখানা, কিন্তু তার এক লাইনও আমার মনে নেই—যা আমার বিস্মৃতিশক্তি না!'

'ধূমকেতুর সঙ্গে আপনার যুগান্তরের তফাতটা ছিল কোথায়?'

'নজরুলের লেখায় খোলাখুলি রাজদ্রোহের কথা থাকত। বিপ্লবের প্রেরণায় ভরা। তবে কবি তো সে, উপমা-ইঙ্গিতের আড়ালে তার বক্তব্যটা প্রকাশ পেত স্বভাবতই। আইনের প্যাঁচে তার নাগাল পাওয়া সহজ ছিল না। যেমন ধরুন না—ধূমকেতুতে বেরুনো 'দুঃশাসনের রক্ত চাই' বলে বিখ্যাত কবিতাটা। বলরে বন্য হিংস্র বীর/দুঃশাসনের চাই রুধির/চাই রুধির রক্ত চাই/ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই/দুঃশাসনের রক্ত চাই/দুঃশাসনের রক্ত চাই/ওরে, এ যে সেই দুঃশাসন/দিলো শত বীরে নির্বাসন/কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত/করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাৎ/মা বোনেদের হরেছে লাজ/দিনের আলোকে এই পিশাচ/বুক ফেটে চোখে জল আসে/তারে ক্ষমা করা ভীরুতা সে/হিংসাশী মোরা মাংসাশী/ভণ্ডামি ভালো বাসাবাসি। এমনি পড়লে মনে হবে যে মহাভারতের উল্লেখ-কাহিনী, কিন্তু আসল অর্থটা কী, পাঠকের তা বোঝার কিছু বাকী থাকবে না। বাংলার উদ্ধত যৌবন তখন কাজীর কবিতায় উন্মত্ত হয়েছিল। কিন্তু এহেন অর্থের দ্বিত্ব থাকা সত্ত্বেও সরকারের দ্বিধা বেশিদিন থাকেনি। আইনের পাকে অচিরেই পড়তে হয়েছিল নজরুলকে। জেল হয়েছিল দু'বছরের জন্য। কারাবরণের আগে আদালতে তার আত্মসমর্থনে যে কবুলতি সে দেয়, সেই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' অবিস্মরণীয় এক দলিল।'

'আপনার যুগান্তরের প্রেরণাটা কী ছিল?'

'রাজদ্রোহ নয় ঠিক। সমাজদ্রোহ বলা হয়ত যায়। আমাদের কালের সমাজ-ব্যবস্থায় যে সব অবিচার অনাচার অত্যাচার মনে প্রচণ্ড নাড়া দিত, তার বিরুদ্ধেই আমি কলম ধরেছিলাম। ইংরাজের শাসন আমায় তেমন পীড়িত করেনি, যাকে বলে Social injustice সেই সব—যেমন অব্রাহ্মণদের ওপরে বামুনদের অত্যাচার, প্রজাদের ওপরে জমিদারের শোষণপেষণ—এই সবেই আমি বেশি অভিভূত হয়েছিলাম। সমাজবাদের ধুমধাড়াক্কা তখনো তেমনটা পড়েনি, সোভিয়েট মুল্লুকে সমাজতন্ত্র পত্তনের নামগন্ধ বাতাসে ভাসছিল, ঘুনাক্ষরের বার্তায় আসছিল—শুধু তারই সুদূর হাতছানি কাউকে কাউকে যেন কেমন উন্মনা করছে সে সময়। যার আবহে মনে হয়, প্রেমেন লিখেছিল, আমি কবি যত

কামারের/কুমোরের/যত ছুতোরের আর ইতরের/ইত্যাদি (মিস-কোটেশন হয়ে গেল হয়ত বা! যে মেমারি!) প্রত্যাসন্ন যুগের সেই সম্ভাবনার আবছায়াতেই আমার সে সময়ের লেখা যত না। পরে সেই সব ভাব-ভাবনাই ফলাও করে প্রবন্ধাকারে আমি ফলিয়েছি তারানাথ রায় সম্পাদিত নবশক্তির পাতায়—যা পরে আমার মস্কো বনাম পন্ডিচেরি আর ফানুসফাটাই—এই দুই নিবন্ধ বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কাজীকেও এই পথে আসতে হয়েছিল শেষপর্যন্ত—তার 'সাম্যের গান' কবিতায় যার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। তবে কাজী ছিল আসলে জন্মবিদ্রোহী—তার সেই সর্বপ্রথম কবিতার মতই কায়মনোবাক্যে সর্বদাই বিদ্রোহী সে। এমন কি তার ফাউন্টেন পেনের কালিও ছিল লাল। 'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা/ তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা/তার কোন কবিতার কোথায় যেন আছে না?'

'তা যুগান্তর পত্রিকাটির থেকে বেশ উপায় হয়েছিল আপনার? তাই না?'

'তা হয়েছিল। কাগজ বিক্রির ফলে তলার থেকেও যেমন কুড়িয়েছি, তেমনি ওপর থেকে পাড়বারও কোনো কসুর ছিল না আমার। দেশবন্ধু, বিধানচন্দ্র, শরৎবোস, লিবারেল পার্টির নায়ক যতীন্দ্রনাথ বসু—সবাই লিব্যারলি সাহায্য করেছেন আমায়। এমন কি, কাগজখানা উঠে যাবার অনেকদিন বাদেও বেশ দু'পয়সা দিয়ে গেছে আমাকে।'

'কেমনতর?'

'কাগজখানার নাম বেচেই মোটা টাকা উপায় করেছি একবার। তুষারকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার বাদেও তাঁদের সংস্থার থেকে একখানা বাংলা দৈনিক বার করার ইচ্ছে করেছিলেন-' আমি বিবৃত করিঃ

'সেই সূত্রেই আমার এই সংস্থানটা হোলো। তিনি পত্রিকাটার যুতসই একটা নাম খুঁজছিলেন। যুগান্তর নামটা সেদিক থেকে বেশ মজবুতসই মনে হোলো তাঁর। কিন্তু বাধা এল আদালতের। আগেকার প্রিন্টার পাবলিশার ছাড়ান না দিলে নয়া ডিক্লেয়ারেশন পাবার উপায় ছিল না। আর, কাগজটার শেষ প্রিন্টার, পাবলিশার, এমন কি সম্পাদকও আমিই ছিলাম একমাত্র। আমার বন্ধু ভবানী মুখোপাধ্যায়ের কাছে খবর পেয়ে, (পরে জেনেছি) তুষারবাবুর দূত আমার বাসায় আবির্ভূত হলেন একদিন—নগদ পাঁচশো টাকা হাতে নিয়ে। আমার ঐ নামমাত্র বিনিময়ের বাবদেই ঐ টাকাটা আগাম। পরে যেদিন আদালতে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে যুগান্তরের নামগন্ধ ছাড়লাম (তার পরে দিগ্বিদিকে ছড়ালামও বলা যায়—দৈনন্দিন। পরস্মৈপদী ভাবেই যদিও) সেদিনও আরো পাঁচশ এসে গেল নগদ।'

'বলেন কী?'

'এই সূত্রে তুষারবাবুর দর্শনও পেয়েছিলাম সেই কালে। তিনিও একদিন এসেছিলেন আমার বাসায় সেই উপলক্ষেই। আমি তখন বিছানায় বসে—না, প্রাতরাশ নয়, মধ্যাহ্নের আশ মেটাচ্ছি। চামচেয় করে রাবড়িচূর্ণ খাচ্ছি তখন। চার চামচ নেসপ্রে-র গুঁড়ো দুধের সঙ্গে এক চামচ চিনি মিশিয়ে যা একখান হয় না! ভীম নাগের সন্দেশকেও ছাড়িয়ে যায়। জিভের থেকে টাক্‌রা পর্যন্ত—সেই মিষ্টির অণুপরমাণু ওতপ্রোত হয়ে ছড়িয়ে থাকে—সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বানিয়ে একদিন খেয়ে দেখবেন না?'

'তুষারবাবু পা দিলেন আপনার আস্তানায়?'

'আস্তাকুড়ও বলা যায়। দেখেছেন তো সেই ঘরজোড়া জঞ্জাল? সেই আঁস্তাকুড়ে আস্ত এই কুড়ের সামনাসামনি বসলেন আমার বিছানায়। বিছানা ছাড়া বসার কোনো জায়গা তো

নেই ঘরে, দেখেননি কি? বসেই তাঁর জিজ্ঞাসা—কী খাচ্ছেন? আজ্ঞে রাবড়িচূর্ণ। গুঁড়ো দুধ চিনি একাধারে মিশিয়ে—খাবেন একটু? তিনি মাথা নাড়লেন। রাজী হলেন না চাখতে। প্রায় হিমালয়তুল্য ব্যক্তিত্ব বলেই হয়ত তাঁর তুষার গলাতে পারিনি। তুষারবাবুর গলা দিয়ে তলাতে পারিনি ঐ জিনিস। খাননি তিনি।'

'কী বলে তাঁকে ওই অখাদ্য অফার করলেন বলুন তো?'

'আমিও তাই ভাবি এখন। ভেবে অবাক হই। অবশ্যি, ইতুদের কাছে রাবড়িচূর্ণের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তাঁর কাছে সে ব্যাখ্যান দিতে সাহসী হইনি। —'বুঝলি না ইতু? সের পাঁচেক রাবড়ি কিনে আনি, পাঁচখানা থালায় ছড়িয়ে রোদে শুকোতে দিই—ঠিক আমসত্ত্বর মতই। তারপর সেই রাবড়ি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে হামানদিস্তায় তাই গুঁড়ো করে না, বোতলে ভরে রেখেছি। ইচ্ছে হলেই খাই, খাওয়াই।' তারা অবিশ্বাস ভরে শুনলেও খেয়ে কিন্তু হতবাক্। সত্যি শিব্রামদা, রাবড়ির মতই টেস্ট তো বটে। এমন কি তার চেয়েও খাসা। আমার ভাগনে-ভাগনি, পাড়ার ছেলেমেয়েদের যেই না খেয়েছে তারই দৃঢ় প্রত্যয়, ওই পদ্ধতিতে প্রস্তুত ওটা আসল রাবড়িচূর্ণই।'

'কিন্তু ঐ রাবড়িচূর্ণ তুষারবাবুকে...তাঁকে ছেলেমানুষের মতই বিবেচনা করে... আপনার স্পর্ধা তো কম নয় মশাই।'

'কী জানি, ওঁকে দেখে কেমন যেন আমার ছেলেমানুষ বলেই বোধ হয়েছিল—শিশুর মত সহজ সরল মনে হয় না তাঁকে? শিশুসুলভ একটা আমেজ যেন তাঁর মেজাজের সঙ্গে মাখানো। প্রথম দর্শনের সেই ধারণা তার পরেও তেমনটা টলেনি আমার। সুধীরবাবু বেঁচে থাকতে মৌচাকের আসরে মাঝে মাঝেই তিনি আসতেন তো, অচিন্ত্য, ভবানী, প্রবোধ, প্রেমেন, অনেকেই যেত যেমন, আর তাঁর মুখে কত গল্পও সেখানে বসে শোনা। এমন রসিয়ে গল্প করতে পারেন উনি! তাঁর তুল্য মজলিসী আরেকজনকেই সেই আড্ডায় দেখেছি, প্রবাসীর সম্পাদক কেদার চাটুজ্যেকে। তুষারবাবুর সেই সব বিচিত্র কাহিনীই পরে আরও বিচিত্র কাহিনী হয়ে বই আকারে বেরিয়েছে এখন। আসলে তুষারবাবুর সে-সব বই কিশোরপাঠ্যই। তাছাড়া, তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'তাছাড়া, সেই প্রথম দর্শনের দিনই আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আমার ছেলেদের লেখার তিনি নিয়মিত পাঠক। আমার ওই সব লেখাই ভালো লাগে তাঁর। আমার অনেক ছোটদের বই তিনি কিনেছেনও নাকি। এমন কি, মৌচাকের পৃষ্ঠায় আমার সব প্রথমের—ঘোড়ার বেগুনি খাওয়ার গল্পটাও—তিনি হুবহু শুনিয়ে দিলেন আমাকে। আরো জানালেন যে তিনি ওই ছোটদের বই পড়তেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। স্বাভাবিক কৈশোরের একটা সৌরভ তাঁর দেহমনে যেন উচ্ছ্বসিত, তাই তাঁকে বালক জ্ঞান করে তদ্রূপ আচরণ করা স্বভাবতই সহজ হয়েছিল আমার পক্ষে। তাহলেও, আপনি যা বললেন না, এখন সেটা ভাবতে গেলে বিস্ময় লাগে বইকি। মাহাত্মা শিশিরকুমারের বংশধর, তুষারবাবুর নিজের মহাত্ম্যও কিছু কম নয়, তাঁকে ওই রাবড়িচূর্ণের আতিথ্যে আপ্যায়িত করতে যাওয়া স্পর্ধার চূড়ান্তই বটে। কিন্তু আমার স্বভাবসিদ্ধ যে হঠকারিতায় অগ্নিযুগের যুগান্তরকে আমার ভগ্নিযুগে আমদানি করেছিলাম, ওটাও সেই যুগান্তকারী হঠকারিতারই আর এক নিদর্শন। হঠতার যত কারুকার্য আমার জীবনে প্রতি পদেই—প্রতি পাদেই।

॥ ষাট ॥

আমার বিষয়কর্মের খবরটা বিস্তারিত হবার পরে সুরেশদার সঙ্গে দেখা একদিন দৈবাৎ দর্শনমাত্রই তিনি বলেছেন—'তুই আমাদের কেন বললি না ? আমাদের কাছে এলি না কে তুই ? আমরা তোকে দু'হাজার টাকা দিতাম ঐ যুগান্তরের জন্যে।'

'আমি জানব কি করে যে, আপনারাও চান।' শুনে তো আমি অবাক ; 'ঘুণাক্ষরেও কে জানায়নি আমায়। কিন্তু আপনাদের তো আনন্দবাজারই রয়েছে, এমন একখানা কাগজে ওপর আরেকখানা দৈনিক বার করতেন নাকি আপনারা ?'

'না। তা করতুম না। নামটা চেপে রাখতুম কেবল। ওই নামের কাগজ অন্য কাউকে বার করতে দিতুম না।'

তাতে কার কী লাভ হতো যে, তার রহস্য আমার অবিদিত থেকে যায়। অবশ্যি, আমা লাভটা ছিল সেন্ট পারসেন্ট—উপরি আরো হাজার টাকার উপায় হত। কিন্তু সেই ক্ষতি হেতু কোনো ক্ষোভ ছিল না আমার—নগদ যা পেয়েছি সেই আমার ঢের—যে-দাঁওট মারতে পারতাম, কিন্তু পারিনি, ফসকে গেছে, তার প্রতি কোনো লোভ ছিল না আমার

বরং আমার মনে হয়েছে অপরের পরিচালনায় চালু হলেও ঐতিহাসিক ওই নামটা তে বেঁচে রইল, সেইটেই যেন বড় কথা। এই সূত্রে অনেক সাংবাদিক আর অসাংবাদিক কর্ম করে খাবেন (কিংবা আমার বন্ধু স্বর্গত জ্যোতির্ময় রায়ের ভাষায় 'না খেয়ে করবেন'—যা হোক না !) তখনকার সাংবাদিকদের জীবন এখনকার মত এমন স্বচ্ছল ছিল না, ছি সংগ্রামী : বিদেশী শাসকদের সঙ্গে অনবরত সংঘর্ষের, অনিবার্য রাজদণ্ডের, ত্যাগব্রতী জীবনা-দর্শের : স্বাধীনতার জন্যে যোদ্ধৃবাহিনীর প্রথম সারিতে তাঁরা।

অগ্নিযুগের যুগান্তর অনেক ফাঁড়া কাটিয়ে লগ্নিযুগে এসে খাড়া হল শেষটায়—রূপান্তর লাভ করে আলাদা চেহারায়। ভেসটেড্ ইন্টারেস্টের চক্রে পড়ে একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে দাঁড়াল। এই দাস ক্যাপিটালের যুগে ক্যাপিটালের দাস না হয়ে কোন আদর্শই নিছক নিজের জোরে কখনো টেকসই হতে পারে না। সেবা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ও সংস্কৃতি সংস্থা সব, এমন কি নামজাদা সঙ্ঘ আর আশ্রমগুলিও যত না ! কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়েই কায়েম হয় শেষ পর্যন্ত। এবাস্য পরমাগতি—অর্থের আগতিটাই পরম। অর্থ না থাকলে কোন কিছুরই যেন কোন অর্থ হয় না।

'যুগান্তর তো গেল, কী করবি এবার ?' শুধালেন সুরেশদা।

এখানে বলা দরকার, আমার যুগান্তরে একটা লেখার জন্য রাজদ্রোহের দায়ে জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর, ঠিক পরম্পরায় না হলেও মাঝে মাঝে আমার কাগজখানা বেরুতই। হাতে কিছু পুঁজি এলে এবং নিজের কিছু লেখা পুঞ্জীভূত হলে তার দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কাগজটা বার করে বসতাম—হুজুগের মুখেই অনেকটা। যুগান্তর তখন প্রায় হুজুগান্তর উঠেছিল।

'যা হয় করা যাবে।' আমি জানাই। —'কিছু না করলে কী হয় সুরেশদা ?'

সত্যি, কিছু যে করতেই হবে তার কী মানে আছে ? কোনো কিছু না করেও অনেক কিছু হয়ে যায় আমি দেখেছি। আমার জন্যে পরের যতই দুশ্চিন্তা থাক না, আমার নিজের

কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কোনোদিনই নয়। অনিশ্চয়তার মধ্যেই চিরদিনের নিশ্চিত আশ্রয় ছিল যেন আমার।

'তুই আমাদের আনন্দবাজারে চলে আয় না? আমরা একটা সাপ্তাহিকও বার করব ভেবেছি। তোর তো কলমের জোর আছে বেশ।' সুরেশদা বলেন।

'অনুবাদের হাতও মন্দ নয়।' প্রফুল্লদা সায় দেন তাঁর কথায়: 'সংবাদ-অনুবাদও করানো যায় ওঁকে দিয়ে।'

যুগান্তকর বাণিজ্যের কালে তুষারবাবুর কাছ থেকেও অনুরূপ আহ্বান এসেছিল। দৈনিক পত্রটার সম্পাদকরূপে আমরা বিবেকানন্দবাবুকে ঠিক করেছি। আনন্দবাজার ছেড়ে দিয়ে তিনি আসছেন। আপনিও আসুন না কেন তাঁর সহকারী হয়ে?...' বলেছিলেন তিনি।

কিন্তু দু'জায়গাতেই আমি ঘাড় নেড়েছিলাম। স্থায়িত্বের পথে দায়িত্বের পথে এগুবার কোথায় যেন বাধা ছিল আমার। অন্তরগত অনীহায় কোনো ভার বহনের ধার ঘেঁষে যেতে চাইনি কোনোদিনই।

'আহা, যদি যেতেন, কতো সুখে থাকতেন না আজ। স্ত্রী-পুত্র পরিবার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর, বাঁড়ি গাড়ি মোটর সোফা-সেট নিয়ে সুখের সংসারে বিরাজ করতেন কেমন!'

সুখের সংসার! আমি সেটা মনে করি না। আসলে সুখ হচ্ছে মনের। বিষপানে নীলকন্ঠের সুখ। বিষয় বিশষে জর্জরিত হয়ে সংসারীর। বিবিধ আধিব্যাধি পীড়িত হয়ে পরের সহানুভূতি লাভে কেউ সুখী, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির নির্ঝঞ্ঝাট স্ব-ভাবে সুখ কারো। নিজের লাভ খতিয়ে হিসেবী মানুষ সুখ পায়, পরের ক্ষতি করে আনন্দ হয় কারো আবার!

সুখের নানান রকম ফের। কিছু হওয়ার, হয়ে ওঠার মধ্যে যেমন সুখ, অনেক কিছু না হওয়ার, না হতে পাওয়ার ভেতরেও আরাম আছে তেমনি। যেমন বেঁচে থাকার প্রশস্তি, তেমনি বেঁচে যাওয়ার স্বস্তি। মোটের উপর স্বচ্ছন্দ থাকাটাই আমার মতে সুখের।

'কারো দুঃখ-সুখের ভাগী না হয়ে শুধু নিজের সামান্য সুখ-দুঃখ নিয়ে একলা থাকার আপনার এই একেলষেঁড়েমির জন্যে দোষ না দিয়ে পারিনে—'তবুও জনাব সাহেবের আপসোস—'তা হলেও আমি বলব, সিকিউরিটি-বোধের যে একটা স্বস্তি তা আপনি জীবনে পাননি, জানেননি কখনো। মাসকাবারে নির্দিশ্ট একটা তারিখে বাঁধা মাইনেটা পাবার যা আরাম...'

'হ্যাঁ, তাও পেয়েছি। তাও জানি। তবে ক'মাসের বেশি সে-সোয়াস্তি এ-বরাতে জোটেনি। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরীণ যাবার কালে তাঁর সাপ্তাহিক আত্মশক্তির দায় সুভাষচন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে যান। সুভাষ তখন কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। (আমার ক্রনিক বিস্মৃতিশক্তির জন্য ঘটনার পারম্পর্যে আমার কাহিনী হয়ত ক্রনলজিক্যালি সঠিক হচ্ছে না, যখন যেটা মনে পড়ছে লিখছি, যেভাবে আসছে প্রকাশ পাচ্ছে...তা হলেও যদ্দূর আমার মনে পড়ে, তিনিই তখন এই পৌর সংস্থার কর্ণধার।) দেশবন্ধুর কথায় সুভাষচন্দ্র আমাকেই আত্মশক্তির সম্পাদক নিয়োগ করেন—মাসিক একশ টাকায়।

নির্ঝঞ্ঝাট নির্ভাবনায় সে ক'মাস কেটেছিল আমার সত্যি। বরাদ্দ মাইনের বাঁধা চাকরি আমার জীবনে সেই প্রথম আর সেই শেষ।

চন্দননগর গোঁদলপাড়ার প্রাক্তন বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অফিসের দেখা-শোনা করতেন—কর্মকর্তার যা কিছু করণীয় তা তাঁর। প্রুফ দেখা থেকে কাগজ ছাপিয়ে বার

করার তাবৎ দায় তাঁর ওপর।

সেদিকে আমার দেখার কিছু ছিল না, আমার দায়িত্ব ছিল লেখার। ডবল ক্রাউন-সাইজের আট পাতা (কি ষোল পাতার, ঠিক স্মরণে নেই আমার) প্রায় সবটাই লিখে ভরতে হতো আমাকেই। বাইরের থেকে যা দু-চারটে লেখা আসত, দেখেশুনে দেওয়া হত, কিন্তু বাকিটা সবই, স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে বিবিধ কাঁচারে লিখে ভরাট করতাম আমি।

এখনকার কালে যেমন, সর্বোপরি একজন সম্পাদকের তাঁবে থাকলেও পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ স্বতন্ত্র লেখকের তদারকে তখনকার দিনে ঠিক এমনটি ছিল না। সব পত্রিকার বেলায় অন্তত নয়।

কোনো কোনো সাপ্তাহিকের পিছনে একটা লেখকগোষ্ঠী থাকলেও, যেমন বিজলীর ছিল, আমার সম্পাদিত কাগজ সর্বদাই তার ব্যতিক্রম। লেখকদের কাছে যাতায়াত, নড়াচড়ার নিরুৎসাহ আমার চিরদিন, তাই আমার কাগজে বাধ্য হয়ে আমিই সর্বময়—আমারই একচ্ছত্র বিধাতার ন্যায় সর্বভূতে বিরাজ করতে গিয়ে সব ভূতের বোঝা—একা আমাকেই বইতে হয়েছে—সব লেখকের লেখার দায় নিজের কাছ থেকেই আদায় করতাম।

এখন, স্বভাবত আমার মজ্জাগত হ'লেও লেখারা আমার একটু যেন লজ্জাবতী লতার মতই—স্পর্শকাতরতায় সঙ্কুচিত। অপরের সামনে বেরুতে চায় না কিছুতেই। কেউ আমার কাছে থাকলে লেখা হয় না, ত্রিসীমানার আনাচে-কানাচে ঘুরলে-ফিরলে দেখা দেয় না লেখারা। গোলমালের মধ্যে তো নয়ই।

এদিকে চেরি প্রেসের ওপর তলায় বসে তলার আওয়াজে কলমের কাজে মন দেওয়া মুশকিল। মনের অনুবর্তী না হলে কাগজ ভর্তির মালমসলা পাব কোত্থেকে ?

নিজের ঘরটিতে বিছানার আরামে শুয়ে বসে গড়িয়ে বিশ্রামের মতো লেখা। লেখবার মত মন কোনদিনই আমার হয় না—কোনদিনই নেই তা—যদি না তা মনের মত লেখা হয়। কিন্তু আমার এই অক্ষমতার কথা কি কেউ বুঝবে ? বিশেষ করে যাঁরা সর্বক্ষম, সর্বদাক্ষম, সব অবস্থাক্ষম লিখিয়ে ? সর্বপরিবেশক্ষম তাঁদের মতন বেশ লিখিয়ে আমি নই তো—বেশি লিখিয়ে হয়ত হলেও।

যাই হোক, আমার অক্ষমতাজনিত এই ত্রুটি, অফিসবিধিবিরুদ্ধ এই গাফিলতির কথা কেউ হয়ত সুভাষবাবুর কাছে লাগিয়ে থাকবেন। আমি নিয়মিত অফিসে যাই না, দশটা-পাঁচটা কাঠের চেয়ারে ঠায় বসে থাকিনে, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনটিতে প্রেসে দেবার পূর্বক্ষণে আমার সব লেখা গছিয়ে দিয়ে আসি, তারপর সে হপ্তায় আর আমার পাত্তা মেলে না, সেই মাসকাবারে ঠিক তারিখটিতে মাইনে নিতে হাজির হই।

বিধিবদ্ধ কোনো আপিসের আইনে এমনধারা চলে না, একথা আমি মানব। কিন্তু লেখারাও কোনো আইন মেনে চলে না—সে কথাও তো সত্যি ? বিশেষ করে আমার লেখারা—কোনো ধারারই ধার ধারে না যারা।

অতএব এমন অবস্থায় যা হবার তাই হলো। একদা আত্মশক্তি কার্যালয়ে উপস্থিত হতেই নরেনবাবু সীল-করা কর্পোরেশনের মার্কা মারা একটা লেফাফা আমার হাতে তুলে দিলেন। তার মধ্যে ছিল তিনখানা একশ টাকার নোট আর ছোট্ট একটা চিরকুট ; তাতে লেখা-'আপনাকে আমাদের আর দরকার নেই। সুভাষ।'

বাস্। হয়ে গেল। এক কথায় খতম।

সঠিক বলতে, সে সময়ে আমার মনে একটু ক্ষোভ হয়েছিল সত্যিই। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে

হয়ত একটু অভিমানও হয়ে থাকবে বা (তার পরে আর কখনো তাঁর সমীপস্থ হইনি) কিন্তু আজ সমস্তটা খতিয়ে দেখে মনে হয় না—আমার প্রতি কোনো অবিচার হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র দারুণ ডিসিপ্লিনবাদী, চিরদিনই তাঁর এই শৃঙ্খলাবোধ যেমন নিজের বেলায় তেমনি সবার ব্যাপারেই। স্বভাবতই আপিস বিধিবিরুদ্ধ আমার এই ব্যবহার তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না।

তবুও আমার দিকের কথাটা না শুনে পরের কথায় কান দিয়ে তাঁর এই একতরফা ডিক্রি-ডিসমিস আমার একটু যেন কেমনতর ঠেকেছিল সে সময়। তাঁর কাছে ডেকে আমার গাফিলতির কৈফিয়ত তো তিনি চাইতে পারতেন। নিজের সাফাইয়ে আমারও কিছু বলবার থাকতে পারে তো। আপিসে গরহাজির থেকেও তাঁর আত্মশক্তির কাজ তো আমি বাজিয়ে গিয়েছি ঠিকই। আপিসে বসেই লিখি আর ঘরে শুয়েই লিখি—সম্পাদনা কি লেখার কাজে তো কোনো কসুর ছিল না আমার।

তবে চাকরিটা গিয়ে প্রথমটায় একটু মুষড়ে পড়লেও, 'কহেন কবি কালিদাস'-এর কথায় খানিক সান্ত্বনা পাই শেষ পর্যন্ত। সেই যে—নেই তাই খাচ্ছ নইলে কোথায় পেতে। কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে। চাকরিটা এমন করে গেল বলেই না এই বড়ো বড়ো তিনখানা জলছবি হাতের মুঠোয় এলো। জলের মতন উড়িয়ে এখন ফূর্তি করা যাবে দিনকতক।...'

'সুভাষবাবু একটু কানপাতলা ছিলেন লোকে বলে।' জনাব সাহেবের জবান : 'পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যেস ছিল নাকি তাঁর।'

'সে কথা আমি বলি না। তবে রাজারা কর্ণেন পশ্যতি বলে একটা আপ্তবাক্য আছে, সেই রাজোচিত মর্যাদা ছিল তাঁর নিশ্চয়।'

'সে কথা থাক্। আপনি যুগান্তরের গোড়ার কথাটা বললেন, কিন্তু কি করে খতম হল বলেননি তো?'

'এমন কিছু ঘটা করে নয়। ফুললো আর মরলো-র মতন একেবারে হঠাৎ। বেশ চলছিল কাগজ, আমদানিও হচ্ছিল মন্দ না, কিন্তু সেই প্রফুল্লতার মুখেই আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল অকস্মাৎ। একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ঘরের ভেতর আমার সুটকেসটা নেই। জামাকাপড় খাতাপত্তর টুকিটাকি এটা-ওটা রাখতে মাঝারি সাইজের একটা সুটকেস কিনেছিলাম। কিন্তু বিষয়সম্পত্তি সবার সয় না। যুগান্তরের পুঁজিপাটা টাকাকড়ি অন্নবিত্তর তার ভেতরেই থাকত সব। একেবারে লোপাট।

দরজা জানালা সব খোলা রেখেই শুই আমি—এখনও অব্দি। বাইরে গেলেও লাগাই না কখনো, তালা-চাবির বালাই ছিল না আমার। সুটকেসটাতেও কোনো চাবি দেওয়া ছিল না। সুট করে এসে কে নিয়ে গেছে কখন।

ছাপাখানার দায় মেটানোর কাগজ কেনার টাকা ছিল তার ভেতরেই—কোথায় যাই এখন? কাগজ বার করি কি করে?

এরকম অবস্থায় গন্তব্যস্থল ছিল একটাই। দেশবন্ধুর কাছে।

গেলাম তাঁর বাড়ি। গিয়ে শুনলাম তিনি কলকাতার বাইরে। কী করা যায় তা হলে?

শার্টের পকেটে ট্রাম ভাড়ার কয়েক আনার সম্বল মাত্র। কী করে এত সমস্যার সমাধান করি ভাবতে ভাবতে ফিরছিলাম। ট্রামটা যখন ওয়েলিংটন স্ট্রীটে, বৌবাজারের কাছ বরাবর

আচমকা আমার মনে হল....

মরীচিকামায়ার মত একটা ছায়াভাস দেখা দিল যেন।

অনেকের প্রকোপে একটার পর একটা করে গেরো পড়লেও সব গেরোই এক কোপে কেটে যায়, আমি দেখেছি। স্বপক্ষেই থাক আর বিপক্ষেই যাক, বজ্র আঁটুনির একটা ফস্কা গেরো থাকেই, কোন ফাঁকে তা-ই তাবৎ গ্রন্থিমোচন করে দেয়।

এদিনও যেন প্রায় সেই রকমটাই হলো।

যে-আভাসটা আন্দাজে পেয়েছিলাম, ফলে গেছল সেদিন।

ট্রামে আসতে আচমকা আমার মনে হলো, সেই সেদিনকার মতন, আজও বোধ হয় আমাদের বাসা ঘেরাও হয়েছে। পুলিসে পাহারাওলায় ছেয়ে গেছে পাড়া—আমাদের পাকড়াতে এসেছে পুলিস।

এখন কী কর্তব্য? আমি ভাবি।

প্রথমেই পেট ভরে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। কারণ থানার হাজতে কী জুটবে বরাতে, জানা নেই। খিদেও পেয়েছিল দারুণ।

কোথায় খাই?

ততক্ষণে আমার নামার জায়গা ঠনঠনের মোড় পার হয়ে ট্রামটা পরের স্টপ-এ—আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মুখোমুখি।

তারপর আর আমায় প্রেরণা দিতে হয় না। আমি নেমে পড়ি। মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের টেবিলে বসি গিয়ে।

এনতার রাজভোগের অর্ডার দিই। না, কচুরি সিঙাড়া আজেবাজে জিনিস নয় আজ। বিনিপয়সার ভোজ যেকালে, তখন আর কিছু কিনি না। শুধু রাজভোগই চাই—রাজভোগই খাই। রাজভোগেই পেট ভরাতে হবে আজ—তারপর যা থাকে বরাতে।

পেট ঠেসে খেয়ে তার পরে পকেটে হাত দিয়ে হঠাৎ—'ও মা! মনিব্যাগটা গেল কোথায় আমার? ট্রামে কেউ পকেট মেরেছে নিশ্চয়।'

কথাটা কেবল ডাহা মিথ্যা নয়, ডবোল মিথ্যা। মনিব্যাগ আমার একদম নেই, কখনো থাকে না, ছিল না কোনো কালেই।

পাড়ার পকেটমার বন্ধু বলেছিল আমায় একবার, টাকা না রেখে যেন পকেটে মনিব্যাগ নিয়ে না বেরোই। ওতে নাহক ওদের হয়রান করা হয়—বহুৎ মেহনতি বেফয়দায় যায়।

তবে, আমার দোস্ত বেরাদারদের হয়রানি বাঁচাতে নয়, আমার মনিব্যাগ না থাকার কারণ অন্য। কখন টাকায় থাকি না, তাই মনিব্যাগ রাখি না।

'কোথায় থাকেন আপনি? ঠিকানাটা দিন। সুবিধে মতন এক সময় এসে দিয়ে যাবেন এখন। তার কী হয়েছে?'

আদর্শের এক ভদ্রলোক বললেন। ভদ্রলোকের আদর্শ বলতে হয়।

'কাছেই থাকি তো। ঠনঠনের কাছাকাছি। আপনারা একজনকে দিন না আমার সঙ্গে—তার হাতে দিয়ে দেব দামটা।'

একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে এল।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে, যা ভেবেছি, সারা গলিটা লালে লাল—পাহারাওলাদের লাল পাগড়ির জেল্লায়।

রাস্তায় আসতেই যার আঁচ পেয়েছিলাম, ভালো করে না আঁচাতেই তার ছোঁয়াচ লাগল! কিন্তু পুলিসের মতন এমন ওয়েলকাম সেদিন আমার কাছে আর কিছু ছিল না। পুলিস

সব সময়ই সমস্যা নয়, সমস্যার সমাধানও কখনো আবার।

দোরগোড়ায় পৌঁছতেই এক ইনস্পেকটার এসে আমার নাম শুধালেন। শোনা মাত্রই বললেন—'আপনি অ্যারেস্টেড্।'

তবুও, তার পরেও যেটা বক্তব্য থাকে, বলতে কসুর করি না—'ওয়ারেন্ট কই?'

'এই যে। দেখুন না।'

আদালতের ওয়ারেন্ট। সাদা কথায়, এর পর আর কথা চলে না। সামনে খাড়া করা কয়েদ-গাড়িতে গিয়ে উঠতে হয়।

উঠে দেখি, আমি ধৃত হবার আগেই গিরিজা আর বীরেনদা সেখানে উদ্ধৃত হয়েছেন।

ফিরে তাকাই, আদর্শের লোকটি ত্রিসীমানায় নেই।

পুলিসের কান্ড দেখেই না সে উধাও হয়ে গেছে কখন।

আমার মত আসামীকে খাওয়াবার দায়ে পাছে পুলিসে তাকেও পাকড়ায়, সেই ভয়েই হয়ত সে উড়ে দৌড়?

আদর্শের এমন খদ্দের, এহেন আদর্শ খদ্দের হয়ত এর আগে সে আর দ্যাখেনি।

॥ একষট্টি ॥

বাসার থেকে কয়েদগাড়ি চেপে সটান লালবাজার। বড় থানায় বেশিক্ষণ কিন্তু দাঁড়াতে হয়নি, খানিক বাদে আর সব আসামীর সাথে ব্যাংশাল কোর্টে আমাদের চালান করে দিয়েছে সরাসরি।

আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে খাড়া হতেই, পরের দিনে হাজির হবার নির্দেশ দিয়ে জেলের হাজতে রাখার হুকুম দিয়েছেন হাকিম।

পুলিসের হেফাজতে নয় আর, সোজাসুজি জেলের হাজতে।

হাঁপ ছাড়লেন বীরেনদা—'বাঁচা গেল বাপ। থানার জিম্মায় রাখলে আর রক্ষে ছিল না ভাই। পুলিসে যা পেটায়, জানিস?'

'কী করে জানব?'থানার কার্যকলাপ জানা ছিল না আমাদের।

'থানার পাশাপাশি বাড়িতে থাকলে জানা যায়। মারের চোটে সারা রাত এমন চেঁচায় বেচারারা যে কান পাতা যায় না, চোখের পাতা বোজা দায়। নেহাত বাচ্চা আসামীদেরও রেহাই দেয় না ওরা।'

'কেন বীরেনদা?'

'কবুল করানোর জন্যেই করে। ওদের কবুলতি ধরে আরো সব আসামীদের পাকড়াতে পারে তখন। ওই করেই ওরা সব কেসের হিল্লে করে, প্রোমোশন হয়ে থাকে ওদের, বুঝেছিস?'

কাঠগড়ার ফেরত, ফৌজদারি আদালতের লক-আপ-এ বসে এই সব বার্তা, কি বার্তালা ঝাড়ছিলেন বীরেনদা। পেটি কেস থেকে চুরি ডাকাতি খুন অবধি সব কেসই ওদের কাছে পেটাই কেস—পেটবার মামলা। পলিটিক্যাল আসামী হলে তো কথাই নেই, যদিও সেক্ষেত্রে কখনো-সখনো দোরোখা পেটাপেটিই আবার। জানা গেল ওঁর কথায়।

'ওই পেটনের জন্যেই ওদের বেটন দেওয়া—তাই বুঝি বীরেনদা?'

আমি বাতলাই: 'তাই হবে বোধহয়।'

'সেই হেতুই ওরা বেতন পায়, বোধ হয়—কী কও?'

'আবার কী ?'

'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা বলে না ? পুলিসে ছুঁলেও তাই। তবে বাঘের ঘা তার নখদন্তের আঁচড় কামড়ে, আর পুলিসের ঘা-টা হচ্ছে ওই বেটন-পেটার। জানো বীরেনদা, আমাকেও একটা গোরা পুলিস শুট করেছিল একবার ?'

'তাই নাকি ?' শুনে তিনি হাঁ। —'কোথায় লেগেছিল গুলিটা ?'

'কোথাও না। তার চোটে আমি প্রিজন ভ্যানে সেঁধিয়ে গেলাম।'

'যাঃ! গুল মারার আর জায়গা পাসনি তুই। গুলির চোটে প্রিজন ভ্যানে সেঁধিয়ে গেলি! বললেই হোলো ? কোথায় লেগেছিল গুলিটা ?'

'গুলি নয়, বুট।' আমি বলি—'যেখানে লাগবার ঠিক সেইখানটিতেই।'

'বুট দিয়ে সুট করেছিল লোকটা ? তা, বেশ করেছিল। ভালোই করেছিল। তোর মতন হতচ্ছাড়ার উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট তাই।'

আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি না—'তোমাকে করলে আরো বেশ হতো। সেও পায়ে আরাম পেতো আরো।'

'আমি গোরা পুলিশের ত্রিসীমানায় যাই না।' তিনি জানান। 'প্রাণ থাকতে নয়।'

'আমিই যাই নাকি ? সাধ করে কেউ যায় কখনো ? গোরা পুলিস আর ঘোড়া পুলিস দুইই সমান দাদা! ঘোড়ার চাট খেলে যেমন, পুলিস সার্জেনের মার খেলেও তাই। হাড়গোড় আর আস্ত থাকে না, ডাক্তার সার্জনের কাছে যেতে হয় তখন।'

আদালত ভাঙ্গার পর আর সবার সঙ্গে আমাদের তিনজনকেও কয়েদগাড়িতে তোলা হল। সন্ধ্যের আগেই আমরা জেলখানায় গিয়ে পৌঁছলাম।

জেলখানায় আর জেলের খানায়—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

সকাল থেকে বীরেনদাদের পেটে কিচ্ছু পড়েনি, চুঁই চুঁই করছিল পেট। আর আমি, যদিও সকালে আমার এলাকার এক মিষ্টান্ন ভান্ডারে ঋণং কৃত্বা দরাজ ভোগের চর্ব্যচোষ্য করে চার্বাকনীতির আদর্শ-স্থাপনা করে এসেছিলাম, তা হলেও সে সব এতক্ষণে কখন হজম হয়ে আমার অন্তরাত্মাও, যা কিনা হৃদিস্থিতেন হৃষিকেশের ঠিক তলদেশেই, অনন্তনাগের মতই ফণা বিস্তার করেছেন। তাঁর ছোবলে আমি অস্থির।

'আজকে মাংসের দিন। আজ সন্ধ্যেয় রুটি মাংস দেবে।' জানিয়েছিল এক কয়েদী। শোনার পর আমাদের আর তর সইছিল না।

কিন্তু দেয়ার ইজ মেনি এ স্লিপ বিটুইন দা কাপ অ্যানড দা লিপ। আদালতের পাঠানো স্লিপগুলির সঙ্গে জেলখানার নথি মিলিয়ে নেবার ছিল, হাজতের কয়েদীদের সনাক্তকরণের পালা ছিল তার পর। আরো ছিল কতো কী।

সেই সব অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল পরম্পরায়। মাসিকপত্রের ধারা-বাহিকের ন্যায় ক্রমশঃ প্রকাশ্য হতে লাগল।

আমাদের সবাইকে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল তার পর।

জেলার সাহেব এলেন। আসতেই হাঁক পাড়লো হেডওয়ার্ডার ; —সরকার সালাম্।

শশব্যস্ত সেলাম ঠুকল সবাই। আমরা চুপচাপ। সেলাম-টেলাম কিচ্ছু নেই আমাদের।

তাই দেখে সঙ্গী আসামীদের কারো কারো চোখ একটু ট্যারা হলেও জেলার সাহেব কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সিপাহী কি ওয়ার্ডারদেরও কেউ দৃক্‌পাত করল না সেদিকে।

পলিটিক্যাল আসামীদের স্বভাবসুলভ বেয়াদবিতে তারা এতদিনে রপ্ত হয়ে গেছে মনে হয়।

'কখন খেতে দেবে হে?' আমার পাশে দাঁড়ানো মেটের কাছে আমি ফিসফিসিয়ে জানতে চাই—খাবার দেরিকতো আর? 'এখন খানা কি বাবু? তল্লাসি হোক আগে। তবে না?' সে বলেছে।

খানাতল্লাসীর কথা জানা ছিল, কিন্তু খানা আর তল্লাসি আলাদা আলাদা—তা জানতাম না। খানার আগেও আবার এক তল্লাসি আছে এই প্রথম জানলাম। পৃথক পৃথকরূপে তাদের প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাও হল এই প্রথম। যদিও এই জ্ঞানলাভের সবটাই পরস্মৈপদী—পরের ওপর পরখ হতে দেখেই তৃপ্ত হতে হয়েছিল আমাদের।

একেকজনকে একেবারে বিবস্ত্র করে তালাস করা হচ্ছিল। কী তালাস, কিসের তালাস—কে জানে?

'আমাদের পালাও আসছে বীরেনদা। রেডি হও।'

শুনে তিনি সশঙ্কিত—'কী সর্বনাশ!'

'দেরি আছে তার। আমরা সব শেষে দাঁড়িয়েছি না?' ভরসা দিই তাকে—'মিনিট পনের দেরি আছে বোধহয়।'

তিনি মোটেই আশ্বস্ত হন না কিন্তু—'কী মুশকিল দ্যাখ তো! তোদের পাল্লায় পড়ে এডিটার হতে গিয়ে কী ফ্যাসাদে পড়া গেল এখন।'

'তোমার আবার ফ্যাসাদ কী বীরেনদা? তোমার চেহারাটা তো এমন কিছু খারাপ নয়। সুপুরুষই বলা যায় তোমায়....নিজের প্রদর্শনী খুলতে তোমার আবার লজ্জাটা কিসের।'

'ধুত্তোর সুপুরুষ! প্রদর্শনীর নিকুচি করেছে।' বীরেনদার গজগজানি।

'মানে, বলছিলাম কি, তোমাকে দিগম্বর করলে দৃশ্যটা এমন কিছু অদর্শনীয় হবে না। খালি গা হতে আমারই লজ্জা, এই হাড় ক'খানা বার করার মতন বিশ্রী কিছু আছে আর? আর গিরিজা? ও বেপরোয়া। ও তো লাফাতে লাফাতে খালি গা হবে, চাই কি হবার পরেও হয়ত লাফায় ও?'

'সেটা কি একটা বিসদৃশ হবে না?' বীরেনদা জিজ্ঞাসু—'হবার পরেও যদি লাফায় ও?'

'হলে তখন দেখা যাবে।' আমি বলি—'গিরিজাদের লম্ফঝম্প দেখা যাবে তখন। দেখবার পর বুঝব।'

কিন্তু আমার পাশের মেটটি বলল, 'না বাবু, আপনাদের লাঙ্গা হতে হবে না, লাঙ্গা করবে না আপনাদের। কয়েদীদের পোশাকও পরতে হবে না আপনাদের। আপনারা গান্ধীজীর চ্যালা কিনা।'

মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য-মহিমায় মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। —'বটে? বাঃ, ভালো তো তাহলে....কিন্তু, আচ্ছা, ওদের অমনধারা ওঠ-বোস করাচ্ছে কেন গো? নাকি ওরা নিজেরাই ওই ব্যায়াম করছে—খাবার আগে খিদেটা চাঙ্গা করার জন্যে?'

'জানেন বাবু, ওরা কিনা লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা আফিং চরস সব নিয়ে আসে, এমনকি পয়সাকড়িও, কেউ কেউ ছুরি-ছোরাও আনে আবার।'

'কী করে আনবে? কারো হাতে কিচ্ছু নেই, দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।'

'মালখানায় ভরে আনে যে!' সে জানায়, 'প্রত্যেকেরই মজবুদ মালখানা রয়েছে। ওঠ-বোসের চোটে সেই লুকোনো মাল ওইসব বেরিয়ে পড়ে—দেখতে না দেখতে!'

'মালখানা। সে আবার কী হে? শুনে আমরা তাজ্জব। —'কোথায় মালখানা। কি করে বেরুবে?'

সে ইঙ্গিত ইসারায় খোলসা করার চেষ্টা পায় কিন্তু তবু আমরা সম্‌ঝাতে পারি না দেখে শেষটায় বিশদে আসে। চাপা গলায় বলে -'যেমন করে ঝাড়া ফিরে না বাবু?'

তখন আমরা টের পাই যে, বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে সমাগত সেই প্রত্যাশীর 'দুরাবস্থার' মতন এখানেও আ-কারের ঐ বাহুল্য প্রয়োগ হয়েছে। মালখানার বিকল্পে ওটা হবে আসলে, আমাদের তাবৎ খানা যে পথে নির্গত হয়ে নিরুদ্দেশযাত্রায় বেরয়।

কে জানে হয়ত একদিন সারগর্ভ ধাপার মাঠ পার হয়ে অমন বাঁধাকপির অমল মূর্তি ধরে আমাদের পাতে পড়ে আবার।

'ছোরাছুরিও আনে বলছো?' আমার কৌতূহল। —'হতাহত হয় না?'

'না বাবু, ছোরাছুরি অমন করে আনলেও কোথাও কেটেকুটে যায় না। আনার কায়দা আছে। জানেন বাবু, একবার একজন ছেনি বাটালি উখো সব নিয়ে এসেছিল ঐ ভাবে। জেলখানার জানালার লোহার শিক কাটবার জন্যেই।....'

'বলো কি, গারদখানার গরাদ কাটবার জন্য গোটা একটা কারখানাই!' আমি হতবাক্‌। —ঐভাবে আমদানি করা? আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ বাবু। একবার একজন একটা সিঁধকাঠিও এনেছিল নাকি। মাটির তলায় সুড়ং কেটে এখান থেকে বেরুবার মতলবে।' সে বলে, 'কিন্তু ধর্মঠাকুর আছেন না? ধরা পড়ে গেল বেচারা—ঐ ওঠ-বোস করতে গিয়েই বেরিয়ে পড়ল বেবাক।'

'আছেই তো ধর্মঠাকুর। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।' বীরেনদার সায় তার কথায়—'ধরা না পড়ে যায় কখনো? পড়তেই হবে।'

'তিনি কলকাঠি নাড়ছেন বলেই সিঁধকাঠি বেরুচ্ছে।' আমি বলি—'কখনো কখনো বেরুচ্ছেও না আবার। তখন সেই লোকটাই বেরিয়ে যাচ্ছে জেল থেকে। অধর্মপথে যদিও। কিন্তু কী করা যাবে?'

'যাক্ গে!' মেট তাকে অম্লানবদনে বেকসুর খালাস দেয়। —'যেতে দিন। কিন্তু সে যা মার খেয়েছিল না বাবু! সিঁধকাঠি-চোরটা! তার ওপর আবার সেই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে খাড়াবেড়ি—ঝাড়া চার মাস।'

চুয়াল্লিশ ডিগ্রির চার মাসটা আমার জানার বাসনা ছিল, কিন্তু সবার তল্লাসি খতম হবার পর খানার ডাক পড়তেই তখনকার মত কৌতূহল দমন করলাম।

লৌহঘটিত প্লেটে পরিবেশিত রুটি-মাংসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম গিয়ে আমরা।

সন্ধ্যের আগেই খাওয়া আর খাওয়ার পরেই শোয়া—জেলখানার এই রেওয়াজ।

বিচারাধীন বন্দীদের জন্যে বরাদ্দ একটা হলঘরে খাওয়ার পরে আমরা সবাই গিয়ে পাশাপাশি লম্বা হয়ে পড়লাম।

'আলোগুলো সারা রাত জ্বলবে, না নিবিয়ে দেবে এরপর?' বীরেনদা জানতে চান—'অন্ধকারে বাপু আমার ভয় করে ভারী।'

'আমারও।...ভূতের ভয় আমার বেজায়।' বলতে দ্বিধা করি না।

'ভূত নয়, আমার অন্য ভয়।' বীরেনদা ফুৎকারে আমার ভয়টাকে ওড়াতে চান—'জেলখানায় আবার ভূত কিসের রে? সাধ করে কেউ মরতে আসে এখানে যে, মরে ভূত

হবে ?'

'জেলখানায় কেউ মরে না বাবু, কী যে কন ?' আমার পাশের ধরাশায়ী জানায় : 'যারা ফাঁসি যায় তার তো মরবার পর ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এখানেই। দেখাও দেয় নাকি মাঝে মধ্যে, কে আর তাদের জন্য গয়ায় পিণ্ডি দিতে গেছে বলুন !'

'বাগে পেলে আমাদেরই পিণ্ডি চটকাবে, আমাদেরকে পিণ্ডি করে চটকাবে এখন।'

'দ্যুৎ। তোর খালি ভূতের কথা। ভূতের আবার ভয়টা কী ? আমি বলি ভূত নয়, অন্য ভয়...'

কিন্তু অন্য ভয়টা যে কী হতে পারে আমি ঠাওর পাই না, তিনিও ফাঁস করেন না, আমরাও আঁচ পাই না। এখানে চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই হবার কিছু নেই। তবে অন্ধকারের সুযোগে অকারণ পুলকে কেউ যদি আদর করে করে গলা টিপে ধরে তো বলা যায় না।

'হ্যাঁ, আছে বইকি বাবু অন্য ভয়...' আমার পার্শবর্তী কয় : 'ওই বাবুর...ওনার পাশের লোকটিই তো ভয়ঙ্কর...'

'মুশকো চেহারার ঐ লোকটা ?' আমি তাকিয়ে দেখি। 'একটু কাঠখোট্টা গোছের বটে, কিন্তু ভয়ের তো কিছু দেখি না।'

'জানেন বাবু, কী কারণে ওর ফাটক হয়েছে ? পাকড়েছে কেন ওকে পুলিস ? জানেন ?'

সাংস্কৃতিক বিশেষ্য অশ্বের সহিত ইংরেজি ক্রিয়াপদের এক ফক্কুড়ি লাগিয়ে এমন সবিশেষ করে সে বলে যে, সেই অকথ্যভাষা সভ্যসমাজে মুখে আনা যায় না। অনুচ্চার্য সেই অকথ্য শুনেই না আক্কেল গুড়ুম।

ইঙ্গবঙ্গীয় এই স্ল্যাংগোয়েজের সঙ্গেও পরিচয় আমার এই প্রথম। শুনে আমি স্তম্ভিত।

বীরেনদা কিন্তু আতঙ্কিত—'না বাবা, আমি এপাশে শুচ্ছিনে। প্রাণ থাকতে এর পাশে নয়। তুই এধারে আয়, আমি ওদিকে যাই বরং।'

'ভয় খাচ্ছ কেন বীরেনদা, হলেও অশ্ব কখনই নয়, হতেই পারে না। অশ্বিনী নিশ্চয়। তাই না হে ?'

'যাই হোক না, আমি ওর মধ্যে নেই ভাই।'

'তুমি তো অশ্বিনী নও, তোমার—আবার ভয় কিসের ? এমনকি, তোমার নামটাও অশ্বিনী না। এমন বীরোচিত নাম নিয়ে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমের অধিকারী হয়েও পরের আক্রমণের ভয় তোমার ?'

'অশ্বই হোক, আর অশ্বিনীই হোক, আমি ওসব রিস্কের মধ্যে যাব না বাবা !' বীরেনদা নিজের গোঁ ছাড়েন না—'এমন বিপজ্জনক লোকের পাশে আমি...না...না। কখনই না। প্রাণ থাকতে নয়।' তাঁর সেই এক কথা।

'যাচ্চলে !' গিরিজা বলে। সেও এক কথায় সারে।

'না বাবু, অশ্বিনী নয়, অশ্বই, আমি হলফ করে বলছি। ওর কেসের কাগজে লেখা রয়েছে আমি দেখেছি...' সেই লোকটিও নিজের কথায় অনড়।

'তা কি কখনো হতে পারে ? কী করে হবে ?' আমার সংশয় যায় না—'দু হাত নইলে বাজে কি তালি ? এ ব্যাপারে ঘোড়া বা ঘুঁড়ির সম্মতি থাকা চাই না ? তাদের নিজস্ব

মতামত নেই কোনো ? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র নেই তাদের ? তাদের অমতে কি কখনো হতে পারে এ কাজ ?'

'তাদের মতামতে কে কান দিচ্ছে বাবু ? ও যা গোঁয়ার আর মারখুনে। বাগে পেলে বাঘকেও ছাড়বে না। ওর কাছে গেলে বাঘও ভড়কাবে। ভয় খেয়ে পালাবে তক্ষুনি। তাছাড়া ঘোড়াটা না বলবে কি করে বলুন ? তার কি মুখ আছে ? মানে মুখ থাকলেও সে কি কথা কইতে পারে ?'

'বললেও তার ভাষা কি আমরা বুঝবো ?' গিরিজার বক্তব্য : 'আর চুপ করে থাকলে ভাবব মৌনসম্মতি।'

'আহা, একান্তই বলতে না পারুক, চাট মারতে পারে তো ?' আমার বক্তব্য : 'অশ্ব কি অশ্বিনী যাই হোক, তার ওপর এমন বিতিকিচ্ছি কাণ্ড হতে দেখলে চাট মারতে ছাড়বে না। পায়ে খুর থাকতে মারতে কসুর করবে কেন ?'

'এমন অসম্ভব অব্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেছল বোধহয়, চাট মারার কথা মনেই পড়েনি তার।' বীরেনদা ঘোড়াটার সাফাই গান।

'তা হতে পারে।' মানতে হয় আমায়—'এমন দৃশ্য দেখলে মাতালেরই নেশা ছুটে যাবে, চাট মারার কথা মনেই পড়বে না তার—তারও।'

'তবে ? তাহলে ? আমার কথায় আমাকেই পেড়ে ফেলেন বীরেনদা।

'তাহলেও তুমি ঘাবড়াচ্ছো কেন ?' তুমি কিছু অশ্বিনী নও। অশ্বশক্তি বিশিষ্টই একজন। হতে পারে হর্স পাওয়ার ওয়ান—তাহলেও তুমি অশ্বই। তবে ?'

'তবে-ফবে জানি না। তুমিও কিছু গাধা নও। বেঁটেখাটো হলেও এক অশ্বই। তাহলে তোমার এধারে শোবার বাধাটা শুনি ?'

চেহারায় একটু হ্রস্ব হলেও আমি যে অশ্বই, সে কথা অস্বীকার করা যায় না—'না, বাধা কিছুই নয়। তবে কিনা...তবে কিনা শুয়ে পড়েছি এক জায়গায়, অকারণে আবার কেন এখান থেকে ঠাঁই নাড়ানাড়ি—ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট হতে যাওয়া ?'

'তাহলে গিরিজা তুই আয় এধারে, আমি তোদের দু'জনের মাঝখানে থাকি। নিশ্চিন্ত হয়ে নিরাপদে ঘুমোতে চাই।'

'গিরিজা অকুতোভয়, বীরেনদার কথায় অকুস্থলে নিজের স্থান নিতে কোনো দ্বিধা করে না।

বীরেনদা পরদিন সকালে উঠেই জেলখানার রোলকল, সরকার সালাম ইত্যাদি পালার কালে জেলার সাহেবের কাছে গিয়ে আরজি পেশ করেছে—

'রাত্রে আমাদের আলাদা শোবার একটা ব্যবস্থা করে দিন স্যার। ওদের সবার সঙ্গে ঢালাও শোয়াটা যেন কী রকম ? ওরা যা সব অসভ্য কথা বলে না। কী বলব স্যার ?'

'বুঝেছি। বুঝতে পারছি। কিন্তু কোথায় আপনাদের দিই বলুন তো ? সলিটারি সেল আছে বটে এ জেলে। সব জেলেই থাকে। আমাদের এখানে সেটা চুয়াল্লিশ ডিগ্রির সেল। কিন্তু সেখানে তো ফাঁসির আসামীরা থাকে ; জেলের নিয়মশৃঙ্খলা যারা ভঙ্গ করে তাদেরও ওখানে রাখা হয় বটে। কনডেমনড্ সেল বলে ওগুলোকে—কিন্তু ওখানে আপনাদের কি বলে রাখি বলুন তো ?'

'কিচ্ছু বলতে হবে না। এমনিতেই আমরা থাকতে রাজী। ফাঁসীর আসামীরা থাকে, তাই

বলে সেখানে থাকলেই তো আর কিছু ফাঁসি হচ্ছে না আমাদের ?'

'আর তাহলেও...' বীরেনদা আমার কানের গোড়ায় ফিসফিস করেন। তার থেকে তাঁর যে বক্তব্যটা ফাঁস হয় তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে—ধনেপ্রাণে মারা যাওয়ার চাইতে কেবল প্রাণে মারা যাওয়া নাকি ঢের শ্রেয়। অনেক উপাদেয়—অন্তত তাঁর কাছে।

নিজেকে অশ্বমেধযজ্ঞের নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করে সেই রাজসূয় ব্যাপারে ফেঁসে যাওয়ার চেয়ে বীরেনদা বরং চুয়াল্লিশ ডিগ্রির কনডেমড্ সেলে থেকে তার হেতু যদি দরকার হয় তো ফাঁসি যেতেও বুঝি রাজী।

॥ বাষট্টি ॥

গত রাত্রের মতই আরেক চমক দিলেন আজ বীরেনদা, আদালতে গিয়েই না! কেসের ডাক পড়লে আমরা তিন মূর্তি আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে খাড়া হতেই সরাসরি তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সম্বোধন করেছেন—

ইয়োর লর্ডশিপ্, ইয়োর এক্সেলেন্সি, হুজুর, সার। আই হ্যাভ এ স্পেশাল আরজি টু পেশ। আই বেগ টু সাবমিট, আই নো নাথিং অ্যাবাউট অল দিস। নাইদার রেসপনসিবল ফর ইট। আই অ্যাম অ্যান ওয়ার্কিং ম্যান অফ দা ক্যালকাটা কর্পোরেশন। আই অ্যাম নট অ্যান এডিটর অব দিস পেপার, নর অ্যাম ইনটারেসটেড্ ইন ইট। টু টেল দা ট্রুথ, নেভার রোট এ লাইন ইন ইট, নর এভার আই রেড এ লাইন অব দিস। আইদার বিফোর অর আফটার প্রিন্টিং। আই অ্যাম এ ভেরি বিজি ম্যান, নো টাইম ফর অল দিস ননসেন্স। (তারপর আমাকে দেখিয়ে)

হি ইজ দা এডিটর, নান বাট হি, অ্যান্ড হি ইজ সোল্ রেসপনসিবল ফর অল দিজ রাইটিংস্—সিডিশাস অর আদারওয়াইজ।

সার, আমাকে না জানিয়ে জোর করে এর এডিটর বলে আমার নাম ছাপিয়ে দিয়েছে কাগজে—উইদাওট অ্যাট্ অল্ ইনফর্মিং মি। কী বলব সার?...

পুনশ্চ আমার প্রতি তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ—অ্যাট দা রুট অব অল দিস—ইজ দিস্ স্কাউনড্রেল, রাদার দিস নটি বয়। মোস্ট হাম্বলি, আই বেগ ইওর পার্ডন সার। আই অ্যাম এগ্রীয়েবল টু গিভ অ্যান আণ্ডারটেকিং নেভার টু লুক অ্যাট হিজ ফেস। অর হিজ পেপার।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার দিকে তাকালেন—ইজ দ্যাট রাইট?

আমার বিদ্যের দৌড় বেশি নয়। ইংরেজির তুবড়ি ছোটাতে না পেরে সোজা ইঙ্গ-বঙ্গী হাফ-ফিরিঙ্গি ভাষায় আমার বক্তব্য বোঝাই—ইয়েস লর্ড সর, হোয়াট হি সেজ, অ্যাবসলিউটলি রাইট। আই অ্যাম দা অনলি এডিটর; সোললি রাইটার অ্যানড হোললি রেসপনসিবল ফর অল দিস। আমি ছাড়া আর কেউ নয়। নান বাট মি—বাট আমার একটা নিবেদন...আই হ্যাভ টু অবজেকট্ টু হিজ স্টেটমেন্ট ইন দিস রেসপেক্ট...দ্যাট আই অ্যাম নট এ নটি বয়, মে বি নটি বাট নেভার এ বয়—রাদার এ স্কাউন্ড্রেল—দ্যাট হি সেজ দ্যাট আই অ্যাম। আই হ্যাভ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।

বীরেনদার আরজি মঞ্জুর হলো। পরের দিন তারিখ পড়ল আমাদের মামলার। কাঠগড়ার থেকে ফিরে এলাম আমরা আদালতের লক্-আপ-এ।

বীরেনদাও এলেন। যতক্ষণ না তাঁর ছাড়পত্র তৈরি হয়ে ছাড়া পাচ্ছেন ততক্ষণের জ যদিও।

লক্-আপ-এর এক ধারে আমাকে টেনে নিয়ে আড়ালে তিনি বললেন আমায়—'রাগ করিসনি তো, তোকে তখন ওই স্কাউন্ড্রেল বলেছি বলে ? কিছু মনে করিসনি ভাইটি ।'

'মনে করব কেন ? মনে করার কী আছে ? কিছু মিছে কথা তো কওনি তুমি বীরেনদা। রাগ কিসের ? ঠিক কথাই বলেছো তো । আমি যে একটা স্কাউন্ড্রেল তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে ? কিন্তু সে কথা নয়, আমার একটা অন্য কথা ছিল তোমাকে বলার। লজ্জার কথাই সেটা, তাই এখানে আড়ালেই বলি তোমায় । কাল বাসায় ফিরে পুলিসের হাতে ধরা দেবার আগে আমি এক অপকর্ম করে ফেলেছি । ভীষণ খিদে পেয়েছিল দাদা, একটা মেঠায়ের দোকানে...শ্রীমানী বাজারের গায়ে আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার দেখেছো তো ? সেখানে গিয়ে গোটা বিশেক রাজভোগ বসিয়েছি, এখান থেকে বেরিয়ে তার দামটা তুমি দিয়ে দিয়ো তাদের । আর নেহাত যদি না দিতে পারো, তাহলে বোলো তাদের যে, আমি জেল থেকে খালাস পেয়েই ফিরে গিয়ে ধারটা মিটিয়ে দেব আমার ।'

'ও ধারে যাস্‌নে আর—তা হলেই হবে ।' বীরেনদা বাতলান আমায়—'ও ধার দিয়েই হাঁটবিনে একদম । শ্রীমানীর দিকের ফুটপাথ ছাড়া কি সারা কলকাতায় রাস্তা নেইকো আর? ধার শুধবি কি রে ? কেউ কি কারো ধার শুধতে পারে কখনো ? কোনো ধার কি কখনো শোধা যায় ? ধার করি আমরা নিজের উদ্ধার পাবার জন্য, শোধবার জন্য না । কী বোকা রে তুই ? তুই যাবি খাবার ধার মেটাতে ! পাগল ! এ বাজারে যার যত দিকে ধার না, যত না ধার, তার তত বেশি ক্রেডিট । তা জানিস ? অতো টাকার মেঠাই তুই ধারে খেয়েছিস, অমনি খেতে পেয়েছিস জেনে তোর সম্বন্ধে আমার ধারণা পালটে গেল রে ! স্কাউন্ড্রেল তুই ঠিকই, জানা গেল এবার যদিও সঠিক, তা হলেও তোর সম্পর্কে আমার একটু উচ্চ ধারণাই হল বলতে কি !'

বীরেনদা কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন—কারো ঋণই কখনো শোধ করা যায় না । আজন্ম থেকে অজান্তে, কি জ্ঞাতসারে, যতজনের কাছে ঋণী হয়েছি, তাদের ঋণ—সব ঋণ, সবার ঋণই এ জীবনে সমান অপরিশোধ্য । শুধু আমার নয়, সবার পক্ষেই সেটা সত্য ।

কারও ধারই কখনো শোধ করা যায় না, শুধবার নয়, হাজার সুদ দিয়েও—এমন কি ! ধরুন, সেই কাবুলিওয়ালার দেনাই কি আমি মেটাতে পেরেছি ? আমার বন্ধু পুণ্যশ্লোক সেই বিভূতি বাঁড়ুজ্যের ? যখন আমার কোনো উপায় ছিল না সেই দুঃসময়ে অর্থসাহায্যে নড়বড়ে আমাকে নিজের দু'পায়ে দাঁড় করাবার যাঁরা প্রয়াস পেয়েছেন ? যদিও তাঁদের সেই দুশ্চেষ্টার পরেও হাতী-ঘোড়ার কদরে ওঠা দূরে থাক, তেমনি নড়বড়ে রয়ে গেছি শেষ পর্যন্ত । তাঁদের পাওনা যেমন দিতে পারিনি, চিরঋণী থেকে গেছি, আদর্শের ধারও মেটানো গেল না তেমনি—অনেক চেষ্টা করেও—বলব কী !

জেল থেকে বেরিয়েই আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকেছিলাম আবার—আগের দেনাটা মেটাবার মতলবেই ।

কিন্তু কথাটা পাড়তেই না কর্তাব্যক্তিটি হৈ হৈ করে উঠেছেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ! মনে পড়েছে । সেই বোমার মামলার আসামী তো ? যার সঙ্গে আমাদের লোক গেছল খাবারের দামটা আনতে ? আরেকটু হলেই সে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যেত । ফাঁড়া কাটিয়ে খুব বেঁচে ফিরে এসেছে সেদিন । মা-কালীর কৃপা ছাড়া কী ! তা, সে ব্যক্তি কি আপনি ? আপনি বলছেন আপনিই সেই লোক ?'

'হ্যাঁ, সেই কথাই বলতে এসেছি তো...'

'বোমা পিস্তল সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নাকি ? পুলিস আপনার পেছনে নেই তো ? পিছু নেয়নি তো পুলিশ ? জানেন ঠিক ? তা কী চাই আপনার বলুন ? কতো চাই ? চটপট বলুন মশাই। কত টাকার দরকার ? গুলি গোলা ছুঁড়তে হবে না আপনাকে, এমনিতেই দেব। দেশের জন্যে কিছুই করতে পারিনে—যদি এভাবেও কিছু করা যায়। এই, দ্যাখ তো ক্যাশবাক্সে কতো আছে আজ ?'

'আজ তো সকাল থেকে তেমন বিশেষ বিক্রি হয়নি বাবু। এমন কিছু টাকা পড়েনি বাক্সে...।' বাক্সর জিম্মাদার গাঁইগুঁই করে জানায়।

'না না, টাকার কোনো দরকার নেই আমার। আপনাদের ভাঁড়ার লুঠ করতে আমি আসিনি। আপনাদের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের আদর্শ মিষ্টান্নাদিও নয়—হাজার তা উপাদেয় হলেও। আপনাদের সেই পাওনার টাকাটা মিটিয়ে দিতেই আমি এসেছিলাম...'

'কিসের টাকা ?' তিনি এবার সত্যিই যেন হতভম্ব।

'সেই মেঠায়ের দামটা মেটাতেই...সেদিন যে রাজভোগগুলো খেয়ে গেলাম না ? অমনি অমনিই—জেল থেকে আজ খালাস পেয়েই তার দাম দিতে এলাম আপনাদের। এর আগে দেবার ফুরসত পাইনি তো ? এখন পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিন আপনারা।'

'ও ! তাই নাকি ? তা ভালো।' স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো তাঁর। —'ভালো—তা ভালো ! বসুন এই চেয়ারটায়। ক'টা রাজভোগ খেয়েছিলেন সেদিন ?'

'তা গোটা বিশেক তো হবেই ?' আমি বিশদ করি—'এক্কেকটা ওর দাম কতো ? আপনাদের ওই অতিকায় রসগোল্লাগুলোর ?'

'বেশি নয়, চার আনা পিস্। কিন্তু বিশটা রাজভোগ আপনি খেয়েছেন—খেতে পেরেছেন, তা আমার বিশ্বাস হয় না। আপনার ওই পল্‌কা দেহে অতগুলো রাজভোগ ধরবার জায়গা কোথায় ? কট্টুকুন পেট আপনার ?'

সপেট আমার সর্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠবের প্রতি তাঁর এই অপাঙ্গ দৃষ্টির কটাক্ষপাতে আমি লজ্জিত বোধ করি। নামমাত্র এই পেট নিয়েও আমি যে খাওয়ার ব্যাপারে সপটু, উল্লেখযোগ্য এক পেটুক—কী করে তাঁকে বোঝাই ?

'ধরবার জায়গা নেই ঠিকই, কিন্তু ধরিয়েছিলাম কোনোগতিকে। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগে প্রাণের দায়ে খেতে হয়েছিল আমায়। পেটে খেলেই পিঠে সয়, জানেন তো ? লালবাজারে গিয়ে কী পিঠে পড়বে কে জানে—সেই পিঠে খাবার আগে গায়ে জোর করার জন্যেই এখানে এসে পেটকে সইয়েছিলাম। এই আর কি ! তা দামটা...'

'তা হলেও আমাদের পেত্যয় হচ্ছে না মশাই ! বিশ-বিশটা রাজভোগ গিলেছেন আপনি। বেশ, খান তো বসে আমাদের সামনে আবার, দেখা যাক। এই, দে তো এনাকে বিশটা রাজভোগ এনে এখেনে। টাটকা যেগুলো আজকের—তাই দিবি।'

রাজভোগের সামনে বসতে হল না, বসেই ছিলাম, রাজভোগ আমার সামনে এসে বসল।

'খান তো দেখি এবার।'

প্রমাণ দিতে বসে পেটের না অপমান করে বসি—ভয় হয় আমার। পেটের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়—তা জানি, কিন্তু যে পরম মিষ্ট (নেরম অধরেরে কথা ধরছিনে) উল্লাসবোধে অনায়াসে খাওয়া যায়, তাই উপরোধে গিলতে হলে ঢেঁকির মতই মনে হতে

থাকে। ঢক করে গেলা যায় না। যাই হোক, কুঁথিয়ে-কাঁথিয়ে তো পার করা গেল কোনো রকমে।

তারপর দামের কথাটা ফের পাড়তেই—'না না! এর দাম দিতে আর হবে না আপনার। এ তো আমরা খাওয়ালাম। আনন্দে খাইয়েছি আপনাকে। খেয়ে আপনি আনন্দিত হয়ে থাকলেই আমরা খুশি। এ তো বাজি ধরে খাওয়াই একরকমের। বাজি জিতেছেন, তার দরুন আরো বিশটা ওই রাজভোগ আপনার পাওনা। না না, এখানে বসে খেতে হবে না আপনার—আপনাকে খুন করতে চাইনে আমরা। বাড়ি নিয়ে ধীরে সুস্থে খুশিমতন খাবেন। এই, দে তো এনাকে একটা বড়ো হাঁড়িতে করে আরো বিশটা সরেস রাজভোগ গরম দেখে—যেটা নেমেছে আজ সকালে—এক নম্বরের।'

'তা এটার দাম না নিন, নাই নিলেন, কিন্তু আপনার আগেরটা—' চমৎকৃত হয়ে আমি কই।

'সে তো আমরা সেদিনই বাঁ দিকে খরচ লিখে রেখেছি, আমাদের লোকের মুখে শুনেই না—তখুনিই। তার কী দাম দেবেন আবার? তা ছাড়া, আপনারা হচ্ছেন খুদিরামের সগোত্র (হায় খুদিরাম, অপদার্থ শিব্রামের সঙ্গে তুল্যমূল্য হয়ে গেলে!) ফাঁসিকাঠে হাসিমুখে প্রাণ দিতে যাচ্ছেন আপনারা (হায় হায়!!) আপনাদের খাওয়াতে পারাটা তো ভাগ্যের কথাই। আপনি যখন খুশি আসবেন এখানে, যা খুশি খাবেন, তার জন্য কখনো কোনো দাম দিতে হবে না আপনাকে। এঁকে চিনে রাখো তোমরা। দেশের জন্যে অক্লেশে প্রাণ দিতে যাচ্ছেন এঁরা—আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। আপনাদের দেখলে পুণ্যি হয়। দোকানে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়াটাই বরাত! আসবেন আবার...আসবেন তো?... নিশ্চয় আসবেন। নমস্কার নমস্কার।'

রাজভোগের হাঁড়ি হাতে, মুখ হাঁড়ি করে ফিরলাম নিজের মেসবাড়িতে। কিন্তু তারপরে আমি বীরেনদার সেই কথাটা রেখেছিলাম। ওধারের ফুটপাথ মাড়াইনি আর। ওঁদের দোকানে যাইনি আর কখনো। আদর্শ মহাজন অতবার নিশ্চয় করে বলার পরও, এমন কী তাঁর কর্মচারীদের আমায় চিনে রাখতে বললেও আমি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছি। যথার্থই তাঁরা যে এ যুগের আদর্শস্থানীয় তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। আহারে আহারেও। সত্যি বলতে, সেই বিনিপয়সার ভোজে কি রকম যেন বিড়ম্বিত বোধ করেছিলাম। তাঁর মুখে খুদিরামের নামোচ্চারণেই বিষম খেয়েছিলাম—আমার সেই বিষম খাওয়াটার ওপর আবার! যে খুদিরামের খুদকুঁড়োও নেই আমার, সেই তার আদর্শ ভাঙিয়ে আরেক আদর্শের ঘাড় ভেঙে এই খাওয়াটা কেমনতর লাগছিল যেন।

কিন্তু ভেবে দেখলে, এ দুনিয়ায় কিছুই মানুষের ইচ্ছায় আদৌ হয় না। কী রাজভোগ, কী রাজদন্ডভোগ—কোনোটাই কখনো ইচ্ছে করলেই মেলে না। পরের রাজভোগের কথা রাখুন, নিজের রানীভোগ কিংবা হয়রানিভোগ, এমন কি তাও নিজের ইচ্ছেমতন হবার নয়।

সেদিন বীরেনদাকে ফৌজদারি কোর্টের মুক্তাঙ্গনে ফেলে রেখেই জেলে ফিরলাম আমরা।

আদালত ভাঙার পর কয়েদ-গাড়িতে আমাদের ওঠার সময় কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সাশ্রুনেত্র হবার সহস্র চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে নিরুপায় শেষটায় হাসিমুখেই বিদায় দিলেন আমাদের। বিনাবাক্যব্যয়ে উভয় পক্ষের সেই বিদায়।

ফিরে এলাম জেলে। সেটা সেন্ট্রাল জেল কি প্রেসিডেন্সি, আজও আমি ঠিক জানিনে। তখন হয়ত জেনেছি, মনে নেই এখন আর। এইমাত্র বলতে পারি, যেই জেলে সেই সুবিখ্যাত

চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর অন্ধকূপগুলি বিরাজিত, এ হচ্ছে সে-ই জেল।

সকালেই বীরেনদার আবেদনে ব্যবস্থা হয়ে রয়েছিল, সেই মতন সন্ধ্যেয় খাওয়া খতম হবার পর আজ আর আনডারট্রায়ালদের সেই জেনারেল পিজরাপোলে যেতে হল না, সোজাসুজি চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর দুই সেলে দুজনে গিয়ে মজুদ হলাম আমি আর গিরিজা।

'যার বর্ণনা, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের উপেনদার 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় পড়েছিলাম, খুদিরাম প্রমুখদের সতীর্থস্থল না হয়েও, অনুগামী সহযাত্রী না হলেও, বাংলার-বাঙালীর সেই তীর্থস্থলে যাবার—তার ধূলায় গিয়ে গড়াবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের।

॥ তেষট্টি ॥

ফৌজদারি কোর্টের ফেরত সন্ধ্যের মুখে জেলে ফিরেই খানার সম্মুখে। আর, খাবার পাট চুকিয়েই আরেক লৌহকপাটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

পিঁজরেগুলি বেঁটেখাটো, একটা নয়, সারি সারি লৌহকপাট—চুয়াল্লিশ ডিগ্রির। পরের পর সাজানো। পূব আর দক্ষিণমুখো বাইশটা করে ছোট ছোট ঘর কোণ ঘেঁষে রাইট অ্যাংগলে কাট্-করা দু'সারিতে। ফাঁসির আসামীদের থাকার জন্য কন্‌ডেমড্ কুঠরি—জেলের নিয়মভঙ্গকারীদের রাখার জন্য সলিটারি সেল—যার নাম নাকি ঠাণ্ডিগারদ। সেই টর্চার সেলের একটার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

হাবিলদারের টর্চের আলোয় ভেতরটা দেখে নিলাম এক নজর। দুখানা কম্বল পাশাপাশি পাতা যায় এতটাই চওড়া আর লম্বায় বোধ হয় আড়াই কম্বলটাক।

খুপরির এককোণে একটা চুপড়ির মতন রাখা, সেটা নাকি প্রাতঃকৃত্যের জন্যই, জানা গেল। রাত্রকৃত্যর নিমিত্তও লাগতে পারে দরকার পড়লে। কারাকক্ষের লৌহঘটিত দরজার ওপাশটায় এক বালতি জল, আর এধারে একটা ঘটিমার্কা মগ। পানাহার শৌচকর্মাদি কৃত্যাকৃত্যের প্রয়োজনে। লৌহদ্বারের রেলিং-এর ফাঁকতালে মগ গলিয়ে অনায়াসে জল আনা যায় দেখা গেল। একটুকরো এই মগের মুল্লুকের আমিই এখন একেশ্বর।

পাশের খর্পরে গিরিজার ঠাঁই হয়েছিল। একটু পরেই তার সাড়া পেলাম—শিব্রাম্! এই শিব্রাম্!'

আমার ঘুম পাচ্ছিল। কোনো সাড়া দিলাম না। কিন্তু তার আগেই হাঁক পাড়ল হাবিলদার—'অ্যায়, চুপ রহো। বাতচিৎ মনা হৈ।'

বেঁচে গেলাম।

গিরিজার সঙ্গে কথা বলা মানেই তর্ক লাগানো। আর, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই। এঁড়ে তর্ক, কি যুক্তিসহ বেড়ে তর্ক, তা জানিনে, লজিক আমার পাঠ্য ছিল না। (লজিক্যাল নই কোনো কালেই তো), কী করে বলব। তবে ওর সঙ্গে পেরে উঠি না, তা জানি। তাই সর্বদাই সতর্ক থাকি, পরমব্রহ্মের ন্যায় ওকে তর্কাতীত রাখি। নিজেও আমি তাই থাকতে চাই।

অপরেও প্রায় তাই, আমার মনে হয়েছে। বিমল বলে ওর এক কলেজী বন্ধু ছিল, হাওড়া না কোথায় থাকত যেন, ওর কাছে আসত মাঝেসাঝে। দেখতে শুনতে ভালোই ছেলেটা। কিন্তু দেখতে যত ভালো, শুনতে ততটা নয় নিশ্চয়। তার প্রাণের বন্ধু হলেও মোটেই তার কানের বন্ধু হতে পারেনি।

এক নাগাড়ে গিরিজার বাগড়ম্বর সে সইতে পারে না। ভদ্রছেলে, মুখ ফুটে কোনো আপত্তি করত না বটে, কেননা তা করতে গেলেই তো আরো আরো বাগ্‌নিষ্পত্তি আর বিপত্তির কারণ হবে সে জানত। তার চেয়ে তার তর্কের পাল্লা কাটিয়ে আমার খোসগল্পের মহল্লায় চলে আসত সটাং। গিরিজার ত্রিসীমা এড়িয়ে, বাসার থেকে বেরিয়ে সামনের মার্কাস স্কোয়ারে গিয়ে গল্পগুজবের চক্কর মারতাম আমরা। আর, গিরিজা এমন চটত যে আমার উপর!

আজ জেলের পাহারাদারের সতর্ক প্রহরায় গিরিজার তর্ক পরিপাটি হয়ে উঠবার আগেই পরাস্ত হয়ে গেছে।

'যা শত্রু পরে পরে—বলে না? সেই রকমই প্রায়।

বুট পরে গট গট করে হাঁটছিল লোকটা। ডিগ্রী এলাকার এমোড় থেকে ওমোড় অব্দি তার পাহারার পায়চারি চালাচ্ছিল সে। সঙ্গীন বন্দুক হাতে।

মাঝে মাঝে খুপরির গোড়ায় এসে টর্চ ফেলে তাকাচ্ছিল ভেতরে—কী করছে কয়েদীরা চারধার নিশুতি। কোনো শব্দ নেই কোথ্থাও। কেবল সেই সবুট পদধ্বনি : গট্ গট্ গট্ গট্।

শব্দ কি ছিল না আর কোথাও?

ছিল। দক্ষিণা হাওয়া দিয়েছিল বাইরে, প্রায় ঝড়ের মতই বইছিল যেন। ঝড়ের মাতন গাছপালায়। তার সরসরানি মড়মড়ানি শাখায় শাখায় পাতায় পাতায়। সারা রাত।

ঘুমিয়ে পড়ছি, ঘুম ভাঙছে, ঘুমুচ্ছি ফের, জাগছি আবার। আর রাতভোর শুনছি সেই মর্মরধ্বনি।

বাইরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুপরিটার ভেতরে কি এক ফোঁটাও হাওয়া আসতে নেই? পথ ভুলে একটুখানি হাওয়াও কি আসতে পারে না এদিকে? ঘরের মধ্যে গরমের এমন বিচ্ছিরি ভ্যাপসা যে কী বলব! বলতে গেলে আরো ঘামতে হয়।

'মা বলতেন মিছে নয়, প্রমাণ পেলাম তার এখন। ভগবানের যা কিছু দান, তা পেতে হলে অপরকে দিয়ে তবে পেতে হয়, বলতেন মা। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তখন তাঁকেই ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাইতেই।

রূপগুণ অর্থ সামর্থ্যের মতন জল-হাওয়াও বিধাতার দান বইতো নয়। যাবার পথ তার খোলা না রাখলে আসার পথ খোলা থাকে না। তাঁর আসা হয় না, আমাদের আশা ব্যর্থ হয়।

এই যে, দারুণ বাতাস দিয়েছে বাইরে, মাঝে মাঝে তার এক-আধটা ঝাপটা লাগছে এসে গায়ে। কিন্তু আমার ওপর দিয়ে তা বয়ে যেতে পারছে না—কেবল আমার অচলায়তনের এদিকটা উন্মুক্ত নয় বলেই তো? দক্ষিণা হাওয়ার দাক্ষিণ্য লাভে আমি প্রবঞ্চিত তাই।

সকালে খুপরির তালা খোলার পর আমাদের দু'জনকে নিয়ে দশ নম্বর ওয়ার্ডে ছেড়ে দেওয়া হল।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বেবাক ফাঁকা, একধারে চৌবাচ্চা ভর্তি জল। নাওয়া-টাওয়ার ভারী সুবিধে হবে এখানে। গিরিজাকে দেখাই।

'দাশসাহেব এই দশ নম্বর ওয়ার্ডেই থাকতেন, সেনগুপ্ত সাহেবকেও রাখা হয়েছিল এখানেই। জানালো মেট। 'দাশসাহেব এই চৌবাচ্চাতেই নাইতেন। কোণের ওই ফুলগাছটা উনিই লাগিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি ?'

এই ফুলগাছের ধার দিয়েই সেই ভাগীরথীর ধারা বয়ে গেছে একদিন। জেনে রোমাঞ্চিত ই। ফুলগাছটাকে আমি একটু আদর করলাম কাছে গিয়ে।

ঢং দ্যাখো না! গিরিজার বাঁকা হাসি দেখা গেল।

'ঢং কিসের ? এখানে আর কাকে পাচ্ছি বলো ? খাব কাকে ?' সাফাই গাই যেন—'তাই র ওপর দিয়েই একটুখানি মিটিয়ে নেয়া গেল ভাই!'

'যথার্থই! আদর করার আর একটা পাত্র না পেলে চলে না যেন কারো কারো। এই শোর পল্লবটি আমার প্রিয়জন না হলেও প্রয়োজন এখন। সত্যি বলতে, আমার বন্ধু ভূতিভূষণের ন্যায় প্রকৃতির প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। কোনোদিনই ছিল না। কৃতি তো পটভূমি মাত্র, তার ওপরেও আরও কিছুর যেন অপেক্ষা থাকে, সেই পরিবেশে রীর মতন বেশ এমন কিছু, তেমন কেউ। বন্য প্রকৃতির পরেও অন্য প্রকৃতি—সেই অপার াধুরীর ওপরে অপর কোনো মাধুর্য। তা না হলেও, আলোর মধ্যেও সবটাই কেমন যেন

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, হ্যাঁ ঠিকই। কিন্তু ভুবন হাজার সুন্দর হলেও তার চয়েও বড় সত্যি, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। এই সূর্যালোকে এই পুষ্পিত গননে—সুষমায় অপর্যাপ্ত, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার পরেই কবি যে ওই বলেছিলেন—জীবন্ত দি মাঝে যদি ঠাঁই পাই—চরম সত্য সেইটাই।

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণকে দেখেছি প্রকৃতির ক্রোড়ে গিয়ে নিমগ্ন হয়ে যেতে—গিয়ে তন্ময় তেন, তন্ময় হবার জন্যই যেতেন যেন সেখানে। সেই ঘাটশিলায় আমিও গেছি, মাঝে াঝেই যাই এখনো, তাঁর দেখা সেইসব গাছপালা পাহাড় আমিও দেখেছি, আমারও দেখা। ফুলডুংরির থেকে ডুংরি-এর ফুল কিছুই অদেখা নেই। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। মুখ রে গেছে তার রূপসুধায়, বলতে কি! কিন্তু তাঁর মতন তাদের রূপগুণে আমি বিভোর তে পারিনি।

বন্য প্রকৃতির লাবণ্য দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু দেখা যায় বড় জোর পাঁচ মিনিট। তার বশি আর নয়।

দেখে দেখে একঘেয়ে লাগে কেমন। অরুচি ধরে যায়।

কিন্তু এই কলকাতায় কখনোই তেমনটা হয় না, এখানে ক্ষণে ক্ষণেই রূপের নতুন মুখ দখি, মুহূর্তে মুহূর্তে মুখ বদলানো যায়। কিন্তু প্রকৃতির গর্ভে সেটি হবার যো নেই, সেখানে, সই গাছ সেই ফুল কাল যা দেখেছি আজও তাই, মিনিট পাঁচেক আগেও যেরকমটি, এখনো তদ্রূপ। তার কোনো তারতম্য নেই। ইতরবিশেষ হয় না কোনো। পাহাড় যেখানে যমনটি ছিল সেখানেই তেমিনি স্তূপাকার। অবিকল সেই রূপেই—কালকে যেমনটা দেখা গছে। হেরফের নেই কোথ্থাও। আলাদা আলাদা জাতের ফুল থাকলেও এক জাতীয় ফুলের এক রকমই চেহারা চিরকাল। একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়।

গাছপালা পাহাড়পর্বত নদীনালা চিরকাল একরকমই থাকে। ক্ষণেকের জন্যে বারেক দেখলেই হোলো, দু'বার দেখার কিছু নেই। কিন্তু মানুষের বেলাও কি তাই ?

মানুষের মধ্যে যারা সুন্দর তাদের বেলায় কি তা বলা চলে ?

প্রকৃতির চিত্রপটে এক রূপ, একই রূপ চিরকাল, কিন্তু কোনো কিশোরীর মুখপটে সেই

রূপেরই বিচিত্র রূপ—এক রূপসীই নিত্য নব। মুহুর্মুহুই তিনি অপরূপ। ভিন্ন কিশোরী, ফুলের মতন প্রস্ফুটিত হলেও, বিভিন্ন রূপে বিচ্ছুরিত। অন্য কিশোরী ভিন্ন ভিন্ন রূপের বিভিন্ন রূপে দেখা দিলেও প্রত্যেকেই তারা অনন্যা। সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে এক জাতের ফুল এক রূপে দেখা দিলেও এতাবৎ সেই কৈশরের দুটি মুখ কখনই এক রূপে দেখা যায়নি—এক মুখে অসংখ্য রূপ অন্তহীন অফুরন্ত হয়ে দেখা দিলেও কিন্তু এখানে, এই মরুভূমিতে এসে এখন এই ফুল গাছটিকেই যেন আমার দারুণ ভালো লেগে গেল। কেন, কে জানে!

ভালোবেসে ফেললাম, এতবড় মিথ্যে কথা আমি বলতে চাই না, বিভুতির সেই অনুভূতি, কিংবা অনুভূতির সেই বিভূতি আমার নেই, তবে এখানকার এখনকার এই নিঃসঙ্গ দশায় গাছটিকে মিষ্টিত লাগছিল বেশ। তার প্রেমে ঠিক না পড়লেও। তার ডালপালায় ফুল-পাতায় আদর করলাম অনেক অনেক। ঘুরে-ফিরে। বারংবার। সে কি জেলখানা বলেই, আমি এখন একেবারে নিঃসঙ্গ বলেই কি ? আমার এই অকারণ ভালো লাগাটা, প্রকৃতি-প্রবণতা—আমার প্রকৃতিদুর্লভ এহেন আচরণ তা কি এখানকার এই নির্জন অরণ্যবাসের জন্যেই ? কিন্তু বিভূতিবাবুর বেলায়...?

বিভুতিবাবু কি ধরাধামকে কারাগার জ্ঞান করতেন? অন্তঃকরণে কি তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন?

॥ চৌষট্টি ॥

এই লুব্ধ প্রকৃতির হলেও প্রকৃতিলুব্ধ আমি কখনই নয়। প্রকৃতির লীলাখেলা কি রূপ-যৌবন কোনদিনন্ আমায় বিচলিত করেনি। যে মহাবোধির সংক্রণে আব্রহ্মস্তম্ভ বিশ্বচরাচরের সহিত একাত্মবোধে প্রাকৃতিক সহানুভূতি জাগরূক হয়, আর তদ্গত মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে গাছপালা নদীনালা পাহাড় পর্বতের অপার্থিব অভিব্যক্তি ব্যক্ত হতে থাকে, অনুভূতির সেই বিভূতি (কিংবা, বিভূতির সেই অনুভূতি) আমার লেশমাত্র নেই। তাই অতিশয় প্রাকৃতিক (এবং কিছুটা অতিপ্রাকৃতিকও বোধহয়) বিভূতিভূষণ বনভূমির লাবণ্য দেখে যেখানে তন্নিষ্ঠ আত্মহারা হয়ে যান, সেখানে আমি একটুখানিও ঘনিষ্ঠ হভে পারিনে।

জানি গাছপালারা আমাদের অনাত্মীয় নয়, বাঁদররা আমাদের পূর্বপুরুষ। একই পাদপ-পিতার শাখার থেকে আমাদের উভয়ের উত্তরণ—কিন্তু আদ্যিকালের এই ঐহিক সম্বন্ধ থাকলেও এবং বৃক্ষলতাগুল্মের সঙ্গে শারীরবৃত্তে (আর বৃত্তিতেও) আমাদের অভিন্নতা আচার্য বসুর আবিষ্কারের পরে সপ্রমাণ হয়ে দৈহিক সম্পর্কে আমরা সন্নিকট হলেও, কেন জানি না, তাদের সঙ্গে কোনো স্নৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা বুঝি চলে না। প্রাণের অচ্ছেদ্য বন্ধন সত্ত্বেও হৃদয়ের আদানপ্রদান বাধা পায়। গাছপালাকে যেন কিছুতেই ভালোবাসা যায় না।

তবুও জেলখানার এই ফুলগাছটিকে আমার এমন ভালো লেগে গেল কেন যে হঠাৎ! প্রাকৃতিক পটভূমির বাইরে , পরিবেশও যেখানে ঠিক প্রাকৃতিক নয়, প্রকৃত তো নয়ই, সব কিছুই একটু অপ্রকৃতিস্থ, আমার স্বভাবের এই অকারণ অন্যথা দেখা গেল। ফুলগাছটির কী মাধুরী ছিল কে জানে, প্রথম দর্শনেই আমাকে যেন অভিভূত করেছিল! কিন্তু কেন যে, তার কোনো মাথামুন্ডু আমি খুঁজে পাইনি, তখনও না, এমনকি এখনও নয়। অবশ্যি টানের

কোনো মানে হয় না জানি। কেন যে হয়, কখন হয়, কার জন্যে হয়, কী কারণে হয়ে থাকে বা হবেই যে, তা কেউ বলতে পারে না। বেশির ভাগ অপদার্থদের দিকেই তার ঝোঁক আমি দেখেছি।

চিরকালই তা এক রহস্য।

দুটি কূল থাকলেই হোলো, সেই দুয়ের আনুকূল্যেই টানাপোড়েনে সে বয়ে চলে, টানের চোটে কোথায় কাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কে জানে!

দুটি কূলই তার যথেষ্ট—সেই দু হাতেই তার জলতরঙ্গের তাল বাজায়—ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তাল হয়ে বাজে বুঝি। তার মাঝে পড়ে তৃতীয় কোনো প্রতিকূল এসে যদি বাধা দিতে যায় তা যেন সেই টানকে আরো জোরদার করে দেয়। বেজার করে যায়। তিনকোণা ধাক্কায় তখন তা ফুলে ফুলে কূলে কূলে কানায় কানায় ছাপিয়ে ওঠে, দিগ্বিদিক ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

কানায় কানায় ছাপায় যে, সত্যিই! চোখারাও কিছু পার পায় না। ভালোবাসা এমনই অদ্ভুত! তো যেমন বোকাদের চৌকস করে তেমনি আবার চোখাদের ধরে বোকা বানায়। গোড়াতেই কানা করে তারপরে কিনা কানায় কানায় ছাপিয়ে যায়।

গিরিজা চোখা ছেলে, তার নজর পড়তে দেরি হয়নি। সে বললে, তোমাদের দুটিতে মিলেছে ভালো। দু'জনেই তোমরা ফুল তো—যদিও আলাদা বানানে। ওটা ফুলগাছ আর তুমি একটি গেছো ফুল।

সে কথা সত্যি! নিজেকে কোনোদিনই আমি চৌকস বলে ভাবতে পারিনে। যখনই যে টানের মাথায় পড়েছি অবলীলায় ভেসে গেছি, চোখ কান খোলা রাখতে পারিনি। টান যদি অন্ধ না করে দেয়, চোখে কানে দেখতে না দেয় যদি, তবে আর সে টান কিসের!

তবে এহেন গেছো প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয়। এর আগে আরো দুটো ফুলগাছ এসেছিল আমার জীবনে—টেনেছিল মূলসুদ্ধু, মনে পড়ে আমার। সেই অনুষঙ্গেই এই গাছটিকে আমার ভালো লেগেছিল কি না কে জানে!

সেই কৈশোর-স্মৃতিই যেন ভেসে উঠল আচম্বিতে।

রোজ বিকেলে পকেটে পাটালি আর চিড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম বেড়াতে, রিনি আর আমি—সেই যুঁই গাছটার তলা দিয়ে, কুকুরদীঘির ধার ঘেঁষে, মেঠো ক্ষেতের আলপথ ধরে চলে যেতাম মহানন্দার কিনারায়। সেখানে একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর বসে সরু চিড়ের সঙ্গে খেজুর গুড়ের পাটালির শ্রাদ্ধ করতাম দুজনায়।

একেকদিন রিনি এলিয়ে পড়ত কোলের ওপর। আমার উপকূলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে চিড়ে গুড় চাখত আর আলোয় আলো আকাশের দিকে চোখ তুলে রাখত। গোধূলি বেলার রঙের খেলায় শূন্যের মহাসাগরে বুঝি বান ডাকত তখন। কোনো কথাটি না কয়ে চুপ করে পড়ে থাকত সে।

অস্তমান সূর্যের মুখোমুখি বক্ষ্যমান চাঁদকে সুমুখে নিয়ে—(রিনির সঙ্গে তুলনা দিয়ে, আমি বলব, মস্ত মান দেওয়া হোলো চাঁদটাকে!) আমি তখন...তখন কি আমি...খেজুর গুড়ের সঙ্গে চাঁদের গুঁড়ো মিশিয়ে চন্দ্রপুলির আস্বাদ পেয়েছি।

সেকালের সেই পাথরটাকে—(উল্কাবেগে কক্ষভ্রষ্ট চন্দ্রশিলাই ছিলো নাকি সেটা!) এখনো আমি ভুলতে পারিনি। আর সেই যুঁই গাছটাকেও নয়। কী মিষ্টি গন্ধ বিলোতো সে চার

ধারে—কতো ফুল তার ছড়ানো থাকত তলায়। যুঁই বিছানো সেই ঘাসের বিছানায়, তার ছায়ায় কতো রবিবার, ভ্যাকেশনের কতো দুপুর হাতে হাত দিয়ে আমরা বসে থেকেছি দুজনে যে!

একেক সময় মনে হয় সেই গাঁয়ে গিয়ে দেখে আসি তাদের—সেই গাছ আর পাথরটাকে। এখনো কি তারা সেইখানে আছে, তেমনটিই রয়েছে? বেঁচে বর্তে আছে এখনো? তেমনিই কি পাপড়ির সঙ্গে যুঁই ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে গাছটা? সেই পাথরটায় কোন চাঁদমুখ নিজের সিংহাসন পাতে এখন?

সেদিন জেলের ফুলগাছটিকে দেখে ফেলে-আসা সেই গাছটিকে মনে পড়েছিল আমার। যেমন এখন এই লেখার সময় সেই গাছটাই আমার মনে ফিরে দেখা দিয়েছে আবার।

এখনো মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছে করে বইকি। স্বজন বন্ধু কারো জন্যে নয়, কে আর আমার আছে সেখানে! সেকালের বন্ধুদের প্রায় সকলেরই তো একে একে মহাপ্রয়াণের খবর পেয়েছি, আমার পরিচিত কেউ বোধহয় আর বেঁচে নেই কোথাও...আমার সময়ের সেই গাছ পাথরই কি রয়েছে আর?

আর থাকলেই বা তার দাম কী আর? এক-এর অভাবে শূন্যের কি মূল্য দাঁড়ায়? রিনির বিহনে সে গাছ কি আর সেই গাছ? সেই পাথর আর সেই সিংহাসন নয়; বিবর্ণ, পান্ডুর, ধূসর শিলালিপির মতই নিতান্তই এক পান্ডুরাজার ঢিপি!

এক চলে গেলে শূন্যের কী থাকে আর? মহাশুন্য ছাড়া আর কী? সংখ্যাহীন শূন্যযোগে তার কিছু দাম কি আর বাড়ে? পাশের একক গিয়ে সেই গাছ-পাথরের মতই আমিও আজ একাকী! চারপাশের শূন্য নিয়ে, আকাশের মতন ফাঁকায় পড়ে আজ আমি একান্তই একাকী—নিতান্তই শূন্যাকার।

কিন্তু আমার কালের কেউ নেই, আমার বয়সের গাছ-পাথরও না, অথচ আমি রয়েছি, ভাবতে গেলে বিস্ময় লাগে বইকি। কতোকাল ধরে বাঁচছি...বাঁচছিই...বেঁচেই যাচ্ছি, মরবার নামটিও নেই। বাঁচতে বাঁচতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

অবাক হবার কথাই। এমনকি প্রেমেনও অবাক হয়েছিল এক সময়...সেই কালেই! অনেককাল ধরে আমাকে একরকমটি দেখে এবং কোনো বৈলক্ষণ্য না দেখে সে একবার বলেছিল আমায়—তুমি বাবা জীউ!

বাবাজীউ? বাবাজীউ মানে তো জামাই! আমি বলেছি—কারো বাবাজীউ কি হতে পারলাম ভাই আর?

আহা, সে বাবাজীউ না গো। সেই জীউ! জীউদের বাবা—সেই ওয়ান্ডারিং জীউ। অনন্তকাল ধরে সে নাকি পৃথিবী জুড়ে...পায়চারি করছে, করেই চলেছে—তুমিই সেই। মহেঞ্জোদারোর সময়ে তুমি ছিলে, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের আমলেও—সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময়। আবার এখন আমাদের সামনেও তুমি রয়েছো। আমরা মরে যাব, আমাদের নাতি-নাতনিরাও—সবাই মরে ভূত হবে। তুমি কিন্তু বাবা টিকে থাকবে ঠিক চিরকাল এইরকমটিই!

আমার নিত্য বর্তমান দশায় সে বিস্ময় বা বিরক্তি—কী প্রকাশ করেছিল জানি না। সেই কথাগুলোও সেই সঙ্গে মনে পড়ে আমার।

'আজ ঘুম থেকে উঠে কী দেখলাম জানো?' অন্য কথা এনে গিরিজা আমার ভাবনার

মোড় ঘোরায়—'আমার সেলের মধ্যে কী দেখেছি জানো ?'

'আমিও দেখেছি—আমার সেলেও রয়েছে। প্রাতঃকৃত্যর নিমিত্ত সুরক্ষিত সেই চুপড়ির কথা বলছো তো ?'

'ধুত্তোর চুপড়ি! দেয়ালের গায়ে কবিতার ছত্র লেখা রয়েছে দেখলাম। রক্তাক্ষরে লিখিত।'

'আমার দেয়ালেও লেখা আছে দেখেছি। ওইসব সেলে আগে বিপ্লবী কয়েদীরা সব থেকেছিল না ? তাদের কর্ম। তাদের মনের কথা ছত্রাকারে লিখে গেছে তারাই।'

'সরঞ্জাম তারা পেল কোথায় আমি ভাবছি। পেনসিল কি কলম কিছু তো নিয়ে আসতে দেয় না ভেতরে।'

'নিজের আঙুল দিয়ে লিখেছে হে। ছুরি দিয়ে আঙুল চেঁছে ...'

'ছুরিই বা পাবে কোথায়। ছুরি কি আনতে দেয় এখানে ?'

'ছুরি তো দাঁতেই রয়েছে। দাঁতে আঙুল কেটেছে।'

'ওব্‌বাবা !' শুনেই সে আঁতকায়।

'তুমি আমি তা পারব না। তোমার আমার কাছেই ওব্‌বাবা। কিন্তু তাদের কাছে কিছুই না—নিজের আঙুল কাটা তো তুচ্ছ—যারা নাকি ফাঁসিকাঠে হাসিমুখে নিজেদের প্রাণবলি দিতে যাচ্ছে...'

শুনে গিরিজা গুম। অনেকক্ষণ আর তার কোনো গুমোর দেখা গেল না। তার পরে গুমরানি শুনলাম সেই আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে।

পাবলিক প্রসিকিউটর তারক সাধুর অভিযোগক্রমে আমাদের নামে চার্জ গঠিত হলে সে বললে, 'আমাদের বিরুদ্ধে সিডিশনের চার্জ এনেছে জানো ? একশো চব্বিশ না কতো ধারায়।'

পাঠশালার ধারাপাতের মতই আইনের ধারা-জ্ঞান আমার। —'তার মানে ?'

'তার মানে, ঐ ধারার খর্পরে পড়ে ধূমকেতুর জন্য কাজীদার দু'বছর হয়ে গেছে না ?...'

'কাজীর দু'বছরের জেল হয়েছে জানি, কিন্তু ধারার কোনো খবর রাখিনে...কোন্ ধারায়, কিসে কী হয়, কে তার ধার ধারে।'

অমরেশ কাঞ্জিলালের হয়েছে পাক্কা তিন বছর—'আমলাতন্ত্রের ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দাও', শুধু এই একটি লাইন লেখার জন্যই।'

'তাই নাকি? তা, সিডিশন যখন রাজদ্রোহই, তখন তার জন্য ওরা ফাঁসিও দিতে পারে ইচ্ছে করলে।'

'তারপরে কাজী আর কাঞ্জিলালের ভুঁড়ি ফাঁসানো মামলা বাদেও লোকমান্য তিলকের হয়েছিল ছ' বছর এই সিডিশনের জন্যই', বলে সে আরো ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি আর উদাহরণমালার সামনে দাঁড়াতে উৎসাহবোধ করি না—'ধরো ভাই, আমাদেরও যদি তিন বছর হয়ে যায় তাহলে ?'

'ভাবছি তাই।

'তাহলে আমি আর জেল থেকে বেরুতে পারব না সত্যি বলছি। এই হাড় ক'খানা জেলেই রেখে যেতে হবে আমাকে। দশ দিনের জেলেই একবার যা দশা হয়েছিল না আমার, সেই খিদিরপুর ডকে... তবে আমার মনে হয় তা বোধহয় হবে না এবার।'

'কী করে বুঝলে ?'

'বোঝা যায়। আঁচ পাওয়া যায় একআধটু। তবে না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই। আইনের আচরণ না দেখা পর্যন্ত কিছু বলা যায় না—সে কথাও ঠিক।'

এমন সময় জজসাহেব জিজ্ঞেস করলেন আমাদের—'আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমরা কোনো উকীল দেবে না ? উকীল দিতে চাও তোমরা ?'

গিরিজা তার কী যে জবাব দেয় মনে নেই আমার, আমি কিন্তু সাফ জানাই—'কোথায় পাব সার উকীল ? উকীল লাগাতে তো টাকা লাগে। টাকা কোথায় আমাদের ?'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে একটু কথা কয়ে তারক সাধু মশাই তখন আমাদের শুধালেন—'তোমাদের আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে পারো। তাঁরা এসে তার ব্যবস্থা করবেন। এক হপ্তা, দু হপ্তা, কি তিন হপ্তার সময় নাও তোমরা—তৈরি হবার জন্য, বুঝলে ?'

'এখানে কেউ চেনাজানা নেই আমাদের। আত্মীয়স্বজন কেউ না।'

সামনে বসে থাকা অ্যাডভোকেটের সারির থেকে একজন তখন দাঁড়িয়ে উঠে জানালেন, তিনিই আমাদের ডিফেন্ড করবেন স্বেচ্ছায়।

'মিস্টার পি গাঙ্গুলি, অ্যাডভোকেট, উইল ডিফেন্ড দেম্, ইওর অনার। প্রভাত গাঙ্গুলি মশাই তোমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন, বুঝেছ ? স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজী হয়েছেন ; তোমাদের কোনো ফী দিতে হবে না ওঁকে।'

আমার কেমন চেনা চেনা ঠেকল ভদ্রলোককে। ভারতীর আসরে ওঁকে দেখেছিলাম যেন একবার। ভেবেছিলাম কোনো লেখক হবেন, কিংবা সম্পাদকগোষ্ঠীরই কেউ। এখন দেখা যাচ্ছে উনি উকীলও বটেন।

পরে জেনেছিলাম, সুরেশদা, প্রফুল্লদা, মাখন সেন মশাইরা ওঁকে লাগিয়েছিলেন আমাদের সমর্থনে। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল প্রভাতদার।

অবশ্যি তাঁদের সঙ্গে সেই এককালের যোগাযোগ ছিল আমারও—

সেই যখন কিনা আমি আনন্দবাজারের হকারি করতাম। কিন্তু সে সম্পর্ক ছিল একেবারে তলার দিকের—ওপর ওপর।

আর, প্রভাতদা ছিলেন একেবারে ওপর তলার—ওঁদের ভেতরেরই একজন।

এ খবরটা আমি জেনেছিলাম পরেই।

আমাদের মতন রাজদ্রোহঘটিত সেকালের অনেক মামলায় এভাবে আসামীর রক্ষণে অকৃপণ উদারতায় এগিয়ে এসেছেন আনন্দবাজার। অলক্ষ্যে থেকে তাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন ঐ পত্রিকাগোষ্ঠী, এ খবর জেনেছিলাম আমি আরো পরে।

ঐ প্রভাতদার মুখেই জানা আমার। তাঁর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ট হবার পর।

॥ পঁয়ষট্টি ॥

আসলে আমাদের মামলাটা তেমন সাদাসিধে ছিল না। কিন্তু তারকনাথ সাধুর মতন ধুরন্ধর সরকারী উকীলও তার বিশেষ ঠাহর পাননি। সিডিশনের অভিযোগে আমাদের সোপরদ্দ করেছিলেন, কিন্তু রাজদ্রোহের কেস এটা ছিল না আদপেই।

পত্রিকায় প্রকাশিত যে কবিতাটার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেটা মূলত রবীন্দ্রনাথের বহুবিখ্যাত এক কবিতার প্যারডি। তাঁর উর্বশী কবিতাটার ব্যঙ্গানুকৃতিতে ভূর্বশী।

আট-দশ স্ট্যানজা রচনার মাত্র গোড়ার দু' লাইনই মনে আছে আমার—

'নহ পিতা, নহ ভ্রাতা, নহ বন্ধু, নহ প্রতিবাসী
হে ভূপতি চৌরঙ্গী বিলাসী।'

তার পরের বাকীটা কেবল আমার মন থেকেই নয়—ত্রিভুবন থেকেই হারিয়ে গেছে। যুগান্তরের কোনো কপিই আমার কাছে নেই, কারো কাছে কোথাও আছে কিনা তাও জানি না।

কিন্তু কবিতাটা আদৌ ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে নয়। ছিল সেকালের জমিদার আর অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধেই। 'দেড় শত বর্ষ আগে উঠেছিল ক্ষুব্ধ বাংলাতে/ ডান হাতে তেলভান্ড, মসিপাত্র নিয়ে বাম হাতে....' সময় মাফিক ধরতে গেলে, ইংরেজ আর জমিদারগোষ্ঠীর অভ্যুদয় প্রায় সমকালে হয়ে থাকলেও ইংরেজ কাউকে এখানে তেল দিতে আসেননি, এসেছিলেন এখানকার তৈলনিষ্কাশনেই। আর, ওই চৌরঙ্গীবিলাস। সাহেব সুবোদের সঙ্গে আমাদের জমিদাররাও সেখানে গা-ঘেঁষাঘেঁষি বাস করলেও পরস্পর একটু সুদূরপরাহত ছিলেন নাকি?

কাজেই, কবিতাটা প্রায় তরোয়ালের ন্যায় ধারালো হলেও ইংরেজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। সেই দুঃসাধ্য চেষ্টার অপপ্রয়াসে তারকাবাবুকে বেগ পেতে হচ্ছিল। উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো নেহাত সহজ কান্ড নয় তো। তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবের তপ্ত আবহাওয়ায় সমাজবিপ্লবের ধারণাও কেউ করতে পারেনি। কানপুরের বোলশেভিক কনস্পিরেসির কেস তখনও হয়েছ কিনা মনে পড়ে না ঠিক, রাশিয়ার কালান্তরকারী কার্যকলাপের সমূহ খবর তখনো এদেশে এসে পৌঁছয়নি বোধ হয়, মজফ্ফর আহমদ প্রমুখ অগ্রপথিক কয়েকজনের মগজেই খেলা করছিল আইডিয়াটা, কাগজে-কলমে রূপ ধরে প্রকাশ পায়নি তখনো, সেইকালে শ্রেণীবিদ্বেষের এই প্রথম পদক্ষেপ আমরাই যে নিজেদের অগোচরে হঠকারিতায় করে বসেছি, নিজেরাই তা টের পাইনি। তারকনাথের ন্যায় সাধু ব্যক্তি তা আর কী করে সন্দেহ করবেন!

জোরসে তিনি রাজদ্রোহের ধারায় চালিয়ে গেছেন তাঁর মামলা।

বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ড হয়ে—সেই রাজদন্ডের স্বাদ যাতে কিছুটা অন্তত আমরা পাই সেহেতু উনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বোধ হয়।

প্রভাতদা অবশ্যি বলেছিলেন যে এ-মামলা দাড়াবে না। দাঁড়াবার নয়।

কিন্তু তাঁর আশ্বাসবাক্যে আমরা তেমন ভরসা পাইনি। তার আগেই বলতে কি, আমরা একেবারে বসে পড়েছিলাম—শুয়ে পড়ার অপেক্ষায়। গিরিজা বলেছিল, তা কি কখনো হতে পারে? যেখানে 'আমলাতন্ত্রের ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দাও!' নৈর্ব্যক্তিক ঐ এক লাইনের জন্যেই রাজদ্রোহের দরুণ অমরেশ কাঞ্জিলালের তিন বছর হয়ে যায়, সেখানে ছন্দোবদ্ধ এতগুলি মিঠেকড়া লাইনের দারুণ ভূবশীকরণের দায় থেকে আমাদের অব্যাহতি কোথায়।

তাই প্রভাতদার কথায় ততটা আমরা আশ্বস্ত হতে পারিনি।

তবু তাহলেও মনের কোণে কোথাও একটুখানি ভরসা যেন ছিল আমার। সেই ভরসাটার ভাগ আমি দিতে গেছলাম গিরিজাকে....

দুঃখ করছিল গিরিজা—সে ভেবেছিল যে, কলকাতার কোনো ভালো কলেজে ভর্তি হয়ে বি. এ.পাশ করলে 'ল পড়বে, বিলেত যাবে, আই-সি-এস হবে—কতো কী। কিছুই আর হল না। তিন বছরের ধাক্কায় তার তাবৎ কেরীয়ার পত্রপাঠ খতম।

আমি তাকে বলতে গেছি—'অত ভাবছ কেন হে! শেষ পর্যন্ত দ্যাখো না কী হয়। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে দেখো তুমি। আমি যা প্যাঁচ একখানা কষেছি....কিছু না হয়ে যায় না, বুঝলে ?'

'কিসের প্যাঁচ ?'

'আমার সেই মারপ্যাঁচ। মা'র সেই প্যাঁচেই এ যাত্রা আমরা বেঁচে যাব নির্ঘাৎ!'

'তোমার সেই ভুরুর মাঝখানে মন এনে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করার ? তোমার মা'র শেখানো সেই প্যাঁচটা তো ? জানি। আগেও বলেছো তুমি আমাকে। ওতে কিছু হয় না ভাই।'

'ওই করে কতো বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে গেলুম আমি কতোবার! আর তুমি বলছো হয় না!' তারপরেও বলতে গেছি আমি।

'থামো। তোমার ওই ভিরকুটি রাখো।' সে ভ্রূকুটি করে : 'এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই। ইংরেজের আদালত। কোনো মারপ্যাঁচ এখানে খাটে না।'

বলে সে উড়িয়ে দিয়েছে আমায় এক কথায়।

মনে পড়ে, উপেনদার ঝাপটাতেও আমি উড়ে গেছলাম একবার। তাঁর কাছেও এই প্যাঁচ খাটাতে গিয়েছিলাম! কার যেন কী অসুখ করেছিল, বলতে গেছি—'ও তো সহজেই সারানো যায় উপেনদা! কপালের এইখানটায় মন নিয়ে এসে....মা দুর্গাকে বললেই তিনি সারিয়ে দেন তক্ষুনি....'

'চালাকি পেয়েছিস ? আমার কাছে বুজরুকি ঝাড়তে এসেছিস ? বললেই মা দুর্গা সারিয়ে দেয় ? বটে ?'

হ্যাঁ, উপেনদা। এই করে আমার অসুখ-বিসুখ সব তো সারাই আমি....আমাব তেমন অসুখ হয় না তাই তো, হলেও তেমনটা ভোগায় না, অল্পেই সেরে যায় দুদিনে। কতোবার আমার হাতেনাতে পরীক্ষা করা।'

'আরে, তোর মা দুর্গা যদি এতই ওস্তাদ—এমন ব্যারাম সারাতে পারে তো নিজের ছেলের ওই শুঁড়টা সারাচ্ছে না কেন বল তো ? ঐ শুঁড়টা সারিয়ে দিলেই আর ঐ ভুঁড়িটাও—তাহলেই গণেশের চেহারাটাও কার্তিকের মতন হয়ে যায় না ?'

উপেনদার জবাবে আমি ধাক্কা খাই। বেশ ঘাবড়েই যাই বলতে কি!

যাঁকে নাকি স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর তথাকথিত মাতৃসুলভ অতিমানসিক আত্মবলে বাঁধতে পারেননি, কোনো মহাপুরুষ বা মহানারী-র দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধযজ্ঞের উপযুক্ত বলে নিজের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না বলেই বোধ করি—খোদ্ সেই পীরের কাছে আমি গেছি মামদোবাজি করতে ? তাঁর দর্গায় এক কোপেই আমার দুর্গার কোরবানি হয়ে গেল!

প্রভাতদা বলেছিলেন, 'ভয় খেয়ো না তোমরা। আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর সঙ্গেও এ নিয়ে কনসাল্ট করেছি—কিছুতেই এই কেস টিকতে পারে না। পিওর ক্লাস-হেটরেডের কেসকে সিডিশানের ধারায় এনে খাড়া করা হয়েছে—এ মামলা কি দাঁড়াতে পারে ?'

'সিডিশান তো জানি।' আমি বলি—'কিন্তু ওই ক্লাস-হেটরেডটা কী দাদা ?'

'ক্লাস-হেটরেড কাকে বলে জানো না ?'

জানব না কেন ? আমার তো দারুণ ক্লাস-হেটরেড—সেই ছোটবেলা থেকেই। কিছুতেই ক্লাসে গিয়ে বসতে ইচ্ছা করে না। প্রায়ই ইস্কুল কামাই করতাম।'

'সে ক্লাস-হেটেরেড নয় !' আমার কথায় তিনি হাসেন। কিন্তু ঐ ক্লাস-হেটেরেড যে কী বস্তু, তাও তিনি বিশদ করে দেন না।

'তোমাদের বরাত ভালো যে, সেই নিদারুণ ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো সাহেব নেই এখন। ইনি আহেল-বিলিতি সাহেব, সদ্য আই-সি-এস হয়ে আসা, এখনো ফ্রেশ, আমলাতান্ত্রিক প্যাঁচে পড়ে জুডিশিয়াল মাইন্ড খোয়াননি এখনো—তারক সাধু যা বোঝাবেন তাই যে মুখটি বুজে বুঝবেন, সে পাত্র নন। এমন কি এঁর কাছে তোমরা বেকসুর খালাসও পেয়ে যেতে পারো।'

'ভরসা হয় না, স্যার,' বলতে যায় গিরিজা। কাজীদার দু' বছর আর অমরেশদার হয়েছে তিন তিন বচ্ছর....তারপরও কি ভরসা হয় !'

'সুইনহো সাহেবের হাতে সেই হচ্ছে শেষ কেস—মিস্টার কাঞ্জিলালের। তারপরেই তিনি রিটায়ার করেছেন। আর সেই রকসবার্গ এসেছেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। তাঁর প্রথম পলিটিক্যাল কেস তোমরা—দেখা যাক না কি হয়।'

'কী হবে জানাই আছে !' গিরিজার কানাকানি আমাকে—জীবনকে সে বেশি মিষ্ট মনে করে না কখনই। এক নম্বরের পেসিমিস্ট।

শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর এগিয়ে এল শেষটায়। বিচারের অন্তিম লগ্ন এসে গেল অবশেষে। পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু অনাথ আমাদের বিপক্ষে সওয়াল করতে দাঁড়ালেন। কার সৌজন্যে জানি না, হাইকোর্টের এক নামজাদা ব্যারিস্টার লড়তে এসেছিলেন আমাদের জন্যে। প্রভাতদাই নিয়ে এসেছিলেন ওই বড় ব্যারিস্টারকে শেষদিনটায়।

'কার জন্যে হোলো এটা জানো ?'

'মিস্টার গাঙ্গুলির কেরামতি—আবার কার ?'

'তাঁর তো বটেই, কিন্তু তিনি তো নিমিত্ত মাত্র। তা ছাড়াও—'আমি বলতে যাই : 'সেই মারপ্যাঁচের কথাটা তোমায় বলেছিলাম না ? তুমি তো মানতেই চাও না। সেই মা'র জন্যেই হয়েছে।'

'তোমার মা'র জন্যে হয়েছে ? মা তো তোমার দেশেই এখন গো। এখানকার এ-সবের কোনো খবরই তিনি রাখেন না।'

'মানে, আমার মা নয়। আমার মা, তোমার মা, সবার মা সেই মা—'

'থামো থামো!' আমার উচ্চারণের আগেই সে সমুচ্চারিত—সেই মা দুর্গাকে মুখের বাইরে দূরীভূত করতে দেয়নি—'দাঁড়াও, খবর নিচ্ছি আমি। অত বড়ো ব্যারিস্টারকে লাগানো চাট্টিখানি কথা না। কার কুদরৎ জানা যাক। হাজার টাকার ধাক্কা—একদিনেই। তা জানো?'

প্রভাতদার কাছ থেকে জেনে এসে বললে সে—'তোমার প্রফুল্লদা, সুরেশদাদের কাণ্ড। আনন্দবাজারের কর্তারাই ওনাকে আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য লাগিয়েছেন।'

'ওই হোলো। এক কথাই। মা কি নিজের হাতে এসে সব করে দেবেন নাকি ? তাঁর দশ হাত দশ দিকে বিস্তৃত নয় ? দশজনের মধ্যে ছড়ানো না ? তারই একটা হাত ওই আনন্দবাজার। ওঁদের দিয়েই উনি এক হাত খেলেছেন এখানে।'

'হয়েছে। থামো এবার। সরকারী উকীল কী বলছেন শোনা যাক—'

তারক সাধু মশাই দাঁড়িয়েছেন সরকার পক্ষের সওয়ালে। আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব ছিল না, যথাসাধ্য যুক্তিগ্রাহ্যভাবে একে একে মজুদ করেছিলেন সেগুলো। ওই কবিতাটার কোথায় কোথায় চরম রাজদ্রোহ ঘটে গেছে, বেছে বেছে দেখাচ্ছিলেন পরম্পরায়, কিন্তু তাঁর অমন অধ্যবসায়ে মনেপ্রাণে যেন সায় দিতে পারছিলেন না সাহেব।

বারংবার ঘাড় নড়ছিল তাঁর—'বাট আফটার অল ইট ইজ এ প্যারডি—নট টু বি টেকন সিরিয়সলি। এ থিং টু লাফ অ্যাওয়ে। ইজন্‌ট্‌ ইট ?'

আমাদের তরফের ব্যারিস্টার আর. রায় মুখ টিপে হাসছিলেন হাকিমের কথায়।

কিন্তু তারক সাধু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। নানান আইন-কানুন, নথিপত্রে, ধারা-উপধারা এনে খাড়া করছিলেন ধারাবাহিক। কিন্তু কিছুতেই কিছু দাঁড়াচ্ছিল না তাঁর। নাট-বোল্টুর কোথায় যেন কী গরমিল ছিল, গড়বড় হয়ে যাচ্ছিল সব।

স্কোয়ার লেগে গোল বল্টু লাগাবার মতই গোলমাল বাঁধছিল কেবল।

আসলে তো আমাদের কেসটা রাজদ্রোহের ছিল না ঠিক। সমাজবিপ্লব বা শ্রেণী সংঘর্ষের বলা যায় হয়ত। আমরা যে দেশের কুকুর ধরে আদর করেছি, বিদেশের ঠাকুরদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ না করে—এরকম একটা ফ্যাশানবিরুদ্ধ অসময়োচিত নীতিবিগর্হিত কাজ আমাদের বয়সের কেউ তৎকালে করতে পারে, আমাদের কাছ থেকে এতটা অসাধুতা স্বভাবতই সাধুমশাই প্রত্যাশা করতে পারেননি—ধারণাও ছিল না তাঁর। তাঁর কোনো দোষ ছিল না। সওয়ালেরও কোনো কসুর ছিল না, কিন্তু অমন চৌকস লোক হয়েও নাট-বোল্টুর গলতিকে যথাযথ খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না কেমন। আদালতের কাঠগড়ায় এর আগে অবহেলায় আমার মতন শত শত আসামীর মুণ্ডপাতের পরেও এবারে যেন তাঁর আটকে গেল কোথায়! হাঁড়িকাঠে আমাদের মাথাটাকে যুতসই করে বাগাতেই পারলেন না কিছুতেই। কোনমতেই আমাদের কবন্ধ করা গেল না।

দুর্ভাবনায় তাঁকে ঘর্মাক্ত হতে দেখলাম।

ফৌজদারির নাটমঞ্চে এতকালের এত নাটের গুরু হয়েও নাট-বোল্টুর খেলাপিতে তাঁর নাট্যলীলা জমল না তেমন।

আমাদের তরফে রোলান্ড রোডের রোহিণী রায়, বার-অ্যাট্‌-ল'র হলকর্ষণ শুরু হোলো তারপর। সাধু মশায়ের এত করে চষা জমির বীজ অঙ্কুরিত হবার আগেই (কেটে ফসল ঘরে তোলা তো পরের কথা) তছনছ হয়ে গেল সব।

তবে অতখানি সরকারী আরজির পর বেকসুর খালাস তো দেওয়া যায় না, তাই অপ্রমাণিত উক্ত সিডিশনের দায়ে একমাস করে জেল হল আমাদের।

জেল হাজতের প্রায় হপ্তা দুয়েক ধরে মোটমাট দেড় মাসের কারাবাস দণ্ড! এ ক্লাসে তার ওপরে। এমন কঠোর কিছু সাজা নয়। একটু মজাই বলা যায় বরং।

যেমন যুগান্তকারী আমাদের মামলাটা, তেমনি যুগান্তকর জাজমেন্ট আর রাজ-দণ্ড দেওয়া নয়া হাকিম রকস্‌বার্গ সাহেবের।

ভারত খণ্ডে সিডিশনের কেসে অভূতপূর্বই এটা। লোকমান্য তিলকের সুদীর্ঘ সেই ছ' বছর মেয়াদের পর বালকগণ্য আমাদের বেলায় এই ছ' হপ্তার ঠেলায় রাজদ্রোহ মামলার যেন নয়ছয় হয়ে গেল শেষটায়।

বাবা তারকনাথের পরোক্ষ কৃপাতেই সম্ভব হল যদিও, কিন্তু তাঁকে বেশ অপ্রসন্ন দেখা গেল যেন। আমরা নাচার। বিচারের গলদ, আমরা কী করব তার ?

॥ ছেষট্টি ॥

সরকারী মামলার বয়ানে বা বিচারের কোনখানো কী গলদ ছিল জানিনে, গলদেশ থেকে ভারী পাথরটা নেমে গেল আমাদের। মহাত্মা রক্কোবর্গ বা সাধু তারকনাথ, যাঁর দয়াতেই হোক, বেঁচে গেলাম এ যাত্রায়।

কাঠগড়ার থেকে নেমে আদালতের হাজতঘরে গিয়ে হাঁফ ছাড়ছি, একগাদা খাবার নিয়ে প্রভাতদা এসে হাজির।

'প্রভাতদা, কী বলে যে আপনাকে....' আমি বলতে যাই।

'কিচ্ছু বলতে হবে না।' তিনি বলেন—'এগুলো তোমরা খাও এখন। জেল থেকে ফিরে আমার বাড়িতে এসো, নেমন্তন্ন রইলো তোমাদের। তারপরে আমি তোমাদের নিয়ে মিস্টার রায়ের ওখানে যাব।'

'আপনাকে তো বটেই, তাঁকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাবেন।' গিরিজা বলে—'অজস্র অজস্র ধন্যবাদ।'

আমি যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাই না, গিরিজা সেখানে বেশ সড়গড়। আদবে আচরণে টনটনে।

এর মধ্যেই আমি একখানা কাগজে ফসফস করে কয়েক লাইন ছড়িয়েছি—সেই ছত্রাকার প্রভাতদার হাতে গুঁজে দিলাম—এক পদাঘাত ওঁদের দু'জনের প্রতিই।

সেই ক' লাইন এখনো মনে রয়েছে আমার। —

কী আছে কবির/সে কী দিতে পারে ?/একাকী জীবনে মরণে। /আছে শুধু প্রাণ/ দেয় সে যে তাই/কারো হাতে, কারো চরণে। /যেথায় হারায়/যত কথা গীতি/যেথা জেগে থাকে/ ভালোবাসা প্রীতি/সেথায় রহিবে তোমাদের স্মৃতি/অমর মরম-স্মরণে।

খাবার-দাবার সাবাড় করার পর গিরিজাকে বললাম—'দেখলে তো মা দুর্গার মহিমা! কী বলেছিলাম তোমায় ?'

'মহিমা না ছাই!' সুইনহো থাকলে দেখিয়ে দিত এতক্ষণ। পুরো তিন বছর শ্রীঘরে ঘানি টানতে হোতো—দেখতে।'

'সুইনহো থাকবে কেন ? থাকতে পারে কখনো ?' আমি বলি—'এই সময়ে আমরা সোপরদ্দ হব বলেই না মা দুর্গা আগের থেকে ওই সুইনহোকে সরিয়ে দিয়ে আনকোরা এই সাহেবকে এনে বসিয়েছে এখেনে ? পরে যখন সেটা হবার, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরা না পড়লেও, তিনি আগের থেকেই তার সব ব্যবস্থা করে রাখেন, তা জানো ?'

'তোমায় বলেছে!'

'বলেছেই তো। আমার মা-ই বলেছে। বলেছে যে, তুই যদি মা দুর্গাকে ডাকিস না, জীবনে কখনো কোনো দুঃখকষ্ট পাবিনে। কদাচ তোকে বিপদ-আপদে পড়তে হবে না। কোথাও দরজায় ধাক্কা মেরে ঢুকতে হবে না তোকে। তুই যাবার আগেই দেখবি দরজা খুলে গেছে, তার পথ সব সময়ই খোলা পাবি সামনে...'

'প্রমাণ ?'

'প্রমাণ হাতে হাতে। জন্মাতে না জন্মাতেই প্রমাণ পেয়েছি।'

'মানে ?'

'মানে চাঁচল তো একটা অজ পাড়াগাঁই ছিল সেকালে। পঞ্চাশ কোশের ভেতর কোনো

ইস্কুল-ফিস্কুল ছিল না। গেঁয়ো পন্ডিতের পাঠশালায় গিয়ে পড়েতে হতো সবাইকে। মা বলেছিল আমাকে, জানিস, তোরা আসবি বলে তোদের লেখাপড়া শেখার জন্যেই মা-দুর্গা রাজা ঠাকুরপোকে দিয়ে আমার মাস-শাশুড়ির নামে এই হাই ইস্কুল স্থাপিত করলেন চাঁচলে। আমি আসার আগেই আমার জন্যে ইস্কুল। আমিও এলাম আর....'

'তুমিও হ'লে আর ইস্কুলও হলো।'

'ইস্কুল হলো আর আমিও হলাম—এভাবেও বলা যায় কথাটা। তাতেও অর্থের কোনো ব্যত্যয় হয় না।....'

'আর তুমি একদিন এসে ফিরি করবে বলেই ওই আনন্দবাজার পত্রিকাটা হয়েছিল—তাই তুমি বলতে চাও?'

'না, তা আমি বলতে চাই না। সেটা আমার জন্যেও যেমন, তেমনি আরো অনেকের জন্যে—অনেক কিছুর জন্যেই। আকাশ ব্যেপে যখন বৃষ্টি ঝেঁপে আসে, তখন একজনের জন্যে আসে না—একজনের ক্ষেতেই পড়ে না কেবল, সবার মাঠ ভরে যায়, সবারই ফসল ফলায়। সেই ফসলে সবার ঘর ভরে, সবার সঙ্গে আমিও পাই, আমিও খাই। একসঙ্গে বাঁচি সবাই।'

'বুঝেছি।' তার মুখে অপ্রত্যয়ের হাসি।

'মা দুর্গার অর্চনামন্ত্রের গোড়াতেই রয়েছে না? সর্বমাঙ্গল্য-মঙ্গলে শিবে সর্বার্থসাধিকে....তার মানে কী? সবার মঙ্গলের সঙ্গে যে-মঙ্গল সেই মঙ্গল তিনি করেন, সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের, প্রত্যেকের সঙ্গে সবার—যুগপৎ সব প্রয়োজন তিনি মেটান, একসঙ্গে সকলের সার্থকতা-সাধন হচ্ছে তাঁর। যেমন চাঁচলের ইস্কুলটা কেবল আমার জন্যই হয়নি, তোমার জন্যও হয়েছিল, আরো আরো সব ছেলের পড়াশুনা করে মানুষ হবার জন্যই।' বলে পুনরায় আমার অনুযোগ: 'তিনি আমাদের জন্য চতুর্বর্গ নিয়ে বসে আছেন, আমাদের রক্ষা করতে অকুস্থলে এমন অকুসময়ে ওই রক্ষোবর্গকে এই প্রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট করে পাঠানো কি তাঁর এতই কঠিন?'

'তোমার মা দুর্গার কোনো কেরামতি নয় হে, একে বলে কাকতালীয়।'

'কী তালীয়?' কথাটার তাল আমি ধরতে পারি না।

'মানে, কাকও এসে তালগাছে বসল আর তালটাও পড়ে গেল তক্ষুনি। মনে হবে যেন কাকই ফেলল তালটাকে। কিন্তু তা তো না, পরিপক্ক হয়ে সেটা পড়বার অপেক্ষাতেই ছিল, আর যেই না কাকটা এসে বসেছে...'

'ও! সেই কাকতালীয়? কিন্তু ওই কাকতালীয় ক'বার হ'তে পারে কারো? কতবার অমন অঘটন ঘটবার? বার বারই কি ঐ কাক এসে তাল সামলায়?' বলতে গিয়ে আমি মনের মধ্যে তলিয়ে যাই, খতিয়ে দেখি, আমার এই বেতালা জীবনের আগাগোড়াই তো ওই কাকতালীয় তালিকা। তাছাড়া কী আর?

'মা'র শেখানো তোমার ওই প্যাঁচে সব সময় কাজ হয় না ভাই। একেকবার কোনো রকমে খেটে যায় হয়তো, কিন্তু সর্বদা খাটে না। খাটবার নয়। তাহলে আর ভাবনা ছিল না। ঐ করেই তরে যেত সবাই। জীবনে স্ট্রাগল বলে কিছু আর থাকত না তাহলে।'

কিন্তু আমার জীবনে স্ট্রাগল কোথায়? আমি ভাবি। জীবনের সব ঘোরপ্যাঁচ তেমন ঘোরালো হয়ে আসার আগেই মা'র শেখানো ঐ প্যাঁচ—সেই মারপ্যাঁচের জোরেই কাটিয়ে

এসেছি তো। এই প্যাঁচওয়ার্ক—জোড়াতালির জীবন, জীবনই নয় হয়ত বা, কোনো ধকল না পুইয়ে কেবল ঐ বুড়ি ছুঁয়ে বাঁচার মতন বাঁচাটাই হয়ত হয়নি আমার। তাবৎ প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে উত্তরপত্র আমার যথাযথ হয়নি নিশ্চয়, কিন্তু তাহলেও একথা তো ঠিক, কানাকড়ির সম্বল না নিয়ে ফুটো নৌকোয় চড়ে সংসার পারাবার পার হয়ে এলাম শুধু ওর জোরেই। উত্তর না মিললেও উত্তরণে এসে মিলেছি তো ঠিকই।

জেলখানায় ফিরতেই জেলার সাহেব ডেকে জানালেন—কাল সকালে তোমাদের এখান থেকে ট্রান্সফার করা হবে। বহরমপুর জেলে যাবে তোমরা, বুঝেচ ? তৈরি থেকো।

'বহরমপুর জেল ? সেটা তো শুনেছি একটা পাগলা গারদ। সেখানে কেন ?' আমি শুধাই।

'এখন আর পাগলা গারদ নয়। রাজবন্দীদের জায়গা দিতে সেখান থেকে পাগলাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিশিষ্ট রাজনীতিক বন্দীরাই সেখানে থাকেন এখন। যেমন কবি নজরুল ইসলাম—'

জেলার ভদ্রলোক শ্রদ্ধাভরে নজরুলের নামোল্লেখ করেন। —'এবং জেল ব্যানার্জি।'

'জেল ব্যানার্জিও ?' শুনেই গিরিজা উল্লসিত। —'তিনিও সেখানে আছেন নাকি ? বাঃ? বেশ তো!'

'জেল ব্যানার্জি আবার কে হে?' গিরিজাকে আমি শুধাই—'জেলের মধ্যে জেল কেন আবার?'

'জেল নয় হে, জে. এল.। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনোনি ? আশ্চর্য।'

'শুনব না কেন ? বক্তৃতাও শুনেছি তাঁর—কতোবার! কী জোর যে বলেন উনি!'

'হ্যাঁ, ইংরেজি বাংলায় সমান।' গিরিজার সায় পাই—'যেন ঝড়ের মতই বলে যান—তাই না ?' বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ঠিক না হলেও সিদ্ধবাক্ বাগ্মী তাঁকে বলা যায় অবশ্যই। রাষ্ট্রগুরুর বাগ্মিতা শোনার সৌভাগ্য হয়নি আমার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া জে. এল. বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছিল ক'বার। শুনেছিলাম, পরে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের কালে যখন তিনি বিলেতে যান, পার্লামেন্টে ভাষণ দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে এমন একখানা বক্তৃতা ঝাড়েন যে, তাক লেগে যায় সবাইকার। তাদের ভাষায় তাদেরকেই টেক্কা মেরে এমনভাবে ঝড়ের দাপটের মত জোরালো কেউ বলতে পারে ধারণাই ছিল না তাদের। বাক্‌পটু বাগ্মীশ্বর সেই জিতেন্দ্রলাল।

'তোমার সঙ্গে আলাপ আছে নাকি ওঁর।'

'নিশ্চয়। ওর ইংরেজিতে মুগ্ধ হয়ে আমি গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি গিয়ে। ইচ্ছে ছিল উনি যে কলেজে পড়ান সেইখানে ভর্তি হবার। বহরমপুরে গেলে তাঁর সঙ্গে খাতির জমিয়ে তার পথটা এবার খোলসা করা যাবে।'

'তাহলে জেলে এসেও তোমার কোনো ক্ষতি হয়নি ভাই, লাভই হয়েছে বরং। পথে এসে গেল কেমন! জেলে এলে বলেই না তোমার এই পথ খুঁজে পেলে! তোমার বেলাতেও কেমন কাকতালীয় হয়ে গেল দ্যাখো। কাকস্য পরিবেদনার কথা বলছিলে না ?'

পরদিন সকালে লপ্‌সিখানা খেয়েই জেলখানার থেকে বেরুলাম। একশো এগারো নম্বরের এক ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি চেপে দু'জন পাহারাওলার জিম্মায় বহরমপুরের উদ্দেশে শেয়ালদা রওনা হলাম আমরা।

লপ্‌সির প্রাতরাশের পর সেখানে গিয়ে পড়লাম একেবারে মুর্গির কারি আর বিরিয়ানি পোলাওয়ের ওপর। এক গোরুতর পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়লাম বলতে কি!

আমাদের দেখেই কাজীর সোল্লাস অভ্যর্থনা—'লে হালুয়া! দে গোরুর গা ধুইয়ে!'

অতুলনীয়—অতুলনীয়।

॥ সাতষট্টি ॥

গোড়াতেই কাজীর কাছে ওই গোরুত্ব লাভ করে সহজেই সেখানে আমরা স্বাগত হলাম। প্রাচীন এবং নবীন প্রসিদ্ধ দেশব্রতী আর বিপ্লব-পথিকদের সঙ্গে অর্বাচীন আমরা অবলীলায় মিশে গেলাম। চিনি যেমন জলের সঙ্গে মিশে যায়, চেনাচিনির অপেক্ষা রাখে না, চিহ্ন থাকে না, তেমনি অসারবৎ আমাদের নিছক জলাঞ্জলিও মিশ খেয়ে সরবতের একাত্মা হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা হলঘরে অনেকগুলো লোহার খাট পড়েছিল পাশাপাশি। তারই দুটোর ওপর জেলের আপিস থেকে পাওয়া আমাদের দুখানা করে কম্বল বিস্তৃত হল। খট্টাঙ্গের সেই কম্বলবিস্তারে সাষ্টাঙ্গে আমি সবিস্তার হতে যাচ্ছি, বাধা দিল কাজী।

'আরে, এখনই শোবে কি হে?'

'তার মানে? খাওয়ার পরেই শোয়া—এই তো জানি। খাই আর শুই—কাজ তো এই দুই...'

'এখন আমাদের গান, আবৃত্তি, হৈ-হল্লা কতো কী হবে...'

'হোক না! তার শ্রোতাও চাই তো? আমিই সেই শ্রোতা। শুয়ে শুয়ে শুনব এখন। আমি তো আর গায়ক ও আবৃত্তিকারের পার্ট নিতে পারব না ভাই!'

'দাঁড়াও, এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই আগে, এসো।'

'এখান থেকেই চিনিয়ে দাও না। দূরের থেকেই চিনে রাখা ভালো তো। কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি কীরকম বেখাপ্পা। কারো সঙ্গে মিশতে পারি না সহজে। খাপ খাওয়াতে পারি না তেমনটা।'

কবিগুরুর কথাগুলো মনে পড়ে যায়—কুসুম সুকুমার কপোলতল/কী শোভা পায়/প্রেমলাজে গো/ যাহার ঢলঢল নয়ন শতদল/তারেই আঁখিজল/সাজে গো/ভালোবাসিলে ভালো যারে বাসিতে হয়/সে যেন পারে ভালবাসিতে/মধুর হাসি তার/দিক সে উপহার/মাধুরী ফোটে যার হাসিতে। ঠিক তেমনি ছেলেদের বেলাতেও, মনে হয় আমার। মিষ্ট স্বভাবের মিশ্রির মতন যারা, যেমন কি না কাজী, তারাই সহজে সবার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে। সবারই তারা আকাঙ্ক্ষীয়। হীনম্মন্যতাই হয়ত তার হেতু হবে, আমি নিজেকে ঠিক তা মনে করতে পারি না। মিশতে ভড়কাই তাই।

'ঐ যে সৌম্যদর্শন যুবকটি ওধারে দেখছ না? উনি চারণকবি বিজয়লাল। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। চেনো নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, নাম শোনা আছে। কবিতাও পড়েছি ওনাব। আমার যুগান্তরেও এক-আধবার লিখে থাকবেন মনে হয়।'

'আর তোমার খাটের পাশেই যাঁর খাট। উনি হচ্ছেন বিপ্লবনায়ক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস। আমাদের পূর্ণদা। ওঁকে তো জানোই।'

'জানি বই কি। তোমার কবিতার থেকেই জেনেছি। সেই—'এসো গো ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর। লম্বাপানা কাঠখোট্টা ঐ ভদ্রলোক...উনিই!!'

'দধীচির হাড় দিয়ে তৈরি। ইংরেজের মাথার বজ্রাঘাত।...আলাপ নেই তোমাদের? বলো কি? জানতে না ওঁকে এর আগে?'

'একদম না। দেখিওনি কখনো।'

'সে কী হে! একটা বিপ্লবী কাগজের সম্পাদক তুমি, অথচ, অনুশীলন পার্টি, যুগান্তর পার্টির নাম শোনোনি? আশ্চর্য্য! কাজী তো হতবাক্।

'যুগান্তরের আবার পার্টি কিসের? একজনই তো জানি যুগান্তরের—এই আমি। আমিই পার্টি—এক এবং অদ্বিতীয়। আমার আবার পার্টি কোথায়?'

'আহা, যুগান্তর পার্টি, অনুশীলন পার্টি—নামকরা সব বিপ্লবীদের দল—শ্রী অরবিন্দের গড়ে যাওয়া—জানো না? সেইসব দলের নায়ক তো এঁরাই—এই পূর্ণ দাস, পুলিন দাস, যাদুগোপাল, কিরণদা, অমরদা, বিপিনদা...'

'বিপিনদাকে জানি। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি তো? ফরবেস ম্যানসনে থাকতে পরিচয় হয়েছিল। ওপর ওপর ভাসা ভাসা আলাপ—এমনিই। বিপ্লবমূলক কিছু নয়।...আর ঐ যাদুগোপালবাবুকেও জানি বেশ। রাঁচিতে যখন থাকতুম আমরা, বর্ধমান গ্রাউণ্ডের পাশের হোস্টেলে, আমাদের পাশের বাংলো বাড়িতেই থাকতেন উনি, অন্তরীণ হয়ে সেখানেই ডাক্তারি করতেন। আমার মা'র হাঁপানির ব্যারাম, সেই সূত্রে, মা'র চিকিৎসার ব্যাপারে আলাপ আমার। খুব বড়ো ডাক্তার বলবো ভাই। অদ্ভুত চিকিৎসা। মা ওঁর এক দাগ দাবাইয়েই আরাম! বিধান রায়ের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নন।'

'যাদুদা রাঁচিতে থাকেন, জানি। যোগাযোগ আছে আমাদের।'

'এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই আমার সঙ্গে। তবে তাঁর চেয়ে তাঁর আলমারিদের সঙ্গেই বেশি সৌহার্দ্য হয়েছিল আমার।'

'আলমারিদের সঙ্গে, তার মানে?'

'মানে, বইয়ের আলমারি গো! ডাক্তারির যতো ভারী ভারী বইয়ের। আমার খুব গল্পের বই পড়ার বাতিক তো, সেই ধরণের বই চাইতে গেছি, তিনি তাঁর আলমারিগুলো দেখিয়ে দিলেন—আমার যতো বই সব ঐ। ইচ্ছে করলে নিয়ে পড়তে পারো। যথাস্থানে রেখে দিয়ো আবার। পাশের এই শেলফটাও ঘেঁটে দেখতে পারো। খানকয়েক বাংলা বই আছে এর ভেতর। তিনি বলার পর তাঁর জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আমার শেলফ্‌হেলফ শুরু হয়ে গেল। তাঁর ডাক্তারি বই যতো ছিল না, পড়ে পড়ে ফাঁক করলাম—বুঝি আর নাই বুঝি। ডাক্তারির এই পল্লবিত বিদ্যে আমার সেই থেকেই—সেখান থেকেই।'

শুনে কাজী হাসতে থাকে। 'যাদুদার সত্যিকার পরিচয় তুমি পাওনি। কী করে পাবে? ওঁরা ধরা না দিলে কি ধরা যায় ওঁদের? সাধু মহাত্মাদের মতই প্রায়। যাক্ গে, যেতে দাও। আমার অবাক লাগছে, কোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই...'

'দলাদলি আমি সর্বদাই ডরাই—সব সময়ে এড়িয়ে চলি তাই। দল বাঁধলে, দলে ভিড়লে নিজেকেও সেই দলে বাঁধা পড়তে হয়। দলে বাঁধা পড়ে ঐরাবতও মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়ে, তা জানো? হাতী যে হাতী, সেও দল বাঁধলো কি দ-য়ে মজলো—হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে গেল। আমি মুক্ত বিহঙ্গের মতই থাকতে চাই।'

'কোনো বিপ্লবী বা বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ নেই, অথচ তোমার কাগজটা বিপ্লবের—ঐ যুগান্তর ?'

'যুগান্তর না বলে হুজুগান্তর বলো বরং। তোমার ধূমকেতু দেখে, তোমার দেখাদেখি আরো সবাই কাগজ বার করেছে দেখে, সেই হুজুগে আমিও ঐ—আমারও ধূমধাম।'

আমার সঙ্গে কোনো বিপ্লব বা বিপ্লবীর সংযোগ নেই দেখে, কেন নেই, বলে কাজী যেমন সপ্রশ্ন আর হতভম্ব হয়েছিল, সেইরকমের এক বিমূঢ় জিজ্ঞাসা ছিল বোধ হয় তখনকার সরকারেরও। সে খবর পেয়েছিলাম আমি অনেকদিন পরে মৌচাকের আসরে বসে আমার লেখক-বন্ধু পঞ্চানন ঘোষালের কাছে।

মৌচাক সম্পাদক সুধীর সরকারের জীবদ্দশায় তাঁর ব্যক্তিত্বের টানে গুণীজ্ঞানীদের অনেকেই আসতেন সেখানে। তুষারকান্তি ঘোষ, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন, আমাদের হেমেনদা, সবাই যেতেন—সুধীরবাবুর ন্যায় তাঁদের অনেকেই এখন ইহলোকে নেই। তুষারবাবু অবশ্যি এখনো আসেন মাঝে মাঝে, কোনো কোনো শুক্রবারে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পাই। যেমন দেখতে পাই অচিন্ত্য, প্রেমেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রিয় গুহ আর বিশু মুখোপাধ্যায়কে। কবি হরপ্রসাদ মিত্র, লেখক ডাক্তার নির্মল সরকার, সুশীল রায়ও আসেন কখনো-সখনো। প্রিয়বাবু প্রমুখ আর সবাই কখনো কদাচ, কিন্তু বিশুবাবু আর সুপ্রিয় সরকার সেখানে সর্বদাই।

তখন তিনি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। তাই সরকারী গোপন কথা ফাঁস করার তখন আর কোনো বাধা ছিল না তাঁর। পুলিশ কমিশনার হয়ে রিটায়ার করার অ্যামবিশন তাঁর পূর্ণ হল না বুঝি আমার জন্যই—ইদানীং তাঁর কলেবরের ঐ অপর্যাপ্ততার দরুণই নাকি।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল কথাটা।

'কী মুটিয়েছেন যে মশাই! আমি তো এক মোটা, আর আমাদের হর্ষবর্ধনকেও দেখেছি মোটামুটি—কিন্তু আপনি আমাদের দুজনকেই টেক্কা মেরেছেন। হৃষ্টপুষ্টতায় আপনি অদ্বিতীয়। সেই কবে বৌবাজারের ও. সি-রূপে আপনাকে দেখেছিলাম, কী শ্রী। কেমন ছিমছাম সুঠাম। আর এই দেখছি। এ কী হয়েছেন এখন। খেয়ে না খেয়ে কি এমন করেই মোটাতে হয়।'

'আপনার সঙ্গদোষেই, বলতে কী।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি কন।

'সে কী। আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে গেলাম কখন ? সেই কাবুলিওয়ালার দায়ে পড়ে একবার যা গেছলাম আপনার কাছে—তারপর আর কই ? তারপর এই দেখছি তো। এখানেই এখন।'

'জেনেশুনে কি আর সঙ্গ দিয়েছেন। অজান্তে হয়ে গেছে। ঘুণাক্ষরেও টের পাননি আপনি। তাহলে খুলেই বলি আপনাকে...।'

আমার সেই যুগান্তকারী কালের কথা বললেন তিনি আমায়। তখন তিনি আমায় ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেছিলেন কিছুদিন—কোন বিপ্লবীদল বা বিপ্লবী কোনো কারো সঙ্গে আমি বিজড়িত কিনা তার খোঁজ নিতে, সরকারী নির্দেশেই।

'পেয়েছিলেন কারো খবর ?' আমি শুধাই।

'কোথায় ! ফলো করে যাচ্ছি...যাচ্ছি...ফলো করে আপনাকে। দেখলাম হঠাৎ আপনি সড়াৎ করে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লেন। সন্দেহভাজন অন্য কারো সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই নিশ্চয়। তাই মনে করে আমিও ঢুকেছি আপনার পিছু পিছু। দেখি আপনি এক কোণে বসে একমনে অর্ডার দিচ্ছেন আর খেয়ে যাচ্ছেন এক ধার থেকে। আপনার কাছাকাছি আরেক টেবিলে বসে আমাকেও খেতে হয়েছে বাধ্য হয়ে...তারপর, আপনি যেমন সেখান থেকে বেরুলেন, আমিও বেরুলাম। যেতে যেতে পাশে একটা সন্দেশের দোকান পেয়ে সেখানে আপনি সেঁধিয়েছেন দেখলাম। আমাকেও সেঁধুতে হ'ল। দেখি কি, আপনি হরেক রকমের মিষ্টান্ন—সন্দেশ—রসগোল্লা—রাজভোগ সাঁটিয়ে চলেছেন, আমিও তাই চালালুম। এমনিভাবে আপনাকে শ্যাডো করে সারা কলকাতার ভালোমন্দ নানান খানার পাত্তা পাওয়া গেল, কিন্তু আপনার কোন বিপ্লবীসঙ্গীর সন্ধান মিলল না।...আর এদিকে গণ্ডেপিণ্ডে গোগ্রাসে গিলে আপনার সঙ্গদোষে আমার ভোজন বেড়ে গেল যৎপরোনাস্তি !'

শুনে আমি অবাক হই—'কিন্তু মশাই, আপনি যেমন খেয়েছিলেন, আমিও তেমনি খেয়েছি তো ? কিন্তু কই, আপনার মতন এতটা তো আমি মোটাইনি ?'

'আপনি খেতেন নিজের পয়সায়, বুঝেসুঝে হিসেব করে, আর আমার খাওয়াটা ছিল সরকারের ঘাড়ে—গায়ে লাগত না। আপনার চারগুণ খেয়ে বিল করে তার চতুর্গুণ আদায় করা যেত।...'

'কিন্তু, বেশিদিন তো আর ফলো করতে হয়নি আমাকে। তার পরই তো, কিছুদিনেই আমি ধরা পড়ে গেলাম...'

'কোথায় ধরা পড়লেন ? ধরতেই পারিনি আপনাকে আমরা !'

'আহা, সে-ধরা নয়, আমার সঙ্গে বিপ্লব বা বিপ্লবীদের ঘুণাক্ষরেও কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা তো আপনার অচিরেই টের পেয়ে গেলেন, তারপর তো আর আমায় ফলো করতে হয়নি আপনাকে ?'

'তা হয়নি ঠিক। কিন্তু তাতেই যা ফলোদয় হল না—আপনার বাকভঙ্গীতেই বলি—খাওয়ার ঐ বদভ্যাসটা থেকেই গেল আমার—এই আপাদমস্তকে তার প্রমাণ।'

'এই পর্বতপ্রমাণ ? আপনি বলছেন আমার পাশাপাশি কাছাকাছি মুখোমুখি বসে এত এত খেয়েছেন, কিন্তু কই মশাই, আপনাকে তো আমি লক্ষ্য করিনি কখনো ? এ কী করে হতে পারে ?'

'খাবার সময় কোনোদিকে আপনার লক্ষ্য থাকত না কী ! কোনো লোকের দিকেই আপনি তাকাতেন না, যা একটু আপনার নেকনজর তা দেখেছি ঐ মেয়েদের দিকেই। দেখেছি একেক সময় আপনিই আবার ফলো করে চলেছেন...'

'আমি ? আমি আবার কার ফলো করলাম ?'

'কোনো তরুণীর। কলেজের পড়ুয়া-টড়ুয়া হবে হয়তো। যাচ্ছেন যাচ্ছেন, মেয়েটিও যাচ্ছে, আপনার আগে আগে—ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেও মাঝে মাঝে ! ভাবলাম পেয়েছি অ্যাদ্দিনে, বিপ্লবীদলের কোনো মেয়েটেয়ে বোধহয়—এদের গোপন ডেরার সন্ধান মিলবে এবার। তারপর যেতে যেতে মিলিয়ে গেল মেয়েটা। আর আপনি চিত্রপুত্তলিকার মতন দাঁড়িয়ে।...'

'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেল নাকি ? বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা সব আণ্ডারগ্রাউণ্ড হয়ে যায় বলে শুনেছি, যেমন কিনা ভুঁইফোড় হয়ে গজায় তেমনি ওই মাটির গর্তে মিলিয়ে যায়

আবার।'

'কে জানে। কি করে যে চকিতে চোখের ওপর উপে গেল একটি মেয়ে—ভাবাই যায় না। তবে একটা মেয়েকে দেখেছিলাম, আমার এখনও মনে রয়েছে বেশ, ঘুরে দাঁড়িয়ে পায়ের চপ্পল খুলে উঁচু করে তুলে আপনাকে দেখিয়েছিল।'

'সে মেয়েটি ভুলবার নয়।'

'মুখের মতন জবাব দিয়েছিল বলেই বোধহয়?'

'কী যে কন! আমার মুখের চেয়ে তার জুতোর দাম ঢের বেশি।'

'তা হতে পারে। তখনকার চপ্পলের বাজারদর আমার ঠিক জানা নেই। তবে হ্যাঁ, স্মরণীয় বটে ব্যাপারটা।'

'আমারো তাকে মনে আছে। যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে তেমন যুতসই মনে হয় নি, তবু বেশ মজবুতসই ছিল মেয়েটা। কী শক্ত সমর্থ দেহ, কীরকম চওড়া তার কবজি—ঠিক আমার বোন ইতুর মতন। তাকে কব্জা করা কারো পক্ষেই তেমন সহজ হবে না, তন্বী বহ্নি যাকে বলে। তাহলেও, কতো মেয়েই তো ঐ পদযাত্রায় আমার যাত্রাপথে এসে গেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ চকিত চাহনিতে তাকিয়ে একটুখানি হেসেও গেছে হয়ত বা, তারা সবাই আমার স্মৃতির মিছিল থেকে ভেসে গেছে কোথায়! কিন্তু সেই মেয়েটিকে আজও আমি ভুলতে পারিনি। স-চপ্পল সেই চপলাকে এখনো আমার মনে রয়েছে!'

॥ আটষট্টি ॥

কবি, বিপ্লবপথিক আর প্রেমিক একদিক দিয়ে সতীর্থই—তাদের ওই পাগলামিতেই। সেদিক দিয়ে ধরলে পাগলামির তীর্থক্ষেত্র এই বহরমপুরের একদা খ্যাত পাগলা-গারদের এক গোয়ালে সগোত্রদের সবাইকার ঠাঁই করে দিয়ে সরকার বাহাদুর বেশ রসবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।

রসকষ দুই ছিলো ইংরেজের। সেকালের দৈনিক ইংলিশম্যান পত্রিকার এক কোণায় 'পাগলামির আড়ত'—এর উল্লেখ থাকত। তাদের সেই কলামটার নাম ছিল 'ক্র্যাংকস্ কর্নার'—তাতে গান্ধীজীর খবরাখবর থাকত সব।

বিশ্ববরেণ্য মহাত্মার এই ক্র্যাংক বলে পরিচয় দেওয়াটা মোটেই রসালো নয়, বরং কটু কষায় রসের বলা যায়।

তবে একদিক দিয়ে গান্ধী পাগলই বই কি! পাগলদের রাজা বলা যায় তাঁকে। তাঁর সংক্রামক পাগলামির ছোঁয়াচে তিনি দেশজোড়া সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন সন্দেহ কি! কবিগুরুর কবিতায় যে-উল্লেখ পাওয়া যায়—কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ/জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো/ প্রেমিক ওগো/পাগল ওগো/সাধক ওগো ধরায় আসো/...ঘোর বিপদ মাঝে/কোন জননীর মুখের হাসি/দেখিয়া হাসো! /

এটা কাকে লক্ষ্য করে তাঁর রচনা, গান্ধীজী কি পরমহংসদেব, সঠিক জানিনে, কিন্তু দু' জনের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। পরমহংসদেবের ন্যায় গান্ধীজীও পাগলও বটেন, প্রেমিকও বটেন, সাধক তো বটেই। যেমন মানবপ্রেমিক তেমনিই অসাধ্য সাধক।

রাজবন্দীদের মধ্যে কবি ছিল, বিপ্লবী ছিল, আর প্রেমিক? কে নয়? সাধারণ অর্থে প্রেমিক না হলেও তাঁদের নিজেদের আদর্শের প্রেমে উন্মত্তই তো তাঁরা।

আমাদের ভেতর সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ছিলেন শুধু একজন—অধ্যাপক জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরাট হল-এ আমাদের সঙ্গে তিনি থাকতেন না, আমাদের থেকে আলাদা একটা সুসজ্জিত ঘর তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, নেতৃস্থানীয় বিরাট ব্যক্তি বলেই বোধ হয়। সেখানে নিজের বইপত্তর নিয়ে পড়াশোনায় তিনি নিমগ্ন থাকতেন। আমাদের হলের এবং কোলাহলের বাইরে।

আমাদের দলের কেউ কখনো তাঁর ঘরে হামলা করতে যেত না। তেমন সাহস বা উৎসাহ ছিল না কারো। গোড়ায় গেল গিরিজা। আমাদের হলের থেকে সেই প্রথমে তাঁর মহলে। তারপর গেলাম আমি—তার ল্যাজ ধরে, নিজের কৌতূহলে।

গিরিজার কয়েকদিন পরেই আমি গিয়ে দেখি, সে বেশ জমিয়ে বসেছে সেখানে। জিতেনবাবু তার সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ক্লাসে লেকচার দেওয়ার বাতিক তাঁর যাবে কোথায়? ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, তিনি জেলখানায় এসেও তাঁর অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছেন! গিরিজার মত উপযুক্ত শিক্ষার্থী পেয়ে তাঁর উৎসাহ আর ধরছিল না।

স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে গিরিজা ছোটবেলার থেকেই পড়াশোনায় খুব পোক্ত। নিজের ক্লাসের থেকে, বয়সের থেকে, অনেক বেশি এগিয়ে। স্কুলে পড়তেই সে কলেজের পড়ুয়াদের টেক্কা দিত। জিতেনবাবুকে সে যেন গোগ্রাসে গিলছিল।

মনের মত শিষ্য হলে গুরুর আনন্দ কত হয় সেদিনই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জিতেনবাবু যেন তাঁর সব কিছু শত মুখে তাঁকে উজাড় করে ঢেলে দিতেন। মাঝখান থেকে উপরি লাভ হ'ত আমার—শেলি, ব্রাউনিং কীটস্, শেকস্পীয়ার প্রমুখের সারাংশ আমার পল্লবগ্রাহী নৈপুণ্যে পেয়ে যেতাম—মুখস্থ না করেও আত্মসাৎ করা যেত।

জিতেনবাবু কী স্নেহের চোখে যে দেখেছিলেন ওকে বলা যায় না। সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও সযত্নে শিখিয়েছিলেন। গিরিজা ইংরেজিতে একটু পোক্তই ছিল, যার ফলে সে অচিরেই আরো শক্ত সমর্থ হয়ে উঠল। উত্তরকালে তাঁর শিক্ষার সদুত্তর সে দিতে পেরেছে। কিছুদিন আগে য়ুরোপ থেকে প্রকাশিত তার 'ইনসাইড য়ুরোপ' বইটিতে প্রমাণ মিলেছে তার। বইটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে সৈয়দ মজুতবা আলীর 'দেশ'-এ প্রকাশিত বিস্তৃত সমালোচনা—নিবন্ধে তার পরিচয় পেয়েছি।

জেল থেকে বেরিয়ে (এবং তারও কিছুদিন বাদে জিতেনবাবুরও বেরুনোর পর) সে তাঁর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে (বিদ্যাসাগর কলেজের কাছাকাছি) থেকেছিল দিনকতক, সেখানে তাকে এবং নিজের আদরের ভাগনে গাবুকে আর দেবুকে (ভালো নাম জানিনে) সমানে তিনি পড়াতেন আমি দেখেছি।

জিতেনবাবু বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক এবং প্রিন্সিপাল (নাকি ভাইস প্রিন্সিপাল) ছিলেন, গিরিজা কিন্তু তাঁর কলেজে ভর্তি না হয়ে সেন্ট পলস্-এ গিয়ে ভর্তি হয়েছিল। সেখানকার হোস্টেলে ছিল—সেখানেও মাঝে মাঝে তার কাছে আমি যেতাম।

কিন্তু খুব উৎসাহ পেতাম না, সেও পেত না, বলতে কি! আমার মতন একটা মুখ্যুকে মনে হয় সে পছন্দ করত না। আর আমি? আমিও, কেন জানি না, তার পাণ্ডিত্যের হিংসেয় নয়, এমনিতেই কেমন যেন তাকে বরদাস্ত করতে পারতাম না। কেবল তাকে নয়, তার মতন নির্মল মনস্বীদের কবেই আমি অন্তর থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছি।

তাছাড়া, তার কাছে গেলেই তো তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাটি—প্রবল বিতার্কিক গিরিজার প্রচণ্ড ঝড়ঝাপটার সামনে সাধ করে কে নিজের মুখ বাড়িয়ে মার খেতে যায় ?

যাই হোক, উচ্চাভিলাষী গিরিজা তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পেরেছিল। অধ্যাপক বড়ুয়ার জামাই হয়ে তাঁর দৌলতে বিলেত গিয়েছিল, সেখানে আরো উচ্চতর শিক্ষালাভের পর সেখানেই বসবাস শুরু করে দেয়—সেখানেও নাকি বিয়ে করেছিল সে আবার, শুনেছিলাম। এখানে যে মিষ্টি মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেলে রেখে গেছল (তাদের একটি মিষ্টিতর মেয়েও হয়েছিল শুনেছিলাম), তাদের কী হ'ল জানি না।

তবে গিরিজা পরে বার্লিনে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সহায়কতায় যোগ দিয়েছিল বলে শুনেছি। সেখান থেকে সুভাষচন্দ্রের সমাচার সহ একখানা চিঠি দিয়েছিল আমায়—বসুমতীর ঠিকানায়। চিঠিটা ভুলক্রমে আমার বন্ধু শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর কাছে চলে যায়, আমি পাইনি।

এর মধ্যে সে ভারতেও ফিরেছিল একবার—এই তো সেদিন। এক রাত বারোটায় প্রবোধ সান্যালের সাথে আমার বাসায় এসে হাজির হঠাৎ। আমার ঠিকানার হদিশ বাতলাবার জন্যই প্রবোধকে সঙ্গে করে আনা, জানা গেল। কিছুক্ষণ ছিল, বিশেষ কোনো কথা হয়নি, গোলপার্কের কোথায় যেন উঠেছিল, কিন্তু আমি আর যেতে পারিনি। পরে তার একটা চিঠি পেয়েছিলাম দিল্লির থেকে—সেই কবেকার আমাদের যুগান্তরে 'পথিক' ছদ্মনামে তার দু' একটা ছোটখাট কথিকা গোছের লেখা বেরিয়েছিল তারই খোঁজ করে, সেগুলি পাওয়া যায় কিনা জানতে চেয়েছিল সে। কোথায় পাব সে যুগান্তর ? গতকাল আমার নিজের যে লেখা বেরিয়েছে তারই কোন পাত্তা নেই আমার, লেখাটেখার প্রতি এতই যে অ-মায়িক প্রকৃতির—তার কাছে অত কাল আগেকার যুগান্তরের খবর থাকে ?

কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, বিশ্ববিদিত না হলেও যে নাকি আন্তর্জাতিক লেখকদের একজন বলেই গণ্য, তারও কিনা মনের কোণে কোণে মাতৃভাষায় লেখা কবেকার সামান্য কয়েক ছত্রের জন্যও মায়া জড়িয়ে থাকে! অবাক হবার কথাই বই কি!

তার কোর্টশিপের কালে গিরিজা আমাকে অধ্যাপক বড়ুয়ার বাসাতে নিয়ে গিয়েছিল একবার—(তাঁর পুরো নাম বোধ করি বেণীমাধব বড়ুয়া, বাড়ি ছিল যেন শ্রীরামপুরেই ?) তার ভাবী বউকে দেখাতেই, মনে আছে। ভারী সুশ্রী মেয়েটি, মুখখানি কী মিষ্টি যে। অসমীয়া মেয়েরা স্বভাবতই যেমনটা হয়ে থাকে। সেই বাড়িতে এমন একটা কাণ্ড সে করে বসে যাতে আমি বেশ ধাক্কা খাই। কাণ্ডটা এমন কিছু নয়—সাধারণের কাছে, সাধারণভাবে দেখলে এমন কিছু মারাত্মক ঠেকবে না, কিন্তু আমার মনে তার চোট দারুণ লেগেছিল। বৈঠকখানায় আমরা বসে গল্প করছিলাম, বাড়ির এক বাচ্চা ছেলে, তার ভাবী শ্যালকই হবে সম্ভব, ভারী দুরন্তপনা করছিল, ছেলেরা যেমনটা করে থাকে সচরাচর। গিরিজা করল কি, তার ঘাড় ধরে নুইয়ে সেই বিরাট তক্তপোষের তলায় ঢুকিয়ে দিল, বলল, থাকো ঐখানে বসে যতক্ষণ না আমরা এখান থেকে যাচ্ছি। আশ্চর্য, ছেলেটা সেখানেই হামাগুড়ি দিয়ে বসে রইল বিনা বাক্যব্যয়ে—বেড়ালের মতই চুপটি করে ম্যাও শব্দটি না করেই। যতক্ষণ আমরা ছিলাম তাকে আর বেরুতে দেখিনি তার পর। বাড়ির ছেলেপিলেরা গিরিজাকে বেশ ভয় খায় দেখলাম।

ব্যাপারটা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। ছেলেটার মনে কতটা লেগেছিল জানিনে,

মনের ঐশ্বর্যে তারা অফুরন্ত তাই হয়ত কিছুই তাদের মনে লাগে না। জলের গায়ে আঘাতের ন্যায় খুব মর্মভেদী ঘা-ও মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়। এতদিনে সে ঢের বড়ো হয়েছে, কবেই ভুলে গেছে সেদিনের কথাটা, তার পরেই হয়ত বা, কিন্তু চোট আমার মন থেকে যায়নি এখনো। সত্যি বলতে, সেই কাণ্ডের পরই গিরিজার সঙ্গে যেন আমার কাটান ছাড়ান হয়ে গেল, অন্তরের দিক থেকে অন্তত। যে-টানটুকু তার ওপর তখনো আমার ছিল তারও যেন কাটান হয়ে গেল ঐ কাণ্ডটাই। তার বিয়েতেও আমি যাইনি আর তার পর।

জিতেন্দ্রলাল ছিলেন মহামনস্বী আর মহামনা। বিদ্যাসাগর গোত্রীয়। যেমন বিদ্যায় তেমনি উদারতায় আর দাক্ষিণ্যে। কেবল গিরিজাকেই না, তার মতন কত ছেলেকেই যে তিনি অর্থ দিয়ে, আহার্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমাকেই বা কিছু কম কি ? চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের পরে অভাবে পড়ে যখনই না তাঁর কাছে গেছি, অকৃপণ দাক্ষিণ্য লাভ করেছি, এতবার এত এত যে, তা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না।

তেমনি পেয়েছি আরেকজনের কাছেও। তিনিও সেকালের এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। মডারেট পার্টির এক মুখ্য নেতা অ্যাটর্নিদের অগ্রগণ্য যতীন্দ্রনাথ বসু। তাঁর হৃদয়বত্তারও তুলনা হয় না। আবালবৃদ্ধবনিতা যে-কোন প্রার্থীকেই তিনি বিমুখ করতেন না। মুক্তহস্তে দিতেন, এমন কি তাঁর বিপক্ষীয় কেউ এসে তাঁর আনুকূল্য চাইলে কখনো নাকি বঞ্চিত হয়ে ফেরেননি। এ কথা আমাকে বলেছিলেন স্বয়ং হেমন্তকুমার সরকার, তৎকালে স্বরাজ্যদলের, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকেই। এই ধরনের মানুষ একালে আর দেখাই যায় না বলতে গেলে।

কৃতজ্ঞতার পরিচয়ে আমার প্রথম প্রবন্ধের বই 'আজ এবং আগামীকাল' যতীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছিলাম আর 'কালান্তক লালফিতা' বইটি অধ্যাপক জিতেন্দ্রলালকে উৎসর্গীকৃত।

দুটো বইয়ের কোনটাই এখন আর পাওয়া যায় না। তার পর আর তা পুনর্মুদ্রিত হয়নি, কালস্রোতে বিলীন। আমার সেকালের প্রায় সব বইয়ের এই দশা—কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি কোনটাই। উত্তরকালের উদ্দেশে রচিত না বলেই বোধ হয়।

জিতেন্দ্রলাল গিরিজাকে আদর করে পথিক বলে ডাকতেন—যুগান্তরের কথিকা-রচয়িতার ছদ্মনামটি ধরে বারংবার সেই সম্বোধনেই কি না কে জানে, তার মনে সুদূর যাত্রার দুরাকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, এবং নিজের উদ্দেশ্যপথে অনেক দূর এগিয়েও ছিল সে। যে সুভাষচন্দ্র আমাকে আত্মশক্তিতে ডাকার পরই বিশৃঙ্খল বলে বিষবৎ বিসর্জন করেছিলেন, সেই সুভাষের বিশ্বস্ত দায়িত্ববান পার্শ্বচররূপে জার্মানীতে কাজ করা নেহাত কম কথা নয়। আমি তো তা ভাবতেই পারিনে!

জিতেন্দ্রলালের আদর্শে নিজেকে অতিমানুষরূপে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছিল গিরিজা। পড়াশুনা, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণে অবিকল তাঁর মতই। জিতেন্দ্রলাল যেমন মহামনস্বী ছিলেন, তেমনি ছিলেন এক অতিমানুষ। বাগ্মিতায়, দেশপ্রেমে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, তাঁর মতনটি হওয়া খুব সহজ ছিল না। তাহলেও তাঁর মাপেরটি না হলেও, ছোটখাট একটা অতিমানুষ হতে সে সচেষ্ট ছিল বোধ হয়।

হয়েছিল কি ? হতে পেরেছিল কি ? হয়ে থাকলেও তাতে তার কী লাভ হয়েছিল আমি জানিনে। অতিমানুষ হওয়ার অত্যাকাঙ্ক্ষা কোনোদিন আমাকে পায়নি, আমার ধাতেই

নেই, সে-পথের লাভক্ষতির খতিয়ান আমি দিতে পারব না।

অতিমানুষ আর অতি মানস, সত্যি বলতে, দুই-ই আমার ধরণার বাইরে। আমার মনে হয় কেউ যদি কোনো একটা পেশায় এক মনে একটানা লেগে থাকে তাহলে এককালে হয়ত সে অতীব মানুষ না হয়েও ঐ অতিমানুষের পর্যায় পরিচিত হতে পারে। কিন্তু একমাত্র পেশায় একপেশে হয়ে যাওয়ায়, ভালোটা কোথায় ? হিটলারের ন্যায় অতিমানবিক পেশায় নিজের অষ্টোপাশে নিজেই জড়ীভূত হয়ে আশেপাশের সবাইকে সমপেষণ ছাড়া আর কী ? ছোটখাট পরিধিতে নাতিখর্ব কি খর্বাকার হিটলার হয়ে সবাই মিলে সমান নিষ্পিষ্ট হওয়া বইতো নয়। সেটা কি বাঞ্ছনীয় ?

আমার মতে, অতীব নয়, সম্পূর্ণ হওয়াটাই সার্থক। সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য বড় হতে হয় না, কাউকে পেষার দরকার করে না ; নিজের হওয়ার সাথে সাথে সে-ই হওয়ায়, তার আশপাশের আর সবাইকেও সে হওয়ায়।

সুন্দরই হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুন্দর সুষম হওয়াই সম্পূর্ণ হওয়া। ফুল যেমন তার ছোট্ট বৃন্তে, সামান্য বৃন্তেই রূপে রসে গন্ধে—আনন্দের ছন্দে হয়ে ওঠার বৃত্তিতে পরিপূর্ণ।

আমাদের কালে সম্পূর্ণ মানুষ দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথকে। নজরুলকেও আমরা দেখেছি। প্রেমেনকেও হয়ত বলা যায়। প্রেমেন দেখতে ভালো, আচারে আচরণে নিখুঁত, মনে আর মগজে সমান দিগ্গজ, স্বভাবে ব্যবহারে সুমধুর। স্বভূমির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের বৃন্তে দাঁড়িয়ে স্বকীয় আদান-প্রদানের শিল্পবৃত্তিতে সব দিক দিয়ে সে সার্থক। ছোট পরিধিতে হলেও রবীন্দ্রনাথের মতই নিজের রহস্যময় অন্তস্তল থেকে নেওয়া আর বিশ্বজনকে বিলিয়ে দিয়ে যাওয়ার পরম অবলীলায় সে অপরূপ।

এই আদান-প্রদানের বৃত্তিতেই যে কোনো মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে। লেখক, গায়ক, শিল্পী, যে কোনো রূপবান কলাবৎই তা হতে পারে। কিন্তু অতিমানসে কিংবা অতি মানুষত্বে উত্তীর্ণ হওয়া এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। দারুণ বিড়ম্বনা। তেমন সর্বনাশ যেন কখনো কারো না হয়, ভগবান আমাদের রক্ষে করুন!

কিন্তু জিতেন্দ্রলালের পৈঠায় দূরে থাক, তাঁর পাদমূলেও কি পৌঁছতে পেরেছিলো গিরিজা ? মনে হয় না।

জিতেন্দ্রলাল যেমন মাথায় তেমনিতর মনের দিকেও বিরাট ছিলেন। বুদ্ধির দিক দিয়ে যেমন অতিমনস্বী, বিদ্যায় বাগ্মিতায় অদ্বিতীয়, মনের দিক দিয়েও তেমন অতিশয় মনুষ্য। তাঁর মনের পরিচয় পেয়েছিলাম সেইখানেই—সেই জেলখানাতেই একদিন।

সেদিন তাঁর ঘরের তকতকে মেজেয় শুয়ে আমি দৈনিক স্টেটসম্যান পড়ছিলাম, আর তিনি কোণের জানালার দিকটায় ডেকচেয়ারে ঠেস দিয়ে একান্ত মনোযোগে পড়ছেন শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া। জিতেন্দ্রলালকে জেলের থেকে দৈনিক পত্র আর তাঁর পছন্দসই বই যোগানো হতো।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ফোঁসফোঁসানি শুনে চমকে উঠে তাকালাম। দেখি কিনা, বই পড়তে পড়তে হাপুস নয়নে তিনি কাঁদছেন, ছেলেমানুষের মতন অঝোর কান্নায় চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে তাঁর। বই মুড়ে প্রাণভরে খানিকটা কেঁদে নিয়ে বই খুলছেন, আবার কাঁদছেন আবার মুড়ে রাখছেন—ফের আবার—বারংবারই ঐ কাণ্ড। তারপর তিনি আর সামলাতে পারেন না, না নিজেকে, না বইটাকে।

ঘরের অন্য কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেন বইটাকে। খানিক বাদে চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে তুলে আসেন বইটা, খানিক পড়ার পর কেঁদে ভাসিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন আবার। আবার তুলে আনেন। এমনিধারা চলতে থাকে তাঁর বারংবার।

না পারছেন নিজেকে রুখতে, না পারছেন বই পড়া রাখতে। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তাঁর চোখ মুখ চিবুক প্রশস্ত বুক—শরৎ-রচনার এর চেয়ে বড় প্রশস্তি আর কী হতে পারে? তার এই অশ্রুত অশ্রুপ্লুত কাহিনী তাঁর মনশ্চরিত্রের আরেক দিক প্রকাশ করে অনেককেই চমকে দেবে হয়ত। অশ্রুবন্যায় ভাসমান তাঁকে দেখে অরক্ষণীয়া কন্যার ন্যায় তাঁকেও আমার নিতান্ত অরক্ষণীয় বলেই মনে হয়েছিল সেদিন।

॥ উনসত্তর ॥

বহরমপুরে কারাবাসের এক মাস দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল আমাদের। এগিয়ে এলো খালাস পাবার তারিখ।

দেখে দেখে আর চেখে চেখে ফুর্তির মধ্যেই কেটেছিল দিনগুলো। দেখবার ছিল একজনই কেবল—সেই কাজী। সে-ই একমাত্র দ্রষ্টব্য। মুহূর্তে মুহূর্তে তার রঙ বদলাচ্ছে, সুর বদলাচ্ছে, মেজাজ বদলাচ্ছে। মুহুর্মুহু সে অপরূপ।

কোনো বিধিনিয়মের রজ্জু দিয়েই তাকে ধরা যায় না, মাপা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই অভিব্যক্তির আখ্যান হতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যান নেই। এমন পরমাশ্চর্য বুঝি এর আগে দেখা গেছল সেই নবদ্বীপেই—বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতাকে যা মাতিয়েছিল আরেকবার। অপর দৃষ্টান্ত দ্বাপরের—বৃন্দাবনের মেয়েপুরুষকে পাগল করে তুলবার সেই।

দ্রষ্টব্যই নয় কেবল কাজী, শ্রোতব্যও বলতে হয়। সুরের তালে অহরহ তার আনাগোনা। নিজেও সে যেমন মাতোয়ারা, তেমনি গানে গানে মাতিয়ে রাখত আমাদের সবাইকে। নিজের গানের চেয়েও বেশি গাইত সে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

চোখে দেখার দিকে যেমন, চেখে দেখার দিকেও তেমনি সে। ভালোমন্দ নানান খানা, নানা খাবার চাখা-য় চাখাবার সে ছাড়া কে আর? কয়েদখানার পাকিস্তানের কায়েদে আজম নজরুল। কতো রকমের রান্নার কায়দাকানুন জানা তার, তা বলবার নয়।

অবশ্যি আমাদের খানা পাকানোর থেকে তাবৎ পরিচর্যার জন্য জেলের থেকে কয়েকজনা মেট মজুদ ছিল, কিন্তু তাহলেও কাজী নিজগুণেই রান্নাঘরের হাতা-খুনতিতে গিয়ে হাত লাগাতো বেশির ভাগ।

কতো দেশবিদেশের রান্নাবান্নাই না জানত সে। শেখদের হারেমের শিককাবাব; (নাকি, শেখদের কাবু করা শেখকাবাব?) থেকে শুরু করে তুর্ক মুলুকের মুর্গমসল্লাম (যা খেয়ে বোগদাদের আমীররা তুর্কীনাচন নাচতেন), আফগানি পোলাও থেকে বেলুচিস্তানের চাপাটি পেরিয়ে পেশোয়ারী প্যাটিস্ হয়ে পাটনাই চাঁপ পর্যন্ত—হরেক কিসিমের মোগলাই কারিকোর্মা রোস্ট্—সেই সঙ্গে আমাদের এদেশী বিরিয়ানি আর চিরদিনের পরমান্ন নিয়ে—কতো রকমের খানদানি খানাপিনা যে!

খেয়ে খেয়ে চেহারা ফিরে গেল আমার, চেকনাই দেখা দিল। ক'খানা হাড় নিয়ে কয়েদখানার গেছলাম, অদৃষ্ট হাতে করে—সেখানেই এগুলোর সদ্গতি হবে সেই আশায়, এদিকে নানান খানায় হৃষ্ট হয়ে গায়ে গত্তি গজিয়ে সেখান থেকে বেরুলাম, বেশ পুষ্ট হয়ে।

জেলে গেলেই রাজবন্দীরা লপসীর প্যাঁচে পড়ে ভালো খাওয়ার দাবিতে প্রায়োপবেশন করে এই জানি, না খেয়ে শুকিয়ে টি-বি বানিয়ে ম্লানমুখে ফেরে এইটেই জানা, আমার বরাতে সর্বক্ষেত্রে সব ব্যাপারেই উল্টো উৎপত্তি! বেড়ে ভোজনে ওজনে বেড়ে রীতিমতন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেরুলো।

ছাড়া পাবার দিন জেলখানার আপিসঘরে ডাক পড়লো। সেখানে যেতেই ছাড়পত্রের সঙ্গে দুখানা রেলোয়ে পাশ দেওয়া হল শেয়ালদা পর্যন্ত—ফাসকেলাস পাশ, ফাসকেলাস কয়েদী যখন। কারাবরণের কেরামতিতে সেই প্রথম ফাসকেলাসে চাপার সুযোগ ঘটল আমার।

'তোমাদের নিজস্ব জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে পারো, অ্যালাউ করা আছে এই পাশে।' বললেন জেলের করণিকটি।

নিজস্ব বলতে, পরনের কাপড়-জামা ছাড়া, জেলের থেকে পাওয়া কম্বল দুটো সম্বল করে নিয়ে বেরুলাম।

গিরিজা নিল না, বলল, 'গয়ার পাপ গয়াতেই থাক।'

শেয়ালদায় নেমে ট্যাকসি ধরে গিরিজা কোথায় গেল জানি না। আমি ট্যাকসি চাপব কোন ভরসায়? তার ভাড়া গোনার কে আছে আমার কলকাতায়? কম্বল ঘাড়ে সোজা হণ্টন দিলাম ঠনঠনের দিকে।

বাসায় এসে দেখি, আমার ঘর তালাবন্ধ। শুনলাম, পুলিসে আমাদের ধরে নিয়ে যাবার পরেই বাড়ির মালিক আনন্দবাবু এসে নিজের তালাচাবি মেরে দিয়ে গেছেন।

গেলাম আনন্দবাবুর কাছে।

আমাকে দেকে তিনি আনন্দিত। চা জলখাবার খাইয়ে শুধালেন আমাকে—'এ কম্বল আপনি পেলেন কোথায়?'

'জেলখানায়। দিয়েছিল আমাকে।'

শুনেই তিনি আঁতকে উঠেছেন—'অ্যাঁ, করেছেন কী? জেলখানার জিনিস হাতিয়ে এনেছেন? গেটে আটকায়নি আপনাকে? না? আশ্চর্য। আরে মশাই, দেখছেন না জেলখানার ছাপ মারা আছে কম্বলে। এই মার্কা পুলিসের নজরে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। তারপরে এবার যে জেল হবে আপনাব তা ওই লুচি আব পোলাওয়ের নয়, দস্তুর মতন ঘানিটানার। বুঝলেন?'

'তাই নাকি? তা আমি কি জানি। আমায় বলল, তোমার যা আছে সব নিয়ে যাও। নিজের বলতে ত্রিভুবনে এই কম্বল দুটোই দেখলাম। কী করব? কই, তারা কিছু বলল না তো? বাধা দিল না তো গেটে?'

'খেয়াল করেনি হয়ত। ফাসক্লাস পলিটিক্যাল প্রিজনার বলে ছেড়ে দিয়েছে, আপত্তি না করে। কিংবা হয়ত ওগুলো বহরমপুর জেলের ছিল না বলেই। সেখানকার জেলখানা থেকে নেওয়া হয়নি বলেই জমা দেবার কোনো প্রশ্ন ছিল না। আলিপুর জেলের থেকে বহরমপুরে রপ্তানি করার সময় শীতকাল বলে তাঁরাই দিয়ে দিয়েছিলেন তো।'

শুনে আনন্দবাবু বললেন, 'যাক্‌গে, এগুলোকে এখন সরিয়ে ফেলুন সবার নজরের থেকে। পাচার করে দিন এক্ষুনি।'

'কোথায় পাচার করবো?'

'আপাতত চাদরের তলায়। পেতে ফেলুন বিছানায়। আমি একটা বেড কভার দিচ্ছি, তাই দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিন। দিনকতক পুলিসের নজর থাকবে এখন আপনার ওপর,

নজর রাখবে তারা। থানার থেকে এস-আই এসে খোঁজ নিয়ে যাবে মাঝে মাঝে, তখন যদি এই কম্বল দেখতে পায় একবার...।'

আর বলতে হল না। বেড কভারটা নিয়ে বিছিয়ে দিলাম আমার কম্বলের বিছানায়।

বাসার চৌকির ওপর কম্বলমাত্র সম্বল আমার শয্যা বেডকভার বিছানো এখনো আমার বাসায়। সেই কম্বলের চৌকিদারি এখনও করছি। অবশ্যি, আনন্দের সেই উপহার এতদিনে নেই আর তা ঠিক, কিন্তু আমার বোন পুতুলের অবদান বালিশকে শিরোধার্য করে সেই কম্বলের একখানা এখনো রয়েছে।

জেলের আরেকখানা খুইয়ে এসেছি রেলে। আমার ভ্রাতৃভূমি ঘাটশিলায় যাবার কালে ১১১নং কামরার বেঞ্চিতে পেড়ে আরাম করে গেছলাম। ইস্টিশনে নামার তাড়ায় সেখানকার কথা খেয়াল ছিল না। জেল কোম্পানির কম্বল রেল কোম্পানিকে দিয়ে এসেছি।

আর শীর্ষস্থানীয় সেই বালিশটা? আমার বোন পুতুল ওরফে সরস্বতী (তখন বসু, এখন মিত্র) বন্ধুর কাজ করেছিল একবার। হঠাৎ আমার বাসায় এসে বিছানায় বালিশ নেই দেখে সে অবাক। —'এ কী? তোমার মাথার বালিশ নেই কেন গো?'

'পাব কোথায়? তাছাড়া, বালিশের আমার দরকার লাগে না। বিছানায় পড়লেই ঘুম। ঘুমটাই আসল, বালিশটা নয়...।'

'সে কী হয় নাকি? বালিশ পাব কোথায়, তার মানে? বিছানা যেখানে পেয়েছিলে, খুঁজলে সেই দোকানে তার বালিশটাও পেতে। পেয়ে যেতে অমনি।'

'হ্যাঁ, দিচ্ছে অমনি। বিছানা তো জেলখানার, কাউকে বলিসনে যেন, তাহলে আবার জেলে নিয়ে পুরবে আমায়। তারা শুধু বিছানাই দেয়, এই কম্বল। বালিশ ফালিশ দেয় না ভাই!'

'ঘুমুতে কি করে তাহলে? ঘুমোও কি করে শুনি?'

'ঘুম তো আমার হাতে। আমার হাতের পাঁচ।'

'বললেই হোলো! দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি তোমার বালিশ। কাছেই কমলালয় স্টোরস, ট্যাকসি নিয়ে যাব আর আসব।'

ওর বলাবলিতে বৈষ্ণব পদাবলীর সেই 'রতিলালিশ ভুজবালিস সুখআলিশ'-এর কথা মনে পড়ল আমার। রতিলালিশ না থাক, ভুজবালিস তো রয়েছেই। পরহস্তগত না হোক। (পরহস্তগতির ভরসা করিনে), নিজের হাতেরটা যাবে কোথায়?

নিজের হাতে মাথা দিয়ে ছেঁড়া কাঁথায় আয়েশে ঘুমোনো যায়—ঘুমটাই হচ্ছে আসল। ঘুমের মতন শয্যা আর হয় না। খিদের মতন সুখাদ্য নেই।

'এত বেলায় বাসায় তো এখন ভাত বাড়ন্ত। খেতে পাবেন না গিয়ে। এখানেই দুটি খেয়ে যান না! গিন্নী খিচুড়ি রেঁধেছেন আজ শুনছিলাম।'

খিচুড়ি! শুনেই আমি লাফিয়ে উঠেছি। যে আমি খিচুড়ি-প্রীতির প্রেরণায় জেলখানার লপসিকেও খিচুড়ি-ভ্রমে খেয়ে খুসি হয়েছি—সেই আমার আজ অনিবার্য হরিমটরের দিনে (অবশ্যি মল্লিকবাড়ির জগন্নাথপ্রসাদ পাওয়ার সময় ছিল তখনো, যেতে বাধাও ছিল না কোনো) এই মেঘ না চাইতেই জলের মত কম্বল চুরি করে আনার পরই এই খিচুড়ি!

ভাগ্যের এমন যোগাযোগ আর হয় না!

জেলখানায় সেই সাতসকালে রুটি মাখন ডিমের প্রাতরাশের পর এতক্ষণের হা পিত্যেশে এমন খিদে পেয়েছিল যে, কহতব্য নয়।

সেদিন আনন্দধামের খিচুড়ি খেয়ে অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিলাম।

খিচুড়িটাও ছিল অদ্ভুত। এমন খিচুড়ি আমি আর কোথাও খাইনি, তার আগেও না, পরেও নয়। চালডালের গলাগলি গায়ে-গায়ে জড়াজড়ি যা সচরাচর খেয়েছি তার থেকে এ স্বতন্ত্র, একেবারে পৃথক। খিচুড়ির প্রত্যেক অণুপরমাণু পৃথক পৃথক। ফ্রায়েড রাইসের মতই অনেকটা, একরকমের বেশ ঝরঝরে খিচুড়ি। আর গাওয়া ঘি দিয়ে খেতে যা উপাদেয় তা বলবার না।

পরিপাটি খেয়ে চাবিকাঠি নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে কম্বলের ওপরে বেডকভার বিছিয়ে সটান হওয়া গেল লম্বা হয়ে।

একটানা একখানা ঘুমের পর বিকেলে উঠতেই দেখি, কেতাদুরস্ত এক চাপরাসী অপেক্ষা করছে আমার জন্য—সুভাষচন্দ্রের চিঠি নিয়ে। সুভাষবাবু তখন কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার।

সি-ই-ও'র শীলমোহর লাঞ্ছিত সেই খামখানা খুলে জানলাম, সুভাষচন্দ্র আজ সন্ধ্যের পর তাঁর বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন আমাকে।

গেলাম তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে যথাসময়ে।

তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে, উপেনদা (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সম্প্রতি অন্তরীণ, তাঁর কাগজ সাপ্তাহিক আত্মশক্তির ভার দিয়ে গেছেন তাঁর ওপর। আর দেশবন্ধুর ইচ্ছা, আমাকেই যেন সম্পাদক করা হয়। তাঁর ধারণা, উপেন্দ্রনাথের পত্রিকার মর্যাদা আমার হাতে ক্ষুন্ন হবে না, সম্পাদকরূপে আমি মোটেই অনুপযুক্ত হব না নাকি।

'এই দেখুন না দেশবন্ধুর চিঠি।' সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর পত্রটা আমার হাতে দিলেন, পেন্‌সিলে লেখা কয়েক ছত্রের নোট—তার একটি কথা ভুলতে পারিনি এখনো। 'শিবরাম, এ গুড্‌ রাইটার অব বেংগলি প্রোজ' বলে পরিচয় দিয়েছেন তিনি আমার।

'তারপরে টেলিফোনেও কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমার....।' সুভাষ বললেন তার ওপরে : 'তাহলে লেগে যান আপনি কাল থেকেই ? কেমন ?'

লেগে গেলাম। তারপরই।

॥ সত্তর ॥

জেল থেকে বেরিয়ে 'আত্মশক্তি'র সাহায্যে যাতে আমি স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারি, তার এই ব্যবস্থা করে রাখা দেশবন্ধুর এই অহেতুক স্নেহকরুণার আমি কোনো তুলনা পাই না। যাঁকে সর্বক্ষণ সারা দেশের ভাবনায় সমস্যায় জর্জর হতে হচ্ছে, তাঁর অভিভাবনার এককোণে আমার ন্যায় নগণ্যদের জন্যও যে একটুখানি ঠাঁই রয়ে গেছে ভেবে অবাক হতে হয়।

যে উত্তম রহস্য সন্তানজন্মের আগেই তার জন্য মাতৃস্তন্যের বন্দোবস্ত করে রাখে তাঁর মধ্যে সেই ভগবৎ সত্তার সাক্ষাৎ পাই যেন। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা—তাঁরই পরিচয় মিলে যায় যেন।

হেদোর পৈঠায় বসে যে ছেলেটি একদা বলেছিল আমায় যে দেশবন্ধু গঙ্গাই, মনে হয় তাই বটে। যে গঙ্গাকে রসাতলযাত্রায় একদা পাতালবাহিনী ভোগবতীরূপে দেখা গেছে, সেই তিনিই আরেকদিন সর্বত্যাগব্রতী হয়ে রসাতলের সেই ভোগবতী-কন্যাদের দেশসেবার দানব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন, তারা দলে দলে এসেছে রাজপথ ধরে স্বরাজ ভাণ্ডারে প্রাণের

চেয়ে প্রিয় অলঙ্কার দানের অভিযানে, কে না জানে ? পতিতাদের একদা আকর্ষণ করেছিলেন বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, তারপরে পরমহংসদেব আর এই সেদিন আমাদের দেশবন্ধু। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা—এঁরা সবাই।

গঙ্গাই বটে। যে গঙ্গা মনের মণিপদ্মাসনে আত্মস্থতার গভীরতায়, গাম্ভীর্যে, বিস্তারে, বিরাটের অব্যয় অভিব্যক্তি, সেই তিনিই পদ্মার মতই আবার অথৈ, উত্তাল, অকূলের কূলভাঙ্গা বিপুল ভাঙাগড়ার খেলা—তিনিই ফের মহাভারতের হৃদয়প্লাবী ভাগীরথীর মৃতসঞ্জীবনী। প্রাণপ্রবাহের অজস্রতা ! কাব্যলোকের সুরধুনীরূপে সাগরসঙ্গমের মোহানায় গিয়ে যিনি আত্মহারা, তিনিই আবার গঙ্গোত্রীর পথে অলখঝোরা পেরিয়ে ভুবনেশ্বর নগাধিরাজের জটাজুটে অলকনন্দা। মহেশ্বর শিরশ্চ্যুত জাহ্নবীর এই রূপের পঞ্চপ্রদীপে সেই মহাদেবের মহারতি।

ভাবলাম একবার, তাঁর কাছে গিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি। যাইনি, জানি তো তিনি তার অপেক্ষা রাখেননি। তাছাড়া কৃতজ্ঞতার ভাষাও আমার জানা নেই। কাউকে কোনো দিনই তা জানাতে পারিনি। তুচ্ছ মুখের কথায় প্রাণের ঋণ পরিশোধ করা যায় তা আমি মনে করিনে, চিরকালই তা অপরিশোধ্য থেকে যায়। তাছাড়া প্রায় ভালোবাসার মতই ঐ কৃতজ্ঞতাও বাইরের স্তরে নয়, অন্তরের অনুভবে।

এক মনের অনুভূতি অগোচরে সহজেই অপর মনে গিয়ে পৌঁছয়—এক কূলের ঢেউ আপনার থেকেই অন্য কূলে গিয়ে লাগে। নিজগুণেই তিনি টের পেয়েছেন, সন্দেহ নেই।

আত্মশক্তির সাধনায় লাগা গেল তারপর। এমন কিছু অসাধ্যসাধন শক্ত কাজ ছিল না। ডবলক্রাউন চার পেজী সাইজের আট পাতার কাগজ—কিংবা ষোলো পাতারই হবে হয়ত, মনে পড়ে না। যুগান্তরের মতন তার আগাপাশতলার সবটাই লিখতে হত না আমায়, আত্মশক্তির লেখকগোষ্ঠী ছিল, উপেনদাই গড়ে দিয়ে গেছলেন। তাঁদের লেখা পাওয়া যেত নিয়মিত। সেসব লেখা দেখেশুনে দেওয়ার কিছু ছিল না—প্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁরা। নবীন লেখকদের লেখাও, লেখার মত হলে ছাপাবার আমার কোনো অন্যথা হত না। আগে ছাপতাম।

পরিচালনার কোনো দায় আমার ছিল না। চন্দননগর গোঁদলপাড়ার প্রাক্তন বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ, সেসব দিক তিনিই সামলাতেন। যুগান্তরের যেমন আগাগোড়া সব লেখার থেকে শুরু করে সম্পাদনা, প্রুফ দেখা এবং প্রেসে চাপানোর আগে তার মেক-আপ-এ সহযোগিতা করা পর্যন্ত সব কিছুর সামাল দিতে হয়েছে আমায়, এমনকি তার পরেও ডাকের কাগজের মোড়কে গ্রাহকদের নাম ঠিকানা লেখাও বাদ ছিল না, ডাকঘরে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসা তো ছিলই—সেসব ঝামেলা পোহাতে হয়নি এখানে।

আর মাসকাবারে করকরে সেই একশো টাকা নিয়মিত। যে ক'মাস আমার বরাতে ছিল সে সময়টা স্বচ্ছন্দ নির্ভাবনায় কেটেছে। আদাজল খেয়ে লাগতে হয়নি, রাবড়ি বা মটন চপের সঙ্গে লাগসই হয়ে আরামে কাজ চালিয়ে গেছি।

তবে বেশিদিন এই স্বাচ্ছন্দ্যের সুখ আমার কপালে সয়নি। আমার ভেতরে বোধকরি এক ঘূর্ণী আছে, সেই যে, 'ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিলো সূর্য তারাকে', সেই ঘূর্ণীই সূর্যতারার সঙ্গে কপাল সমেত আমাকেও ঘুরিয়েছে বারংবার।

আত্মশক্তি আমি নিজেই ছাড়লাম একথা বলা যায় না, কোন কিছু আপনার থেকে ছাড়ার

ক্ষমতা বা অহঙ্কার আমার নেই, মায়াবদ্ধ জীব, সহজেই সব কিছু আর সবার প্রতি আসক্ত হই, ছেড়ে যাবার শক্তি রাখি না। ছাড়লাম না বলে ছাড়িত হলাম বলাটাই ঠিক।

আর, সেটা হয়েই থাকে—পৃথিবীর সবক্ষেত্রে জীবনের পথ চলায় স্বভাবতই তা হয়ে যায়, তা নিয়ে কোনো অভিযোগ চলে না। আমারও কোনো অভিযোগ নেই। জাগতিক নিয়মে এরকমটা হবেই সর্বদাই, না হয়ে যায় না।

আমার পরে আত্মশক্তি কর্ণধার হয়েছিলেন বিজলী-সম্পাদক স্বনামধন্য নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, তাঁর পরে সরোজকুমার রায়চৌধুরী, গোপাললাল সান্যাল। গোপালবাবু আর সরোজ সুভাষচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আমার সম্পাদিত আত্মশক্তি), যতদূর মনে করি, সরোজের প্রথমকার লেখা সব বেরিয়েছে।

তারপরে ফরোয়ার্ড পাবলিশিং-এর হাতে গিয়ে আত্মশক্তি নবশক্তি-র নবকলেবর লাভ করে। তখন তার সম্পাদক হন একদা বিপ্লবী তারানাথ রায়। তাঁর সময়ে নবশক্তির আকর্ষণ আর মহিমা অনেক বেড়ে যায়। এর পৃষ্ঠাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম একাঙ্ক নাটক বুদ্ধদেব বসুর 'একটি মেয়ের জন্য' প্রকাশ পায়। তারপরের হপ্তায় অচিন্ত্যর 'নতুন তারা' আর বোধকরি তার দু-এক সপ্তাহ বাদেই একাঙ্কিকায় আমার সম্পূর্ণ নাটক 'যখন তারা কথা বলবে'।

প্রথম একাঙ্কিকা লেখার গৌরব বুদ্ধদেব কি মন্মথ রায়ের, পাঁজিপুঁথি তারিখ মিলিয়ে আমি সঠিক বলতে পারব না। মন্মথ রায়ও এইকালেই একাঙ্কিকা লিখতেন, কল্লোলে এবং অন্যত্র। এই ক্লাসের কে ফার্স্ট বয় তা গবেষকরা বিচার করে বলবেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সমসাময়িক জাগরণী পত্রিকায় আমার ঐ একাঙ্কিকার আলোচনা করেছিলেন। সেটা আমার নাটিকার প্রশস্তি হলেও কাজটাকে আমি প্রশস্ত বলতে পারি না। প্রেমেন সেকালে আমার প্রতি একটু পক্ষপাতদুষ্ট ছিল মনে হয়। তার প্রথম বই 'পুতুল ও প্রতিমা' উৎসর্গ করেছিল আমায়। তার আর সব বন্ধুর তুলনায় আমার অনেক অযোগ্যতা থাকলেও, অভিযোগ করার কিছু নেই, কেননা স্নেহ ভালোবাসা সর্বকালে সর্বত্রই নিতান্ত অযোগ্যর প্রতিই বর্ষিত হয়ে থাকে।

তারানাথ রায়ের পরে নবশক্তির সম্পাদক হন অকালে লোকান্তরিত শক্তিধর লেখক অদ্বৈতমল্ল বর্মণ—তাঁর বিখ্যাত বই 'তিতাস একটা নদীর নাম' তাঁর সম্পাদিত কাগজেই ধারাবাহিক বেরয়। তাঁর প্রতিভা প্রায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয়ই বলা যায়—যদিও তা পূর্ণ বিকাশলাভের সুযোগ পায়নি। এই সম্পর্কে এটাও হয়ত উল্লেখ করা চলে, জানিনে ঠিক, তৎকালে ক্যাপটেন নরেন দত্তর তত্ত্বাবধানাধীন নবশক্তির সম্পাদনায় তাঁদের প্রচারসচিব প্রেমেন মিত্রেরও সম্ভবত কিছু সহায়তা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু প্রেমেন বেশীদিন ছিলেন না, কাজে ঢুকেই তিনি পরিস্থিতি টের পেয়েছিলেন এবং বলেও ছিলেন আমাকে যে, ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই। দায়িত্ব থাকলেও এখানে কাজের স্থায়িত্বর কোনো সম্ভাবনা দেখছিনে। আমি তাকে বলেছিলাম, বেঙ্গল ইমিউনিটি না? সারা বাংলার সবাই এ সংস্থায় ক্ষণকালের সঙ্গ দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান করবে—বেংগলের দিকে হচ্ছ তোমরা, আর ইমিউনিটির দিকে একজন মাত্রই—ঐ ক্যাপটেন দত্ত।

যাই হোক, অল্পদিনের হলেও, 'আত্মশক্তির সম্পাদনা সূত্রে সামান্য আমিও কলকাতার মান্যগণ্যদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। দেশের কৃতি পুরুষরাই কেবল নয়, কলকাতায় সাংস্কৃতিক দিকটারও পরিচয় পেয়েছিলাম সেই সময়।

আত্মশক্তির দৌলতে শহরের রঙ্গমঞ্চগুলির আমন্ত্রনপত্র পাওয়া যেত—প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় রজনীতেই। তা ছাড়াও যখন-তখন চাওয়া মাত্র য'টা ইচ্ছা পাশ মিলত যে-কোনো রঙ্গমঞ্চের।

প্রথম আমন্ত্রণী পাই শিশিরকুমারের। তাঁর অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে—একালে যেখানে গ্রেস সিনেমা—বসন্তলীলার উদ্বোধন-রজনীতে। সেখানেই সুনীতি চাটুজ্যে থেকে ভারতী গোষ্ঠীর মণিলাল গাঙ্গুলি, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায় সবারই দেখা পাই। কারো কারো সঙ্গে এক আধটু আলাপও হয়েছিল আমার। নজরুল, নৃপেন চাটুজ্যেকেও সেখানে দেখি। কল্লোলের আরো কাউকে কাউকেও।

তারপর স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন (যাকে ভেঙেচুরে দিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর রাস্তা বেরিয়ে গেছে) থিয়েটার—সব ক'টারই। স্টারের কর্ণার্জুন, ইরাণের রাণী থেকে রবীন্দ্রনাথের শোধবোধ, চিরকুমার সভা, গৃহপ্রবেশ, মিনার্ভায় মিসরকুমারী, কিন্নরী, আলিবাবা, ভূপেন বাঁড়ুজ্যের যত প্রহসন, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাদিও, মনোমোহনে কী কী দেখেছি এখন মনে পড়ে না, শিশিরবাবুর নানা নামান্তরে নানান রঙ্গমঞ্চের সংখ্যাহীন প্রযোজনা—সেই সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির হলে বসে রবীন্দ্রনাথের নাট্যবিচিত্রা।

শেষ নাটকও দেখা আমার শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমেই। কী নাটক মনে নেই, দেখতে গেছি, পাশ হলেও সাধারণত টিকিটে নম্বর লাগিয়ে বুকিং থেকে সেটা কেটে নিতে হয়—সেদিন কিন্তু তা হয়নি। অভিনয় আরম্ভ হবার দেরি ছিল না। শিশিরবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, তিনি ভাইদের কাকে (ঋষীবাবুকে বোধহয়, নাকি মুরারিবাবুকেই, কে জানে) বললেন, ওঁর আবার টিকিট কিসের ? ওঁকে নিয়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর একটা সীটে বসিয়ে দাও গে।

অডিটোরিয়ামে ঢুকে প্রথম সারির ধার ঘেঁষে একটা আসনে বসলাম গিয়ে।

খানিকবাদে এক দর্শক এলেন, তাঁর কাছে ঐ নম্বরের টিকিট। তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পাশের সীটটায় বসলাম তখন। আরেকজনা এলেন তারপর, ওই সীটের নম্বর। তাঁকেও জায়গা ছাড়তে হোলো। সেখানেও এল আবার আরেক। তাঁকেও ছাড়লাম। তারপরও আরেকজন আবার, মার্কামারা টিকিট নিয়ে, তাঁকেও ছেড়ে দিলাম।

এইভাবে অভাবনীয় আবির্ভাবে একটার পর একটা ছাড়তে ছাড়তে চললাম দ্বিতীয় সারির প্রথম নম্বরে। সেটাও পার হতে হ'ল ঐভাবে। অমনি করে তৃতীয় সারিও পেরিয়ে গেলাম তারপরে। সরতে সরতে একেবারে শেষ সারির শেষতম আসনে গিয়ে পৌঁছলাম।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। সারগর্ভ প্রেক্ষাগৃহের সারাৎসার সীটেরও একজন অভ্যাগত এলেন।

বাধ্য হয়ে উঠতে হোলো এবারও।

পাশে চল্ পাশে চল্ ভাই! —আমার পার্ষদ সবার পাশ কাটিয়ে শেষটায় শূন্যতার সীমানায় গিয়ে পৌঁছলাম।

কিন্তু মরীয়া হয়ে একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না এবার। শুধালাম তাঁকে—'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার টিকিটটা একটু দেখতে পারি কি ?'

'টিকিট কোথায় ? পাশ তো!

'পাশ!' আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি।

'পাশ তো মশাই সবারই। শিশির ভাদুড়ির থিয়েটার পয়সা দিয়ে দেখে কেউ ? তাঁর

বসুধৈব কুটুম্বকম্—দেশে দেশে চ বান্ধবা (তাঁর বকবকম শুনতে হয় আমায়) 'হোল অডিটোরিয়ামে টিকিট কাটেনি একজনাও। এই যে ফুল হাউস দেখছেন, এর ভেতর ফুল নেই একজনও। সবাই ওয়াইজ। শিশির ভাদুড়ির মায়াপাশেই এই ফুলহাউস, নইলে পাশ বিহনে এ থিয়েটার ফাঁকা হয়ে যেত মশাই—বুঝচেন?'

'বুঝলাম বইকি।' আমি বলি—'একজন অবশ্যি ফুল আছেন এর ভেতর। বদান্য বোকা তিনি। ঐ ভাদুড়ি মশাই-ই।'

বলে আমি বেরিয়ে আসি। তারপরে আর কোনোদিনই ওমুখো হইনি।

কবিগুরুর গানের কলি মনে পড়ে—সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি। সে কি তার এই জাতীয় অভিজ্ঞতার থেকেই বা নিছক কল্পনাকুশলতা?

আমি তো জাগলাম তারপরই, ওধার ঘেঁষলাম না আর, কিন্তু অত জন—বাংলা মুলুকের শত সহস্র জন তাঁর পাশে এসে বসার পরও শিশিরকুমার যথাসময়ে সজাগ হতে পারেননি। কী ঘুম তাঁর পেয়েছিল তিনিই জানেন।

তারপর জেনেছি, শিশিরবাবুর রঙ্গমঞ্চও ঐ পথেই পাশ কাটিয়ে পাশ আউট হয়ে গেছে একদিন—নিজের অবলীলায়।

তাঁর থিয়েটারি পাশা খেলায়।

॥ একাত্তর ॥

শিশিরকুমারের সেদিনকার সেই ফুলহাউস থেকে বেরিয়ে তার পরে আর ওনার হাউস ফুল বা ফুলতর করার দায় নিয়ে যাইনি কখনো ওপথে।

রঙ্গমঞ্চের দিকে টানও কমে গেছল অনেকটাই—প্রেক্ষাগৃহগুলির প্রতি উপেক্ষায় নয়, সম্পাদকীটা বেহাত হয়ে অযাচিত আমন্ত্রণ আসত না, আর, সেখানে গিয়ে পাশ চাইবার উৎসাহও লোপ পেয়েছিল। এবং আত্মশক্তি গিয়ে টাকা দিয়ে টিকিট কিনে থিয়েটার দেখার মতন আত্মসামর্থ্যও ছিল না আমার।

তাছাড়া, সেইকালে সিনেমার আকর্ষণ ছিলো আরো জোরালো। তখনই তো চার্লি চ্যাপলিন, জ্যাকি কুগান, ডগলাস ফেয়ার ব্যান্‌ক্‌স, মেরি পিকফোর্ড, গ্রেটা গার্বো, রুডলফ্ ভ্যালোনটিনো, লরেল হার্ডি প্রভৃতিকে নিয়ে ছায়াছবির আসর জমজমাট।

এদিকে কানন দেবী, দুর্গাদাস, ডি-জি'র পালাপার্বণ। আর, সিনেমার আকর্ষণ আমার চিরকালের। চার আনার টিকিটে সেই টানেই ভেসে গেলাম।

তাই বলে সেকালের থিয়েটারের নাটক আর নটনায়কদের আমি খাটো করতে চাইনে।

শিশিরকুমার অবশ্যই অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; সেকালের প্রেক্ষিতে বিচার করলে অনেক দিক থেকেই তাঁকে অনন্য মনে হবে। প্রেক্ষামঞ্চেরও তিনি বহুৎ পরিবর্তন এনেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন শিল্পকলায়, সঙ্গীতকলায়, চিত্রকলায়, সাহিত্যে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যদের তাঁর বন্ধু এবং সহায়করূপে পেয়েও সবরকমের আনুকূল্য সত্ত্বেও তাঁর কাছে তাঁর যুগের যে দাবী ছিল তা তিনি মেটাতে পারেননি। হতে পারে সে সম্পর্কে হয়ত তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না, কিংবা সেকালে তিনি যা দিয়েছিলেন, দিতে পেরেছেন, তার বেশি দেওয়া তখন সম্ভবও ছিল না বোধ হয়।

গিরিশচন্দ্র আমাদের নাট্যজগতে যে রচনা আরম্ভ করে গিয়েছিলেন সেই ধারাটাই বজায় রেখে তারই অনুসরণ করে কিছু বাড়িয়ে-টাড়িয়ে সেই বাক্যই কমা-সেমিকোলন, কোলন এবং কোথাও কিঞ্চিৎ ড্যাশের পর তিনি দাঁড়ি টেনে সমাপ্ত করে গেলেন। সেইখানেই তিনি দাঁড়িয়ে গেছেন, এগোতে পারেননি আর।

গৈরিশী যুগের উজ্জ্বল পরিসমাপ্তি বলেই তাঁকে আমার মনে হয়। নাট্যমঞ্চের ও অভিনয়ের নিজস্ব কিছু কিছু ধারণা নিয়েও এবং তাঁর যথাসম্ভব মঞ্চরূপ দিয়েও, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আসলে তিনি গৈরিশী ধারারই সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গৈরিশী প্রয়োগকল্পনা বা অভিনয়রীতির কিছু অবশ্যি আমি দেখিনি, দেখার সুযোগও পাইনি তা সত্যি, কিন্তু তাঁর আদর্শ বংশধর—বাবার আদর্শ আর বংশ দুইই যাঁর ধর্তব্য ছিল—সেই দানীবাবুর অভিনয়ে তার প্রতিচ্ছবি কিছু দেখেছি তো, তার থেকে শিশিরবাবুর বৈশিষ্ট্য ততখানি পৃথক নয়। দুই ধারাই তো ব্যক্তিমুখ্য আর অভিব্যক্তি-সর্বস্ব। অন্তত আমার সেই রকম মনে হয়েছে।

শিশির নাটমঞ্চে যেমন পুরনো ভাবনারই নবরূপদানে প্রচেষ্টিত ছিলেন, সেটাকেই ভেবেছিলেন নাটকীয় রূপান্তর, তেমনি তাঁর কালের নাট্যসাহিত্যেরও কোনো যুগান্তর সাধন করতে পারেননি। সেরূপ উদ্ভাবনায় তাঁর দিক থেকে কোনো প্রেরণাই ছিল না। সেকালের সপ্রতিভ লেখকরা প্রবুদ্ধ হলে তাঁদের গল্প কবিতার রচনার ন্যায় নতুন নাটক সৃষ্টিতেও আত্মনিয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে কোনো উৎসাহ পাননি মনে হয়। বুদ্ধদেব 'রাবণ'কে নিয়ে একটি আধুনিক নাটক লিখেছিলেন, সেটি শিশিরকুমার ঘোষণা করেও কানাঘুষার পরেও, মঞ্চস্থ করতে আদৌ উদ্যোগী হননি।

এমনকি, যে ষোড়শী নিয়ে তখন এত হৈচৈ, প্রথমে তার মধ্যেও তিনি কোনো নাট্য সম্ভাবনা দেখতে পাননি। ষোড়শী নিশ্চয়ই নাটক হিসেবে কিছু যুগান্তরসাধক নয়, নাটকই নয়, উপন্যাসের নাট্যরূপ মাত্র, আগের কালে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিও নাট্যরূপায়িত করা হয়েছিল, কিন্তু একালের অন্তর্গত এত নাটকীয়তা এবং বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও, রঙ্গমঞ্চের কোনো দিক্‌পালের নজর শরৎচন্দ্রের দিকে পড়েনি কেন, তাই বিস্ময়। পরে অবিশ্যি শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসেরই নাট্যরূপ ফিল্‌মি রূপ ইত্যাদি পেয়েছে, কিন্তু তাঁর দেনা-পাওনা বইয়ের নাট্যরূপটাই সর্বপ্রথম—এ যুগের ভালো উপন্যাসগুলির নাট্যরূপান্তরণের সেইটাই মুক্তধারা। সেই ধারা এখন আরো বিস্তার, আরো ব্যাপকতা, আরো সাফল্য লাভ করেছে সমরেশের অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, আর শঙ্করের চৌরঙ্গীর (রাসবিহারী সরকার কৃত) সফল নাট্যরূপায়ণে।

কিন্তু শিশিরকুমারের কালে নতুন নাটক কই? নাট্যরূপান্তর কিছু নাটক নয় নাট্যসাহিত্যের উদ্বোধক না। সেই ব্যর্থতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে তৎকালের নিরুৎসাহিত লেখকরা দায়ী হলেও শিশিরকুমারের পরোক্ষ দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। মঞ্চরূপ লাভের সম্ভাবনা না থাকলে নাট্য সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না—মহীরুহ হওয়া দূরে থাক, তা অঙ্কুরিতই হতে চায় না।

শিশিরকুমার নাটকের জগতে কোনো নবযুগ না আনলেও অভিনয় বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি এমন কিছু যুগান্তর সাধন করেছিলেন? একালের নাটক অভিনয়রীতি ও প্রযোজনার

প্রেক্ষিতে তাঁর বিচার করতে চাইনে, সেভাবে তাঁর তুলনা করাটা হয়ত সঠিক হবে না, কেননা সেদিক দিয়ে দেখলে তাঁকে বেজায় খাটো দেখাবে—তাছাড়া যেহেতু একাল সময়ের বিচারে সব দিক দিয়েই তাঁর কাল থেকে এগিয়ে—স্বভাবতই অগ্রসর হতে বাধ্য, তা না হলে একালের সার্থকতাটা কোন্‌খানে ? কিন্তু সেই মানদণ্ডের প্রমাণ পাল্লা দিয়েই কি বলা যায় না যে, শিশিরবাবুরও তেমনটাই ছিল না কি, গিরিশের কাল থেকে স্বভাবতই আর ন্যায্যতই আরো অনেক এগিয়ে আসা ? সেটা তিনি পারেননি।

তাহলেও তিনি স্বকীয় ভঙ্গীর নাট-নৈপুণ্যে অনন্য, অভিনয় শক্তিতে অদ্বিতীয়, প্রয়োগ ক্ষমতায় চমকপ্রদ, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে অসাধারণ—একথা অনস্বীকার্য। বাক্‌চাতুর্যে চারপাশের শ্রোতাদের আর অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। বাক্‌পটুতা ছিল প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতই, যা বলতেন তাই যেন সাহিত্য হয়ে যেত।

কিন্তু এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি নিয়েও তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেননি, মিটিয়ে যেতে পারেননি তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষাও। শেষটায় তিনি চেয়েছিলেন বিরাট এক জাতীয় রঙ্গশালা—সে কি যুগোপযোগী নব নাটকীয় পালার পার্বণের জন্যেই ? না কি তাঁর শ্রীরঙ্গমক্ষেত্রে যে রঙ্গটা ঘটেছিল, সেই কলকাতার নাগরিকদের মতই তাঁর পাশ-এ চারপাশের সারা ভারতের সবাইকে ঘুরপাক খাওয়াবার মতলবেই ? কে জানে।

নাট্যজগতে যুগান্তর করা দূরে থাক, আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে আনার প্রথম কৃতিত্বও তাঁর নয়। সে কীর্তি স্টারের অধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র গুহের। এই এক ভদ্রলোক (অবিস্মরণীয় বলেই এখন বোধকরি বিস্মৃত) ঢক্কানিনাদের নেপথ্যে থেকে সেকালের রঙ্গমঞ্চে সম্ভাবিত এবং সম্ভবপর তাবৎ পরিবর্তন সাধন করে গেছেন।

গোড়ায় তিনি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য অনুসরণে কর্ণার্জুন আর ইরানের রানী নিয়ে পত্তন করলেও (সেগুলিও কিছু কম চমকপ্রদ উপস্থাপনা ছিল না বলতে হয়), রবীন্দ্রনাথের চিরকুমারসভাকে সবার সামনে অপরূপ রূপে উপস্থিত করেছিলেন তিনিই। এবং সেইখানেই না থেমে, তার পরেও তাঁর শোধবোধ ইত্যাদি ধরে আরো বই করেও শেষ পর্যন্ত তাঁর গৃহপ্রবেশ অবধি এগিয়ে গেছেন, এটা কম কথা নয়। পরমাশ্চর্য প্রযোজনা হয়েছিল তাঁর গৃহপ্রবেশ।

তারপরে শিশিরকুমারও রবীন্দ্রনাথকে নিজের মঞ্চে নিয়ে এসেছেন—ঐ চিরকুমারসভা দিয়েই।

স্টারের পরে হলেও তা ঠিক সেই রকমটি হয়নি নিশ্চয়ই। শিশিরবাবুর চিরকুমারসভা তাঁর স্বকীয় প্রযোজনারীতির সমূহ বৈশিষ্ট্য নিয়েই সার্থক সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবোধবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণে হলেও তাঁর পদক্ষেপ অবশ্যই স্বতন্ত্র আর সার্থক। এবং তাই হবার কথাই।

তবুও শিশিরকুমার আর স্টার দু'জায়গায় অভিনয় দেখে আমি সে যুগের দুই দিক্‌পাল অভিনেতার তুলনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিশির আর অহীন্দ্র। শিশিরকুমারের চন্দ্র যেকালে তাঁর ব্যক্তিগত অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্যে ষোলকলায় বিকশিত, প্রায় চাঁদপানাই, অহীন চৌধুরীর চন্দ্র সেখানে চরিত্রগত অভিনয়ে, অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ নিমজ্জনে নিখুঁত। শিশিরকুমারের যে-কোনো অভিনয়েই তাঁকে কখনো ভোলা যায় না, ভুলবার উপায় নেই, তারই চিত্তচমৎকারী কারুকাণ্ড দেখছি মনে হয় সর্বদাই—কিন্তু

অহীন্দ্রের অভিনয়ে, অহীনবাবুকে মনেই পড়ে না একদম—কিন্তু অহীন্দ্রের। এখন, কারটা বেশী বাহাদুরী তা আমি বলতে পারব না, তবে দু'জনের অভিনয়ধারার এইখানেই পার্থক্য। আমার নিজের ধারনায় অহীন্দ্রকেই মহত্তর মনে হয়েছে। (এ বিষয়ে আমার সঙ্গে অপরে একমত না হতেও পারেন এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে যাঁরা শিশিরবাবুর ব্যক্তিগত বন্ধু, ব্যক্তিত্বে বিমোহিত, তাঁর অভিনয়ের অভিব্যক্তিত্ব স্বভাবতই তাঁদের অভিভূত করবে, বলাই বাহুল্য)।

তবে রবীন্দ্রনাথকে না আনলেও শরৎচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চে প্রথম আহরণের মাহাত্ম্য তাঁর। যদিও সেটা অনেক গড়িমসির পরেই। এবং এক রকম, ঐ প্রবোধবাবুকে টেক্কা দিতে গিয়েই।

আমি যখন গোড়ায় দেনা-পাওনার নাট্যরূপের খসড়া নিয়ে তাঁর কাছে যাই, তিনি দেখেশুনে 'ভেরি ক্লেভারলি ডান্' বলে আমাকে তা ফেরত দিয়েছিলেন। আমি তখন কী করি, টাকার দরকার, আমার বন্ধু জগৎ ভট্টাচার্যকে তা ছাপতে দিই। সরলা দেবী-সম্পাদিত ভারতী মাসিকপত্রের তিনি তখন সহযোগী সম্পাদক, শরৎচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তাঁর নামেই সেটা তিনি ভারতীর শারদীয় আর সর্বশেষ সংখ্যায় বার করেন—দক্ষিণার সিংহভাগ স্বভাবতই শরৎবাবুকে দিয়ে নামমাত্র কিছু (নাট্যরূপ দাতারূপে নিজের নাম হারানো সত্ত্বেও) পেয়েই আমি বর্তে যাই, বলাই বাহুল্য। এবং ভারতীতে প্রকাশ লাভের পরই প্রবোধবাবু সে বই মঞ্চস্থ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। খবরটা পাবামাত্রই শিশিরকুমার পাণিত্রাসে তাঁর কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বইয়ের অভিনয় স্বত্ব আগেভাগেই হাতিয়ে নিয়ে আসেন। তাহলেও, কাজটা এমন কিছু নিন্দনীয় হয়েছে আমার মনে হয় না। নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার... ইত্যাদি ইত্যাদি বলে না ?

এবং লাভের কথাটা ধরতে গেলে, এরকম কাজ করতেই হয়। আর সেদিকটা খতিয়ে দেখে বলা যায়, ষোড়শীই তাঁর প্রযোজনা-কৃতিত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে লাভজনক অধ্যায়। তাঁর অভিনয়কীর্তিতে সবচেয়ে কীর্তিত।

রবিতীর্থের পরিক্রমায় প্রবোধ গুহর অনুগমন করলেও শিশিরকুমারের নিজের পরাক্রম কিছু কম ছিল না। প্রবোধচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও তাঁর পদক্ষেপ ছিল স্বভাবতই অন্য রকমের। প্রয়োগ প্রযোজনা আর অভিনয়রীতির স্বকীয়তায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

তা ছাড়া, তিনি সর্বদাই ছিলেন পাদপ্রদীপের সম্মুখে, আর প্রবোধবাবু নেপথ্যে। তাই প্রবোধবাবুর কৃতিত্ব তাঁর অন্তরঙ্গদেরই জানা কেবল, যেকালে শিশিরকুমারের কীর্তি সর্বজনপরিদৃষ্ট।

বিখ্যাত নাট্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক চন্দ্রশেখর ওরফে মনুজেন্দ্র ভঞ্জ মশাইয়ের সঙ্গে সেদিনকার অকস্মাৎ সাক্ষাৎকারে টের পেলাম যে, সেকালের আমার নাট্যকাহিনী রচনার ভেতর বিস্তর গলদ—বহুৎ ইতরবিশেষ ঘটে গেছে। এই বিশেষ ইতরতার জন্য নিজের দায় মেনে নিয়েও আমি বলতে চাই যে, আমার অগাধ বিস্মৃতিশক্তিই এহেতু দায়ী। মেমারি বর্ধমানের হলেও আমার মেমারিরা কোন কালেই বর্ধমান নয়, বরং দিনকের দিন ক্ষীয়মান, ম্রিয়মাণ। তার প্রমাণ এই রচনায় যত্রতত্র।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মনুজবাবু চন্দ্রশেখর ছদ্মনামে তাঁর সাপ্তাহিক নাট্য আলোচনা

আমার সম্পাদিত আত্মশক্তিতেই শুরু করেছিলেন, আমি ভুলে গেছলাম, তিনি আমায় মনে করিয়ে দিলেন সেদিন। তারপরে আমি সে-পত্রিকা ছেড়ে এলেও তিনি তাঁর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন শেষপর্যন্ত। এখন তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় ঐ বিভাগীয় সম্পাদক। তিনি আত্মশক্তিতে শুরু করেছিলেন, সে খবর ভুললেও তিনি যে বাংলা নাট্যালোচনায় যুগ-প্রবর্তনার মূল, সে কথা তো ভুলবার নয়। তাঁর রচনাগুলি ক্লাসিক পর্যায়ের ছিল সে কথা বলতেই হয়।

তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, জানবার পর মনে পড়ল যে, শিশিরবাবুর নাট্যমন্দির গোড়ায় ছিল মনোমোহন থিয়েটারে—যার ওপর দিয়ে এখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বেরিয়ে গেছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ আর বিডন স্ট্রীটের ত্রিবেণীসঙ্গম থেকে তিনি চলে আসেন শ্যামবাজারে—যেখানে এখন উত্তরা আর শ্রী সিনেমা। শহরের উত্তরাঞ্চলে এই শ্রী-ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর শ্রীরঙ্গম। ষোড়শীর অভিনয় হয়েছিল এখানেই।

এখন যেখানে বিশ্বরূপা, সেখানে এসেছিলেন প্রবোধ গুহই স্টার মঞ্চের থেকে বিযুক্ত হবার পর। বিশ্বরূপার স্থলে তেলের কল না কী যেন ছিল তখন, জায়গাটা নিয়ে ভেঙে গড়ে প্রবোধবাবু তাঁর নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। সময়টার সমস্তটা না হলেও কিছু কিঞ্চিৎ মনে পড়ছে এখন আমার খুব ক্ষীণভাবে যদিও—এমন কি, নাট্যনিকেতনের গ্রীনরুম পর্যন্ত—যেখানে একদা প্রসিদ্ধ নাট্যকার আমাদের শচীনদাকে একান্তভাবে নীহারবালার পদসেবায় নিযুক্ত দেখেছিলাম।

একান্তভাবে হলেও কোনো কান্তভাবে নয়, গোড়াতেই বলে রাখি। শচীনদা নিষ্কলুষ দেবতুল্য চরিত্রের, সেদিক দিয়ে কটাক্ষপাত করার কিছু নেই, তবে কিনা একটুখানি স্নেহপ্রবণ, এই যা। নীহারদেবী শয্যাশায়ী হলেও তিনি তাঁর পাশে বসে, দেবী চৌধুরাণীর ব্রজেশ্বর সেকালে যে কর্মে উদ্যোগী হয়েছিল (বঙ্কিম দৃষ্টিতে তাকালে) শচীনদাও তাতেই ব্যাপৃত—হয়ত কিছু অপত্যস্নেহ থাকলেও, অকথ্য কিছু অপকর্ম নয়।

আচমকা আমায় দেখে শচীনদা অপ্রতিভের মত বললেন, নীহারের পা কামড়াচ্ছে কি না...!'

নীহারবালা একটুখানি মুচকি হাসলেন মাত্র। কিছু বললেন না।

কৈফিয়ত, দেবার কিছু ছিল না, চিরকুমার সভার সঙ্গীতবন্যায় সারা দেশ ভাসিয়ে (তিনিই বোধ হয় প্রথম রবীন্দ্র-গায়িকা) কবিগুরুর স্নেহধন্যা সুরকন্যা তন্বী নীহারবালা তখন অপার্থিব মহিমায় লোকচক্ষে অলোকসামান্যা। এমন কি, আমার নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর অপর পা-টা হাতাবার।

কিন্তু বুকের পাটা ছিল না তেমন, কানাঘুষায় জানা ছিল যে, নীহার দেবীর শুধু পা-ই না, আপাদমস্তক সবটাই প্রবোধবাবুর কপিরাইট যেখানে, অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে কপিরাইট তছরূপের দায়ে পড়তে হয় পাছে, তাই সামনে অমন সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও প্রলোভন সংবরণ করেছিলাম।

ভালো করেছি কি না জানি না। কেননা, নীহার দেবীর সর্বস্বত্ব প্রবোধবাবুর সংরক্ষিত হলেও প্রবোধবাবু স্বয়ং ছিলেন নাকি তাঁর তাঁবেই।

অবশ্যই সেই তাঁবেদারির জন্যই নয়, শচীন্দ্রনাথের অনন্য নাট্যকৃতিত্বের কারণেই

দেশাত্মবোধক গৈরিক পতাকা (সরকারে বাজেয়াপ্ত) থেকে ঝড়ের রাতে (সতু সেনের আলোক-সম্পাতে যে প্রযোজনা নাট্যজগতে নতুন দিক্-নির্দেশ করেছিল) তাঁর অনেক বই প্রবোধ গুহর রঙ্গমঞ্চে হয়েছিল। কাজেই, কান টানলে যেমন মাথা আসে, পা টানলেও হয়ত তেমনি ঘাড়ের ওপর চেপে বসা যায়—নাই ধরে মাথায় ওঠা যায় যেমন কিনা।

সেই নাই ধরেই প্রবোধবাবুর হৃদয়ে একটুখানি ঠাঁই পেয়েছিলাম বুঝি। দুটো না-ই মিলে যেমন একটা হ্যাঁ-ই হয়ে যায়, তেমনি ষোড়শীলাভে বঞ্চিত তাঁর ষোড়শীর লাভে প্রবঞ্চিত আমার প্রতি হয়ত একটু সহানুভূতি জেগে থাকবে, তিনি ডেকে আগাম দক্ষিণা দিয়ে নিরুপমা দেবীর 'দিদি' বইয়ের নাট্যরূপান্তরের বরাত দেন আমায়। বরাত দেখুন! এক জায়গায় টাকার ভাগে ভাগীদার না হয়েও আরেক জায়গায় টাকার ভাগ্য খুলে যায় কেমন করে।

টাকার ভাগ্য খুলেছিল আমারও। দিদি'র জন্য আগাম সেই মোটা দাদন পাওয়ার পরেও পেয়েছিলাম আমি আরো। নাট্যকারের প্রাপ্য একটা সম্মানরজনীর সম্পূর্ণ বেনিফিট তিনি দিয়েছিলেন আমাকে—যদিও দিদি তেমনটা মঞ্চসফল হয়নি। তাহলেও তিনি সান্ত্বনাচ্ছলে বলেছিলেন যে, রিভলভিং স্টেজ হলে এ-বই নাকি জমানো যেত ভালোই।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সাফল্য লাভ না হলেও আমার কপালটা ঘুরে গেল আরো। তিনি আমাকে আরো বেশ কিছু পাইয়ে দেবার নিমিত্ত হলেন, তাঁর নাট্যনিকেতনের দু'তিন লাখের অগ্নিবীমাটা আমাকে দিয়েই করালেন। আমাদের হেমন্তদা (স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতা হেমন্তকুমার সরকার) নরউইচ্ ইনস্যুরেন্সের একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে প্রবোধবাবুর প্রস্তাবটা পাড়লাম। কমিশনবাবদে কয়েক হাজার টাকার প্রাপ্তিযোগ ঘটে গেল কয়েক দিনেই।

পৃথিবীর এটাই ধারা—এই রকমটাই ঘটে থাকে। কোথাও অবশ্যপ্রাপ্য না পাওয়া. কোথাও বা অভাবিত পাওনা অযাচিত পেয়ে যাওয়া। এইভাবে দিতে দিতে পাওয়া আর পেতে পেতে যাওয়া—এই দুনিয়ার এই ধারারই লেনদেন অবিরাম। সেই রহস্যময় সূত্র ধরেই সেদিনের বীমান্তকারী সেই আমার অসামান্য লাভের সীমান্ত ছোঁয়া।

॥ বাহাত্তর ॥

ষোড়শী নিয়ে লড়ালড়ি চিরদিনের—সেই সুন্দ-উপসুন্দর আমল থেকেই। আর দেনাপাওনার জেরও কখনই মেটে না। আর সেই সব মিলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অসুন্দর।

জানি : কিন্তু জানলেও মন মানতে চায় না। এমন কি, কোনো ভাবমূর্তি নিছক মনগড়া হলেও তা ভাঙলে মনে লাগে, না লেগে পারে না। নিতান্ত পৌত্তলিকতা যদিও, অন্তর্গত সেই পুতুল (বা প্রতিমাই) ভেঙে পড়লে মনের খানিকটা নিয়েই পড়ে বুঝি।

আমার মর্মের পীঠস্থান থেকে শরৎচন্দ্রের মর্মর মূর্তির স্খলন সেদিন আমার মনে বেশি লেগেছিল—লাভালাভের নীট হিসেবের থেকেও। তাঁর সেই ভঙ্গুর দশাই তখন আমার কাছে মর্মান্তিক।

ভাবমূর্তি উপে গিয়ে কী ভাবমূর্তিই না দেখেছিলাম তাঁর সেদিন!

ষোড়শীর বেনিফিট নাইটে আমারও কিছু প্রাপ্যগণ্ডা থাকবে আশ্বাস পেয়েছিলাম

শিশিরবাবুর।

অভিনয় শেষে গ্রীনরুমে গিয়ে জানলাম, (শিশিরবাবু স্বমুখেই) সেদিনকার বিক্রির সব টাকা একটা থলেয় ভরে রাখা হয়েছিল, সেই থলিটা নিয়ে শরৎচন্দ্র চলে গেছেন খানিক আগেই।

শিশিরবাবু আমার অংশত দাবীর কথাটা তাঁকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নাকি তা দাবিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—'শিবরাম টাকা নিয়ে কী করবে ? বিয়ে করেনি কিচ্ছু না ! তার ছেলে নেই পুলে নেই, ঘর নেই সংসার নেই—টাকার তার কীসের দরকার !'

এই বলে থলে নিয়ে ট্যাকসি ডাকিয়ে এতক্ষণে হয়ত হাওড়া স্টেশনে।

তবুও শিশিরকুমার বলতে গেছলেন—'ক্ষমাঘেন্না করেও কিছু অন্তত দিন ওকে শরৎদা !'

তার জবাবে তিনি এই বলেছেন, 'আমার বেনিফিট নাইটের বখরা ওকে দিতে যাব কেন? এ রাত্তিরে টিকিট বিক্রি হয়েছে আমার নামে, আমার জন্য টাকা দিয়ে দেখতে এসেছে সবাই। এর ভেতর সে আসছে কোথা থেকে ?'

আমি আর কিছু কইতে পারি না। সত্যি ! আমার টাকার দরকার কী ! মেসের টাকা বাকী, এর ওর তার কাছে ধার, এটা ওটা সেটার দরকার—কিন্তু তা নিয়ে উচ্চবাচ্যর কী প্রয়োজন ! আমার অভাবের চাকী এখানে ঘুরিয়ে কী লাভ ? তা শুধু আমাকে পিষ্ট করার জন্যই, অপরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের নিমিত্ত নয়। আমার নিজের চরকায় আর কেউ তেল দিতে আসবে কিসের গরজে ?

আমি চুপ করে থাকি। শিশিরবাবু তাঁর এক ভাইকে বলেন—'দ্যাখ তো কিছু পড়ে আছে কিনা কোথাও।'

'ক্যাশবাক্সে যা ছিলো, সবই তো দেওয়া হয়ে গেছে শরৎদাকে। টিকিটঘরে একটা পয়সাও পড়ে নেই আর।'

'আমার চেক বইটা আন।'

চেক বই এলে আমাকে শুধান, 'ক্রস চেক দেবো ?'

'ভাঙাবো কোথায় ? আমার কি কোনো অ্যাকাউন্ট আছে কোথাও !'

'একটা পে টু সেলফ্ লিখে দাওনা দাদা,' তাঁর ভাই বাতলায়।

একশ'কুড়ি টাকার একখানা সেলফ্ চেক কেটে দেন তিনি তৎক্ষণাৎ। 'আমার সেভিংস অ্যাকাউন্টে এই টাকাটাই পড়ে আছে দেখছি।'

এর বেশি আর কিছু বললেন না। যা পাই যথা লাভ জ্ঞান করে আমিও বাক্যব্যয় বাহুল্য বোধ করি।

সেই একশ'কুড়িই আমার কাছে এক কাঁড়ি। তখনকার মতন দুঃখ প্রশমনের পক্ষে অনেক টাকা। এই সেলফ্ হেল্পেই চলে যাবে এখন দিনকতক।

কিন্তু সত্যি বলতে, শিশিরবাবুর দিক থেকে ততটা নয়, শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে আমার আঁতে লেগেছিল যেমনটা। উপন্যাসের দরদী শরৎচন্দ্র জীবনের বাস্তববিন্যাসে এক নিমেষে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন।

মনে পড়ল কবির কথা, কাব্য পড়ে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো ! কিন্তু তাহলেও একী ! যাঁর লেখার পত্রে, ছত্রে ছত্রে এত দরদ, টাকার দিক দিয়ে ধরতে গেলে তার এই দস্তুর !

টাকার কষ্টিপাথরে আর কষ্টের অকূল পাথারেই মানুষের যথার্থ পরিচয় বলে যে, তা মিথ্যে নয়।

কিন্তু এটাই স্বাভাবিক—আজ আমি তা বুঝতে পারি। সাধারণ মানুষ অসাধারণদের চেয়ে মানুষ হিসেবে অনেক বড় সত্যিই। এবং সবার উপরে মানুষ সত্য যে মানুষ, সে হচ্ছে এই জনসাধারণ। উপরওয়ালা মানুষরা না। যেহেতু যে মানুষ যত উঁচোয় উঠেছে, আরেক দিকে সে ততটা নিচেই নেমে গেছে। যে প্রাসাদ যত উর্দ্ধলোকে স্থিত, নিশ্চিতরূপেই তার ভিত নেমেছে তত নিচেয়—যত নিভৃতই হোক না। সমস্তরে সাধারণ মানুষ সমান স্তরের সকলের সঙ্গে সমতুল্য ব্যবহার করে মানুষের মতই, কিন্তু উচ্চলোকে অভিব্যক্তিরা (তাঁদের শিল্পে, সাহিত্যসৃষ্টিতে, যেরূপেই দেখা দিন না) সাধারণদের তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকেন। অতি-মনুষ্যরা অবশ্যই অবমনুষ্য হতে বাধ্য। না হয়ে যায় না।

প্রতিভার এটা অভিসম্পাত কিনা জানি না, তবে সপ্রতিভদের এই উৎপাত। বিশ্বাত্মবোধে বিশ্বকে আত্মসাৎ করার ভগবদ্দত্ত ন্যায্য অধিকার তাঁদের। অন্তত তাঁরা তাই মনে করেন। এবং সেই কর্মের হেতু কোনো দুঃখ দরদ দূরে থাক, সংকোচমাত্র বোধ করেন না। এইহেতু প্রতিভাধরদের থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

প্রতিভার অবদানই শ্রেয়, তাই আমাদের গ্রহণীয় হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিভার প্রতিভুকেও নিতে গেলে তাঁর খাঁই মেটাতে নিজের লেশমাত্রও অবশেষ থাকে না, অবশেষে নিজেও যেতে হয়। প্রতিভা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগে নিয়মের পর যমের স্থান—প্রতিভা সেই যম। আশপাশের সব কিছু, সবাইকেই তিনি হজম করেন। তাই করেই বেঁচেবর্তে থাকেন, বাড়বাড়ন্ত হয় তাঁর।

গোরুর চেয়ে গোরুর দুধ ভালো, তাই খেয়েই খুশি থাকতে হয়, তার ওপরেও যে গোসেবায় এগোয়, সে-হতভাগা কখনো না কখনো গোরুর গুঁতো খায়ই—যদি তার নিজেরও সমান গোরুত্ব না থাকে। দুঃখের কথা, এই জ্ঞান আগের থেকে কারু হয় না। হলে পর হাড়ে হাড়ে সেই শিক্ষালাভের পর তা আর যাবার নয়। সেই শিক্ষা কখনই সে হারায় না আবার। তাবৎ প্রতিভার থেকে তার পর থেকে সে সুদূরপরাহত হয়ে থাকে। অবশ্য দূরের একটা নমস্কার রাখেই।

পৃথিবীতে চিরদিনই দু'ধরনের মানুষ আছে, থাকবেও। এক দল দিয়ে ফতুর—বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধুগোত্রীয় ; আরেক দল নিতে চতুর। তাদেরই হরণ পূরণে অদানে প্রদানে চলতি দুনিয়া। এর খেলা চালু রাখতে সবারই দরকার। এটা শুধু জীবনযাপনেরই মূল কথা নয়, এর ভেতর দিয়েই অন্তরালের খেলোয়াড় চিরদিনের সেই লীলাময়ের মোলাকাত।

সেই যিনি বহু বাসনার প্রাণপণ চাওয়ার থেকে বঞ্চিত করে সারা জীবন বাঁচান আমাদের বঞ্চনার ছাইয়ের গাদা থেকে পরম সোনার সঞ্চয় উদ্ধার করেন বারংবার। থাবড়া মেরে ব্যথা দিয়ে ভুল পথের থেকে মুখ ঘুরিয়ে ঠিকপথে নিয়ে আসেন শেষতক্। নিজের বৃত্তিপথের অমৃত উত্তরণে আনেন। ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই, মিথ্যে নয়। শেষ পর্যন্ত বেশই হয়।

রঙ্গলোকের নেপথ্য থেকে অমন মার খেয়ে বার হতে না পারলে কী দশা যে হতো আজ আমার! ঠিক পথে এসেছি কিনা জানিনে, তবে বিপথগতি বিপদমতির ফাঁড়া কাটিয়ে বেঁচে গেছি। নীহারিকালোকে বি-পদগ্রস্ত আর মহানায়কদের কবলে পর্যুদস্ত হতে হয়নি আমায়।

তাহলেও বেশ কিছুদিন খুব টানাটানিতেই কেটেছিল আমার। মরুভূমির বুকে সেই শিশির সম্পাত কবেই উবে গেছে, কোনো প্রবোধলাভও করিনি আর তারপর। আত্মশক্তির চাকরিটাও ছিল না—টানাটানি হবার কথাই। লম্বা লম্বা কবিতা লিখি, গল্পও ফাঁদি, সেসব ভারতবর্ষ, কল্লোল, উত্তরা ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশও পায়, কিন্তু তার ফাঁদে টাকাটা সিকেটাও ধরা পড়ে না।

কোথায় যাই ? কার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাই ? দেশবন্ধুও বেঁচে নেই তখন। আমার জানাশোনার মধ্যে কেউই নেই বলতে গেলে। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, বিধান রায়ের কাছেই যাই না কেন ? কিন্তু কী ছুতোয় যাব ? বয়েস হয়েছে, কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক, বেকার থাকার কোনো অর্থ হয় না—বেকার থাকাতেও অর্থ নেই তা বুঝি। ছোট ছেলেটি আর নই তো, কারো কাছে অমনি কিছু চাইতে গেলে সঙ্কোচ হয়।

বিধান রায়ের অনেক প্রতিপত্তি প্রভাব শুনেছি। ইচ্ছে করলে তিনি যে-কোনো একটা কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অনেককে দিয়েওছেন বলে শোনা ছিল।

ভাবলাম, অসুখের ছুতো করে তো অনায়াসেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায়। সেইভাবেই যাই না হয়, গিয়ে আলাপ জমাইগে। তারপর ভাব একটু জমলে চাকরিবাকরির কথা পাড়া যাবে। কোন্ অসুখের ছুতো করে যাব, ভাবি তাই।

তিনি নাকি চেহারা দেখেই রোগের মালুম পান—শোনা ছিল। রোগীরও মালুম পান তবে নিশ্চয়। রোগের স্থলে যদি আমাকেই একটি রোগ বলে ঠাওরান তাহলে ?

এমন একটা রোগ বানিয়ে যেতে হবে, যেটা কোনো ডাক্তারেরই ধরার সাধ্য নেই। তেমন একটা ছুতো নিয়েই যেতে হবে। তবে, ঐ মাথা ধরার মত কিছু নয়—যা নাকি একটা সারিডনেই সারবার। ক্রনিক ধরনের কিছু বানিয়ে যেতে হবে।

গেলাম। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছেন—কংগ্রেস মন্ডপে তোমাকে দেখেছি যেন মনে হচ্ছে ?'

কলকাতায় কংগ্রেস হয়েছিল বছর কয়েক আগে, পলকের সেই ক্ষণিক দর্শন তাঁর রয়ে গেছে।

'হ্যাঁ। তখন ভলান্টিয়ারি করতাম তো।'

'বেজায় চেঁচাচ্ছিলে তোমরা। মনে আছে তাই।'

আমাদের ভলান্টিয়ারদের কাজই ছিল তাই। প্যান্ডেলের গেটে দাঁড়িয়ে আগমন নির্গমনের পথে নেতাদের—গান্ধী, জহরলাল, সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে বড় মেজ ছোট সবাইকার জয়ধ্বনি দেবার। বিধানচন্দ্র কি জয় বলে চেঁচিয়েছি নিশ্চয়।

'কী হয়েছে তোমার ?'

'কোষ্ঠবদ্ধতা। কিছুতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার......'

'বুঝেছি। যা খাচ্ছ তা হজম হচ্ছে না। পরিষ্কার হচ্ছে না তাই। আচ্ছা, এই ওষুধটা নিয়ে খাওগে—' বলে পাশের দেরাজ থেকে একটা ওষুধ বের করে দিলেন—'রাত্রে শোবার আগে গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাবে, বুঝেছ ?'

'কিন্তু দুধ পাবো কোথায় ?'

'তবে জল মিশিয়ে খেয়ো। তাতেও কাজ দেবে।'

ক'দিন বাদে গেলাম ফের। 'কী হলো ? সেরে গেছে তো ?'

না সার, ঠিক তেমনিই......'

'আশ্চর্য ! এমন হবার তো কথা নয় । আচ্ছা, এটা খেয়ে দ্যাখো দেখি । এটা আরো জব্বর দাবাই' । আরেক বোতল দিলেন তিনি আমায়—'এর জন্য দাম লাগে না স্যাম্পল ফাইল দেয় এরা ডাক্তারদের । অমনি পাই আমরা । নিয়ে যাও ।'

নিয়ে এলাম । যথাবিধি খেলাম । কিন্তু বাথরুমে গিয়ে ফলের সাক্ষাৎ নেই ।

আবার যেতে হলো তাঁর কাছে—ঐ ছুতো ধরেই......

'এখনো সারলো না ? আশ্চর্য ! এমন তো হয় না । তুমি করো কী শুনি ?'

'কী করব ?'

'কাজ-টাজ কিছু করো না ?

'লেখাটেখার কাজ করি !...'

'কী লেখো ? হিসেবের খাতা ?'

'এই গল্প কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি......।'

আমার বেহিসেবি দপ্তর বার করি ।

'টাকা পাও ?'

'ছাপতেই চায় না কেউ, টাকা দেবে তার ওপর ? ছাপালেই বর্তে যাই মশাই !'

'এবার ধরেছি তোমার ব্যায়রাম । এই তার ওষুধ । ধরো ।' বলে ড্রয়ার থেকে খান কয়েক নোট বার করে দিলেন দশ টাকার—'পেট ভরে খাওগে । খেলে পরে তবে তো বেরুবে । আহারের পরেই না বাহার !'

॥ তিয়াত্তর ॥

ডাক্তার রায়ের দাক্ষিণ্য ডান হাতের মুঠোয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক, পেটভরে খাওয়া যাক আজ । আমিনিয়াতেই যাই না কেন !

অবশ্যি, ক্ষুৎপীড়িতের পক্ষে ডালমুটও কিছু খুঁতখুঁত করায় মত নয়, তাই মুঠো মুঠো খাওয়া যায় মুফত পাওয়া যায় যদি—সেখানে আমিনিয়ার বিরিয়ানি তো রূপে-গুণে নিখুঁত। তবে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের থেকে আমিনিয়া অনেকখানি, পায়দল আধঘণ্টার পাল্লা, আর ট্রাম ভাড়ায় দশ টাকার নোট ভাঙাবে না—এদিকে সবুর সইছে না আমার । বিধানবাবুর বাড়ির কাছাকাছি সাবীর-এই চলে গেলাম সটান । তার চপ-এর জন্য চাপল্য দেখালেও দূষ্য হবে না, উপাদেয়তায় তাও কিছু তুচ্ছ নয় ।

ভরপেট খেয়ে ভরদুপুরে সিনেমা দেখে সন্ধ্যের পর বাসায় ফিরে দেখি, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কে বা কারা এসে আমার সারা ঘর তছনছ করে গেছে। তোরঙ্গ সুটকেস ওলটপালট, বিছানা-টিছানা ওলটানো, বইটই যত গড়াগড়ি, লেখা-পত্তর ছড়াছড়ি-দস্তুরমতন রাহাজানি। হানি তেমন কিছু না হলেও এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ডই !

'কে এসেছিল মশাই, আমার ঘরে ?' পাশের ঘরে গিয়ে শুধাই ।

'তা তো জানিনে । ধূপকাঠি বেচতে এসেছিল একজন, আমরা তখন আপিসে বেরুচ্ছি । কে কিনবে ধূপকাঠি, ধূপকাঠি নিয়ে কী করব আমরা ? আপনার ঘরটা খোলা পেয়ে সে বললে, আমার আত্মীয় হন ইনি, এখনই তো আসবেন । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক না হয় । তারপর আমরা তো সব বেরিয়ে গেছি মশাই, কিছুই জানিনে । কেন, কী হয়েছে ?'

'না, কিছু হয়নি। জানতে চাইছিলাম এমনি।'

বাসার ভৃত্য দাতারাম জানাল, সারা দুপুর আমার বিছানায় গড়িয়েছে লোকটা, তারপর কখন উঠে চলে গেছে সে তার খবর রাখে না।

'কিছু নিয়ে গেছে নাকি লোকটা ?'

'কী নেবে ! কিছু থাকলে তো নেবে। কিছুই নেই আমার ঘরে। কখনই থাকে না ! সেই কারণেই তালা লাগাইনে আমি। খোলাই পড়ে থাকে আমার দরজা।'

'লোকটা কি আপনার কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় নয় তা হলে ? কোনো চোর ছ্যাঁচোর নাকি !'

'না না, চোর ছ্যাঁচোর কেন হবে। আত্মীয়ই বটে আমার।' আমি জানাই—'আমার সগোত্রই।'

না, খোয়া কিছু যায়নি আমার, খোয়াবার কিছু ছিলও না। তবে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে লোকটার খোয়ার হয়েছে যৎপরোনাস্তি। সেটা আমি বুঝতে পারি।

নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু আমাকে এক বাণ্ডিল ধূপকাঠি উপহার দিয়ে গেছেন দেখলাম। মাথার বালিশের উপরে সযত্নে সুরক্ষিত সেই গোছাটা, তার সঙ্গে একখানা চিরকুট এবং তাতে জড়ানো একটা দশ টাকার নোট।

চিরকুটে লেখা—সারা ঘর হাঁটকে পাঁটকে হয়রান, কোত্থাও কিছু নেইকো, একটা পয়সাও না। বাক্স-তোরঙ্গ, সুটকেস-ফুটকেস, বিছানার তলাটা সব হাতড়ালাম—কিছুই বাদ দিইনি, নোট-ফোট দূরে থাক, কানাকড়িটাও পাওয়া গেল না। তোমার অবস্থা দেখছি আমার চেয়েও শোচনীয়। বাসার ঠাকুর পরশুরাম পাড়হির কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, টাকা দিতে পারোনি বলে ম্যানেজারের মানায় তোমার মিল বন্ধ যাচ্ছে ক'দিন থেকে। খাবার জন্য বাসায় না ফিরতেও পারো এখন, শুনে দুঃখিত। খাচ্চো কী হে ? কোথায় খাচ্চো ? রাজেন্দ্র মল্লিকে নাকি ? চলছে কি করে তোমার ? তোমার লেখাপত্তর ঘেঁটেঘুটে জানা গেল তুমি এক লেখক, কবিও আবার তার ওপর। লম্বা লম্বা কবিতা দেখলাম—কী সর্বনাশ। এইসব ছাইপাঁশ লেখো নাকি তুমি ? ছি ছি ! অবশেষে তোমার একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তোমার বিছানায় শুয়ে পড়া গেল খানিকক্ষণ, তার ভেতরই খানিক ঘুমিয়েও নিয়েছি আবার। আমিও তোমার মতই এইসব, এমনি সব রাবিশ লিখতাম এককালে। এখন আর লিখি না, এই ধূপকাঠি বেচি এখন। যা হোক, তা হলেও দিনান্তে দু'পয়সার মুখ দেখতে পাই, তুমি বোধ হয় তাও পাও না। আমার অন্ন জোটে অন্তত, তোমার কি জোটে ? আমি বলি কি, এইসব আগড়ম বাগড়ম ছেড়ে দিয়ে সোজা বটতলায় চলে যাও, সেখানে গিয়ে দশ বারো আনা দামের একখানা 'অল্প মূলধনে সহজ শিল্পকর্ম শিক্ষা বইটা কিনে আনোগে। তারপর আমার মতন এই ধূপকাঠি বেচার ব্যবসা শুরু করো—আড়াই টাকার মূলধনেই ফলাও কারবার। কোনো দুঃখু থাকবে না আর। সেইজন্যেই এই দশ টাকা দিয়ে গেলাম তোমাকে। তুমি দাঁড়াতে পারলে আমি খুশি হবো। ইতি—

পুনশ্চ, ঘর জোড়া এত সব জঞ্জাল জুটিয়েছ কেন ? এই এতো এতো কাগজপত্তর—বইপত্তর—লেখাপত্তর—জমা করে ঘর নোঙরা করা কেবল। কী হবে এসবে ? পড়ে-টড়ে কিস্সু হয় না। লিখেটিখেও নয়। আমি এককালে লেখক হতে চেয়েছিলাম, সকলেই চায়,

গোঁফ গজাবার সাথে সাথেই কবিতা গজায় সবাইকার, তারপর গল্প, তারপর উপন্যাস, তারপর নাটক-ফাটক যাত্রাভিনয়ের পালা আরো কতো কী! সে সখ মিটে গেছে আমার। এখন এই ধূপকাঠি বেচি। তোমার সঙ্গে দেখা হল না। তবে যদি তুমি পথে আসো, আমার পথে আসো যদি, এই ধূপকাঠি ধরে দু'পয়সা উপায়ের পথ দেখলে—একদিন না একদিন সেই পথেই দেখা হবে আমাদের।

পুন, পুনশ্চ! এই সব জড়ো করা জঞ্জালেরও দাম আছে ভাই। নেহাত ফ্যালনা নয়, তা আমি মানি। রাস্তায় ফেলে দিলে পড়তে পায় না, তাও আমার জানা আছে। থলেওয়ালারা তাদের থলেয় ভড়ে কুড়িয়ে নিয়ে যায় দেখতে না দেখতেই। সেইরকম এক থোলোধরা বন্ধু আছে আমার। এক বস্তিতেই পাশাপাশি বাস করি। তাকে বলব, সে একদিন এসে, তোমার বর্তমানে বা অবর্তমানে তোমার ঘর ঝেঁটিয়ে সবকিছু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে যাবে এক সময়।

নিখরচায় তোমার ঘর পরিষ্কার হবে, তারও জঞ্জাল বেচে দু'পয়সা জুটবে এখন।...

আমার নিজের ঠিক তেমনটা না হলেও আমি দেখেছি, আমার প্রতি সর্বজীবের সমদৃষ্টি। সর্বদাই। মহাজীবন বিধানচন্দ্রের থেকে সামান্যজীবী ধূপকাঠিওয়ালার সমান দরদ দেখা গেছে আমার ওপর। মনে হয়েছে যেন এইভাবেই বিধাতা আমায় বারংবার দর্শন দিয়েছেন। এবং দর্শনীও দিয়েছেন—দিয়ে গেছেন—আমাকেই।

তারই নিদর্শন, এই দশ টাকার নোটখানা, বিধানচন্দ্রের মুক্ত হস্তের বরাদ্দর চেয়েও বেশি যেন আমায় অভিভূত করে।...নোটখানাকে বুকে জড়িয়ে ঘুম লাগাই।

সকালে ঘুম ভাঙতেই লোকটার সদুপদেশের কথা মনে পড়ল। কিন্তু ঠিক মনে ধরল না। ভেবেছিলাম একবার যে, বটতলায় গিয়ে ধূপকাঠি নির্মাণ শিক্ষাটা নিয়ে আসি, কিন্তু খটকা বাধলো। ধূপকাঠির ধুমধারাক্কায়, দুষ্ট বা শিষ্ট যাই হোক, এই সাহিত্যসরস্বতী ঘাড় থেকে নামবেন আমার? মনের মধ্যে সাকিম, তাঁকে তো মা মনসার সগোত্র বলেই ধারণা হয়, তাঁর বিষও কিছু কম নয়, ছোবলে জীবনভোর জর্জর করে রাখে। ধুনোর গন্ধে যদি তিনি প্রধূমিত হয়ে ওঠেন আরো?

বিধানবাবু ক'দিন বাদে যেতে বলেছিলেন আবার। যেতেই বললেন, 'বোসো। তোমার জন্যে আমি ভেবেছি। দ্যাখো, এই উঞ্ছবৃত্তি করে কোনো লাভ হবে না। কাজকর্ম করতে হবে তোমাকে। লিখেটিখে কিস্‌সু হয় না।'

তাঁর মুখে সেই ধূপকাঠিওয়ালার প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই আবার।

'কেন হবে না? কারো কারো বেশ হয়, আমি দেখেছি।'

'দেখেছো তুমি? কোথায় দেখলে শুনি?'

'আমার সামনেই। এই তো আপনি, একটু আগেই একজনকে এক লাইন লিখে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা কুড়িয়ে নিলেন এক্ষুনি।'

'সে তো প্রেসকৃপসন লিখে হে!' আমার কথায় তিনি হাসলেন—'এটা কি আবার লেখা নাকি? সত্যিকার লেখা লিখলে কতো পাওয়া যায় বলো?'

'তা আমি জানিনে। বলতে পারব না। আমি পাঁচ শো লাইন লিখেও এক টাকা পাইনে। সত্যিকার লেখা লিখতে পারিনে বলেই বোধ হয়।'

'তা হতে পারে। লেখাটেখার আমিও কিছু জানিনে। বঙ্কিমবাবু অনেক টাকা কামিয়ে গেছেন তাঁর উপন্যাসগুলোর থেকে। শরৎচন্দ্রও বিস্তর টাকা পান শুনেছি। কিন্তু তাঁদের মতন লেখা ক'জন পারে লিখতে ? এ দেশের বেশির ভাগ লেখকই তো খেতে পায় না, না খেয়ে মারা যায়, যাচ্ছেও এখন... তুমি কবি গোবিন্দদাসের নাম শুনেছ ?'

'কেন শুনব না ? পড়েছিও তো কতো ! বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস...'

'আহা, সে গোবিন্দদাস নয়। তাঁরা তো কবেই গত হয়েছেন। একালের কবি গোবিন্দদাস, তাঁর কথাই বলছি আমি—যিনি লিখে গেছেন—ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে তোমরা আমার চিতায় দেবে মঠ। কিন্তু আজ যে আমি খিদেয় করি ছটফট...'

'জানি জানি। তাঁর কতো স্বদেশী গান তো শোভাযাত্রা করে গেয়ে গেয়ে ঘুরেছি আমরা। —স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এ দেশ তোদের নয়/এই যমুনা গঙ্গানদী/এদেশ তোদের হোতো যদি/পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়...'

'তা হবে। তবে দেশবন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, পূর্ববঙ্গে কোথায় যেন কোন কর্ম উপলক্ষে গিয়ে সকালে উঠে দাড়ি কামাবার সময় ক্ষুর মোছার কাগজটায় গোবিন্দদাসের খবর তিনি দেখতে পান—আকস্মিক ঘটনাই। কবি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী, অত্যন্ত দৈন্যদশায়, দেখাশোনার কেউ নেই—এইসব লেখা ছিল সেই কাগজের টুকরোটায়। দেখে দাড়ি কামিয়ে উঠেই তিনি ছুটে গেলেন কবির শয্যাপাশে, তাঁর বিধিমত চিকিৎসার, খাওয়া-থাকায় বন্দোবস্ত করে দিলেন সব। কিন্তু দেশবন্ধুর মতন মানুষ ক'জন হয় ? দেশের ক'জনাই বা তাঁর নজরে পড়ে, ক'জনকেই বা তিনি দেখতে পান ? দেখতে পারেন ?'

'তা বটে। আমাকেও তিনি দেখেছিলেন একসময়—যদিও আমি কবি-টবি কিছুই নই...'

'সে কথা যাক। তোমাকে কিছু কাজটাজ করতে হবে এখন ! ঐ লেখাটেখার লাইনেই না হয় ?... নাকি তুমি আমার মতন এক লাইন লিখে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে চাও ? ডাক্তার হতে চাও নাকি ? তা যদি চাও তো বলো, তোমাকে আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দেব, পড়াটড়ার খরচ সব আমার। কেমন, পড়বে ? হবে ডাক্তার ?'

'আমার এক বোন...বোন না বলে বন্ধু বলা উচিত...সেও চেয়েছিল আমি ডাক্তার হই। ডাক্তারের মেয়েছিলো কিনা সে। কিন্তু তা আর হয় না স্যার, সেই এক লাইনের লাইন কবেই আমি ছেড়ে এসেছি। অন্য লাইনে চলে এসেছি এখন...' আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে বুঝি। —'সে লাইনে যাওয়া যায় না আর। ডিরেলমেন্ট হয়ে গেছে আমার।'

'তা হলে, এই লেখার লাইনেরই অন্য কোনো কাজ নাও। সহকারী সম্পাদক-টম্পাদক হতে পারো না ? প্রুফ দেখার কাজ জানো ? প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দবাবুকে আমি বলে দিতে পারি...'

'সেখানে আমার এক কাজিন কাজ করেন। চারুদা। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'চিনি তাঁকে। আমাদের ব্রাহ্ম সমাজেরই গণ্যমান্য একজন। তা হলে তুমিই গিয়ে তাঁকে ধরো না কেন ? সহজেই তো ধরতে পারো।'

'না চারুদার কাছে যেতে আমার ভয় করে। কী দারুণ গম্ভীর যে...।'

'তা হলে কোনো জায়গায় প্রচার-সচিবের কাজ নাও না হয়। পাবলিসিটি অফিসার বা তার সহকারীর কাজ—পারবে না করতে ? তোমার এই লেখাটেখার লাইনেই তো। বিজ্ঞাপন ইত্যাদি লেখার কাজ হবে বোধ হয়। পারবে না ?'

'পারতে পারি। চেষ্টা করে দেখতে হয়।'

'বেশ, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি—ক্যাপটেন দত্তকে। বেঙ্গল ইমিউনিটির ক্যাপটেন নরেন দত্ত। এই পাশেই তো তাঁদের আপিস। আর, হিন্দুস্থানের নলিনী সরকারকেও লিখছি। দু'জনের কাছেই যাও—দ্যাখো গিয়ে কী হয়। লেগে যাবে আমার বিশ্বাস। ফোন করেও পরে বলব আমি তাঁদের।'

সেদিন কোনো অর্থসাহায্য না করে দু'খানি শুষ্ক পত্র দিয়েই তিনি আমায় বিদায় করলেন।

বাসায় ফিরে আমার মুখ শুকনো হলো আরো। দরজায় তালা লাগিয়ে গেছলাম, তবে চাবিটা পকেটে নেই। হারিয়েছে কখন।

কী সর্বনাশ! অনভ্যাসের তিলক, কপাল চড়চড় করে। অনভ্যাসীর লক্ তার চাবিকাঠি হারায়।

সেদিনকার সেই ঘরোয়া উপদ্রবের পরেই দরজায় তালা মেরেছিলাম। কোনো চোর ছ্যাঁচোরের পরোয়ায় নয়। সেই ধূপকাঠিওয়ালা যে শাসিয়ে গেছে আমায়, তার থোলাবরদার কাকে যেন পাঠিয়ে দেবে আমার ঘরদোর সব সাফ করাব জন্য। সেই ভয়েই আমার এই তালা দেওয়া।

দরজায় তালা লাগাতে গিয়ে আজ ঘরটাকেই তালাক দিতে হল দেখছি।

ঘরের জঞ্জাল গেলে আমার ঘরের আর থাকবে কী! এইসব জঞ্জালের মধ্যেই তো—আমার মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি যা আমি রচনা...সেইসব।

জীবনের জঞ্জাল সব মিটে গেলে তার আওতায় যত কাঁকড়াবিছে, নেংটি ইঁদুর জড়ো বলেই তো এই ঘরে অন্য কারো আসার উৎসাহ হয় না। নিশ্চন্ত নির্ধান্দায় একলাটি থাকতে পাই—খেয়ে না খেয়ে স্বচ্ছন্দ আরামেই।

এক একটি সুন্দর মেয়েও যেমন দেখা যায়, দাঁত মাজতে চায় না—তেমনি আমার ঘরের এই আবর্জনা আমাকে সব সময় রক্ষা করে, বাঁচিয়ে চলে।

আমার জানা এক অম্লান কিশোরীকে জানি, অবাঞ্ছিত আক্রমণের দায় এড়াতে কখনই সে নিজের দাঁত মাজতো না। শুধালে বলতো, তোমাদের জ্বালাতেই, আবার কেন?

আমি বলেছিলাম, দাঁত মাজ তুই। আমি তোর ত্রিসীমানায় আসব না, কথা দিচ্ছি, তোকে চুমু দিতে হবে না। দাঁত মাজলে ঝকঝকে দাঁতে তোকে আরো ঢের ভালো দেখাবে। দূর থেকেই খুশি থাকব না-হয়।

'শুধু তুমিই নাকি গো? দাদার আর বন্ধুরা নেই?' বলেছিল সে।

এইভাবে হাতে হাতে নিজেকে বাঁচিয়ে, অপরকে সামান্য সুখদানে কার্পণ্য করে বিয়ের আগে দাঁত স্ক্রেপ করতে গিয়ে এমন দুঃখ পেয়েছিল বেচারা! ভাবলে দুঃখ হয়।

দাঁতকুঠির চেয়ারে বসে অঝোর ধারায় ভেসে যাচ্ছিল সে।

আমার এই অমার্জিত ঘর সেই রূপসী কিশোরীকেই মনে করিয়ে দেয়। তার কোনো ছবি আমার ঘরে নেই, আমার এই ঘরটাই যেন তার প্রতিচ্ছবি।

॥ চুয়াত্তর ॥

বিধানবাবুর নির্দেশমত প্রথম আমি নলিনী সরকারের কাছে গেলাম।

হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য অফিস ছিল এখনকার সুরেন বাঁড়ুজ্যে স্ট্রীটে, রাস্তাটার তখন অন্য কী এক নাম ছিল যেন। এখনকার এলিট সিনেমার মুখোমুখি, আমিনিয়া হোটেলের পাশাপাশি বাড়িটা।

রবিবারে গেছি, সেদিন তাঁকে অবকাশের মধ্যে পাবার আশায়। সকালের দিকটায়। লিফট্‌ম্যানকে বলতে সে আমায় সোজা তিনতলায় নিয়ে গেল। একটা ঘরে ডিভানে শুয়ে তিনি বিশ্রাম করছিলেন, নার্স-জাতীয় একটি মেয়ে ফলমূল কেটে ছাড়িয়ে প্লেটে সাজিয়ে রাখছিল তাঁর সামনে।'

খেতে খেতেই তিনি চোখ তুলে তাকালেন,'তোমাকে আমি দাশমশায়ের বাড়িতে দেখেছি না ?'

আমি ঘাড় নেড়ে বিধানবাবুর চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম, চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন—'ফোনেও তিনি বলেছেন আমাকে। কিন্তু আমাদের তো পাবলিসিটি অফিসার রয়েছে। ভালো লোকই আছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চ্যাটার্জি। বেশ নামকরা লেখক।'

'কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। জানি আমি তাঁকে।...আমাদের সাবিত্রীদা।'

'তুমি কেমন লেখো আমি জানি না। তোমার লেখাটেখা কিছু পড়িনি। প্রবন্ধ লিখতে পারো ?'

'পারব।'

'পারতে পারো। সুভাষের সাপ্তাহিকপত্রটা তুমি সম্পাদনা করতে শুনেছি। অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে হবে। অর্থনীতির জানো কিছু ?'

আমি কোনো জবাব দিতে পারি না।

'পাউণ্ডের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার নিয়ে দারুণ বিতর্ক চলছে এখন তা জানো ?'

'খবরের কাগজে দেখেছি বটে—কিন্তু—' একটু কিন্তু কিন্তু করে বলি—'ওসব কিন্তু আমার মগজে ঢোকে না।'

'সমস্ত জিনিসটা তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব। পয়েন্টগুলোও বাতলে দেব। তাই নিয়ে তুমি একটা প্রবন্ধ লিখে আনবে। পারবে না ?'

'আপনি পয়েন্টগুলো বলে দিন।'

জলের মত সরল করে জিনিসটা তিনি বুঝিয়ে দিলেন আমায়। কোন্ কোন্ পয়েন্টে জোর দিয়ে লিখতে হবে, তাও।'

তাঁর কথার ধাঁচে গোড়ায় আমার ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর অর্থনীতিবিষয়ক একটা রচনার ভাষাটাষা শুধরে বানান-টানানগুলো ঠিকঠাক করে দিতে হবে আমায়, এখন আঁচ পেলাম এতক্ষণে যে না, তা নয়, বানানের দায় নয় কেবল লেখাটা বানাতেও হবে আমাকেই।'

'পারবে তো ?'

'খুব পারব। এমন কিছু শক্ত কাজ না। বলেন তো কোনো মাসিকপত্রে ছাপাবার ব্যবস্থাও করতে পারি।'

'কোন্ কাগজে ? প্রবাসী, ভারতবর্ষে—?'

আমি ভেবে দেখি। প্রবাসী কার্যালয়ে এগুতেই আমি সাহস করব না। সেখানে গুরুগম্ভীর চারুদা বিরাজিত। আর ভারতবর্ষে আমি পাত্তাই পাব না বলতে কি। কেননা জলধরবাবুর কাছে প্রস্তাবটা পাড়ব কি, সেটা তাঁর কানে তোলাই এক শক্ত ব্যাপার। আমার কোনো কথাই তাঁর কাছে খাটবে না, তিনি কানে খাটো।

'যদি বিচিত্রায় ছাপানো যায় ? আমাদের উপেনদার কাগজ। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।'

'ভালো হয় তাহলে। বিচিত্রা বেশ কাগজ। আমি দেখেছি। তাতে হিন্দুস্থানের বিজ্ঞাপন বেরয়, ভেতরের পৃষ্ঠায়। বিজ্ঞাপনটা আমি ভেতরের পাতার থেকে কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আনার ব্যবস্থা করব—অনেক বেশি চার্জ দিয়ে।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। উপেনদাকে বলব সেকথা।'

'বলতে পারো। লেখাটা ঠিক রবীন্দ্রনাথের স্টাইলে হওয়া চাই, সেই ভাষায়, বুঝেচ ? পড়ে যেন লোকে মনে করে লেখাটা আমায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছেন।'

'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপনার নামে লিখেছেন একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে মনে করেন ?'

'না করুক। আমি যে আসলে লিখতে পারি, একথাই কি কেউ বিশ্বাস করবে ? তাহলেও কতক কতক লোকের ঐ সন্দেহ জাগতে পারে তো ! রবীন্দ্রনাথ টাকার জন্য লিখবেন তা কেউ ভাবতে পারবে না, কিন্তু তিনি আমায় স্নেহ করে লিখে দিয়েছেন এটাও তো ভাবতে পারে কেউ কেউ। ঐ বেনিফিট অব ডাউট-টাই আমার লাভ।'

'বুঝেছি। আপনার বিতর্কিত অর্থনীতির ব্যাপারে কবিগুরুর সমর্থনীতির সায় আছে এটাই আপনি পরোক্ষে জানাতে চান সবাইকে ?'

'প্রায়। সেটা বোধহয় মন্দ হবে না, কী বলো ?'

আমি চুপ করে ভাবি। আমার লেখা কতদূর অর্থনীতিসম্মত হবে তা নিয়ে নয়, কতটা সাহিত্যনীতিসঙ্গত তাই নিয়ে। তারপরে সবদিক খতিয়ে আমার মত এক অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণের পক্ষে নৈতিক মানের উচ্চ নিরিখ আঁকড়ে থাকা কতটা গুণের হবে, তার ঠাহর না পেয়ে ভাবি যে, এই অর্থনীতির বিতর্ক আমার দ্ব্যর্থনীতির স্টাইলে পড়লে বিষয়টা হয়ত জগাখিচুড়ির মতন ব্যর্থ হয়ে সব দিক বজায় থাকবে শেষ পর্যন্ত।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি শুধান—'কেন, রবিবাবুর ধরনে লেখাটা কি তোমার পক্ষে খুব শক্ত হবে ?'

'না, শক্ত কিসের। ছোটবেলার থেকে রবীন্দ্রনাথ পড়ছি আমরা, হজম করছি। আর, তাঁর লেখা পড়ার বিপদ কী জানেন ? অজান্তে প্রায় তাঁর মতই হয়ে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে যে যতটা হজম করে, বুঝেছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁকে ততটাই হজম করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অস্থিমজ্জায়, তাঁকে হাতের কব্জায় নিয়ে আসা শক্তটা কী ! তাঁর স্টাইল কাটিয়ে লিখতে পারাটাই কঠিন ব্যাপার। কবিতা লেখায় অন্তত।'

'বেশ। লিখে এনো তাহলে।...আমাদের পাবলিসিটির যা কিছু কাজ সাবিত্রীবাবুই করেন, সেখানে তো কোনো ভ্যাকান্সি নেই। তুমি বরং মাঝে মাঝে আমার এই প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লিখে ছাপিয়ো না হয়, দু'চারশো টাকা পেয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।'

'সেই ভালো' বলে আমি হাঁপ ছেড়ে চলে এলাম। চাকরির খর্পরে পড়তে হলে না দেখে বেঁচে গেলাম যেন।

আমার সেই একমাত্র অর্থনীতিমূলক প্রবন্ধ নলিনীরঞ্জন সরকারের নামে যথাসময়ে বিচিত্রায়

বেরিয়েছিল, তাতে অর্থনীতির কতদূর শান্তি হয়েছিল জানিনে, কিন্তু মূলক যে বেশ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাস্তি।

সেই প্রথম আর সেই শেষ। তারপরে অর্থনীতির কোনো মূলোৎপাটন করতে হয়নি আমায়...তাঁর কাছ থেকেও কোনো ডাক আসেনি আর, আমিও নিজের থেকে গরজ করে যাইনি তাঁর কাছে কখনো আবার। স্বরাজ্যদলের এই ভদ্রলোকটিকে কেন জানি না, আমার ভাল লাগত না কেমন যেন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ বোধ করতাম না। কেমন যেন বৈষয়িক মানুষ বলে বোধ হোতো।

অবশ্যি, তার পরেও এই ধরনের প্রচারমূলক লেখা আরেকবার লিখতে হয়েছে,—ঘিয়ের কারবার নিয়ে লিখেছিলাম সেটা, শ্রীঘৃতের বিষয়ে। সেটা আমার নামেই প্রকাশলাভ করেছিল—ওই বিচিত্রাতেই। তার জন্য টাকা পেয়েছিলাম মোটারকম অশোক রক্ষিত মশায়ের কাছ থেকে।

বিধানবাবুর কথাটা রাখতে তারপর ক্যাপ্টেন দত্তর কাছেও গেলাম একদিন।

চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন, 'বেশ। আমাদের পাবলিসিটি অফিসার কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছেন দিনকতক আগে। সেই পদেই আপনি বহাল হবেন। ডাঃ রায় যখন রেকমেন্ড করে পাঠিয়েছেন, তার ওপরে আর কথা নেই। আমাদের পে-স্কেল ভালোই। পয়লা তারিখে আসবেন আপনি, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার রেডি থাকবে।'

'কখন আসব?'

'অফিসটাইমে। কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। দশটা পাঁচটা কাজ, তার বেশি নয়। মাঝখানে টিফিন আছে।...এর আগে কোনো আপিসে কাজ করেছেন? আর কোনো প্রচার দপ্তরে?'

'কোথাও না। এই প্রথম। তবে করতে করতে হয়ে যাবে।'

'তা হবে। বিশেষ আপনি লেখক যখন, এই লেখালেখিরই কাজ তো! তবে একটা কথা, লেখকরা একটু ঢিলেঢালা টাইপের হয়, আপিসে কাজ করতে গেলে তা চলবে না। আপিসের একটা রীতিনীতি নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে...বুঝেছেন? সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ—এসব দরকার।

'জানি,' বলে বেরিয়ে আসি। তার পরে সোজা প্রেমেনের কাছে চলে যাই। চাকরির কথাটাও বলি গিয়ে।

'বেশ ভালো কাজ, মোটা মাইনের পাবলিসিটি অফিসারের কাজ। করো না তুমি!' তাকে সাধি।

'ভালোই তো বোধ হচ্ছে। তা, তুমি করছো না কেন? অফারটা তো তোমাকেই দিয়েছে। এমন কিছু ভারী কাজ নয়, বাধা কিসের?'

'মনের বাধা। মন সায় দিচ্ছে না। তবে এমন কাজটা ফসকে যাক, আমি চাইনে। তুমি করলে খুশি হবো। পয়লা তারিখে যেতে হবে। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় তোমাকে নিয়ে যাব আমি। তুমি রাজী হলে এর ভেতরে সব ঠিকঠাক করে রাখব আমি বলেকয়ে।'

'কিন্তু তুমি করছো না কেন? তোমার অসুবিধেটা কী হচ্ছে?'

'মনের সায় নেই। কোনো ধরাবাঁধার মধ্যে আমার মন যেতে চায় না, সময় বাঁধা রেখে, স্বাধীনতা খুইয়ে টাকা কামানো আমার কর্ম না।'

'সেভাবে দেখলে, কেবল দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই কারো স্বাধীনতা নেই কোথাও। সবাইকেই সময় বাঁধা রাখতে হয়। বাধ্য থাকতে হয় এক সময়—মনিবের কাছে,

পরিবারের কাছে, কারো না কারো কাছে। এড়াবার জো নেই, জানো ?'

'সংসারের ভেতরে থাকলে নেই বটে, কিন্তু যে তার বাইরে থাকে, থাকতে চায়? সত্যি বলতে, জানো দশটা পাঁচটা অফিসের চেয়ারে টান হয়ে বসে থাকা কাজ থাক না থাক, একটানা ঐ এক দশায়, সে-অধ্যাবসায় আমার নেই। টেবিলের সামনে বসলেই আমার পিঠটান দিতে ইচ্ছে করে।'

'অদ্ভুত তো !'

'অদ্ভুত কী। সেটাই স্বাভাবিক। শৃঙ্খলাবোধ বাল্যকাল থেকে শিখতে হয়—রেগুলার ইস্কুল কলেজ করে। পড়াশুনা তো নিজের বিছানায় শুয়েও হতে পারে কিন্তু ঐ রেগুলারিটি আর ডিসিপ্লিনের শিক্ষা সেই ইস্কুল কলেজেই হয়ে থাকে। সেখানে সে পাঠ যে নেয়নি—এগারোটা-চারটে ইস্কুল করেনি, সে দশটা পাঁচটা অফিস করতে কখনই পারবে না, কিছুতেই না। সর্বদাই আইঢাই করবে। পালাই পালাই করবে সব সময়। ইস্কুলের বেঞ্চে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন উড়ু উড়ু করত যেমন।'

'কিন্তু কাজ তো সবাইকে করতেই হয়। কাজ না করে কি কারো চলে ?'

'তা তো চলে না জানি। আমিও কাজ করতে চাই—মনের কাজ হয় যদি।'

'সে আবার কোথায় মেলে হে ? কাজের মতন কাজ হলেই হয়।'

'আমার হয় না ভাই। মনের মতন কাজ হওয়া চাই আমার। হয়েওছিল একবার। এই লেখালেখিরই কাজ। তবে নিজের বিছানায় শুয়ে বসে গড়িয়ে আরামে অবকাশের মধ্যে করা যেত। আত্মশক্তির সম্পাদকতা করতাম যখন—ডবল ক্রাউনের এক ফর্মা ঘরে বসে লিখে দিলেই চুকে যেত—তারপর মাস গেলেই একশ টাকা। বেশ কাজ ছিল সেটা, কিন্তু টিকল না শেষ পর্যন্ত। মনের মতন কিছুই কখনই বেশি দিন থাকে না, আমি দেখেছি। মনের মতন মানুষ যারা তারাও চলে যায় শেষটায়।'

'মনের মতন না হল তো কী ! টাকার জন্যই তো কাজ করা। আর, তোমারও যখন টাকার দরকার—এ কাজটা তুমি করবে না কেন ?...সব কাজই ইচ্ছে করলে করা যায়, মানিয়ে নিতে হয় কেবল।'

'তোমার কথাটা মানি। আর মানি ফ্যালনা নয়, তাও মানতে হয়, সে কথাও বটে। কিন্তু আমার ঘটে যদি ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তুমিই তার কী করবে, আমিই বা কী করব ! কারো নিয়তি কেউ খণ্ডাতে পারে ?'

পয়লা তারিখের আগের দিন ক্যাপটেন দত্তকে গিয়ে জানালাম—'আপনার কাজটার জন্য আমার চেয়েও ভালো লোক ঠিক করেছি। প্রেমেন মিত্তির। নাম শুনেছেন নিশ্চয় ? আমার চেয়ে ঢের ঢের বড় লেখক—এমনকি, একালের আমাদের সবার অগ্রগণ্য বলেই তাঁকে আমার মনে হয়। তাঁকেই আমি নিয়ে আসব কালকে।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। প্রেমেন পরদিন থেকেই লেগে গেল কাজটায়।

আত্মশক্তি কাগজটা সে সময় 'নবশক্তি'র রূপ ধরে ক্যাপটেন দত্তের তত্ত্বাবধানে ছিল, 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর বিখ্যাত লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের সম্পাদনায়। প্রতি সপ্তাহে কাগজের শেষের দিকে প্রেমেনের এক পাতা করে লেখা থাকত—বেংগল ইমিউনিটির তৈরি ওষুধগুলির প্রচার বিজ্ঞাপনী হয়ে। একাধারে বৈজ্ঞানিক আর বৈজ্ঞাপনিক কলাসম্মত প্রচারনার সেই রম্যরচনাগুলি—তার সংক্ষিপ্তসার কুড়িয়ে বাড়িয়ে বার করতে পারলে একটা আদর্শ স্বাস্থ্যশিক্ষার বই হতে পারত, আমার ধারণা। প্রেমেনের এখনকার যতো বিজ্ঞাননির্ভর

গল্পকাহিনীর গোড়ার কথা বলে আমার মনে হয়।

'মনের মত ঠিক না-হলেও, কাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। কাজটা না করলেও প্রেমেনের এই কথাটা আমি মেনেছিলাম।

মনের মতন কাজের আশায় যে বসে থাকে, তার তেমন কিছু কোনদিনই হয় না।

মনের মত কাজ নয়, কাজের মতন মন করতে হয়। যারা তা পারে, যাদের তা হয়, তারাই কাজের লোক হয়। সেই কেজো লোকরাই কালে কৃতী, স্বীয় কৃতিত্বে স্বকীয় কীর্তি রেখে যায়। তারাই কর্মবীর ; আর সবাই তাঁদের মতন না হয়ে আলামোহন দাশ-এর বদলে আলাভোলা হয়ে বাউণ্ডুলে জীবন কাটায়। উঞ্ছবৃত্তির জীবদ্দশায় দিন কাটে তাদের।

বাবা বলতেন, উঞ্ছবৃত্তি কিছু খারাপ নয়। একদা ব্রাহ্মণদের—যারা নাকি আদর্শ ব্রাহ্মণ, তাদের কাজ ছিল তাই করা। কারো দাস্যবৃত্তি না, বৈশ্য বৃত্তি নয়, ক্ষাত্রবৃত্তি তো নয়ই—ঐ উঞ্ছবৃত্তি।

মা বলতেন, উঞ্ছবৃত্তি আর ভিক্ষাবৃত্তি এক। দুটোই দৈন্যদশার।

'মোটেই তা নয়' বাবা বলতেন আমায়, 'আমরা যাদের বংশধর—উর্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লবৎ—এই পঞ্চ প্রবর আমাদের পূর্বপুরুষ—ঐ উঞ্ছবৃত্তিই ছিল তাঁদের কাজ। শাস্ত্রচর্চা, ধ্যান-ধারণা এসব নিয়েই তাঁরা থাকতেন, কিন্তু জীবিকা নির্বাহ হ'ত তাঁদের ঐ উঞ্ছবৃত্তিতেই। উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলে জানিস ? কৃষকরা মাঠের থেকে তাদের ফসল কেটে বাড়ি নিয়ে যাবার কালে তাদের বোঝার থেকে যে সব শস্যকণা মাটিতে পড়ত, সেই সব কুড়িয়ে এনে সেদ্ধ করে খেতেন তাঁরা। বাকী সময়টা কাটাতেন ব্রহ্মচিন্তায়। বুঝেছিস ?'

বুঝতে পেরেছিলাম ভালোই, আমার ধারণায় সেই থেকেই প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চ প্রবরের ঐ কাজ বরণীয় হয়ে আমার মনের কোথায় গেঁথে গেছল যেন। উর্ব চ্যবন ইত্যাদির উর্বর ক্ষেত্রে পরের ফসল থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিজের কারবার ফলাও করতে লেগেছিলাম সেই থেকেই—নিজের অবচেতনাতেই যদিও।

আমার এই প্রবরণীয় পেশায় পরের উর্বর ক্ষেত্রে ফলাও ফসলের ঝরতি-পড়তিতে ভাগ বসাবার এই আপ্লবৎ আদৌ আমার জন্মকোষ্ঠি-বিরুদ্ধ ছিল না।

সেটা বুঝতে পেরে মা তখনই বাধা দিয়েছিলেন আমায় : 'না, খবরদার না। উঞ্ছবৃত্তির পথে যাসনে। তোর মন যে দিকে টানবে সে দিকে যাবি, মাকে মনে রেখে প্রবৃত্তির পথে এগুবি তুই। যা তার পাবার, যা তার প্রার্থনীয়, সবই তার মিলে যাবে দেখিস।'

বাবা প্রতিবাদ করেছিলেন মা'র কথার। বলেছিলেন, 'না, প্রবৃত্তি নয় নিবৃত্তি।' বলে লম্বা এক শাস্ত্রবাক্যও আউড়ে ছিলেন তিনি—'নমাংস ভক্ষণে দোষ/ ন মদ্য/ ন মৈথুনে/ প্রবৃত্তিরেষা ভূতনাম/ নিবৃত্তেস্তু মহাফলম/

মোদ্দা কথাটা বাবার এই, প্রবৃত্তির পথে সকলেই যায়, যাবেই, কিন্তু যে নাকি নিবৃত্ত হবে মহাফল তারই প্রাপ্য।

মা'র কথা আমি বাবার কথা-র ওপরে মানতাম, কিন্তু এখন দেখা গেল, তাঁর কথাও নেহাত মিছে নয়। বাবার কথাটাই অভাবিত ভাবে কেমন করে ফলে গেল যেন।

বেঙ্গল ইমিউনিটির পথে নিবৃত্ত হবার পরেই একদিন হঠাৎ সুধীরবাবুর মৌচাক কার্যালয়ে যেতেই তিনি কথাটা তুললেন—মৌচাকের জন্যে লিখুন না! অনেকদিন ধরেই ভাবছি বলব

আপনাকে...ছোটখাট একটা গল্প লিখে আনুন।'

'টাকা দেবেন?' বলে ফেলি হঠাৎ।

'নিশ্চয়ই। সবাইকেই দিই। সব লেখার জন্যেই দিয়ে থাকি। গল্প কবিতা প্রবন্ধ সবের। তবে গল্পই দিন আপনি। গল্পেরই দরকার।'

'কতো দেবেন?'

'যা চাইবেন। তিন-চার পাতার মত লেখা, তার জন্য যা উপযুক্ত মনে করেন।'

'যদি পনের টাকা চাই?'

'নিশ্চয়। ইচ্ছে করলে নিতে পারেন এক্ষুনি।'

তক্ষুনি তিনি দশ-পাঁচ টাকার দু'খানা নোট আমার হাতে ধরে দিলেন। আগাম। ঘোড়ার আগেই লাগাম পেয়ে গেলাম।

পেতেই আমার কেমন হাসি পেল যেন—কেন যে! এতদিন ইয়াব্ বড় বড় গল্প কবিতা প্রবন্ধ, এমন কি নাটক পর্যন্ত লিখেও তেমন কিছু পাইনি, আর এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

হাসব না কাঁদব? হাসিই পেল আমার।

আর সেই যে আমার হাসি পেল, সেই হাসিই বুঝি পেয়ে বসল আমার সব লেখা তারপর থেকেই!'

বাবার প্রণোদিত নিবৃত্তির পথ ধরে মা'র প্ররোচিত আমার প্রবৃত্তির পথ খুঁজে পেলাম। দুটো পথ আমার জীবনে মিললো এসে এক জায়গায়। দরাজ হাসির রাজপথে।

এক ধারায় এসে মিলে গেল একই মোহনায়, সাগরসঙ্গমের মতই। সেদিন আমার সাগর থেকে ফেরা নয়, সাগরের দিকেই ফেরা—ফেরার হওয়ার দিন!

॥ পঁচাত্তর ॥

অদ্ভুত লোক ছিলেন মৌচাকের মক্ষিরাজ এই সুধীর সরকার। মধুকর আর মধুলুব্ধদের জন্যে তাঁর মৌ-ভান্ডার সর্বদা উন্মুক্ত থাকত। দরাজ হাতে নির্বিচারে তিনি বিলিয়ে দিতেন সবাইকে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মতন তাঁরও ছিল নবরত্ন সভা। সেকালের সাহিত্য জগতের দিক্‌পালেরা তাঁকে ঘিরে মৌচাকের আসরে এসে জমত। কবি সত্যেন দত্ত, মণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন দেব, প্রভাত গাঙ্গুলি, কেদার চাটুজ্যে (ইনি জগন্নাথ পন্ডিতের ছদ্মনামে অনেক চমৎকার গল্প লিখেছেন মৌচাকে), হিতেন বসু শিল্পী চারু রায় প্রভৃতি তো ছিলেনই, (সকলের নাম মনে আসছে না এখন; নবরত্নের পরেও তিনি নব নব রত্নদের নিয়ে এসেছেন। আমাদের কালে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, অন্নদাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার, মোহনলাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধীরেন ধর, খগেন মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ, সুকুমার দে সরকার, মানিক বন্দ্যো, বিমল দত্ত, শৈলজানন্দ, বিভূতি বন্দ্যোকেও এনেছিলেন মৌচাকে, এমনকি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুবোধ ঘোষকে পর্যন্ত টেনেছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের চেয়েও পরাক্রমে তিনি বড় ছিলেন, পরকেও তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার করে নিতে জানতেন। তাঁর মৌচাক-রাজ্যে রথী-মহারথীর থেকে আমার ন্যায় সামান্য

পদাতিক পর্যন্ত এসে জুটেছে, আর সবার সাহায্যে শিশু সাহিত্য বড় হয়ে উঠেছে। বয়সে বেড়েছে না কেবল, দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশভঙ্গীও বদলে গেছে, রূপ বৈচিত্র্যে অপরূপ হয়েছে দিনের পর দিন। শিশু সাহিত্যের রাজ্য বিস্তারে মহারথদের নিয়ে নিজের সারথ্যে বার বার তিনি সীমান্ত পার হয়েছেন, চার ধারে ছড়িয়ে সীমানা ছাড়িয়ে গেছে কবেই, আজ আর তার সীমা পরিসীমা নেই।

'সন্দেশের' থেকে কোন্ দেশে আমরা এসে গেলাম ! সন্দেশের অবশ্য জোড়া তুলনা হয় না, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় জন্মাবেন না আর, যোগীন সরকার, কুলদারঞ্জনের মতন কাউকে আর পাব না আমরা, দক্ষিণারঞ্জনের অপরূপ রূপকথার জগতও চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। বাঙালীর শৈশব থেকে হারায়নি যদিও, কোনোকালেই হারাবার নয়, কেননা প্রথম অক্ষর পরিচয়ের পর এঁদের বই আমাদের পড়তে হবেই, সাহিত্য রসাস্বাদনের গোড়াপত্তন ওসবের থেকেই কিন্তু বাংলার কিশোরদের কৌতূহলের স্বাদ এনে দিলেন হেমেন্দ্রকুমার—তাঁর অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী 'যখের ধন'-এই সব প্রথম। মৌচাক আর সুধীর সরকার নইলে কি তা সম্ভব হত ? সুধীরবাবুই তাঁর সমকালীন লেখকবন্ধুদের সাহায্যে শৈশবের রাজ্যে কৈশোর নিয়ে এসেছেন—শিশুসাহিত্যে নয়া জোয়ানির বান ডাকিয়েছেন! যেন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় নিমেষের মধ্যে শিশুকে তারুণ্যে পৌঁছে দিয়েছেন—যেখানে দুনিয়ার দিগ্বিদিক তার সামনে খোলা, বিশ্বের বহুবিচিত্র বিস্ময় নিয়ে। হেমেন্দ্রকুমারের যখের ধন আর মণীন্দ্রলালের কায়াহীনের কাহিনীর লাট্টুর ঘূর্ণীতে শুরু হয়ে কল্লোলিনী সুরধুনীর ন্যায় বাঁক ঘুরে বহুৎ ঘুরপাক খেয়ে সুবোধ ঘোষের পুতুলের চিঠি পেরিয়ে, আজকের সত্যজিৎ আর প্রেমেন মিত্তিরের বিজ্ঞাননির্ভর রহস্য-কাহিনীর কিনারায় এসে পৌঁছানো—ভাবলে অবাক হতে হয় বই কি ! দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথার কল্পলোক থেকে এখনকার বস্তুনিষ্ঠ গল্পলোকে এই—পরমাশ্চর্য উত্তরণ !

কয়েক দশকেই এই যুগান্তকর কান্ড—ধারণাই করা যায় না। এর গোড়ায় সুধীর সরকার। ধুরন্ধর লেখকরা এর জন্যে কলম ধরেছিলেন সে ঠিক, কিন্তু একালের যুগন্ধর ঐ সুধীরচন্দ্রই। তিনি না এলে তাঁরা আসতেন কিনা, অন্তত এভাবে এই শিশু সাহিত্যে নামতেন কি না সন্দেহ আছে। তিনিই এঁদের—বড়দের এই বিখ্যাত লিখিয়েদের কিশোর সাহিত্য রচনায় নামিয়েছেন তাঁর মৌচাকে। আর বড় লেখকরা এসেছিলেন বলেই শিশুসাহিত্য বড় হল—বড় দরের হয়ে দাঁড়াল।

প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃপ্রকাশ সত্যই। চন্দ্র সূর্য জ্যোতিষ্করা স্বপ্রকাশ, নিজের আলোতেই প্রকাশিত, সন্দেহ নেই। কিন্তু জ্যোতির্ময় সূর্যকেও আকাশের অপেক্ষা রাখতে হয়—আত্মপ্রকাশের জন্য। তাই আকাশের ভূমিকা সূর্যের চেয়ে বড়ো, আকাশ না থাকলে সূর্যরা ঠাঁই পায় কোথায় ? তাদের প্রকাশ করে কে ? লেখকের চেয়ে প্রকাশক অনেক বড়ো—এই কারণেই। 'আকাশ নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা ?' লেখক শুধু নিজেকেই প্রকাশ করেন, প্রকাশক করেন অনেককে।

সুধীর সরকারের ছিল সেই আকাশী ভূমিকা। যে ভূমিকা কম নয়।

এমনকি, শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশক সুধীরবাবুই। তাঁর মননশীল প্রবন্ধগুচ্ছ 'নারীর মূল্য' তিনিই বার করেন। তাঁর দুঃসাহসিক বই—পথের দাবী, (প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহ প্রচারের দায়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত) কয়েক হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে রেখেছিলেন

কিন্তু পরে শরৎচন্দ্র সেটি উমাপ্রসাদবাবুকে ছাপতে দেবার জন্য চাইতেই, অমনিই তাঁকে ফিরিয়ে দেন তক্ষুনি—কিছু না নিয়েই। এই ঔদার্য তাঁর ছিল।

সব লেখকের বেলাতেই এটা দেখেছি। কোনো লেখক দরকারে পড়ে এসে চাইলেই তিনি অকৃপণ ভাবে দিতেন, লেখকের লেখা দিয়েই যা পরিশোধ হয়ে যাবার। কিন্তু লেখকেরও ঐ লেখা দেবার কথা মনে থাকত না, আর তিনিও চাইতে ভুলে যেতেন—না লেখা না টাকা।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত একখানা উপন্যাস লিখে বেকায়দায় পড়েছিলেন একবার। তাঁর বইয়ের কোনো প্রকাশক পাচ্ছিলেন না। নাট্যকারের উপন্যাসের প্রকাশক পাওয়া সেকালে মুশকিল ছিল। অথচ, তাঁর টাকার বিশেষ দরকার তখন। রাস্তায় দেখা হতে বললেন আমাকে, 'বইটা কাকে দেওয়া যায় বল তো হে? এক্ষুনি টাকা দিয়ে কে নিতে পারে আমার উপন্যাস?'

'কে আবার? ঐ সুধীর সরকার।' আমি নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছি।

সুধীরবাবুর কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে, শোনা মাত্রই পাণ্ডুলিপিটা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে কয়েক শ'টাকা তাঁকে দিলেন তিনি তক্ষুনি—কোনো লেখাপড়া চুক্তিপত্রাদি না করেই। আবার কিছুদিন বাদে, সেই বইটি অপর কোনো প্রকাশককে দেবার জন্য শচীনদা এসে চাইতেই সেই ড্রয়ারের ভেতর থেকেই পাণ্ডুলিপিটা বার করে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন তৎক্ষণাৎ। বিনা বাক্যব্যয়ে—তাঁকে দেওয়া টাকাকড়ির নামগন্ধ না করেই।

লেখকদের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তিনি অকৃপণ হাতে দিয়ে গেছেন। বিনিময় প্রাপ্তির আশা না করে—ফিরে পাওয়ার দাবী না রেখেই এই আমিই কি তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার সময়ে অসময়ে কম নিয়েছি তাঁর কাছ থেকে? কিন্তু তাঁকে ভোলাবার বুঝি কোনো দরকার ছিল না। নিজ গুণেই তিনি ভুলে যেতেন। দেয়ার পরেই দানের কথাটা তাঁর আর মনে থাকত না। দেওয়া আর ভুলে যাওয়া যেন তাঁর মজ্জাগত বদভ্যাস ছিল।

এমনি অমায়িক ছিলেন সুধীর সরকার—কেবল ব্যবহারেই নয়, টাকার দিক দিয়েও। টাকায় তাঁর কোনো মায়া ছিল না যেন। একবার বুদ্ধদেব মৌচাকের দরজায় ঝাঁটানো জঞ্জালের মধ্যে একটা একশ' টাকার নোট দেখে কুড়িয়ে নিয়ে সুধীরবাবুকে দিতেও তাঁর কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি। তাই নাকি? পড়েছিল ওখানে? বলে নির্লিপ্তভাবে তুলে রেখেছিলেন ড্রয়ারের ভেতর। বুদ্ধদেব তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় ঘটনাটা অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন।

পরের দুরবস্থায় মুক্তহস্ত হওয়া এটা বোধ করি সরকারদের স্বভাবসিদ্ধ। সার এন .এন. থেকে সুধীরবাবু পর্যন্ত এই ধারাটা আমি লক্ষ্য করেছি। এমনকি তার পরে...তারও পরে...অর পরেও আরো।

এমন কি পলিটিক্যালি ঝুনো, (ঝানু লোক বলতে পারি না তাঁকে) আমাদের হেমন্তদা, হেমন্তকুমার সরকার পর্যন্ত, নাট্যনিকেতনের ফায়ার ইনস্যুরেন্স-এর কমিশনের বাবদে তাঁর পাওনার পুরো টাকাটাই অম্লানবদনে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। টাকাটা নেহাত কম ছিল না। এক হাজারেরও ওপর বটেই।

ঘোষ বংশ বড় বংশ, বোস বংশ দাতা—প্রবাদে কয়। কথাটা মিথ্যে নয়। শরৎ বোস,

সুভাষ বোস থেকে যতীন বোস পর্যন্ত তার পরিচয় আমার এই সামান্য জীবনেই প্রচুর বোসদের সৌজন্যেই আমি দাঁড়িয়েছি বলতে বাধা নেই। কিন্তু তাহলেও বলব, বদান্যতায় সরকার বংশও তার অন্যথা নয়।

সুধীরবাবু জীবদ্দশায় কারণে অকারণে আমায় অনেক তো দিয়েছিলেন, এমনকি, দেহরক্ষার পরেও দেবার তাঁর কোনো কসুর হয়নি। তাঁর স্মারক বইয়ের জন্য আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম, উদ্ধৃত করছি এখানে—

রূপকাহিনীর রূপোর কাঠির ছোঁয়া ঘুম ঘুম দেশটাকে.../ছিলো যতো শিশু স্বপ্নমায়ায় কল্পপুরীর মই ধরে.../শিশুসাহিত্য হতবিহ্বল শৈশবসুখে সেই তাকে/জাগিয়েছ তুমি/ডেকেছো যে তুমি/নিয়ে এসেছ যে ঐ ভোরে/সেই সাথে যতো শিশু সাহিত্য-মহারথীদের হাত ধরে/সুধীরচন্দ্র ! তোমার মিষ্টি মৌচাকে। /শিশুসাহিত্য এবং শিশুরা রাতারাতি বুঝি সেই ডাকে/শৈশবমায়া পেরিয়ে সহসা পা দিয়েছে এসে কৈশোরে...। /সাহিত্য রাজপথেই এসেছে সেইদিকে হৈ হৈ করে ! /সুধীরচন্দ্র ! তোমার মিষ্টি মৌচাকে।

শিশুসাহিত্য-সারথি তুমি হে !
হে সুধীর সরকার !
হে-সুরধুনীর ভগীরথ তুমি, তোমারে নমস্কার !!

কবিতাটা লিখেই কিন্তু আমার মন খারাপ হয়ে গেল—সুধীরবাবুর জন্য ততটা নয়। যতটা ঐ কবিতাটার জন্য। সুধীরবাবু তো গেছেনই, তাঁর কাছে আর আমার কোনো প্রাপ্তিযোগ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কবিতাটাও গেল।

ওটার থেকে কোনো দক্ষিণা পাওয়ার আশা নেই, চাওয়া যায় না। যদিও তাঁর ছেলে সুপ্রিয় সরকার তাঁরই ঐতিহ্যধারায়, তাহলেও এহেতু কিছু দাবী করতে সঙ্কোচ কেমন বাধে না ? যেখানে অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ তা-বড়ো তা-বড়ো লেখক অমনি তাঁদের লেখা দিয়েছেন ঐ স্মারকে, সেখানে এই লেখকেরও চক্ষুলজ্জা বলে একটা কিছু থাকতে পারে। থাকা উচিত।

তাহলে আমার কয়েক ঘন্টার এই পরিশ্রম পুস্তিকার মাঠে মারা গেল অমনি ? ভাবতেই মনটা খচ খচ করে কেমন।

যাঁর কাছ থেকে অত পেয়েছি তাঁকে সামান্য একটু শ্রদ্ধা (না হয় পদ্যাকারেই হোলো) দিতে আমার কী কার্পণ্য! এতেই আমি কীরূপ স্বার্থপর মন্দমতি নীচাশয় তা টের পাবেন। আমিও তা টের পাইনি যে তা নয়, কিন্তু স্বভাব কি পালটায় ? এই আমিই আবার শিশিরকুমার, শরৎচন্দ্রকে অর্থপর বলে দুষেছি, অথচ আমি নিজে কিরকম অর্থগৃধ্নু তা দেখুন!

তবে ভেবে দেখলে অর্থলোলুপ কে নয় ? শরৎ, শিশির তো মাথার ঠাকুর, এমনকি বিগ্রহরূপী নারায়ণ থেকে বিড়লা পর্যন্ত সকলেই পরার্থপর। কেউ কিছু কম যান না। সামনে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা দেখলে প্রায় সবারই হাত বাড়াবার সম্ভাবনা।

কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু থাকেই—সুধীরবাবু সেই ব্যতিক্রম। সুধীরবাবু আমার মনের কথা (কিংবা ব্যথাই বলা যায়) কি করে যেন টের পেয়েছিলেন, দেহরক্ষার পর ঈশ্বর লাভের হেতু ঈশ্বরের ন্যায় অন্তর্যামী হওয়া যায় বোধ হয়, (যায় কি যায় না তা দেবযানের মহানস্রষ্টা

আমার বন্ধু বিভূতিভূষণই বলতে পারতেন !) এক্ষেত্রেও দেখা গেল প্রায় সেই রকমটাই।

পরের সপ্তাহে দেখলাম, আমার সেই কবিতাটা আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দমেলায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দক্ষিণাবাবদে আমি পনের টাকা পেয়ে গেলুম। মরার পরেও খাঁড়া ঘা বসিয়ে গেলেন তিনি আমায়—যদিও তো রূপোর খাঁড়াই। দেহ রেখেও তিনি দিয়ে গেলেন, তারপরেও সামান্য কিছু স্নেহ রেখে গেলেন এই অধমের জন্যে।

পরে শুনেছিলাম, ওটা কানাই সরকার মশায়ের সৌজন্যেই আনন্দমেলায় ছাপা হয়েছিল। তাহলেও দেখুন—সেই সরকার ! এখানেও ! আমার টাকা-নাই দশা জানতেন বলেই কানাইবাবু আমার এই প্রাপ্তিযোগটা ঘটিয়েছিলেন মনে হয়।

অসামান্য প্রাপ্তিযোগও ঘটেছে আমার তাঁর দৌলতেই। আনন্দবাজারের সূত্রে এখন আমার যে অল্পবিস্তর আমদানি, তার গোড়াতেও তিনিই। তিনি এবং অশোক সরকার মশাই। আর সেটাও ঘটেছিল সুধীরবাবুঘটিত এক মৌচাকখানার আসরেই। সেখানেও উপলক্ষ সুধীরচন্দ্র সরকার, পরোক্ষভাবেই যদিও।

কানাইবাবু সেকালে মৌচাকের বৈঠকে কখনো কখনো আসতেন। এবং প্রায়ই বলতেন আমায় আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় লেখা দিতে। কী ধরনের লেখা ? আউট অব নাথিং—যা কিছু। আমার লেখাটাই তো নাথিং তার মধ্যে। কিছুই থাকে না বলতে গেলে, তাই বোধ হয় ঐ সহজ বায়নাটাই দিয়েছিলেন তিনি আমাকে।

কিন্তু আউট অব নাথিং কিছু লিখতে যাওয়াটাই তো সামথিং। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় লীডারে যে লঘু রচনাটি থাকে তা মোটেই সামান্য নয়, অসাধারণ এক লেখকের অসামান্যতার পরিচয় তার মধ্যেও—তেমনটা লেখা কি আমার পক্ষে সম্ভব ? তাছাড়া, আমার ভাষার ত্রুটি। কথ্য ভাষার আমার গদ্যভঙ্গী ঐ পৃষ্ঠার অকথ্য ভাষার রচনাবলীর সঙ্গে খাপ খাবে কি ? যদিও কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদগুলি অকথ্যতায় (বস্তুত বেশির ভাগ ক্রিয়াই তো অকথ্য !) বদলে দিলেই নিছক সাধুতায় দাঁড়িয়ে যায়, তাহলেও স্বভাবতই আমি ইতস্তত করেছি। লেখা নিয়ে দেখা দিইনি তাঁর কাছে।

কিন্তু একদিন অভাবিত মাহেন্দ্রযোগ ঘটে গেল অকস্মাৎ। বছরে একবার করে সুধীরবাবুর হেফাজতে আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, উল্টোরথ, মৌচাকের সাহিত্য পুরস্কার বিতরণী সাহিত্যিক বৈঠকে বসে—তেমনি এক সাহিত্যবাসরে যোগাযোগটা ঘটল।

উক্ত বাসরে কোনো বক্তৃতাবাজি থাকে না, কিন্তু গলাবাজি বেশ। বাজি ধরে গলাধঃকরণের মতন খাদ্যরাজি উত্তম। চপ কাটলেট থেকে শুরু করে আইসক্রিম অব্দি—যথেষ্ট খাও !

সেবার ল্যান্সডাউন রোডের একটা হিন্দী স্কুলে বৈঠকটা বসেছিল। তিনজনের করে ছোট ছোট টেবিল সাজানো, সব টেবিলই ভর্তি—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে ঘরে। আমি তো দিশেহারা, টেবিলে টেবিলে খানা দেখছি, কিন্তু নিজেকে কোনোখানেই দেখছি না।

একটা টেবিলে একটা আসন খালি কেবল। সেখানে অশোকবাবু আর কানাইবাবু বসে—সেখানে গিয়ে সাহস করে তৃতীয় জন কেউ বসেনি তখনো। আমি দুঃসাহস ভরে এগিয়ে যেতেই কানাইবাবু আমায় ডাকলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন অশোকবাবুর সঙ্গে।

সাহস পেয়ে এগিয়ে টেবিলের শূন্যস্থল তৃতীয় স্থান অধিকার করলাম গিয়ে। অশোকবাবু কথায় কথায় বললেন, 'বসুমতীতে আপনার 'বাঁকা চোখে' কলমে যেমনটা আপনি লিখে

থাকেন, সেই ধরনের একটা হিউমারস কলম আনন্দবাজারে লিখতে আপনার আপত্তি আছে?'

'আপত্তি কিসের!' আমি বললাম, 'তেমন সুযোগ পেলে তো আমি বর্তে যাব, সেটা ভাগ্য বলেই মনে করব আমার।'

যথার্থই তাই। সেরকম অল্প কথার চুট্‌কি লেখায় সামান্য খাটুনির সুযোগ পাওয়া আমার পক্ষে সৌভাগ্যই বটে।

এর আগে একাধিকবার কানাইবাবুর কাছ থেকেও আমি আনন্দবাজারে লঘু গুরু নিবন্ধ রচনার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু ততটা প্রণোদিত হইনি। যে কাজে বেশ পড়াশোনা আর অধ্যবসায় লাগে তাতে স্বতঃই আমার তেমন উৎসাহ জাগে না। সে কাজটা আমার মনের মত মনে হয়নি, কিন্তু এটা আমার মনের মতন কাজ।

অবশ্যি প্রেমেন একবার বলেছিল বটে আমায় যে, কাজ মনের মত না হোলো তো কী! কাজের মতন মন হলেই হয় কাজে লেগেই মনকে কাজের মত করে নেয়া যায়। যে কোনো কাজে লাগলেই হয়। কাজে লেগেই, লেগে থাকতে থাকতেই মন এসে যায়। প্রেমেন বুঝিয়েছিল আমায়। এমন কি এ তত্ত্বও সে শুনিয়েছে, বিশেষ করে আমাদের এই বয়সের তরুণ মন, জলের মতই তরল, যে-আধারে থাকে সেই আকারই পেয়ে যায়। পেয়ে যায়, সব কিছু খাপ খেয়ে যায়, কিছুই বেখাপ্পা লাগে না। দিনকতক থাকলে এমন কি জেলখানাতেও মন বসে যায় তার।

'যা বলেছো ভাই!' নিজের মন খতিয়ে সায় দিই আমি তার কথায়: 'আমি আগে কী রোগাই না ছিলাম যে! আমার সে চেহারা তুমি দ্যাখোনি। সেই দিব্যকান্তি দেখলে মানুষ মূর্ছা যেতো! মেয়েরা বিশেষত। এমন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে এলাম কোথা থেকে? সেই জেলখানা থেকে—জেলের খানা থেকেই। এমন মন বসে গেছল যে, চলে আসতে চাইছিল না, কিন্তু এমনি তাদের কানুন ভাই, টার্ম ফুরিয়ে গেলে তার একদিনও বেশি তারা রাখে না, রাখতেই চায় না কিছুতে, হাজার সাধলেও নয়।'

'অমনিই হয় ভাই!' সে বলে: 'বেংগল ইমিউনিটির কাজটা তোমাকেই নিতে বলছিলাম তাই। দেখো মন বসে যাবে ঠিক। এই বয়সে এমন অযাচিত সুযোগ ছাড়তে নেই। টাকার কতো দরকার তা জানো?'

'জানি। তবে মন লাগছে না যে, কী করব? দশটা পাঁচটা এক জায়গায় আটকা থাকা, স্বাধীনতা আর সময় বাঁধা রেখে....সে টাকার-কী দাম!'

'মনে তোমার কাজ লাগেনি, তাই কাজে মন লাগাতে পারছো না। দুনিয়া জুড়ে এত এত লোক কাজ করছে তাহলে কী করে? ছোট বড়ো কতো রকমের কাজ করছে! করছে কী করে তারা? এ যদি না পারো তো কোনোদিনই তুমি কোনো কাজে লাগবে না, না নিজের না পরের। কোনো কাজই হবে না তোমার দ্বারা। কোনোদিন কিছুই তুমি করতে পারবে না।'

পারলামও না। সত্যিই নাহক নট কিচ্ছু থেকে গেলাম ছেলেদের সেই মার্বেল গুলির মতই অনড়—নট্‌ নট্‌চড় নট্‌ কিচ্ছুই। ছেলেবেলা আর কাটল না আমার জীবনে।

জানি যে, কেজো লোক হলেই কাজের কাজী হওয়া যায় একদিন। কিন্তু তা আমি হতে পারলাম কই? প্রেমেনদের মতো কাজের কাজীও হলাম না, নজরুলের মতন কাজীর

কাজও হল না আমার দ্বারা।

কিছুই হল না, তবে কোনো খেদও নেই। মনের গর্ভে বা জীবনের পর্বে অশান্তিও নেই কোনো। দুর্দশা হয়ত কদাচ একটু থাকলেও দুরাকাঙ্ক্ষীর দুরন্ত দশাও পায়নি কখনো আমাকে।

কাজ করতে করতেই কর্মবীর হয় কে না জানে। নিতান্ত আলামোহন দাশ হতে না পারলেও একান্তই তাকে আলালের ঘরের দুলাল হয়ে কিংবা আলাভোলা বাউন্ডুলে হয়ে জীবন কাটাতে হয় না। না হলেও, তার বাড়ি গাড়ি ফ্রিজ সোফাসেট রেডিয়ো রেকর্ড-প্লেয়ার বৌ-টৌ—সেই সঙ্গে ছেলেপুলেও তো হয় অন্তত। এয়ারকন্ডিশনড্ সব, ইয়ার্কি নয়।

সবই তার হয়, আর যেটা যায় সেটা তার সময়। আকাশের মতন ফাঁকা অখন্ড অবকাশ। মুক্ত পাখায় মনের সঞ্চরণের অনন্ত বিস্তার।

কবি বলেছিলেন, অবকাশটাই জীবনের আসল। পেয়ালার ফাঁকটাই রসে ভরে ওঠে। বিজ্ঞানী আর যন্ত্রবিদ্রাও বলছেন, শেষ পর্যন্ত সব মানুষকে চূড়ান্ত অবকাশ দেওয়াটাই তাঁদের কাম্য, তার জন্যই নাকি তাঁদের সাধনা।

সেই এন্তার অবকাশ আমি হারাতে যাব ?

কবি গেয়েছিলেন, দুয়ার মোর পথ পাশে/ সদাই তারে খুলে রাখি/ কখন কার রথ আসে/ ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি!

জীবনের আনন্দমেলায় রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচার সৌভাগ্য হয় না তার। রাজার দুলাল ঘরের সুমুখ দিয়ে চলে গেলেও, নিজের মন দেওয়া দূরে থাক, চোখের পলক দেখারও ফাঁক পায় না বেচারা। মুখমিষ্টির বিনিময়ে মিষ্টি মুখ, চোখে এবং চেখে, দেখে দেখে খাবার সুযোগ সে হারায়। দিন রাত কাজের গাদায় আর প্রয়োজনের তাগাদায় জড়িয়ে প্রিয়জন মিলনের ফুরসত তার হয় না। জীবনমন্থন হলাহল পান করে যায়, তার অমৃত আস্বাদের সময় সে পায় না। জগতের আনন্দযজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়েও নিজের যজ্ঞভাগে বঞ্চিত থাকে। হয়ে ওঠা, হয়ে যাওয়া, হতে হতে যাওয়া তার হয় না।

তবে পরমান্নের ভাগীদার হয়েই বা কী, তাও বলা যায় বটে। শেষ পর্যন্ত সবই তো হারাতে হয় সবাইকে। সব কিছুই হারিয়ে যায়। সমস্তই খোয়া যায়, খোয়ার থাকেই আখেরে। বিলকুল হারায়, মহাভিক্ষু আর পথের ভিখারী সবারই একই দশা দাঁড়ায়। খতম হয় সব, সবাই। কবিকেও দুঃখ করে বলতে হয়, হায়রে হৃদয়/তোমার সঞ্চয়/দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

তাহলেও সেই পথভ্রষ্ট জীবনেও মুহুর্মুহু হৃদয় হারানোর প্রতিমুহূর্তের প্রাপ্তিযোগ রয়েছেই, যা নাকি হারাবার নয়। তার শেষ অঙ্কে, অঙ্কের শেষ ফল শূন্য হলেও, চরম ক্ষতির সঙ্গে পরম প্রাপ্তি বুঝি ওতপ্রোত থাকে, সেই শূন্যস্থলই বারে বারে অমৃত রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে, ক্ষণে ক্ষণে জনে জনে ভরে দিয়ে যায়।

সেদিনের বৈঠকখানায় (নাকি, খানার বৈঠকে) সেই পরম ক্ষণই এল বুঝি আমার আবার। আনন্দবাজারের সেই আমন্ত্রণ।

অবশ্যি, কানাইবাবুর কাছ থেকে এ আমন্ত্রণ আগেই আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমি রবিবারে বসুমতীর কলম-রাইটার। হাতে আম থাকতে আর গাছের আম হাতাবার গরজ ছিল না আমার।

কিছু হলেই হলো, সামান্য নিয়েই আমি সুখী, পরমাণু কণাতেই পরিতৃপ্ত, বেশি কিছু, আরো কিছু চাহিদা আমার নেই। নিজের সীমিত সময় আর শক্তির সীমানা তো জানি।

কানাইবাবুর (বোধকরি সরকার মাত্রই) পরদুঃখকাতরপ্রাণ। আমার টাকা-নাই-দশা দেখেই বাড়তি উপায়ের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। সেটা ছিল তাঁর আমাকে পুনর্বাসনের প্রয়াস। কেবল আমাকেই নয়, অনেক লেখকেরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। ছোট মাপের হলেও এদিক দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সগোত্রই বলা যায়। বিদ্যাসাগরের বরাদ্দ যেকালে কেবল এক মাইকেলের জন্যই ছিল, সেখানে তাঁর সৌজন্যে, মাইকেল তুল্য না হলেও একাধিক লেখকের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাকেও তার একজন ধরা যায়।

আমার বেলায় তা শুধু পুনর্বাসনই নয়, পূর্ণ বাসন। অশনবসন ওষুধপত্রের সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত।

কিন্তু কাজের কাজী ছিলাম না বলেই তখন আমি রাজী হতে পারিনি, কেননা কাজটা ছিল শ্রমসাধ্য, সময়বাধ্য। আর আমি, সময়ভিক্ষু শ্রমবিমুখ চিরকাল। কিন্তু এবারকার প্রস্তাবটা আমার স্বধর্মোচিত কাজের মতই, মনের মতন বলে সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়েছি। সাগ্রহে গ্রহণ করেছি।

বসুমতীর বাঁকা চোখের মত চুট্‌কি লেখার কাজই আমার পোষায়। চটুল এবং চটক্‌দারি। সময়সাধ্য শ্রমসাধ্য নয়, চট্ করে হয়, চট্‌জলদি কাম—মাথা খাটিয়ে মাথার ঘাম ফেলবার টায়ারিং কাজ না। মাথায় খাটাবার টায়রা নয়, বঙ্গবাণীর অঙ্গাভরণের জড়োয়া গয়না নয় কিছু, পদতলের চটকি মাত্র।

এমন কাজই আমি চেয়েছিলাম।

'বসুমতীর কাজটা ছাড়লেন কেন ?' অশোকবাবু শুধালেন আমায়।

'আমি ঠিক ছাড়িনি', বললাম আমি : 'সত্যি বললে, ছাড়িত হয়েছি বলাটাই সঠিক।'

এবং সত্যিই তাই। আমার মত মায়াবদ্ধ জীব কখনই সহজে কিছু বা কাউকে ছাড়তে পারে না। আপনার থেকেই মায়ায় জড়িয়ে পড়ি কেমন! অপর পক্ষই আমাকে ছেড়ে যায়, ছাড়িয়ে যায়! বার বার আমার জীবনের সব ক্ষেত্রেই এইটেই ঘটেছে, আমি দেখেছি।

বসুমতী আমি ছাড়িনি, ছাড়তেও চাইনি। কিন্তু কি কারণে যে, দৈনিকের সম্পাদক এবং সর্বাধ্যক্ষ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মশাই আমার প্রতি বিরূপ হলেন, জানি না, আমি তাঁর ত্রিসীমানার থেকে নিজেই সুদূরপরাহত হয়ে গেলাম।

প্রাণতোষ ঘটকের আমলে বসুমতী নবপর্যায়ে নবীনরূপে দেখা দিয়েছিল। তাঁরই আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে রবিবারের কাগজে ঐ এক কলমের চুটকি লেখায় লাগি।

যতদূর মনে পড়ে, হেমেনবাবু ভালোভাবেই নিয়েছিলেন আমায়। বসুমতীর পৃষ্ঠায় বহু বিজ্ঞাপিত পঞ্চম জর্জের করমর্দনকারী, প্রায় পঞ্চম জর্জেরই ন্যায় ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে শোভমান সৌম্যদর্শন বহুশ্রুত এই ভদ্রলোককে প্রথম পরিচয়ে আমার ভালোই লেগেছিল সত্যি। তিনিও আমার ঐ চুটকি লেখার প্রশংসাই করেছিলেন।

বলেছিলেন, 'বিলেতের পান্‌চ্ কাগজের গোড়াতেই এই ধরনের লেখা থাকে। চারভারিয়া। পান্‌চ্ আপনি দেখেছেন নিশ্চয় ?'

'দেখেছি, পড়েওছি। এখনও পড়ি হাতে এলে। তবে যথার্থ বলতে, পাঞ্চের চারভারিয়ার চুটকির রসে আমাদের ঠিক মন ভরে না। ওদের হিউমার ঠিক বুঝতে পারি না বলেই হবে

হয়ত।'

'পাঞ্চের ঐ পৃষ্ঠাটি যিনি লেখেন, বিস্তর টাকা পান আমি জানি। তিনি অন্তত পাঁচশো পাউন্ড পান। সে হিসেবে আমরা আপনাকে তেমন কিছু দিতে পারব না। বসুমতীর হাতের মাপে আমরা দেব, আপনার মুঠো ভরবার মত তা হবে না হয়ত।'

মাসিক একশ টাকা আমি পেতাম, আর তাইতেই আমি খুশি ছিলাম।

তাই, অশোকবাবু যখন জানতে চাইলেন আনন্দবাজারের থেকে কতো আমি পেতে চাই, তখন আমি হেমেন্দ্রপ্রসাদের কথাটাই বললাম—তাঁর মন্তব্যেরই পুনরুক্তি করলাম : 'আপনারা আমার মুঠোর মত দেবেন কেন, আপনাদের হাতের মাপেই দেবেন আমায়।'

'কতো পেতেন আপনি বসুমতীতে!'

'একশ টাকা করে।'

কিন্তু সত্য কথা বলা হল না। একশ টাকায় শুরু হলেও এবং বহুদিন ধরে তা পেলেও, টাকাটা আশীতে এসে দাঁড়িয়েছিল শেষটায়। এবং শেষ পর্যন্ত তাও দাঁড়াল না।

হঠাৎ একদিন গিয়ে শুনলাম, তিনি সেই মাসের আমার বিলটা পাশ করেননি। পরের মাসান্তেও ঠিক তাই হল। এবং তৃতীয় মাসেও ঘটল তাই। সেবারেও পাশ না করে তিনি বিলের পাশ কাটিয়েছেন। বার বার তিনবার। তৃতীয়বারেও আশী টাকার আশা না দেখে বাধ্য হয়ে তখন আমাকেও বসুমতীর মায়াপাশ কাটাতে হল।

বাবা বলতেন, জ্বর আর পর খেতে না দিলেই পালাবে। পর তো আর ঘরের বউ নয় যে, খেতে না পেলেও পড়ে থাকবে। কিচ্ছুটি আজ খাসনে, জ্বর তোর সেরে যাবে তাহলেই। দেখিস।

আমার মনে হয়েছিল, পরের মেয়ে হলেও বৌরা হয়ত পর নয়, পরীই হয় বোধ হয়—সেই কারণেই তাদের বেলায় এই অন্যথাটা হয়ে থাকে।

আমার ধারণা, হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাবাও হয়ত তাঁকে এই প্রবাদ বচনটা বলে থাকবেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্বাভাবিক সৌজন্যবশেই সম্ভবতঃ কাউকে ঘাড় ধরে আপিসের বার করে দিতেন না। পত্রপাঠ বিদায় দেওয়াও হয়ত তাঁর বাঞ্ছনীয় ছিল না। কাউকে গলা ধরে অধঃকরণ না করে কেবল তার গলাধঃকরণের পথ বন্ধ করে দিতেন। খাদ্যের বরাদ্দ বন্ধ হলেই, বাধ্য হয়ে, বসুমতী কেন তুমি এতই কৃপণা—বলে তাকে পথ দেখতে হত তখন।

তিনি ভদ্রলোক ছিলেন বাস্তবিক।

॥ ছিয়াত্তর ॥

হেমেন্দ্রপ্রসাদের কৃপায় মাস বরাদ্দ মজুরিটা মজে গিয়ে আমি প্রায় মোক্ষলাভের পথেই এগিয়েছিলাম বলা যায়।

হ্যাঁ, মজুরিই বলব। লেখার মোট ফেলে সেই মোটের ওপর কিছু পাওয়া—আমাকে লেখক হিসেবে এক মেহনতি মজদুর ছাড়া আর কিছুই মনে করিনে। বাহুবল অভাবে রিক্শা টানতে পারিনে বলেই অঙ্গুলিসম্বল এই কলম টানি—চিরকালই নিজেকে মজুর বলে জানি। মাথার মোট গেলে আর মজুরি না পেলে বেকার দশায় নিজেকে কেমন মুমুক্ষু বা মুমূর্ষু বলেই মনে হতে থাকে।

বরাদ্দের শতকরা বিশভাগ মোচন হতেই নির্বিষ ঢোঁড়াসাপের পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম। পাঁচ দশ টাকার লেখায় উঞ্ছবৃত্তির ফসল কোথায় মেলে তার জন্য ঢোঁড়াঢুঁড়ি লাগিয়েছিলাম, তার ওপর বাকী আশীভাগটাও বাদ গিয়ে....কী বলব? শেষপর্যন্ত বুঝি আশীর্বাদই দাঁড়াল। মায়ার গ্রন্থিমুক্ত হয়ে হাতে হাতেই মোক্ষলাভ হল আমার।

সেদিনকার সাহিত্যের বৈঠকখানায় খানা আর বৈঠক দুই-ই উপাদেয় ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও উপাদেয় আর একখানা জুটল আমার—অশোকবাবুদের ঐ প্রস্তাব।

শাপে বর হয়ে গেল আমার। বারে বারে আমার বরাতে এইটেই ঘটেছে, দেখেছি আমি।

অল্প লইয়া থাকি/তাই মোর/যাহা যায় তাহা যায়। তা সত্যি ; কিন্তু ওই তাহা-টুকুও না গেলে যাহা-র পরেও যাহা আছে আরও যে তাহা-তাহা থাকে, তার খবর পাই না। ভাগ্যের বরখাস্ত না হলে বুঝি বিধাতার বরহস্ত আমার নাগালে আসে না। মহাপ্রসাদের পরমান্ন নিজের গালে পাইনে। চাঁচলরাজবাড়ির পিলখানায় রাজহস্তী মোহনপ্রসাদের সম্মুখে যেমনটা দেখেছিলাম একদা, তেমনি করে উসিতরসের মতই আপনার থেকে মুখে উঠে আসে না খাবার।

ষোলো আনা গেলেই—সেই পর্বের পরেই আমার পড়ে পাওয়া সেই আঠারো আনা গেলার পার্বণ।

হেমেন্দ্রবাবুর অভিসম্পাতের মত এককালের সেই শিশির-সম্পাতও আমার জীবনে মাহেন্দ্রযোগ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, কেউ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না কখনোই। ওপরওয়ালার যেন তাতে সায় দেওয়া দস্তখতি নেই। তাই সব ক্ষতি বিক্ষতি পুষিয়ে গিয়ে নেপথ্যের থেকে পরম উদ্গাতি হতে দেখা যায়। যেমন নাকি কবে চক্রবাক্হননে মুহ্যমান মহর্ষি বাল্মীকির কণ্ঠ থেকে অন্তরের শোক প্রথম শ্লোক বাক্যের স্বচ্ছন্দ উচ্চারণে উদ্গীত হয়েছিল একদা...সেই—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তমগমঃ শাশ্বতীসমা...সেই রকম শিশির-সম্পর্কিত সন্তাপজনিত সেইকালের একটি কথাই শেষকালে কিনা প্রতিষ্ঠা দিল আমাকে!

মনের দুঃখে আমি বলেছিলাম, কার কাছে মনে পড়ে না ঠিক, হয়ত বা কল্লোলের আড্ডাতেই, 'শিশি-র ভাদুড়ি নহ, বোতলের তুমি!' নিঃসন্দেহ বিদ্বেষবশেই। কিন্তু আমার সেই কথাটিই লাখ কথার এক কথা হয়ে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে। আমার বড়ো বড়ো কবিতা, ছোট ছোট গল্প, ইয়া ইয়া প্রবন্ধ, তাবৎ রচনা ছাপিয়ে...কী করে কে জানে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল শেষটায়!

লিখে বার করিনি, ছাপা হয়নি কোথাও, তবু চাপা রইলো না। পান্-মোড়া আমার সেই প্রথম বি-রসের ভিয়েন পান্তুয়ার মতই যেন লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নিষাদযোগে পাওয়া বাল্মীকির পরম উপলব্ধির মতন বিষাদযোগে পাওয়া আমার সেই প্রথম দুর্বাক্যই আমার মোক্ষম প্রাপ্তিযোগের কারণ।

কারণ প্রাণতোষ ঘটক যখন (তার অনেক পরে) বসুমতীর মালিকানা উত্তরাধিকার করে তাঁদের কাগজে লিখতে ডাকলেন আমায়, তখন সেই কথাটিরই পুনরুল্লেখ করলেন আমার কাছে...

'আপনি ওই শিশির ভাদুড়ি নহ-র মতই টপিক্যাল খবরের ওপর দু'চার লাইনের ওই ধারার টিপ্পনি দিয়ে এক-কলম করে লিখুন না রবিবারের বসুমতীতে...লিখবেন?'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম, বলতে কী!

তার আগে আমি দু-পাঁচ টাকার উঞ্ছবৃত্তি করেছি, চয়নিকা ইত্যাদি অধুনালুপ্ত নানান পত্রিকায় লেখা দিয়ে, তার মধ্যে মৌচাক থেকেই পেয়েছি আমি ম্যাক্সিমাম্। রামধনুর থেকেও প্রায় তাই। আর মিনিমাম্ এসেছে যতো খুদে খুদে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। সারা কলকাতা ঝেঁটিয়ে তারা এসেছিল, তাদের পাড়ার কিংবা ইস্কুলের হাতে-লেখা পত্রিকায় আমার লেখা নিতে, কিন্তু আমি একেবারে অমনি লিখব না, লিখতে পারব না জেনে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পকেট হাতড়ে যা পেয়েছে বার করে দিয়েছে...পাঁচ আনা, সাত আনা, এমনকি চোদ্দ আনা পর্যন্ত খসিয়ে আমার একটা অত্যন্ত ছোট গল্প কিংবা অতিশয় খাটো কবিতা নিয়ে গেছে তাদের পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। এবং তার পরে, তারাই ইস্কুলের টিফিনের পয়সা জমিয়ে আমার গল্পের বই কিনে—সেকালে তার দাম ছিল চার আনা, ছ'আনা মাত্র—আমার বাজার গরম করেছিল—দেশে প্রদেশে চারিয়ে দিয়েছিল তারাই, আমি স্থির নিশ্চিত। লাইব্রেরি থেকে পাঠছলে বাড়ি নিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে মলাট উড়িয়ে শেষ-পর্যন্ত লোপাট করে লাইব্রেরিয়ানকে আবার কিনতে বাধ্য করেছিল—তারা ছাড়া আর কেউ না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সেকালে এমনি করেই আমায় বেঁচেবর্তে রেখে একালে এনে পৌঁছে দিয়েছে সেই বালখিল্যের দল। আমার জীবনে আমি কোন ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে পারিনি, পাছে সেই দায় পোহাতে হয়, সেই ভয়ে বিয়েই করলাম না একদম, কিন্তু অবশ্যই আমি বলব যে, বাংলার ছেলেমেয়েরা আমাকে মানুষ করার জন্য হুদ্দমুদ্দ চেষ্টা করেছিল।

যদিও শেষ পর্যন্ত পারেনি, হার মেনেছে। তাই রক্ষে!

মানুষ বুঝি কাউকেই করা যায় না, যে হয় সে আপনিই হয়। কারো প্রচেষ্টায় কেউ হবার নয়।

অশোকবাবুর কাছ থেকেও সেই প্রাণতোষিণী প্রস্তাব এল আবার। আমার সেই এক লাইনের মার। ওস্তাদি মার নয় যদিও। তথাপি তিনিও তাই চাইলেন।

কিসের থেকে কী গড়ায় দেখুন! এককালের অভিশাপ, আরেক কালের অভিবাদনে দাঁড়ায়।

মানুষের বরাতে শাপই বর হয়ে দেখা দেয় বারে বারে—তাই বোধহয় তার বরাদ্দ। যেটাকে আমরা একদা বঞ্চনা বলে জ্ঞান করি, পরে দেখা যায়, সেটাই আমাদের বেঁচে যাওয়া। সবার অভিজ্ঞতাই তাই বলে বোধ হয়, এমন কি কবির অভিজ্ঞানেও তার পরিচয় রয়েছে। বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই/বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে/এ কৃপা কঠোর/সঞ্চিত মোর/জীবন ভরে'/...সেই কথাই কয় নাকি? সবার মতন আমার জীবনেও কিছু তার অন্যথা হতে পারে না। হয়ওনি।

এবং সেইজন্যই এ জীবনে মানুষ হতে না পারলেও আমি যে আমি হতে পেরেছি—এই আমার ঢের। কিছু না হয়েও কিছু হয়ে ওঠা—কবিকথিত 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর মতন' সকল ভালো-মন্দর মধ্যে বিরাজিত ভালোর মতন তাবৎ দ্বিধা-দন্দ্বের অতিক্রম না-করার মধ্যে এই আকার নেওয়াটাই বুঝি চরম। এর জন্য যাঁর কাছে পেয়েছি এবং যাঁদের কাছে পাইনি, সবার প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের আশীর্বাদের ন্যায় শিশিরবাবুর অবদানের জন্যও আমি কৃতার্থ। কিছু না

হারালে কিছু মেলে না দুনিয়ায়। এবং যে-হারটা মানতে হয় তার ভেতরেই জয় যেন প্রচ্ছন্ন থাকে—ইংরেজি বাংলা দুই বানানেই।

শিশিরকুমার মহানুভব ছিলেন সন্দেহ নেই। সবার প্রতিই তাঁর সহানুভূতি ছিল। ইচ্ছে করে কাউকে তিনি বঞ্চনা করতেন না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু কার্যক্রমে কখনো কখনো তা হয়ে যেত যে, সেটা তাঁর দোষ নয়। থাকলে পরে, থাকা পর্যন্ত তিনি ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে দিতেন। সেদিন যে ব্যাঙ্কের পাশবই দেখে তাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্টে মাত্র ১২০ টাকা পেয়ে, তার সবটাই—সেদিনকার মতন তার যথাসর্বস্বই, আমায় দিয়েছিলেন, তা আমি বিশ্বাস করি।

বরং বলা যায়, তাঁকেই অনেকে নানাভাবে বঞ্চনা করেছিল, তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দেয়নি। কিন্তু তাঁর এই বঞ্চিত হওয়াটা অপর কারো প্রবঞ্চনায় নয়, বরং তাঁর নিজগুণেই। এবং কিছুটা আত্মজনের, আর কিছুটা-বা পরের গুণফলে।

তিনি কারো ধার করে তারপর আর শোধ করতেন না, সেলুনে দাড়ি কামিয়ে পয়সা দিতেন না পর্যন্ত, বা মুদীর দোকানের দেনা মেটাননি বা যে দোকান থেকে মদ কিনতেন, তারও দাম দিতেন না কোনদিন, বলে সে নানা গুজব শোনা যেত তার সবটাই হয়ত সত্যি নয়।

উলটে, তিনি কারো বিশেষ ধার ধারতেন না, এই কথাই বলা যায় বরঞ্চ।

এমনি করেই মনে হয় ঘটনাগুলো ঘটে যেত—যার ফলে নাকি ওই ধারার রটনা।

কখনই পকেটে টাকাপয়সা নিয়ে বাড়ির বার হতেন না মনে হয়, যেটা নাকি বিস্মরণশীল সম্ভ্রান্ত প্রতিভার সহজাত।

সেলুনে দাড়ি কামিয়েছেন, পয়সা দিতে গিয়ে দেখেন নেই। সেলুনওয়ালা তাঁকে আশ্বস্ত করেছে—তাতে কী হয়েছে! আপনি আমাদের দেশের গৌরব! আপনাকে কামাতে পেরে আমরা কৃতার্থ—তারপরও আরও কিছু না-ই কামালাম।

মুদীও তাই করেছে, মদওয়ালাও তাই।

আপনাকে কিছু দিতে পেরে আমরা ধন্য—তার জন্য দাম আবার কী নেব ? বলেছে সবাই।

কিন্তু কেউই তারা মুদিত হবার পাত্র ছিল না, স্বার্থচেতন ছিল সকলেই, যথাকালে পরম্পরায় তারা দেখা দিয়েছে—পয়সার জন্য নয়, পাশের জন্য। প্রমোদিত হবার জন্যই।

এবং শিশিরকুমারও তা না দিয়ে পারেননি।

আর, এই করেই এত এত পাশ কাটার সাথে সাথে থিয়েটারী ব্যবসাও তাঁর পাশ কাটিয়েছে—তাঁর পাশ থেকে কেটে পড়েছে কখন। নইলে যে-ব্যবসায় সেই কালেরই মনোমোহন পাঁড়ে অগাধ টাকা উপায় করেছেন, সেই কালেই নব নাট্যযুগের পাণ্ডা (নাকি আরেক পাঁড়ে ? বা পাঁড়) হয়েও অসংখ্য লোকের মন মোহিত করেও সেই পথেই শেষপর্যন্ত তিনি সর্বস্বান্ত!

দুঃখ হয় নাকি ? তাঁর জন্যই হয়।

আমার নিজের জন্য তেমনটা নয়। কেননা তাঁদের ওই প্রতিকূলতার আনুকূল্য না পেলে কখনই আমি আমার কূলে এসে ভিড়তে পারতাম না। তাঁদের সেই নামমাত্র অনুদানের সাহায্যও কিছু কম নয়।

জীবনে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। যেমন প্রিয়জনের তেমনি বিরূপজনের। সৌহার্দ্য ভালোবাসা বাধাবিপত্তি সব কিছুই জীবনে সত্যি—সব জড়িয়ে মোট মূল্যেই সার্থক।

সবই আমাদের এগিয়ে দেয়—যাত্রাপথের পাথেয় যোগায় সকলেই।

কালক্রমেই সেটা জানা যায়। তখনই বোঝা যায় যে, সুবিস্তৃত মহাকালের বুকে নৃত্যপরা মহাকালীর লীলা খেলায় একদিকে যেমন তাঁর মস্ত খড়্গ, অন্যদিকে তেমনই তাঁর অভয়হস্ত। এক হাতে ধৃত যেমন আমার ছিন্নমস্তক, তার কাছাকাছিই অপর হাতে ধরা আমার জন্য তাঁর বরমাল্য!

তাঁর এই কালীয়দমনকাণ্ডে সময়-মন্থন তাবৎ হলাহল—জীবনে যা হল আর যা হল না—সবকিছুরই পরম অমৃতায়ন—যথাকালেই জানা যায়। কালক্রমে হতে থাকে। সকলের জীবনেই—কোনো তার ইতরবিশেষ হয় না কখনো।

জীবনের আঁক কষতে গিয়ে, শেষপর্যন্ত দেখি, যা নাকি কিছুতেই মেলেনি, যত না গরমিল আর অমিল ছিল, সমস্তই মহাকালের কোলে এসে কেমন করে যেন মিলে গেছে। মাতৃঅঙ্কে এসে মিলে যায় সমস্ত—জীবনের যত আঁকিবুকি সব মিলিয়ে চমৎকার ছবি হয়ে দাঁড়ায়। সেই অঙ্কন আর কারো নয়, মা'র আপন হাতের।

কালোত্তীর্ণ এই অমৃতের সন্ধান পেতেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার দরকার। নইলে এই বাঁচার—এমন করে বেঁচে থাকার কোনই মানে হয় না জীবনের নানা বৃত্তে, বিভিন্ন বৃত্তিতে, সুখদুঃখের নানান দশায় দশমহাবিদ্যার বিদ্যমানতা দেখে জন্ম সার্থক করার জন্যই আমাদের জীবন।

এক কালের দুঃখ অপর কালে কেমন করে যে মুক্তির কারণ হয়! এক সময়ের তাবৎ বাধা আরেক সময়ে সর্বাত্মক মুক্তি হয়ে ওঠে—অঙ্ক কষার যত ভুল কেমন করে মিলে যায় শেষটায়! সকল অসংগতি মহাকালের সঙ্গমে সঙ্গত হয়ে যায় যেন।

তখনই টের পেতে বাকী থাকে না, সেকালের সেই ক্ষণিকের খেদোক্তি—শিশির ভাদুড়ি নহ, বোতলের তুমি—কালোত্তীর্ণ হয়ে এই শেষ অঙ্কে এসে বাঁচালো আমাকে।

বুঝতে পারি, যার পেটে যেমন ধরে, যতটা হজম হতে পারে, অন্নপূর্ণার ভাঁড়ারে তার তেমন ভর ব্যবস্থাই। মহাকাব্যের কবি, মহানাট্যকার হবার জন্য সবাই নয়, মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহ সবাই হয় না, কিন্তু বৃহৎ বিপুল পরিক্রমার দারুণ পরাক্রম না থাকলেও হয়, কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ছোট্ট বৃত্তের সামান্য বৃত্তিতেও সমান সার্থক হওয়া যায়। একই আনন্দ মেলে। কবির কথায়, যেমন লাগে সোনার বাটির পায়েস/ সেই মিষ্টান্ন ভাঁড়ে হলেও দিয়ে থাকে তেমনিতরই আয়েস। কিছু মাটি হয় না, যেহেতু পরমান্নটাই খাঁটি। সেইটাই আসল। আসলে ভূমাতেই সুখ—আর কিছুতেই নয়কো। স্বভূমি পেলেই সেটা মেলে। নিজের ভুঁইয়ে দাঁড়িয়ে মা'র সঙ্গে যুক্ত থাকা, সেই যোগাযোগই ভূমা—তাতেই পরমানন্দ।

মহাজ্যোতিষ্কের গগনবিদার উদার অভ্যুদয় যেমন সার্থক, সেই সার্থকতা ক্ষণদীপ্তির জোনাকিরও।

মহাকাশের বিরাট জ্যোতির্লিঙ্গ নাই হওয়া গেল, দুঃখ কিসের! ক্ষণকালের জোনাকির স্ফুলিঙ্গ হয়েও সুখ আছে।

সময়ের অঙ্কে যেমন সব মিলে যায়, তেমনি মিলিয়েও যায় সব যথাসময়েই। যেমনটা

ওই জোনাকিরা, তেমনি সূর্যতারাও কালের ফুৎকারে ফুৎকৃত হয়ে যাবার। সব আঁকের সমস্ত আঁকুপাঁকুরই শেষ ফল শূন্য—এড়াবার যো নেই।

মহা মহা ঐরাবৎ ডাইনোসেরাসও কালের গর্ভে কবে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু সেকালের সেই ছোট্ট চড়াইটি মহাকালের পারাবার পেরিয়ে একালেও হাজির!

আমার গল্প নয়, কবিতা নয়, উপন্যাস নয়, শিশির ভাদুড়ির দৌলতে পাওয়া আমার সেই এককথার চুট্‌কিটাই আমায় উতরে দিয়েছে!

চুট্‌কি লেখার এই চটক।

॥ সাতাত্তর ॥

বিশ্বামিত্র তিনটি ছত্রে/ লিখিলা গায়ত্রী/ চুটকী বলিয়া পাইলা না ঋষি/ ফলারের পাত্রী/ হোথা শ্লোক তিনটন/ লিখি মিলটন/ অমর হইলা ভবে/ লোকে পড়ে কি না পড়ে/ জানেন বিধাতা/ হরি হরি বল সবে॥ কবে লিখে গেছেন কবি সত্যেন দত্ত।

সেই চুটকি লিখেই আমার এই ফলাও কারবার আবার! সাহিত্যলোকের কোনো এলাকায় একছত্র আধিপত্য না করেও এক ছত্রের এই ছত্রপতিত্ব!

মূকং করোতি বাচালম্/পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং—জাতীয় একটা মিরাকল্ বলেই মনে হচ্ছে আমার। ফুটপাথের কেয়ার অফ যে—যার নাকি কবেই সেখানে পর্যবসিত হবার কথা, চড়াই পাখির মতন চুট্‌কির পাখায় ভর করে ফুরুৎ ফুরুৎ তারই আবার মস্ত বাধার পাহাড় ওতরাবার ব্যাপার? এমন কাণ্ড কার? যে নাকি কবে শহীদ হয়ে যাবার, তাকে যে এতদিন ধরে এতজনের এমন স্নেহ ভালোবাসা সইতে হল—এসব তো তার পাবার কথা ছিল না!

তিনটনী বোঝা নামিয়ে মিলটনী অমরত্ব লাভের কামনা কোনদিনই আমার ছিল না, তেমন ক্ষমতাও নাস্তি, বিরাট বড়ো কিছু না হয়ে কেবলমাত্র শুধু আমি-হতেই আমি চেয়েছিলাম। আমার মাও বলেছিলেন সেই কথাই।

বলেছিলেন, কোনো কাজই বড় নয়, ছোট কাজ বলেও নেই কিছু—জগন্মাতাকে মনে রেখে যে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হওয়াটাই আসল কথা। আসল কাজ।

প্রাণপণে চাওয়া বহু বাসনার সমাধির পরে—তারই ছাই উড়িয়ে এই সোনা পাওয়া যায়—সত্য হওয়া যায়—সুন্দর হওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। মনোবৃত্তির পথ ধরে এগুলেই হয়। সহজেই হওয়া যায়। মায়ের সাহায্য মেলে। পদে পদে হাতে হাতে তাঁর মোলাকাত পাই।

মাতৃভূমির মূল থেকে বৃত্তপথের জন্মভূমিতে মুহুর্মুহু জন্মজন্মান্তরের আমূল বৃত্তান্ত! জীবনভোর মিলিয়ে দেখা যায়।

সেই কৈশোর কালে যে পত্রিকার হকারি থেকে শুরু করেছিলাম, এই অন্তিম দশায় সেই পত্রিকাতেই কলমদারি—আশ্চর্য যোগাযোগ না?

প্রাণপণে চাওয়া বহু বাসনার সমাধির পরে—তবেই ছাই উড়িয়ে এই সোনা পাওয়া, হাতের ধুলো মুঠি সোনা মুঠি হয়ে যাওয়ার মতই এসব কার কেরামতি?

সেই মা'রই তো!

যাঁর হঠকারিতায় হঠাৎ হঠাৎই মিলে যায় সব, তাঁর হস্তগত (কিংবা শরণাগতই বলুন!) হলেই সব হয়।

এই বোধি লাভই জীবনের সত্যিকার পাওয়া। এর হেতুই আমাদের জন্মানো, জীবন-যাপন,

সুখ-দুঃখে দীর্ঘদিন ধরে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকা।

নিজের ভুঁয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে যে যোগাযোগ তাই ভূমা—তাতেই সুখম্—সুখের সঙ্গে শান্তি সোয়াস্তি স্বাচ্ছন্দ্য। সেই স্বভূমিতেই, বলেছিলেন মা, তার বৃত্ত (বা বৃত্তি) বড় হোক ছোট হোক—সেই স্বরাজ্যে সবাই সার্বভৌম। বৃত্তই আসল, কেন্দ্রমূলের সমমূল্য, মূলকেন্দ্রের সমতুল্য। এবং সদা-সর্বদা এই প্রবৃত্ত থাকাটাই আমাদের জীবনবৃত্তান্ত।

এই বোধিই সত্য। জন্ম-জন্মান্তরে এই বোধিই আমাদের পেতে হয়। সেই বোধিসত্ত্ব হওয়াটাই লক্ষ্য আমাদের—তাই সবার নিয়তি।

এই বোধোদয়ের পরই তো উপক্রমণিকা, আরেক জীবনের ভূমিকা। এই জন্মেই পুনর্জন্মের দ্বিজত্বলাভ। নতুন করে হওয়া আবার নয়া ব্যাকরণে—সংস্কৃত জীবনায়নে। জননী পুনর্ণবার আশীর্বাদে বার বার পুনর্ণবায়ণ।

কল্লোল-গোষ্ঠীর নৃপেনকে আমার কেমন যেন অলৌকিক বলে মনে হোতো। অবশ্যি অলৌকিকত্ব ছিল ওদের প্রায় সবারই—অচিন্ত্য, প্রেমেন, বুদ্ধদেব। আর বিশেষ করে ওই কাজীর তো বটেই। অলৌকিকতার প্রাচুর্যে সে ছিল যৎপরোনাস্তি!

অবশ্যি লেখক শিল্পী মাত্রেরই অলৌকিকতার সহিত কিছু না কিছু সম্পর্ক থাকেই—যে-সূত্র থেকে তারা প্রেরণা পায়, রচনার মালমশলার যোগান আসে—সৃষ্টি করে। দৈনন্দিন জীবনে যে ভাগাড়েই ঘুরে মরুক না, যাতে করে লেখার বা আঁকার কালে, নিমেষের মধ্যে তারা এক তুরীয় লোকে উঠে যেতে পারে—স্রষ্টার একাত্ম হয়ে যায়। সেই রহস্যের—রহস্যময়তার কোনো ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।

সেই অলৌকিকতা তো নৃপেনের ছিলই, তার অল্পদিনের জীবনেই কী আশ্চর্য শিশুসাহিত্য —যা নাকি দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোরের রচনার মতই অপরূপ—দিয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু শুধু সেইজন্যেই আমি বলছি না, অন্য অর্থেও সে অলৌকিক।

সে কোনো লৌকিকতা বা বাস্তবতার ধার ধারত না। এদিক দিয়ে সে খানিকটা নজরুলের সগোত্রই ছিল। পাক্কা বোহেমিয়ান।

সেদিনের মৌচাকের প্রথম প্রাপ্তিযোগের পর কলেজ স্ট্রীট ধরে আসছিলাম, পথের মোড়ে নৃপেনের সঙ্গে দেখা।

'ভারী মুশকিলে পড়েছি ভাই! তোমার কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে নাকি? দিতে পারো আমায়? অবশ্যিই ধার হিসেবে।'

উস্‌কোখুস্‌কো চুল, উসখুস ভাব, অদ্ভুত চেহারা নৃপেনের।

বললাম, 'আছে কিছু যৎসামান্যই। এই মাত্তর মৌচাকের থেকে একটা গল্প লেখার দরুন পেয়েছি—এই পনের টাকা।'

হঠাৎ বরাতের এই-খোলতাই খোলসা না করে পারা গেল না।

'দেখি।' বলেই সে টাকাটা আমার হাত থেকে যেন ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল।

'আরে, আরে! আমারো যে টাকার দরকার হে। কিছুই নেই আর, আমার কাছে।'

বলতেই সে পাঁচ টাকার নোটখানা ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে। আর, পকেটের ভেতর থেকে এক গোছা নোট বার করে তার ওপরে আমার দশটাকিয়াটাকে গচ্ছিত করেছে।

'এত টাকা তোমার। তার ওপরেও ফের তুমি টাকা চাইছো? আশ্চর্য!' আমি অবাক হই সত্যিই।

'কালকে আমার অনেক টাকার দরকার তা জানো? অনেকের কাছ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই মাত্র যোগাড় করতে পেরেছি। কাল শনিবার, তুমি জানো না?'

'শনিবার তো কী!'

'শনিবার মাঠে রেস হয় জানো না? রেসকোর্সে যাওনি বুঝি কখনো? ঘোড়দৌড় দ্যাখোনি নাকি?'

'দেখব না কেন? সে আর মাঠে গিয়ে দেখতে হয় না। সিনেমার হলে বসে পর্দাতেই বেশ দেখা যায়।'

'রেসের ব্যাপারটা জানো তাহলে মোটামুটি?'

'জানব না কেন? পৃথিবীতে দুটি মাত্র রেস, হিউম্যান রেস আর হর্সরেস্। আমার জানা আছে বেশ। আর এও জানি যে, এই দুই রেসের মধ্যে দারুণ রেষারেষি। মানুষরা যায় ঘোড়াদের নিজেদের পথে আনতে, আর ঘোড়ারা তাদের পথে বসিয়ে দেয়। কে না জানে?'

'তা যদি জানা থাকে তাহলে ভালোই জানো যে, এত টাকার একটাও কাল মাঠ থেকে ফিরে আসছে না। অতএব...অতএব...' সে একটু ঢোঁক গিলে কয়, 'তোমার এ টাকা কোনোদিনই শোধ হবার নয়।' সে অকপট হয়।

সেটা আমি ভালই জানতাম। ঋণ স্বভাবতই অপরিশোধ্য—সবার ঋণই—সব সময়েই। এমন কি আমিও যদি ওর কাছ থেকে দশটা টাকা নিতাম কোনোদিন, তা আর শুধতে পারতাম না ঠিকই। সেই কথা বলে ওকে সান্ত্বনা দিতে চাই।

এবং তার পরেও বলতে যাই, সদুপদেশছলেই—'টাকাটা জমিয়ে রাখলে কাজ দিত ভাই। নিদেন, মাঠে ফেলে ওইভাবে উড়িয়ে না দিয়ে ঐ টাকার রাবড়ি খেতে যদি...।'

'বাজে বোকো না...' বকে দেয় সে-ই আমায়—'টাকা কি রাখা যায় নাকি? রাখতে পারে কেউ? টাকা উড়বার, ওড়াবার, উড়ে যাবার—কখনই থাকবার নয়। জানো ভাই?'

টাকার এ রহস্য আমার অজানা ছিল না। সকলেই জানে। ট্যাঁকে গুঁজে রাখলেও তারা থাকে না, উপে যায় কি করে যে! মাথায় করে রাখলেও থাকবার নয়। হাওয়া হয়। হাতে থাকতে থাকতেই বেহাত হয়ে যায় কেমন করে কখন! এমনি করে হাতাহাতি হয়ে বেহাত হতে হতে তার যাতায়াত।

'যাক্, এই দশ টাকার জন্য তুমি দুঃখ কোরো না। এ টাকাটা ফেরত না পেলেও তোমাকে অন্য রকমে আমি পুষিয়ে দেব।' সে আশ্বাস দেয় আমাকে।

তা, পুষিয়ে দিয়েছিল সে সত্যি। দশ টাকার দশগুণ বললে কমিয়ে বলা হয়, একশ গুণ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—হয়তো পাঁচশ গুণ হতে পারে সাত-পাঁচ জড়িয়ে।

তার কাছ থেকেই রেডিয়োর প্রথম আমন্ত্রণ আসে আমার—তার নিজের গল্প দাদুর আসরে গল্পপাঠের। এবং তার পর থেকে আসতেই থাকে। এবং এক খাসি পাঁচবার জবাই করে—যেটা করা নাকি আমার স্বভাব—সেই একদা রেডিওপঠিত গল্পই (ক'জন কান দিয়ে শোনে আর? আর শুনলেও মনে করে রাখতে পারে? ভূ-ভারতে এমন শ্রুতিধর কে আছে?) পরে পত্রিকায় ছেপে বই-এ বার করে পাঁচ গুণ লাভ কি আর হয়নি আমার?

এইভাবে এনতার কামিয়েছি। সেদিক দিয়ে ধরলে প্রায় পুষ্যিপুত্তুরের মতই আমার নিয়মিত খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সে।

যদিও আমার এমনি বরাত, ভাগ্যের অনুগ্রহ লাভের সাথে সাথে বিড়ম্বনাও থাকে বুঝি তার হাত ধরে।

বেতারের আসরে প্রথম পদক্ষেপেই বিপর্যয় ঘটলো আমার।

নৃপেনের জরুরি চিঠি পেলাম হঠাৎ—বেতারের কার্যালয়ে তার সঙ্গে মোলাকাত করতে বলছে তৎক্ষণাৎ।

গার্সটিন প্লেসে ক্লাইভের আমলের পুরনো এক বাড়িতে বেতারের আসর বসত সেকালে। খুঁজেপেতে সেখনে গিয়ে হাজির হলাম একদিন।

যেতেই সে একটা চুক্তিপত্র আমার হাতে তুলে দিল। তার সেই আসরে কয়েক মিনিটের গল্পপাঠের আমন্ত্রণী।

এবং তার দক্ষিণা—ত্রিশ টাকা, গল্প পাঠ, নগদ। সেটাও সেই চুক্তির সঙ্গে উল্লিখিত। চুক্তিনামাটা দেখি, নানান নিয়মকানুনে বিড়ম্বিত, তার মুখ্য স্থলে আমার পাঠতব্য গল্পটার নামটাও নির্দেশ করা রয়েছে—'সর্বমত্যন্তম্—' অত্যন্তম্-এর পরে মোক্ষম্ এক ড্যাশ।

'গল্পটার নাম। তুমি যেটা পড়বে তারই শিরোনামা লিখে দেওয়া হয়েছে। এই নামের সঙ্গে খাপ খায় এমন একটা গল্প তোমাকে লিখতে হবে এখন।'

'ওব্ বাবা!' শুনেই আমি চমকাই।

'ঘাবড়াবার কী আছে ? আমরা আগে গল্প লিখে তার পরে তার নাম লাগাই, এখানে আগেই নাম বসিয়ে তার পর গল্পটা বাগানো—এই তো! লাগাম তো পেয়েই গেলে, এখন জুতসই একটা গল্পের ঘোড়া এনে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কেবল। সেটাই তোমার দায়। এ আর তুমি পারবে না ?'

পারব কি না ভাবি। এতকাল গল্প লিখে তার পরে নামকরণ করেছি, এখন আগে নাম ফেঁদে পরে তার গল্পটা ফাঁদা, এ আবার কেমনতর ফাঁদ—কী ফ্যাসাদ...কে জানে। ঘোড়ার লাগামটা তো আগাম বাগালাম, এখন তার ল্যাজামুড়ো মেলাতে পারলে হয়! পারব কি না খোদাই জানেন!

কিন্তু এতগুলো টাকাও তো ফ্যালনা নয়! সই দিয়ে চুক্তি নিয়ে বাসায় ফিরলাম—শেষ পর্যন্ত শহীদ হবার জন্যই বুঝি বা!

'নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে আসবে, তার কোনো অন্যথা না হয় যেন। বরং আধঘন্টাটাক আগেই এসো তুমি। গল্পটা পড়ে দেখব তো, তোমার একটু রিহার্সাল দেওয়ারও দরকার হতে পারে।' বেশ করে মনে করিয়ে দেয় নৃপেন : 'বেতারে এর আগে পড়োনি তো কখনো।'

বাসায় ফিরে ভাবতে বসলাম। কী লেখা যায় ? ভাবনায় কাতর হয়ে কাত হলাম অবশেষে— কিন্তু যে গল্পরা এতদিন অকাতরে এসে আমাকে দেখা দিয়েছে, তাদের কারো একটার টিকিরও নাগাল পাওয়া গেল না।

নামটা তো বেশ ফলাও করা। এখন কলাকৌশলে কোনোরকমে নামসই একটা গল্প ফলানো বইতো নয়। 'সর্বমত্যন্তম্—' নামখানি তো হয়েই রয়েছে, এর সঙ্গে জুতমতো মজবুত মতো একটা কাহিনী আমদানি করা কেবল। খাপ পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে তলোয়ারের খাপ খাওয়ানোটা বাকী। একটা বেখাপ্পা ঠেকলেও এইটুকুই দায় আমার।

কিন্তু নিতান্ত সহজ দায় না। দায় সারা সহজ নয়। মগজ থেকে কিছুতেই কোনো গল্প আদায় করা যায় না! যতই কলা ফলাই, কৌশল খাটাই, আদায়-কাঁচকলায় হয়ে যায় শেষটায়।

লাগাম আগাম মিললেও ঘোড়া আমার কিছুতেই আগায় না। কিন্তু ঘোড়া না দেখে কেবল লাগাম দেখেই খোঁড়া হওয়া সাজে কি? তীরে এসে তরী ডুববে আমার? তীর্থে এসেও সৌভাগ্যলক্ষীর দর্শন পাব না!

ভাবনার কূল পাইনে সত্যিই! গল্প তো লিখেছি, কিন্তু এ ধরনের গল্প কখনো লিখিনি। ছোট্ট একটুখানি বীজের থেকে বড় বড় মহীরূহ গজিয়ে ওঠে, লোকে বলে থাকে, আমি নিজের চোখে কখনো দেখিনি বটে, তবে লোকের কথায় অবিশ্বাস করতে চাইনে! তবুও একথা আমি বলব যে গাছের বেলা হয়ত তা সত্যি হলেও, গল্পের বেলায় তা করতে যাওয়া দারুণ দুর্ধর্ষ ব্যাপার। নামমাত্র বীজের থেকে গোটা রামায়ণ বার করে আনা, বাল্মীকিসুলভ আর যার হোক, আমার না।

বলব কি মশাই, যতই প্লট ফাঁদি আর গল্পই বাঁধি না, আর যত রকম করেই ছকতে যাই, ছক্কা হয় না কিছুতেই! কোনো মতেই গভীর জলের থেকে মৃগেলকে টেনে তুলে নিজের পথে আনতে পারি না। কোন্ বনের হরিণের মত সে পালিয়ে বেড়ায়, আমার মায়াজালে সেই মায়ামৃগ ধরাই দিতে চায় না। মরীচিকা হয়ে থাকে, মৃগয়া হতে আসে না মোটেই।

ওই 'সর্বমত্যন্তম্—' এর সঙ্গে কিছুতেই কিছু খাপ খাওয়ানো যায় না। একটা গল্প লিখতে গিয়ে ভাবতে একশ'টা গল্প এসে যায়, এমন মুশকিল! মনের মধ্যে গল্পের একশা আর মনের মত আর প্রত্যেকটাই, কিন্তু নামের মতন একটাও না!

ভাবতে ভাবতে সাত রাত্তির ঘুম নেই, এমন কি দিনের বেল্যাও দু'চোখ বুজতে পারি না। চোখের কোলে কালি পড়ল, মাথার চুল সাদা হতে শুরু করল। আদ্ধেক চুল টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেললাম, টাকার চিন্তায় এই করেই বুঝি টাক পড়ে সকলের? যাদৃশী ভাবনার্যস্য...এমনি করে পড়া টাকের পরেই অর্থসিদ্ধিটা আসে তারপর—ভাবনা মাফিক! যাই হোক, আমার বরাতে চুলও গেল কিন্তু চুলচেরা এত খতিয়েও সেই গল্প এল না—ত্রিশ টাকার মওকা তেমনি সুদূরপরাহত রয়ে গেল! কামড়ে কামড়ে ফাউন্টেন পেনের আধখানা ভুঁড়ির গর্ভে গেল আমার। কত গল্পই এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এল আর গেল কিন্তু কোনোটাই ওই নামের সঙ্গে খাটল না।

তখন আমি নিজেই খাটলাম—আমাকেই খাটিয়া নিতে হোলো শেষটায়।

শুয়ে শুয়ে আমার খাতার শুভ্র অঙ্ক কলঙ্কিত করতে লাগলাম। আমার অনাগত গল্পের আষ্টেপৃষ্টে ললাটে কতো কী যে আঁকলাম আমি! অঙ্কনের আলপনায় গল্পের কল্পনারা ধরা দিতে লাগল। রেখায় রেখায় দেখা দিল—কখনো একক, কখনো বা জোড়ায় জোড়ায়। কী না আঁকলাম খোস মেজাজে—কাকের সঙ্গে বক জুড়ে, বাঘের সঙ্গে কুমীরের কোলাকুলি বাধিয়ে, হনুমানের সঙ্গে জাম্বুবানকে জর্জ্জরিত করে, বকের সঙ্গে কচ্ছপের মচ্ছবে সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার! বিতিকিচ্ছিরি!

সব জড়িয়ে ইলাহী কাণ্ড এক! কী যে ওই সব ছবি—তার কিচ্ছু বুঝবার যো নেই, অথচ বুঝতে গেলে অনেক কিছুই বোঝা যায়। গুহা-মানবরা একদা যেসব ছবি আঁকতো, এবং মানুষের মনের গুহায় মনশ্চক্ষুর অগোচরে, অন্তরের অন্তরালে তার অবচেতনায় এখনো

যেসব ছবি অনুক্ষণ অঙ্কিত হচ্ছে, মনের সেই সব আঁকুপাঁকু—নিদারুণ এক গুহ্য ব্যাপার। মনের গর্ভপাত সেই সব দৃশ্য আমার দুঃস্বপ্নের মধ্যেও এসে হানা দিতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে—আরেক উৎপাত!

মানুষ পাগল হয়ে গেলে যেসব ছবি আঁকে অথবা যে সব ছবি আঁকবার পরেই পাগল হয়ে যায়। বনমানুষরা যে ধারায় সভ্যতার পাড়ায় এসে পৌছেছে—যার ধারণায় মহৎ,লেখকরা মহত্তর শিল্পী বনে যান শেষে—সেই সব হেস্তনেস্ত কান্ড! তারই হিস্ট্রি জিয়োগ্রাফি—তাবৎ হদিশ!

অবশ্যি, নির্দিষ্ট দিনক্ষণের আগেই আমার সেই চিত্রকাহিনী শেষ করতে পেরেছিলাম। আর, সেই বিচিত্রিত গল্পটার—সর্বমত্যন্তম্—ড্যাশ—উইদিন ইনভার্টেড কমা'র শিরোনামার ঠিক নীচের থেকে শুরু করে গল্পের অন্তিম পৃষ্ঠায় আমার নাম স্বাক্ষরের ওপর অবধি কেবল ওই সব ছবি— ওই পাগল-করা ছবি সব! পাতার দু'ধারেই-মার্জিনও বাদ নেই তার—মার্জনা নেই কোনোখানেই।

অবশেষে যথাসময়ে নৃপেনের কাছে গিয়ে হাজির।

'এনেছো গল্পটা? যাক্, বাঁচালে বাবা! যা ভাবনায় ফেলেছিলে না! দেখি, দাও।' সে হাত বাড়ায়।

গল্পটা হাতে নিয়ে সে চমকে উঠেছে তক্ষুনি--'এ কী হে! এসব কী তোমার। এতসব আঁকিবুকি কিসের?'

'আমি কী জানি! কী যে এসব আমি কি নিজেই তার কিছু জানি নাকি!' আমি জানাই, 'মনের উৎস থেকে উৎসারিত ভয়ঙ্কর মহামহিম কিছু হবে হয়ত...নতুন ধরনের কোনো অঙ্কনরীতির নয়া ধারার শিল্পশৈলী এই রকম কিছু একটা হবে বোধহয়...এখন কিচ্ছু টের পাওয়া যাচ্ছে না, পরে এককালে এই নিয়ে দারুণ হইচই পড়তে পারে! পড়বে হয়তো, দেখো তুমি।'

'ধুত্তোর! গল্পটা কোথায়? তোমার গল্পটা কই হে?'

'কেন, ঐ যে পাতার মাথায়—তোমার দেওয়া শিরোনামার পাশটাতেই গল্পটা গোটা গোটা অক্ষরে উজ্জ্বল করে দাগা। দেখতে পাচ্ছ না?'

তখন সে দেখতে পায়। দাগাও পায় বোধ হয়। সর্বমত্যন্তম্-এর পাশে ড্যাশের ফাঁকা জায়গাটায় মোটা মোটা আখরে গাঢ় করে দেগে দেওয়া কথাটা...একমাত্র কথাই একটা কথাই— মাত্রা ছাড়িয়ে চোখের ওপর জ্বলজ্বল করছিল!

'ধ্যাৎ!' বেশি আর কিছু না বলে ঐ এক কথাতেই সে নিজের ধিক্কার জানায়।

'হ্যাঁ, ঐ গর্হিতম! ওটাই—আমার গল্প। ঐ কথাটা দিয়েই তোমার দেওয়া নামটার আমি ফিল্ আপ দি গ্যাপ্ করে দিয়েছি। তোমার সর্বমত্যন্তম্-এর পরে আমার ঐ গর্হিতম! সত্যি ভাই, ভেবে দেখলে গর্হিত ছাড়া কী আর? ছোট দরের—ছোটদের লেখক—পাঁচ সাত টাকার গল্প লিখে খাই, প্রাংশুলভ্য ফললোভী বানরের ন্যায় তোমার ঐ ত্রিশ টাকার দক্ষিণার জন্য উদ্বাহু হওয়া আমার পক্ষে গর্হিত ছাড়া আর কী? তাই ওই কথাটাই ভালো করে খোদাই করে আমার এই দারুণ খোদকারি শেষ করেছি!

॥ আটাত্তর ॥

নৃপেন তার পরেও আবার প্রোগ্রাম দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু প্রথমটার মতন লেখার নাম আগের থেকে দেগে দেয়নি ফের অমন। নতুন করে দাগা আর দেয়নি সে আমায়। এর পরে তার চুক্তিপত্রগুলোয় 'এ হিউমারাস স্টোরি বলেই উল্লেখ থাকত মাত্র। আমারও লেখার কোনো অসুবিধা হত না।

একটা গল্প লিখে তার দুটো কপি করে (হোরাবার ভয়ে নয়, আরো একটু বেশী জেতবার মতলবেই এক গল্পের দুটো কপি করা) একটা কপি মৌচাকে নগদ বেচে অন্য কপিটা বেতারে পড়ে দিয়ে চেক নিয়ে আসতাম।

আসতাম সেই মৌচাকেই আবার। কেননা, ক্রস চেক ভাঙাবার কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না আমার, কোনো কালেই নেই, সে কারণে আমার বরাতে কখনো ঐরূপ ঘটলে সুধীরবাবুর কাছেই আসতে হত আবার। তিনি অম্লানবদনে চেকটা ভাঙিয়ে দিতেন—শুধু চেকের পিঠে আমার সই করিয়ে নিয়েই তাঁর এই পৃষ্ঠপোষকতা।

আবার একদিন নৃপেনের সঙ্গে দেখা হল আমার—ওই পথেই। সেই রকম উসকোখুসকো চেহারা, ভাবগর্ভ মুখচোখ—উদাস উদাসীন। মৌচাকের থেকে আসছিলাম, থোকথাক ছিলও কিছু পকেটে, কিন্তু ওকে মুখোমুখি দেখেও আমার সন্ত্রস্ত হবার কিছু ছিল না। বরং ওর উপকারের ঋণ যৎসামান্য উদ্ধারলাভ হয়, কে তাতে পেছোয়?

কিন্তু সে, সুযোগ হয়নি আর আমার। নৃপেন তারপর কোনোদিনই আমার কাছে কিছু ধার চায়নি কখনো।

'কোত্থেকে আসছ হে?' সে শুধোলো।

'কোত্থেকে আর? সেই মৌচাক।'

'মধু সংগ্রহ হল?'

'হল বইকি কিঞ্চিৎ।'

'গল্প বেচে? এ মাসে যেটা আমার আসরে পড়তে যাচ্ছো, সেইটেই বেচে দিয়ে এলে আগাম?'

'ধরছো ঠিক। সেই পাঠ্যই বটে—একবার মাথার দিকে কাটো আরেকবার লেজের দিকে। রেডিও পাঠ্যই হোক আর যাই হোক, কোনো বস্তুকে নানা অর্থে না পেলে আমার পাঠতৃষ্ণা মেটে না। পাঠওয়ালার প্রিভিলেজ।'

'ওটা কিন্তু নিয়ম নয়, তা জানো? চুক্তিপত্রের পেছন দিকটা পড়ে দেখেছো?'

'দেখেছি বই কি। সেই জন্যে গল্পটার নাম বদলে দিতে হয় আমায়। গোড়ার দিকটা পালটে দিই। কলেবরও বদলে দিতে হয় একআধটু। আর দেহান্তর ঘটলেই নামান্তরে কোনো দোষ হয় না। যেমন, যিনিই রাম তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ—একই প্রভু ভিন্ন দেহে, নামান্তরে—তাই না? আমারটাও প্রায় সে-রকম আর কি।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু—' আমার কথায় তবুও ওর কিন্তু কিন্তু থাকে।

'কিন্তু আবার কী? অবতারভেদে যেমন একই ভগবত্তা, আমার বেলাও প্রায় তাই একই গল্প বিভিন্ন অবতারণায়। তা ছাড়া, মৌচাকে ছাপানোটাই তো আমি রেডিয়োয় পড়তে যাচ্ছিনা, আগে বেতারে পড়ছি, তার পরে মৌচাকে বেরুচ্ছে। এ মাসেই যে বেরুবে তার

কোনো ঠিক নেই, কবে যে বার হবে কে জানে। সে সুধীরবাবুর মর্জি।'

'কিন্তু আমার আসরের ছেলেমেয়েরা যদি ধরতে পারে... আর তার পরে জানিয়ে দেয় রেডিয়ো আপিসে...ওপরওলাদের কাছে কমপ্লেন গেলে।...'

'কোনো ভয় নেই, তেমন শ্রুতিধর স্মৃতিরত্ন বালক বাংলাদেশে জন্মায়নি এখনো। পড়াশোনায় সমান টান এমন কেউ অতি বিরল। পড়ার পরে মনে থাকে, শুনলেও মনে রাখে এমন কাউকে আমি তো ভাই দেখিনে আজকাল।'

'তা হলেও তোমাকে বলা আমার কর্তব্য, জানিয়ে দিচ্ছি তাই, ধরা পড়লে কিন্তু তোমাকে আর কোনো প্রোগ্রাম দেওয়া যাবে না। বেতারের ব্ল্যাক লিস্টে নাম উঠে যাবে তোমার, মনে রেখো।'

'ওঠে উঠুক, প্রোগ্রাম না পাই তো কী আর করব? কিন্তু এটা তোমার রেডিয়োওলাদের ঠিক নয় ভাই। না না, আমি প্রোগ্রাম দেওয়া না দেওয়ার কথা বলছি না, আমি বলছিলাম, ওই ত্রিশ টাকা মাত্র দিয়ে বস্তুত লেখাটার সর্বস্বত্ব দখল করে রাখার কথাটাই। একটা লেখার সঙ্গে কত রকমের রাইট জড়ানো থাকে জানো? তার অনুবাদ স্বত্ব, গ্রামোফোন স্বত্ব, ড্রামাটিক স্বত্ব, প্লে-রাইট, ফ্লিম-রাইট, কখনো যদি এদেশে টেলিভিসন হয় তা হলে সেই টেলিরাইটও। কেবল রেডিওরাইটের নামমাত্র দক্ষিণা দিয়ে ওই সব অন্য রাইটগুলো ব্যবহার না করলেও ঐভাবে আটকে রাখাটা ঠিক কি?'

'ঠিকঠাক করার মালিক আমি নই। আমার তোমাকে বলা কর্তব্য তাই বললাম, তোমার যা দরকার করবে। যাক্ গে, সুধীরবাবুর দোকানে আর কে কে আছেন এখন? কাকে কাকে দেখলে ওখানে?'

'খেয়াল করে দেখিনি। তবে সুধীরবাবু রয়েছেন। বসিওনি, আড্ডাও দিইনি, এক মিনিটের কাজ আমার। গেলাম, লেখাটা দিলাম, তারপরে শ্বেতপত্রের প্যাডটা খুঁজে বার করলাম, গল্পের নাম, দক্ষিণার পরিমাণ যথাস্থানে বসিয়ে সই করে তাঁকে দিতেই তিনি ড্রয়ার থেকে টাকাটা বার করে দিলেন। আমারও পত্রপাঠ বিদায়।...অবাক হচ্ছ কি? আমার ভাউচার লেখার কষ্টটুকুও তাঁকে আমি করতে দিইনি। অনেক কষ্টে টাকা পেতে হয় ভাই, তাই এ কষ্টটুকুও আমিই স্বীকার করি।'

'বেশ করো।' আমার করিৎকর্মের কুশলতায় তাকে একটু খুশি মনে হয়।

'তুমি যাচ্ছো নাকি মৌচাকে? যাও না, সুধীরবাবু এখন দোকানেই তো। একটুখানি বসলে পরে আরো অনেককে পাবে ওখানেই। অচিন্ত্য প্রেমেন প্রবোধ...ওরাও আসতে পারে।'

নৃপেনের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না—'এখন গেলে আমার হবে না, টাকার দরকার আমার। অন্য কারো সামনে সেটা হবার নয়।'

'তবে এখনই যাও না! তেমন কেউ আসেনি এখন...'

'আমার তো তোমার ওই পাঁচ-দশ টাকার গরজ নয় ভাই। আমার চাহিদা অনেক, আমার খিদে ওতে মিটবে না। আরো চাই আমার।'

'চাইলেই পাবে—যাও না। আমার মতন এখনই লেখা দিয়ে নিতে হবে যে তাও না, সুধীরবাবু তোমাকে স্নেহই করেন। পরে লিখে দেব বললেও হবে।'

'না, যাব আমি। তবে এখন নয়। ওঁর বাড়িতেই যেতে হবে আমাকে। রাত্তিরে। রাত বারোটার পরে।'

'বারোটা বাজাতে যাবার কী প্রয়োজন ? আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'আমার বৌয়ের শক্ত অসুখ যে! এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে না? কেবিনে নিতে হতে পারে।'

'ওমা, তাই নাকি ! তা হলে খুব জরুরি দরকার বলতে হয়—জরু-র দরকার যেকালে। এখনি তুমি যাও তবে, ওঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলবে এখন।... আহা, সেই জন্যেই তোমার এই চেহারা, উসকোখুসকো চুল, চান করোনি, তেল দাওনি মাথায়, এমনতরো মুখচোখ। আগে আমি বুঝতে পারিনি ভাই।'

'না, এখন গেলে হবে না। যথাসময়ে যেতে হয়। বিপদের কি সময় অসময় আছে ? বিপন্ন মানুষের অযথা সময়ই হচ্ছে যথাসময়। সুধীরবাবুর কাছে যেতে হবে আমাকে ওই বারোটার পরেই...'

'তখন তো খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছেন উনি।'

'সেইটেই হবে ঠিক সময়। বিপদগ্রস্ত লোকের কি মাথার ঠিক থাকে নাকি ? আমার মাথা ঠিক থাকলেও, চুলের ঠিকঠাক থাকবে না—আরো উসকোখুসকো করতে হবে এগুলোকে। তারপর বেছে বেছে ওই সময়ে, বারোটায় কি তারও পরে গিয়ে হানা দেব তাঁর বাড়ি...ঘুম থেকে উঠে ঢুলতে ঢুলতে নিচে নেমে এলেই বেশি আমায় বলতে হবে না আর, আপনার থেকেই আমার বিপদটা হৃদয়ঙ্গম হবে। ওই আন্‌আর্থলি টাইমটাই আমার বিপন্নতার সাক্ষ্য দেবে—বেশি চিন্তা বিবেচনার সময় তিনি পাবেন না, সেফ খুলে হাতের কাছে যা পান, দুশো পাঁচশো, দিয়ে দেবেন তৎক্ষণাৎ।'

'তৎক্ষণাৎ ?'

'নিশ্চয়। অমনি করে অমন সময়ে গিয়েই চাইতে হয়। তা হলেই হয়ে যায়। খুব সহজেই হয়। আর কিছু না হোক, অসময়ের এই আপদ বিদেয় করার জন্যেও, নিজের ঘুমের গরজেই, বিনাবাক্যব্যয়ে টাকাটা দিয়েই বিছানায় গিয়ে তিনি কাত হতে চাইবেন তক্ষুনি।' একটু থেমে সে বলে, 'মোটামুটি পেতে হলে এমনি অসময় বেছে বেছে যেতে হয়।'

'তাই নাকি ? তা তুমি এভাবে আরো নিয়েছো নাকি ওঁর কাছে ?'

'কতোবার ! আর খালি ওঁর কাছেই কি ! আরো কি আমার প্রকাশক নেই নাকি ? সবাইকে এইভাবেই বধ করতে হয় !'

লেখক আর প্রকাশকের সম্পর্কটা খাদ্য-খাদকের, এমনধারা একটা কথা কোথায় যেন শুনেছিলাম ! পরস্পরকে খেয়ে ওরা বেঁচে থাকে। কথাটা মিথ্যে নয় দেখছি। প্রকাশকরা যেকালে লেখককে তিলে তিলে মারেন, প্রকাশককে মারতে হলে লেখককে যেখানে তালে তালে থাকতে হয়। যেমন নৃপেনের এই তালটা।

'তোমার বৌয়ের কোনো অসুখবিসুখ হয়নি তা হলে ? বাঁচলাম।' আমি হাঁফ ছাড়ি।

'হয়নি, তবে হবে। হতেই থাকবে। হাসপাতালে তো ভর্তি করি এখন। ফ্রি বেড পাব না, জানা কথাই। কেবিন নিতে হবে। কেবিনের খরচা বহুৎ। ওষুধপত্র কেনার, নার্স রাখার অনেক দায়। সে সব দায় আমার সামলাবে কে ? ওই সুধীরবাবুরাই। তারপর তার অপারেশন রয়েছে। কতো কী আরো। তারপর সে মারাই যাবে হয়তো বা—তার খরচা নেইকো ? কদ্দিন আর ধরেবেঁধে তাকে বাঁচানো যাবে ? বার কয়েক হাসপাতাল কেবিন

করার পর বাধ্য হয়েই তাকে মারতে হবে আমাকে। তখন ঘাটখরচা, গাঁটগচ্ছা আরো আরো। আমার কী! ওই প্রকাশকের, মানে, সুধীরবাবু প্রমুখদের। তবে ওই উনিই মুখ্য।'

'কিন্তু বৌ মরলেই তো ফুরিয়ে গেল ভাই।' আমার আশঙ্কা জানাই। —'তখন?'

'বৌ কি ফুরোয় কখনো? মরলেই কি ফুরিয়ে যায় সব? বৌরা অফুরন্ত। সে সব দিক ভেবেই আমি দু-দুটো বিয়ে করে রেখেছি। একবার এটার, একবার ওটার দায়ধাক্কা সামলাই...'

'আর ধারাবাহিক তোমার যতো বায়নাক্কা সেই সঙ্গে!' আমি কই, 'কিন্তু বার বার তোমার পালে বাঘ পড়লে কথামালার সেই রাখালের দশা—সেই দুর্দশা না দাঁড়ায় আবার! তার না হয় গরুর পাল ছিল, কিন্তু তোমার তো আর জরুর পাল নেই। দুটি মাত্র সম্বল। দুটো গেলেই খতম! তোমার নটের গাছটিও মুড়োলো-সব গল্পই ফুরোলো।'

'না, তা হয় না! তা হবার নয়। বিবাহিত লোকদের প্রতি বিবাহিত ব্যক্তির সহানুভূতি থাকেই, অনিবার্যই থাকে, না থেকে যায় না। বৌকে নিয়ে ভুগতে হয় সবাইকে, সবার বৌয়েরই অসুখ-বিসুখ লেগে রয়েছে—তাই নিয়ে ভোগান্তি সবাইকার। সকলেই হদ্দমুদ্দ ভুক্তভোগী। তাই, শুধু সহানুভূতি হয় কেমন একটা ফেলোফিলিং রয়ে গেছে তাদের ভেতর। ফল্গু স্রোতের মত অন্তরে অন্তরে ওতপ্রোত—সকলের। পরের দুঃখে কাতর হয়ে নয়, নিজের দুঃখের কাতরতা অনুভব করেই পরস্পরকে তারা সাহায্য করে। নিজের বৌয়ের কথা ভেবেই আমার বৌয়ের দুঃখটা তাঁরা ফীল করতে পারেন।'

'আর তোমায় ফুলফিল করেন?'

'এটাও এক রকমের স্ত্রৈণতা বলেই আমার বোধ হয়। হয়ত বা পরস্ত্রীকাতরতাও বলা যায়। তবে সদ্‌ভাবের সাত্ত্বিকতায় এখানে ব্যক্ত, হয়ত এর আবার রাজসিক তামসিক দিকও থাকতে পারে—সেটা তামাশার কিছু না। তবে তা নিয়ে কিছু বলছি না...।

'তুমি স্ত্রীভাগ্যে ধনী হে নৃপেন। তুমি ভাগ্যবান!'

বলতে গিয়েই আমার খটকা লাগে। খট্ করে লাগে যেন কোথায়। গ্রীনরুমের নেপথ্যে বলা শরৎচন্দ্রের সেই কথাটা মনে পড়ে যায়...'শিবরামের ফের টাকার দরকারটা কিসের! ছেলেপুলে নেই, বৌ নেই, সংসার নেই—টাকার আবার কী দরকার তার!'

সেই অফেলো-ফিলিংসুলভ তাঁর কথাটার মূল তত্ত্ব তাহলে এখানেই। অবিবাহিতরা দুনিয়ার সবার বিলকুল সহানুভূতি-বর্জিত।

স্ত্রীভাগ্যে ধন! বলেই দিয়েছে—তুমি জানতে না?' নৃপেন আমাকে শুধায়।

'শোনা ছিল বটে কথাটা, কিন্তু তার মানে যে এই তা আমার জানা ছিল না ঠিক। আমি স্ত্রীভাগ্য বলতে ভেবেছি অন্যরকম....মানে, কুমারী অবস্থায় মেয়েরা তো নেহাত গরীব থাকে। একটা পয়সাও পায় না কখনো কোথাও। ছেলেরাই মা'র সবটা আদর পায়, কেড়ে-কুড়ে খায়, জোর করে আদায় করে সব কিছু-টাকাপয়সার দরকার পড়লে ইচ্ছেমতন বাপ-কাকার পকেট মারে। মেয়েরা তো তা পারে না! পারতেও চায় না। তারা গোধূলি লগ্নের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে। সেই ছাঁদনাতলায় গিয়ে ওতরালে, কোনোরকমে কারো কণ্ঠলগ্ন হতে পারলে একবার—কে পায় তাকে আর? চিরদিনের মতই তার দুঃখ-নিশি পোহায়। স্ত্রী হলেই সে ধনী হয়ে যায়—তার ভাগ্য ফিরে যায় এক নিমেষে—বরাত খুলে

যায় হঠাৎ। হস্তগত বরের রোজগারের সব টাকাটা মাসকাবারে তার আঁচলের খুঁটে এসে বাঁধা পড়ে, অন্য খুঁটে বাঁধা থাকেন স্বামীরত্নটি। খুঁটোর জোরে গরু লাফায়, আর ওই খুঁটোর জোরে জরুরা। তাদের মতন ধনী আর কে তখন। স্ত্রীভাগ্যে ধন, তার মানে আমি এই ভেবেছিলাম—স্ত্রীর ভাগ্যেই। ভাগ্যে কারো স্ত্রী হতে পারলেই ধনী তখন।'

এই কারণেই মেয়েরা বুঝি ধনি-রূপে সম্বোধিত হয়ে থাকে। পদাবলীর কথাটাও আমার মনে পড়ে....'যব্ গোধূলি লগন বেলি/ধনি মন্দির বার ভেলি/নবজলধরে বিজুরি চমক/দ্বন্দ্ব পসারি গেলি'/আমার মনে প্রতিধ্বনিত হয়।

'তোমার কথা যেমন উল্টোপাল্টা, তোমার মাথাও তেমনি উল্টোরকম....' বলে সে হাসতে থাকে—'যাক গো, এবার তাহলে তোমার নিজের ভাগ্যও ফিরিয়ে নাও না। মাথা খাটিয়ে আমার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে দাও!'

'কী করে লাগাবো? বৌ কোথায় আমার? বিয়েই করিনি যে!'

'বিয়েই করোনি! একটাও না? তাহলে আর কী হবে!'

আমার স্ত্রীবিয়োগে সে যেন ব্যথিতই বোধ হলো।

'কিছুই হবে না। আমার ভাগ্যে অর্থযোগ নেই, জানি আমি। আমার জীবন নিরর্থক। কী করবো?'

'কী করবে! একটা বিয়ে করে ফ্যালো। আবার কী?- সত্যি সত্যি না হলেও, মিথ্যে মিথ্যে, নইলে তোমার বরাত খুলবে না। দশ পাঁচ টাকার এই উঞ্ছবৃত্তি করেই কাটাতে হবে সারাজীবন।'

এখন আমার মনে হয়, নৃপেনের কথাই ঠিক। স্বভাবতই সপত্নীকদের প্রতি দরদ সবার। আমি যদি পত্নীবান হতাম তাহলে সুভাষচন্দ্র কি হেমেন্দ্রপ্রসাদ অমন করে এক কথায় বা বিনা বাক্যব্যয়ে আমায় বিদায় দিতে পারতেন কি কখনো? আমার প্রতি মমতা না থাকলেও অন্তত এই টাকাটা গেলে আমার বৌ-ছেলের কী হবে, তা ভেবেও ওঁরা একটু ইতস্তত করতেন বইকি।

নৃপেনের যেকালে নিজের বৌ ভাঙিয়ে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনার প্রাপ্তিযোগ, সেখানে আমার এই ব্যাঙের আধুলি কোনো ব্যাংকেই ভাঙানো যাচ্ছে না, সর্বত্রই আমার জন্য অর্ধচন্দ্র!

॥ উনাশি ॥

চোরবাগানের চৌহদ্দিতে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের মোড়টাতেই ছিল রমেশবাবুর (কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন) কবিরাজখানা। সেখানেই ছিল তাঁর স্থাপিত একদাবিখ্যাত সাহিত্যসেবক সমিতি। সাহিত্যছত্রের পদাতিক কবি থেকে রাজতুল্য লেখকরাও এসে জমতেন—তাঁর সেই কবিরাজী আড্ডায়। নিয়মিত ভাবেই ঐ সমিতির বৈঠক বসত; সাহিত্যিকদের ওঠা-বসা যাওয়া-আসা গল্পগুজব চলত প্রায় সব সময়। আমিও মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে ওঁদের সাহিত্যভোজে খাদ্যাখাদ্যের অংশ নিয়েছি—সাহিত্যের সেই কবিরাজী কাটলেট—উইথ্ এ পিন্‌চ অব ভাস্কর লবণ।

কবিরাজখানার উলটো দিকের বাড়িতে ছিল রমেশবাবুর পারিবারিক আস্তানা, আর রাস্তার এক কিনারে ছিল ছ্যাকরা গাড়িদের আস্তাবল। সেখানকার ঘোড়াদের গোবরের গন্ধামোদিত

বৈঠকে বসে কবিরাজী মোদকের সঙ্গে লেখকরা সাহিত্যরসে আমোদিত হতেন। একরকম অশ্বগন্ধা রসায়নের মতই সঞ্জীবনী বলা যায়।

রমেশবাবু যেমন ভালো কবিরাজ ছিলেন তেমনি ছিলেন ভালো লেখক। কুরপালা ইত্যাদি কয়েকখানা উপন্যাস আর চমৎকার কতকগুলি ছোট গল্প লিখে গেছেন—কিন্তু বই আকারে সেগুলি এখন আর পাওয়া যায় না বোধহয়। সাহিত্যসংসদ বা বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের মতন কোনো প্রতিষ্ঠান তাঁর রচনাগুলি একত্রে গ্রন্থাবলী আকারে বার করলে ভালো হয়। তাঁর সাহিত্য স্থায়িত্বলাভের অপেক্ষা রাখে।

সাহিত্য ক্ষেত্রের নবাগত অনেক লেখককে তাঁর সমিতির সহায়তায় প্রতিষ্ঠালাভে সাহায্য করলেও তিনি নিজে কখনো সামনে এগিয়ে এসে নিজেকে জাহির করতে চাইতেন না। খ্যাতির মোহ কোনদিন তাঁর দেখিনি। সাহিত্যিকসুলভ কোনও অহংকারও ছিল না তাঁর। তাই তাঁর মোহনায় নদ-নদীরা সহজ স্বচ্ছন্দে এসে মিশতে পারতেন।

সেকালে আরো দুটি নামজাদা সাহিত্যিক আসর ছিল—কল্লোল আর শনিবারের চিঠির। ঐ দুই মুখপত্রকে কেন্দ্র করে দুটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যসেবক সমিতির কোনো মুখপত্র ছিল না, ছিলেন মাত্র এক মুখপাত্র-ঐ রমেশবাবুই। মুখ্যত তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই গোষ্ঠী নির্বিভেদে তাবৎ লেখকই তাঁর ঐ কৃষ্টিক্ষেত্রে এসে জমতেন।

প্রেমেনের প্রথম দর্শন পাই এক সিনেমা হলে (তার একটি রচনায় সেই বিবরণী রয়েছে), অচিন্ত্যর সঙ্গে আলাপ জমে ফুটবলের মাঠে, আর কবি নজরুলের সঙ্গে বহরমপুর জেলেই আমার জমজমাট, কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, সতীকান্ত গুহ প্রভৃতির সঙ্গে মোলাকাত আমার ঐখানেই। দরাজ ঐ কবিরাজখানার সঙ্গমস্থলেই বিভিন্ন দলের সাহিত্যিকরা এসে মিলিত হয়েছেন। পবিত্র গাঙ্গুলিও আসতেন ওখানে। শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য, এমনকি প্রেমেনেরও কখনো কখনো পাত্তা পেয়েছি আমি সেখানেই এবং আরো কতোজনার!

আমার যাতায়াতের পথেই ঐ জংশনটা—না জমলেও সেটাই ছিল আমার হল্টিং স্টেশন। কদাচ বা ওয়েটিং রুম।

ঐ বাড়ির দোতলাতেই থাকত আমার বিখ্যাত বোন বিনিরা আর তার কাজিন্ কমল। ওদের জন্যে আমি অপেক্ষা করতুম সেখানে। কমলরা স্কুল থেকে ফিরলেই কেটে পড়তাম সেখান থেকে, বেড়াতে বেরুতাম তাদের নিয়ে, কিংবা পাশেই তাদের সদর দরজার চৌকাঠে বসে আগড়ম বাগড়ম আলাপ চালাতাম আমাদের। পাশের সাহিত্য আলোচনায় জলাঞ্জলি দিয়ে।

সাহিত্যিক বা সাহিত্য আসরের আকর্ষণ চিরদিনই আমার কম। সাহিত্য বা সাহিত্যিক আমার কাছে কখনই আলোচ্য বস্তু নয়, তাদের আলোচনায় গেলে, বীরবলী ভাষায়—আলোর চেয়ে চোনাই বেরয় বেশি। আমার ধারণায় সাহিত্য হচ্ছে, সৌন্দর্যের মতই উপভোগের বস্তু—আস্বাদের জিনিস। এবং সে কাজ একান্তেই হতে পারে—একান্তভাবে করতে হয় যদি।

তাহলেও ঐ সমিতিটি সেই কালে আমার খুব কাজে লেগেছিল। আমার কাছে সাহিত্য আলোচনার জন্য উৎসুক কেউ এলে, হবু সাহিত্যিকরাই বেশির ভাগ, আমি তাঁদের রমেশবাবুর ঐ আড়তে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতাম। রমেশবাবু সানন্দে নিজের সমিতির সভ্য হিসেবে তাদের লুফে নিতেন। আর তারাও মাসিক চার আনা মাত্র চাঁদার বিনিময়ে ঢালাও

আড্ডা আর আলোচনার সুযোগ পেত—সেই সঙ্গে চা কচুরি সিঙ্গারা তো মিলতই : সেদিক দিয়ে ওটা ছিল আমার ডামপিং গ্রাউন্ড।

রমেশবাবুর মত তাঁর ওষুধেরও আমি গুণগ্রাহী ছিলাম। আমার মতই ছিলেন হয়ত আরো অনেকে, কেননা তাঁর বহুমূল্য দাবাই তিনি বিনামূল্যে লেখক-বন্ধুদের দিতে সর্বদাই মুক্তহস্ত। তাঁর ওষুধ খেয়ে কতোবার যে বেঁচে গেছি বলা যায় না। একবার এমন মারাত্মক রক্তামাশায় ধরেছিল যে, সারছিল না কিছুতেই। তাঁর চিকিৎসাতেই রক্ষা পাই। তিনি কী বটিকা আর পাঁচনের ব্যবস্থা করেছিলেন, আর আমার মামাতো ভাই কমল করেছিল বাঁচনের ব্যবস্থাটা। বিনির সাহায্যে বাড়িতে পাঁচন বানিয়ে (কত সের জলে ঐ পাঁচনাদি দিয়ে কিরকম জ্বালের আঁচে কতক্ষণ ধরে ফুটিয়ে জলটা মেরে কতটা থাকতে তা নামাতে হয় যেন—সে এক দারুণ দুষ্কর মহামারি ব্যাপার !) তার সাথে গাঁদাল পাতার ঝোল আর ভাত নিয়ে তার স্কুলের টিফিনের সময় রোজ এসে খাইয়ে যেত আমাকে—মাসখানেক ধরে প্রায়। কিন্তু চিকিৎসাটা অব্যর্থ বলতে হবে, কেননা তার পরে আমার জীবনে ঐ ব্যারাম আর ধরেনি আমায়।

ফোটোগ্রাফিতে আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল কমলের—ঐটুকুন বয়সেই। সেই কালেই সে কোডাকের বাক্স ক্যামেরায় জে. এল. বাঁড়ুজ্যের (কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে কাছাকাছি বাড়িতে তিনি থাকতেন তখন) এমন চমৎকার এক ছবি তুলেছিল যে, বাঁড়ুজ্যেমশাই, তাঁর অসংখ্য ফোটোর ভেতর সেটিকেই সবচেয়ে পছন্দ করতেন। তাঁর টেবিলের ওপর সুদৃশ্য ফ্রেমে সাজানো থাকত ফোটোটা। তাঁর বিখ্যাত নোটবইগুলির প্রকাশক সেনরায় কোম্পানির একেবারের ক্যালেন্ডারে কমলের তোলা জিতেনবাবুর সেই ছবিটিই ছাপা হবার মর্যাদা লাভ করেছিল।

শৈলজানন্দ তখন সাহিত্য বাদে চিত্রজগতে বাদশাহীত্ব করছিলেন। সব্যসাচীর মতন তিনি তখন নিজের কয়েকটি অপরূপ উপন্যাসের পরমাশ্চর্য চিত্ররূপ দিয়েছিলেন—প্রায় সবগুলিই তার হিট ছবি হয়েছিল। পরিচালকরূপে তাঁব খুব নামডাক তখন। তাঁর কাছেই নিয়ে গেলাম কমলকে।

আমার কথায় তক্ষুনি তিনি কমলকে নিজের সহকারী করে নিলেন—একশ টাকার মাস মাইনেয়। সেই কিশোর বয়সেই নিজের নৈপুণ্যে কমল চিত্রকর্মের বিভিন্ন বিভাগে এমন দক্ষতা অর্জন করেছিল যে, তারপরে শৈলজার থেকে স্বতন্ত্র হয়েও সে কয়েকটি ছবি তুলেছিল নিজের পরিচালনায়। তার একটির সঙ্গে আমি একটু বিজড়িত ছিলাম। তার 'রক্তের টান' বইটির, তারই নির্দেশ মতন, সংলাপংশটা লিখে দিয়েছিলাম আমি।

বইটার থেকে মোটামুটি বেশ মুনাফা হয়েছিল আমার। আপনজন বলে অযথা সুবিধা নেয়ার চেষ্টা না করে বেশ টাকাই দিয়েছিল আমাকে। তারপর ওটা বই হয়ে বেরুলেও ফের আমার অর্থাগম হয়েছে।

বইটার প্রথম সংস্করণ সে-ই নিজের খরচে ছাপায়, সঙ্গতভাবেই নিজের নামে, যদিও সংলাপাংশ যে আমার সে উল্লেখও ছিল তার ভূমিকায়। কিন্তু বইটা তেমন বেচতে পারেনি, বই কোথায় কীভাবে বিক্রি হয় তার কোনো ধারণাই ছিল না বেচারার ! নিজের ছবির প্রদর্শনকালে সিনেমা হলেই বইটা চালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার ধারণা, বইয়ের দোকানে সিনেমা দেখানোর মত, সিনেমা হলে বই চালু করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

স্বাভাবিকভাবেই সফল হবার নয়।

কষ্টেসৃষ্টে দু' একশ কাটানোর পর সংস্করণটার বাকি কপিগুলি সে দিয়ে দিল আমাকেই অমনিই। দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমি করলাম কি—টাইটেল পেজে লেখকের স্থলে তার বদলে আমার নামটা বসিয়ে পাতাটা নতুন করে ছাপিয়ে নিলাম আর ভূমিকার উল্লেখ থাকল— মূল কাহিনীটি কমলের। সংলাপ রচনাটুকুই শুধু আমার আর তাও যে তারই নির্দেশ মতই—তাও জানিয়ে একটু বেশি কমিশন দিয়ে ঐ বই-ই ছেড়ে দিলাম বাজারে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পুরো এডিশন। তার পরেও তার কিশোর, বয়স্ক বিভিন্ন সংস্করণে নানা নামে নামান্তরে বইটার কাটতি হয়ে রীতিমতই মোটা উপায় হয়েছিল আমার।

অথচ, ঐ বই সম্পর্কে আগ্রহ ছিল না আদপেই। পরের নির্দেশ মত সংলাপ রচনায় উৎসাহ পাইনি বলতে কি! ঠিক অর্থ লালসাতেই ঐ কর্ম ছিল না আমার, কমলের প্রতি প্রাণের টানেই করেছিলাম, তাহলেও বলতে হয়, রক্তের টানের সুবাদে তখনকার মতন অর্থের টানাটানি থেকে বেঁচে গিয়েছি।

কিন্তু রক্তের টান থেকে মোটামুটি আমার লাভ হলেও কমলের মোটমাট লোকসানই দাঁড়াল। কেবল প্রকাশিত ঐ বইটার থেকেই নয়, প্রদর্শিত ছবিটার থেকেও সিনেমা লাইনের ঘাঁৎঘোঁৎ আর কারবারীদের আচার-আচরণ ভালো মত জানা ছিল না বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে ছবির প্রদর্শনীর থেকে নিজের প্রাপ্য রয়ালটি আদায় করতে পারেনি, প্রায় সকলেই ওকে ঠকিয়েছে, অনভিজ্ঞ আর ভালো মানুষ হলে যা হয়। তাছাড়া নেহাত ছেলেমানুষও ছিল তো! তারপরে বাংলাদেশে (তখনকার পাকিস্তানে) তার ছবিটা খুব চললেও আর জনপ্রিয় হলেও মোটা লাভটাই তাকে গচ্ছা দিতে হয়েছিল নাকি, কি কারণে জানি না, এক পয়সাও তার উদ্ধার করা যায়নি।

কমলের বেলাও দেখেছি, আর শৈলজা, গৌরাঙ্গ, প্রেমেনের বেলাতেও দেখলাম (এমনকি, উদয়ের পথে-র বিখ্যাত ধুরন্ধর লেখক জ্যোতির্ময় রায়ের বেলাও তার কোনো অন্যথা হয়নি) ফিল্ম-কর্মে গোড়ার দিকে দু'পয়সা হলেও মূলে হা-ভাত হয়ে সব উপায়ই কেমন করে যেন উপে যায় হঠাৎ। লাখ লাখ টাকা আমদানির পরেও লোকসানই দাঁড়ায় শেষপর্যন্ত। লাভের কড়ির কিছুই আর হাতে না থাকলেও প্রায় হাতকড়ির মতই অবস্থা হয় হয়ত বা। ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ এর থেকে ফয়দা তুলতে পারলেও অব্যবসায়ী স্বপ্ন-দেখা লেখক ও শিল্পীদের ভাগ্যে পরধর্মের মতই ভয়াবহ হয়ে ওঠে অচিরেই।

এবং তারপরে এই চোট সামলে উঠতে তাদের সময় লাগে বেশ। বিপথে গিয়ে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খাবার পর খাড়া হয়ে পা-র তলায় নিজের ঠাঁই—আগেকার ঠাঁইটি খুঁজে আর পায় না বোধহয়। যথাযথ ভাবে দাঁড়িয়ে যথোচিত ভাবে নিজের মাথা তুলে দাঁড়ানো বুঝি যায় না আর। কোথায় যেন কী হয়ে যায়!

অনেকটা যেন ডুব সাঁতারে অনেকখানি পেরিয়ে আসার মতই। ডুবে ডুবে অনেককাল কাটিয়ে মাথা তুলে হঠাৎ দেখা যায়, কোথায় এলাম রে! এর মধ্যে বিস্তর সময়ের জলাঞ্জলি হয়েছে—কোথায় যেন যাবার ছিল, কোনখানে যেতে এ কোথায় এসে গেলাম! দেখতে পাই, ঠিক পথের থেকে বহুৎ পিছিয়ে পড়েছি। যারা ছিল অনুগামী, অনেক আগেই তাদের অনেকে উতরে গিয়েছে কখন!

অনন্য প্রতিভাধর কেউ কেউ হয়ত এমন ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু সবার পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। অসামান্য শক্তিমান হয়েও আমাদের জ্যোতির্ময় রায় তা পারেননি, এই পথে পা বাড়িয়ে বিপাকে জড়িয়ে বিনত হয়ে নিতান্ত হতাশায় কেবল স্বক্ষেত্র থেকেই নয়, অকালে আকস্মিকভাবে ইহলোক হতেও বিগত হয়েছিলেন—এটা একটা ট্রাজেডিই। কেবল তাঁর নিজের দিক থেকেই নয়, বাংলা সাহিত্যেরও বলতে হয়।

আমাদের কালের এবং কল্লোলের বন্ধুদের মধ্যে কেবল নারাণ গাঙ্গুলিই—খানিকটা গিয়েও ফিরে আসেত পেরেছিলেন যথাসময়ে। ফিলম্ জগতের সঙ্গে অংশত জড়িত হয়েও বিশেষ বিপর্যয়ে পড়তে হয়নি তাঁকে। চিত্রনাট্য আর সংলাপ-অংশ লিখেই তিনি নিরস্ত হয়েছেন, ফিলমি লাইনের হলেও যেটা হয়ত খানিকটা তাঁর নিজের লাইনেও বলা যায়, একেবারে স্বধর্মবিচ্যুতি নয় বোধ হয়, কিন্তু আরো এগিয়ে এই অক্টোপাশের ফাঁদে পা দিয়ে চিত্র-পরিচালনা বা প্রযোজনায় দায় ঘাড়ে নিয়ে ল্যাজে-গোবরে ওতপ্রোত হয় যায়-যায় দশায় গিয়ে তাঁকে দাঁড়াতে হয়নি কখনই। তাই শেষ অব্দি তাঁর সাহিত্যের নবনবোন্মেষ আমরা লক্ষ্য করেছি—সুনন্দর জার্নাল পর্যন্ত। কোনোখানে কিছু বাধা পায়নি কখনো। এবং বেঁচে গেছেন অচিন্ত্য আর বুদ্ধদেব—ঐ মোহিনী মায়ার বাহুপাশ থেকে।

অচিন্ত্য মুনসেফ তখন। সেই মুনসেফির সেফটি ভালব, স্বভাবসুলভ বিচারবুদ্ধিই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আর বুদ্ধদেব বেঁচেছেন নিজের সহজাত প্রতিভায়। এঁদের সকলেই সপ্রতিভ হলেও বুদ্ধদেবের প্রতিভা আবার ডবল তো। নিজের প্রতিভা এবং আরো নিজের। প্রতিভার স্কোয়ার রুট স্বভাবতই প্রবল। সেই চৌকস প্রতিভাই তাঁকে বাঁচিয়েছিল বলে আমার ধারণা। বুদ্ধদেব যদি প্রতিভাবলে বেঁচে থাকেন তো অচিন্ত্য বেঁচেছেন দৈব বলে—তার পরম পৌরুষে। সেটা নিজের পুরুষকারও হতে পারে, আবার পরম পুরুষের দৈবী কৃপা হওয়াও অসম্ভব নয়।

পরমহংসদেব কোথায় যেন বলেছিলেন না যে, বাঘ যাকে ধরে তাকে অন্য কারো ধরবার মতন কিছু আর বাকী রাখে না, তাকে একেবারেই অপরের ধর্তব্যের বাইরে নিয়ে যায় সে।

বিবেকানন্দ আর শ্রী-মর পর যাঁকে তিনি নিজের প্রচারবাহনরূপে চিহ্নিত করে রেখেছেন, তাঁর সেই দাগা দেওয়ার ওপর আর কেউ এসে দাগা বোলায় এমন সাধ্য কার?

তাই তাঁর ওপর দাগাবাজি করাটা একটু অচিন্তনীয়ই নয় কি?

॥ আশি ॥

কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেনের আখড়ায় পবিত্রবাবুই ছিলেন সবচেয়ে পালোয়ান, আখেরই একদিন টের পেলাম।

আমাদের গোটা গ্যাং-এর ভেতর উনিই ছিলেন গুলির মত জোরালো আর জবরদস্ত, জেনেছিলাম অচিরেই। ওঁর বাহুর মাস্তুলগুলি বুলেটের মতন ডাক দিয়ে সেই কথাই বলত। তার বেয়ারিং ধাক্কা কোনোদিন পোহাতে হলে যে ডবল চার্জ দিতে আমায়, সেটাও বুঝতে দেরি হয়নি। ডবল মাশুলে উসুল দিয়ে সেটা সমঝেছিলাম একদিন।

পবিত্র গাঙ্গুলি আর রমেশ সেন সগোত্র ছিলেন একদিক দিয়ে। যেমন সাহিত্যসেবী তেমনি সাহিত্যিক-সেবক দুজনেই। নিজের দিকে না তাকিয়ে আগ বাড়িয়ে বাণীর সাধকদের

সাহায্যে লাগা—বিশেষ করে সতীর্থদের মধ্যে যারা নবাগত—এই যেন কাজ ছিল দু'জনের। একাধিক লেখকদের স্বপ্রতিষ্ঠ করতে নানাদিক থেকে তাঁরা সহায়তা করেছেন।

প্রবাসী থেকে শুরু করে নানান পত্র-পত্রিকায়, নজরুল যখন কারারুদ্ধ, তার কবিতা প্রকাশের সাথে নগদ দক্ষিনার উপায় করে সেই টাকা জেলখানায় কাজীকে পৌঁছে দিয়ে আসার পবিত্র কাহিনী তো অনেকেরই জানা। তিনি কেবল নজরুলেরই কাজের কাজী ছিলেন না, কাজীর মত অনেকেরই কাজে লেগেছিলেন।

আমার কোনো কাজে না লাগলেও আমাকেই ধরে লাগাবার কাজটা তাঁর নিজের হাতে নিলেন একদিন—সাহিত্য-কসরতের সেন মশায়ের সেই পালোয়ানি আখড়ায় হাতাহাতি হয়ে প্রায় হতাহত হবার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা একদিন। আখেরে কী হত কে জানে, নেহাত— আমার পলায়নী মনোবৃত্তির দরুনই তার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি সে যাত্রায়।

আবার রাতারাতি কিছু প্রাপ্তিযোগের নগদ নারায়ণ লাভের দাঁওয়ের মওকাও আমি সেইখানেই পাই।

সতীকান্ত গুহর সহিত সাক্ষাৎলাভ আমার সেখানেই। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছিলেন—'আপনিই শিবরাম চক্রবর্তী বটে ? আমার ভাগনে গোরা তো মশাই আপনার নামেই অজ্ঞান !'

'নামেই অজ্ঞান ?' যতই অজ্ঞানী বালক হোক না, একজন নামমাত্র লেখকের পক্ষে এমন খবরটা হতজ্ঞান হবার মতই।

'আমি তো মশাই আপনার কোনো লেখাই পড়িনি এখনো, কিন্তু সে বলে যে, আপনার মতন লেখক নাকি হয় না। আপনিই নাকি বাংলা সাহিত্যের একমাত্র লেখক এখন।'

'একটুখানি বাড়িয়ে বলেছে। একমাত্র না হলেও একমাত্রায় নয়, তাতে ভুল নেই।' লজ্জিত হয়ে আমি বলি।

'সম্প্রতি আমি একটা পাবলিশিং হাউস করেছি 'গ্রন্থবিহার' নামে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, ডি. এম. লাইব্রেরীর ঠিক পাশেই। দেবার মতো আপনার কোনো বই থাকলে দিতে পারেন আমাকে। গোরার খুব ইচ্ছে আপনার একটা বই আমরা বার করি ! আছে কি কোনো বই আপনার ?'

'রামধনু-তে আমার একটা উপন্যাস শেষ হয়েছে সেদিন। ছোটদের উপন্যাস—বাড়ি থেকে পালিয়ে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বইটার কথাই বলছিল বটে। বলছিল যে, অমন বই নাকি....যাক্ সে-কথা, ওটার ফাইল কপিগুলো নিয়ে একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি, এই সম্পর্কে কথা হবে।'

বলে নিজের বাড়ির ঠিকানা জানালেন। ইন্দ্র রায় রোডের দশ নম্বর বাড়িতে তখন ওঁরা থাকতেন।

'কবে যাব বলুন ?' আমি জিজ্ঞেস করি : 'কখন গেলে আপনার সুবিধে ?'

'যে কোনোদিন সকালে। সকালেই সুবিধে। তখন গেলে গোরার সঙ্গেও আলাপ হবে আপনার। সামনের বাড়িতেই থাকে ওরা। যেদিন আপনার সুবিধা হয়, আপনার সুবিধামতই যাবেন।'

আমার সুবিধে মত ? কথাটায় আমার হাসি পায়। হায়, আমার সুবিধে মতন কিছুই যে আমার হয় না। এমন কি, আমার লেখাটেখাও হবার নয়।

সব কিছুই আমার অসুবিধা মতন হয়ে থাকে। এমন কি ঐ লেখাটেখাও। কোনো প্রেরণার

দায়ে নয়, খুব অসুবিধায় পড়লেই লেখারা পায় আমায়। সৃজনৈষণার বশে নয়, নিতান্ত দায়ে ঠেকলেই লিখতে বসি। লেখা বেরয় আমার।

টাকার দরকার না পড়লে লেখার মর্জি হয় না। গরজই হয় না আমার। টাকার জন্যই লিখি, লিখে থাকি, লিখছি চিরটা কাল।

আর অসুবিধা আমার সব সময়। অসুবিধায় পড়লেই আমার সব হয়। লেখা হয়, টাকা হয়, সব কিছুই। আমি জোটাই, আবার আপনার থেকেও জুটে যায়। কী করে যে এই জট পাকায় কি জানি। মহাকালের জটাজূট হতে সুরধুনী ধারার মতই আকাশ ফেটে আপনার থেকেই ঝরে পড়ে কিনা কে জানে!

'পকেটে টাকা থাকতেই টাকার ধান্দায় বোরোও না কেন দাদা?' বিনি বলত আমায়, 'তাহলে আর এই অসুবিধায় পড়তে হয় না। এই দুর্ভোগ ভুগতে হত না তোমাকে।'

'অসুবিধায় না পড়লে আমার হত কী? দায়ে পড়লেই তো লিখি। টাকার ধান্দায় বেরোই। টাকা পাই—টাকা পেলেই গিলে বসি, সে টাকা আর ওগরাতে পারব না জেনেই বাধ্য হয়ে লিখতে হয় তখন। নইলে টাকা থাকতে আমায় লেখায় কে? স্বভাবের বশে নয় ভাই, নেহাত অভাবে পড়েই লেখাটেখা আমার—বুঝেছিস?'

'এই জন্যেই কোনোদিন তোমার কিছু হয় না। লেখারও উচিত দাম তুমি পাও না কোনোদিন। যে যা দেয়, দায়ে পড়ে তাই নিতে হয় তোমায়। সম্পাদক প্রকাশকরা মওকা পেয়ে যায়। তোমার পকেট যে গড়ের মাঠ, সেটা টের পেতে দেরি হয় না কারো। তোমার মুখেই তার লক্ষণ প্রকট হয়ে পড়ে।'

'গড়ের মাঠের মতন্ ঘাস গজায় বুঝি? মনের দুঃখে দাড়ি কামাইনে বলে বলছিস তাই?'

'খাঁকতির মাথায় যাও বলেই যার যা খুশি দেয়, হাসিমুখে তাই নিয়ে আসতে হয় তোমায়। যে টাকায় অন্যরা সব এডিশন দেয়, তাই পেয়ে তুমি কপি রাইট বেচে নাচতে নাচতে আসো। নিজের মাথা নিজেই খাচ্ছো। একটা সংস্করণ স্বত্ব বেচেই প্রেমেনদা কতো বেশি পান তোমার চেয়ে, তা জানো? তাঁর একটা বইয়ের দাম তিন টাকা চার টাকা, আর তোমার চার আনা ছ' আনা। দিনকের দিন বাজারদর কমে যাচ্ছে তোমার।'

'ঘরে ঘরে আদর বাড়ছে তেমনি। কপি রাইট বেচে দি বলেই না আমার বইয়ের দাম অতো সস্তা? ছেলেমেয়েরা কিনতে পারে কতো সহজে?'

বাজারদরের সঙ্গে ছোটদের আদর মিলিয়ে লাভ-ক্ষতিটা আমার কতখানি দাঁড়ায় খতিয়ে দেখি, দেখাতে চাই।

'আদর আমার মাথায় থাক। আদর নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আদর খেয়ে কি বাঁচবে তুমি?' সে ঝামটা দেয়: 'আর পাঁচ দশ টাকার গল্প বেচে আসো যে পত্রিকায়, তার কী? সেটা ওই টানাটানির মুখে যাও বলেই না? আগের থেকে লিখে রাখলে তারা এসে টাকা দিয়ে তোমার লেখা নিয়ে যেতে পারে—ভালো দামও পাও তাহলে। তা করো না বলেই তাই আগাম ওই নামমাত্র দাদন দিয়ে তারা লিখিয়ে নেয় তোমাকে দিয়ে।' —বিনি কয়—'কেন, তোমার আগে থাকতে অবসর মতন লিখে রাখতে কী হয়?'

'কী হয় কে জানে! মোটের ওপর খুব ভালো হয় না। সেই পঞ্জীভূত লেখা তখন দায় হয়ে দাঁড়ায়। মাথা খারাপ করে দেয়। মন ভারি হয়ে থাকে। অবিবাহিতা মেয়েকে যেমন পাত্রস্থ করতেই হয়, অপ্রকাশিত লেখাদেরও তেমনি পাত্রস্থ না করে রেহাই নেই—মনের ভেতর তারা আঁকুপাঁকু করতে থাকে কেমন! না ছাপানো পর্যন্ত ভাই, আমার ভালো

লাগে না, স্বস্তি পাই না। কন্যাদায়ের মতই সে এক নিদারুণ দায়। ছোটাছুটি করো তখন, সম্পাদকদের বাড়ি বাড়ি—সে এক বেজায় ঝকমারি। আমার পোষায় না।'

'আর সব লিখিয়েরা তবে কাঁড়ি কাঁড়ি লিখে জমায় কি করে? এক সাথে বাজারে চার-পাঁচখানা করে বই ছাড়ে যে....?'

আমার কাছে সেটা রহস্যই সত্যি! অভাবে পড়ে লেখে না, স্বভাবের তোড়ে লিখে যায়—সরস্বতীর বরপুত্র তারা নিশ্চয়। লিখে তারা আনন্দ পায়, লেখে তাই। লেখার জন্য তাদের কোনো প্রাণের দায় নেই—কেবল ঐ প্রেরণার ঘাই! চুনোপুঁটির মৎস্য অবতাররূপা তাঁদের জালে পড়ে বরাহ হয়ে ওঠেন, একটা ছোট্ট গল্পের মতন এতটুকু প্রাণীকে কী করে তাঁরা রাঘব বোয়ালের ন্যায় উপন্যাসে বাড়িয়ে ছাড়েন। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করার মতই।'

যাকে তন্নিষ্ঠ লেখক বলে, এঁরা বোধ হয় তাই। সর্বদাই তাঁরা লেখেন, না লিখে যেন নিস্তার নেই—কিছু না কিছু লিখছেনই সব সময়। সকালে উঠেই খেয়ে না খেয়ে লিখতে বসেন—খেয়েদেয়েও তা শেষ হবার নামটি নেই—লিখেই যাচ্ছেন। লেখাটাই তাঁদের খোরাক, লেখার খাঁই কখনই তাঁদের মেটে না। মিটবার নয়।

কিন্তু এই তন্নিষ্ঠ লেখকদের মত লেখার সঙ্গে অমন ঘনিষ্ঠ হওয়া আমার পোষায় না। অতটা পরিশ্রম—লেখার জন্য কখনই নয়, পারলে পরে পরীদের জন্যই হয়ত করা যায়। সেই শ্রমস্বীকারের পারিতোষিক আছে। পরিতুষ্ট হওয়া যায়। কিন্তু লেখার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া আমার কর্ম নয়।

পরমহংসদেব বলেছিলেন না, যার পেটে যেমনটা সয়? তার জন্য মা'র সেই রকমের ব্যবস্থাই? মা সরস্বতীরও তাই। তাঁর বড় পুত্রের জন্যই যতো তাঁর বাড় বাড়ন্ত! এক অন্ন আর একান্ন ব্যঞ্জন। মেজ সেজ ছোটদের জন্যও তেমনি বিধি, বরাদ্দ—বিরিয়ানির থেকে কোপ্তা কাবাব কালিয়া পোলাও শিককাবাব—যার যেটি চাই। কারো কারো পিঠে পায়েস—খান না তাঁরা আয়েস করে! কিন্তু তারও পরে তাঁর আরো পুত্র থাকে তো; তাঁর ন—রাঙ্গা—নানান। আমি তাঁর সেই ন-পুত্রই, কিংবা হয়ত ঐ ত্যজ্যপুত্রই হব বোধ হয়। আমার বরাতে তাই ওই কাঁচকলাই।

তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। পেটরোগা আমি তাই খেয়েই বেশ মোটা।

বিনিকে আমি সেই কথাই বাতলাই।

'আর বেশি ব্যাখ্যানায় কাজ নেই। তুমি যে একটি কুড়ের বাদশা, জানি আমি।

রাজবাড়ির গোলাম প্রায় রাজতুল্যই জানি, কিন্তু তা হওয়ার চেয়ে কুঁড়েঘরের বাদশা হওয়া ঢের ভালো, আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে বাইরে একটা মোটরের হর্ন শুনেই না, ওর কোনো সহপাঠিনীর ঘন্টাধ্বনি হবে হয়ত, নিজের ভ্যানিটি দেখিয়ে ব্যগ্রভাবে বন্ধুর পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে—আমার জবাবের কোনো অপেক্ষা না করেই।

আমার অসুবিধা মতন পরদিন সকালেই সতীকান্তবাবুর বাড়ি গেলাম—রামধনুর ফাইল কপিগুলি সমেত।

ফাইলটা তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'পড়ে দেখুন আগে, নেবার মতন কি না।'

'পড়বার দরকার করে না। ছেলেদের লেখার, বুঝেছেন, ছেলেরাই বেস্ট জাজ্। গোরার যখন ভালো লেগেছে, তখন আর সব ছেলেরই ভালো লাগবে ধরে নেওয়া যায়।'

'তাহলেও একবার পড়ে দেখার দরকার বোধ হয়। আপনি অবন্ ঠাকুর প্রভৃতির বই

ছেপেছেন বলছিলেন না....আমার লেখাটা সেই দরের হয়েছে কিনা দেখুন আগে....'

'সেই দরের কী করে হবে ? তা কী হয় ? তাঁর মতন কি কেউ লিখতে পারে কখনো ?' বলে একটু হাসলেন, আমার প্রগল্‌ভতায় হয়ত বা—'তবে আপনার বইটা কাল রাত্রিরেই পড়ে আমি শেষ করেছি, বলতেই গোরা তার রামধনুর কপিগুলো দিয়েছিল আমাকে। খুব উঁচুদরের না হলেও, বেশ বই, বলব আমি।'

তার পরে আর আমি কী বলতে পারি ? চুপ করে থাকি।

তিনি বললেন, 'দেখুন, মোটমাট শ' পাঁচেক টাকা দেব আমি আপনাকে। আপনি রাজী?'

'নিশ্চয়। কপি রাইটের জন্য আমি যথেষ্ট মনে করি।'

মুখে বলি, আর মনে লাফিয়ে উঠি। আমার লেখকদশার সেই প্রাক্কালে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকায় কপিরাইট বেচি তখন, সেই সময়ে অতগুলো টাকা আমার কাছে প্রায় যেন ছপ্পর ফেটে পড়বার মতই।

'এটা আপনার প্রথম সংস্করণের জন্যই।' তিনি জানালেন তারপর।

'কপিরাইট নেবেন না আপনি ?' আমি—'ওতেই আপনি কপিরাইট পেয়ে যেতেন কিন্তু।'

'না, কপিরাইট কিসের ! কপিরাইট আপনারই রইলো। পরের সংস্করণে আবার আপনি পাঁচশো টাকাই পাবেন আমার কাছে। বুঝেচেন ?'

বুঝতে আমার সময় লাগে। বিস্ময় জাগে।

কিন্তু বিস্মিত হবার কিচু ছিল না। উচ্চশিক্ষিত, উঁচু ঘরের ছেলে, উঁচুদরের লিখিয়ে নিজেও—তখনই প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত কিশোর পত্রিকা রংমশালে 'খেয়ার মাঝি লক্ষ্মীনাথ' বলে তাঁর একটি অবিস্মরণীয় লেখা বেরিয়ে সাহিত্যিকমহলে সোরগোল তুলেছিল (সেই গল্পটা আরো নানা গল্পের সঙ্গে বই হয়ে বেরিয়েছে এতদিন বাদে—এম. সি. সরকার থেকেই সম্প্রতি—মৌচাকের বিজ্ঞাপন পাঠে জানলাম) সুতরাং লেখার মান তিনি ভালোই জানেন, আর লেখকের উপযুক্ত মর্যাদা দিতেও তাঁর কুণ্ঠা হবার কথা নয়। একটি উচ্চমনা অভিজাতবংশের তরুণের কাছে সেইটাই আশা করা যায়।

কিন্তু আভিজাত্য আর ব্যবসা-বুদ্ধি বোধহয় হাত ধরাধরি করে চলে না। জ্যোতিঠাকুরের জাহাজী কারবার থেকে শুরু করে সুরেনঠাকুরের বীমা ব্যবসায় জেরবার হওয়া পর্যন্ত এইটেই দেখা গেছে, সতীকান্তবাবুর বেলাও তার অন্যথা হবার কথা নয়।

লেখার এবং লেখকের মানছত্র বাড়াতে গিয়ে তাঁর প্রকাশনা-মন্দিরের দানছত্র উঠে গেল দু'দিনেই—'গ্রন্থবিহার' চলল না বেশিদিন। ভেঙে পড়ল দেখতে না দেখতে।

বিহারের সেই দারুণ ভূমিকম্প তার জন্য দায়ী কিনা আমি বলতে পারব না।

॥ একাশি ॥

যার হেতু আমার এই বরাত খুলল, সেই গোরার সঙ্গেও আলাপ হল আমার তার পর।

কিন্তু গোরা যে আমার বই নেবার জন্য তার মামাকে ধরবে এটা একটুও বিস্মিত করেনি আমাকে। কেননা, চিরকাল ধরেই এরকমটা আমি দেখে আসছি। পড়েননি, আমার বই, ছাপাতেও তেমন আগ্রহী নন, আমি কেমন লেখক তাও তাঁদের জানা নেই, নেহাত তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ধরে বসেছে বলেই সেই নাছোড়বান্দা দায় এড়াতেই প্রকাশকরা আমার দায়-পরিগ্রহ করেছেন, পরেও আমি দেখেছিলাম।

গোরার থেকে আরম্ভ হলেও আমার লেখক জীবনের আগাগোড়াই এই কাণ্ড।

অদ্ভুতই ছিল—গোরা সেই বাল্যকালেই। কালচারড্, কিন্তু শুধু তাই নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল সে। আশ্চর্য ছিল তার কথাবার্তা—প্রায় সমবয়সী সমকক্ষের মতই ছিল তার আচার-আচরণ। প্রেমেন থেকে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত তাবড়ো তাবড়ো লেখকদের সবাইকেই সে অবাক করে দিয়েছিল প্রথম চোটেই। বয়সে অতো ছোট হয়েও সে ছিল সবার বয়স্যের মতই।

অদ্ভুত ছিল তার পড়াশোনা। তার মামার ঘরোয়া পাঠাগারের ঘরভর্তি যতো বই—ইংরেজিই তার বেশির ভাগ—সে পড়ে শেষ করেছিল সেই বয়সেই। তার কাছেই আমি ডিকেন্সের খবর পাই, কনান ডায়েলের—মার্ক টোয়েনের। আরো অনেকেরই। বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় লাভ আমার তার সৌজন্যেই। এদিক দিয়ে তার কাছে আমি অশেষ ঋণী।

যেমন পড়ুয়া ছিল, তেমনি গল্পও লিখতে পারত সে। চমৎকার লিখত। তখনই তার কয়েকটা গল্প রামধনু ইত্যাদি পত্রিকায় বেরিয়েছে। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ছোটদের গল্পের তার এই অপরূপ বইটি, শৈল চক্রবর্তী বিচিত্রিত হয়ে তার ইস্কুলের পঠদ্দশাতেই প্রকাশ পায়। ইস্টার্ন ল হাউস-আরতি এজেন্সির অনাথ দে মশাই, 'মস্টুর মাষ্টার' ইত্যাদি আরো কী কী বই বার করেছিলেন—তার সঙ্গে আমারও সেই সময়েই।

গোরা আমায় তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। গোরার বাবা যাদবেন্দ্রবাবু আলিপুরের অ্যাডভোকেট, ভারিক্কী মানুষ ছিলেন. বেশি কথা কইতেন না, কিন্তু তার মা সস্নেহে আমায় গ্রহণ করলেন। নিজের ছেলের মতই।

অমন পরমাশ্চর্য মহিলা আমি জীবনে দেখিনি। মহিয়সী বললে কিছুই তাঁর বলা হয় না। সহজ আভিজাত্য তো ছিলই, তার চেয়েও বড় ছিল তাঁর মাতৃসত্তা। সেই মাতৃবত্তা—যা আমি কেবল মা'র মধ্যেই দেখেছিলাম। ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না।

তিনি আমায় বললেন, 'এখানেই দুটি খেয়ে যাবে আজ—কেমন ?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, 'বাসার থেকে খেয়ে বেরিয়েছি যে! ঘুম থেকে উঠেই আমার খিদে পায়, আর খিদে পেলেই খাই। খালিপেটে থাকতে পারিনে। বেশ, আর একদিন খাব না হয়!'

কিন্তু পকেট ভর্তি টাকা ছিল, কোনো বড় রেস্তোরাঁয় গিয়ে পেট ভর্তি করব বলেই যে ও-কথা বলেছিলাম তা নয়, মূলতঃ পরের বাড়ি কিছু খাবার মানাই ছিল আমার মা'র।

দেশে থাকতে বামুন পাড়ায় গিয়ে কারো বাড়ি যদি কোনোদিন কিছু আমি খেয়ে আসতাম, জানতে পারলে মা রাগ করতেন। বলতেন, খাস্নে আর। পরের বাড়ি এমন করে খেলে লোকে বলবে লেলটিয়া।

লেলটিয়া কী ? তার মানে আমি আজও জানিনে। হ্যাংলামি আর পেটুকপনা দুই মিলিয়েই হয়ত মা'র ঐ কথাটার অর্থ হবে—তাঁর আশ্চর্য বাগৈশ্বর্যর পরিচয়।

কিন্তু ঐ লেলটিয়া হবার ভয়েই আমি অনেক দিন কারো বাড়ি কোথাও কিছু খাইনি।

আসলে মা আমার তেমন কিছু রাঁধতে জানতেন না—সেটা আমি টের পেলাম গৌরাঙ্গর মা'র রান্না খাবার পরই। উনি এক ইলিশ মাছকে সাত পাকে সাত রকমের রেঁধে ধ্রুপদী রান্নার সা রে গা মা পা ধা নি সাধতেন যেন! রন্ধনকলার অমন কালোয়াতি আর কোথাও আমি দেখিনি।

আমার মা রাঁধতে পারতেন মোটামুটি। ঐ ডাল ভাত আর মাছের ঝোল চচ্চড়ি আলু ভাতে লুচি সিঙ্গারা আলুর দম এই সব। আমাদের মুখে তাই অবশ্যি অমৃত বলে ঠাওর হত।

কিন্তু জানতেন যে, তিনি মোটেই রাঁধতে জানেন না। অন্য কারো বাড়ি খেয়ে পাছে আমরা টের পেয়ে যাই আর তাঁর হাতছাড়া হই, সেটা বোধহয় তিনি চাইতেন না।

ওই লেলটিয়ামির ভয় দেখাতেন তাই। পাছে আমরা অন্য কারো রান্না খেয়ে তার রান্নায় অরুচি দেখাই। অপর কারো রান্না খেয়ে পর হয়ে যায় নিজের ছেলে—কেমন পেটসর্বস্ব যে আমি জানতেন তো ভালোই—আরো ভালো খাইয়ে কোনো পরের মা-ই আমার কাছে পরমা হয়ে ওঠে—আমি তার খপ্পরে গিয়ে পড়ি আর বেহাত হয়ে যাই, সেই ভয়ে আর ঈর্ষাতেই তিনি ছেলেকে নিজের ঘরে বেঁধে রাখতে চাইতেন হয়ত।

'বাঃ! আজ আমার জন্মদিন যে! খাবেন না আপনি?' বলেছিল গোরা।

জন্মদিন যে কী বস্তু, তাও আমি ভালো করে জানিনে তখন। কেন যে তা অবশ্য পালনীয়—এবং সেটা যে চর্ব্য চোষ্য খেয়েই, তাও আমার জানা ছিল না। আমার জন্মতিথি কোনোদিনই পালিত হয়নি, নিজের জন্মতারিখই জানা ছিল না আমার।

'জন্মদিন তোমার? তাই নাকি? তাহলে তো খেতেই হয়।' বলেছিলাম, আর খেয়েও ছিলাম তারপর।

খেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আড়ালে ওকে শুধিয়েছি, 'এইরকম খাও নাকি হে তোমরা রোজ? রোজ রোজ?'

'তা, প্রায় রোজই। বাবা খেতে খুব ভালবাসেন। নিজে বাজার করেন। পাঁচ সাত রকমের মাছ মাংস কিনে আনেন রোজ'—সে বলেছিল।

তারপর আর বলতে হয়নি। তারপরে প্রায় রোজই ওদের বাড়ি গিয়ে খেয়েছি। কারণে অকারণে। থেকেওছি। ওর মা যেমন নানা রকমের রাঁধতে ভালোবাসেন, তেমনি প্রাণভরে ভালোবাসতেন খাওয়াতে সবাইকে। কিন্তু গোরারই নয় কেবল, সেই দিনটি আমারও জন্মদিন ছিল বোধহয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর গোরার মা ওর কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে ওকে আদর করলেন একটুখানি।

গোরা বলল, 'শিব্রামবাবুকে খেলে না?'

বারো-তেরো বছরের রহস্যময় বয়সে ছেলেরা যেন অলৌকিকতার রসে লীলায়িত থাকে। এই ধরনের অসম্ভব কথা কয়ে একেক সময়ে অবাক করে দেয় সবাইকে।

ছেলের অদ্ভুত আবদার বাধ্য হয়ে রাখতে হয় মাকে। কপালের ওপর আলতো একটুখানি ছোঁয়া পাই, সেইখানে—যেখানটি ছুঁয়ে আমার মা আরেক কোন্ মায়ের সঙ্গে—যিনি নাকি আমার মা, তোমার মা—সবার মা—সেই জগন্মাতাই! —যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন সব প্রথম।

আরেক আঁচের ছোঁয়াচ লাগা সেই প্রথম দিনটির মতই আমি শিহরিত হই।

আর সঙ্গে সঙ্গেই আমারও নবজন্মলাভ হোলো সেদিন। সেই মুহূর্তে। উনিও আমাকে ছেলের মত গ্রহণ করলেন, আর আমিও সেইখানে সেইক্ষণেই নিজের মায়ের স্থলে তাঁকে বরণ করে নিলাম। তারপর থেকে বরাবরই তাঁকে আমি মা বলেই ডেকে এসেছি। আর তার ফলে কেবল মা, ভাই বা বন্ধুই নয়, যা আমার ছিল না, তিনকুলে ভাইফোঁটা দেবার ছিল না কেউ, সেই আমার মায়ের পেটের বোনের মতন পেলাম ক'জনকে। আমার বোনের

চেয়ে বড়ো, বন্ধুর মতও বলা যায়, তাদের পেয়ে গেলাম তারপরই ডাকনামে যারা জবা, জানু, পুতুল, ইতু, ভুতু—আর নামডাকে যমুনা, জাহ্নবী, সরস্বতী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি।

সত্যি বলতে, ওদের বাড়ি এসে ওদের সঙ্গে মিশেই আমি মানুষ হলাম বলা যায়। দেশের থেকে এসেছিলাম প্রায় জংলীর মতই। সেকালের গেঁয়ো ছেলেরা হোতো যেমন। কালচার-ফালচারের ধার ধারতাম না, জানতামও না কিছু।

মা-বাবার সংস্কৃতজ্ঞান থাকলেও সংস্কৃতির জ্ঞান ছিল না। সংস্কৃতি অবশ্যই ছিল একটা তাঁদের, কিন্তু সেটা নেহাত সেকেলে-একেবারে আলাদা ধরনের। আর কলকাতায় এসে আমার সংস্কৃতির দৌড় যা ছিল, তা ওই জেলেপাড়ার সং পর্যন্তই। এমনকি, আমি নিয়মিত চুল ছাঁটতেও জানতাম না তখন। ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলভরা থাকত মাথা, কাজীর মতন সুবিন্যস্ত নয়, বুনো ঘাসের মতই—সেই চুলের গোছা উপচে এসে পড়ত কপালের ওপর—শৈলবাবুর আঁকা সেকালের আমার গল্পের ছবিতে যেমনটা দেখা যায়। গোরার পাল্লায় পড়ে সেদিনই ওদের পাড়ার সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটলাম, সামনের চুলগুলো যেন না কাটে, অমনিই থাকে, একচুল এদিক-ওদিক না হয়—পেছনে যেমন খুসি ছাঁটুক—পরমানিককে সকাতর এই অনুনয় জানিয়ে। ফলে চেহারাটা ওরই ভেতর একটু ভদ্রগোছের হোলা বলতে কি। দেশের থেকে জংলির মত এসে ওই সাংস্কৃতিক পরিবেশে গোরাদের বাড়িতেই খেয়ে পড়ে আমি মানুষ হয়েছি, বলব আমি। গোরার বাড়ি খেয়ে আর ওর মামার লাইব্রেরির যতো বই না পড়ে—যা কিছু আমার বিদ্যে, শিক্ষালাভ আর কৃষ্টিপ্রাপ্তি। ওদের ঋণ আমার এ জীবনে শুধবার না। আর, ওদের স্নেহপ্রীতি—তাই কি শুধতে পারব কখনো? ওর মা সবার প্রতিই সমান স্নেহার্দ্র, সাক্ষাৎ মাতৃরূপা। কিন্তু তাছাড়াও, আমার জীবনের উষর মরুভূমির ওপর দিয়ে যে কল্পনদীরা বয়ে গেল...যমুনা, জাহ্নবী, সরস্বতী, কৃষ্ণা, কাবেরী...জবা জানু পুতুল ইতু ভুতু...ইত্যাদির ঋণ আমি কি শুধতে পারব কোনদিনই? আমার প্রায় বইয়েই—সেই আই-এ-পি'র থেকে ইদানিং আনন্দ পাবলিশার্সের প্রকাশনায়--'নিখরচায় জলযোগ'-এর থেকে 'ভালোবাসার অনেক নাম' পর্যন্ত বইয়ে ওদের কাহিনী ছড়িয়ে আছে—এই স্মৃতিচারণায় তার পুনরুক্তি করতে চাইনে। কিন্তু সেই প্রবাহিনীর থেকে আমার কৃষিক্ষেত্রেও যে সোনার ফসল আমি তুললাম জীবনভোর...ক্ষণে ক্ষণেই মুহুর্মুহু যে আমার নব নব জন্মলাভ হোলো...আমার পতিত ভুঁইয়ে যে সোনা ফললো স্পর্শমণির সেই ছোঁয়ায়, তার মর্মকথা কি আমার গল্পগাথায় বলতে পেরেছি!

॥ বিরাশি ॥

কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেনের নাতিবৃহৎ ঘরটার উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল তাঁর ওষুধভর্তি আলমারি-দেরাজ। ঘরজোড়া প্রকাণ্ড এক তক্তপোষ, সেই তক্তপোষের ওপর কেন্দ্রমণিরূপে তিনি বিরাজ করতেন, তাঁকে ঘিরে বসত সুহৃদ সাহিত্যিকরা, আর এক কোণে থাকত তাঁর কম্পাউন্ডার আর ছাত্ররা। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে একজনকে আমার মনে আছে আজও, হরিদাসবাবুকে, কবিরাজী ওষুধপত্র পাঁচন মুষ্টিযোগ বানানো ছিল যাঁর কাজ।

সেখানে বসেই রমেশবাবু সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার সাথে রোগীদের দেখাশোনা করতেন, প্রার্থী সম্পাদকদের লেখাটেখা দিতেন সেখানেই—সাহিত্যপত্র আর

ওষুধপত্রের ব্যবস্থা চলত পাশাপাশি।

রমেশবাবুর সেই তক্ততাউসে সাহিত্যের রাজাগজার থেকে প্রজাখাজা, সবার জন্যেই সমান অভ্যর্থনা ছিল। বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠীর, বাহ্যত যাঁদের সাপে-নেউলের সম্পর্ক, তাঁরা সেই তক্তপোষে এসে আপসে মিলেছেন।

দেয়ালঘেঁষা দেরাজ আলমারির খাপে খাপে কবিরাজখানার দাবাইভর্তি শিশি বোতল বোয়েম সব সাজানো, আসব অরিষ্ট মোদক মাদক তাবৎ স্বর্ণ রৌপ্য লৌহঘটিত বটিকাদের ঘটা। মাঝখানে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে দিলদরাজ কবিরাজ-লিখিয়ে রমেশবাবু বিরাজমান। সেখানে বেখাপ্পা কিছু হবার যো ছিল না।

তবু সেখানেই একদিন ছন্দপতন ঘটে গেল।

ছন্নচাড়া এই আমাকে নিয়েই।

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ আমার সেখানেই—সেই তক্তপোষের ওপরেই। আর সেই আলাপেই প্রথম ছন্দপাত।

প্রথমালাপটি যে মধুরোচক হয়নি তা বলতেই হয়। প্রথম যোগাযোগই দুর্যোগাযোগ!

পরিচয় হতেই আমি বলে ফেলেছিলাম—আপনার লেখা আমার ভালো লাগে না মশাই। এখনো যদি সেই করিয়া খাঁইয়াই পড়তে হয় তো দামোদরবাবু কী দোষ করলেন? তাঁর গ্রন্থাবলীই পড়বো না হয়। প্রায় সেই একই ধরনের যদি লেখা হয় তো বঙ্কিমবাবু থেকে কী আপনি এগুলেন? শরৎচন্দ্রের থেকেই বা আপনার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? তাঁদের লেখাই পড়ব বরং আপনার লেখা পড়তে যাব কেন?

তিনি সে-কথার জবাবে কোনো রূঢ়তা প্রকাশ করেননি, জবাব দেননি কিছু, শুধু একটু হেসেছিলেন মাত্র।

বোধ করি তাই ছিল তাঁর জবাব।

সে সময়টায় আমি যেন কেমন ধারাই ছিলাম। পাড়াগাঁর থেকে নিয়ে আসা গ্রাম্যতা আমার গা থেকে যায়নি তখনো। কলকাতার সভাসমাজের আওতায় এসে তার নাগরিকতার ছোঁয়াচ লাগেনি। তেমন সভ্যভব্য হয়নি তখনো। প্রায় জংলীই ছিলাম একরকম।

তাছাড়া উঠতি বয়সটারই কেমন যেন একটা নেশা আছে। যে নেশার বিভ্রমে সহজেই ধরাকে সরা জ্ঞান করা যায়।

সে বয়সের দাপটে নওজোয়ানরা দাড়ির স্বকপোলকল্পনায় সাধ করে নিজের গালে বার বার ক্ষুরের চোট খায়, আর নয়া বাছুররা তার শক্তিমত্তা ফলাতে চায় ক্ষুর তুলে, এমন কি বনস্পতির গোড়াতেও গিয়ে ঢুঁ মারতে কসুর করে না। শিঙ গজাবার মুখে তাদের কপাল বোধহয় সুড় সুড় করে আর্তনাদ ছাড়বার গোড়ায়। (এই হেতুই বুঝি সুকুমার রায় গানে আর গুঁতোয় একাকার করে ফেলেছিলেন।) ঠিক তেমন ধারাই হয়ত নয়ালিখিয়েরা নিজের বলবত্তা ফলাও করতে বাছবিচার না করে চোট মারতে যায় সবাইকে—গোত্তা মেরেই আরাম পায় বোধ হয়। শিঙ বেরোবার আগে সেটাই বোধ হয় তাদের এক রকমের শৃঙ্গার।

আমিও তেমনি সবাইকে তখন ধরে ধরে গুঁতিয়ে দিতে শুরু করেছিলাম—উল্লেখ কাউকেই আমার তিরিক্ষে লেখনী রেহাই দেয়নি তখন। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, শিশির ভাদুড়ি কাকে না? (আমার মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী বইয়ে মস্করার ছলে তাঁদের সেই সপিণ্ডকরণের সবিশেষ সবিস্তারে উল্লেখিত।) জুতসই করে কাউকে মজুতসই

গুঁতো মারাটার কেমনতর মজা আছে যেন। তরুণ বয়সীর কাছে সেটা বাহাদুরি বলেই মনে হয়।

সেই বাহাদুরির বাহুল্যই তারাশঙ্করের কাছে ফলানো আমার।

তিনি আমার প্রগলভতার কোন প্রতিবাদ করেননি, প্রত্যাঘাতও না।

কিন্তু এক বালকের মুখে আমার কথাটার প্রতিধ্বনি শুনে অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল আমাকে একটু বাদেই—ঐখানেই।

একটি ছেলে তাদের বাড়ির কার ওষুধ নিতে এসেছিল রমেশবাবুর কাছে। কৌতুক করার মতলবেই হয়ত ছেলেটিকে তিনি শুধিয়েছিলেন—'তারাশঙ্করবাবুর লেখা তুমি পড়েছো? কেমন লাগে তোমার?'

'ততটা ভালো লাগে না। বোধ হয় বুঝতে পারি না বলেই।'

'আর শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা?'

'দারুণ দারুণ! ভীষণ ভাল্লাগে আমার।'

'ওদের কাউকে তুমি চেন কি?'

'একদম না।'

তখনো দেখলাম তারাশঙ্করবাবুর মুখে সেই মৃদু হাসি। একটুও অপ্রতিভ হয়নি তার কথায়।

অপ্রস্তুত হতে হয়েছে আমাকেই। আমি তার কথার প্রতিবাদ না করে পারিনি—'বড় হও। বড় হয়ে তুমি তারাশঙ্করবাবুর লেখা পড়ো, তখন বুঝবে কাঁচের সঙ্গে হীরের কী তফাত। তোমার বয়সের ছেলেরা চাকচিক্যে ভোলে। কিন্তু জানো তো, অল্ দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড? যখন তুমি তারাশঙ্করের লেখা বুঝবে, তখন ওই শিব্রামের লেখা তোমার একটুও ভাল্লাগবে না।'

ছেলেটা অপ্রসন্ন মুখে আমার উপদেশ আর রমেশবাবুর ওষুধ নিয়ে চলে গেল।

একটু আগেই নিজের কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়ে আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হলেও তারাশঙ্কর কিন্তু তেমনি সপ্রতিভ। তাঁর মুখে সেই মৃদু হাসিই।

লেখকে লেখকে লেখার তারতম্য, মতামতে পার্থক্য, ব্যক্তিত্বের উনিশ-বিশ থাকেই, কিন্তু তা হলেও আমি বলব, লেখকরা পরস্পরের কাছে বিষতুল্যই। মুখে মধুর হলেও পরস্পরের প্রতি তাঁরা বিষিয়ে রয়েছেন সর্বদাই।

গরুর চেয়ে গরুর দুধ ভালো, লেখকের চেয়ে তাঁর লেখা। এই আমার চিরকালের ধারণা—অভিজ্ঞতার ধারে পরীক্ষিত।

দুধ শুধু খেতেই ভালো নয়, পুষ্টি-তুষ্টিকরও। যেমন প্রেয় তেমনি শ্রেয়। কিন্তু গোরুকে অখাদ্য বলেই ধরা উচিত—যেহেতু তার কাছে ঘেঁষলেই গুঁতো খেতে হবে। নিদেন পক্ষে শিঙ-নাড়া তো রয়েছেই।

লেখার মত লেখক ততটা উপাদেয় না হতেও পারেন।

লেখকে সান্নিধ্যে গেলে তিনি গুঁতোবেনই, আপনাকে না হলেও অন্য কাউকে—যে-লেখক তখন আপনাদের সামনে নেই। সেই মর্মভেদী কাণ্ড গণ্ডার সদৃশ ভক্তের চর্ম-ভেদী না হলেও অপর সকলের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। যা শত্রু পরে পরে-র মত কারো হয়ত উপভোগ্য হলেও পর-পরস্মৈপদী কর্ণভেদী কটুকাটব্য অবাধ অসহনীয়।

তারাশঙ্করের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার জীবনে খুব কমই হয়েছে। তিনি থাকতেন পাইকপাড়ার এক টেরে আর আমি আমার চোরবাগানের টেরেসে, পরস্পরের টের বিলকুল বাইরে। এধারে পথেঘাটে তাঁর সাথে দেখাসাক্ষাৎ যা ঘটেছে তা দৈবাৎ পথেঘাটেই। আর সাত পাড়া ঠেঙিয়ে— ট্রাম-বাসে যাতায়াতের দুর্ভোগ কাটিয়ে পাইকপাড়ায় কে যায়?

আমাদের এলাকায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানের কাছাকাছি একবার তাঁকে দেখেছিলাম কাহিল অবস্থায়। কী হয়েছে, শুধাতে বললেন যে, পাইল্‌সে বেজায় কষ্ট পাচ্ছেন। আমি বলেছিলাম, টাকাপয়সা এলেই তা হবে, ঐ আধিব্যাধি। হয় আত্মীয়কুটুমেরা এসে অর্শাবে, নয়তো ঐ অর্শই। আপনি বোধ করি বেশ উপায় করছেন এখন। আর্নিং পাইল্‌স আফ্‌টার পাইল্‌স। শুনে তিনি হেসেছিলেন। কাছাকাছি বিখ্যাত চাঁদসীর মলমের বিজ্ঞাপনদাতা একজনার দোকানে তাঁকে নিয়ে গেছলাম, মনে আছে।

তারপরে এই মাঝে মধ্যেই। তাঁর প্রতিবেশী আমার বন্ধু শৈলজানন্দকে দেখতে যখন গিয়েছি, তখনই যা তাঁর বাড়িত এক-আধটুর জন্য হানা দিতাম—অমরনাথ যাত্রার কালে স্বয়ম্ভু দর্শনে যাবার পথে তীর্থযাত্রী যেমন বদরিকাশ্রম ছুঁয়ে যায়।

সেই সামান্য সংলাপেই যে-পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে তাঁর সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি যে, কাউকে গুঁতোনো দূরে থাক, তাঁর কোনো শিঙ-ই আমি দেখতে পাইনি। আর, শিং এবং ল্যাজ এহেন বস্তু, যা থাকলে পরে কিছুতেই তো ঢেকে-ঢুকে রাখা যায় না। আপনার থেকেই রুখে বেরয়। নিজগুণের প্রকাশ পায়, স্বরূপেই বেরিয়ে পড়ে।

তারাশঙ্করের মুখে কখনো অপর কোন লেখকের নিন্দেমন্দ শুনিনি। এরকম আরেকটি লেখকের কথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে, তিনি নারায়ণ গাঙ্গুলি। তাঁর ন্যায় মিষ্টি মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

যেমন মানুষের মধ্যে লেখক, তেমনি লেখকের মানুষ। দু'জনেই এঁরা। এই আশ্চর্য যোগাযোগ খুব কমই নজরে পড়ে। লেখক হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের মানুষ বলে ভাবতে দ্বিধা হয় না।

নারায়ণ গাঙ্গুলির একটি ইডিয়লজি ছিল অবশ্যি, যা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই নিয়ে বিরুদ্ধমতি কারো সঙ্গে তর্কাতর্কি বা আঘাত দিয়ে কথা কইতে কোনদিন তাঁকে শুনিনি। বিরোধিতা বা বিরুদ্ধবাদকে মৃদু হেসে সায় দিয়ে যাবার অধ্যবসায় ছিল তাঁর। কোন লেখকের কাছ থেকে এটা যেমন অপ্রত্যাশিত শিষ্ট আচরণ, তেমনি অকল্পনীয় মিষ্ট ব্যবহার। এটাকেই আমি তাঁর মিষ্টতা বলেছি। এর স্বাভাবিক সৌরভ তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে বিজড়িত ছিল।

তারাশঙ্কর অবশ্যই এমনধারা মিষ্ট নন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো প্রতি কোনো তিক্ততা না থাকলেও আদর্শগত ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মীর প্রতি বিরূপ—জেহাদীর মতই খড়্গহস্ত।

সেদিক দিয়ে তিনি বীরভূমের মাটির মতই কড়া—যেমন কঠোরতায় তেমনি তীক্ষ্ণতায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তিনিন্দার নীচুস্তরে ব্যক্ত হতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি, আমি তো দেখিনি।

না, পরের ওপর শিঙের ধার পরখ করার শৃঙ্গার তাঁর আচরণে আমি দেখিনি কখনো। কাউকেই তিনি কদাপি গুঁতোতেন না। অন্তর্গত শিঙের অভাবেই সেটা পারতেন না বোধ

করি। বরং বলা যায় যে, আমিই তাঁকে একবার গুঁতিয়ে দিয়েছি--তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে ঢুঁ মারতে গিয়েছি— সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন চারধারেই আমার ঢুঁ ঢুঁ—সেই কারণেই হয়ত বা।

আমার ঢুক্কারের জবাবে তিনি চুপ করেছিলেন, নিরুত্তাপ তাঁর সেই নিরুত্তরতার মধ্যেই বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর নিহিত ছিল। তাঁর নিরুক্তির ভেতর দিয়েই সে কথা নিঃশেষে উক্ত হয়েছিল বুঝি বা।

আমার জবাব পেয়েছিলাম কিছুদিন পরেই—তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে। অনির্বচনীয় সেই রচনা।

পাটনার প্রভাতী মাসিকে তাঁর 'কবি' বেরুচ্ছিল ধারাবাহিক। কবি পড়ে আমি তো অভিভূত।

ছোট একটুখানি গোষ্পদের গর্ভে যেমন বিপুল আকাশের ছায়া পড়ে, তেমনি অজ পাড়াগাঁর নিরক্ষর এক ছড়াকারের ভেতরে বিরাট কবির ভূমিকা তিনি ধরে দিয়েছেন ওই বইয়ে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি একাত্ম হয়ে এখানে যেন বিধাতার মতই যুগপৎ মহৎ।

তারাশঙ্করের ভাষার বহিরঙ্গ দেখে আমি ক্ষুব্ধ ছিলাম। তাঁর অন্তরের অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ পাইনি এর আগে।

সেটা ছিল প্রমথ চৌধুরীর যুগ। বাংলাসাহিত্যে বীরবলী Spell তখন—চলতি ভাষাই চালু। এক কথায় অনেক কথা বলা, অল্পের মধ্যে বিস্তরের আভাস—ইঙ্গিতবহ আঁটসাট তাঁর বাক্‌ভঙ্গীর মায়ায় সবাই আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। এমনকি, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর হস্তাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। সেই সময় তারাশঙ্করের ওই ফেলে-ছড়িয়ে লেখায়—বহু কথনের বহুলতর বিস্তার আমার কাছে যেন বাহুল্য বলেই বোধ হয়েছিল। বীরবলের ঋজু তির্যক সংক্ষিপ্ত ভাষণের কাছে আর সব ভাষা—সবার ভাষণই নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হত।

তখনো আমি দেখতে পাইনি যে, বীরভূমের রুক্ষ ভূঁয়ের পাশ দিয়েই রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে। রাঙামাটির রস জমাটি—সেই রসরূপের দেখা পেলাম ওই কবিতেই। কবির প্রতীকের ভেতর দিয়ে তিনি জগৎ-কবির প্রতিকৃতিই প্রকাশ করেছেন—সেই বিরাট প্রতীকক্রিয়ায় 'করিয়া খাইয়া'র তাবৎ ক্রিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছে কোথায়।

প্রভাতীতে তাঁর যথার্থ পরিচয় পাবার পর আমার প্রতিক্রিয়া পত্রিকাপাঠ পত্রপাঠ তাঁকে জানিয়েছিলাম, তারও কোনো জবাব তিনি দেননি। সত্যদ্রষ্টা মহৎস্রষ্টারা স্বভাবতই সব নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে থাকেন, কিছুতেই তাঁরা বিচলিত হন না। রমেশবাবুর আড্ডায় নিজের কুচ্ছায় যেমন অবিচল, সাধুবাদেও তেমনি তিনি অনুচ্ছ্বসিত।

আমার চিঠির জবাব পেয়েছিলাম অবশ্যি পরে—অনেক পরেই। রঙ্গমঞ্চে নাট্যরূপে কবির উপস্থাপনার কালে। কলাবাগানের গলিঘুঁজি পেরিয়ে কত কষ্ট করে মেহনত পুইয়ে আমার বাসার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আমার আস্তাবলে তিনি এসেছিলেন—কবির অভিনয় দর্শনের আমন্ত্রণী নিয়ে। রচনার মত রঙ্গমঞ্চে তার উপস্থাপনাও অপরূপ—অবিস্মরণীয়।

পরে আমি তাঁর রচনার আরো পরিচয় পেয়েছি। দেখেছি যে, জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর এহেন বিস্তৃত, বক্তব্য এতই বেশি যে বিস্তারিত না হয়ে তাঁর উপায় ছিল না, সংক্ষেপে বলা অসম্ভব, সব বলা সব কথা বিশদে না বলা পর্যন্ত তাঁর রেহাই নেই। ইঙ্গিত ইশারায় সারা যায় না, বিশল্যকরণী সেই মৃতসঞ্জীবনীকে আনতে হলে গোটা গন্ধমাদনকেই উপড়ে

আনতে হয়। মহাবীর্যবান সহিত্যকলার চাল কখনই চটুলগতি ঠুমকির মত হতে পারে না।

তাই তার গতিবেগ রূপনারায়ণের ন্যায় এমনই দুর্দাম যে, কোথাও একটু বসে থিতিয়ে থেমে নিজের ভাবাকে মেজে ঘষে একটু ঘুরিয়ে বলার কসরত করার তাঁর ফুরসত নেই। অনেক কথার ভেতর দিয়ে যে একটি কথা তিনি কন, সেই এক কথারই দাম অনেক। ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে সেই এক কথাই কথারক।

এক মণ ভারী কয়লার তুলনায় এক ভরি সোনা যেমন।

তাছাড়া, ভেবে দেখলে, আঙ্গিকের ভঙ্গিমা ছাড়িয়ে—ছাপিয়েই তো সাহিত্য। অঙ্গভঙ্গীর চেয়ে মানুষটাই বড় যেমন।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে সেই মানুষের কথাই।

রমেশবাবুর আখড়ায় সেই প্রথম আমার সাহিত্যিক সংঘর্ষ। মুখোমুখি যদিও নয় ঠিক, কেননি। আমি মুখিয়ে গেলেও তিনি এড়িয়ে গেছেন, মুখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হননি, কিন্তু দ্বিতীয়বার যথার্থই একটা হাতাহাতি হয়ে গেল। অদ্বিতীয় পবিত্র গাঙ্গুলির সাথেই।

সেখানের বৈঠকে সাহিত্যজিজ্ঞাসায় আমার শেষ ঠোকাঠুকি সেইটাই।

কমলদের বাড়ির সদর চৌকাঠে বসে তার সঙ্গে গল্পগুজব করছি, এমন সময়ে পাশের আসর থেকে সোরগোল এল—কী নিয়ে বেজায় তর্কাতর্কি বেধেছে যেন।

বিতর্কিত ব্যাপারে গলা বাড়াতে না চাইলেও সব সময় পারা যায় কি! হট্টগোলের একটা আকর্ষণ থাকেই, সেটাই আগ বাড়িয়ে এসে কান পাকড়ায়। ইচ্ছে করলেও তর্কাতীত থাকা যায় না।

কৌতূহলবশে হট্টমালার দেশে গিয়ে বসেছি, একটুখানির জন্যেই, রমেশবাবু শুধিয়েছেন—শৈলজা আর অচিন্ত্যর মধ্যে কে বড়? বলুন তো, আপনার কী মত?

বিতর্কটা বেধেছে তাই নিয়েই বুঝলাম।

'এ আর বলা শক্ত কি! কে কোন্ সালে জন্মেছে জানলেই তো বলা যায়।' আমি বললাম।

'বয়সের কথা হচ্ছে না...'

'তবে কি বিদ্যে-বুদ্ধিতে? তা, অচিন্ত্য যেকালে মুনসেফ'—আমি সেফ সাইডে থাকতে চাই—'সে-ই বড়ো বলে আমার মনে হয়।'

'বিদ্যেবুদ্ধির কথা নয়, লেখক হিসেবে দু'জনের মধ্যে বড়ো কে? এইটেই প্রশ্ন।' পবিত্রবাবুর হুঙ্কার।

'হ্যাঁ, তাই জানতে চাইছি আপনার কাছে।' সায় দেন রমেশ সেন।

সত্যি বলতে, এরকম কোনো প্রশ্ন উঠতেই পারে না। শৈলজা আর অচিন্ত্যর ভেতর কে বড় লিখিয়ে তা কি করে বলা যায়? আম আর আনারসের মধ্যে বড়ো কে, এই ধরনের নয় কি প্রশ্নটা? কোনো ফলের সঙ্গেই কোনো ফলের তুলনা হতে পারে না, মূল্য বিচার হবে কি করে? তুল্যমূল্য করা যায় না ওদের।

রসের জিজ্ঞাসায় তরমুজ বড়ো কি তালশাঁস—এহেন প্রশ্ন আসাই উচিৎ নয়। ফলের বিচারে দুজনেই অনন্য, স্বাদ আর রসে পৃথক হলেও উভয়েরই সমান সাফল্য। কারো সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। ওই তরমুজ আর তালশাঁস—দুই-ই সমান তর করে দেয়—দুটোই মজাদার—তারিয়ে তারিয়ে খাবার।

কারো কাছে ওই আনারসই ষোলো আনা, এবং নিচুর স্থানই সবার উঁচোয়। যার কাছে যেমন লাগে।

'এঁদের দু'জনার মধ্যে কোন্‌জন লেখক হিসেবে বড়, বলুন তাই।' শুধান সবাই।

'আমার বিবেচনায় কে বড়ো জানতে চাইছেন? অচিন্ত্য আর শৈলজার মধ্যে?...এঁদের দু'জনের মধ্যে, আমার ধারণায় প্রেমেনই বড়।'

শুনেই পবিত্রবাবু খাপ্পা—'এঁদের মধ্যে প্রেমেন বড়? প্রেমেনের কোনো কথাই হচ্ছে না এখেনে। প্রেমেন এর ভেতর আসছে কোত্থেকে?'

'কোত্থেকে আসছে কে জানে!' আমার জবাব—'কিন্তু বলতে গেলে প্রেমেনকেই এদের মধ্যে বড় বলতে হয়।'

'প্রেমেন বড়ো?' সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রবাবু আস্তিন গুটিয়ে খাড়া। এই মারেন কি সেই মারেন।

এবার আমি সতর্ক। পবিত্রবাবু বঙ্গদেশীয় কাঠগোঁয়ার আর শৈলজা দারুণ গোঁড়া।

আর, কাঠগোঁয়ার বললে কমিয়েই বলা হয় তাঁকে। শালকাঠ গোঁয়ার বললেই সঠিক হয়। আস্তিন গুটোতেই তাঁর শালপ্রাংশু মহাভুজঃ প্রকাশ হয়ে পড়ল। নাগালের মধ্যে পেলে আমার গালের দফা সারা, বুঝতে আমার দেরি হোলো না।

শুধু গালমন্দর উপর দিয়েই যাবে না, হাতে পায়ে খোঁড়াও হতে হবে আমায়। কিন্তু রুদ্রমূর্তি পবিত্রবাবুকে থামায় কে?

বাহ্বাস্ফোটে তিনি এগিয়ে আসতেই না আমি তাঁকে এইসা এক ধাক্কা লাগিয়েছি....গিয়ে পড়েছেন ঘরজোড়া তক্তপোষের কিনারায় দেয়ালঘেঁষা দাবাইয়ের আলমারিগুলোর ঘাড়ে। তাদের ভেতরে সারে সারে খাড়া-করা থাকবন্দী রমেশবাবুর যত ওষুধ আর বটিকা—টোট্‌কা এবং টুটকি, মকরধ্বজ আর চ্যবনপ্রাশ—ব্রাহ্মঘৃত আর শ্রীগোপাল তৈল, কামেশ্বরমোদক আর ভাস্কর লবণ—কটুতিক্তকষায় রসায়ন যত না।

অকুস্থলে পবিত্রবাবুর পাচনের ওপর পড়ল গিয়ে বেটক্কর আমার ঐ মুষ্টিযোগ।

তারপর আর কিছু বলতে হল না। ওতেই কাম ফতে। দেখতে হল না তারপর।

পবিত্রবাবু আলমারির ওপরে গিয়ে পড়লেন, আলমারি তাঁকে নিয়ে পড়ল। তার পরে দুজনে মিলে জড়াজড়ি করে ভাস্কর-লবণ-জর্জর পঞ্চতিক্ত কষায়ে কষিত সালসাদের সহিত ওতপ্রোত হরির্তকি আমলকি বহেড়ার আলুথালুর মধ্যে বটিকাদের ছড়াছড়ির ছত্রাকারে সেই তক্তপোষের উপরে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন।

বিফলাদ্য বিতর্কের ত্রিফলাদ্যযোগে তাবৎ ঈশবগুল গুলঞ্চ আর মশগুল সাহিত্যরসিকরা একাকার হয়ে একশা সবাই। ইলাহী কাণ্ড!

পবিত্রর গায়ে জোর আমার অন্তত ছ'গুণ। ওই কবরেজখানার মকরধ্বজের ন্যায় ষড়্‌গুণ বলি-জারিত হতে সেখেনে আমি দাঁড়াই আর? পবিত্রবাবুকে ঐভাবে রেখে সেখেন থেকে আমি উধাও। মেষের মতই ল্যাজ গুটিয়ে আমি পলাতক। নিমেষের মধ্যেই নিজের মেসের বিছানায় এসে পর্যবাসিত।

হাত থাকতে মুখে কেন? এটাও একটা তর্কের প্রশ্নই।

কেননা, কোনো তর্কের জবাবই মুখে মুখে খেলে না, ওই হাতে হাতেই মেলে। শেষ অবধি হাতাহাতিতেই সব তর্কের নিষ্পত্তি হয়।

তার পরে আর মুখ খোলার দরকার থাকে না, পরস্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। এর চেয়ে ভাল মুখবন্ধ আর হয় না।

॥ তিরাশি ॥

নারাণ গাঙ্গুলির অকালমৃত্যুর জন্য আমি নিজেকেই দায়ী মনে করি।

নারাণবাবুর বাড়ি গেছি একদিন, গৌরাঙ্গদের বাড়ি যাবার পথে গোলপার্কের কাছেই তাঁর আস্তানাটা—নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছিল আমাদের।

কথায় কথায় শরীর গতিকের কথা উঠল। আমার হাই ব্লাডপ্রেশার, ওঁর তো তা রয়েছেই, তার ওপরে আবার ডাইবিটিস।

'আমার ওই ব্লাডপ্রেশারই ভালো মশাই। ডাইবিটিস আমি চাই না।'

'চান না?'

'না। ব্লাডপ্রেশারে নুন না খেলেই চুকে যায়, সল্ট-ফ্রী খাবার হলেই হলো, কিন্তু ডাইবিটিসে সুইট-ফ্রী থাকতে হয়। সে ভারী মুশকিল। মিষ্টি না খেয়ে আমি থাকতে পারি না।'

'তা বটে।'

সঙ্গে সঙ্গে ওঁর বাড়ির ভেতর থেকে ফরমায়েসী গরম গরম রসগোল্লা এসে পড়ল। তার সদ্ব্যবহারে লেগে বললুম, 'ডাইবিটিস হলে এসব আর মুখে তুলতে পারব কী। শুধু সেই একটিমাত্র মিষ্টি ছাড়া আর কিছুই তো মুখে তোলা যাবে না। এবং সেই মিষ্টিই বা পাব কোথায় এখন? এই বয়সে কে দেবে আমায় আর?'

আমার কথায় তিনি মৃদু হাসলেন।

ব্লাডপ্রেশার নিয়ে খাসাই আছি বলতে কি। দুটি মাত্র ভয় তো, করোনারি থ্রম্বোসিস আর সেরিব্রেল হেমারেজ-এর। করোনারি আটকাতে চর্বিজাতীয় কিছু না খেলেই হোলো। চর্বিতচর্বণ বাদ দিয়েছি একদম। আর সেরিব্রেল হেমারেজের হাত থেকে রেহাই পেতে ওষুধ খাই। যা সব চমৎকার ওষুধ বেরিয়েছে না আজকাল!'

'কী করেন?'

'ডাক্তার যা বলেছেন। কাজকর্ম সব বন্ধ করে দিই, আডেলফিন উইথ ইসিড্রেক্স এক বটি খেয়েই না লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়। সলিড কিছু খাই না আর তারপর। খালি হরলিকস্। ঐ বটি আর বিশ্রাম। দেখতে না দেখতে আরাম!'

'কি করে টের পান আসন্ন হেমারেজের?'

'মাথা ক্রিক্ ক্রিক্ করলেই বুঝতে পারি যে, গড়বড় হয়েছে হেড আপিসে। নইলে অকারণে সহসা তার এই ক্রিংকার কেন? যতক্ষণ না সে ঐ ক্রিক্ রোডের মোড় থেকে ফিরেছে, স্বস্তি নেই আমার। ওষুধ খাবার আর বিশ্রাম নেবার খানিক বাদেই মাথা সহজ হয়ে আসে আমার। ওষুধ খাবার আর বিশ্রাম নেবার খানিক বাদেই মাথা সহজ হয়ে আসে আবার। তার পরে হরলিকস্ খেয়ে টানা ঘুম লাগাই। সেদিন আর কোনো কাজ নেই।'

'আরে মশাই, আমারো যে মাথা ক্রিক্ করে মাঝে মাঝেই।' তিনি জানান।

'কী করেন আপনি?'

'কিছুই না, কী করব? কাজকর্ম যা করার করে যাই তেমনি।'

'লেখেন-টেখেন তখনো?'

'নিশ্চয়।'

'কোনো ওষুধ-টষুধ খান না? ঐ ইসিড্রেক্স অ্যাডেলফিন.....

'কেন খেতে যাব অকারণে? তাছাড়া, না লিখে কি থাকা যায়? দায় আছে না মাথায়? ডিউটি ফার্স্ট।'

'তা জানি। কিন্তু ওষুধ ফোরমোস্ট। সব কর্তব্য ফেলে রেখে ওষুধ খেতে হয় সবার আগে।'

নারাণবাবু যেমন লেখা-পাগলা দেখা গেল, আমার ভয় হল, কোন্‌দিন না ঐ লেখার জন্যেই তিনি শহীদ হয়ে যান।

'ওষুধ বেশি খেতে নেই, যখন তখন তো কখনই নয়। ওষুধের একটা প্রতিক্রিয়া আছে—সেই বিষক্রিয়াতেও ভুগতে হয় আবার।' তিনি বললেন।

'জানি। কিন্তু এই ভোগবতী বসুন্ধরায় ভোগ এড়াবার উপায় নেই। হয় অসুখে ভুগুন, নয় ওষুধে ভুগুন—ভুগতেই হবে আপনাকে। ওষুধে ভোগাটাই ভাল নাকি? হাজার প্রতিক্রিয়া হোক, আরাম আছে তার মধ্যে। আর ব্যারামে ভুগলে আপনারও কষ্ট, আপনাকে নিয়ে আশপাশের আর সবারও ভোগান্তি।'

'তা বটে। তবে ডাক্তাররাও কারণে-অকারণে ওষুধ খেতে বলেন না.....'

'না বলুন। আমার মনের মধ্যে বলে যে। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে—খা খা! ওষুধ খা। কাজকর্ম সব ফেলে রেখে শুয়ে পড় চট করে। করছিস কী? একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে না তোর? শুনেই আমি শুয়ে পড়ি চট করে—একটা পিল ঠুকেই না। ওষুধের ব্যবস্থা দিয়েছে ডাক্তার—কাজ তার সেইখানেই খতম! তারপর থেকে আমার মতিগতির বাধ্য আমি। মনের কথায় চলি। সব বিষয়ে—সব সময়।'

'জানি বই কি। সেই জন্যেই বাধ্য হয়ে আমায় ডাক্তার বদলাতে হয় যে।'

'ডাক্তার বদলাতে হয়?'

'হবে না? বেঘোরে মারা পড়লে কী করা যায়। বিশ বছর আমি হাই প্রেশারে ভুগছি—এর ভেতর আমার তিন তিনটে ডাক্তার ঐ রোগেই স্বর্গীয় হয়েছেন—দুজনে মারা গেছেন, একজন পক্ষাঘাতে পড়ে। চতুর্থ ডাক্তার, আমার বন্ধুতুল্যই, ডাঃ কে. পি. রায়কে ধরেছি এখন, জেনেছি তাঁরও ঐ প্রেশার, তাই করজোড়ে তাঁকে নিবেদন করেছি—দোহাই! আমি মারা যাবার আগে যেন মহাপ্রয়াণ করবেন না দয়া করে। তাহলে আমায় দেখবার কে থাকবে? যে-ঔষধ আমার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, আপনিও তাই খাবেন দরকার পড়লে, অন্যথা না হয়।'

'তবেই বুঝুন, নিজেদের ওষুধ নিজেরাই কেন খান না ডাক্তাররা। ওষুধেরও একটা বিষক্রিয়া আছে যে। রোগের থেকে যার বিপদ কম নয়।'

'দুই নিয়েই আমাদের চলতে হয়, বাঁচতে চাইলে চলতে হবে—উপায় নেই। যাক্ গে, ওকথা থাক্‌গে, আপনি ওষুধ খাবেন মোটের ওপর। রোগে যতটা ক্ষতি করে ওষুধ নিশ্চয় তার বেশি ক্ষতিকর নয়।'

এই কথা বলে, যে কথাগুলি বলতে আমার বেধেছিল, বেশ সঙ্কোচ বোধ করেছি—সে কথা আমার ছিল না, ছিল আমার মা'র।

মা বলেছিলেন, অসুখ আর ওষুধ দুয়েরই বিষক্রিয়া *মা'র কৃপায় নিরাকৃত* হয়ে যায়।

তোর বাবা বলতেন, ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণু, ওষুধ খাওয়ার আগে বিষ্ণুকে স্মরণ করবে। সেই বিষ্ণু কে ? ওই দুর্গাই। তিনিই বিষ্ণুর শক্তি—তাঁকে বাদে দিয়ে বিষ্ণুর কোনো শক্তি নেই। চণ্ডীতে বলেছে না ? ত্বম্ বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা/বিশ্বস্য বীজম্ পরমাসি মায়া/সম্মোহিতম্ দেবি সমস্তমেতৎ/ত্বম্ প্রসন্না ভূবিমুক্তি হেতু ॥ সব শক্তি, সবার শক্তি ঐ মা দুর্গাই। কিন্তু তাঁর বাহন চাই। বাহন না হলে তিনি কাজ করবেন কী দিয়ে। কাকে নিয়ে ? ওষুধই সেই বাহন। ওষুধই হলো গিয়ে সেই বাহন—সিংহস্বরূপ—যে-বাহনে ভর দিয়ে তিনি অসুখরূপী অসুরকে সংহার করেন, বশীভূত করেন। মা'র কৃপায় ওষুধ আর অসুখ দুই-ই সমীকৃত হয়ে যায় তাঁর পায়ের তলায়।

কিন্তু ওসব কথা নারায়ণবাবুর ন্যায় বুদ্ধিজীবীর কাছে ফলাও করতে কেমন যেন আমার আটকে ছিল সত্যিই। উনি কি বিশ্বাস করবেন ? আমার দুর্বলতায় হাসবেন মনে মনে।

বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর সম্মুখে আমার প্রগল্‌ভ কণ্ঠও কুণ্ঠিত হয়েছে। উনি কি বিশ্বাস করবেন আমার কথাটা ?

কিন্তু বিশ্বাস করা না করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। মা বলতেন, তাঁকে জানানো নিয়ে কথা, অবিশ্বাস করে বললেও ফল হবে—বিশ্বাস না করে আগুনে হাত দিলে কি হাত পোড়ে না ? সব কিছুই বাজিয়ে দেখতে হয়, এমন কি ঐ ঈশ্বরকেও। জীবনে অসুখবিসুখ দুঃখ দুর্বিপাক ইত্যাদি আসে কেন ? ঈশ্বরের পরিচয় পাবার জন্যই, তাঁকে বাজিয়ে নেবার জন্যই তো।

'এতই যদি তাঁর স্নেহ,' আমি বলেছি, 'এসব দুঃখ দুর্যোগ আসেই বা কেন আদপে ? তিনি কি আগের থেকেই রুখতে পারেন না এসব ?'

'তা কী করে হয় রে। তবে তো সব গুটি সরিয়ে খেলার ছকটাই গুটিয়ে নিতে হয় তাহলে। গোটা মায়াটাই কেটে যায় তবে—সমস্ত খেলাটাই মাটি। পাত্তাড়ি গুটোতে হয় সবাইকে। এই জগৎ-সৃষ্টি-সংসার, মা ছেলে ভালোবাসাটাসা কিছুই থাকে না আর !'

'না না না।' আমি প্রতিবাদ করেছি—'ভালোবাসাটা চাই আমাদের। চাই-ই। নইলে বাঁচবো কী নিয়ে ? থাকব কী নিয়ে আমরা ?'

'তবে বোঝ্। তাহলে এই বসুন্ধরারও দরকার। ঐ ভালোবাসার জন্যই। নইলে সেই কেন্দ্রমূলে গিয়ে বিন্দুমাত্র হয়ে থাকায় কোন লাভ নেই। সেই তন্মাত্র অস্তিত্বের যদি কোন মূল্য থাকত, পরমেশ্বর স্বয়ং সাধ করে নিজের মায়াবৃত্ত ফেঁদে তার ভেতরে জড়াতে যেতেন না ; মজা তো এইখানেই—এর মধ্যেই—এই মায়াবৃত্তে—মহামায়ার বৃত্তান্তে। আমরা ছোটখাট মায়াপাশে বদ্ধ, আর তিনি বেঁধেছেন মহামায়াপাশে আপনাকে। মুক্তি নেই কোথাও।

মা'র কথায় কবিগুরুর কথাটা আমার মনে পড়েছিল—মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে/বাঁধা সবার কাছে ॥

'সবই ভালো। কিন্তু কেন যে এই সব দুঃখ দুর্বিপাক দুর্যোগ দুর্ভোগ...।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম। —'এসব নইলে কি চলতো না আর ?'

'খেলার নিয়মেই এইসব। অঙ্কের ছকে বাঁধা। সেন্টার রেডিয়াস্ সার্কল—এই তিন নিয়েই তো সব। সার্কল-এ এসে বৃত্তপথে বৃত্তিপথেই এদের উৎপত্তি। বৃত্ত ধরে প্রবৃত্তি পথে এগুলেই পদে পদে বাধা পড়ে, মা'র নাম করে তাঁর সাহায্যে কাটাতে হয় এসব। কেন্দ্রেও যে

বিন্দু, সেই বিন্দু রেডিয়াসেও, আবার বৃত্তপথে এসেও সেই বিন্দুই—একই বিন্দুবাসিনী। সবারই সমান শক্তি—তুল্যমূল্য সব। সর্বত্রই আত্মবিস্তার-প্রয়াস। সবাই নিজের গতিমুক্তি খুঁজছে। নিজের বৃত্ত রচনা করতে পারাতেই সেই বিমুক্তি। মনের মুক্তি যেমন মন্ত্রে—সুরে সুরভিতে সৌন্দর্যে। মন্ত্রের ঐ ক্রিয়াগুলি বৃত্তিগুলি আমাদের মধুর বৃত্ত। কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া রয়েছেই। বৃত্তও যখন উল্টে নিজেকে চাউর করতে চায়, সেই চেষ্টায় অসুর সৃষ্টি হয়—অসুখ দুঃখ দুর্ভোগ ইত্যাদিরা জোটে—তাই হচ্ছে বৃত্রাসুর। বৃত্তি থেকে বৃত্ত থেকে যা ত্রাণ পায় তাই। মা'র সাহায্য নিয়ে বৃত্রাসুরকে সংহার করতে হয়। বধ করেন বিষ্ণুই—মা'র সেই বৈষ্ণবী শক্তিই।

'তুই দুর্গার পটের মধ্যে জীবনের পুরো ছকটাই পাবি। কেন্দ্রমূল, মধুর বৃত্ত, অসুর বৃত্ত সব কিছুর। সবই আছে তার ভেতর—সবটারই দরকার—সমস্তই চাই। নিজের বাহন সিংহের ওপরেও—মা'র যেমন ঝুঁকি, অসুরের প্রতি ঝোঁক তাঁর কিছুমাত্র কম নয়। বেশিই বরং। দেখবি মা ডান দিকেই ঝুঁকে রয়েছেন।

'ওষুধ হচ্ছে সিংহ, মা'র বাহন। আর ঐ অসুখ হলো গে অসুর। পরস্পরের অপোজিং পাওয়ার—কিন্তু মাকে টের পাওয়ার জন্য দুটোরই দরকার। মাকে মনে রেখে ওষুধ খেলি, সেরে গেলি, সঙ্গে সঙ্গে মা'র পরিচয় পেলি। এখন তখন, এই যাস কি সেই যাস, বিপরিত ফলও হতে পারে—কিন্তু মাকে মনে করে খেলে উলটো উৎপত্তির ফাঁড়া কেটে যায়—তুই রক্ষা পাস।

'সব কিছুরই পজিশন আর অপোজিশন আছে—সব সময়েই। জীবনের পদে পদেই বিপদ আর সম্পদের দেখা পাবি—পাবি তোর মায়ের পরিচয়।

দুঃখ দুর্যোগের পাথারেই তো ভগবতীর সাক্ষাৎ। সেই কষ্টিপাথরে কষেই মা'র অস্তিত্বের বিচার। যে-ঈশ্বর আমার অসুখে-বিসুখে আপদে-বিপদে কাজে লাগে না সে-ঈশ্বরকে নিয়ে আমার কী কাজ ?'

কিন্তু তাঁর কথাটা মা যেভাবে বলেছিলেন তেমনি ফলাও করে নারায়ণবাবুকে বলাও কী যেত আমার।

কামারশালায় গিয়ে ছুঁচ বেচার মতই গোয়ার্তুমি হ'ত না কি।

ছোট ছেলে হলে বলা যায়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই থাকে না। ঈশ্বরকে হাতে হাতে বাজিয়ে দেখার কথায় তারা মজাই পায়। ঈশ্বরকে নিয়ে খেলাই যেন এক রকমের। —খেলার সাথীকে নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে যায়। তখন তখনই বাজাতে লেগে যায়—আমি যেমন ঐ করে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করতে লেগেছিলাম একদিন। জীবনভোর সেই বাজনা চলে—ঈশ্বর আর নিজের কাজ দুই-ই বেশ বাজানো যায় একসঙ্গে।

এই হেতুই কি সেকালে ঐ ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম দীক্ষা কৈশোরের সেই উপনয়নেই দেওয়া হত নাকি ?

জীবনের রান্ শুরু হবার গোড়াতেই এই সুরটা ভাঁজবার বোধহয়। নইলে বয়েস গড়িয়ে বুদ্ধিবৃত্তিতে পৌঁছে নারাণ হয়ে যাবার পর এমন কথা আর পাড়া যায় না বুঝি।

অতএব ক্যাচ্ দেম্ ইয়ং। এ যুগের উপযোগী করে ইস্কুলের প্রাথমিক পাঠেই সেই নব নবীনদের কাছে এই প্রণবমন্ত্রের দীক্ষাদান হোক্। মা-ফতেমা, মেরীমাতা কিংবা গায়ত্রী

দেবীর কাছে (আসলে সবই সেই দুর্গাই) এই পুনর্নবনবারণের প্রার্থনা।

তবুও আমার মনে দুঃখ একটা রইলই। কথাটা তাঁকে বলতে আমার কী হয়েছিল? অপদস্থ উপহসিতই হতাম না হয়...তবুও যদি উনি কখনো ভুলেও ব্যাপারটা পরখ করে দেখতেন...মেঠায়ের স্বাদই তার মিষ্টত্তর প্রমাণ দিত, আমার কথার কোনো অপেক্ষা রাখত না তার পর।

হাজার ঘুণ হলেও তাঁর কাছে কি ঘুণাক্ষরেও কথাটা বলা যেত না!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, বাবার কাছেই কেমন নাজেহাল হয়েছিলাম একবার এই কথা কইতে গিয়ে। মা'র কথাটা পাড়তেই না ফোঁস করে উঠেছেন তিনি—যাঃ যাঃ। আমার কাছে আর তোর দুর্গার মহিমা ফলাতে আসিস না। আমি কি তোর মা'র মতন শাক্ত নাকি? ত্বমীশ্বরং ঈশ্বরানাং পরমঃ—আমাদের সন্ন্যাসীদের কাছে দেবাদিদেব সেই মহাদেব ছাড়া কিছু নেই। আর আমিই হচ্ছি সেই শিব। বুঝেছিস? চিদানন্দরূপম্ শিবোহম্ শিবোহম্!

বলেই তিনি ভোম হয়ে রইলেন।

মা'র কাছে গিয়ে বাবার কথাটা পাড়লে তিনি বললেন—পাগল! ভগবতীর ওপরে আবার কেউ আছে নাকি রে? ভগবত্যাঃ পরং কুতঃ ভগবান নহি বিদ্যতে!

'মা কী বলে জানো বাবা? ভগবত্যাঃ পরং কুতঃ ভগবান নহি বিদ্যতে'...বাবার কাছে মা'র কথাটা গিয়ে কুঁথিয়েছি।

'কোন্ শাস্ত্রে বলেছে? জেনে আয় গে, কোন্ সুক্তে আছে কথাটা? বললেই আমি মেনে নেব নাকি?' বললেন বাবা—'জেনে আয় কার সুক্ত এটা।'

'কার সুক্ত—তার মানে?'

'সুক্ত থাকে না? যেমন ধর, তোর ঐ দেবীসুক্ত—চণ্ডীর গোড়াতেই রয়েছে! অম্ভৃণী ঋষির কন্যা বিদুষী বাক্-এর সুক্ত সেই—যাতে আছে ঐ—অহমেব রুদ্রেভিঃ বসুভিশ্চরামি/অহমাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।'

'ও! সেইটে! আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবাইকে চরাচ্ছি—সেই কথাটাই বলছো তো? ওটা তো ঠিক মা'র কথাই, তাই না?'

'চরামি মানে চরাচ্ছি নয়। তোকে ধরে আমি যদি একটা চড় কসাই তাহলে আমার রাগ যায় বটে, তবে চরামি হয় না'—শুনেই আমি তিন হাত পিছিয়ে আসি—'এখানে চরামির অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে বিচরণ করি। বুঝেছিস? না, আরো ভালো করে বুঝিয়ে দেব তোকে?'

শুনেই আমি সরে পড়ি সেখান থেকে। সুক্তর কথাটা পাড়ি গিয়ে মা'র কাছে এবার। জানা যায়, কোনো শাস্তরের কথা নয়—

'মা বললো যে, ওটা মা'র সুক্ত। আর কারো না। বুঝেছো?'

'তোর মা'র সুক্ত?'

'হ্যাঁ। বাক্-টাকের নয়। তাই বলল মা।'

'বুরবাকের মত কথা।'

'কেন, মা'র সুক্ত কি হতে পারে না? মা কি বানাতে পারে না নাকি? রোজ রোজ যে সুক্ত রাঁধে মা?'

'সুক্ত না ছাই! মুখ বিকৃত করেন বাবা—'মুখেও তোলা যায় না—যাচ্ছেতাই।'

'একথাটা তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। মা'র সুক্তরা ভারী অখাদ্য।' এক কথায় সায় দিয়ে বাবা'র সঙ্গে আমার সন্ধি হয়ে যায়।

কিন্তু নারাণের শোক কিছুতেই ভুলতে পারি না। যখনই কোথাও কোনো অপঘাত ঘটে, বুকটা আমার ছ্যাঁত করে ওঠে, যখনই কোনো ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে আত্মহনন করে, কি দুটি ছেলেমেয়ে ভালোবেসে ছাঁদনাতলায় গিয়ে মিলতে না পেরে পৃথিবীর থেকে পিঠটান দেয়, তখনই আমার মন টন টন করে—নতুন করে দুঃখটা উথলায়, মনে হয়, এ আমার অপরাধ—এর জন্যে আমিই দায়ী। আমিই যেন অপরাধী।

কবে সেই ছেলেবেলায় মা'র কাছ থেকে এই বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র পেয়েছিলাম, হেলাফেলায় যার ব্যবহার করে সব ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছি, যে-ভেলায় চেপে অবহেলায় উতরে এলাম ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই জীবনের পারাবার, সেই কথাটাই আমি বলে যেতে পারলাম না কাউকে—আমার ভাইবোনদের, দেশের ছেলেমেয়েদের—কাউকেই না। এই দুঃখটাই বড়ো হয়ে রইলো আমার।

যদিও ঠিক আমার নয়, আমার মা'রও নয় কথাটা—আমাদের সাবেক কালের কথাই—পরমহংসদেব বলে গেছেন এসব কথাই, কিন্তু একালের ছেলেদের কানে কি করে একথা পৌঁছানো যায় কী ভাবে কোন্ ভাষায় বললে তারা শুনবে—তা কি আমি বলতে পারব। ভারতবর্ষের প্রাণের কথা—সেই ভগবানের কথাই বটে, কিন্তু এ যুগের সংঘাত সমস্যায় কী করে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে ? কষ্টের পাথর চিরকালই রয়েছে—সর্বজনের সম্মুখেই—দিনদিনই থাকবার—সেই-কষ্টিপাথরে তার যাচাই করার কথাটাই কেবল। কিন্তু কী করে বলা যায়!

সাধুসন্তরা ভগবানের কাজে লাগবার কথা বলেছেন, তাঁর সেবা করবার কথাই। আমার মতন অসাধু স্বার্থপরের কথা হচ্ছে আলাদা—আমরা ভগবানকেই নিজেদের কাজে লাগাতে চাই—তাকেই সেবক বানাবার আমাদের সাধনা।

কিন্তু ভগবান কখনো কারো কাজে লাগেন না, কাজে লাগাবার নয়, পিতৃতুল্য তাঁর সে রকম কোনো মতলবই নেই আপদে, বলতেন মা। মা-ই ছেলেদের কাজে লাগেন—তাদের সেবায় সজাগ রয়েছেন সর্বদাই—সেই মা-ই একমাত্র।

সেই মাকেই আমাদের চাই।

এবং একটু ডাকলেই তাঁকে পাই। যা পাওয়ার, যা যা চাওয়ার, পেয়ে যাই তাঁর কাছেই।

'কী করে তাঁকে পাওয়া যায় ? তুমি কি পেয়েছো মাকে ? দেখেছো মাকে ? ঠিক করে বলো আমায়।' শুধিয়েছিলাম আমি।

'দুর বোকা! মাকে কি চর্মচক্ষে দেখা যায় ? দেখতে পায় কেউ ? তাঁর স্নেহের মধ্যেই তাঁর দর্শন মেলে। বরাভয়েই তাঁর পরিচয়। তাঁকে ডেকে যখন কোনো সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাই, তখনই তাঁর দেখা পেলাম। যখন তিনি স্তন্য দেন, তখনই তো মা। অন্নপূর্ণা মাকে স্তন্যপূর্ণারূপেই দেখা যায়। দুহিতা হয়েই তিনি দর্শন দেন।

'তার মানে ?'

'মা নিজেই কি তা জানিয়ে যাননি ? কতোবার তো বলেছেন।'

'বলেছেন ? কোথায় বলেছেন ? জানিনে তো।'

'ঐ বাক্‌সূক্তেই বলেছেন। সেটা অবশ্যি মন্ত্রের ভাষা। তাছাড়াও মা'র জানাবার ভাষা

আছে আরো। তাঁর ওই প্রতিমার ভাষা। সে ভাষা বোঝা একটু শক্তই বটে, কিন্তু খোলাখুলিও বলে গেছেন আবার। রামপ্রসাদের কাহিনীটা জানিস না? তিনি ঘরের বেড়া বাঁধছিলেন, বাঁধনের দড়া ফুরিয়ে গেছে, ঘরের ভেতরে মেয়েকে ডেকেছেন—কাতাটা দে মা! মেয়ে এসে বেড়ার ফাঁকে গলিয়ে বাবার হাতে বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়ে কিন্তু যোগায়নি তা, ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল সে, বাবার ডাক কানেই যায়নি তার। মা কালী মেয়ে সেজে এসে নিজে যুগিয়ে গেছেন।'

ঘরের বেড়া বাঁধার ছলনায় ওই রামপ্রসাদকেই মায়ার বাঁধনে বাধতে—যে মায়া নাকি নেহাত মিথ্যেই—নিজে এসে কাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন কাত্যায়নী!

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি মা। তাঁর গানেই রয়েছে তো—রামপ্রসাদের বাঁধলো বেড়া।...'

'তারপরে কলকাতার কাছেই কোথায় কাঁকনতলার ঘাট আছে জানিস? এক পূজারী বামুন রাতদিন ডাকতো মাকে, কেউ কোথাও ছিল না তার, একদিন এক শাঁখারী এসে বলল, তোমার মেয়ে পুকুরঘাটে পৈঠায় বসে শাঁখা কিনেছে আমার থেকে, তার দাম দিতে বলেছে তোমায়। দামটা দাও।'

'মেয়ে কোথায়! তিন কুলে কেউ নেই আমার! গরিব মানুষ, কোথা থেকে দেব শাঁখার দাম!'

'শাঁখারী ফিরে গেল পুকুরঘাটে। পূজারী ঠাকুরের কথাটা মেয়েকে গিয়ে বলতেই সে বললো, 'বাবাকে বলো গে, লক্ষ্মী ঠাকরুণের ঝাঁপিতে সিঁদুর মাখা টাকা আছে একটা-সেইটে দিতে বলো।'

শুনেই ঠাকুর টের পেয়ে যায়—এ মেয়ে তার কে! হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় ঘাটে কোথায় কে। কেউ কোথাও নেই। শাঁখারী তখন কাঁদতে থাকে এই বলে—কোথায় গেলি মা? আমাকে মিথ্যেবাদী বানিয়ে গেলি! আর পূজারী কাঁদে এই বলে—শাঁখারীর কী ভাগ্যি, কি ভাগ্যি। সে তোর দেখা পেল। আর আমি কী হতভাগ্য, আমি তোর দর্শন পেলাম না! তখন সেই পুকুরের মাঝ থেকে দু' খানি হাত উঠলো শাঁখা-পরা। দু'হাতেই শঙ্খকঙ্কন। দেখে সব সন্দেহভঞ্জন হোলো দু'জনের। মা যেমন মন্ত্রের ভাষায়, প্রতিমার ভাষায় কথা কন, তেমনি ঐ প্রতীকী ভাষাতেও। তাঁর দেখা পেতে হলে বৃত্তপথে বৃত্তির পথেই দেখতে পাই—দোহন করলেই দেখা পাই তাঁর—দুহিতা রূপেই তিনি দেখা দেন। দুহিতা হলেই। মা নিজেই তো বলে গেছেন কথাটা—বললেন আমার মা।

বাবাও একবার বলেছিলেন যেন এই রকমটাই। গো অর্থে পৃথিবী, গো আবার মাতাও। শ্রীকৃষ্ণের গোদোহনের অর্থ হচ্ছে এই পৃথিবীকে দোহন করা। পার্থিব জগত থেকে অপার্থিব রস আহরণ। তিনি এই দোহনবৃত্তির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন আমাদের।

মা'র কথাটা মনে ধরেছিল আমার। যাঁর স্নেহধারায় আমাদের পুষ্টিতুষ্টি—বাছুরের মতন তাঁকে ঢুঁ মেরে মেরে দোহনের জন্যেই আমরা। দোহনের হেতুই ভগবান—দুইবার জন্য, দুয়ে নেবার জন্য তো।

ভগবান কি গোরুর অধম হতে পারে?

- সমাপ্ত -